৮৫/২৩

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্নিখিলয়ান্বিপশ্চিতা-
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ ॥



আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

)*(

ত্রয়োবিংশ বর্ষ—১৩৩৭

সম্পাদক—শ্রীমৎ সত্যচৈতন্য ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২॥০ | প্রতি সংখ্যা—।০

সূচী

(বর্ণমালা অনুসারে)

—*—

যোরহাট
যোগমায়া প্রিণ্টিং-ওৱার্কস্ হইতে
শ্রীসতীশ ব্রহ্মচারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ওঁ তৎসৎ
আর্য্য-দর্পণ
সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৩শ বর্ষ | ১ম খণ্ড
বৈশাখ—১৩৩৭
সমষ্টি সং ২৪১ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষে

—(*)—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং; মাহং ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তুনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববর্ষের প্রথমেই শান্তিপাঠ করিয়া নিজের মাঝে শক্তিসঞ্চার অনুভব করা প্রয়োজন। প্রার্থনায় যত সহজে শক্তিসঞ্চার হয়, অন্য কিছুতেই আর তেমন হয় না। তাই বৎসরের প্রারম্ভেই ব্রহ্মের কাছে—আমারই বিরাট্‌ আত্মস্বরূপের কাছে প্রার্থনার মন্ত্রে প্রণতি জানাইতেছি।

আমার সমস্ত অঙ্গ, বাক্‌, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপুষ্ট হউক।

ইহার মাঝে একটী নিগূঢ় দ্যোতনা আছে। দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়েরই উত্তেজনা বেশী; কিন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যদি পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে আপনি তাহাদের শক্তি ঊর্দ্ধ-প্রেরণাভিমুখী হইয়া যাইবে।

ইন্দ্রিয় হইতে বড় শত্রু অথচ বড় মিত্র নাই। তাই উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মকে শরীরে মনে প্রাণে অনুভব করিতে চাহিলেই অগ্রে ইন্দ্রিয়ের

পরিপুষ্টি—ইন্দ্রিয়ের বিশুদ্ধি হওয়া চাই। কাহারও মাঝে যদি কোন দুর্ব্বলতা না থাকে, তাহা হইলেই আর বিকৃতির আশঙ্কা নাই।

"আপ্যায়ন" কথাটীর কি মঙ্গলময়, শুভ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। উত্তেজনা দ্বারা কখনই আপ্যায়ন হইতে পারে না; বরঞ্চ তাহাতে প্রাণের জ্বালা—হৃদয়ের হাহাকার আরও বেশী করিয়া বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আপ্যায়নে তো কোন আবিলতা নাই। পরিপূর্ণ রসে সবাই বিভোর। কে কাহার পানে উগ্র দৃষ্টিতে তাকাইবে? সকলই যদি পূর্ণ হয়, পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে অশান্তি কিসে? পরিপূর্ণতায় নিটোল সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিকই একটা আকর্ষণ আছে—তাহাতে কোন কামলালসা থাকে না। একটা ফুল যখন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠে, তখন তাহার সৌন্দর্য্যে আপনি সকলকে বিমোহিত করে। পরিপূর্ণতার এই সহজ সুন্দর বিমল আকর্ষণকে কে অগ্রাহ্য করিতে পারে?

আপ্যায়নে ইন্দ্রিয়ের অধঃস্রোত স্তব্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের উজান স্রোত বহিতে আরম্ভ করে। এই উজান স্রোত যখন চলে—তখন দেহের মাঝেই এক অপার্থিব বিমলানন্দ উপভোগ হয়। যোগীরা ষট্‌চক্রের ভিতর দিয়া এই উজান-স্রোতের আনন্দ-তরঙ্গই উপলব্ধি করিয়া—সমাধিতে মগ্ন হইয়া যান। বৈষ্ণবেরা ইহাকেই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তখন জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোথায় থাকে কাম, আর প্রাকৃত নর-নারীর প্রাকৃত লীলা—সব তখন অপ্রাকৃত, সব তখন বৃন্দাবনের নিত্যলীলা। একবার মানুষ এই আপ্যায়নের অনুসন্ধান পাইলে আর কি তুচ্ছ আনন্দে আকৃষ্ট হইতে পারে? ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় মানুষ আর কি আত্মহারা হয়, এর চেয়ে গভীরভাবে আত্মহারা হইয়া যায় মানুষ, যখন ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। জীবনের এই উজান গতিকেই একবার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে তাহারই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। চাই শুধু আপ্যায়ন—প্রশান্তি!

সমস্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া গেলে যে সৌন্দর্য্যের রূপ বিকসিত হইয়া উঠে—তাহাই দেবতার উপভোগ্য। সাধনার আগুনে কামকে পুড়িয়া ছাই করিয়া ফেলিতে না পারিলে উজ্জ্বল হেম কান্তি ফুটিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন মানেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আধ্যাত্মিক রসে পরিপুষ্ট। কিন্তু আপ্যায়ন আনিতে বহু সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন। কাজেই সাধনা করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিতে হইবে যাহাতে ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন সহজেই আসিয়া পড়ে।

শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সংযমে যে কি আনন্দ, শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া তো কেহই দেখিতে চায় না। আমরা বলি কাম না থাকিলে উত্তেজনা না থাকিলে মানুষ যে জড়; কিন্তু কামের নিবৃত্তি যে প্রেম—সে প্রেমে মানুষকে আরও বেশী করিয়া চেতন করিয়া তুলে।

উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন। কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিভাত হইবেন কখন? —ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন হইয়া গেলে। কাজেই ব্রহ্মানুভূতির পূর্ব্বে শরীরকে "ব্রাহ্মী তনু" করিতে হইবে। কামনা থাকিলে, চিত্তের আবিলতা মোচন না হইলে ব্রহ্ম প্রতিভাত হইবেন না।

"আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখ্যান না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখান না করেন। ব্রহ্মেতে আমাতে নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকুক!"

আমি যদি যোগ্য না হই, ব্রহ্মকে ধারণা করিবার শক্তি যদি আমার না থাকে তাহা হইলেই ব্রহ্ম আমার নিকট প্রত্যাখ্যাত। "আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখান না করি" ইহাই হইল ধরিবার কথা

ব্রহ্ম আমাকে কখনো প্রত্যাখ্যান করিবেন না, ইহা তো জানা কথাই। আলো তো সর্ব্বদা বিদ্যমান—অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গেলেই আলো প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। সূর্য্যের কিরণ মেঘে ঢাকা পড়ে বলিয়াই যে সূর্য্যের কিরণকে অস্বীকার করিতে হইবে তাহার কি মানে আছে! ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না আমারই অযোগ্যতায়—আমারই অপূর্ণতায়।

নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে সমানে সমানে। আমি যদি ব্রহ্মকে অনুভব করিবার দরুণ শুদ্ধ দেহ মন-প্রাণ নিয়া উন্মুখ হইয়া থাকি, আর ব্রহ্মও যদি আমায় কৃপা করেন তাহা হইলেই তো ব্রহ্মানন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমার দিক হইতে আমিও পূর্ণ—কোথাও কোনরূপ দুর্ব্বলতা থাকিবে না আমার; আর ব্রহ্মও আমাকে অস্বীকার করিবেন না। তাহা হইলে আর চাই কি! তখন "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।" কেবল চারিদিকে পরিপূর্ণতা—পরিপূর্ণতা!

একটী কথা খুব মনে রাখিতে হইবে শান্তিপাঠের প্রথমেই ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। ব্রহ্মকে ধারণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন হইবে ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন হইলেই। পূর্ব্বে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয় নিয়া যত কিছু আধ্যাত্মিক আলোই দেখি না কেন, সবই সাময়িক—সবই ক্ষণস্থায়ী!

চঞ্চল বলিয়াই ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, আর এই জন্যই ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি হইতে পারে না। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ই ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য আধার। ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি হয় কিসে?—রসের পরিপাকে—রসের বিকারে নয়। খাঁটী রসিকের প্রাণে কিন্তু কোনরূপ আবিলতা নাই! রসেই ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি হইবে বটে; কিন্তু এই রস প্রবৃত্তির তীব্র রস নয়; এই রসকে শান্ত রস বলা হইয়াছে। শিরা উপশিরায় এই রসের অস্থির নৃত্য নাই; এই রসে আছে শুধু শান্ত শীতল স্থিতি-প্রবাহ। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তর্পণ হইয়া যায় ইহাতে। কোন উগ্রতা নাই, কোন তাপ নাই, সকলকেই স্তব্ধ করে শান্ত করে এই আধ্যাত্মিক রস।

দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় সকলের বন্ধন হইতে আমরা মুক্ত হইব, তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া নয়—আপ্যায়িত করিয়া। কিন্তু তাহাদের আপ্যায়ন হইবে কিসে?—আত্মরতি দ্বারা। আত্মাতে প্রীতি জন্মিয়া গেলেই ইন্দ্রিয়ের আর কোন চঞ্চলতা থাকিবে না।

এই আত্মা বৃহৎ—ভূমা। ইঁহাকেই জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভবের মাঝে পাইতে হইবে। সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণতা দিয়া সেই বিরাট আত্মার অনুভব হইতে পারে না। একবার ব্রহ্মের পানে ফিরিয়া তাকাইতে হইবে—তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়ের নীচ দৃষ্টি অপসারিত হইয়া যাইবে। প্রত্যেকের প্রাণে একটা চরম সার্থকতা স্বর্গীয় দ্যুতি আনিয়া দিতে হইবে। ইহাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। আর কিছু না, প্রত্যেককেই আপন বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—কোনরূপ আসক্তি, কোনরূপ দুর্ব্বলতা যেন না থাকে।

কর্ম্মে চিন্তায় বাক্যে আমরা কেবল ব্রহ্মকে নিরাকৃত করিয়াই আসিতেছি। নববর্ষে নবদীক্ষা লাভ করিয়া যেন সবদিকেই আমরা ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হইয়া উঠি। বর্ষের প্রথম দিন হইতেই যদি ইন্দ্রিয় আপ্যায়নের সাধনা চলিতে থাকে, তাহা হইলেই উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিবেন। একদিনের সাধনায় কিছু হইবে না, তিল তিল করিয়া সারা বৎসর এই সাধনার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আমাদের দোষে যেন ব্রহ্ম প্রত্যাখ্যাত না হন—এই মনে করিয়া সর্ব্বদা হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে।

শান্তিপাঠের সর্ব্বশেষে রহিয়াছে—"আত্মনিষ্ঠ

আমাতে প্রোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রতিভাত হউক।” কাজেই ব্রহ্মানুভূতি পাইতে হইলেই প্রথমে আত্ম-নিষ্ঠার প্রয়োজন। আত্মার প্রতি যাহার নিষ্ঠা নাই—তাহার তো ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন কিছুতেই হইতে পারে না। আত্মনিষ্ঠ হইলে ইন্দ্রিয়ের মোড় আপনি ফিরিয়া যায়। তখন সকল ইন্দ্রিয়ের উপর বাহিরের কোন কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজনই হয় না।

দাবী মিটাইয়া দিলে অভাব মিটে বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা আপ্যায়ন হয় না। কাজেই ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন করিতে হইলে আগে আত্মাকে তুষ্ট করা চাই।

অনেক সময় আচম্‌কা আলোতে আমাদের উজ্জ্বল করিয়া তুলে বটে, কিন্তু নিমেষের মাঝে আবার সেই আলো স্তিমিত হইয়া যায়; তখন আবার পূর্ব্বের যেই অন্ধকার সেই অন্ধকার। কিন্তু আত্মবোধের দীপ্তির নির্ব্বাণ হয় না কিছুতেই। যে একবার আত্মাকে জানিতে পারিয়াছে তাহার সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

অক্ষম বলিয়া ফাঁকি দিতে চাই না—আমার ভিতর শক্তি সঞ্চয় হোক্—আমি সকল রকম কর্ম্মের বোঝা বহিয়া চলিতেই রাজী। কিন্তু যাহাদের নিয়া কাজ করিব—তাহারা যদি কর্ম্মের পথে বিপ্লব বাধাইয়া বসে, তাহা হইলেই তো আমার সকল আশা ব্যর্থ হইবে। কাজেই সর্ব্বপ্রথমেই ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন করিতে চাই।

নববর্ষের প্রথম দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আজ অন্তর হইতে এই প্রার্থনার মন্ত্রই উদিত হইতেছে—“হে প্রভু! আমাদের বল দাও—শক্তি দাও—যেন কোন কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া আসিতে না হয় আমাদের। তুমি আজ প্রাণে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলে, যেন তাহা ধারণ করিয়া বিরাট কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি।”

ভারতবর্ষ

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—*‡0‡*—

[Golden Gate Hall, San Fransisco. U. S. A. Jan, 28—1920]

আজ রাতে আমেরিকাবাসীদের কাছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দু চার কথা বল্‌ব। আজকের বক্তৃতায় এত অল্প লোক হল কেন, তা জানি না। যাক্, তার জন্য দুঃখ করি না। যারা আজ এসেছ, রামের চোখে তারাই আমেরিকা—শুধু তাই নয়, তোমরাই সমস্ত ইউরোপ, সমস্ত জগৎ। আজ এই মুষ্টিমেয় শ্রোতার হৃদয়ে যদি আমার কথার কোন ছাপ পড়ে, একজন লোকও যদি অন্তরের দরদ দিয়ে আমার কথা বুঝ্‌তে পার; তোমার পাঁচ সাত জনেও যদি রামের আকাঙ্ক্ষিত ব্রত গ্রহণ কর বা রামের এই অরণ্যে রোদন শোন, তাহলেই তিনি মনে কর্‌বেন, তাঁর সব হয়ে গেল!

তোমাদের মাঝে যে ব্রহ্মস্বরূপ রয়েছেন, যে অনন্তস্বরূপ রয়েছেন, তাঁর কাছে রামের এই আবেদন! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একটী দেহেও যদি সেই অনন্তস্বরূপ জেগে ওঠেন, তাহলে জগতে অভাবনীয়

কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। এই অনন্ত আত্মস্বরূপকে সাম্প্রদায়িকতার মোহে আচ্ছন্ন করো না—দোহাই তোমাদের! একটী ঘণ্টার দরুণ অন্ততঃ, এই যবনিকা ছিঁড়ে বেরিয়ে এস তোমরা—ভুলে যাও তোমাতে-আমাতে, বর্ণে, জাতিতে বা ধর্ম্মে কোন ভেদ আছে কিনা! ওই সংস্কারই তো অচেনা মানুষের কথায় মানুষকে বধির করে রাখে।

আজ দুমাস ধরে রাম ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা শিরোমণি, তাই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন; ভারতীয় শাস্ত্র মন্থন করে তিনি তোমাদের জন্য আহরণ করেছেন প্রাণের আপ্যায়ন অমৃত, জীবনের রসায়ন দুগ্ধ! যে আকর থেকে এই মণিরত্ন উদ্ধার হয়েছে, যে কামধেনু এই দুগ্ধ ক্ষরণ করেছে, যে দেশ প্রথম এই সত্যকে ঘোষণা করেছে, যে ভূমি জগৎকে ধর্ম্ম দিয়েছে, তারই কথা আজ রাম তোমাদের বল্‌তে চান। হাঁ, প্রত্যক্ষে হোক্‌, পরোক্ষে হোক্‌, ভারতবর্ষই জগৎকে ধর্ম্ম দিয়েছে। আমেরিকা আর ইউরোপে দিনের পর দিন যে অভিনব ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উদ্ভব হচ্ছে, তারও মূলে এই ভারত; তারই কথা আজ রাম তোমাদের বল্‌তে চান। তোমাদের New Thought, Theosophy, Spiritualism, Christian Science, Mental Healing—যা নিয়ে তোমরা এত গর্ব্ব করছ, এর সবকটাই প্রত্যক্ষে হোক্‌, পরোক্ষে হোক্‌ ভারতবর্ষ থেকে আমদানী। অতীতে, বর্ত্তমানে জগৎকে দর্শনচক্ষু দান করেছে যে দেশ, তারই কথা রাম তোমাদের বল্‌তে চান। তোমাদের Plato, Socrates, Pythagorus, Plotins প্রভৃতি গ্রীকদার্শনিকদের প্রেরণার মূল উৎস ছিল পূর্ব্ব ভারত; দর্শনের ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। Schopenhour, Schlegel, Schelling, M. Cousin প্রভৃতি সবাই স্বীকার করেছেন, তাঁদের ভাবধারার মূলে প্রাচ্যের বেদান্ত, সাংখ্য, বৌদ্ধ শাসন, উপনিষদ্‌ বা গীতা। আমেরিকা, ইংলণ্ড বা জার্ম্মেনীর অদ্বৈতবাদও প্রাচীর দান। রাম যে দেশের কথা তোমাদের বল্‌তে চান, সে দেশ শ্রীকৃষ্ণ-শঙ্করের জন্মভূমি; যে সুদিব্য, মহাপ্রাণ ভাবধারা তোমাদের ঋষিকল্প Emerson, Walt Whitman, Sir Edwin Arnold ও Maxmullerকে অনুপ্রাণিত, প্লাবিত, দীপ্ত করেছে, এ দেশ তারই প্রসূতি; শুধু উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তা নয়, শুধু কাব্য আর দর্শনই নয়, শারীরিক শক্তি ও বীর্য্যবত্তারও প্রসূতি এই দেশ! শারীরিক বলবীর্য্যের কথা বললাম বলে অবাক্‌ হচ্ছ বোধ হয়? জান, আজ পর্য্যন্ত ইংরেজরাজের সর্ব্বোত্তম সহায় ও রক্ষী কারা?—পূর্ব্ব ভারতের শিখ্‌, গুর্খা, মারাঠী, রাজপুতেরা। ইংরেজের অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখে বুক পেতে দেয় এই ভারতবর্ষের সিপাহীরা!

রাম ভারতের কাহিনী আজ তোমাদের শোনাতে চান। এই ভারতই একদিন জগতে সব চেয়ে সমৃদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষকে শোষণ করে জাতির পর জাতি 'লাল' হয়ে গেছে। এই ভারতবর্ষের প্রতি অতি লোভে উত্তেজিত হয়েই না দৈবাৎ কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। আগেও আমেরিকার নাম ছিল —India।

একদিন যে দেশ জগতের মাথার মণি ছিল, রাম আজ তারই কথা বল্‌ছেন। বহুবিচিত্র অরণ্যানীতে আবৃত হিমালয় আর শস্য-সমৃদ্ধ প্রান্তর যার অনুপম শোভা, জগতের সেই সর্ব্বোত্তম ভূমির কথাই রাম তোমাদের বল্‌ছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বলাই তাঁর তাৎপর্য্য নয়। ভারতবর্ষ ছিল জগতের শিরোমণি—শুধু স্থূলেই নয়, বিদ্যায়, চারিত্র্যে, ধর্ম্মেও। আজ সে দেশ জগতের পদতলে!

আমেরিকা, আজ তুমি জগতের শিরোদেশে, আর ভারত জগতের পদতলে! এই মস্তকের প্রতি রামের তাই আবেদন, যদি শক্তিশালী হতে চাও তো পা দুটীকেও সুস্থ রাখ। পা যদি খোঁড়া হয় তো

মাথাকেও তার জন্য ভুগ্‌তে হবে যে। পায়ের ব্যথা কি মাথার ক্ষতি করবে না? যে জগদ্ধাত্রী তাঁর কাব্যে-দর্শনে, তাঁর চিন্তার ধর্ম্মে বিশ্বকে পোষণ করেছেন, সেই জগজ্জননী, সেই সনাতনী বিশ্বধারিণী আজ পীড়িতা। আর্য্য-বংশের জ্যেষ্ঠা দুহিতা আজ পীড়িতা। তোমরা তাঁর সেবা করবে না? কামধেনু পীড়িতা—মৃতা নয়, পীড়িতা। তোমরা তার কিছু করতে পার তো, তার আরোগ্যের পথে সহায় হতে পার তো। ভারতবর্ষ জগৎকে স্তন্য দিয়েছে, পুষ্টির আহার দিয়েছে, বীর্যশালী রসায়ন দিয়েছে, দিব্যজ্ঞান দিয়েছে। কামধেনুর মতই তার এখন শুশ্রূষা করা উচিত। এই কামধেনু শুধু তৃষ্ণায় পীড়িতা, অনাহারে মুমূর্ষু। জগৎ তার স্তন্য পান করেছে; এখন তার উচিত কোনও রকমে তাকে দুটী ঘাসজল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা।

আচ্ছা, ভারতবর্ষ না হয় খুবই মন্দ; জগৎকে সে কিছুই দেয়নি; হিন্দুরা জগতের মাঝে সব চেয়ে ওঁছাই হল না হয়! তা হলেও তো তোমাদের ওপর ভারতবর্ষের দাবী সব চেয়ে বেশী। সব চেয়ে খারাপ বলেই তো তার সেবা আরো বেশী দরকার।

একজন পীড়িত হলে শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, রোগটা ও সে সংসারময় ছড়িয়ে দেয়। একজনের সর্দ্দি হলে পাঁচজনের তার ছোঁয়াচ লাগে। ভারতবর্ষের আজ তেমনি সর্দ্দি হয়েছে। বল্‌তে পার, ও তো গরম, সর্দ্দি লাগবে কি করে? সে তো ঠাণ্ডার সর্দ্দি নয়, সে হচ্ছে দুঃখ-দৈন্যের শৈত্য। এই শৈত্যে পীড়িত হয়ে ভারতবর্ষ কাঁপছে। জানই তো একজনের সর্দ্দি হলে তার পাশে আর একজনের হবে। একজনের যদি কলেরা হয় তো পাঁচজনের মাঝে সে রোগ ছড়িয়ে পড়বে। একজনের যদি বসন্ত হয় তো দশজনের হবে। এই জন্য যে পীড়িত তার সেবা করা সবার কর্ত্তব্য—নিজের জন্য না হোক্, জগতের ভালোর জন্য। রোগীকে ভুগে মরতে দিলে সে দুর্ব্বলতা জগৎময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত জগতের দিকে চেয়ে রাম বলছেন, ভারতবর্ষকে তোমরা তুলে ধর।

জিজ্ঞাসা করতে পার, ভারতবর্ষের কি হয়েছে? কোথায় তার ব্যথা? সে কথা খুলে বল্‌ছি। * *

ভারতবর্ষের নাড়ীতে যে রোগ, রাম তার কথাই বলবেন। ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ কি, কেন তার চারদিকে এত বাধা, এত নৈরাশ্য, তা শোন। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যেতে পারত, সবটা খুঁটিয়ে শোনাবার মত ধৈর্য্য ও সময় তো লোকের নাই, তাই রামকে সমস্ত কথা অতি সংক্ষেপে গুটিয়ে আনতে হবে।

ভারতবর্ষের অধঃপতনের নিদান বেদান্ত দর্শন দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। এ হচ্ছে কর্ম্মফল। কর্ম্ম বলতে বুঝি, আমরা নিজেরা যা ঘটিয়েছি। আজ মানুষ যা ভোগ করছে, তার বীজ ছিল পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে। হিন্দুরা যেমন নাকি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের নির্য্যাতিত করেছিল, তেমনি জগতের বিজেতা জাতিদের দ্বারা তারা আজ নির্য্যাতিত হচ্ছে। অসুখের দরুণ মানুষ নিজেই দায়ী, নিজের অজ্ঞানতায় বেশী খেয়ে বা অন্য কোনও রকমে স্বাস্থ্যের নিয়মভঙ্গ করে মানুষ অসুখ ডেকে আনে; তেমনি ভারতবর্ষ যে আজ পীড়িত, সে পীড়ার মূল হচ্ছে তাদের নিজের কর্ম্ম বা অজ্ঞান।

তা অসুখ যেমন করেই হোক্ না কেন, চিকিৎসক এসে তার দরুণ রোগীকে গালমন্দ করে না। চিকিৎসক রোগীকে ভরসা দেয়, আরাম করে তোলে। রোগীকে তিরস্কার করলে রোগ আরও বাড়বে বই তো নয়। ভারতবাসীদের দুষ্কৃতির জন্য তিরস্কার করবার সময় এ নয়। আমাদের কর্ত্তব্য, তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করা।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উৎপত্তি

রাষ্ট্রনীতিতে আছে শ্রমবিভাগের কথা। ফ্যাক্টরী

বা গিলে শৃঙ্খলার দরুণ সমস্ত কাজগুলিকে ভাগ করে নেওয়া হয়। তোমার দেহ-যন্ত্রশালাতেও এমনি শ্রমবিভাগ আছে। চোখ কেবল দেখেই, শোনে না; কান কেবল শোনেই, চোখের কাজ তাকে দিয়ে হয় না। হাত কখনো পায়ের কাজ করে না; পা নিজের কাজ করে, হাতও তার নিজের কাজ করে। চোখ দিয়ে যদি শুনতে চাই, নাক দিয়ে হাঁটতে চাই, কি হাত দিয়ে শুঁকতে চাই আর কাণ দিয়ে খেতে চাই, তা কি চলে? না, তাহলে আমরা আবার সেই বিবর্ত্তনের আদি কোঠায় protoplasmএর পর্য্যায়ে গিয়ে পড়্‌ব; আমরা হব তখন এককোষ প্রাণীর মত; তাদের শুধু পেট ছাড়া আর কিছুই নাই, এক পেট দিয়েই তাদের চোখ, কাণ, নাক, পা সবার কাজ হয়। আমরা তো তা হতে চাই না। শ্রমবিভাগ প্রয়োজন, সঙ্গতও বটে। এই শ্রমবিভাগের ওপর ভিত্তি করেই একদিন ভারতবর্ষে জাতিভেদের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

তখন জাতিভেদ ছিল শুদ্ধ শ্রমবিভাগ মাত্র, আর কিছু নয়। একজন নিল পুরোহিতের কাজ, আর একজন নিল সৈনিকের কাজ। একজনের লড়াইয়ে মেজাজ, পশু-শক্তির প্রাচুর্য্য আছে, অস্ত্র ধরতে পারে, শত্রুকে তেড়ে-পেড়ে ফেল্‌তে পারে, তাকে ধর্ম্ম প্রচারকের মোলায়েম বৃত্তি দিলে তো চলে না। এইখানেই শ্রমবিভাগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারু হয়ত দোকানদারীর মত কম ঝঞ্ঝাটের পেশাটাই ভাল লাগে। তাদের দ্বারা পুরোহিতের কাজ চল্‌বে না। তারপর অনার্য্য আদিম অধিবাসীরা ছিল; তাদের না ছিল সভ্যতা, না ছিল শিক্ষা; শৈশব আর বাল্যকাল তাদের যেমন-তেমন করে গা ঢেলে দিয়ে কেটে গেছে। তারা তো আর পুরোহিতের কাজও করতে পারবে না; যোদ্ধার কাজও তাদের দিয়ে চল্‌বে না, কেননা তাদের কুচ-কাওয়াজ শেখা নাই, লড়াইয়ের কায়দা জানা নাই। এমন কি দোকানদারীটা করা পর্য্যন্ত তাদের দিয়ে হয়ে উঠ্‌বে না, কারণ তাতেও বুদ্ধি দরকার, নৈপুণ্য দরকার। এরা স্বচ্ছন্দে নিলে মুটে-মজুরের কাজ—রাস্তা ঝেঁটানো বা পথের ধারে খোয়া ভাঙ্গা তাদের মানাল ভাল। এমনি করে কাজকর্ম্মের মাঝে চারটা বিভাগ এসে দাঁড়াল। যারা পুরোহিত, তারা হল ব্রাহ্মণ; যারা যোদ্ধা, তারা ক্ষত্রিয়; যারা দোকানদারী বা বণিকবৃত্তি ধরল, তারা হল বৈশ্য; আর হাতে-পায়ে খাটা মজুরীর কাজ যারা নিল, তার হল শূদ্র। যে কাজ যার পছন্দ, তার সে কাজ করতে কোনও বিধি নিষেধ বা আইনের কড়াকড় ছিল না। এমনি ধারা শ্রমবিভাগ কি সব জায়গাতেই ছিল না? আজ আমেরিকায় নাই? আমেরিকাতেও মানুষের শ্রেণীবিভাগ আছে; ইংলণ্ডেও আছে; জগতের সর্ব্বত্রই আছে। আমেরিকাতে জাতিভেদ নাই কি? এদেশে সমাজের শিরোমণি আর সর্ব্বসাধারণ বলে একটা গণ্ডী কি নাই? সব জায়গাতেই এ তফাৎটুকু আছে, থাকা স্বাভাবিক। তাহলে ভারতবর্ষের জাতিভেদের অপরাধ কি?

ওদেশে হিন্দুর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একখানা বই আছে—নাম মনুসংহিতা। আগেকার যুগে বইখানাতে সবার উপকার হত। প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাতে নানা রকম উপদেশ, ইঙ্গিত, বিধি-বিধান ইত্যাদি দেওয়া ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে যেভাবে চলা আবশ্যক ও সুবিধাজনক, কিম্বা ক্ষত্রিয়ের যা করা উচিত, সে সম্বন্ধে ওতে বিস্তৃত আলোচনা ছিল; কাজেই বইখানা তখনকার যুগে সবারই কাজে লাগ্‌ত। ক্রমে ক্রমে বইখানার ব্যাখ্যাপদ্ধতিতে নানা গলদ ঢুকতে সুরু হল। যেমন করেই হোক, কালক্রমে সব ওলট পালট হয়ে গেল, সব বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। এই যে কর্ম্মবিভাগমূলে জাতিভেদপ্রথা ছিল, এটা অনুদার, প্রাণহীন, নিরেট, পাথুরে হয়ে উঠ্‌ল। মানুষ এটাকে একেবারে অনড়-অচল করে

তুলল; আর তাতেই জাতির প্রাণ স্তিমিত হয়ে পড়্‌ল। সব হল তখন কৃত্রিম, যন্ত্রের সামিল। মনু-স্মৃতি তখন আর সমাজ-সেবক না হয়ে হল সমাজের ওপর জুলুমবাজ স্বেচ্ছাচারের পাণ্ডা!

তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটা করে থাক্ আছে—শিক্ষানবীশ (Freshman), প্রবর্ত্ত (Sophomore), অবর (Junior) আর প্রবর (Senior)! থাক্‌গুলো বেশ; কিন্তু অধ্যাপকদের এমন মতলব নয় যে থাক্‌গুলো যেমন আছে তেমনি থাকবে, নীচের থাকের ছেলেরা কখনো উন্নতি করবে না, ওপরের থাকে উঠ্‌বে না। দ্বিতীয় বার্ষিকের ছেলেরা কি তৃতীয় বার্ষিকে উঠবে না? তৃতীয় বার্ষিকেরা কি চতুর্থ বার্ষিকে প্রমোশান পাবে না? থাক্ থাকা খুবই ভাল, তাতে ভুল নাই; কিন্তু ভারতবর্ষে ভীষণ মারাত্মক ভুল হয়ে গেল এই যে এই থাকগুলি শেষকালে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে এঁটে গেল—এক একটা থাক একেবারে চিরতরে দানা বেঁধে গেল। এমনি করে বর্ত্তমান জাতিভেদের উৎপত্তি; আর তাই হল গিয়ে ভারতের অবনতির কারণ, তার মাথার 'পরে অভিশাপের প্রচণ্ড বজ্র!

মনুস্মৃতির নিয়মগুলি ছিল পরিবর্ত্তনসই; আর আর সে শুধু তখনকার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা, যুগের প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্কেত মাত্র। তাই কিনা শেষে শ্রুতির আসন ও মর্য্যাদা বেদখল করে একচেটে করে নিল! উপনিষদ্ বা বেদান্তে যে সত্য প্রচারিত হয়েছে, তা অবিনাশী, তাই শ্রুতি; স্মৃতি তার কাছে কি? লোকে একথা ভুলে গেল যে আইন-কানুন মানুষের জন্য; তারা ধরল, মানুষই আইন-কানুনের জন্য। মৃত অতীতের হুমকীটাই হয়ে উঠল বড়; অন্তর্য্যামী আত্মদেবের নির্দ্দেশের চেয়ে তার শাসনটাই মান্য হল। মানুষ তখন হল শুধু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রক্তমাংসের পিণ্ড মাত্র! অনন্ত সত্তাস্বরূপ আত্মার কথা একেবারেই চাপা পড়ে গেল। জাতিবিধানের ভয় আর দেশাচারের কুশ্রী বিভীষিকা মানুষের চোখকে ধাঁধিয়ে দিল, তাকে বুঝতে দিল না যে সে অপরাপর জাতির সঙ্গে এক। সব সময় ব্রাহ্মণত্ব আর ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানটাকেই অতিমাত্রায় জাঁকিয়ে তুলে হৃদয়ে মনুষ্যত্ববোধ উদ্বোধনের পথ রুদ্ধ করা হল।

(ক্রমশঃ)



শক্তির রূপ ও লীলা

—:*:—

মুক্তি-পিপাসায় যে প্রাকৃত মায়াকে অহরহঃ গাল দিচ্ছ, তারও একটা বিপরীত দিক আছে। এখানকার সবই সেখানে আছে, কিন্তু তাৎপর্য্য বিপরীত, আনন্দ অনুপম। ধর, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, কাজেই নির্লিপ্ত. তিনি কাউকেই চান না; অথচ তিনি গোপীদের "অরীরমৎ"—রমণ করালেন। স্বয়ং লীলার প্রয়োজক হয়ে আত্মানন্দের কোটীগুণ আনন্দ তাদের ভোগ করালেন। "আমি ভোগ করব", এই ক্ষুদ্র বাসনা যদি শ্রীকৃষ্ণের মাঝে থাকৃত, তাহলে তিনি রাসমণ্ডলে স্বয়ং বহু হয়ে বহু গোপীকে যুগপৎ তৃপ্ত করতে পারতেন না—সবাই তাঁকে পূর্ণরূপে পেত না। অবশ্য এমন কথা বল্‌তে চাই না, শ্রীকৃষ্ণে বাসনা ছিল না। আদিতে ছিল না, কিন্তু গোপীর প্রেমবশ্যতায় তাঁর মাঝেও শুদ্ধ বাসনার আবির্ভাব হল, তাই সমস্ত গোপী হতে রাধিকাকে তিনি বিবিক্ত করে নিলেন। এখানে প্রেমই হল লীলার প্রয়োজক। কিন্তু কিন্তু সে নিগূঢ় রস বুঝবার আগে, পুরুষের এই বৈরাগ্যানুবিদ্ধ প্রেমের লীলাটী বুঝ্‌তে হবে। সেই কথাই বল্‌ছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্র ভোগ-বাসনায় পীড়িত নন। আবার গোপীরও স্বভাব দেখ, সে ও শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করতে চায় না, চায় ভোগ করাতে। কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী, তাই "কৃষ্ণ হতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়।" গোপী তাই নিগুর্ণা। এই তো মজা, কারু ভোগ করবার বাসনা নাই, অথচ মহা ভোগোল্লাসের লীলা চল্‌ছে রাসমঞ্চে। এই হচ্ছে যোগমায়ার খেলা।

এ খেলা প্রাকৃত মায়ার খেলার বিপরীত। অথচ এ মায়ারই খেলা। ভোগ-বাসনা কোনও পক্ষে নাই, অথচ ভোগ হচ্ছে, উভয়ে উভয়কে ভোগ করাতে চায়। কিছুই নাই মূলে, অথচ ভোগ হচ্ছে—এ মায়া নয় কি? বাজীকর যেমন শূন্যে শূন্যে আমগাছ সৃষ্টি করে তাতে আম ফলায়, এ-ও তেমনি নয় কি? তাই বলি, এ-ও মায়া; কিন্তু যোগমায়া অর্থাৎ গুণাতীতা মায়া। এই প্রেম প্রাকৃত জগতে নেমে এসেছে খণ্ডিত হয়ে, তাই দেহ, এই গণ্ডীর বাইরে যাবার সাধ্য কারু নাই। আর এই সঙ্কুচিত অধিকারের মাঝে পুরুষ চায় স্ত্রীকে ভোগ করতে, স্ত্রীও চায় পুরুষকে ভোগ করতে। এই হচ্ছে অবিদ্যার খেলা, প্রাকৃত জগতের কামলীলা—অপ্রাকৃত লীলার বিপর্য্যস্ত রূপ। গুণবদ্ধ দুজনাই, কেউ সে বাঁধন কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। এই হচ্ছে জীবভাব।

কিন্তু এই নর নারীর মাঝেই আবার অপ্রাকৃত জগতের লীলা ফুটে ওঠে—উভয়ে যখন নিষ্কাম হয়। স্বামী ভাবে, কি করে সে স্ত্রীকে সুখী করবে, স্বসুখবাঞ্ছা তার থাকে না; আর স্ত্রী ভাবে, কি করে সেই বা স্বামীকে সুখী করবে, তারও ভোগের পিপাসা থাকে না। এই তো প্রেম; দেহ-সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ কিছুই নাই, অথচ আছে এক মহানন্দময় পরিপূর্ণতা। এই ভাবের ভাবনায় মনের আগুন নিভে যায়, বুক জুড়িয়ে যায়। মৃণ্ময় দেহ চিন্ময় দেহে রূপান্তরিত হয়, মনের সমস্ত বৃত্তি গুটিয়ে এসে এক অবিরাম ভাবপ্রবাহে পর্য্যবসিত হয়। এই তো প্রেমের সমাধি।

এই প্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত প্রেম-সমাধি হতে সৃষ্টিলীলা বোঝা যায়। পুরুষ যদি যথার্থ পুরুষ হয়, তাহলে প্রাকৃত কারণ বশতঃই তার মাঝে কামপ্রবৃত্তি কম থাকা উচিত। অবশ্য খাঁটী পুরুষ দেখি খুব কম;

সচরাচর যে পুরুষ দেখি, সব প্রকৃতিতে অধ্যস্ত, প্রকৃতির ভাবধারা অনুপ্রাণিত। পুরুষ স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌লে যা হত, ভয়াবহ পরধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠিক তার বিপরীত হয়েছে। আবার স্বভাবে নারী স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা: তাই তার বিকারটুকুও স্বাভাবিক ও সুন্দর, কেননা ও তার স্বধর্ম্ম। এই কথাটা ভুলে গেলে চল্‌বে না।

কিন্তু সৃষ্টি বুঝ্‌তে গেলে সৃষ্টির গোড়ায় যেতে হবে। এখান হতে সৃষ্টির গোড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখ্‌ব প্রকৃতি স্বধর্ম্মানুসারিণী; সুতরাং তার মাঝে কোথায়ও অসুন্দরের বা নিরানন্দের ছায়াপাত দেখ্‌ব না। আসল পুরুষের পরিচয় পাব, ওই সৃষ্টির গোড়া পার হয়ে। সেই আসল পুরুষের বিদ্যুদ্দীপ্তি এই নকল পুরুষেও এসে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতির আবরণে সেটা চাপা পড়ে আছে। সাধনা দ্বারা পুরুষকে তা জাগিয়ে নিতে হয়। নারীকে সাধনা করতে হয় না; সে অসাধনেই পূর্ণ। তার শুধু প্রয়োজন আশ্রয়। এদেশে এই সমস্ত চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই নারীপুরুষের সাধন-পন্থা নিরূপণের প্রচেষ্টা হয়েছিল। যাক্ সে কথা।

বল্‌ছি, পুরুষের স্বধর্ম্মের কথা। তাই বলছিলাম, পুরুষ যদি শুদ্ধচিত্ত, সংযমী, ব্রহ্মচারী হয়, তাহলে তার স্বধর্ম্মের তরফ থেকে সে এমন কোনও প্রেরণা পাবে না, যাতে তার সৃষ্টিবাসনা জন্মাতে পারে। অবশ্য নারীর কাছে থাক্‌লেই যে পুরুষের কাম জাগে, সে কাম-রোগী, স্বভাব ভ্রষ্ট; তার কথা বল্‌ছি না। বল্‌ছি, আকুমার ব্রহ্মচারী সংযমী স্বামীর কথা, যথার্থ পৌরুষের পরিচয় যে পেয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে থেকে স্ত্রী-সংস্পর্শ বশতঃ তার ভিতর যা জাগে, তা বিশুদ্ধ নির্ম্মল আনন্দ, রিপুর উত্তেজনা নয়, দেহের আসক্তি নয়। এই অমৃতময় শুদ্ধ সত্যের আস্বাদন সকল স্ত্রী পুরুষই পায়, কিন্তু কৌশল না জানায় আত্মজ্ঞান না থাকায় এ ভাবকে স্থায়ী করতে পারে না। যথার্থ পুরুষের কামে কোনও প্রয়োজন নাই, প্রেম মাত্র তার প্রয়োজন। এই জন্যই বলেছিলাম, সৃষ্টি করবার বাসনা পুরুষের স্বভাবের অনুকূল নয়। পুরুষ নিঃসঙ্গ হতে পারলে আর কিছু চায় না।

কিন্তু নারীর মাঝে আছে সৃষ্টির বাসনা—তা প্রকৃতিরই দান। প্রাকৃত প্রেরণাবশতঃই নারীতে সন্তানকামনা জাগে, দেহধর্ম্মে তা প্রকাশ পায়। এই দেহধর্ম্মের অনুরূপ কোনও ব্যাপার পুরুষে নাই। পুরুষ স্বভাবতঃই সৃষ্টিব্যাপারে উদাসীন; প্রকৃতির প্রণয়-আরতি ভিন্ন তার মাঝে কাম বা সৃষ্টিবাসনা জাগে না। ইতর-জগতে দেখ্‌বে, এই বিধান সব জায়গায় চল্‌ছে। মানুষের মাঝেই দেখি, প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী-শক্তির বিকাশ। মানুষ যেমন সবার সেরা হতে পারে, তেমনি সবার অধমও হতে পারে। তবে জৈব ব্যাপারে সমগ্র জীব-জগতের আদর্শানুযায়ীই বিচার হওয়া উচিত। সৃষ্টিব্যাপারকে তাই সেই হিসাবেই দেখছি।

এখন শুদ্ধচিত্ত পুরুষ আর শুদ্ধচিত্তা নারীকে জীব হিসাবে বিচার করে দেখ। স্বভাবতঃই দেখবে, পুরুষ সৃষ্টিবিমুখ, কাম তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; তাই প্রকৃতি তার দেহেও কামবিকারের উপযোগী অতিরিক্ত কোনও শারীর ধর্ম্মের সন্নিবেশ করেন নি; কিন্তু নারীতে তা করেছেন, শুদ্ধচিত্তা প্রেমময়ী নারীতেও।

তাই মাতৃভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পুরুষের সঙ্গ প্রার্থনা করা নারীর পক্ষে অতি স্বাভাবিক, অতি সুন্দর। সৃষ্টিবাসনা নারীর মাঝে স্বাভাবিক, নারী তাই প্রার্থিনী। মনে থাকে যেন, এটা প্রাকৃত বিকারের দিক আলোচনা করছি; গীতায় যে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামের কথা বলা হয়েছে, এ তারই প্রকাশ। আর একটা অপ্রাকৃত-বিকারের দিক আছে, নারী সেখানে গুণাতীতা, পুরুষ স্বরূপে থেকেও গুণময়; তাই বৃন্দাবন লীলা। সে কথা এখানে নয়।

কিন্তু অটল পুরুষকে না টলালে নারীর সৃষ্টি-বাসনা

সিদ্ধ হবে না। নারীর প্রেমে, তার বশ্যতায় মুগ্ধ হয়ে পুরুষ যখন তার সৃষ্টি-বাসনা চরিতার্থ করতে আনুকূল্য করেন, তখন শুদ্ধচিত্ত পুরুষ তা কোনও তাড়নায় করেন না নিশ্চয়। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্রে গর্ভাধান একটা ধর্ম্মসংস্কার। এমন কি পুরুষের পক্ষে স্ত্রী ঋতুরক্ষা না করা শাস্ত্রে পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। এই পাপের বিভীষিকা সংযমীকে সৃষ্টিব্যাপারে লিপ্ত করার জন্যই। নতুবা পুরুষ যদি কামসন্তপ্ত হয়ে নারীতে আসক্ত থাকে, শাস্ত্রকার আবার তাকে একটা পাপের দিব্য দিয়ে হাস্যাস্পদ হতে যাবেন কেন? এই শাস্ত্রীয়-বিধানের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝ্‌তে পেরে মাঝে মাঝে ভট্টপল্লী কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে শুনি! ইন্দ্রিয়াতুর দেশ এই বেলা বুঝি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখ্‌তে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসে, আর পণ্ডিতেরা শ্লোক আওড়িয়ে তার পোষকতা করে। কই, অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় তো এমন উৎসাহ দেখা যায় না?

পুরুষ যখন **বিরক্ত** থেকে নারীর সৃষ্টি-বাসনা চরিতার্থ করেন, তখন নির্লেপের এই প্রেম-বশ্যতায় প্রকৃতি আপনাকে চিরানুগৃহীতা মনে করেন। এই জন্যই দেখ্‌বে, সংযমী পুরুষেরাই নারীকে বশে রাখ্‌তে পারে, অথচ তাদের যথার্থ তৃপ্তও করতে পারে।

এই প্রাকৃত ব্যাপারের সঙ্গে জীবন্মুক্তের আচরণের তুলনা কর। জীবন্মুক্ত যে প্রকৃতির বন্ধন স্বীকার করেন, তা এমনি বিরক্ত থেকে। সৃষ্টিতে তাঁর আত্যন্তিক কোনও প্রয়োজন নাই; কিন্তু প্রকৃতির প্রেমে তিনি মুগ্ধ, তাই অধিষ্ঠাতা হয়ে তার সৃষ্টি-বাসনাকে তৃপ্ত করছেন মাত্র। তিনি প্রেমের অধীন হয়ে গুণকে কৃপা করেন।

এই হতে বুঝ্‌তে পারি, যথার্থ প্রেমিক-দম্পতী তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করে আপনাকে শিব-শক্তির ভাবে ভাবিত করে জীবন্মুক্তির অধিকারী হতে পারেন। আর এই হতে আরও বুঝি, নির্লিপ্ত গৃহস্থ আর লিপ্ত সন্ন্যাসী একই কথা।

এই ভাব জীবনের চরম লক্ষ্য। এইখানে পৌঁছাবার জন্যই যত তপস্যা আর সংযম। জ্ঞান না হলে মুক্তি নাই। অতপস্বীর জ্ঞান হবে না। কাম-জগৎ হতে উদ্ধার পেতে হবে। প্রকৃতিকে ভোগ কর্‌ব, এ লোলুপতা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চঞ্চলা প্রকৃতির উপরই আমার নির্ভর। সে নির্ভরতায় যদি আত্মপ্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় তো তার চেয়ে মারাত্মক বন্ধন আর কিছুই নয়। তখন প্রকৃতিই তোমায় বাঁধবে, কিন্তু আড়ালে চোখের জলও মুছ্‌বে। সে তোমার কাছে হারতে চায়, জিৎতে চায় না। কিন্তু তুমি মনে কর, বুঝি তুমি হেরে গেলেই সে খুসী হবে!

অবশ্য প্রকৃতি সহায়েই সাধনা করতে হবে। প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে কেউ উঠ্‌তে পারে না। কিন্তু সাধনসহায়িকা প্রকৃতি প্রেমময়ী—গুণময়ী নয়। সে বন্ধন করে না—তার কাছে প্রলোভন কিছুই নাই। কিন্তু স্ত্রী মূর্ত্তি যে ভাবেই কল্পনা করি না কেন, হয়ত একটু না একটু বিকার আস্‌তে পারে, কারণ সৌন্দর্য্যের একটা মাদকতা আছে, যে মাদকতা ভাবাবস্থা লাভ না হলে জীর্ণ হয় না; ভূতনাথের নেশা সয়, কিন্তু ভূতের সয় না। তাই কালীসাধনার ব্যবস্থা। কালী আত্মশক্তি। এই শক্তিতে দানব দলন হচ্ছে, চারিদিকে শ্মশানের বিভীষিকা—প্রলোভনের আর কিছুই নাই, যার প্ররোচনায় কামজগতে ফিরে যেতে পারি। প্রাকৃত অধোগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন কালী। এই তো প্রবর্ত্ত-সাধকের আরাধিতা মহাশক্তি। এসো—এসো ভয়ঙ্করী! তোমার ওই বৈরাগ্যদীপ্তা প্রলয়ঙ্করী করালিনী মূর্ত্তিই চাই!

অধম অধিকারীর জন্য এই রূপ। আর উত্তম অধিকারীর জন্য তপস্বিনী উমার রূপ। যেখানে ভীষণ কিছুই নাই—আছে শুধু মাধুর্য্য আর তপস্যা।

দুই-ই এক। চিত্তবৃত্তির পরিণাম অনুযায়ী দুয়েরই সাধনা করা চলে এক যুক্তিতে।

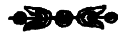
শক্তিকে পৃথক করে ভাববার প্রয়োজন নাই—সর্ব্বদাই শিবশক্তির একত্ব ভাবনা করবে। আত্ম-স্বরূপ ভাবনায় অভ্যস্ত হলেই শক্তিকে সেই সঙ্গে জড়িত বলে অনুভব করবে। তাই হচ্ছে পূর্ণতার সাধনা। শিব-শক্তির অবিচ্ছেদ ভাবের সাধনা ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনা।

ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনার মূল। অবিক্ষিপ্ত থাকবে। অবিক্ষেপ শক্তিরূপে তাকে ধারণা করবে। ধারণা মানেই এক হয়ে যাও। সর্ব্বদাই ঐক্য ও সাম্যের ভাবনা করবে।

গুণাতীতা শক্তি কেমন?—শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা। কিন্তু তবুও জানবে, সে শক্তি জগতের সার, জগজ্জ-সনাকে রোধ করবার বা লীলাকমলে ফুটিয়ে তোলবার প্রচণ্ড শক্তি। তিনি সাবিত্রী, গায়ত্রী—ব্রহ্মচারীর চির উপাস্যা। তাই বেদ বলছেন, তিনিও চিরব্রহ্মচারিণী। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর মাঝে এই ব্রহ্মচারিণীর প্রতিষ্ঠা আছে, তাই ব্রহ্মতেজ, তাই তপঃশক্তি।

পৌরুষের প্রতিষ্ঠায় এই শক্তি জীর্ণ হলেই যে শুদ্ধসত্ত্বময় বিকারের আবির্ভাব হয়, তাই লীলা-রস, তাই যোগমায়ার বিভূতি, তাই চরম পুরুষার্থ!

বিবেকখ্যাতি



"প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাচ্ছে"—এই বলে নির্ব্বিকার থাকা সহজ কথা নয়। যাদের বিবেক-খ্যাতি না হয়েছে তাদের পক্ষে অনেক আশঙ্কা রয়েছে। আর অজ্ঞানী মোহান্ধ জীব এ কথা মুখে বললেও অন্তর তাদের অনুশোচনায় জ্বলতে থাকে। কাজেই একবার যারা নেতিমূলক সাধনার অর্থাৎ আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, কাম নই, ক্রোধ নই—চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্—এ অনুভব না পেয়েছে, তাদের পক্ষে প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ অনেক দুর্ভোগের কারণ। কেননা শেষ পর্য্যন্ত তারা অচল-অটল থাকতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের বিকারে তাদের আত্মাও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

প্রকৃতিকে যে পর্য্যন্ত নিজের সহায়ক বলে না বুঝ্‌ব—সে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই তো চল্‌বেই। যতদিন পর্য্যন্ত দেখ্‌ব প্রকৃতি আমার ক্ষতি করছে ততদিন পর্য্যন্ত তাকে বাধা দেবই। তারপর আমি যখন দ্রষ্টার আসনে বসে যেতে পারব এবং প্রকৃতিও অনুকূল পথেই চল্‌বে—তখন তো আর কারো সঙ্গে আমার বিরোধ নাই। তখন আমি কাউকে বাধাও দিতে যাব না, আর কারও পক্ষে বাধাস্বরূপও হব না।

আত্মানুভব না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানীর কথার লোভে পড়ে নিজকে ঘুলিয়ে ফেল্‌লে নিজেরই ক্ষতি। সাধকের পক্ষে সাংখ্যের বিবিক্ত সাধনা খুবই প্রয়ো-জনীয়। বিবিক্ত সাধনায় সিদ্ধ না হলে—প্রকৃতির

কাজ প্রকৃতি করে যাচ্ছে এ কথা বলায় ভাবের ঘরে চুরি করা হয়। বিকার আমাকে সম্পূর্ণ স্পর্শ কর্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—তবুও যদি বলি আমি নির্ব্বিকার, তাহলে এ কথার প্রলেপে নিজের অন্তরের মালিন্যকে বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না! আর অভিনয় মানুষ কয়দিনই বা কর্‌তে পারে? দু'দিন পরেই আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়।

সাংখ্যের আর সব বিশেষত্ব ছেড়ে দিলেও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, কি করে যে আত্ম-গৌরব অটুট থাকে, এর একটা সাধনার ধারা পাই। সাংখ্য আমাদের ভিতর বিজয় লাভের বল এনে দিয়েছে। যার সহায়ে সিদ্ধি লাভ, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব না? সমস্ত জড়ত্বকে দূরীভূত করে আমাদের ভিতর পৌরুষ জাগিয়েছে এই সাংখ্য। না বুঝে co-operation করার চেয়ে non coperation করাই শ্রেয়ঃ। তারপর সাংখ্য বিবিক্ত সাধনায় অনুরক্ত হয়েছে—কিসের দরুণ? সবার তত্ত্ব জান্‌বে বলে। কাজেই জগতের সবার সঙ্গেই তো তার আত্মীয়তা রয়েছে। বিচার করে দেখ্‌লে তো সাংখ্যবাদীর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারি না।

গতানুগতিক ধারণায় সবাই সিদ্ধ—প্রকৃতির ওপর হাত নাই—এ তো সবাই বলে আস্‌ছে! কিন্তু সাংখ্য এসে বল্‌লেন—কি, প্রকৃতির ওপর আমার হাত নাই—দেখি প্রকৃতি আমার কি করে? তারপর প্রকৃতি এসে বিচিত্র প্রলোভন দিয়েও যখন পুরুষকে ভুলাতে পার্‌লে না তখন লজ্জাবনতমুখী হয়ে আপনি পুরুষের কাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌লে। এতদিন আমরা জান্‌তাম প্রকৃতিই সব—কিন্তু সাংখ্যের কাছ থেকে প্রথমে আমরা এই নূতন কথা পেলেম যে প্রকৃতির ওপরও পুরুষ আছেন। প্রকৃতি চল্‌ছে তারই ইঙ্গিতে—তারই আজ্ঞায়! পশু-পাখী ইতর প্রাণীর ভিতর আত্মবোধ জাগেনি কিম্বা জেগে থাক্‌লেও খুব অস্পষ্ট, তাই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণেই তাদের গতি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ কোন একটার ওপরও তাদের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু মানুষ এমন কি দুরন্ত ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় মনকেও আত্মবলে বশীভূত কর্‌তে পেরেছে।

"প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাচ্ছে" এ বল্‌লে সাধারণতঃ এই বুঝায়—প্রকৃতি যেন স্বাধীন। তার ওপর কোন জোর খাটে না। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে এর উল্টো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃতি তখন জ্ঞানীর কাছে বশীভূত।

মন চঞ্চল বটে, তাকে বশীভূত করা বায়োরিব সুদুষ্করম্—কিন্তু এর পরের শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

মন যে চঞ্চল ও দুর্দ্দমনীয় তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই—কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাতে নিগৃহীত করা যায়। কাজেই "প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাচ্ছে" বলেই আমাদের নিষ্কৃতি নাই। প্রকৃতির তত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত প্রকৃতির ভাল-মন্দে আমাকেও জবাবদিহী হতে হবে। আর যখন শুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়ে যাব আমি এবং জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখ্‌তে পাব—প্রকৃতিশ্চ বধ্যতে, প্রকৃতিশ্চ মুচ্যতে; তখন আর কিসের ভয়, কিসের বন্ধন! কিন্তু এ অনুভব সাধনা ব্যতিরেকে আয়ত্ত হবার নয়।

প্রকৃতিং যান্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—প্রাণীগণই যখন প্রকৃতির বশীভূত তখন আর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করবে! কিন্তু এর পরের শ্লোকেই আবার বল্‌ছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল-প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে—এ উভয়েরই বশীভূত হলে চল্‌বে না, বরঞ্চ তাদের প্রতিপক্ষই হতে হবে। কেননা রাগ-দ্বেষ মুমুক্ষুর পরিপন্থী। গীতা থেকে

এমন অনেক শ্লোক উদ্ধার করা যায়। এ সব শ্লোক দ্বারা এই বুঝায় প্রকৃতিকে বশীভূত করা দুরূহ বটে—কিন্তু তাই চরম কথা নয়, আত্মবলে মানুষ সবই সাধন করতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের প্রবৃত্তি-অভিমুখীই মন ধাবিত—কিন্তু নিবৃত্তির আকর্ষণ তার চেয়েও প্রবল। তারপর দু'দিনেই তো সিদ্ধিলাভ হয় না।

একটুখানি অপচয়ে, একটুখানি ক্ষতিতে আত্মা এখনও আতঙ্কে কেঁপে উঠেন—কাজেই সিদ্ধের ভান কেন? যখন তুমি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার অনুদ্বিগ্ন অবস্থায় থাকতে পারবে, তখনই তোমার দ্রষ্টৃত্ব ফুটবে, তখনই তুমি নিগুর্ণ হবে। সাংখ্যও বলছেন—গুণাতীত মানেই নিবৃত্তগুণাভিমানঃ। "প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাচ্ছে"—এ উক্তি যার গুণাভিমান নিরসন হয় নি, তার পক্ষে বলা সাজে না।

সাংখ্যকার বলছেন, "অবিপ্লবা বিবেকই হানোপায়।" তাহলেই দেখতে পাচ্ছি, বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন। নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা—কাজেই একদিনকার হঠাৎ বিবেকখ্যাতিতে কিছু হবে না। বারবার অভ্যাস করতে হবে। তারপর বিবেকখ্যাতির পরিপাক হয়ে গেলে তখন আর ভয় নাই। বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠার লক্ষণ গীতাতেও আছে।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

গুণ দ্বারা যিনি বিচলিত হন না, তার পক্ষে "প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাচ্ছে" বললেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। কেননা তার বিবেকখ্যাতিতে নিষ্ঠা জন্মে গিয়েছে—আর কিছুতেই তার ভ্রমে পতিত হবার কারণ নাই। নিজকে সে পেয়েছে—তার আত্মদর্শন হয়ে গিয়েছে!

বিবেকখ্যাতি-নিষ্ঠা—বড় সুন্দর এবং কঠিন কথা। বিবেক হওয়াই সহজ নয়—তারপর আবার বিবেকেরও নিষ্ঠা চাই। সাধনার নৈরন্তর্য্য যে কত প্রয়োজন, এখানেই তা বুঝি।

ঘটী রোজ মাজতে হয়, তা না হলে তাতে কিছু না কিছু ময়লা লাগেই—তেমনি আত্মার ওপরও অনেক আবরণ পড়ে যায়—সাধনা দ্বারাই তাদের উন্মোচন হয়।

যেখানে নিজেই প্রকৃতির কবলিত, সেখানে আর প্রকৃতির লীলা দেখব কি! কাজেই প্রকৃতির উর্দ্ধে—অর্থাৎ পুরুষতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেখানে আমার কেউ নাগাল পায় না, সেখান থেকে লীলা দর্শনে যে কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হয়, তা আর কি বলব?



কাজের ফাঁকে

—*‡0‡*—

সংশয় হয়—সংকল্প করিব কি না করিব? কাজকে তাঁর কাজ বলিয়া ভালবাসিয়া বুকে তুলিয়া লইব—না দূরে দাঁড়াইয়া অনাত্মীয়ের মত গা বাঁচাইয়া শুধু বিচার করিব? ভাল-মন্দ যাহা কিছুই হইতেছে, সবই তাঁর ইচ্ছায় হইতেছে বলিয়া গ্রহণ করা কি এতই সহজ? কে বলিবে, সংকল্প করিতে গিয়া অলক্ষ্যে আত্মস্বার্থ পূরণের ব্যবস্থাটাই সযত্নে করিয়া রাখি নাই? সত্যি বটে – বড় বিষম সমস্যা—সংকল্প করিব কি না করিব?—নির্ব্বিচারে আদেশ মানিব, না কি দরদ বুঝিবার চেষ্টাটাও এক-আধটু করিব?

ভক্ত মনে বলে—মনের অন্দরে ঢুকিয়া শান্তভাবে একবার শুধাইয়া দেখ, তিনি কি বলেন!

তিনি তো বলেন অনেক কথাই, সব সময় গ্রাহ্য করিতে পারি কই! মনে হয়, আদেশ পালন করিতে চাওয়াটা একটা ভিত্তিহীন স্পর্দ্ধা মাত্র; আর দরদ্ বুঝিয়া কাজ করিব? সর্ব্বনাশ!—স পাপিষ্ঠস্ততো ধিকঃ! গালই দিয়া ফেলিলাম—কেননা তাকে বুঝি না যে!—যাহা বোঝা গেল না, তাকে গালি দেওয়া রেওয়াজ। সুতরাং প্রকৃতির স্রোতেই ভাসিয়া চলিয়াছি। কখনো বলি—"প্রভু, তুমি যা করাও তাই করি"; আবার কখনো আপন খেয়ালে তিলকে তাল করিতে গিয়া যেন 'স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি!' কর্ম্ম-সংসারের এ সমস্যার সকলদিক তলায় কয়টী মাথায়?

তিনি নাকি হৃদয় মাঝে প্রকাশ পান। কি করিবে না করিবে, হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া সকলি তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

অতি পুরাতন কথা। সুতরাং বুঝি না বুঝি, আওড়াইতে বাধা কি! বিশেষতঃ শাস্ত্রের দোহাইর আড়ালে নিজের অনেকখানি যুক্তি-দৌর্ব্বল্যের আশ্রয় আছে; যখন আর সাম্‌লাইতে পারি না তখন বলি, শাস্ত্রে আছে! সব সময়েই হৃদয় আর শাস্ত্র যুগপৎ ধ্বনিত হইয়া উঠে? প্রেরণা কি সবাই পায়? তুমি-আমি পর্য্যন্ত?

যা খুসী তা যদি মানুষ করতে পারিত, তবে সত্যই সে সুখী হইত কি না বলিতে পারি না অন্তত আশা তো সেইরূপই করি। তবে কথা হইতেছে এই যে, মীমাংসা বস্তুটা সৃষ্টিছাড়া একটা কিছু নয়।—সমস্যার সঙ্গে তাহার প্রকৃতিগত সাম্য একটা আছে। 'বিবেক' নামে একটা অদ্ভুত জিনিষ মানুষের মাঝে আছে, যাহা সব সময় মানুষকে চালাইতে পারুক না পারুক, ভাল কি মন্দ তা অকপটে মানুষকে চিনাইয়া দেয়। একেবারে চোক-কান বুজিয়া যা খুসী তা মানুষ করে না—করিতে বোধ হয় পারেও না। সুতরাং ঐ যা খুসীর মাঝেও "কিন্তু" আছে। যত নষ্টের গোড়া ঐ "কিন্তু" বুদ্ধি! ধন্য সুখের কাঁটা!

হঠাৎ হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া এই কিন্তুরও মাথা ঘোলাইয়া দেয়—মানুষ নিঃসংশয়ে কাজে নামিয়া পড়ে। আবেগে-উচ্ছ্বাসে অজ্ঞান হইয়াই যে সে তখন কাজ করে, ঠিক তাই কি মনে হয়? যখন দেখা যায়—অবস্থার উপর আত্মা বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে—তখন কি বলিতে পারি না আমি তাঁর ইচ্ছায় কাজে নামিয়াছিলাম? যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ—যদি কোন মতেই হার না মানি, হৃদয়ের আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত আলো করিয়া যদি তাঁহার শান্ত মধুর ইঙ্গিতের অস্তিত্ব পাই—কেন জয়ী হইব

না ?—কেন বলিব না যে, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে ?

যেখানেই সংশয়, সেখানেই দুর্ব্বলতা ; যেখানে দুর্ব্বলতা সেখানেই পাপ। তুমি পরাজিত—তুমি সংশয়াত্মা—তোমার হৃদয়ে এক আর বাহিরে এক—অভিমানে বুক ফুলাইয়া গায়ের জোরে জগতে নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যাইতেছ অথচ একটী অন্তর তোমার কাঁদিতেছে—তোমার এতটুকু হৃদয়রাজ্যের মাঝে যখন অরাজকতার চূড়ান্ত—তখন কি তুমিই স্বীকার করিবে—প্রভুই তোমাকে চালাইয়া লইতেছেন ?—তুমি যতক্ষণ তোমার যা কিছুকে প্রভাবিত করিতে পার পার নাই, যতক্ষণ তোমার রাজ্য তোমার হাতে আসে নাই, ততক্ষণ "কুতো ধর্ম্মঃ কুতো জয়ঃ ?" প্রেরণা কি মুখের কথা ? সে কি কারো খুসীতে আসে-যায় ! সব চেয়ে চরম কথা জানি—ঐ চিরকালের সনাতন কথা—আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না, খড়কুটাটুকুও নড়ে না ! উপনিষদের উপাখ্যানেও ইহার হুবহু প্রমাণ আছে।

তবু তো ইচ্ছাশক্তির সাধনা জগতে আছে। মানুষ বৈজ্ঞানিক অহঙ্কারকে কোনদিনই নিশ্চেষ্ট করিতে পারিল না। অনেক রকম মিষ্টিক্ যুক্তি-তর্কে পোরা সওয়াল-জবাব মানুষ আর মানুষের অন্তরে চলিতে থাকে। জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসা—জীবনটাই জিজ্ঞাসা ! কেবল ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ !

কিন্তু ইহাই তো চরম নয়—এও জানি। কাজের সংসারেও দেখিতে পাই, কোন অবস্থাই চরম নয় ; স্তরের পর স্তর আসিতেছে—কোথাও সাঁৎরাইয়া কোথাও ভাসিয়া চলিয়াছি, যেন সংসা চমক্ ভাঙ্গিল ! তাই বলি—আমার ইচ্ছার সীমা কতদূর ? জীবনটাকে সংকল্প দিয়া বাঁধিয়া রুটিন্ ধরাইয়া চালাইব, না অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দিব ? সেই অদৃষ্টটা কিম্ভূত বস্তু ? সে কি আমার খামখেয়ালী জীবনের পক্ষে উপদ্রববিশেষ নয় ?

যতক্ষণ জ্ঞানবিচার আছে, ততক্ষণ জোর করিয়া নিজকে ছাড়িয়া দিতে নাই। কেহ যদি জোর দেখাইয়া দখল করিতে আসে, তাহার সহিত লড়াই করিতে হইবে। স্বেচ্ছায় সূচাগ্র দখল ছাড়িব না—অর্থাৎ কোনমতেই শিথিলতাকে প্রশ্রয় দিব না !

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধান মানে কেবল কথা দিয়া কথা ঠেকানো। আমার মন কথায় কথাময় ; মনের মাঝেও ঐ ব্যাপার চলে, সুযুক্তির ঠেক্‌না না হইলে সে দাঁড়াইতে পারে না। যতক্ষণ সমস্যা সম্বন্ধে তোমার আত্ম-কেরামতীর যাচাই শেষ হয় নাই, স্বচ্ছন্দে এবং রীতিমত লড়িতে থাক। ভয়ে বা ভাবনার রকমফেরে পড়িয়া ধনুর্বাণ ছাড়িয়া দিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিলে—"ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ"—যারা তোমার জয়া, তারা তোমাকে ভীতু ভাবিবে। জীবন সংগ্রামে ওরূপ অনাবশ্যক উদারতার কোন 'ভ্যালু' নাই।

কিন্তু চুপে চুপে একটী কথা বলিতে পারি কি ?—যাহার সৌভাগ্যে সাথের সাথী জুটিয়াছে, মনের মানুষকে যে পাইয়াছে, তাঁর প্রসাদ অপ্রসাদই তো তাহাকে পথের সন্ধান দিয়া দিবে। শুধু আমার সুখ তো সুখ নয়, তাঁর সুখেরও তোয়াক্কা তখন না রাখিয়া পারিব না যে ! হৃদয়ের যন্ত্রী যদি বাইরের মন্ত্রীরূপে ধরা দেন, অন্তরে-বাহিরের বিরোধ মিটাইয়া দেন, তবে আর চিন্তা কি, দ্বন্দ্ব কি ? সব চেয়ে সহজ এই—মনের মানুষ যাহা বলে তাহাই করা। তুমি তোমার বর্ত্তমানকেই দেখ, আর সে তোমার সব দেখে, সব জানে। যদি দ্বিধা না থাকে, তারই শরণ লও।

সংকল্প করা না করা আমার হাত নয়। প্রতিক্ষণেই অনুভব করি, কে যেন আমার জীবন তার ইচ্ছামত সাজাইয়া তুলিতেছে—কি মায়ায় জানি না আমার ইচ্ছাকে সে ভুলাইয়া লইয়াছে। ইচ্ছা করিতে গিয়া ফাঁপড়ে পড়ি—যেন সে আমার আচরণে ব্যথা পায়। কাজের মধ্যে দেখিতে পাই, মনের মানুষের

মন বুঝিবার চেষ্টা করা—এতে সংসারের যা থাকে, যা যায়।

সুতরাং তখন ঐ কথাই ভাল—ভাল মন্দ যা কিছুকেই ভালবাসিয়া বুকে তুলিয়া লইতে হইবে; কাজকে ভালবাসিতে হইবে। বিচারবিবেচনার জঞ্জাল পারতপক্ষে প্রশ্রয় দিব না। সংকল্প কর, রুটিন্ কর—খুবই ভাল কথা। তাঁর ইচ্ছায় করিও। অন্তর পানে তাকাইয়া থাকিও—তোমার আব্দার তাঁহাকে সহিতেছে কিনা। সুখে থাকিব কামনা করিলেই তিনি গা ঢাকা দিবেন।

কিন্তু এই চুপেচুপের কথাটা বাদ দিলেও আপোষ নিষ্পত্তি হইল এই যে, আচ্ছাসে লড়াই করিতে হইবে—আঘাত করিবার কেহ না থাকে, চিম্টার বাড়ি নিজেই নিজেকে লাগাইতে হইবে। জগতের সকলের সব সহ্য কর—কিন্তু নিজের আব্দার কোনমতেই রাখা চলিবে না।

কাহাকেও বিশ্বাস করিতে না পারিলে অগত্যা নিজের সংসার নিজকেই দেখিতে হইবে, এ তো সাফা কথা। সংকল্প বিকল্প জয়-পরাজয় সবই থাকিবে—অবস্থাকে জীর্ণ করিতে হইবে, তজ্জন্য লড়িতে হইবে। জিজ্ঞাসার চরম তোমার হৃদয়ের মাঝে—এই কথাটীকে বিশ্বাস করিতে না পার বেশ তো বাজাইয়াই লও! ভাগ্য তোমার বিচিত্র হইবে, কোথাও হাসিতে হইবে, কোথাও কাঁদিতে হইবে—কিন্তু পরকে কোথাও দায়ী করা চলিবে না। "অগ্নিপরীতম্ ইব" এ সংসার মধ্যে স্ববিত-আত্মদীপ্তির গৌরবে সর্ব্বদা উজ্জ্বল হইয়া অবস্থান করিতে হইবে—কারো সঙ্গে তুলনা করিলে চলিবে না। চলিতে পার তো এ পথ নিশ্চয়ই ভাল।

কর্ম্ম-পথে দুই ব্যবস্থাই থাকে। কোথাও ছাড়িয়া দিতে হয়, কোথাও ধরিতে হয়। যেখানে যা সাজে। কোথায় যে কি করিতে হইবে, এ জিজ্ঞাসা অনন্তকাল ধরিয়া চলিবেই চলিবে। তবে কিনা যে জাগিয়া আছে, যুদ্ধের ভয়ে যাহাকে বিকম্পিত করে নাই, তার জবাব হাতে হাতে। ছেঁদো নির্ভরেও কাজ হইবে না, উড়ো ভাবুকতাও মনের গায়ে লাগিবে না। অন্তর্নিহিত সংস্কারে সংস্কারে লড়াই হইতে হইতে সত্য এবং পূর্ণ স্ব-ভাবই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যাইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে নিত্য নূতন ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় নিরলসচিত্তে সেই হৃদয়বিহারী ইঙ্গিতকারীর মুখ চাহিয়া থাক কিন্তু বৃথা বসিয়া থাকিও না এক মুহূর্ত্ত। ঢিল দিলেই জগতের প্রতি অত্যাচার করা হইবে।

হাতে কাজ কর—মনে ভাব কর। খিচুড়ী না পাকাইলেই হইল। এত বড় হৃদয়-রাজ্যটার মাঝে "জিজ্ঞাসা" বেচারীর স্থান যেখানে আছে থাক্ না। মিটে তো আপনি মিটিবে।

কাজ কর, প্রাণপণে কাজ কর—কেবল মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে একটু একটু ভাবিয়া লও কার ইচ্ছায় জীবন চলিতেছে—তোমার না তাঁর? এই সতর্কতাটুকুই যথেষ্ট।



অভিমানী ছেলে

—*‡0‡*—

অচেতনের কাছ থেকে সাড়া পেতে অনেক সময় এবং অনেক আঘাত লাগে। মোট কথা সহজে তার চৈতন্য হয় না শুন্‌তে পাই; কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে নাকি কত হাতি-ঘোড়া, কিল-চড়, লাথি-গুঁতার প্রয়োজন হয়েছিল—তবু তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে চৈতন্য হতে হতে অনেক সময় লেগেছিল। কাজেই দেখ্‌তে পাই যে যত জড়, আলস্য-পরায়ণ, তন্দ্রায় বিভোর, তার পক্ষে বাহিরের আঘাতও ঠিক তদনুযায়ীই প্রয়োজন। কিন্তু হাজার হলেও মানুষ চেতন প্রাণী, তার পক্ষে বাহিরের আঘাত খুবই অপমানজনক।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মান-অভিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে—এতে অনেকে আশঙ্কা করে এই বুঝি বকাটে ছেলে গোল্লায় যাবার পথে চল্‌ল। কাজেই তার ওপর কড়া শাসন, কড়া নজর, কড়া বিধিনিষেধের আদেশ জারী করা হয়। আত্মাভিমানকে খর্ব্ব করে, আত্মাকে ছোট নজরে দেখে অভিভাবক ছেলেকে যতই ভাল কর্‌বার প্রচেষ্টায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন—ততই দেখি ছেলেকে নিয়ে সামাল দেওয়া দায় হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলের হিত কর্‌তে গিয়ে আমরা মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাই!

সেদিন আমাদের বাড়ীর পাশেই মোহিতলাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক—তাঁর একমাত্র ছেলে অধীরের উদ্ধত-ব্যবহার নিয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করে অনেক কথাই বলে গেলেন। প্রতিবাদ না করে কাণ পেতে শুনে যাওয়াটাই শান্ত শিষ্ট ছেলের লক্ষণ বলে, আর সেদিন তাঁর কথায় সায় দেওয়াটা সঙ্গত বলে বিবেচনা হওয়াতেই—আগাগোড়া তাঁর বক্তব্য শুনে গেলাম। বক্তব্যের মূল কথাই হল—"অধীর নাকি কথায় কথায় তর্ক করে, যুক্তি চায়, বেজায় অভিমানী, ইত্যাদি, মোট কথা সে শাসনকে মেনে নেবার আগে কৈফিয়ৎ চায়। জীবনের উন্নতির পক্ষে নাকি এই তার প্রধান কুলক্ষণ! এ দোষ কিছুতেই তার সংশোধন হ'ল না।"

চক্রবর্ত্তী মশাই চলে গেলে অনেকক্ষণ অবাক্ এবং স্তব্ধ হয়ে অনেক কথাই ভাব্‌লাম। অধীরকে সংশোধনের যে চেষ্টা এবং আয়োজন চল্‌ছে অর্থাৎ তাকে যে কঠোর শাসন দ্বারা নিষ্পেষণ করে নেহাৎ আদর্শ ছেলে গড়্‌বার আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে—এ যে অধীরের পক্ষে স্বাস্থ্যজনক এবং কল্যাণকর নয় বেশ বুঝ্‌লাম। যে বুঝ্‌তে চায়, যার চোখ ফুটেছে, তার ওপর অবিচারে আদেশ পালন করার অন্যায় দাবী করাতে আত্মার প্রতিই কি অবমাননা করা হয় না?

অভিমানী ছেলের ওপর কেন জানি জানি না আমার একটা খুব শ্রদ্ধা হয়। তারা খুব হুঁসিয়ার, অল্প কথায় সব বুঝে নিতে পারে। আঘাত না দিয়ে শুধু সমবেদনার দ্বারাই, তাদের ভুল সংশোধন করা খুব সহজ। সবদিক্ দিয়েই feelings তাদের খুব তীব্র থাকায়, বুঝিয়ে দিলে নিজের অন্যায়ও তারা সহজে ধরে ফেল্‌তে পারে। অধীরেরও ঠিক এ রকমই স্বভাব। এমনি সে খুব অভিমানী, যুক্তিবাদী, কিন্তু সমবেদনা নিয়ে তার ভুল ত্রুটী ধরিয়ে দিলে সে যে কত লজ্জিত হয়, তা আর বল্‌বার নয়। অভিমানী বলেই কোনদিকের উপেক্ষা তার প্রাণে সহ্য হয় না।

অধীরের ব্যাপার নিয়ে আজ মনে অনেক কথাই জাগ্‌ছে। সে যদি অবিচারে তার পিতৃ-আজ্ঞা

পালন করে যেত অর্থাৎ তার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রশ্ন এবং যুক্তিকে যদি অধীর অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিত তা'হলেই সে আদরের ছেলে হত! আবার এ-ও ভাবি, নিছক নিজের খেয়াল মত করে গ'ড়ে তুলাই কি শিক্ষার চরম আদর্শ এবং লক্ষ্য? জীবনকে ফুটিয়ে তুল্‌বার একটা অনায়াস পন্থা কি নাই? আমার মনে হয় অধীরকে সংশোধনের পন্থা বাহিরের শাসন নয়—অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তার মনের কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেই সব দিকে কল্যাণ হত। দাবিয়ে রাখ্‌বার একটা বয়স এবং সময় আছে। কিন্তু অধীর তো এখন আর নেহাৎ ছোট ছেলে নয়, সব দিকে তার চোখ-মুখ ফুটে গিয়েছে যে!

মান্‌লাম, অধীর খুব অভিমানী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি অর্থাৎ নিজের ধারণার ওপর তার অটল শ্রদ্ধা, কিন্তু সে তো অবুঝ নয় যে বুঝিয়ে বল্‌লেও তার ভুল ধারণা সংশোধন হবে না! তাহলে আমি তাকে খাঁটী অভিমানী বলে স্বীকার কর্‌তাম না। কেননা অভিমানীর একটা প্রধান লক্ষণই যে তারা সব দিকে সব সময় সজাগ থাকে। এ কারণেই দেখ্‌ছি, অধীরের মনে কোন সংশয় উপস্থিত হলে সেটা ছাড়াতে অনেক সময় লাগে, কেননা যাচাই না করে সে কোন কিছুকে স্বীকারই করে না!

সব ছেলে তো আর সমান নয়, কাজেই ছেলে ভাল কর্‌বার দরুণ ব্যবস্থাটাও সবের সমান হতে পারে না। এমনও তো ছেলে দেখেছি কত মার-পিটি খায় তবু তার ভিতর একটা অভিমানই জাগে না। তারপর ছেলেকে ভাল করতে হলে, ছেলের ভিতর প্রথমে এই অভিমানকেই আরও বেশী করে সজাগ করে তুল্‌তে হবে। sensitive ছেলেকে সংশোধন কর্‌তে খুব অল্প সময় লাগে।

আত্মবোধ যে ছেলের ভিতর সহজেই জেগে গিয়েছে—মার্‌লে-ধর্‌লেও সে কেন নীরবে তা সহ্য করে যেতে পারে না—এটা একটা আশ্চর্য্য অদ্ভুত যুক্তি নয় কি? মোহিতবাবুর এখানেই আক্ষেপ—ছেলের মাঝে এত জেদ্ থাক্‌বে কেন? কথায় কথায় সে এত প্রশ্ন তুলে কেন? অর্থাৎ প্রকারান্তরে অধীর অন্ততঃ শাসন বিষয়ে কেন একটা idiot ধরণের বেশ ভাল ছেলে হ'ল না। কিন্তু এই কি ছেলের প্রতি অভিভাবকের ন্যায্য সমবেদনা?

খেয়ালী

—:*:—

"যে আমাকে বড় ভাবে, তার কাছে আমি ছোট থাকিতে পারি না। আমি যেন তাহার কাছে ঋণী হইয়া থাকি—সত্যি সত্যি বড় না হইয়া তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে আমার লজ্জা করে। আমার কত দোষ সে জানে, কত দিক দিয়া মনে মনে কত-জনের কাছে আমি ছোট হইয়া আছি;—তবু যে আমাকে বড় ভাবে, তার কাছে আমি ফাঁপরে পড়ি। মৌখিক স্বীকৃতিতে ভুলাইতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয়—সে প্রাণে প্রাণে আমাকে যা ভাবে, আমি যেন তাই হইতে পারি। জগতে আর কারুকে আমি কেয়ার্ করি না, কিন্তু ঐ একটী লোকের কাছে আমাকে অকাট্য জবাবদিহীতে পড়িতে হয়—মুখের কথায় নয়, প্রাণের ব্যথায়—কোন হেতু নাই, কোন অন্যায় দাবী সে করে না, কেবল যেহেতু সে আমায় বড়

ভাবে। তর্কে জিতিয়া যাই সর্ব্বত্র, কিন্তু তার ভাবনার উপর আমার তর্ক ঘুরায় না—মনে হয়, ও কি শুধুশুধুই বড় ভাবে?—সত্যি সত্যি তুই কি বড় ন'স্? না হলে ওর ভাবনা তোর প্রাণে বাজে কেন?

যাদের মনে মুখে ঐক্য থাকে না, অথচ যারা চায়—তাদের চাওয়াকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু সে তো মুখে কিছু চায় না, তবু কি করিয়া যেন ভাবে বুঝি সে আমার কাছে কত কিছুই চায়, আমার সুখের জন্যই চায়; তার চাওয়াকে তৃপ্ত না করিয়া আমার কল্যাণ নাই—আমি থাকিতে পারি না। আমার সম্বন্ধে বুঝি সে আপ্তকাম, তাই তার সর্ব্বকাম পূর্ণ না করিয়া আমার নিস্তার নাই। উঃ—কি বিষম টান, কি বিষম বাধ্যতা! তবু তো রাগ করিতে পারি না। তার সুখের জন্য কিছুই তো সে চাহে না; তার শুধু জোর এইটুকু যে, সে আমাকে বড় ভাবে।

মানুষের জানোয়ার মনকে সহৃদয় করিবার এক অদ্ভুত কায়দা বটে। যখনি মনে পড়ে, সে আমাকে বড় ভাবে, তখনি আমার সকল ছোটত্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া যায়—চৌদিকে পথ খোঁজে, শুধু পালাই পালাই করে।......আমি আবার ভুল করি, আবার ছোট হই—কিন্তু তার তো কৃপণতা দেখি না; তবু সে আমাকে বড়ই ভাবে, বড়ই ভাবে!

আজ আমার এই ক্ষণিকের সুমতিতেও সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বুক ঠুকিয়া এ কথা বলিতে পারি—যদি সত্যি সত্যি নিজের হিত চাও পরের হিতও চাও, মানুষকে বড় ভাব। সত্যি মানুষ বড়; ছোট ভাবনাই তাকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে। জগতে কয়টা লোক জাগিয়া ঘুমায় বল দেখি? যারাই জাগে, তারাই যেন বড় ভাসে সকলকে—ঘুম কি না ছুটিয়া পারে? পরকে সুমতি দিতে যাও কিন্তু নিজের মনটী সুমস্ত রাখ না—তাই মন্ত্র ব্যর্থ হয়। তোমরা ভিতর হইতে কথা বল কই?—সত্যি সত্যি মানুষকে বড় ভাব কই?

এ কথা বুঝিবার ক্ষমতা আজ আমার বেশ হইয়াছে—যারা আমার চৌদিকে বেড়িয়া আছে, তাদের মনের অসরল অস্বাভাবিক অনাত্মভাবনাই আমাকে ছোট করিয়া রাখিয়াছিল। শুধু আমি কেন, কত সংসারের কত অস্ফুট ব্যগ্র প্রাণকে এমনি করিয়া সংস্কারভীরু অবজ্ঞার তলে চাপিয়া রাখা হইয়াছে—কত শক্তি কত আনন্দ ফুটিতে চাহিয়াও ফুটিতে পায় নাই। নিজের জোরে সকল বাধা ঠেলিয়া উঠিয়া কেন ফুটিতে পারিল না—এই বলিয়া তাহাদের উপর নির্ম্মম মন্তব্য করিব না; কিন্তু যারা চৌদিকে ছিলে, তাদের বলি—তোমরা কেন তোমাদের জাগ্রত মনের ভাবনার জোর আমাকে ছোট ভাবিয়া অপব্যয় করিলে? তোমরা কেন তাকে বড় ভাবিলে না? মূলে কথা আছে অবশ্য, সে শিক্ষা তোমরাও পাও নাই। কিন্তু জাগ্রতের বড়াই যখন কর, বিজ্ঞতার অভিমানটুকু অন্ততঃ যখন জাগিয়াছে, তখন লুকাইয়া লুকাইয়া নিজকে শুধরাইয়া লও না কেন! এখনো ত দিন আছে যথেষ্ট—সত্যি সত্যি জ্ঞানের চর্চ্চা একটু আধটু করিলে তোমাদের কাজের সংসার ফতুর হইবে না, ইহা ধ্রুব।

বুকে করিয়া, দরদ বুঝিয়া, সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া মানুষকে মানুষ করিতে পার তো ভালই। না পার অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিও—প্রতিজ্ঞা রাখিও—মানুষকে কখনো ছোট ভাবিব না! সত্যি তুমি শক্তিধর—তোমার ছোট ভাবনাতে সত্যি পরকে ছোট করে। আজ যদি দেশে সেই অন্তর্মুখী শক্তির চর্চ্চা হইত, বাহিরের হৈ চৈ লাগিত না—অকপট শ্রদ্ধাই মানুষকে মহৎ করিত। লাখো কথার এক কথা বলিয়া এই কথাকে আমি প্রাণে প্রাণে শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি—মর্ম্মান্তিক সত্য বলিয়া সদানন্দে অনুভব করি।

আর কিছুই না পার—অন্ততঃ মানুষকে বড় ভাব। যদি অবাধ্য মানুষ রাতারাতিই বড় হইয়া উঠিতে আপত্তি করে—প্রথম সান্ত্বনা, তোমার ভাবনা বৃথা

হইবে না ; দ্বিতীয় সান্ত্বনা, তুমি তো বড় হইলে। পরকে বড় ভাবিতে গিয়া আসলে নিজেই বড় হইয়া যাইতেছ, ইহা বোঝ না ?·········

আমি চিরকাল খামখেয়ালী—বিজ্ঞ সংসারের সঙ্গে আমার কোন কালেই বনে না ; কোন অনান্তরিক ক্ষুদ্র ভাবনাকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে আমারো একটুও ব্যথা বোধ হয় না—খেয়ালের অত্যাচারে গতানুগতিক গড্ডালিকাবাহিনী যখন ব্যতিব্যস্ত, ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ—তখনো কিন্তু যে আমাকে বড় ভাবে তার কাছে আমার সব খেয়ালের মাথা নত হয় ! জগতের কাছে কত উগ্র, কত কিছু—কিন্তু তার কাছে······কী যে, সে কথা আর বলিতে পারি না। কোন উপদেশে মন বুঝে নাই, মৌখিক তিরস্কারে মন টলে নাই, দুর্ব্বলের সান্ত্বনায় মন মজে নাই, কারো বিদ্রূপকেও কোন দিন গ্রাহ্য করি নাই ; কিন্তু আমার সকল লড়াইএর শেষ হইয়াছে ঐখানে—যে আমাকে বড় ভাবিয়াছে তার চরণে ! সব পারিব, কিন্তু তার বড় ভাবাকে মিথ্যা করিতে পারিব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা ! যত সব অবশ খেয়াল আজ বড় হইবার খেয়ালে স্ববশ হইতেছে। বড় হইব—এর চেয়ে বড় খেয়াল যে আর হইতে পারে না। এ বিশ্বাস ঐ ভাবুকেরই ব্রাহ্মী ভাবনা হইতে পাইয়াছিলাম।·········

আমার কোন খেয়ালের অর্থই আমি জানিতাম না, এখনো জানি না।—হয়ত বা তিনি জানেন, যিনি আমাকে বড় ভাবেন ! কি সাধে মানুষ এত সহ্য করে—জান কেউ ?"

হয়নি কিছুই পাওয়া

ও তোর হয়নি কিছুই পাওয়া—
বাকী অনেক আসা-যাওয়া—
একটুখানি আলোক দেখেই
থামাস্‌নে তোর ধাওয়া—
(ও তোর) হয়নি কিছুই পাওয়া।

আছে অনেকখানি বাকী,
করিস্‌ যতই ঢাকাঢাকি—
আস্‌লে হাওয়া ঝড়ের তুফান,
দেখ্‌বি সবই ফাঁকি—
(আছে) অনেকখানি বাকী।

করিস্‌ যতই মাতামাতি—
চাস্‌ যতই রাতারাতি,
একটুখানি পেতেও হবে
অনেক হাতাহাতি !
(করিস্‌) যতই মাতামাতি।

তোরে চল্‌তে হবে একা,
আজ যায় যাদেরে দেখা ;
থাক্‌বে না কেউ, দুঃখে ললাট
রাখবে শুধুই রেখা—
(তোরে) চল্‌তে হবে একা।

মঙ্গলময়

—(*)—

মানুষ চলে মঙ্গলের আকর্ষণে। সে মঙ্গল হিরণ্ময় সুখ দিয়া আবৃত। সুখের টানেই সবাই চলিতেছি, এটা বাহিরের কথা—কেননা অন্তরের মহত্ত্বে অনেক সময় দুঃখকেও তো স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং কি করিয়া বলি যে, শুধু আত্মসুখই জীবনের একান্ত নিয়ামক? সুখ-দুঃখ খণ্ড অনুভবের কথা। এমন একটা রহস্য আছে, যাহা অহরহঃ এ জীবনকে সর্ব্বতোভাবে স্পন্দিত করিতেছে; জাগ্রত মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারি—উহাই মঙ্গলময়ের প্রেরণা। বাস্তবিকই প্রাণে প্রাণে আমরা মঙ্গলই চাই, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের শুভ চাই। অতি ঘোর দুঃসময়েও আমাদের সদিচ্ছাই আমাদিকে রক্ষা করে। শুভ যদি মূলে না থাকিত, এই কাতর জগতের আশ্রয় হইত কে?

কত মতে অবিশ্রাম আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু কিছুতেই তো প্রাণের কথাটা খুলিয়া বলা হইতেছে না। জাগতিক নিয়মে, অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে যাহা হইয়া আসিতেছে হইতেছে, তাহাকে মানিয়া লইয়াই চলিতে হইবে—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তুচ্ছই বটে! স্বেচ্ছায় তুচ্ছ না কর, তোমাকে জোর করিয়া তুচ্ছ করাইবে। এই অমোঘ শক্তি আর কিছুই নহে—মঙ্গলের প্রেরণা। তাহাই বুঝি আমাকে সকল অবস্থা সহ্য করিতে স্বীকৃত করে! যেখানেই দেখিয়াছি, অমঙ্গলের সূত্রপাত, আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া একজনকে না একজনকে সেখানে সহ্য করিতে স্বীকার হইতেই হইবে, নতুবা গোল মিটিবে না। মানুষ শুধু আত্মসেবী নয়, সে সামাজিক প্রাণী। সমাজ-দেহের মঙ্গলবিধান জন্য সে আত্মদানে স্বীকৃত—ইহাই তাহার মহিমা! একজন নীলকণ্ঠের মত গরল-জ্বালা বুক পাতিয়া গ্রহণ করুক;—তখনও অমঙ্গল থাকিল, কিন্তু অভয় আশ্রয় পাইয়া থাকিল, মঙ্গলময়ের গৌরব হইয়া থাকিল। জীবনের দ্বন্দ্বে এ সত্যকে প্রত্যক্ষ করি।

অন্তর হইতে এই ত্যাগের গৌরব হারাইয়া ফেলি বলিয়াই ঘটনার বৈপরীত্যকে অস্বীকার করিয়া সঙ্কীর্ণ হৃদয় নিয়া কোণে পড়িয়া থাকি। সব ঘটনাকেই সহজ প্রেমে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—জানিতে হইবে ইহাতে সেই মঙ্গলময়কেই প্রীত করা হইতেছে। চোখের জল ঝরে ঝরুক্, তাহাতে কি? কোথাও "পারিব না" বলিলে চলিবে না। যেখানেই পারিব না বলিয়া পিছাইয়া আসিলাম, সেইখানেই আমার ছোটত্ব প্রমাণিত করা হইল—চিত্তের অব্যাপ্তিকে আশ্রয় দিয়া যেন দুধ দিয়া কালসাপ পোষা হইল। অন্তর হইতে মঙ্গলময়ের অশ্রু ঝরে—নীরবে বলেন, তোর এই কাজ? তখন পারি না—স্বীকার না হইয়া পারি না!

'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট' কাহাকে বলে?—যাহার মুখে 'পারিব না' নাই, অথচ মনে ক্ষোভ নাই—সর্ব্বাবস্থাকে যে সহজে গ্রহণ করে। সত্যই তো—দুঃখকে মানিয়া না লইলে যে জীবন দেনার দায়ে রিক্ত হইয়া পড়িতে থাকে। আত্মকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়া দেওয়াই আমাদের বৈশিষ্ট্য। জগতের কোন ধর্ম্মকেই অস্বীকার করি না। কোন সমস্যাই বিভ্রান্ত করিতে পারে না। অন্তরে-বাহিরে ওতপ্রোত এই সনাতন সত্য—মঙ্গলময়ের প্রেরণা; শ্রীগুরু-সকাশে ইহারই দীক্ষা লইয়াছি।

সমস্যা বুঝিবার ক্ষমতা সকলেরই থাকিতে পারে,

কিন্তু মীমাংসা করিবার ক্ষমতা হয়ত তোমারই আছে —প্রায় ব্যাপারেই এরূপ লক্ষ্য কর না কি? যদি কর, বুঝিবে, মঙ্গলময়ের প্রেরণা পাইতেছ। তখন মীমাংসার আশ্রয় একমাত্র তুমি। তুমি যেখানে ত্যাগ-স্বীকার করিবে, সেইখানেই মীমাংসা ফুটিয়া উঠিবে। পরস্পর মুখচাওয়া-চাওয়ি আর ঠেলাঠেলি কর বলিয়াই মিলন হয় না, মিলন দুঃসহ হইয়া উঠে।

মঙ্গল বলিতে চিত্তের অনাবিল স্বস্তি—যাহা হইতে প্রাণে জোর আসে, আনন্দ পাওয়া যায়। প্রাণে এমন অদম্য উৎসাহ থাকিবে যেন নিজকে ভুল হইয়া যাইবে—সুখ দুঃখ তো দূরের কথা। কাহারও ধার ধারিলে চলিবে না। আত্মবিচারই যথার্থ বিচার। পরের উপরে কিছু নির্ভর করে না। প্রতিষ্ঠিত হইয়া তবে প্রতিষ্ঠানে হাত দিতে হইবে। তুমি তোমার মাঝে সেই অনাবিল স্বস্তি, শান্তি, শক্তি ও অদম্য তেজ অনুভব কর কি?

ধ্যানলব্ধ বহির্জগৎবঞ্চিত এই যে নিতান্ত একান্ত তুমি—ইহার ধ্যানই যত ভবরোগের ঔষধ। সংস্কারে যখন জড়াইয়া পড়িতেছ, নিজের মঙ্গল যখন নিজে দেখিতে পাইতেছ না, তখন এমনি করিয়া নিজকে ভোগবঞ্চিত ত্যাগী তপস্বী করিবার চেষ্টাতেই সমস্যার মীমাংসা ফুটিয়া উঠিবে।

জীবনে নিজের চেষ্টার দৌরাত্ম্য আর কতটুকু পর্য্যন্ত? পুঞ্জীভূত মুগ্ধ সংস্কার আর জড়তা আলস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবে—সে ভাল কথা; কিন্তু জয় পরাজয় বিষয়ে অনুদ্বিগ্ন থাকিও। প্রশান্তিই চরম স্বস্তি—ইহাতেই জীবন জয়যুক্ত ও মঙ্গলোপেত হইয়া রহিয়াছে। হাল ছাড়িয়া দেওয়াও নয়, আবার দুশ্চেষ্টাও নয়—কেবল অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে প্রাণের প্রাণ হইতে যে সদিচ্ছার প্রেরণা পাইতেছ, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। অন্তরের তাঁহাকে যত জানিবে, বাহিরের ব্যাপারে তত বিনীত হইবে। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—যথার্থ জ্ঞানলাভ ঐ দিক দিয়া হইতেছে, ব্যাপার উপলক্ষ্য মাত্র।

কোন্ কাজে মাথা হেঁট্ হইয়া আসে, মুখটার দিকে তাকাইলে ছোট্ট শিশুটী পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারে। মানুষ স্বভাবতঃই অবোধ নয়। শিশুরও আত্মগ্লানি আত্মগৌরব আছে, লজ্জা আছে, বিবেক আছে, সৌন্দর্য্য-বোধ আছে। মঙ্গলের প্রেরণা সকলেই অনুভব করে। বাহিরে জগতের ঘটনাবিপর্য্যয়ের চাপে পড়িয়া নিজের হিত নিজে বোঝা, সে তো পরের কথা; কিসে আত্মার মঙ্গল হইবে, এই সহজ বোধিটুকু প্রত্যেক হৃদয়েই সর্ব্বদা জাগরূক হয়। দুর্নিমিত্ত যদি বহির্মুখ না করে, অন্তর্মুখ প্রজ্ঞায় প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি। এই অনুভবকে অগ্রাহ্য করিয়া সাময়িক খেয়ালে চলিতে গিয়াই অন্তর্নিহিত মঙ্গল প্রেরণাকে ছাইচাপা দিই মাত্র—কিন্তু আসলে তাহা নিবে না। উহাই যে আমাদের প্রাণের প্রাণ—সকল আঘাত অকাতরে সহিয়া লইয়া সমস্ত ত্রুটী-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়াও এই অবোধ জীবনকে সে বুকে করিয়া রহিয়াছে—সেই যে জীবনসর্ব্বস্ব আমার হৃদয়েশ্বর। ভাবের আবেগে আমারই সেই ব্যাপ্ত আত্মাকে মুহুর্মুহুঃ নমস্কার করি।

কোনমতেই ভ্রান্ত হইতে হয় না, আত্মগৌরব ও সদানন্দ নষ্ট হয় না যদি তুমি ঐ হৃদয়কেন্দ্রে মঙ্গল প্রেরণায় অধিষ্ঠিত থাক। মঙ্গল মানে যদি সামঞ্জস্য হয়, স্বীকৃতি হয়, তবে দেখ ঐ কেন্দ্র ছাড়া নির্ভয় নির্ভর কোথায়? যে সমস্যার মীমাংসা পাও না, তাহারই মূলে এই আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা কর, নিজে ত্যাগস্বীকার করিয়া নিজের ন্যায্য অধিকারের অধিকারী হও—তোমার ব্যক্তিগত দুঃখ গ্লানি ঝরা পাতার মত আনন্দের তুফানে কোথায় উড়িয়া যাইবে, কে তার হিসাব রাখিতে যাইবে?—ফুটিয়া উঠিবে চিরবসন্ত, অনাহত কুহুতান, মঙ্গলময় মলয়-শিহরণ। নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রতি মমতাহীন হইয়া হে

কল্পনাবিলাসী, ব্যর্থতার কল্পনায় দিন দিন ফতুর হইতেছ কেন? শুভবোধই যে তোমার জন্মস্বত্ব।

সকল রোগেরই রসায়ন ঐ মঙ্গলের অনুভব। যে তোমাকে গহন কান্তারে জ্যোতির্লক্ষ্যে পথ দেখাইয়া চলিতেছে—ঐ যে তোমার হৃদয়—যাহাকে নিকটে রাখিয়াও ভ্রমে দূরে হাৎড়াইতেছ। হৃদয় নিয়া তুমি সংসারে নাম—নির্দ্দয় হইও না। তোমার ভালবাসা যদি অটুট থাকে, তোমার সঙ্গে বিরোধ জগতের কয়দিন? জান তো, সেই মঙ্গলময়ের প্রেমই সকল অসামঞ্জস্য গলাইয়া একাকার করিয়া দিয়া মরজীবনে অমৃতের অনুভব আনে! ভালবাস, প্রাণ ভরিয়া সকলকে গ্রহণ কর—দুঃখ বলিয়া মুখ বাঁকাইও না, সুখ বলিয়া গলিয়া পড়িও না। ইহাই ভূতে দয়া। এই দয়া কি কাতরকে কম নিষ্কৃতি দেয় মনে কর?

বিশুদ্ধ প্রেমই একমাত্র মঙ্গল, এ অভ্রান্ত কথা। আত্মত্যাগের অভাবই সকল অশক্তির, সকল অসামঞ্জস্যের নিদান। প্রেম মানেই চিরন্তন স্বীকৃতি—সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভা। কিছুতেই বুদ্ধিমান্দ্য নাই, কোন কিছুতেই নিষেধ নাই, 'না' নাই—সবি হাঁ, সবি পূর্ণ, সবি ওঁ। এই অনুভবই মঙ্গল, এই অনুভবই প্রেম। যাহা আত্মগত ভাবে মঙ্গল-বোধি, তাহাই বিশ্বগত ভাবে প্রেম, স্নেহ, দয়া, মমতা, সৌহৃদ্য। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় শক্তি জগতে জয়ী হইতেছে না কোথাও। যে জয়ের হিসাব-নিকাশ আছে, সে জয় কি জয়?—ও তো পরাজয়েরই নামান্তর। যেখানে আমার কৈফিয়তের কিছু থাকিবে না, প্রাণ ভরিয়া মানিয়া লইব শুধু—সেইখানেই তো আমি যথার্থতঃ জয়ী।

ফুটিয়া ওঠ সেই অনাবিল অনুভবে—যাহার মাঝে মুখবাঁকান দুর্ভাবনার আর বিনাশভীতির কক্কর নাই—প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড অনুভব যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুভবের আস্বাদনে রস পাইতেছে—সেই চরম পরম রসে হৃদয় উদ্বেল হউক।

অন্ত চাই কেন্দ্রে, পরিধি অবিশ্রাম আবর্ত্তিত হইতে থাক্। নিজকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, কিন্তু আমি মঙ্গলময় সর্ব্বাতীত! জীবনের উভয় দিক সমজাগ্রত রাখিতে হইবে। আপাত দৃষ্টিতে একটা 'আমি' আর একটা 'সে'।—একের আকর্ষণে অপর ছুটিয়া চলিয়াছে—মর্ম্মনিহিত মঙ্গলপ্রেরণা হইয়া একের প্রেম অপরকে আকর্ষণ করিতেছে! কে যে তুমি আর কে যে তুমি নও, তাহা বুঝিতে পারি না। হয়ত বা এই আমিই একদিন সেই তুমি হইয়া আসিব, দেখিব, যে তুমি সেই আমি। যে মঙ্গল অনুভব অন্তরে একবার জাগে, একবার ঘুমায়, সে তখন চিরতরে জাগিবে—সে-ই হইবে যথার্থ আমি—তখন আমি হইব বিশ্বজোড়া প্রেমের কাঙ্গাল! মঙ্গলময়ের প্রেম এ জীবনকে সেই পথেই লইয়া চলিতেছেন—ভুলিয়াও যেন ইহা না ভুলি! সেই একই বাণী সকলের অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে; তিনি মঙ্গলময়, তাঁহারি আকর্ষণ আমাদের শুভপথ চিনাইয়া দিতেছে, দিয়াছে এবং দিবে—ইহাই ধ্রুব সত্য।

———:*:———

বেদনা

—(*)—

সুখের উচ্ছ্বাসে নয়—কোন ব্যথা পেয়ে যখন জেগে উঠি, তখন সংশয় থাকে না যে এই পাওয়াই সত্যি পাওয়া। আমার ইচ্ছায় তখন আর কিছু নয়—তাঁর ইচ্ছায় তখন কাজ সুরু হল। সুখে-দুঃখে ওঠা-নামা চল্‌তে থাকুক। তুমি শুধু তন্ময় হয়ে থাক। কিছু না চাওয়াই তাঁকে টলায়।

অন্তরে একটা নেশা জাগে—মন স্বতঃই অন্তর্মুখী হতে চায়—এমন শুভক্ষণে কার স্পর্শ অনুভব কর? কাকে তোমার মনে পড়ে?—ওই তো তাঁর আবেশ, রসের আভাস। একেই বলি বেদনা। তখন কেউ আঘাত কর্‌লে তাকে আরো ভালবাস্‌তেই ইচ্ছা করে। এই স্নিগ্ধতাই খাঁটী হৃদয়।

এই বেদনা-করুণ হৃদয়ে অপূর্ণের আশ্রয়। একা পূর্ণ হয়ে তো সোয়াস্তি নাই—কত শত আঘাত পেয়েও করুণা কেবল ঝরেই পড়ে। এই মহামহিম অনুভব কার প্রেরণায়? যাঁর প্রেরণায়, তুমি তাঁর—অথবা তিনি তোমার! তাঁকে আমরা পাচ্ছি এমনি করে—অন্তরের সর্ব্বসমঞ্জসা ভাব দিয়ে। প্রাণভরে শুধু চাচ্ছি—এই জিনিষটীকেই কি? তাঁর বুকভরা মধুর বেদনা কি?

চাই মার্জ্জনা। সমস্ত বাসনার উগ্রতা নিরস্ত করে সেখানে তাঁর প্রেমের আসন রচনা। তোমার জন্যই তো তাঁর সব। দিতেই তিনি এসেছিলেন, আপন জোরে চেয়ে নাও। সে দাবী তাঁর অসহ্য হবে না। বরং তাই তিনি চান। বেদনায় তিনি শুদ্ধ। কত ব্যথা দিয়েছ, নির্ম্মম হয়ে ভুলে আছ—তবু সেই অশ্রুধারা, তবু সেই ব্যথার পুলক। পরের জন্য কাঁদ্‌তেও এত সুখ!

যখন আর কিছু ভাল লাগে না—সেই সন্ধিক্ষণে কম্পাসের কাঁটার মত মনকে ঘুরিয়ে দিল তাঁর দিকে। কে সে? তাঁরই প্রেমের আকর্ষণ নয় কি? ঐ মুহূর্ত্তে তো কত অকল্যাণ আবিষ্ট কর্‌তে পার্‌ত; কিন্তু তাঁকে ভুলিনি, তাই রক্ষা—ভাল না লাগার অশুভ-মুহূর্ত্তেও তো কৃপা আমায় বঞ্চিত কর্‌ল না।

সকল অক্ষমতা তোমার পায়ে নিবেদন কর্‌লাম প্রভু!—জানি, কত বিঁধ্‌ছে মনে—তবু তো ফিকিরে জয়ী হব না। সত্য সরল সহজ পরিচয়ের অবমাননা কর্‌ব না। সব দিলাম, মন্দ-ভালর বাছাই কর্‌ব না আর। কর এবার যা খুসী তোমার! তোমার মাঝে আমাকে হারানোই চাও, বুঝেছি।

কেন এ চেষ্টা? কেন এ অভিমান? তোমায় সুখ দিতে চাই—এ স্পর্দ্ধা কেন আমার? এই বুঝি লীলা—যার কারণ নাই শুধু কার্য্য বিলাস, পরম্পরা নাই, তবু অখণ্ডানুভবের মণিমালা। আমি তার একটা মণি। কে গাঁথ্‌ল, কে পরাল—জানি না! সুখী হলে কি?—ভাগ্য আমার! কিন্তু অগণিত আঘাত-বেদনার তুলনায় এ সুখ কত তুচ্ছ, কত নগণ্য—তবু তুমি ঐটুকুকেই বড় বলে স্বীকার কর্‌লে। আমার জীবনভরা অপরাধের চেয়ে ঐ একটুখানি জিনিষই তোমাকে স্পর্শ কর্‌লে! ধন্য আমি; অপরূপ লীলা!

উদারতা একেই বলে। আশাতীত ক্ষমা—বিপুল ভরসা—অসীম নির্ভর। কোথাও যদি অমন আশ্রয় না থাক্‌ত, মন ফির্‌ত কি? মহিমায় মুগ্ধ করে জাগিয়ে তুল্‌লে—কোন মূল্য গ্রহণ কর্‌লে না। মন আমার! তুমিও যেন এমনি করেই চাও—উগ্র হয়ে

নয়, ব্যগ্র থেকে। সে ব্যগ্রতায় কি স্নিগ্ধ শান্তি! এত মিষ্টি করে চাওয়া যায়?—আশ্চর্য্য!

সত্যি সত্যি "সকল কাঁটা ধন্য করেই গোলাপ" ফোটে। বেদনা কি দিশেহারা করে? সে আরো জ্ঞানের আলো জোরালো করে। ব্যথা পেয়ে জেগে উঠ্‌ল যে, তাকেই তোমার মনে ধরল বেশী। ওগো প্রেমের ঠাকুর! তোমায় বুঝ্‌তে নারি—তুমি অপূর্ব্ব নও, তবু নূতন। রূপ-অরূপ অপরূপ সবই তুমি; তুমিই আমার চিরসাথী বেদনা!

বিচিত্র-প্রসঙ্গ

—:*:—

সকল কর্ম্মের মাঝেই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা অনুভব করা—এর চেয়ে বড় অনুভূতি আর নাই। উপনিষদেরও গোড়ার কথা এই—ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং। বৈষ্ণবও বল্‌ছেন—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" কিন্তু এই সহজ কথাগুলোর মর্ম্ম বুঝ্‌তে হলে অনেক সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন। বিশিষ্ট কেন্দ্রে মনকে নিয়োজিত করে তারপর পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া খুবই সহজ। প্রথম থেকেই যদি নির্ব্বিচারে ভাল-মন্দ বিচার না করে সব কাজই ভগবানের কাজ বলে, কু-কাজকেও তার নামে চালিয়ে দিই তাহলে পরিণামে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন—"চারাগাছকে বেড়া দিয়া রাখ্‌তে হয়, তারপর বড় হয়ে গেলে তখন হাতি-ঘোড়া এসে গা ঘস্‌লেও গাছের কোন ক্ষতি হয় না।" কাজেই নিজকে বাঁচাতে হলে আপনাতে আপনি থাকাই খুব মঙ্গল। অবাধ সম্মিলন চরম কথা!

জগতে সবারই পরিণাম আছে—মন্দ চিরকাল মন্দ থাকে না। পরিপূর্ণতার দিকে সব মানুষই অগ্রসর হচ্ছে—কিন্তু এর মাঝেও যিনি জ্ঞানী তিনি আরও একটু দ্রুত অগ্রসর হতে পারেন। কেননা জ্ঞানী সব বুঝেন—তাই তাঁর প্রতিপদ-বিক্ষেপে সংযম আছে; অশুভ চিন্তা বা অশুভ কর্ম্ম থেকে নিজকে নির্ম্মুক্ত রাখ্‌বার চেষ্টা এবং সতর্কতা আছে।

জড়-ভরতকে নাকি গরুর খাদ্য খেতে দেওয়া হয়েছিল, প্রহ্লাদকে বিষ দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু অন্তরের প্রসন্নতা এবং শুচি দ্বারা বস্তুর প্রকৃতিগত গুণকেও তারা রূপান্তরিত করে ফেলেছিলেন। এ কি সহজ কথা - তোমার আমার কাজ? তা বলে অসম্ভব যে অমন কথা বল্‌ছি না—কেননা তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন। কিন্তু এ কথা ঠিক, যেখানে ভয় রয়েছে, দুর্ব্বলতা রয়েছে, ভেদ-দৃষ্টি লোপ পায়নি—সেখানে আত্ম-স্যংনার দুর্গে নিজকে রক্ষিত করাই সব চেয়ে শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ সব কাজ-কর্ম্মকে নির্ব্বিচারে প্রতিপালন কর্‌তে না গিয়ে, আমার আত্মার পক্ষে, ভাবের পক্ষে যাকে অনুকূল বুঝ্‌ব তাকেই গ্রহণ করা উচিত। এ কারণেই প্রথমতঃ সাধকের পক্ষে নিভৃত-সাধনায় খুব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব কাজই ভগবানের কাজ, ঠাকুরের কাজ—কিন্তু একে বুঝ্‌বার মত ভাগবত দৃষ্টি কি লাভ হয়েছে তোমার? অনেক ক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাই, সব কাজ ভগবানের কাজ বলে বিশেষ করে নিজের রুচির ওপরই জোর দিই বেশী। কিন্তু একেই কি "খোদার ওপর খোদ্‌কারী" বলে না?

Universal-brotherhood খুব সুন্দর এবং উচ্চ আদর্শের কথা। কিন্তু আপন ঘরেই যদি ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন না হল—তাহলে শুধু "বিশ্ব" কথার উপাধিটাতে কি লাভ! আমাদের আদর্শের প্রতি লোভ আছে বটে, কিন্তু আদর্শকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে রূপ দেবার শক্তি নাই। তাহলে একে বিশ্ব-ভাবুকতা ছাড়া আর কি বলব!

উপনিষদেও দেখ্‌তে পাই, প্রথমেই আত্মানুভব তারপর আত্ম-ব্যাপ্তির কথা রয়েছে। নিজকে না পেয়ে মানুষ নিজকে বিলাবে কেমন করে? প্রথমেই ব্যাপ্তির দিকে মন দিয়ে—না নিজকে পাই, না দশ-জনকে ভাল করে বুঝ্‌তে পারি। এই আত্মগত ব্যষ্টি সাধনাকে অনেকেই সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা বলে—কিন্তু যে উদারতায় নিজকে কোন দিক্ দিয়ে না বুঝিয়ে, কেবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাতে যে নিজের এবং সমাজের কি কল্যাণ হয়, তা'ও তো বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

সব কাজে, সবের দরুণ ঝাঁপিয়ে পড়াটা তো খুবই গৌরবের কথা—কিন্তু ভিতরে কেন্দ্রগত আত্মার বল না পেলে এ উৎসাহ, উদ্যম যে বেশী দিন টিকে না। বরঞ্চ সমাজের হিত কর্‌তে গিয়ে পরিশেষে নিজের আরও কিছু দুঃখ-বেদনা সমাজের ওপর ঢেলে দিয়ে আসি। যে যাই বলুক না কেন, এর চেয়ে সাংখ্যের কৈবল্য সাধনাকে আমি শতগুণে প্রশংসা করি!

সবের দাবী মিটানোর পরেও—আত্মার দাবী থেকে যায়। তখন মানুষ কেন্দ্রাভিমুখে না হয়ে পারে না। মুখে ভাব রক্ষা করে, লৌকিকতা করে বাহিরে কিছুদিন পর্য্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়—কিন্তু এ আনন্দে মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। প্রত্যেকের জীবনেই এই কেন্দ্রগত আত্মার অনিবার্য্য আকর্ষণ রয়েছে—একবার তার ডাক এসে কানে পৌঁছালে তখন আশী বছরের বুড়াও জোয়ান হয়ে ওঠে—সংসারের শত বন্ধনও তাকে আবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে না।

আত্মাকে যে জান্‌তে পেরেছে, তার ভিতর স্বতঃ-স্বতঃই আত্মবল উদ্বোধিত হয়ে উঠে। তখন সমাজ-হিত, দশের হিত, দেশের হিত—সবের হিত করাটাই সহজ এবং কল্যাণজনক হয়ে উঠে। এর দরুণই ঋষিযুগে দেখ্‌তে পাই—আত্মানুশীলনকে সব অনুশীলনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে।

নিজকে বুঝার দরুণই আত্মস্থ হওয়া। একে যদি স্বার্থপরতা বল—বেশ তো হোক্ না স্বার্থপরতা। মূলধন না নিয়ে কারবার আরম্ভ করার চেয়ে, মূলধন নিয়ে কারবার আরম্ভ কর্‌তে যদি একটু বিলম্বও হয়—তাতেও অনেক লাভ, অনেক কল্যাণ। এই যে কিছু না বুঝে, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা স্থির ধীর ধারণা না নিয়ে—আত্মব্যাপ্তির অছিলায় প্রকারান্তরে নিজেরই সর্ব্বনাশ করা—এর চেয়ে সর্ব্বনেশে ভাব কি আর কিছু আছে জগতে?

সবেরই উত্থান-পতন, জোয়ার-ভাটা আছে। এক সময় উপনিষদের উদার-নির্ম্মুক্ত ভাবনার স্রোত সকলকেই পবিত্র করে তুলেছিল। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এ শুধু পুথির বচন ছিল না। প্রত্যেকের জীবনই তখন এক একটা আনন্দের উৎস ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, অনেক বিপর্য্যয় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েছে। এখনও যদি আমরা অতীতের আদর্শ ধরে মুখে শুধু উপনিষদের সহজ-আনন্দের কথা আওড়িয়ে যাই, তাতে কি লাভ? বরঞ্চ সাংখ্যের বিবিক্ত সাধনায় জোর দিয়ে, নিজকে ভাল করে বুঝাতে অনেক কল্যাণ হবে!

আদর্শের মোহ থাকলেই জীবনের উন্নতি হয় না। তার দরুণ অনেক সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন আছে। সহজ কথাগুলো বুঝ্‌তেই আরও বেশী করে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। আমাদের মন হয়ত মহৎ আদর্শের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে—কিন্তু দেহ-ইন্দ্রিয় হয়ত আদর্শকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে

অক্ষম। এমনি করে একটা না একটা দুর্ব্বলতা লেগে আছেই। এই সত্যিকার দুর্ব্বলতাকে কি শুধু ঝুরি ঝুরি বচন দিয়ে বিধ্বস্ত করতে পারা যায়?

এর দরুণই বলছি, বেশ একটু সরে পর। অবজ্ঞার ভাব নিয়ে নয়—সকলকে আরও নিবিড় করে পাবে বলে। তারপর যখন স্ব-প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে—তখন ভাল মন্দ সু-কু সবের সঙ্গে মিলামিশা কর—তখন কিছুতেই আর তোমার পতনের আশঙ্কা নাই। কেননা "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" আত্মার অনুভূতি হয়ে গেছে তোমার!

পেছন থেকে বল না পেলে, আত্মার দীপ্তিতে জীবন ঝল্‌সিয়ে না উঠ্‌লে—জগতের বিচিত্র ভাল-মন্দের সংস্কারটাই যে প্রবল হয়ে ওঠে। সাময়িক উত্তেজনা বা উদ্দীপনা কখনই আত্ম-শক্তির খাঁটী নিদর্শন নয়।

আপনভাব নিয়ে থাকলেই নাকি স্বার্থপরতা করা হয়? বৈশিষ্ট্য বর্জনই নাকি খুব মহত্ত্বের লক্ষণ? কিন্তু সবশুদ্ধ খিচুরী পাকিয়ে যে জীবনের কি উন্নতি হয়, তা এখনো ধারণা হয়নি! ভাবুকতার চেয়ে নিষ্ঠার সহিত যে যা-ই করছে তাকেই শ্রদ্ধা করি। সাধন ভজন তপ-জপ সব কিছুকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়ে—বিশ্ব-উদারতায় দিন দিন অবনতি ছাড়া তো উন্নতি হচ্ছে না।

একটা কথার ধূয়া উঠেছে আশ্রমের কি প্রয়োজন, বিবিক্ত সাধনার কি প্রয়োজন! খুব সুন্দর কথা—সংসারে থেকেই সব হতে পারে। কিন্তু কৈ এ কথাতেই তো মানুষের তৃপ্তি আসছে না। বাস্তবিকই সংসারে থেকে যখন নিরুপদ্রবে সাধনা চলতে পারবে—তখন আর মানুষের মনে বাড়ী-ঘর ছাড়ার বাসনাই জাগবে না। আমি বলি—"আচ্ছা দেখি না এতে কি হয়" এরূপ ধারণা নিয়ে শত্রুর মাঝে, প্রলোভনের মাঝে থেকে দিন দিন জীবনী-শক্তির অপচয় করার চেয়ে, স্বার্থপরতাও যদি হয় তবু নিভৃত সাধনায় অনেক হিত! তারপর নিজকে জানার দরুণ যে সংযমের প্রয়োজন, একে স্বার্থপরতা বললেও তো ত্যাগ করতে পারি না।

আগুনের মাঝে হাত দিলে যদি হাত পুড়েই, তাহলে আগুন থেকে দূরেই সরে থাকতে হবে। বিশ্ব-সঙ্গীতে যদি তোমার মন-প্রাণ উদ্দীপিত না হয়ে ওঠে—তাহলে দৈনন্দিন প্রার্থনাই তোমার পক্ষে হিতজনক। অনুকরণ করা নয়—যাতে বাস্তবিকই হিত হয় তোমার, তারই অনুষ্ঠান কর। নাই বা রইল তোমার নাম বিশ্ব-দরবারে। তাতে ক্ষতি কি!

আত্ম-চিন্তায় ডুবে যেতে না পারলে, অপরের কথা দূরে থাকুক নিজের জীবনের গভীর তত্ত্বও অপরিস্ফুট থেকে যায়। সত্যিকার কিছু লাভ করতে হলেই স্তব্ধ হতে হবে—আত্মস্থ হতে হবে। অসময়ে মানুষকে পীড়ন করে বিকৃত করাতে কি লাভ? বেশ তো, যে আপন মনে থাকতে চায় থাকতে দাও না—তার কাছ থেকে হয়ত একটা গভীর সন্ধানও পেতে পার। মানুষ একটু দূরে সরতে চাইলেই এত কটাক্ষই বা কেন থাকবে তোমার! তাহলে তুমি তোমার কথাকেই একমাত্র পথ বলে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছ!

তোমার আশঙ্কা এতে ভণ্ডামী আসতে পারে; কিন্তু বিশিষ্ট একটা সাধনার ধারা ধরে না চলে—কেবল উদার মত পোষণ করে চলাতেও কি ভণ্ডামী আসতে পারে না? এর চেয়ে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দাও—যে যার আত্মার বাণী শুনে সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যাক! অযথা উদারতায় তো পেট ভরে না, পুষ্টি হয় না!



অক্ষয় ভাণ্ডার

—*‡0‡*—

সে দিনটী গিয়াছিল বেশ।—পূর্ণতাকে যেন প্রাণে পাইয়াছিলাম। প্রভাতের প্রেরণা সারাদিনের পথের আলো হইয়া আগে আগে চলিয়াছিল। চাহি নাই, তবু কত পাইয়াছি: আবার চাহিয়াও তো কোনদিন বিমুখ হই নাই। আজ প্রভাতে সেই পুলকশিহরণই আমার প্রাণে জাগিল—কাহাকেও বিমুখ করিও না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারী তুমি—তোমার কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে, এ দুঃখ কি সহ্য হয়? পরিপূর্ণ বসন্ত-শোভা আজ তোমাকে বিলাইবার জন্য ডাকিতেছে—শীঘ্র স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া আসিয়া ধ্যানে বস।—শুভ্র-শুচি চেষ্টা অনুরণনে প্রতি রোম-কূপ তোমার দিব্য-প্রেরণা মুখরিত হউক।

কেন এ সংসারে আসিয়াছিলাম, জানি না। কি কাজের কাজ তিনি করাইতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। শুধু বুঝিতেছি—ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। এই কি প্রাণের টান? কোন লোকলৌকিকতা নাই, কেন যুক্তিবত্তা নাই।—শুধু শুধুই খামখা আনন্দে হিয়া দুরু দুরু করা—এই কি তাঁর আকর্ষণ? কে বলিবে, এই ভাবে টানিয়া লওয়াই জগতের সব চেয়ে বড় কাজ নয়? কাজের অহঙ্কার আজ কি বলিবে?

আমি তাঁহাকে স্বরূপে দেখিতেছি। তাঁর কোন গুণে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসি নাই। কিসে যেন টানিয়া আনিয়াছে। আর সবার তুলনায় গুণ তো তাঁর কিছু কমও নয়। কিছু চাহিতে ইচ্ছা হয় না—চাহিবার ভাষা যুয়ায় না। শিশু-হৃদয়ের ভাষাহীন বেদনা আমি—আর ঐ তো আমার আশ্রয়, যেন সুধাস্যন্দমান মাতৃ-বক্ষ। তিনি যে আমাকে চাহিয়া চাহিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়াছেন—আমি আবার চাহিব কি! আমি যে তাঁর মাঝে ডুবিয়া আছি।

বিশ্ব সংসার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে—শুধু তুমি, তুমি—ওগো তুমি! এ বশ্যতা কি নূতন? এ বেদনা কি আর কখনো পাই নাই? কে যে আড়াল হইতে অলক্ষ্যে আমাকে পথে টানিয়া আনিল—নিজেই তুমি ব্যক্ত করিবে,. পরিপূর্ণ ভরসায় জাগিয়া বসিয়া আছি। সবই তোমার—আমার কিছুই নাই। সব এলাইয়া যায়—তবু কে যেন ধরিয়া রাখে, বাঙ্গাল হইতে দেয় না।

ধীরে ধীরে জীবন স্তব্ধ হইয়া আসিল। কত কথা বলিবার ছিল তার—সব আজ বেহাত হইয়া গিয়াছে—বুঝি বা তোমার হাতে গিয়া পড়িয়াছে। শুধু আঁচল ভরিয়া কুড়ানো ছাড়া আমার আজ কাজ নাই। আবার অঞ্জলি তো ঐখানেই যাইবে। আমার ভয় নাই, ভাবনা নাই—সব তুমি সুদে-আসলে মিলাইয়া দিয়াছ!……

হঠাৎ ভাবি, এই ভাবুকতা করিতেই কি সংসারে নামিয়াছিলাম? প্রশ্নের উত্তর দাও না—শুধু মিষ্টি-সিজম্‌এর হাসি হাস। দ্বন্দ্ব মিটে না—বুঝি বা মিটিবার নয়। তাই আর অগ্রাহ্য করা হইল না। কার উপর সংশয় এ?—কাজও কি তোকে ভালবাসে না? কাজ—কাজ! 'কাজ' বলিয়া সংসারে আবার একটা কিছু আছে নাকি? কে করায়—কে করে—কিই বা করি? কোথাও কি কিছু ঠেকিয়া আছে! সত্যি কি ইচ্ছা করিলেই কিছু করিয়া ফেলা যায়? কেবল প্রশ্ন, প্রশ্ন—অগণিত জিজ্ঞাসা!

সত্যি কি আমার কিছু চাহিবার নাই? কিন্তু সে যেন আমার হইয়াও আমার নয়। চলিতে চলিতে ঠেকিয়া পড়িলেই মনে হয়, বুঝি বা চাহিবার ছিল। আসলে যে কিছুই চাহিবার নাই। তবু বলি—প্রাণে-মনে ঐক্য করিয়া বলি—যে যা চায়, সে তা পায়! আবার এও সত্যি—কিছু জানি না, বুঝি না, লোভ রাখিতে নাই, অভিমান দড়াইতে নাই!

১৩৩২এর সান্ধ্য-মিলনের কথা মনে পড়ে। তুমি বলিয়াছিলে—"প্রার্থনার বড় আর সাধনা নাই। মন যখন খারাপ হয়, প্রার্থনা করিস্! বুক ভরিয়া পাইবি—আমি তোর অলক্ষ্যে সহায় আছি!" প্রার্থনা কাকে বলে জানি না। যখন যার অর্থ না পাই, স্তব্ধ হইয়া তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকি, ভাষার জিজ্ঞাসা ভাবে গম্ভীর হইয়া উঠে; তারপর ভাবের নীহারিকা হইতে ভাষার জগৎ কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে, তুমিই জান। তখন পাওয়ার স্পর্দ্ধা দেখিতে পাই না কিন্তু হারানোর ব্যথা মিলাইয়া যায়। এই কি গড়িয়া তোলা?—এই কি অলক্ষ্য সহায়? আমি তো আমার জায়গাতেই বসিয়া আছি মনে হয়—তুমিই কি নামিয়া আস?

ভরসাতেই ভরিয়া গিয়াছি আজ—হাতে-কলমে কিসের হিসাব করিব? তুমি ভার লইয়াছ—আর আর ভার বহিতে আমার আপত্তি নাই, আমার অহঙ্কার নাই! আমাকে নিশ্চিন্ত করিলে, পূর্ণ করিলে—তোমার কাছে কোনদিন ঠকি নাই তো! আজই বা কিসের সংশয়ে উদ্ধত হইয়া প্রশ্ন করিব—আমার জীবনে পাইবার কিছু আছে কিনা! আজ আয়রে ভাই সব, তোদের বুকে করি—আমার সকল অভিসার মিলন-সুধায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে!—আজ আমাকে আমার মধ্যে ধরিতেছে না!……

কাজের কথা বলিতে পারিলাম না—তোরা মাপ করিস্ ভাই! শুধু ঐ আনন্দের খবরটী দিতে আসিয়াছিলাম। পূর্ণতা বলিতে হয় বলিস্, অপূর্ণতা বলিতে হয় বলিস্—আমি সব স্বীকার করি, তোদেরও আজ আমি সবই পূর্ণ দেখিতেছি। ভাবের পূর্ণতা হইতে এক কণা বিচ্যুতি আজ নাই কাহারো—যদিই বা কিছু খসিয়া পড়ে, তা সফল কাজে ফলিয়া উঠিতেছে যে! নাই, নাই—সব দিয়াছি, সব নিয়াছ—আছে শুধু তোমার আকর্ষণ; ঐ একটী ঝঙ্কারে সবাই এক সুরে বাজিতেছি! কিসের ভয়ে পিছাইয়া আসি? কেনই বা আগাইয়া চলিবার স্পর্দ্ধা করি? এ কোন্ অপরূপ তৃপ্তি আমাকে আজ ধ্যানস্থ করিতেছে! তোরা কি তার কিছুই জানিস্ রে?……

ওগো রাজ-রাজেশ্বর! আমাদের নিয়াই তো তোমার রাজত্ব! হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতেছি আজ! শুধু আছ এই জানি—কি করিতেছ, করাইতেছ সে হিসাব রাখি না। আরো জানি—আমরা সবাই তোমার ব্যথার ব্যথী—আমাদের হৃদয় তোমার অক্ষয়-ভাণ্ডার!……একটী সার্থক দিনের স্মৃতি সেই ভাণ্ডারে জমা দিলাম।



বকলমা

—*—

গীতায় আছে—"কালেনাত্মনি বিন্দতি।" কালক্রমে সকলেই আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। কিন্তু সাধক-প্রাণ কি কেবলমাত্র এই বাক্যটীর অছিলাতেই তাহার অন্তরের অনির্ব্বাণ মুক্তি-লাভের পিপাসাকে নিবারণ করিতে পারে? তাই বলি, বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই যে, ধৈর্য্য ধর—কিন্তু ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের দরুণ যেন সর্ব্বদা একটা সচেষ্ট আকুলতায় তোমাকে উদ্দীপিত রাখে! লাভের আশায় যেন দিন দিন তোমাকে জড়ত্বে পাইয়া না বসে, তাহার দরুণই এই সতর্ক বাণী!

কবে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে এই আশায় বসিয়া মানুষ দিন কাটাইতে পারে? তাহা হইলে বলিতে হইবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নাই—মানুষ প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। অর্থাৎ প্রকৃতি যেদিন মুক্তি আনিয়া দিবে—সেদিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু মানুষ তো এই ভাবে নীরবে দিন কাটাইতে কিছুতেই পারে না। চেষ্টার উদ্বোধন দ্বারা ফল-লাভ সহজেই হইতে পারে এই বিশ্বাসে মানুষ—"কালেনাত্মনি বিন্দতি" এই কথাটী জানিয়াও আত্ম-চেষ্টায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করে না। এই বিশেষ ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবেই মানুষ—মানুষ হইতে পারিয়াছে।

অনেক সময় দেখি ভরসার বাণীতে আমাদের বড় ক্ষতি করে। গুরু-শিষ্য দিয়াই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—গুরু অনেক সময় শিষ্যকে অনেক উপদেশ দেন, ভরসা দেন, কিন্তু তাঁহার ভরসা দেওয়ার অভিপ্রায় এই নয় যে শিষ্য ফাঁকী দিতে শিখে, আলস্য-জড়ত্বকে দিব্যি প্রশ্রয় দিয়া গুরুর ঘাড়ে সব দায় চাপাইয়া খালাস হইয়া যায়! নিশ্চিত-ভরসা পাইলে শিষ্যের ভিতর সত্য লাভের পিপাসা আরও বৃদ্ধি পাইবে এই ভাবিয়াই গুরু শিষ্যকে আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু গুরুর বাক্যের কদর্থ করিবার যথেষ্ট বুদ্ধিই আমাদের ঘটে আছে!

মনে পড়ে এক গুরুর কথা নিয়া শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর কি একটা ভুল বুঝার ধুয়াই না চলিয়াছিল। উপদেশচ্ছলে গুরু একদিন শিষ্যমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না, শুধু আমাকে ধর।" কথাটা ঠিক গীতার—"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"রই অনুবাদ। কিন্তু শিষ্যেরা শেষের কথাটী বাদ দিয়া, কিম্বা একেবারে ভুলিয়া গিয়া শুধু "তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না" এই কথাটী বেশ করিয়া ধরিয়া বসিল। এইরূপ ভণ্ডামীযুক্ত নির্ভরতায় শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হইতে লাগিল। বৎসরান্তে গুরু যখন আবার শিষ্যদের বাড়ীতে গেলেন তখন এক এক শিষ্য আসিয়া বলিতে লাগিল—"কোথায় ঠাকুর! আপনি না বলিয়াছিলেন আমাদের কিছুই করিতে হইবে না"—কিন্তু এতে তো আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হইল না। গুরু তো শুনিয়া অবাক্—কতক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীর শান্ত স্বরে শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমি কি বলিয়াছিলাম একবার তাহা ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া দেখিও তো।" তারপর আর কি, একজন আর একজনের মুখের দিকে কেবল চাওয়া-চাওয়ি করে। এই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, এই-

রূপ নিজের রুচি অনুযায়ী মহাপুরুষের বাক্যের কদর্থ করিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে যে আমরা কত দোষ চাপাই তাহার ইয়ত্তা নাই।

"কিছুই করিতে হইবে না" এই কথা ঠিক বটে, কিন্তু নির্ব্বিচারে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনও বড় সহজ কথা নয়। সংশয় নিয়া শুধু গুরু রুষ্ট হইবেন ভাবিয়া গুরুর কথার সায় দিয়া গুরুকে তুষ্ট করিতে চায় অনেকেই—কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ? নাক-মুখ, চোখ-কান সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, ভিতরে বৃত্তির-ক্রিয়াও বেশ রীতিমতই চলিতেছে—তবু যদি ভান করিয়া বলি আমি নির্ব্বিকার, ইহাতে ক্ষতি হইবে কার?

আগা-গোড়া তলাইয়া দেখিলে সব কথারই সামঞ্জস্য রহিয়াছে। গুরু বলিয়াছিলেন—"কিছুই করিতে হইবে না—শুধু আমাকে ধর" এই সহজ কথাটীর মাঝে যে কত প্রাণপাতী সাধনার প্রয়োজন—কত অচল-অটল বিশ্বাস থাকা চাই—যাহারা এই কথাটীর মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। গুরুকে আত্ম-সমর্পণ করা এত সহজ নয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে পর অর্জ্জুনের অবিশ্বাস ভঞ্জন হইয়াছিল। কিন্তু এই দিব্য চক্ষু পাইতে অর্জ্জুনকে কম সাধ্য-সাধনা করিতে হয় নাই।

কালে সকলেই আত্ম-জ্ঞান লাভ করিবে—ইহা তো সার্ব্বভৌম ভরসার কথা। কিন্তু ইহাতেই তো তোমার আকুলি-বিকুলির নিরসন হয় না। তারপর শ্লোকেই রহিয়াছে দেখিতে পাই যে—"জ্ঞান লাভ করিবে কে?—না, শ্রদ্ধাবান্, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি।" কাজেই আত্ম-সাধনার স্পষ্ট উল্লেখই তো রহিয়াছে ইহার মাঝে। তেমনি "কিছুই করিতে হইবে না"—কিন্তু গুরুকে ধরা চাই। এই গুরুকে ধরিতে হইলেও যে কত সাধনার প্রয়োজন তাহার ইয়ত্তা নাই। কাজেই ফাঁকির কথাটা তো কথার মাঝে নাই—আছে আমাদের মনে।

"কালেনাত্মনি বিন্দতি"—এই কথাটী প্রথম যিনি বলিয়াছিলেন, তাহার অন্তরেও বোধ হয় আত্মজ্ঞান লাভের দরুণ কম ব্যাকুলতা ছিল না। স্বয়ং ব্রহ্মাও বলিয়াছিলেন—"তপস্যা কর, তপস্যা কর। ভরসা যদি পাইয়া থাক তাহা হইলে তো তোমার খুব ভাগ্যই বলিতে হইবে—কিন্তু খবরদার ফাঁকি দিতে শিখিও না, সাধনায় শৈথিল্য প্রকাশ করিও না। মনে রাখিও, আলস্য জড়তা মুক্তির পরিপন্থী!

আদর্শ যদি বাস্তব-জীবনেও ফুটিয়া না উঠিল, তাহা হইলে তাহাকে আদর্শ বলি কেমন করিয়া? আত্মজ্ঞান লাভ তোমার একদিন হইবেই—ইহাতে যদি তোমার অটল বিশ্বাস হইয়া গিয়া থাকে—তাহা হইলে আর তোমার হা-হুতাশা হইবে কিসের দরুণ? তখন তুমি সদা-প্রফুল্ল, সদা শুচি। অপবিত্রতা তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না—কেননা আদর্শের ভাবনায় যে তুমি তন্ময়!

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই নির্ভরতায় মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলে, অবশ্য খাঁটী নির্ভরতার কথা বলিতেছি না। আশ্চর্য্য বোধ হয় মানুষের অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া, অন্য সবের বেলায়ই আপ্রাণ খাটীতে পারি কিন্তু আধ্যাত্মিকতা লাভ করিবার বেলাতেই বিনা সাধনে ফল লাভ করা চাই। ইহা হইতে বড় hypocrisy আর কি থাকিতে পারে?

তারপর বিশ্বাস কি মানুষের সহজে আসে? "বকল্‌মা দেওয়া" মুখের কথা নয়। আর বকল্‌মা দিলেই বা কি তার পরদিন হইতেই কি সে নিশ্চিন্ত? খাটী বকল্‌মা দিলে—ইষ্টের শুভ ইচ্ছার অনন্ত স্পন্দন তোমার বক্ষকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে। খাঁটী কাজ আরম্ভ হইবে সেই দিন হইতেই। গিরিশ ঘোষ যে দিন হইতে বকল্‌মা দিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ দেবকে—সেই দিন হইতেই তাঁহার অন্তরের আকুলতা

আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল দেখিতে পাই। "বকল্‌মা" দেওয়াতে যেন তাঁহার ভিতর একটা নব শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। আর ইহা তো অসম্ভব নয়—দুটী মহৎ ইচ্ছার সম্মিলন যেখানে সেখানে শক্তির উদ্বোধন না হইয়া থাকিতেই পারে না। এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ কি না করিতে পারে?

অর্জ্জুনকেও শ্রীকৃষ্ণ বারংবার এই 'বকলমা' দেওয়ার উপদেশই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'বকলমা' দিতে গিয়া, আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া অর্জ্জুনকে কম সংশয়ের মাঝে হাবুডুবু খাইতে হয় নাই—তারপর তাঁহার চিত্তে প্রশান্তি আসে, ইষ্টের শুভ ইচ্ছার দীপ্তিতে তাহার শঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। যেদিন অর্জ্জুন নিঃসংশয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেন, সেই দিন হইতেই কোথায় গেল অর্জ্জুনের দৈন্য, কোথায় গেল আত্মীয়-স্বজনের মায়া; নির্ভীক্ চিত্তে ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হইয়া অর্জ্জুনের জীবনে খাঁটীকাজ আরম্ভ হইয়া গেল সেই দিনই। কাজেই বলি ভাই, তুমি যদি গুরুকে ঠিক ঠিকই আত্মসমর্পণ করিয়া থাক—তহা হইলে এক মিনিট সময়ও তোমার ফুরসুৎ নাই। রাতদিন ব্যাকুলতায় তুমি অস্থির থাকিবে। ইষ্টের শুভ ইচ্ছার বিদ্যুতে তোমার অন্তর সর্ব্বদা উদ্ভাসমান থাকিবে—তখন তুমি স্পষ্ট দেখিবে কে যেন হাত ধরিয়া তোমাকে উপরের দিকে টানিয়া তুলিতেছে। কোথায় থাকিবে জড়ত্ব, আর কোথায় থাকিবে ভণ্ডামী! শুধু ব্যাকুলতা—শুধু ব্যস্ততা কতদিন তোমায় বিহ্বল করিয়া রাখিবে? শক্তি যেখানে কোন দিক দিয়া ব্যাহত না হয় সেখানে শক্তির আশ্চর্য্য বল দেখা যায়। শিষ্যও যখন গুরুর ইচ্ছার বিরোধী না হয় তখন শিষ্যের মাঝেও এক প্রচণ্ড শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। তখন গুরু হইতে শিষ্যই শক্তিমান্ হইয়া উঠে। অবশ্য এখানে শিষ্যের কোন কৃতিত্ব নাই—গুরুশক্তিরই ক্রিয়া হইতেছে বুঝিতে হইবে।

গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাসই হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তোমার জীবন আলোয় আলোময় হইয়া উঠিবে। "কিছু করিতে হইবে না" ইহারও এক নূতন ব্যঞ্জনা পাইবে তুমি। চিত্ত তোমার কৃতজ্ঞতায় বিনত হইয়া আসিবে। অবশ্য কৃতজ্ঞতা দ্বারা তুমি ঋণ শোধ করিয়া ফেলিবে এরূপ কল্পনাও তোমার মনে আসিবে না—কিন্তু তবু যে তোমার মন-প্রাণ আকুল না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ইহাই হইল বিশ্বাসবান্ শিষ্যের খাঁটী অন্তরের কথা।

উপনিষদেও আছে—"যমেবৈষ বৃণুতে"। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের দরুণ যাহার ভিতর চেষ্টা নাই, আকুলতা নাই তাহাকে বোধ হয় আত্মা যাচিয়া বরণ করিতে যান নাই। সহজ কথায় বলিতে গেলে যে যাহা চায় তাহার ভিতর তাহার দরুণ পিপাসা না জাগিয়া পারে না।

খাঁটী নির্ভর হইলে কোনরূপ ভণ্ডামী থাকিবে না। প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইহাদের মাঝে কোন ভণ্ডামী ছিল? "হরি সর্ব্বত্র আছেন" এই কথা শুনিবামাত্রই হরির দরুণ তাহারা পাগল হইয়া উঠিল। ঈশ্বর আছেন, কালে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে—এই সব তো জানা কথাই—কিন্তু এই জানা কথাতে তো তৃপ্তি আসিতে পারে না। আমি যাহাকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, তিনি সর্ব্বত্র থাকাতে না থাকাতে আমার কি! কেবল সার্ব্বভৌম উপদেশে তো প্রাণে শান্তি আসে না!

বাস্তবিক ভরসাই যদি পাইয়া থাক—তাহা হইলে কৃতকার্য্যতা তো তোমার নিঃসংশয়ই। কৃতকার্য্য হইতে তুমি তখন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাইবে না কি? যে ভরসা পাইয়াছে, সে বলও পাইয়াছে! অন্তর যাহার ঘোর তমসাবৃত—সে কিছুই পায় নাই! গুরুতে যাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহার আবার অধঃপতন হইতে পারে, ইহা কি কখনও সম্ভব? সে অন্যায় করিতে পারিবে না, অন্যায় তাহার মাঝে প্রশ্রয়

পাইবে না—শুভ্র প্রেরণা-মণ্ডিত ভাগবত জীবন লাভ হইবে তাহার।

সাত্ত্বিকতার তো একটা বহির্লক্ষণও আছে—সাত্ত্বিক মানুষকে দেখিলে অপরের ভিতরে সাত্ত্বিক প্রেরণা জাগে। সদ্‌গুরুর সংশিষ্যকে দেখিলে অপরেও আনন্দ পায়। কিন্তু কৈ তুমি নিজেই আনন্দ পাইতেছ না—অপরকে আনন্দ দিবে কি? তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার ভিতর ভণ্ডামী আছে। মুখে বলিয়াছ যে বিশ্বাস করিয়াছি—কিন্তু মনে-প্রাণে তোমার অন্য কথা।

প্রবঞ্চনা করিয়া যদি কোন কিছু লাভই করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সত্যলাভই বা করিবে কেমন করিয়া!—না সত্যের special favour আছে অর্থাৎ অসত্যকেও সত্য প্রশ্রয় দেয়? বুঝিয়া শুনিয়াও মানুষ সত্য-লাভের বেলায় এই ভণ্ডামীটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে না! অর্থাৎ আমার সব বজায় থাকিবে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়া বেশ দিব্যি আরাম করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখে দিন কর্ত্তন করিব—অথচ সত্য লাভ হইবে আমার। ইহাকেই কি queer-logic বলে না। অথচ এই অদ্ভুত যুক্তিই অহরহ শুনিতে পাই।

বুঝিয়া-শুনিয়াও মানুষ মানুষ-গুরুর উপর যে কি করিয়া এইরূপ অন্যায় দাবী করিয়া বসে তাহা বুঝিতে পারি না। তাহারা আর সব বিষয়েই যুক্তিবাদী, কিন্তু গুরু কৃপা লাভের বেলায় কোন যুক্তিই উদিত হয় না তাহাদের মনে। অর্থাৎ যে যাহাই করি না কেন, গুরু যেন কৃপা করিতে, কিম্বা শিষ্যকে উদ্ধার করিতে বাধ্য। এই অন্যায় আব্দারে ক্ষতি হইলেই বা কার হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়!

অবশ্য ইষ্টের উপর ভক্তের একটা জোর আসে; কিন্তু এই জোর ইষ্টের দরুণ কিছু না করিলে আসিতে পারে না। "ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা"—কিন্তু বলি, ভক্ত ভগবান্‌কে বাঁধিলেন কি করিয়া? শুধু মুখের কথায়—না প্রাণ বিনিময়ে?

বিশ্বাস আসিতেছে না, বেশ তো কাতর-প্রাণে গুরুর কাছে আত্ম-নিবেদন কর, কিন্তু খবরদার অন্যায় আব্দার করিয়া যেন নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই না কর! "পারিলাম না" কথায় কৃপা-সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু কিছু না করিয়াই গুরু-বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হইতে বড় ভণ্ডামী আর নাই। এসব ক্ষেত্রে আত্ম-গোপনের চেয়ে, আত্ম প্রকাশই কল্যাণকর!

তারপর এই যে ফাঁকী দিতে গেলে, ইহাতেই বেশ বুঝা গেল, গুরুকে অন্তর্য্যামীরূপে তুমি বিশ্বাস কর না। আর যদি বল বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা হইলে তোমার সত্যিকার আভ্যন্তরীণ সংশয়কে গুরুর কাছে প্রকাশ করিয়া খুলিয়া বলিয়া নিরসন করিয়া নেওয়াতে তোমার আপত্তি কি?

তলাইয়া যাইবার পথে যদি মনে হয়—আচ্ছা, দেখিই না একবার কি হয়, তাহা হইলে আরও তলাইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। গুরুর কথায় তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, বেশ তো একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিন দিন নয়, চতুর্থ দিনে গুরুর কাছে গিয়া প্রশ্ন নিয়া হাজির হও! গুরু তখন একটা না একটা উপায় করিবেনই। আর সময় মতের আবেদন কখনো অগ্রাহ্য হয় না—এই কথা নিশ্চয় জানিবে।

ভরসা তোমার মাথার মাণিক—কিন্তু এই বলিয়া দৈনন্দিন সাধনার প্রতি যেন তোমার উপেক্ষা না আসে। "কালেনাত্মনি বিন্দতি"—বেশ তো কাহারও জীবন ব্যর্থ হইবার নয়, সকলেরই একদিন আত্ম-জ্ঞান লাভ হইবে—কিন্তু পাতঞ্জল শাস্ত্রে আছে, "তীব্র-সংবেগানাম্ আসন্নঃ"—ইহা কিন্তু উড়াইয়া দিবার কথা নয়।

সাধন ভজন করিতে পার না, অক্ষম তুমি, তাহা হইলেও তুমি কৃপার পাত্র, কিন্তু ফাঁকি দিলে সব দিকে তোমার সর্ব্বনাশ। আত্ম-চেষ্টার উদ্বোধন না হইলে গুরু-বাক্যে তোমার বিশ্বাস হইয়াছে এই কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না!

———:*:———

রূপান্তর

—(*)—

[শিক্ষা-প্রসঙ্গে]

"আচ্ছা, এই যে ছেলেদের সম্মুখে যৌন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে—এতে কি তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া করবে না ? আর যে চিন্তা হয়ত অনেক-দিন পরে জাগ্‌ত, তাকে অসময়ে উদ্বোধিত করাতে যে কি লাভ তা, তো আমি কিছুই বুঝ্‌ছি না। বড় দাদার এই উদারতার প্রতি আমার একটা বড্ড অশ্রদ্ধা। আমি দেখ্‌ছি তিনি ছেলেদের সচেতন করতে গিয়ে আরও বেশী সর্ব্বনাশ করছেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতেও যুক্তিতে সবদিক দিয়েই তিনি আমার শ্রেষ্ঠ, কাজেই তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে যাওয়া আমার বাচালতা মাত্র "

এরূপ অনেক কথা বলে মনের আক্ষেপে রমেশ-বাবুর ছোটভাই উমেশ আমার পড়ার ঘরের টেবিলের অপর পাশে একটা চেয়ারে হঠাৎ এসে বসে পড়্‌ল।

কথাগুলো শুনেও আমি পুনরায় উমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলি হয়েছে কি ?"

আমার কথা শুনে সে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বল্‌লে, "আর বলিস্‌ না ভাই, দাদা সব ছেলেগুলোর মাথা খেতে বসেছে! উনার মত হচ্ছে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভাল মন্দের ভিতর ছেলেদের স্বাধীনতা দিলেই নাকি তারা আত্মোপলব্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাবে। ছেলেদের কোন একটা দোষের কিম্বা উৎ-পাতের কথা বল্‌লে তিনি বলেন, স্বাধীনতা দেওয়াতে যে মন্দটুকু ঘটেছে তাতে ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই—এ আপনি শুধ্‌রে যাবে। বড় রকমের স্বাধীনতা দিলেই নাকি ভিতরের সঙ্কোচ আপনি কেটে যাবে। এসব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার হাড় জলে গিয়েছে। একটু শাসন নাই, একটু পীড়ন নাই—এভাবে কি ছেলের কোনদিক দিয়ে উন্নতি হতে পারে ? তারপর ইদানীন্তন তাদের সঙ্গে অবাধে অনেক গুহ্য-রহস্য সম্বন্ধেও আলোচনা চল্‌ছে। এতে নাকি ছেলেরা আগ থেকেই সচেতন হবে। এসব বিষয়ে রাত-দিনই বিশ্লেষণ চল্‌ছে। সাইকোলজি জানে না বলেই নাকি ছেলেরা বেশী বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, তাই আগ থেকেই তাদের সাইকোলজি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি বলি, যার নাম শুন্‌লে নাকি জিবে জল আসে—দিন রাত্র তার আলোচনায় তার স্মৃতিতে সব দিক দিয়ে ক্ষতি করে না কি ? বরঞ্চ একদম প্রতি পক্ষভাবনাই সব চেয়ে কল্যাণকর।"

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা ভাই উমেশ, আমি যদি এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি, তাহলেতো রাগ করবি না তুই ?"

উমেশ প্রত্যুত্তরে বল্‌লে, "তা কেন করব ? আমি তো এ সম্বন্ধে ভাই তোর মত জান্‌তেই এসেছি। হয় আমাকে আমার ভুল বুঝিয়ে দে, নয় তো আমার কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার কর্‌ তোরা।"

"আচ্ছা ভাই! প্রথমেই আমার একটা কথার জবাব দে তো দেখি! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি যদি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিই হয়ে থাকে—তাহলে তার স্ফুরণও অবশ্যম্ভাবী।"

উমেশ বল্‌লে "হাঁ, তা তো ঠিকই।"

"আচ্ছা, তা যদি ঠিকই হয়ে থাকে, তাহলে সে সব বৃত্তির ভাল মন্দ উভয় দিক দেখিয়ে ছেলেদের আগ থেকেই সাবধান করে দেওয়া কি মঙ্গলজনক নয় ?

যে কাম-বৃত্তির অপব্যবহারে মানুষের বিকৃতি ঘটে—তাকে যদি সংযম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়—তাহলে সেই কামই তো প্রেমে রূপান্তরিত হবে! কাজেই কামবৃত্তি সম্বন্ধে যদি ভাল-মন্দ দু'টা দিকই জানা থাকে—তাহলে মন্দের দিকে যেমন মন টান্‌বার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি উল্টো ভালর দিকেও মন ধাবিত হতে পারে! অনেক সময় প্রতিকারের আর কোন উপায় নাই ভেবেই আমরা জেনে-শুনেও নিজেরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করি। আর কিছু নাই হোক, অন্ততঃ সাইকোলজিটা যদি জানা না থাকে—তাহলে মনে তো একটা সংশয় জাগ্‌বে? আর অচেতনের মত নির্ব্বিচারে প্রকৃতির প্রলোভনের স্রোতে ভেসে যাবার চেয়ে, সজ্ঞানে যদি দু'একবার স্খলনও হয়, তাতেও বরঞ্চ লাভ! আমরা অনেক সময় মনে করি—অজ্ঞতার মাঝে আটক রাখ্‌লেই বুঝি—বৃত্তির উপদ্রব থেকে ছেলেদের রক্ষা করা যায়। এতে আরও হয় কি রুদ্ধ-স্রোত বন্যার প্লাবনের মত শেষে কোন সংযমের বাঁধনই মান্‌তে চায় না। বরঞ্চ যে ছেলের সবদিকে চোখ ফুটেছে (অবশ্য সংযমী আচার্য্যের শিক্ষানুকূলেই) তার পতনাশঙ্কা কম। বিভীষিকা দূর থেকেই—কাছে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখি এর উল্টো ব্যাপার।"

"তারপর রমেশবাবুকে তুই বেশী উদার বলে অপবাদ দিচ্ছিস্। জানিস্‌ই তো ভাই, এমন একটা পাশবিক stage আসে মানবজীবনে—তখন যেই স্বার্থে বাধা দিতে যায় তার প্রতিই পশুর মত প্রতিহিংসানল জ্বলে উঠে; কিন্তু একটুখানি সহানুভূতি, একটুখানি উদারতারই তখন বেশী কাজ করে। কেননা মন্দের কোন stageই চিরস্থায়ী নয়। চেতনা যখন ফিরে আসে, তখন দুর্দ্দিনেও যে উদার দৃষ্টি দ্বারা সহানুভূতি দ্বারা হিত কর্‌তে চেয়েছিল, তার প্রতি স্বাভাবিকই একটা শ্রদ্ধা জাগে। মানুষ যতদিন পাথর না হয়ে যাবে ততদিন তার উত্থান-পতন, ভাল-মন্দ স্খলন থাকবেই। কিন্তু faillureসকে সহানুভূতির দৃষ্টিদ্বারা support করাই হল মহৎ-প্রাণের পরিচয়। আর এটা ঠিক, মানুষকে শ্রদ্ধা করে, মহৎ ভেবে যত কল্যাণ করা যায়, আর কিছুতেই তেমন হয় না। কি জানি একটু ছেড়ে দিলেই একেবারে তলিয়ে যায় ছেলে, এরূপ একটা আশঙ্কা তোর লেগেই আছে। তাই চোখে চোখে রেখে, কিম্বা কঠোর সংযম দ্বারা ছেলের জীবনের উন্নতি করার এত ঝোঁক্ তোর! কিন্তু মানুষ যে পশু নয়—তার মন বস্তুটী অত্যন্ত সজাগ, কাজেই পশুর মত মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্‌লেই, কিম্বা খাঁচায় পুরে রাখ্‌লেই সকল উপদ্রব হতে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হল না।"

"আমি অবশ্য রমেশবাবুর পক্ষ নিয়েই কথাগুলো বল্‌ছি না—আমার যা অভিজ্ঞতা তাই প্রকাশ করে যাচ্ছি। শ্রদ্ধা করা আর ভয়ে ভক্তি করা কিন্তু এক নয়। একটীর মাঝে সহজ ভাব—আর একটীতে ভণ্ডামী। আমার মনে হয় রমেশবাবু এই যে উদারতা দেখান্, এতে ছেলেদের কোনদিক দিয়ে অকল্যাণ ঘটে না, আর তাই যদি হত তাহলে ছেলেরা তাকে এত শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌ত না। মানুষের প্রতি বিপুল বিশ্বাস তাঁর রয়েছে—ইহা আত্ম-ব্যাপ্তিরই নিদর্শন। আর এ ঠিক, সঙ্কীর্ণ হৃদয় নিয়ে ভিতরে পদে পদে আতঙ্কের ভাব রেখে কখনো ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া যায় না।"

"তুই বল্‌ছিস, রমেশবাবু ছেলেদের সঙ্গে অবাধে অনেক গুহ্য বিষয়েরও আলোচনা করেন। আমি বলি এই আলোচনাতেই যদি ছেলেদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়, তবে যাক্ না সে দুর্ব্বল-জীবন ধ্বংস হয়ে! আর স্নায়ুগুলো এত দুর্ব্বল থাক্‌লেই বা চল্‌বে কেমন করে? তারপর দু'দিন পরে তারা তো সবই বুঝ্‌তে পারবে। এ কথা জেনে রেখো, যে-কোন অজ্ঞানতাই মানুষের পক্ষে অভিশাপ। এর চেয়ে মহৎ শক্তির প্রভাবে সব দিক্ দিয়ে চোখ ফুটিয়ে তোলাই বেশী কল্যাণকর।"

"আর একটা কথা বলি, তোর কাছে এসে কয়টা ছেলে প্রাণের কথা বলে বল্ তো দেখি! তোকে রীতিমত ভয় করে ওরা। কেন, এর কারণ কি? এই যে আত্ম-গোপন করে ছেলেরা তোকে ফাঁকি দেয়, এতেই কি তুই গৌরব অনুভব করিস্? মুখে একভাব আর প্রাণে অন্যভাব থাকাটাই কি ছেলের পক্ষে মঙ্গল? অবশ্য তুইও ছেলেদের মঙ্গল চাস্, কিন্তু ছেলেদের ত্রুটী-বিচ্যুতিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পারিস্ না, এই যা তোর দোষ! এখানেই তোর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা রয়েছে!"

"তারপর রমেশবাবুর শিক্ষার রীতি আমি নিজ চোখেও দেখেছি। হাজার খারাপ একটা বিষয় নিয়েও যদি তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন, তাহলেও নিজের মহৎ-শক্তি দ্বারা এটাকে ছেলেদের সাম্‌নে এমন করে ধরেন যে ছেলেদের মনে কুধারণা জন্মাবার চেয়ে—এর মাঝ থেকেও ছেলেরা একটা মহৎ-শিক্ষা লাভ করে। আসল কথা হল আচার্য্যের শক্তি নিয়ে। তোকে ভয় করে ছেলেদের যে চরিত্রের উন্নতি হয়, এ স্থায়ী নয়—বরঞ্চ রমেশবাবুকে ভালবেসে, শ্রদ্ধা করে ওদের চরিত্রে একটা স্থায়ী মহৎ-ভাব সঞ্চারিত হয়! তারপর রমেশবাবু একটু liberal বলেই যে তিনি অন্যায়কেও প্রশ্রয় দেন তাতো নয়—তবে কিনা ছেলেদের দোষ ত্রুটী দেখ্‌লে তিনি এমন ভাবেন না যে এই বুঝি ছেলে একবারে গোল্লায় গেল! আমি বলি, এই গেল গেল বলে চীৎকার করে তুই কয়টা ছেলেকে ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধার কর্‌তে পেরেছিস্ বল্ তো দেখি!"

"রমেশবাবু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারীই নন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কেবল পুঁথিপড়া অভিজ্ঞতাই নয়—তিনি তপস্যা দ্বারা, সংযমের দ্বারা অনেক বিষয় নিজে উপলব্ধি করেছেন। ছেলের মনের কথা বুঝতে হলে তুই বাইর থেকে কি বুঝ্‌বি? অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। আমার কথায় সায় দিতে বলি না, কিন্তু একবার তুই তলিয়ে চিন্তা করে দেখিস্ আমার কথাগুলোর কোন তাৎপর্য্য আছে কিনা। তারপর অপরকে liberty দেওয়াও কম শক্তির প্রয়োজন নয়। এই তো তুইই তার দৃষ্টান্ত—তোর তো আতঙ্কে মন কেবল কাঁপে, কি জানি স্বাধীনতা দিলে ছেলের আরও অবনতি ঘটে! অবিশ্বাস প্রবল বলেই তোর মনে কেবল dark sideটাই বেশী করে জাগে!

"থাক্, কথায় কথায় অনেক কথাই বলে ফেল্‌লাম—এখন তোর আর কোন বক্তব্য থাকলে খুলে বল্। আমার কথায় রাগ করিস্ নে তো?"

উমেশ কতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তারপর বল্‌লে, "যাক্, আজ তোর কাছ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে একটা নূতন Light পেলাম।"

আমি বল্‌লাম, "আমার কাছে আর কি পেলি—তোর দাদার কাছ থেকে তোর আরও অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে। বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে একবার তার সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করে দেখিস্ তাতে তোর অনেক দিকের অজ্ঞানতা, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি উন্মোচন হয় কি না!"

এরপর উমেশ বাড়ী চলে গেল। এখনও উমেশের সঙ্গে আমার দেখা-শুনা হয় কিন্তু তার চরিত্রে এমন এক রূপান্তর এসেছে—তা দেখে আমার পর্য্যন্ত আনন্দ হয়, ঈর্ষা হয়!



অসাধনের ধন

—*‡0‡*—

জগতের বুদ্ধিতে সাধ্য-সাধনার যত মূল্যই থাক্ না কেন, চিরকাল অসাধনের ধনেরই জয় গাহিয়া চলিব। মানুষকে তিনিই মরমী করিয়াছেন, দরদী করিয়াছেন; ধারণাতিরিক্ত প্রেমানন্দে ডুবাইয়া মারিয়াছেন। তাঁহার কৃপা, তাঁহার খুসী—তাঁহারই জয় হউক। আমাদের ব্যক্তিগত অভিমানকৃত প্রচেষ্টা স্তিমিত হউক।

সাধনা যে জীবনে থাকিবে না তাহা নহে—আমার কোন কেরামতী তাহাতে থাকিবে না। সাধনা কর্ম আর আমি তার কর্ত্তা—এই বুদ্ধি নয়, সাধনা হইবে স্বভাব; ইহাই সাধনার রস। নীরস গতানুগতিকতার মূল্য অত্যল্প—তাহার কাছে রসের আশা ছাড়িয়াই চলিতে হয়; বরঞ্চ নিজের মনের রস দ্বারাই গতানুগতিকতাকে সিক্ত রাখা প্রয়োজন পড়ে, নতুবা সে দিশেহারা হয়। ছট্‌ফটিতে সাধনা হইতে পারে না, অভাবের ব্যাকুলতা আর বেদনার চঞ্চলতার মাঝেও একটা সূক্ষ্ম নিবিড় আনন্দের স্পর্শ যদি প্রাণকে ছুঁইয়া না থাকে, তবে সাধনা হয় না।

ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক, অস্থির হইয়া পড়িলে কিছুতেই ফল ভাল হইবে না। একদিকে প্রাণ জ্বলিবে, আর একদিকে ভরসায় বুক ভরা থাকিবে—ইহাকেই বলি যথার্থ 'বেদনা।' এই বেদনাই জীবনরহস্য। ইহা যে সাধকের ভিতর জাগে নাই, সে সাধনা করিবে কি জোরে?

আমার জীবনের সঙ্গে আমি যতক্ষণ বিজড়িত, বিপর্য্যস্ত, ব্যস্ত, ততক্ষণ ঠিক আন্তরিক প্রেরণা পাইবার যোগ্য হই নাই বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক আমার বলিয়া করিবার কিছুই নাই, তব-প্রেমামৃতসাগরে আমি বুদ্বুদ মাত্র; তবু আমারদ্বারা কিছু করাইয়া লওয়া যদি তাঁহারই অভিপ্রেত হয়, সে জন্য আমার মাঝে যে ভাব জাগিবে, তাহা স্নিগ্ধ ব্যাকুলতা—উগ্র বুভুক্ষা নয়। তাঁহার জন্য জ্বলিব বটে, সুখে, মহাসুখেই জ্বলিব। বিরহজ্বালা যে আমাকে নিকট করিতেছে, ইহা যদি বুঝিতে না থাকি, তবে বলিব, তাঁহার প্রতি ভালবাসা আমার জন্মে নাই—তাঁহার কাছে এখনো স্বার্থসুখ-তৃষ্ণা মিটাইবার দাবীই করিতেছি!

যাহারা সাধনা করে, তাঁহার জোরেই করে। প্রথম কথাই হইল, ভাগ্যে যা জুটিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তারপর সাম্রাজ্যই জুটুক আর গাছের তলাই জুটুক, সমান গর্ব্বে, সমান আদরে গ্রহণ করিব। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে "সাধনা" মনে করি, উহা জীবনের স্তর মাত্র—ধীর পদবিক্ষেপে তাহাকে পার হইয়াই যাইতে হইবে, ঐখানেই সব কিছু পাইয়া ফেলিবার লোভ করিলে উহা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। যাঁহার সংসারে আছি, তাঁহার দরদটাও একটু একটু বোঝা উচিত। শুধু তোমার দুঃখটাই ভাব, আর তোমার জন্য তাঁর কি একটুও দুঃখ হয় না মনে কর? তোমার জীবনের চরম দায়িত্ব যদি লইতে পারিতে, তবে বহু পূর্ব্বেই তোমাকে দেওয়া হইত। যাহাকে সাধনা করিতে হইবে, নিজের বুদ্ধিরও অতীত প্রবল এক অনির্ব্বচনীয় বস্তুর প্রেরণায় পাগলের মত সে ছুটিবে—তাহার নিজ দেহ, নিজ জীবন হইয়া ব্যস্ততা থাকিবে না—এক কথা, সাধনা সেই সাধকের দ্বারা তিনিই করাইয়া লইবেন। আত্মশক্তির নাম দিয়া নিজের অভিমানের জয় চাহিও না—বাধা দিও না।

সময় হইলে ফল পাকে। জীবন সম্বন্ধেও ঐ কথা। সত্য সত্যই যে বস্তুটী তোমার দরকার, সেইটির জন্যই যে তুমি ব্যাকুল হও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা নয়; বিচার করিলে এ সব জল্পনা চিত্তের জঞ্জাল বলিয়াই বিবেচিত হইত। সাধনার ইচ্ছা যদি অজ্ঞানকৃত বুদ্ধিবিজৃম্ভণ না হয়, তাহাকে প্রণাম করি। কিন্তু সাধ্য-সাধনার ব্যস্ততা যদি তাঁহার ইচ্ছাকেও ছাড়াইয়া উঠে, উহা কি অনধিকারচর্চ্চা নয়? শুধু এক মুহূর্ত্তের একটুখানি আচম্‌কা ইচ্ছায় সবটুকু তুমি পাইয়া ফেলিতে চাও, ইহা তোমার মূঢ়তা নয় কি? যদি সাধনা করিতেই হয়, কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাহা করিয়া আসিতে হইতেছে, কত শত জীবনের অপূর্ণ আশা হয়ত এক জীবনে মিটিবে,—সে চেষ্টা একটী প্রশান্ত আবেগরূপে তোমাকে সর্ব্বদা এই জীবনপথে জাগাইয়া রাখিবে—উহা কি লাফালাফি আর মাতামাতিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার জিনিষ? সত্যিকার সাধন-চেষ্টা যাহার জাগিবে, সে নীরবে ধ্যানস্থ হইবে। অর্থাৎ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচেষ্টাও তাহার জাগিবে—'পাইনি পাইনি' বলিতে বলিতে একটু একটু করিয়া সে পাইতে থাকিবে। স্থির বিশ্বাসে পল গুণিয়া গুণিয়া সে দিন কাটাইবে—কেননা সে তো জানে, তিনিও তাহার কবে সময় হইবে সেই প্রতীক্ষায় পল গুণিতেছেন। আমাদের কাজ শুধু অধিকারী হওয়া—অধিকার তো তিনি দিয়াই রাখিয়াছেন।

একটী অনির্ব্বাণ চেতনাময় সম্বিৎ অন্তরে না জাগিলে চলিবে কি করিয়া? আত্মচেষ্টার সাময়িক বিজয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি বলিয়াই তো দুদিন পরে রিক্ততার কবলিত হইতে হয়। এটুকু সর্ব্বদাই জানিতে হইবে—যাহা পাই, তাহাই চরম নয়। এতটুকু চাহ বলিয়াই এতটুকু পাইয়া থাক; না চাহিয়াও শুধু জাগিয়া থাকিয়া প্রতীক্ষায় থাকিয়া যাহা পাইতে তাহার তুলনায় ইহা অত্যল্প। আমাকে অল্পে তুষ্ট দেখিয়া কখনো তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে না। আর তাঁহার অতৃপ্তিই আমার হৃদয়ে রিক্ততার কম্পন তোলে; যখনই রিক্ত হই, তখনই বুঝিতে হইবে—কোথায় যেন অল্পে তুষ্ট হইয়া মজিতে চলিয়াছিলাম, তিনি ডাকিয়াছেন—মোহ ভাঙ্গিয়া আবার উঠিয়া পড়িতে হইবে। যাহা পাইয়াছ, ইহাই চরম ভাগ্য ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইতে পার যদি, তিনিই সাধিয়া আসিয়া বরণ করিবেন।

যথার্থ সাধনা ইহাই। যাহা উভয় পক্ষেই সমজাগ্রত। তুমি তোমার জন্যই ব্যস্ত—তাঁর কথা তো ভাব না! যদি ভাবিতে, বরং ফিরিয়া যাইত! মধুর স্বস্তি অল্পের মাঝেও তৃপ্ত রাখিত! পিছাইয়া থাক, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়; আবার মাতামাতি করিয়া বিশৃঙ্খলা বাধাইয়া বসিলেও তো সকলেরই অসুবিধা। একই বেদনা তাঁর প্রাণে তোমার প্রাণে বাজিয়া উঠুক। তুমি তুমিই থাক না! তিনি তিনিই থাকুন না! কারো কর্ম্মক্ষেত্র কেহ বাহিরে দখল নাই বা করিলেন! আসল কথা ঐ প্রাণের মিল—তোমার প্রাণে তাঁর প্রাণে এক সুরে বাজিয়া উঠা। এই সিদ্ধে সাধ্যে একত্বই তো খাঁটী সাধনা। তোমার অধিকার তুমি ছাড়িয়া দিলে, তাঁর অধিকার তো তিনি সর্ব্বদাই ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। তবু কি খোয়া গেল কিছু?—কোনোমতেই না! এই যুগলমিলনসিদ্ধ অনাদ্যন্ত অনুভবই তো সাধনার প্রাণ! বাহিরের দু'চারটা কালোবাতীর লোভ আমাদের ভুলাইবে? সাধ্য কি তার?

জীবন ভরিয়া যেন এই সাধনাই চলিতে দিতে পারি—যাহা আমার জন্মজন্মান্তরের **সহ-জ** সাধনা। উহা আমার জীবনেরই অন্তরসত্য। সত্য ভুলিয়া বাহিরের ঐশ্বর্য্যে মজিয়া জীবনকে জটিল করিয়া তুলি না যেন। আমার যাহা সাধনা, তাহা আমার ভিতর চলিতেছেই—সুরে সুরে আমার প্রাণের বাঁশী পূরিয়া তিনিই তাহা করিতেছেন।

ভীরু মন, একথা বিশ্বাস করিতে ভয় পাইবে কি ?

মুহুর্মুহুঃ জানিতেছি—সাধনা কর্ম্ম নয়, সাধনা স্বভাব ; অথবা, সাধনা সাধকেরই কর্ম্ম, সাধকের প্রাণে প্রাণে গাঁথা স্বাভাবিক কর্ম্ম। শান্ত সমাহিত সহজ প্রণিধানে সাধক আর সাধ্য উভয়ে মিলিয়া তাহা করিয়া যাইতেছেন। এক পক্ষের ব্যস্ততা আর এক পক্ষের ব্যগ্রতাকে অবিশ্বাস করে বলিয়াই প্রাণ পোড়ে। নতুবা যাহাতে প্রাণ পুড়িতেছে, ঠিক তাহাতেই প্রাণ পূরিত। সর্বদা বলি, ওগো আমার অসাধনের ধন ! যেন বিশ্বাস না হারাই।

আমায় তুমি পূর্ণ করিবে, তাহা ক্ষণে ক্ষণেই তো জানিতেছি। পূর্ণ না করিয়া তুমি পার না, আমারও পূর্ণ না হইয়া সোয়াস্তি কই ? তোমায় আমায় সহজ মিলন—ইহার মাঝে সাধনার অন্তরাল, উহা যে আমারই স্বরচিত শৃঙ্খল, ভুল করিয়া পরিয়া বসিয়াছি। ভুল ভাঙ্গিয়াছ, ধরা দিয়াছ—আর কেন ? আমার সর্ব্বস্বই তো তোমার হইয়া রহিল। কিসের বিচার, কিসের প্রস্তুতি—ও তো আমার নয়।—তোমার ইচ্ছায় যা হইবার হইতেছে। তুমি যাহা দাও তাহাই লইব। যাহাই করিব, তাহা ব্যস্ত হইয়া করিব না—লোককে জানাইবার জন্য করিব না।

বিচারের গৃহে তোমার স্থান নয়, অন্তরের অন্তঃপুরের তুমি। যদি তোমার সাধ হয় সুর সাধাইতে, তাহা সাধাইও—আমি কিছুতেই ব্যস্ত হইব না, উদ্বিগ্ন হইব না।

চিন্তামণি

'নাই' বলে সব উড়িয়ে দিলেও থাকে যাহা বাকী,
সে তো নয় গো ফাঁকী !
নিঃশেষে সব বিলিয়ে দিলেও হয় না যে ধন খালি,
তারেই আপন বলি !
এমনি করে সীমার শেষে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি,
তাঁরেই বলি গুণী—
তিনিই চিন্তামণি !



হিমাচলের পথে

—(*)—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—প্রাতে ব্রহ্মচারীজির হাতে আশ্রম ও ধর্ম্মশালার উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই এক-একটি টাকা দান করে। ভাগিরথী-গঙ্গার পশ্চিমপাড় দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে বেলা ৮টার সময় **উত্তরকাশী** যেয়ে পৌঁছি। নাকুরী হতে উত্তরকাশী মাত্র ৬ মাইল। কিন্তু পথ অতি সুন্দর—বরাবর সীধা, চড়াই উৎরাই মোটেই নাই। বাংলার বড় বড় নদীর পাড় দিয়ে যেতে যেমন আনন্দ লাগে, আজ তেমনিই অতি আনন্দের সহিত ভাগিরথী গঙ্গার পাড় দিয়ে, ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছি—কোনরূপ কষ্ট হয় নাই—বরঞ্চ আনন্দ হয়েছে। উত্তরকাশীতে অনেক ধর্ম্মশালা থাকলেও বাবা কালী-কম্বলীবালার ধর্ম্মশালাটী ভাগিরথী-গঙ্গার উপরে বলে তাতে আড্ডা নেই। নাকুরী চটী হতে আসার সময় ৫ মাইল পথ অতিক্রম করে একটী সন্ন্যাসীর আশ্রম পাওয়া যায়। সেটাও অতি সুদৃশ্য আশ্রম—কিন্তু নাকুরীর আশ্রমের মত মনোরম নয়।

উত্তরকাশী
৬ মাইল

উত্তর-কাশীতে অনেক পাণ্ডার বাস, আমরা আসার সময় একজন পাণ্ডা প্রায় মাইলখানেক দুর হতেই আমাদের অভিনন্দন করে এনে দখল বাগিয়ে রাখলো। পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গে বেলা ১০টার সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে সঙ্কল্পাদি করে স্নান করে এলাম।

এখানে ভাগিরথী-গঙ্গার জল বেজায় ঠাণ্ডা—সবই বরফগলান জল এবং অত্যন্ত ঘোলা। এ কয়দিন পর্ব্বতে খুব বৃষ্টি হওয়ায় ভাগিরথী গঙ্গার জল খুব ঘোলা হ'য়েছে। প্রত্যেক যাত্রীরই সঙ্গে কিছু কিছু **ফিটকারী** রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। আমরা বিশেষরূপে জানি, যখনই কোন বড় নদীর ধারে থাকতে হ'য়েছে বা নদীর জল পান করতে হয়েছে, তখনই ঘোলা জলের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছি। ফিট্‌কারী সঙ্গে থাকলে সে অসুবিধাটা কেটে যায়। এ ছাড়া নীচের দিকের পাহাড়ে অত্যধিক গরমে অনেক লোকেরই চোখ উঠে, তারা ফিটকিরির জল ব্যবহার করলে বা ফিটকিরির জল দ্বারা চোখ ধুলে চক্ষুরোগও আরোগ্য হয়ে যায়। ফিটকিরি ঘষে বৃশ্চিক দংশিত স্থানে লাগালেও খুব উপকার হয়। পাহাড়ে অনেক সময় কলেরা লাগে, তখন ফিটকিরি দিয়ে জল পরিষ্কার করে নিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বাবা কালীকম্বলীবালার বড় ধর্ম্মশালাটি পূর্ব্বেই যাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হ'য়ে যাওয়ায়, আমরা তারই পাশে, তাদেরই নুতন দোতালা ধর্ম্মশালায় জায়গা নিয়েছি। এ ধর্ম্মশালাটির দুই দিক একদম খোলা—কোন আবরণ নাই। দ্বিপ্রহরের আহারের পর এমন প্রবল জোরে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, যাতে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত। ঘরটি পাকা নয়—কাঠের থামের উপর টীনের চাল দেওয়া, দু পাশের দেওয়াল মাটী ও পাথর দ্বারা গাথা। ঝড়ের প্রবল বেগে আমরা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে রইলাম—এই বুঝি ঘর শুদ্ধ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়! চুপ করে বসে শশব্যস্তে 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' জপ করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক পাগলা-ঝড়ের চোখরাঙ্গানী সহ্য করে

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেলাম দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমরা রক্ষা পেয়েছি কিন্তু উত্তর-কাশীর অনেক লোকের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে গেছে—গাছ-পালা অনেক ভূমিসাৎ হয়েছে—স্কুল ঘরটির অর্দ্ধেক অংশের কোন খোঁজ-খবর নাই—পাহাড়ের ঝড় এমন প্রবল—এমনই উন্মত্ত পাগল বিশেষ।

এখানে খাবার জিনিষ-পত্র এ পথের অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশ সস্তা, কিন্তু কোন শাক-সব্জি মিলে না—এমন কি আলু পর্য্যন্তও নয়। খুব ভাল পুরাতন বাঁশমতী চাউল ৷৷৹ আনা, খোসা ছাড়ান ভাল ডাল ।৵৹ আনা, ঘী দু'টাকা, চিনি ৷৷৹ আনা, আটা ।৹ আনা, ভাল মোটা দানা সুজী ৷৷৹ আনা সের। বাবা কালীকম্বলীবালার ওখানে সদাব্রত পাওয়া গেল। এখানে সদাব্রতের সঙ্গে একটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ও আছে।

হৃষিকেশে যেমন সাধু-সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা আছে, এখানেও তেমনিই সাধু-সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা বিদ্যমান। হৃষিকেশে যেমন অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বিরাজিত থেকে, বানপ্রস্থাবলম্বী পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট গৃহস্থের তৃষিত কণ্ঠে সর্ব্বদা সদুপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ মুক্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব আছেন, এখানেও সেইরূপ নানাপ্রকার লোককে সাধু-সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ বিরাজিত থেকে, লোককে সর্ব্বপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করতঃ মুক্তির পথ তথা ভগবৎ ভক্তি-লাভের দুর্গম-মার্গ সুগম করতে সর্ব্বদা রত। হৃষিকেশ যেমন লোকে লোকারণ্য—ছত্রশালায়-ধর্ম্মশালায় অধিষ্ঠিত সাংসারিক লোকের কলরবে সর্ব্বদা সোরগোল, এখানে কিন্তু লোকজনশূন্য নির্জ্জনভাবে সাধু মহাত্মাগণ ধর্ম্মশালায় বা ছত্রশালায় বা নানাপ্রকার আশ্রমে অধিষ্ঠিত থেকে সর্ব্বদা একান্ত ভক্তিযুতচিত্তে ভগবৎ

হৃষিকেশ ও উত্তরকাশীর পার্থক্য

আরাধনায় নিমগ্ন! এখানে কোন হট্টগোল নাই—কোনরূপ বাদ বিসংবাদ নাই—কোনরূপ প্রবঞ্চনাদি নাই—কোনরূপ হিংসা-দ্বেষ নাই—কোনরূপ অশান্তি-দুঃখ নাই—সর্ব্বদাই সকলে যেন ভগবৎভাবে বিভোর! যে সকল সজ্জন সর্ব্বদা একান্তে সাধন-ভজন করে কালাতিপাত করতে চান, তাঁদের পক্ষে এ স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রকার শান্তিদায়ক এবং সাধন-ভজনের বিশেষ অনুকূল। হৃষিকেশে যেমন প্রত্যহ দু'বেলাই ছত্রে ছত্রে রুটী ডাল ইত্যাদি ভিক্ষা পাওয়া যায়, এখানেও সেইরূপ সকাল বেলা ৫টী ছত্র হ'তে এবং বিকেলে একটি ছত্র হ'তে সাধু-সন্ন্যাসী মহাত্মাদের রুটী বিতরণ করে থাকে। এ ছাড়া এ বৎসর আরও দু'টী অতিরিক্ত ছত্রশালা খুলেছেন—সে শুধু এ বৎসরেই জন্য। কারণ এবার কুম্ভমেলা হওয়ায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা তীর্থভ্রমণে বের হবেন বলে, তাঁদের সেবার জন্য ধার্ম্মিক সজ্জনগণ কর্ত্তৃক এমন ব্যবস্থা! ধন্য তাঁরা! যাঁরা এমন নিঃস্বার্থভাবে সাধুদের সেবায় দেহ-মন-প্রাণ-অর্থ আদি দান করতঃ তাঁদের সাধন-ভজনের সহায়তা করেন।

সবগুলি ছত্রশালা বারমাস খোলা থাকে না। সবগুলি খোলা থাকবার দরকারও করে না—যখন গঙ্গোত্তরীর পথে যাত্রীগণ চলাচল করেন, সেই সময় সবগুলি ছত্র খোলা থাকে। আবার যাত্রী চলাচল বন্ধ হলেই, কতকগুলি ছত্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুটা ছত্র বরাবর খোলা থাকে, সাধুদের অন্নদান করে সাধন-ভজনের সহায়তার জন্য তৎপর থাকে। এমন পবিত্র সুন্দর স্থান জগতে কয়টা থাকে জানি না!

আমি হরিদাস ভায়ার সঙ্গে বিকেলে পূর্ব্বদিকে প্রায় একমাইল দূরে অবস্থিত কৈলাসাশ্রমে রুটী ভিক্ষা করতে গেলাম। কৈলাসাশ্রমটীও গঙ্গোত্তরীর পথের ধারে, পাহাড়ের কোলে নানাবিধ ফল ফলারির গাছে পরিবেষ্টিত—অনেকটা নাকুঠির আশ্রমের মত স্নিগ্ধ শান্তিযুক্ত। একটী ছোট ঝরণাও বহু-

কষ্টে আনা হয়েছে—তাতে ঝির ঝির করে সর্ব্বদাই জল পড়ছে—জলের সামান্য কষ্ট। কিন্তু সামান্য উৎরাই করলেই ভাগীরথী গঙ্গার প্রবল জলের ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আমরা সেখান হতে রুটী ডাল ভিক্ষা করে সন্ধ্যেবেলা ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম। রাতে অরহর ডালের খিচুরী খাওয়া গেল—মনে হচ্ছিল যেন বিষম জ্বরাভিভূত হয়ে সুমধুর মুখরোচক সাবুদানা খাচ্ছি! এমন বিশ্রী! আজ সাবিত্রীচতুর্দ্দশী ব্রতের উপবাস বিধায় বড়মা উপবাস করে থাকলেও কিন্তু সন্ধ্যাবেলা প্রায় আধসের পরিমাণ জিলাপী দ্বারা উপবাসের মানরক্ষা করতে ভুলেন নাই। হিন্দুস্থানী কিনা! তাই জিলাপীর বড্ড ভক্ত!

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ৩০শে সোমবার

উত্তরকাশীস্থ আমাদের পাণ্ডা ঈশ্বরী দত্তজী (বাংলার কায়স্থ নয়—ব্রাহ্মণ) অতি ভদ্রলোক। কোনরূপ খামখেয়ালী, বা জোরজুলুম কিম্বা চাহিদা বেশী নয়। তাঁর ব্যবহারে আমরা বেশ সন্তুষ্ট হয়েছি। আমাদের হুকুম তামিল করবার জন্য তিনি সদাই উদ্‌গ্রীব থাক্‌তেন। যাঁরা এ পথে যাবেন, তাঁরা একেই পাণ্ডা করলে উপকৃত হবেন—কোনরূপ প্রবঞ্চনা নাই—গরীব কিনা, তাই একটু ধর্ম্মভীরু!

ভাগিরথী গঙ্গা দ্বারা উত্তরকাশী তিনদিকে বেষ্টিত। ভাগিরথী গঙ্গা পূর্ব্বদিকস্থিত কৈলাসাশ্রমের পাশ দিয়ে ক্রমে দক্ষিণ দিকে অনেক দূর যেয়ে, পশ্চিমাভিমুখী হয়ে অনেক দূর এসে, উত্তরমুখী হয়ে বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালার পাশ দিয়ে খানিক দুর উত্তর (উত্তরবাহিনী হওয়া চাই) দিকে গিয়ে, আবার পশ্চিম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হচ্ছেন। উত্তর কাশীতে ভাগিরথী গঙ্গা উত্তর বাহিনীর জন্য বারাণসী-কাশীর সমতুল্য তীর্থ বলে লোকের বিশ্বাস এবং শাস্ত্রেও তাই বর্ণিত আছে। বরং শাস্ত্রে আরও পাওয়া যায়—কলিকালে পাপী তাপী জীবগণের পাপের ভারে ধরা যখন নুইয়ে পড়বে এবং সকল দেশ যখন যবনাধিকৃত হবে, তখন বারাণসী কাশী অভিশপ্ত হয়ে অন্তর্হিত হবে এবং শিবজী ভগবান উক্ত কাশীতে বিরাজিত থেকে কলি-উপহত জীবের মুক্তিদানে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত হবেন। কেদার খণ্ডের অন্তর্গত এই বারাণসী ক্ষেত্রে স্নান, পূজা, জপ, তপ হরিগুণগান করলে এবং এখানে মৃত্যু হলে অনন্ত ফল লাভ হয়। এই উত্তরকাশীধামও পঞ্চক্রোশী এবং ভুবন-বিখ্যাত পরশুরামের তপস্যার স্থান বলে বর্ণিত—তাঁর মন্দিরটীও বহু পুরাতন।

বারাণসী কাশীর মতই উত্তরকাশীতেও নানাবিধ মন্দির এবং অনেক ঘাট বিদ্যমান—যথা, শ্রীশ্রীকাশীবিশ্বনাথ, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, কালভৈরব, গুরু-দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, দুর্গাদেবী, লক্ষেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, মহাদেব, গণেশ, অম্বিকেশ্বর, দেবদর্শন প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির এবং কেদারঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, গোঘাট, ব্রহ্মকুণ্ডঘাট, রুদ্রকুণ্ডঘাট, বিষ্ণুকুণ্ড-ঘাট, জ্ঞানরূপীকুণ্ডঘাট, অসিসঙ্গমঘাট, বরুণাসঙ্গম-ঘাট, দশাশ্বমেধঘাট প্রভৃতি ঘাট বিদ্য-

উত্তর কাশীর মন্দিরাদি

মান। মহারাজা ভরত (যাঁর নাম হতেই ভারতবর্ষ নাম হয়েছে) এখানে উৎকট তপস্যা করে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এখানে জড়ভরতেরও একটী মন্দির বিদ্যমান।

শ্রীশ্রীকাশীবিশ্বনাথদেবের মন্দিরের সামনে একটী প্রায় ২০ হাত লম্বা ত্রিশূল প্রোথিত আছে। এর গাত্রে কোনও ভাষায় কি লেখা আছে আজ পর্য্যন্তও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিম্বদন্তী

শক্তি

যে এই "শক্তি" ত্রিশূল দেবাসুরের যুদ্ধের সময় মহিষাসুর নিহত হওয়ার পর আদ্যাশক্তির হাত হতে এখানে পতিত হয়েছিল, তাই উক্ত ত্রিশূল "শক্তি" নামে কথিত হয়। দশনামী সন্ন্যাসীর "পুরী" সম্প্রদায়োক্ত সন্ন্যাসীগণ দ্বারাই শ্রীশ্রীকাশী

বিশ্বনাথজীর পূজাদি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তাঁরাই উক্ত মন্দিরের মোহান্ত।

উত্তরকাশীধামের আদিম রাজা ভুবনবিখ্যাত একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়ধ্বংসকারী মহাপ্রতাপশালী মহারাজা পরশুরাম দেবের সম্মান ও পূজার ব্যবস্থা সবচেয়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। ভগবান শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দেব পরশুরামের অস্ত্রশিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন।

পরশুরাম

পরশুরাম দেব ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র-শিক্ষার্থে এই স্থানে বসে, দেবাদিদেব মহাদেবকে কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট করলে, তিনি আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অস্ত্রশিক্ষা দেন। তদনন্তর পরশুরাম নিজের রাজধানীতে গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীকে স্থাপন করে পূজাদি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আশুতোষ শিব মরকতমণি সদৃশ লিঙ্গ মূর্ত্তিতে এখানে বিরাজমান হন। সেই হতেই ভগবান শিব উক্ত কাশীর একছত্রাধিপতি দেবতা। এ ছাড়া পরশুরামের আরও একটী বিশেষ সম্মান আছে —হিমালয়স্থ এদিকের গ্রাম্য দেবতাগণ প্রতি বৎসর মাঘ মাসে উত্তরকাশীতে আগমন করতঃ আপন আপন আয়ানুসারে ১০১৲, ৫১৲, ২৫৲, ২১৲, ১১৲, ৫৲ টাকে হারে ভেট করে যান। এতে মনে হয়, পরশুরাম যখন একছত্রাধিপতি রাজা ছিলেন, তখনি অন্যান্য গ্রাম্য দেবতাগণও, তাঁর নিকট পরাজিত হয়ে উক্ত স্থানে কর দাখিল করতঃ আপন আপন রাজ্য বা স্থান পরিচালন করতেন—নতুবা এ ভেট দেওয়ার প্রথা কেন? (ক্রমশঃ)

হাত ধরে

হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোর—
শোকে আনন্দে আশায় ও ভয়ে,
রয়েছ যে তুমি নিকট হয়ে,
জানাও সে কথা—ঘুচাও ঘোর!
হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোর।

সংশয়ে যদি মঙ্গলময়—
তোমাতে বিরাম মনে নাহি লয়,
নাহি যেন ভুলি স্নেহের ডোর—
হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোর।

হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোর—
সুখের লাগিয়া এ দুখানি হাত,
নাহি ডরে পরে করিতে আঘাত;
বাঁধিও তাদের হরিয়া জোর—
হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোর।

অবশ অঙ্গে আঁধার নয়নে,
বাড়াইব হাত শেষের শয়নে—
ধরিও তখন হৃদয়-চোর—
হাত ধরে তুমি নিয়ে যেও মোর।



আরণ্যক

—*—

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

শরতের সুনীল আকাশে দু'পাখা মেলে দিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত চলাই জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বভাবের উপরেও রাজা হয়ে মনকে উর্দ্ধমুখী করে দিন দিন উন্নতি করার যে চেষ্টা, তারই নাম সংযম। তারও শিক্ষা এই জীবনেই। নতুবা অমনভাবে চলা তো প্রবৃত্তির পথে চলা। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" এ বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যা দুঃখময় বলে ভয়ের কিছু নয়—তুমি যা চাও, তাই আরও স্থায়ী, প্রকৃষ্ট সুন্দর করে তোলার উপায়ের নামই তপস্যা। সে আনন্দ উপভোগের অধিকারও এই জীবন—মনে রেখো।

*　　*　　*

কাউকে যদি ভালবাস, তার সু-কু বাদ দিয়ে নয়—গোটা মানুষকেই ভালবাস্‌বে। ডান-হাতখানা নিয়ে বাঁ-হাতখানা নিয়ে কি কর্‌বে? বরং যতদিন আয়ত্ত করতে না পার, সু-টা নিয়ে থেকো—কু' সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

*　　*　　*

কেবল 'নাই' 'নাই' নয়—বল্‌তে হবে শুধু আছেই আছে। যারা কেবল নাই-নাই করে, তাদের হাবাতে ঘর হতে লক্ষ্মী ছুটে পালায়, কাজেই সে নাই-নাই শব্দ তখন কায়েমী হয়ে আসন শক্ত করে বসে। তাই বল্‌তে হবে নাই নয়—হাঁ, আছে। একটু অপেক্ষা করলে পাওয়া যাবে। এ বলা তো মিথ্যা নয়! সত্যিই যে সব রয়েছে, পাওয়ার সাধনায় তর সইছে না, অর্থাৎ যে উপায়ে পাওয়া যায়, তা করবে না—তাহলে আর পাবে কি করে? এত যদি পাওয়ার তাগিদ, তবে সব ছেড়ে ওইটাই পেতে লেগে যাও না কেন? সব পেতে চাও, অথচ কোনটাকেই আঁকড়ে ধরবে না, তবে আর তা টিক্‌বে কি করে? আর এমনি করে যাই কিছু পাও না কেন, তা যদি তোমার ভাণ্ডারে না টিকাতেই পার, তবে তোমার সেই ফুটো-কলসীতে অনন্তকাল ধরে জল ভরলেও তো তা শূন্যই থাকবে! ঘরে তোমার লক্ষ্মী আসবে কি করে? লোকে বলে হাবাতের কাছ হতে লক্ষ্মী পালায়, কিন্তু সত্যি কি লক্ষ্মী নিজে পালায়, না যাতে তিনি পূর্ণরূপে বিরাজ করতে পারেন, সে পথ রুদ্ধ করে দিয়ে আমরাই তাঁকে তাড়াই!

*　　*　　*

আমি চাই আমাকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে। সে আনন্দের তুলনায় সব আনন্দ তুচ্ছ, অথবা ওই তো সব পাওয়ার আনন্দ! সব পেয়েছির দেশ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এই "আমায়" পাওয়ার দেশ। সে দেশ হতে কোনও দেশই বাদ পড়ে না, কোনও কালই বয়ে যায় না—কোনও পাত্রই অভুক্ত থাকে না। আমার আমি নিয়েই এই জগৎ সজীব। আমায় বিনে ত্রিভুবন মিথ্যা—নিরর্থক।

*　　*　　*

প্রাণের সুখ-দুঃখ, শোক ও আনন্দ সমস্তই যখন শুধু তাঁকে নিয়ে হবে, সবটার ভিতরই তাঁর অস্তিত্বই

বিশেষ এক প্রকার সাড়া দিয়ে হৃদয়কে দোলাবে, তখনই তাঁর ঠিক সঙ্গ হবে। এর আগে শুধু মনকে বুঝানো। উদ্দেশ্য তিনি—উপায় আমি।

* * *

যত বড় সংকল্পই হোক্ না কেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত না হলে সব ব্যর্থ। সব চেয়ে আগে আত্ম-সমর্পণ। তারপর তিনি যা করান, তাই বড় কাজ।

* * *

জ্ঞান-প্রেম দুটাই প্রত্যেকের আছে। তাই অহ-ঙ্কার ও দুর্ব্বলতা একা থাকে না। কোনও কিছু বেশী থাকলেই অহঙ্কার—কিন্তু সেখানেই আবার ব্যথা ও দীনতা বা ন্যূনতা আছেই। বুকে প্রবল কোন্‌টা, তাই দেখে সাধন-পথ ঠিক হয়।

* * *

যার যার কর্ম্ম তাকে সেই সেই দিকে টেনে নিচ্ছে। নিজের প্রাণের সুরটী আগে আয়ত্ত কর্‌তে হবে, তবেই জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে। শাস্ত্রের "আত্মানং বিদ্ধি" এরই সঙ্কেত। বহির্জগৎ থেকে মন গুটিয়ে আন্‌বে বটে, কিন্তু তার প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে। কর্ম্মের দেনা মিটাতে হবেই; এবং তা মিটাতে হলেই শান্ত সমাহিত ভাবব্যূঢ়তা চাই। একূল-ওকূল দুকূল রাখা চাই। তারি নাম সামঞ্জস্য—তাতেই সাধনার পরিণতি।

* * *

কি চাই তা বুঝি না: যখন বুঝ্‌তে পারি, তখন দেখি, চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। চাওয়া ব্যাপারটাই মায়া; ধরা পড়্‌লেই বন্ধন মোচন।

* * *

দানপ্রাপ্তি

——):*:(——

[মধ্যবাঙ্গলা সারস্বত-আশ্রমে]

পানীয় জলের [সর্ব্ব সাধারণ হইতে]

জেলা ঢাকা:—শ্রীযুক্ত হরনাথ ধর ২৲ শ্রীযুক্ত রাজমোহন পাল ২৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন সরকার ২৲ যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন ১৲ যদুনাথ রায় চৌধুরী ১৲ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বৈশ্য ১৲ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় ১৲ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কর্ম্ম-কার ১৲ শ্রীযুক্ত মদনমোহন সাহা ১৲ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র বসু ১৲ শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় ১৲ শ্রীযুক্ত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত নবকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী রায় ১৲ খুচরা প্রাপ্ত ৮।০

জেলা ফরিদপুর:—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য ১৲ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দত্ত ১৲ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরকার ১৲ শ্রীযুক্ত বাবুলাল কুণ্ড ১৲ শ্রীযুক্ত অপ্রত্যয়চন্দ্র রুদ্র পাল ১৲ শ্রীযুক্ত গিরিধারী মণ্ডল ১৲ শ্রীযুক্ত যদুনাথ কুণ্ডু ১৲ শ্রীযুক্ত বাবুলাল পাল

১৲ পণ্ডিতসার হাইস্কুল ৪৸৹ খুচরা প্রাপ্ত ১৩৸৶৹

আশ্রমের সাহায্য বাবদে—

জেলা ঢাকা :—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ঘোষ ৪৲ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায় ১৲

উৎসবে, কুমুন

জেলা ময়মনসিংহ :—(বাউসী) শ্রীযুক্ত হৃদয়তারণ সান্ন্যাল ১৲ শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য (ষ্টেশনমাষ্টার) ১৲ পান্নালাল বগর মণ্ডল ১৲ জয়চাঁদ দুলারচাঁদ ১৲ খুচরা প্রাপ্ত ॥৹

ভক্ত-সম্মিলনীতে

জেলা ঢাকা :—শ্রীযুক্ত রাজমোহন পাল ৫৲ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ৩৲ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল ২৲ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র কর্ম্মকার ২৲ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ১৲ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন ১৲ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দে ১৲ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার ১৲ শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর চন্দ ১৲ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চন্দ শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চন্দ ১৲ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে ১৲ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ১৲ শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র দে ১৲ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর পাল ১৲ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র আচার্য্য ১৲ খুচরা প্রাপ্ত ২॥৹ শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ কর্ম্মকার ৫৹ (ঠিকানা অজ্ঞাত) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র কর্মকার ২৲ (ঠিকানা অজ্ঞাত) জনৈক অজ্ঞাতনামা ১৲ শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মেদিনীপুর) ১৲ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র জানা (মেদিনীপুর) ১৲

দার্জ্জিলিং

[সর্ব্বসাধারণ হইতে আশ্রমসেবকগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

মিঃ এস্‌ডব্লিও লেডেন্‌লা সুপারিন্ট অব্ পুলিশ ৫৲ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চন্দ (আসাপুর) ২৲ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চাটার্জ্জি ৩৲ ডাক্তার এস্ এন্ চাটার্জি ৩৲ হাইস্কুলের শিক্ষকগণ ৪।৴৹ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল দত্ত (সাপুর) ২৲ চাঁদমারী পোষ্টাল মেছ ২৲

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব ভুবনমোহন চাটার্জ্জি, রায় সাহেব হরিপ্রসাদ প্রধান, রায় সাহেব এ এন্ অধিকারী হেড্ মাষ্টার, বামাচরণ দাস এ, হেড্ মাষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার হীরালাল ঘোষ, ইনেস্পেক্টর মার্কণ্ডেয় মিহির, এড্‌ভোকেট এন্ সেন, নাজির রামসেবক সিনা, ডাক্তার ইয়েন সিংহ, ডাক্তার চিন্তাহরণ সেনগুপ্ত, ডাক্তার কে, পি, এস্ রায়, ডাক্তার এস্ এস্ দাস, ডাক্তার অতুলচন্দ্র গুহ, ডাক্তার এ, সি, বসু, সেরাপ লামা, সিংমান সিংহ, এস্ কে কুশারী, আশুতোষ চাটার্জ্জি, বি, পি, ঘোষ এণ্ড সন্স, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র কর, ফণীভূষণ মল্লিক, জিতমল এণ্ড ভোজ রাজ, মাষ্টার এণ্ড কোং, এ এন্ গোস্বামী, রাম চাট্টি এণ্ড রামদাস, ভবশঙ্কর ঘোষাল, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গার্ড মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, করকলাল দাস, ষ্টেশন মাষ্টার এস্ এন্ ঘোষ (ঘুম), সাব ইনেস্পেক্টর এ, এম, সিরিঙ্গ, লাকপা সিরিঙ্গ, ডি, সি, চৌধুরী, চাবাগান—মহম্মদ কে, এ, বারি (টুকরিয়া), জি, এন্ সান্ন্যাল, ডাক্তার ইউ, পি, নাগ (বিজয়নগর), ষ্টেশন মাষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত (হাতিঘিসা), ডাক্তার হীরালাল চাটার্জ্জি (সেবিভিউ), রামরঞ্জন চাটার্জ্জি ঐ, নিতাইপদ কর (নিপোনিয়া), সুধালতা দেবী (বেলগাছি), বাসজিদ্ রাম (সরাপুর), শ্রীশচন্দ্র কুণ্ডু (মানঝা), পশুপতি বসু (অরত), সীতানাথ চক্রবর্ত্তী (ত্রিহানা), প্রবোধচন্দ্র সরকার (ব্যাংডোগরা), জটাহারী সরকার (কমলাপুর), পূর্ণচন্দ্র মিত্র (হিন্দুটী), মাখনলাল গুপ্ত, ডাক্তার দীনেশচন্দ্র দাস (দেউমুনী), এম, কে বানার্জ্জি (দমদমা), এইচ্ কে সিকদার, এক্স এইচ কুপার (গুমগুমা), কে সি রায় (কমলা), নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (সাহাবাদ), পূর্ণচন্দ্র সরকার (ঠ্যাংঝোরা) যুধিষ্ঠির ধর (বাগডোগরা), ডাক্তার সর্ব্বরঞ্জন মুখার্জ্জি মহম্মদ ছফিউদ্দিন আহাম্মদ (হাঁসখোয়া), মুকুন্দলাল গাঙ্গুলী,

ষ্টেশনমাষ্টার খগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মাটীগারা), সতীশচন্দ্র বসু (চাম্পাশ্বরী), রাখালদাস বসু (শুকনা), ষ্টেশনমাষ্টার গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ঐ, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (পুটীনবাড়ী), খুচরা সংগৃহীত—দার্জ্জিলিং সহর ৮৲, চাবাগান ১৮।০

শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)

শ্রীযুক্ত রামপদ চাটার্জ্জি ২৲

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত এইচ্ এন্ গুপ্ত এস, ডি, ও, খাঁ বাহাদুর আবুল হায় এস্, ডি, ও, উকিল সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল শিবনাথ মুখার্জ্জি, পেস্কার উপেন্দ্রনাথ দাস, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, ডাক্তার রেবতীমোহন সেন, ডাক্তার ইউ এন্ মণ্ডল, মন্মথনাথ সরকার, রামলছমন, অশ্বিনীকুমার সেন, ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, অনাথবন্ধু পোদ্দার, অন্নদাচরণ বাকচি, বিনয়চরণ মজুমদার, জ্যোতিষচন্দ্র তরফদার, রামদাস খোসলা, অমৃতলাল রায় সরকার, মালগুদাম, শিলিগুড়ি হাই স্কুল, খুচরা সংগৃহীত ৬৲।

জলপাইগুড়ি :—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল ডাক্তার ২৲ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ উকিল ১৲, খুচরা সংগৃহীত ১৲।

কিশেনগঞ্জ (পূর্ণিয়া) – শ্রীযুক্ত জগন্নাথ খিলানী ৪৲, শ্রীযুক্ত কানাইয়া লাল রামনারায়ণ ২৲, শ্রীযুক্ত রামেশ্বরলাল রাউত মল ২৲।

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত মুন্সেফ পরমেশ্বরী দয়াল, মুন্সেফ অবনীধর মুখার্জ্জি, এস্ ডি ও কে পি সিনা, ডিপুটী রবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, ডাক্তার নির্ম্মলচন্দ্র সিনা, ডাক্তার শ্রীপতিকুমার, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাক্তার কুমুদনাথ মৈত্র, সাবডিপুটী বাসুদেব প্রধান, ষ্টেশনমাষ্টার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এস্ সেন, রাখালচন্দ্র রায়, গিরিধারী লাল শম্ভু লাল, শ্রীচাঁদ নাহাটা, ভূপতিনাথ কুমার, খুচরা সংগৃহীত ৯৲।

কাটিহার (পূর্ণিয়া) – শ্রীযুক্ত আর এম ভৌমিক এস্ ডি ও ২৲ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বানার্জ্জি ডাক্তার ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় উকিল ১৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি ১৲ খুচরা সংগৃহীত ২৲।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৩শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৪২ — দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্নয়ে

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩৫।১১-১২]

—*—

ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ননীকম্
উপাক আ রোচতে সূর্য্যস্য।
রুশদ্দৃশে দদৃশে নক্তয়া চিদ্
অরূক্ষিতং দৃশ আ রূপে অন্নম্॥

বীর্য্যশালী বৈশ্বানর! বলিহারি দীপ্ত তব জ্বালা
সবিতার পাশে ওই আকাশেরে করিয়াছে আলা!
কি সুন্দর দ্যুতি তার রজনীর নাশে অন্ধকার,
আনিয়াছি সুশোভন হবি এই—ধর উপচার।

বি যাহ্যগ্নে গৃণতে মণীষাং
খং বেপসা তুবিজাত স্তবানঃ।
বিশ্বভি র্যদ্ ববনঃ শুক্র দেবৈ-
স্তন্নো রস্বে সুমহো ভুরি মন্ম॥

গায় স্তুতি যজমান, শোন নাই শক্তির কুমার ?
শোন নাই আবাহন যজ্ঞভূমে ?—খুলে দাও দ্বার !
বিশ্বের দেবতা লয়ে আসিয়াছ দিতে কত ধন—
দাও তাহা, তেজীয়ান্, আমাদের পুর আকিঞ্চন !

ত্বদ্বাজী বাজম্ভরো বিহায়া
অভিষ্টিকৃজ্জায়তে সত্যশুষ্মঃ।
ত্বদ্রয়ির্দেববজুতো ময়োভু-
স্ত্বদাশুজূ র্জুবাঃ অগ্নে অর্বা॥

ধন্য এই পুত্র মম, বীর্য্যশালী, অন্ন-উৎপাদক,
সত্যসন্ধ, যজ্ঞদ্বারী,—এও জানি তোমারি বালক !
তোমা হতে লভিয়াছি সুখকর দেবতার দান—
লভিয়াছি আরো এই শীঘ্রগতি অশ্ব বেগবান্।

ত্বদগ্নে কাব্যা ত্বন্মনীষা-
স্ত্বদুকৃথা জায়ন্তে রাধ্যানি।
ত্বদেতি দ্রাবিণং বীরপেশা
ইত্থাধিয়ে দাশুষে মর্ত্ত্যায়॥

তোমা হতে উৎসারিত কাব্য আর যত স্তুতিগান,
শ্লাঘ্য যত উক্থবাণী, সবি তব মহিমার দান !
এইরূপে যজ্ঞ করি মর্ত্ত্য তোমা দিয়াছে যে হবিঃ,
ধন বল, রূপ বল, তোমা হতে পেয়েছে সে সবি।

ত্বামগ্নে প্রথমং দেবযন্তো
দেবং মর্ত্তা অমৃত মন্দ্রজিহ্বম্।
দ্বেষো যুতমা বিবাসন্তি ধীভি-
র্দমুনসং গৃহপতিমমূরম্॥

দেবতার অনুগামী মর্ত্ত্য যত তোমারেই সেবে—
মধুর রসনা যাঁর, মৃত্যুজয়ী সেই আদিদেবে ;
প্রগল্ভ বচন তব, পাপ হতে কর তুমি ত্রাণ—
গৃহপতি তুমি দেব, যাহা কিছু, সবি তব দান !

আরে অস্মদমতিমারে অংহ
আরে বিশ্বাং দুর্ম্মতিং যন্নিপাসি।
দোষা শিবঃ সহসঃ শূনো অগ্নে
যং দেব আচিৎ সচসে স্বস্তি॥

তুমি আছ আমাদের, আর বল ভয় করি কারে ?
অশ্রদ্ধা, দুর্ম্মতি, পাপ—যা রে, তোরা সব দূরে যা রে !
রজনীর শোভা তুমি, হে দেবতা, বলের তনয় !
আছ ঘিরে চারিদিক্- সবি আজ হোক শিবময় !

শক্তি



শক্তি চাই—শক্তি চাই—নইলে চলা অসম্ভব জগতে। কিন্তু কি করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিব?

প্রথমতই চাই নিজের প্রতি বিশ্বাস। জগতে আমি নিরর্থক নই, তুচ্ছ নই—স্বারাজ্যসিদ্ধির মহিমা আমারও করায়ত্ত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে চিত্তকে তেজীয়ান্ করিয়া তোল। জগতে আমি বিপ্লব ঘটাইতে চাহি না, উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে চাহি না—আমি না চাহিতেই বিপ্লবের উত্তেজনায় জগৎ হাঁস-ফাঁস করিয়া মরিতেছে; আমি চাই ওই উত্তেজনার আবর্ত্তের মাঝে পড়িয়াও অটল থাকিতে, অনাত্মবস্তুর বিক্ষোভের মাঝে পড়িয়াও আত্মস্বরূপের মননে ভাস্বর থাকিতে। বিকার সত্য—তাহা তো চোখের সামনেই দেখিতেছি; কিন্তু নির্ব্বিকার কি তার চেয়ে মহত্তর নয়? আমি জগতের কিছুই মিথ্যা বলিতে চাহি না, অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহি না—আমি সত্যদর্শী, সত্যের সেবক; আমি বলিব সবই সত্য—মায়াও সত্য, ব্রহ্মও সত্য। কিন্তু দুইটী সত্যকেই আমি যুগপৎ অনুভব করিতে চাই; এই মায়ার দোলায় দুলিতে দুলিতেই আমি ব্রহ্মস্বরূপের অবিচল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাই। আবার ব্রহ্মসাধনের ভূমিকা হইতে অনির্ব্বচনীয় মায়াপ্রপঞ্চে লীলায়িত হইতে চাই। মিথ্যা হইতে মিথ্যায় নয়, মিথ্যা হইতে সত্যেও নয়—সত্য হইতে সত্যেই আমার অভিযান। আমি সত্যের সেবক, সত্যের দিশারা; ভাল মন্দ যাহাই আসুক—অবিচলিত কণ্ঠে বলিব—"ওঁ, ত্বং কিলাসি সত্যম্!"

এই সত্য কি?—সত্য এই, **আমি আছি**; নিস্তেজ হইয়া নয়, নির্ব্বীর্য্য হইয়া নয়, পরিপূর্ণ প্রাণে বিদ্যুন্ময় হইয়া **আমি আছি**। বলিবে, আমার দেহ-মনের সীমা আছে।—হাঁ আছেই তো! কিন্তু আমি কেবল দেহই নই, কেবল মনই নই; অদীনসত্ত্ব অনন্তানন্দ আত্মাও যে আমি। ওই আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই না দেখি, আমার এই ক্ষুদ্র দেহ, এই সীমাবদ্ধ মনও পূর্ণ,—রসে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ, প্রাণে পূর্ণ!

বলিবে, এ তো তোমার কল্পনা মাত্র। হাঁ, সত্যই এ আমার কল্পনা। কিন্তু দেখ দেখি, কি তেজস্কর কল্পনা সুরা খাদ্য নয়, সে কথা তুমিও বলিবে, আমিও বলিব; কিন্তু পাঁড়-মাতালকে তাহা বিশ্বাস করাইতে পারিবে? মদ খাওয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, যেমন নাকি তোমার আমার ভাত খাওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমরা এক বেলা ভাত না খাইলে দুই চোখে অন্ধকার দেখি, সেও এক বেলা মদ না খাইলে দুই চোখে অন্ধকার দেখে। সত্যের বিচারে দুই-ই পিপাসা মাত্র—আত্মতৃপ্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া বলিতে পারিবে, কোন্ পিপাসাটা বড়, আর কোন্‌টাই বা ছোট?

আত্মমহিমার সুরা পানে আমি মাতাল, তুমি কঠিন বাস্তবের চর্ব্বণে মত্ত। তুমি কি রস পাও বা না পাও, তা আমি জানি; কিন্তু আমি যে কি পাইয়াছি, তাহা তো তুমি জান না। তাই বলি, তোমার ওই নিরেট বাস্তবের জড় কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া আমার এই চিন্ময়ী কল্পনার সুরাপাত্রে চুমুক দাও না ভাই, দেখ প্রাণ তাজা হয় কি না!

এই তো শক্তির সাধনা—কুস্তির মারপ্যাঁচ, লড়াইয়ের কুচ-কাওয়াজ নয়; অন্তরের অতি নিভৃতে জগতের চোখে ধুলা দিয়া আমার আত্মস্বরূপের মনন অথবা

আমার আত্মশক্তির উদ্বোধন। জগৎ যেমন চলিতেছে চলুক, আমি এতটুকু প্রতিবাদ করিব না; বলিব না, এই কুটাগাছি এখান হইতে সরাইয়া ওইখানে রাখ। আমার কি গরজ? যে মহাশক্তির ইঙ্গিতে এই জগৎ চলিতেছে, সে কি আমার পর, না তাহার সঙ্গে আমার সাত পুরুষের ঝগড়া যে আমি তাহার কাজে বাদী হইতে যাইব? আমি জানি, পরম পুরুষের প্রতি প্রেমব্যাকুলতাই সেই লীলাময়ীর শক্তির উৎস। সেই অক্ষয় মিলনানন্দে আমি বিভোর! আমি যাইব তার ঘরকন্নায় বাদী হইতে?

তবে আমার এই দেহ আছে, মন আছে, জগৎ চক্রে তাহারা বাঁধা, তাহাদের সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, ভাল মন্দের বাছাই আছে, সে সত্যও স্বীকার করি; দেহ মনকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া আমি সত্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে চাহি না। কিন্তু এই পঙ্গু দেহ-মন জানুক, অমৃতের সেতুস্বরূপ আত্মারাম তাহাদের পিছনে রহিয়াছেন; তাঁহাতে নির্ভর স্থাপনা করিয়া বুক পাতিয়া দাও এই জগতের তরঙ্গ বিক্ষোভের সম্মুখে! কে তোমাকে হটাইয়া দিবে ভাই? জান না, মানুষ প্রকৃতির কারসাজিতে অমর হইতে চাহে না, সে দেবতার সাযুজ্য লাভ করিয়া অমৃত ছিনাইয়া আনিতে চায়। একটীমাত্র ভেলাকে সম্বল করিয়া মহাসমুদ্রে সে পাড়ি জমাইতে ভয় পায় না!

আত্মানুভবের মহিমার কাছে—তুচ্ছ, তুচ্ছ সব! বলি না, এই জগৎ তুচ্ছ, এই জগৎ মিথ্যা; বলি, এই জগতের বিভীষিকা তুচ্ছ, এর আস্ফালন মিথ্যা। বাহিরের জগৎ যেভাবেই সত্য হোক্ না কেন, তাহাতে তোমার কি আসে যায়, যদি তোমার অন্তরে তাহার প্রতিভান আত্মস্বরূপের অনুকূল হয়? বলি বনের বাঘে খায়, না মনের বাঘে খায়? এই যে সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দের বাটখারায় জগৎটাকে ওজন করিয়া আপন মনের সংস্কারানুযায়ী একটা দাম ফেলিয়া যাইতেছ, ওই সংস্কারের বিভীষিকাগুলিই না মিথ্যা? অজর, অভয়, অমৃত আত্মারামের এই বাণী—সুখ তো আনন্দই, বেদনাও চরমে আনন্দে রূপান্তরিত হয়, যদি ভালবাসিতে পার। এর চেয়ে বড় ভরসার কথা আর কি আছে জগতে?

এই অতি স্থূল নিরেট জগতের একটা চাপ আছে তোমার ওপরে—তাহারই চাপে তুমি কুঁজো হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু তোমার আত্মারাম তো সে নতি স্বীকার করিবার পাত্র নন। তাই অবিরাম তিনি অন্তরকন্দর হইতে হাঁকিয়া চলিয়াছেন—"উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত!" সে ডাক কখনো কখনো তোমার কাণে পশে—মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত জঞ্জাল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তুমি সোজা হইয়া দাঁড়াও—বল, অহং ব্রহ্মাস্মি! আত্মশ্লাঘা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। কেন?—না, ও যে আত্মারামেরই স্বপ্রতিষ্ঠার তির্য্যক্ প্রকাশ! তাই বলি, তুমি মহতো মহীয়ান্—এ কল্পনায় বাস্তবিকই তোমার আঁৎকাইয়া উঠিবার কিছু নাই তো! জীবনে এমন গৌরবময় মুহূর্ত্ত সকলেরই আসে, যখন নিজকে নির্ব্বিরোধে সবার বড় ভাবিয়া মানুষ আনন্দ পায়। ওই ভূমার আনন্দই তোমার আত্মস্বরূপ। মেঘে যেমন সূর্য্য ঢাকিয়া যায়—তেমনি তোমারই কল্পিত দুর্ব্বলতায় ওই আত্মস্বরূপের স্বয়ংজ্যোতিঃ বারবার আবৃত হইয়া যাইতেছে।

চাই সংগ্রাম—অবিরাম সংগ্রাম। দুটী অন্নের সংস্থান করিয়া এই দেহটাকে টিকাইয়া রাখিবার দরুণ অহরহ তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে না কি? তুমি একদণ্ড নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেছ কি? কর্ম্মময় জীব তুমি—সুতরাং কর্ম্ম তোমার পক্ষে জবরদস্তী নয় কিছু। কিন্তু তুমি এলোমেলো কর্ম্মই করিতে জান—সুকেশৌল কর্ম্মযোগ জান না—বাহ্য কর্ম্মে এবং আন্তর কর্ম্মে সামঞ্জস্য করিতে জান

না। তাই সাধনার নামে আঁৎকাইয়া ওঠ—স্বরূপের কথায় বিরূপ হইয়া যাও।

যেমন এই দেহটার দরুণ খাটিতেছ, তেমনি মনটার দরুণ খাট, আত্মারামের দরুণ খাট। এই দেহের জন্য যে খাটুনী, তার সব উপাদান কিছু তুমি ওপার হইতে সঙ্গে করিয়া আন নাই; মনোবৃত্তির যে লীলা তোমার মাঝে চলিতেছে, তাও কিছু তোমার নিজের কেরামতী নয়। তেমনি কতকগুলি স্বপ্রকাশ আত্মধর্ম্মও তোমার মাঝে আছে; সেইগুলিকে স্বচ্ছন্দ মহিমায় ফুটিতে দেওয়াও তোমার কর্ত্তব্য।

আত্মমহিমায় জ্বলন্ত বিশ্বাস—এই মহত্তম আত্মধর্ম্ম। আমি ছোট কিসে? আমি দীন কিসে?—দেহের ক্ষমতায়, মনের প্রসারে, পদমর্য্যাদায়, বিত্তসামর্থ্যে? কিন্তু জান, পথের ভিখারীর মাঝেও আজ এমন দুঃসহ তেজের আবির্ভাব হইতে পারে যে পৃথিবীশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী তুলিয়া সে হাঁকিবে—"তফাৎ!" গ্রীসে ডায়োজিনিস্ আর ভারতবর্ষে দণ্ডী স্বামী এমনি করিয়া বিশ্ববিজয়ী আলেক্জাণ্ডারকে হাঁকাইয়া দিয়াছিলেন। শামস্ তব্‌রেজের মাঝে আত্মার মহিমা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—তিনি বলিয়া উঠিলেন "আনল্‌হক!"—আমিই ব্রহ্মস্বরূপ। রাজা শুনিয়া বলিলেন, "খোদার প্রতি বিদ্রোহ, এত বড় স্পর্দ্ধা! জীবন্তে উহার চামড়া ছাড়াইয়া নাও!" তব্‌রেজ বলিলেন, "নাও—এই চামড়া আমি কুকুরকে ছুঁড়িয়া দিলাম—আনল্‌হক্!"

এই তেজ, এই উদ্দীপনা—এ মিথ্যা? ধরিয়া রাখিতে পার না, তাই বল মিথ্যা। বেদের ভাষায় বলিতে গেলে "কুয়াসার রাজ্যে বাস করিয়া নকল আত্মতৃপ্তির জল্পনা করিয়া মরিতেছ, তোমরা কেন বিশ্বাস করিবে এই তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ত পুরুষ অমর মহিমায় জ্বলিতেছেন!"

জীবনে যদি কোনও সাধ্য থাকে তো ওই মহান্ত পুরুষের মত জ্বলিয়া ওঠা! অদ্বৈত বেদান্তের অর্থ কি?—অর্থ, ওই অনির্ব্বাণ জ্বলা। শুধু ওই সত্য—আর সব মিথ্যা—তুচ্ছ; অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে—"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তিনি জ্বলিতেছেন বলিয়াই এরা সব জ্বলিতেছে, তাঁরই আলোতে এরা সব দীপ্তি পাইতেছে।

এ যদি কল্পনাও হয়, তবুও এই কল্পনাকেই জয়ী করিতে হইবে। প্রাণপণ চেষ্টায় এই মননকে অহরহ জাগ্রত রাখিতে হইবে। মস্তিষ্ক বিদীর্ণপ্রায় হইয়া যাইবে, সময় সময় গভীর আঁধারে সব ছাইয়া যাইবে; যতটুকু প্রত্যয় চিত্তে জাগিবে, তাহার শতগুণ করাল সংশয় আসিয়া গ্রাস করিবে—তবুও বলিব—ওই সত্যই চাই—আর কিছু না, আর কিছু না—"তৎ ত্বে পূষন্ অপাবৃণু"—হে পূষন্, দাও—ওই সত্যের আবরণ অপাবৃত করিয়া দাও! মরি যদি তো মরিব—সত্যের সাধনাতেই মরিব; মরণ হউক সবিতার অস্তরাগের শেষ ঝলকের মত; সারাদিন অনির্ব্বাণ জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবার সময়ও হৃদয়শোণিতে জগৎকে রাঙাইয়া দিয়া মরিব।

জান, এই আত্মশক্তির স্বরূপ। কিছুতেই যে দমিতে চাহে না, কারু কাছে যে মাথা নোয়াইতে চাহে না, কোনও যুক্তিতে যে বশ মানে না—সে শক্তি জগতে অজেয়। তোমরা কেবল জান বাঁধা রাস্তায় ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিতে। ভাবনা কি—সারাদিন বোঝা বহিয়া আসিলে সন্ধ্যা বেলায় নাদাভরা খড়বিচালীর বরাদ্দ তো পাওনাই আছে, সারারাত তাহার জাবর কাটিলেও কেহ আপত্তি করিবে না। বাছা বাছা 'গুড্‌বয়' সৃষ্টির চেষ্টায় দেশটা উৎসন্নে গেল। পরমহংসদেব যেমন বলিতেন "বনত্ বনত্ বনী যাই—ওকি বাপু! আমার ও সব ভাল লাগে না; যেন চিঁড়ের ফলার, কোনও আঁট নাই!"

চাই দুরন্ত প্রাণ—একটা জেদকে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী করিবার আপ্রাণ চেষ্টা। বাড়ীতে যে দুষ্টু ছেলেটা দশটা নিয়ম ভাঙ্গিতে জানে, অথচ মিথ্যা কথা বলিতে জানে না—নিরীহ গোবেচারীর চেয়ে সেই ছেলের ওপর ভরসা করি বেশী। আত্মারাম খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার জন্য উহার ভিতর গজ্‌রাইতেছেন!

আমি বিভু—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস, অকুতোভয়ে সত্যের সেবা, আর নিজের জেদকে বজায় রাখিবার জন্য প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা—আত্মশক্তির এই নিশানা।—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই ধর্ম্মের এতটুকুই তোমাকে মহাভয় হইতে বাঁচাইবে।—মহৎ কল্পনাকে বিশ্বাস করিতে শেখ, আরামে কুণ্ডলী পাকাইয়া কেবল হাজার গণ্ডা যুক্তি ফাঁদিতে শিখিও না। যেখানে হাজার যুক্তি, হাজার কথা—জানিও সেইখানেই মিথ্যার বাসা। সত্য এক—তার গতি তীরের মতই সোজা। একটা কথা আঁকড়াইয়া ধর—আর সে কথাটা জগতের সব চেয়ে বড় কথা—সোঽহমস্মি!

স্বামী রামতীর্থ



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শরীরের অসুস্থতা

মিশনকলেজ হইতে নোটিশ পাওয়ার কিছুদিন পরেই তীর্থরাম পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়া বেশী দিন স্থায়ী না হইলেও, ইহা হইতে তাঁহার ইষ্ট-তন্ময়তার আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক জানেন, তীর্থরাম প্রচণ্ড জাপক ছিলেন—দিন রাত প্রণব জপ করা তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস। তাঁহার বহু বক্তৃতাতেও তিনি প্রণব জপের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত অতি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি এক মুহূর্ত্তের দরুণ তাঁহার আত্মানন্দের অনুভব হইতে বিচ্যুত হন নাই, কিম্বা প্রণব জপ পরিত্যাগ করেন নাই। জপ তাঁহার পক্ষে এত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে, নিদ্রাবস্থাতেও তাঁহার ঠোঁট দুটা অবিরাম প্রণব জপ করিয়া যাইত। স্বামী নারায়ণতীর্থ এ বিষয়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তীর্থরামকে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনি কি রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে জপের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারেন?" তীর্থরাম উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, পারি বই কি? তোমরা খোঁজ করিয়া দেখিও, দিনের বেলায় জাগ্রতে যেমন রামের মুখে প্রণবের গুঞ্জন শুনিতে পাও, রাত্রিতেও তেমনি শুনিতে পাইবে।" নারায়ণ স্বামী বলেন, "এই অসুখের সময়ও দেখিয়াছি, তিনি ব্যাধির প্রকোপে আচ্ছন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার প্রণব জপের এক তিল বিচ্ছেদ হয় নাই।"

তীর্থরাম বলিতেন, "অসুখ হইলে আমার আনন্দ বাড়ে, কেননা তখন দেহটা নিস্তেজ হইয়া পড়ায় তাহার বাধা হইতে আমি মুক্তি পাই।" সাধকের পক্ষে ইহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনুভবের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ দেহের সুখ-দুঃখটাই

একান্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। কোন্‌টা দেহের উত্তেজনা সুখ মাত্র, আর কোন্‌টাই বা আত্মার দেহ-নিরপেক্ষ বিমল স্ফূর্ত্তি, ইহা বুঝিয়া উঠা প্রথমাবস্থায় একটু কঠিন বই কি! দেহের একটা ভার আছে, সে ভার মানুষটাকে চাপিয়া রাখে, বুদ্ধির নিষ্কলুষ দীপ্তির উপর একটা আবরণ মেলিয়া দেয়। দেহকে সাত্ত্বিক না করিতে পারিলে সাধনার প্রথম পাঠেই মিথ্যা হইয়া যায়। এ বিষয়ে তীর্থরামের সতর্কতাও অনন্যসাধারণ ছিল। মনের যত কিছু বিকার, সকলের তিনি নিদান খুঁজিতেন—আহারে। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার একমাত্র উপদেশ ছিল, "ভরপেট খাইয়া মাথার কাজ করিতে যাইও না; মাথা যদি পরিষ্কার রাখিতে চাও তো আহার কমাও;—আর যত পার দুধ খাও!" তাঁহার আচার্য্য ধন্নামলজী মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে কড়া চিঠি লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের অস্থিরতা প্রকট হইয়া পড়িত;—একবার তীর্থরাম আচার্য্যকে লিখিলেন, "আপনার মেজাজ যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে, নিশ্চয়ই আপনার পেট খারাপ হইয়াছে; আপনি আহার সম্বন্ধে সাবধান হউন।"

বাস্তবিক আত্মদর্শনের পক্ষে প্রথম বাধাই তো হইতেছে এই দেহটা। আমরা বলিতে চাহি না যে, এই দেহটা আমাদের স্বভাবশত্রু; সাধনার পথে ইহাকে শত্রু করিয়া তুলি আমরা নিজের দোষে। সাধনায় দেহ-শক্তিরও একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে; মস্তিষ্ক তীব্র শক্তিসম্পন্ন না হইলে, নাড়ীচক্র (nervous system) আয়ত্তে না থাকিলে, জ্ঞানের পথেই হউক, কি প্রেমের পথেই হউক, ভাব লাভ করা বড় কঠিন। স্থৈর্য্যের সাধনায়, সংযমশক্তির প্রভাবে বহির্ম্মুখী দেহশক্তি অন্তর্ম্মুখী হয়; এই দেহটাই তখন আত্মদর্শনের ও বিলাসের অনুকূল ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইতে পারে। আত্মার বিলাস-স্ফূর্ত্তির পক্ষে দেহের বিলাসবাসন মারাত্মক বাধা। অথচ দেহের নিষ্পেষণও চাই না—চাই তেজস্কর আপ্যায়ন, চাই ধাতুপ্রসাদ, চাই নাড়ীচক্রের তিতিক্ষা ও স্থৈর্য্য। এই ভাবে দেহটাকে তালিম দিয়া তুলিতে পারিলে অবশেষে সে আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়। দেহের নাস্তিত্ববোধের উপর ভিত্তি করিয়া দেহ-আত্মার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় প্রকাশ দেহসুখের চরম অভিব্যক্তি। দেহ তখন আত্মার অনুকূল, ভাবের বাহন: ভাবের আতিশয্যে সে মরিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়! এই দেহগত সাধনার সঙ্কেত হইতেছে নাড়ীচক্রের স্থৈর্য্য ও দৈহিক প্রবৃত্তির সংযম।

অনেকে বলে, শরীরটা যখন ভাল থাকে, মনটাও তখন তাজা থাকে, বেদান্তের বুলিতে তখন জোর পাই; কিন্তু শরীরটা বেহাল হইয়া পড়িলে আনন্দও উবিয়া যায়। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আত্মানুভূতি দৈহিক বিকারেরই রকমফের মাত্র। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দেহবশ্যতাই আত্মানুভূতি নয়। যে মাটী আজ তোমার চলা ফেরার পক্ষে পরম নির্ভর, সেই মাটীর টানটাই তোমার ব্যোমধর্ম্মী আত্মার স্বচ্ছন্দবিহারের পক্ষে প্রচণ্ড বাধা। ভাবনা করিতে হইবে আকাশের, মাটীর নয়—আকাশটাই জমাট বাঁধিয়া মাটী হইয়াছে;—এই আপাতবিপরীত চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। দেহের উদ্বর্ত্তনে আত্মধর্ম্মের প্রকাশ, এই কথা না ভাবিয়া ভাবিতে হইবে, আত্মার অববর্ত্তনেই দেহের সম্ভাব্যতা। দেহটা যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন যদি আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তি না হয়, বন্ধনমুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য না অনুভূত হয়, তাহা হইলে বেদান্তসাধনায় ভাবের ঘরে চুরী আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তীর্থরামের অবিরাম জপের মাঝে দেহ-মনকে আয়ত্ত করিবার আর একটী সঙ্কেত দেখিতে পাইতেছি। সাধনশাস্ত্রে সাধারণতঃ জপকে নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া হইয়া থাকে; অথচ আমাদের দেশে এই জপেরই ছড়াছড়ি। অবশ্য কোন্ সাধনা সার্ব্বভৌমভাবে উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট, সে সম্বন্ধে কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নয়, কেননা সাধনরাজ্যে অধিকারি-ভেদের বিচার একটা বিজ্ঞানসম্মত কথা। জপের সঙ্গে অর্থ-ভাবনা অর্থাৎ জপ ও মনকে একত্রে জুড়িয়া লইতে পারিলে উহা সমাধির অনুকূল হয়, ইহা পতঞ্জলির অভিমত। ইচ্ছাশক্তির তীব্রতাই সমস্ত সিদ্ধির মূল, সুতরাং একাগ্র মন যে সমাধির অনুকূল হইবে, ইহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। জপকে এই মননের সহিত জুড়িয়া দিলে মন একটা অবলম্বন পায়, এবং তাহাতে শীঘ্র চিত্ত তন্ময় হইতে পারে। জপের ইহাই উৎকৃষ্ট উপ-যোগ।

কিন্তু মনন ছাড়া কেবলমাত্র ধ্বনিকে অব-লম্বন করিয়া জপ দ্বারা চিত্তকে তন্ময় করিতে পারা যায় কিনা, ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে। যে কোনও সদৃশ-প্রত্যয়ের পরম্পরায় চিত্ত নির্ব্বি-ষয় হইয়া যাইতে পারে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু নির্ব্বিষয় চিত্ত তো তমোগুণেও ঢলিয়া পড়িতে পারে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়া থাকে, ইহাও তো জানা কথা। চিত্ত বিষয়শূন্য হইলে পর সেই নিরালম্ব চিত্তকে জাগাইয়া রাখিবে কে, ইহাই সমস্যা। এই স্থানেই উপনিষদুক্ত অগ্র্যা বুদ্ধির প্রয়োজন। শুদ্ধসত্ত্বের দ্যোতনার দ্বারা চিত্তভূমিকে যদি ভাবিত রাখিয়া তারপর উহাকে বিষয়শূন্য করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে চরমক্ষণে চিত্ত-সত্ত্ব অনায়াসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু ইহার জন্য সূক্ষ্ম বিবেকজ্ঞান ও মননকুশল-তার প্রয়োজন; বুদ্ধি (intellect) অপেক্ষা বোধিতে (intuition) স্বাভাবিক নির্ভর অভ্যস্ত না হইলে ইহা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও জপকে অর্থভাবনানিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে না।

জপ যদি কেবলমাত্র ধ্বন্যাত্মক হয়, তাহা হইলে উহা কায়িক সাধনা। এখন দেখিতে হইবে, কোনও বিশিষ্ট ধ্বনির প্রতি আমাদের দেহের কোনও প্রকার প্রবণতা আছে কিনা। অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের লক্ষ্য স্বভা-বতই শ্বাস প্রশ্বাসের উপর আসিয়া পড়ে। নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ দেহের মাঝেও শ্বাস-প্রশ্বাসের একটী বিশিষ্ট ধ্বনি আছে এবং ইহার প্রবাহও অবি চ্ছিন্ন। বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার সহিত এই ধ্বনি-নির্গমনের একটা সম্বন্ধও আছে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া যোগীরা শ্বাস-প্রশ্বাসকে অজপা জপ আখ্যা দিয়া কল্পনা করিয়াছেন—"সোঽহং-হংস-পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা"—নিশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে জীব সর্ব্বদা "সোঽহং—অহং সঃ" এই বেদান্ত-মন্ত্র জপ করিতেছেন। তীর্থরাম বলেন, সোঽহং হইতে যদি কঠিন্ ধ্বন্যাত্মক 'স' ও 'হ' কে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্বর ও কোমল ব্যঞ্জনাশ্রিত 'ওম্' এই ধ্বনি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত ও মৃদু হইলে পর তাহার সহিত 'ওম্'এর ধ্বনিসাদৃশ্য অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। প্রণবের উপর কোনও ভাব আরোপ না করিয়া তাহাকে যদি একটী ধ্বনি বলিয়াই ধরিয়া লই, তাহা হইলে ওঁকারের মত স্বাভাবিক, সার্ব্বভৌম ও অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহী মন্ত্র আর দ্বিতীয় একটী খুঁজিয়া পাইবে না। ঈশ্বর-প্রণিধান বা ভক্তি যদি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে প্রণবকে আমরা সর্ব্বজীবের

ঈশ্বরবাচক নাম রূপে গ্রহণ করিতে পারি এবং এ কথাও ভাবিয়া লইতে পারি, জীব জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সর্ব্বদাই শ্বাসে শ্বাসে প্রণবোচ্চারণ দ্বারা ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছে। এই ভাবটী যদি চিত্তে গাঁথিয়া যায়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আমাদের মন শ্বাসের উপর আসিয়া পড়ে; এবং শ্বাসের উপর মন আসিয়া পড়িলেই উহা আপনা হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও শান্ত ও একাগ্র হইতে থাকে। দৈহিক ও মানসিক পারিপার্শ্বিককে যদি এইরূপে অনুকূল করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র ধ্বনিরূপেই প্রণবকে জাগাইয়া রাখিয়া প্রণব-জপ দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্যের অভাবনীয়রূপে আনুকূল্য করা যাইতে পারে। তীর্থরামের অবিরাম প্রণব জপের সাধনার যৌক্তিকতা এইরূপে ব্যাখ্যা করা চলে।

ক্রমে তীর্থরামের শরীর সারিয়া উঠিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি নারায়ণ স্বামীকে বলিলেন, "নারায়ণ, দেশের একান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে, দেখ না, রামের শরীর দিন দিন সারিয়া উঠিতেছে!" আমার দেহে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, এই দেহের দ্বারা দেশে বেদান্ত প্রচার হইবে, দেশের উপকার হইবে—ইহা ভাবিয়াই তীর্থরাম দেহের স্বাস্থ্যলাভে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কাশ্মীরযাত্রা

শরীর একটু সুস্থ ও সবল হইলে পর ১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে তীর্থরাম কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একবার জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের সহিত তিনি কাশ্মীর গিয়াছিলেন এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, অমরনাথ দর্শন করিবেন। অমরনাথ দর্শনের কাহিনী তিনি 'পাহাড়িয়া ছবি' নামে একটী প্রবন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তীর্থরামের তখনকার ভাবোন্মত্ত অবস্থার একটু পরিচয় দিবার জন্য আমরা প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার দিলাম—

আজ আর ব্যায়াম করা হল না। চল, প্রপাতের নীচে গিয়ে কিছুক্ষণের দরুণ বুক পেতে দিই, আপনা হতে তাহলে ব্যায়াম হয়ে যাবে। বুকের ক্ষেত্রফল আর জলের বেগের পরিমাণ নিয়ে গণিতশাস্ত্রমতে জলের চাপ কত, তা মেপে দেখা যাবে, কেমন ?···ওরে বাবা, জলের এত তোড় ? এ যে গণিত-ফণিত কোথায় উড়িয়ে নিচ্ছে! এ জল যে ইঁটের চেয়েও শক্ত গো! এর সামনে বুক পেতে দেওয়ার চেয়ে চার পাঁচখানা পাথরের গুঁতোয় বুক ছেঁচে ফেলাও তো ভাল দেখছি!···ওরে জল, তোর নম্রতা না সবার দৃষ্টান্তস্থল ছিল ? আজ তোর সে নম্রতা দেখ্‌ছি না যে ? শীতলতাই বা কোথায় গেল ? কেনই বা অমন হাঁসফাঁস করে ছুটে চলেছিস্‌ ? এই আবেশ, এই উচ্ছলতা, এই বেগ, এই তাপ—এ কিসের জন্য ?

জল বল্‌ছে—আমি তো সর্ব্বদাই শীতল আছি গো! আমায় স্পর্শ করেই দেখ না কেন ? শরীর যদি অসাড় না হয়ে যায় তো আমায় তখন বলো। আমার উষ্ণতা তো অনুভবিতার কল্পনার মাঝেই আছে শুধু। আমি শক্তিশালী বটে, কিন্তু তেমনি সর্ব্বদা নম্র হয়েই তো আছি। এ তো ভাই তোমারই উল্টো জবরদস্তী যে আমার ওপর কঠিনতার আরোপ কর্চ্ছ!

অমরনাথ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তীর্থরামের প্রেমোন্মাদ আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এবারও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শন সম্বন্ধে নানা অত্যাশ্চর্য্য অনুভবের কথা যখন তখন নারায়ণ স্বামীকে শোনাইতেন। কোনও দিন হয়ত স্নান করিতে গিয়া আর উঠিয়াই আসিতে চাহেন না; বলেন, "আজ এমন করিয়া আসিয়া ও স্নানের সময় জড়াইয়া ধরিল, আর কি উঠিয়া আসিতে দেয়?" একদিকে অদ্বৈতানুভবের অবিচল প্রশান্তি, আর একদিকে তাহারই বুকে এই লীলোচ্ছল বেদনার স্ফুরণ তীর্থরামের জীবনে জ্ঞান আর প্রেমের এক অপরূপ সমন্বয় আনিয়া দিল।

মিশন কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তীর্থরাম এখন ওরিয়েণ্টাল্ কলেজে কাজ লইয়াছেন। এখানে দুই ঘণ্টা মাত্র পড়াইতে হয়; বেতনও কম। সুতরাং তাঁহার আয়ও কমিয়া গিয়াছে অথচ পোষ্য-বর্গের সংখ্যা কিম্বা দান-খয়রাতের বহর এতটুকুও কমে নাই। তীর্থরামের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এখানে তিনি বেদান্ত আর গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার পাইয়াছেন; দুইটী বিষয়ই তাঁহার প্রিয়। রাম বাদশাহ এখন অদ্বৈতানুভূতির রাজ-তক্তে গদীয়ান; জগত তাঁহার সম্মুখে নতজানু। তাঁহার হৃদয়ের কল্লোলিত আনন্দধারাকে রুদ্ধ করে কে?

(ক্রমশঃ)

আত্মদর্শন

—*—

আত্মদর্শনের উপায় খুঁজতে হবে। প্রথমেই বুঝতে হবে, আত্মা কি; নইলে লক্ষ্য স্থির হবে না। বুদ্ধি নিরেট বস্তু ধারণা করতে অভ্যস্ত, অতএব তাকে আত্মার একটা নিরেট সংজ্ঞাই দিতে হবে, যা তার প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে। দর্শনে আছে, শাখাচন্দ্রদর্শন ন্যায়ের কথা। দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাতে হবে, দেখানো তো সোজা নয়, তাই বলা হল—ওই অশত্থগাছের মগডালের দিকে তাকাও দেখি! সেই-খানে দৃষ্টি স্থির হলে পরে দেখা গেল, তারই পেছনে দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। তেমনি আত্মদর্শনেরও একটা সংজ্ঞা চাই।

ধর, স্থির মনই আত্মা। স্থির মনের একটা বিভীষিকা আছে, আবার সয়ে যেতে পারলে রস যে আছে, তার তো কথাই নাই। এই স্থির মনের অসহ্য একটা চাপও আছে—নিজের ওপরে তো আছেই, পরের ওপরেও সেটা খাটে। আত্মশক্তি জিনিষটা যে কি প্রচণ্ড, তা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু বুঝতে গেলে ধৈর্য্য চাই; আর একটা কথা, বিশ্বাসও চাই। যুক্তিবাদী বলবেন, ওইখানে বুজরুকীর ফাঁক রেখে যাচ্ছ। তা কি করা! এই নিরেট জগৎটার তুলনায় আত্মতত্ত্বটা বুজরুকী বই কি। তাই সে বুজরুকীও একটু একটু করে সইয়ে নিতে হয়।

আর একটা পরখ, অকারণ আনন্দ। কারু কারু ভাগ্যে জিনিষটা অমনি জুটে যায়। তাকে বলি, ওইটাকে চেপে ধর; হাতের কাছে অমনি

পেয়েছ যখন, চুটিয়ে ভোগ করে নাও। মেঘের ফাঁকে রোদের ঝিলিকের মত ওই হচ্ছে আত্মানন্দের নিশানা।

আরও আছে, তিতিক্ষা। এই পরথটা জ্ঞানের তরফ থেকে। জান্‌ছি সবই, অথচ টল্‌ছি না। একটা দিক পুরামাত্রাতেই স্পন্দিত হচ্ছে, তার চঞ্চলতার এতটুকুও এড়িয়ে যাচ্ছে না, আবার তেমনি আর একটা দিক যেন আরও স্তব্ধ, অনড় হয়ে যাচ্ছে। ওই স্তব্ধতা হচ্ছে জ্ঞানের প্রকাশ।

এমনি করে সচ্চিদানন্দের আভাস এই স্থূলেই পাওয়া যায়—সবাই পাচ্ছে, নইলে বাঁচ্‌ত কি করে? কিন্তু সবাই তো আর বিজ্ঞান জানে না, তাই এই অনুভবগুলো কাজে লাগায় না, তাদের অনুশীলন করে পুরোমাত্রায় রস আদায় করতে জানে না।

আচ্ছা, আত্মতত্ত্বের সন্ধান এই পর্য্যন্তই থাক্। এখন পথের কথা হোক্।

প্রথম কথাই হচ্ছে, মন স্থির কর্‌তে হলে **বাক্য স্থির** করতে হবে। "মোক্ষস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্-নিরোধঃ।" উপদেশটা সবারই জানা আছে। একদণ্ড কথা না বল্‌তে পারলে ছট্‌ফট্ করে মরে, এমন লোকের অভাব নাই। তাদের দ্বারা বড় কিছু হওয়া কঠিন। চাণক্যের একটা সোজা নীতি আছে —"চিন্তাপূতং বদেদ্ বাকাম্"—যা বল্‌বে ভেবে-চিন্তে বল্‌বে। ভেবে বল্‌তে গেলেই কথার মাত্রা কম্‌বে। তারপর কথা বল্‌ব না বলেই জেদ করা প্রয়োজন। সব সময় না পার, দিনের মাঝে একটা সময়, অথবা সপ্তাহে একটা দিন নির্দ্দিষ্ট করে রাখ, কিছুতেই সে সময়টা বা সে দিনটা কথা বল্‌ব না। এতে মনের জোর বাড়্‌বে।

বৌদ্ধদর্শনে বাক্‌সংযমের আরও একটী বিধান আছে—মুসাবাদবিরতি, পিসুনবাচাবিরতি, ফরুসবাচাবিরতি, সম্ফলাপবিরতি।—মিথ্যা কথা বল্‌বে না। হিংসুটে কথা, ঝগড়া লাগানো কথা বলবে না। পরের প্রাণে ব্যথা দিয়ে কথা বলবে না। বাজে কথা বলবে না। উপদেশগুলো বোধ হয় "শিশুশিক্ষা"তেও পড়েছি। কিন্তু উপদেশ কাজে লাগাবার মত মনের গতিক যে হয় না।

আর একটা কথা বলি। প্রয়োজনবশেও অনেক সময় অনেক কথা বল্‌তে হয়। একটা মনকে তখন পাহারায় রেখে দেওয়া দরকার। সে কথা বলতে বারণ করবে না বটে, কিন্তু সর্ব্বদা একটা সমান্তরাল চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে চলবে—"আমি বাক্‌সংযমের ব্রত নিয়েছি।" এতে চিত্তে চটুলতা জন্মে না—বেশী কথা বলবার যা নাকি অবশ্যম্ভাবী বিপদ্।

কথা বলবার লোক পেলাম না, তাই কথা বললাম না, কিম্বা সারাদিন তেমন কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়নি বলে বলতে হয়নি—এতে বাক্‌সংযম সিদ্ধ হয় না। এমন ফাঁকার সময়ও চিন্তা করতে হবে, "আমি ব্রতচারী—আমি সংযতবাক্।" বাক্-সংযমের আসল ক্রিয়াটী হবে মনের ওপর কিনা। এই মনের মাঝে একটা অভিমান জন্মিয়ে দেওয়া দরকার। যার আত্মাভিমান নাই, তার কিছুই নাই। দশজনেও যা, আমিও তা—এ হলে কখনো আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ করা যায় না। পারিপার্শ্বিকের চেয়ে আমার একটা কিছু বিশেষত্ব আছেই—আমি সবার থেকে আলাদা, এমনি একটা কঠোর বিবেকজ্ঞান থাকলে তবে না চিত্ত আত্মদর্শনের অনুকূল হবে? তাই বলছিলাম, শত্রু না থাকলেও যেমন রাজা তার পল্টনের কুচ-কাওয়াজ করান শুধু রাজ-অভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য, তেমনি সংযমের প্রয়োজন না থাকলেও সংযমীর অভিমানটা মনের মাঝে জাগিয়ে রাখতে হয়। উপনিষদে একে বলে, "সমনস্কতা।" সমনস্ক না হলে আত্মার জাগরণ অসম্ভব।

বাক্‌সংযমে মনের চেহারাটা খুলবে, বুঝতে পারবে, তুমি কত অসার চিন্তা করে মনের শক্তির অপচয় করছ!

তার পরের কথা হচ্ছে—"**অপরিগ্রহ।**" কথাটা বেদান্ত দর্শনের মাঝেও আছে, পাতঞ্জলেও আছে। অর্থ হচ্ছে, কায় ও প্রাণের মাতে বিচ্ছেদ না ঘটে, এতটুকু মাত্র বিষয় স্বীকার। অর্থাৎ দেহের এতটুকু মাত্র তোয়াজ করব, যাতে প্রাণটা না বেরিয়ে যায়। অবশ্য এটা হল, তিতিক্ষার চরম দশার কথা। তাই কথাটাকে আরো একটু মোলায়েম করে বোঝ। আহার-বিহারাদিতে এমনি সতর্ক হতে হবে, যাতে আমার দেহটাই আমার অধ্যাত্মসাধনার পরিপন্থী হয়ে না দাঁড়ায়। ধর, খাওয়া। উপবাসে শুকিয়েও মরা যায়, আবার পেটুক দামোদরও হওয়া যায়—দেহের সামর্থ্যানুযায়ী উভয়দিকেই সঙ্কোচ-প্রসার করা চলে। কিন্তু বাড়াবাড়িটা কিছুই ভাল নয়। নিতে হবে মধ্যপথ। গীতা যেমন বলছেন, যে উপযুক্ত-মত আহার করে, উপযুক্তমত বিহার করে, উপযুক্ত-মত কাজকর্ম্মে দেহমনকে খাটায়, উপযুক্তমত জাগে ঘুমায়, যোগে তারই দুঃখ দূর হয়। দেহের ভার-কেন্দ্রটী ঠিক রেখে চলতে হবে। দেহকে ভারাক্রান্ত করলে তমোতে ঘিরবে; আবার শুকিয়ে মারলেও মস্তিষ্কশক্তির হানি হবে। ঠিক ততটুকু চাই, যত-টুকু পেলে দেহ আনন্দে আত্মার গোলামী করবে। সে কার পক্ষে কতটুকু, বহুদিনের গবেষণায় স্থির করতে হবে।

দেহের সাধারণতঃ তিনটী বৃত্তির কথা বলা হয়ে থাকে—আহার, নিদ্রা, মৈথুন। ভয়কেও কেউ কেউ দেহবৃত্তির সামিল করে থাকেন। দেহের ভয়ও কিন্তু একটা মস্ত বড় আপদ। তিনটী বৃত্তির মাঝে মৈথুন একেবারে বর্জ্জন করতে হবে; আর আহার-নিদ্রার পরিমাণকে কৌশলে সংযত করতে হবে। অপরিগ্রহের মোটামুটি এই তাৎপর্য্য। অবশ্য শারীরিক আরও কতরকম বিলাস আছে—সে সব ক্ষেত্রে যে বাহুল্যবর্জ্জন করে চলতেই হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই বৃত্তিগুলিকে নিয়েই দেহের একটা জঘন্য বুভুক্ষা আছে—সেটাকে একদম চেপে ফেলতে হবে। চাপলে কখনো ফল ভাল হয় না, এমন একটা কথা আছে জানি। কিন্তু সাময়িকভাবে না চাপলেও তো চলে না। তা ছাড়া পরের জবরদস্তীতে তো চাপব না—আমার ভালর জন্য আপ্তগরজী হয়ে আমিই না চাপ দেব। তবুও নিজের মনে একটু খুঁৎখুঁতি থাকতে পারে। তাই বলি, সংযমে ভয়ের কিছু নাই। ওটাই তো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ভোগ। কিন্তু ভোগকে ভাগবত করতে হলেই সংযম প্রয়োজন। এই দেহেরও একটা বিলাস আছে—সত্যদর্শনের সে-ও এক দিক। কিন্তু তার দরুণ দেহের রূপান্তর চাই যে। সোনাকেও পুড়িয়ে খাদ বের করে নিতে হয়; পোড়ালাম বলে তাকে ফেলে দিই না, বরং তখন তার আরও কদর বাড়ে, তাকে দিয়ে তখন অলঙ্কার গড়াই। এখন এই দেহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার মাঝেও একটা জবরদস্তী আছে, যাতে তোমার নিজের কাছেই ওটা ভাল লাগে না। নিবৃত্তির সাধনায় এই প্রবৃত্তির খাদটুকু পুড়ে গেলে দেহের যে শুদ্ধ প্রকৃতি তারই প্রকাশ হবে। সেই প্রকৃতি তখন পুরুষের সেবায় নিযুক্তা হবে; তখন পুরুষ আবার প্রকৃতির প্রেমবশ্যতায় তার গায়ে ঢলে পড়বেন, আবার দেহের নিকুঞ্জে বসন্তোৎসব সুরু হবে। ওই ভাগবত ভোগের জন্যই না সংযম প্রয়োজন।

অপরিগ্রহের মস্ত বড় ফলের কথা পাতঞ্জলে লেখা আছে। অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলে, কি করে এই জন্মটা হল, তা জানা যায়। সত্যই তো, দেহটা তো কতকগুলি কর্ম্মের ফল; ওটা অস্থির বলেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধটা নজরে আসছে না। দেহটা

শান্ত হয়ে যাক—ঠিক চিত্তে ভাস্‌বে, কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এর জন্ম হল।

এই দুটী গেল বাহ্য সাধনা। তারপর আছে আন্তর সাধনা। বাহ্য সাধনার সঙ্গে আন্তর-সাধনার যোগ অতি নিবিড়, কেননা শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। মন তো ফাঁকা, তাকে কেহ ধরতে-ছুঁতে পারে কি? শরীরের বিকার-গুলি শোধন করে শরীরটাকেও যদি শুদ্ধসত্ত্বময় বা ফাঁকা করে ফেলা যায়, তা হলে কতক-গুলো অভিনব মনোধর্ম্মের প্রকাশ হয়, সাধারণ চেতনার রাজ্যে যেগুলির প্রতিষ্ঠা একরকম অসম্ভব। এখন যে কথাগুলো বল্‌ব, তার তাৎপর্য্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আধারটী শুদ্ধ হওয়া চাই।

একটী কথা হচ্ছে—"নিরাশা"; অর্থাৎ মনের মাঝে কোনও আশা বা ভাবনা না রাখা। কথাটা বুঝ্‌তে বেশী বেগ পেতে হয় না বটে; তেমনি আবার এর আপাতলভ্য অর্থে বিষয়-লোলুপের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। আশাই যদি ছাড়লাম, তাহা হইলে রইল কি, এ কথাটা আপনা হতেই মনে জাগে। জ্ঞানী বলবেন, নাই বা কিছু রইল—কেবলোঽহম্, শিবোঽহম্! নেতিবাদ দিয়ে জগৎকে এমনি করে ঠেকিয়ে রাখা যায় বটে, কিন্তু ইতিবাদেরও তো একটা দাবী আছে; পরিপূর্ণ দর্শনে তাকে বাদ দেওয়া চলে না তো! কেবল আমিই আছি—এও যেমন এক তরফের কথা, তেমনি তুমিও আছ, তোমার হয়ে আমিও আছি—এও আর এক তরফের কথা। আশামূলে বাঞ্ছিতের দরুণ যে 'হিয়াদগদগি পরাণপোড়নি'—সেটা মায়া বা লীলা হলেও মিথ্যা তো নয়। তাই নিরাশার সাধনায় দুদিক বজায় রেখে একটা পথ দেখ্‌তে হবে।

একটী উপায় হচ্ছে, মনটাকে তুলে নেওয়া; দেখেও দেখ্‌ছি না, শুনেও শুন্‌ছি না, করেও করছি না—এমনিতর একটা উদাসীনের ভাব। অর্থাৎ অহংটা ফিকে হয়ে যাক্। এই গণ্ডীর মাঝে যে 'আমি'—সে সত্য হলেও সেই তো আর সবটুকু সত্য নয়। এই আমিকেও চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আর একটা বৃহত্তর আমি। তার ইচ্ছাটাই সফল হবে। তাহলে আর এদিককার ইচ্ছাটাকে উগ্র করে তোলা কেন? ইচ্ছার ক্রিয়া যা হবার তা হোক্ না, কিন্তু ফলটার দরুণ ব্যস্ততা না থাকলেই হল। অবশ্য মনের মত ফলটী চাওয়াও মনের একটা বিলাস; সেটাকে বর্জ্জন করে মনটাকে ন্যাড়া করে ফেল্‌তে কেমন একটা মমতা জাগে। কিন্তু এ জায়গাতেও ওই ছোট-বড়র তুলনার যুক্তিটা খাটে। ছোট মনটা যা চায়, সেই আবদারটাই বড় হবে? এই মনের চাওয়ার মাপ অনুযায়ী যে ক্ষণিকের মিলন, সেই কি একমাত্র সত্য? বিরহের ভিতর দিয়ে যে বাঞ্ছিতকে বড় করে পাওয়া, সেটা কি সত্য নয়? প্রেমের লীলায় আশা-নিরাশায় এমনি করে সন্ধি হওয়া সম্ভব; সঙ্কেত হচ্ছে, মনটাকে তুলে নেওয়া; "লীলাময়ী তুমি—যেমন তোমার খুসী, তেমনি হাঁসাও কাঁদাও; আমি আপনাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে আশার দোরে আগল দিয়েছি—আমার আর ভাববার কি রইল!" প্রেমিকের এই একান্ত আত্মসমর্পণ আর জ্ঞানীর বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা—দুইই আসলে এক বস্তু।

এমনি করে নিজকে একটু তফাৎ রাখ্‌তে অভ্যাস করলে পর আর দুটী যে আন্তর সাধনা রয়েছে—যথা **'নিরীহা'** আর **'একান্ত-শীলতা'**—তা বুঝ্‌তে বেগ পেতে হয় না। নিরীহা মানে চেষ্টার বিরতি। জড় হওয়া তার মানে নয়। কাজ করছি, কিন্তু অভিমান নাই: আমি

করছি না, প্রকৃতি **করছে** কিম্বা তিনিই **করাচ্ছেন**। শেষেরটা আর এক ধাপ ওপরের কথা, প্রেমিক জ্ঞানীর কথা; আগেরটা বিবিক্ত জ্ঞানীর কথা।

আশা আর কীর্ত্তি—এই দুটী যদি এমনি করে বাঁধা পড়ে তো একান্তশীলতা আপনা হতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বাস্তবিক আমার যদি চাইবারও কিছু না রইল, করবারও কিছু না রইল, তাহলে জগতে আমার মত একা আর কে? এই জগৎটা আমার চোখের সাম্‌নে ভাসছে—স্বপ্নের মত; আমি এর সব ঠাঁই থেকেও যেন নাই। একা আমিই আছি; অথবা আরও পাকা কথা—শুধু তোমার হয়েই আমি আছি—আর কারু হয়ে নই। এইটীই স্বরূপ কথা।

———*———

ভারতবর্ষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

মনুর যুগের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীর মাঝে অনেক ওলট-পালটই হয়েছে। পুরোণো খাত ছেড়ে নদী নূতন খাতে বয়েছে, জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, গাছ-লতা পশু-পাখীর স্থান অদলবদল হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে ক্ষাত্রশক্তি একেবারে নির্ম্মূল হয়ে গেছে। এ দেশের প্রাচীন ভাষা বেমালুম লোপ পেয়ে গেছে—আধুনিক হিন্দুর কাছে তা লাটীন বা গ্রীকের মতই অদ্ভুত ও অজানা। অথচ মনু তাঁর যুগের দরুণ জাতিপাঁতির যে সমস্ত আইনকানুন, আচার-বিচার বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, এ দেশের ধর্ম্মান্ধ আত্মঘাতীরা আজ পর্য্যন্ত তার গোলামীর মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারল না। স্বাধীন চিন্তা আজ নাস্তিকতা বা মহাপাতক বলে গণ্য। ওই মরা ভাষার ভিতর দিয়ে যা শুনবে, তাই পবিত্র! তোমার বিচারবুদ্ধি যদি "জো-হুজুরে"র মত ওই সব মড়ার বুলি আর খোশ-খেয়ালের খোসামোদ না করল তো যাও জাহান্নমে!—সবাই তোমার পানে রুখে দাঁড়াবে তখন। পুরোণো পাত্রে নূতন মদ ভরতেই হবে তোমাকে।

কর্ম্মমাত্রেই মহৎ, খেটে খাওয়ায় পুণ্য আছে। কিন্তু ওই জাতপাঁতের উল্‌টো সংস্কারে কর্ম্মের বহিরঙ্গের সঙ্গেই নিন্দা-প্রশংসা জড়িয়ে গেছে। প্রথম জীবনে যারা শিক্ষাবিমুখ থেকে হেলায় কাটিয়েছে, যৌবনে কঠোর কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাদের সে আলস্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের কুঁড়েমির শোধ দিতে হয়। তুমি আমি তাদের এই মজুরীকে ছোট বলবার কে? শূদ্রকর্ম্ম বলে নাক সিঁট্‌কাবার কে? পুরুতের, যোদ্ধার বা বেণিয়ার কাজ যেমন প্রয়োজনীয়, ওই শূদ্রের কাজও তেমনি প্রয়োজনীয় নয় কি? আজ ব্যাপারটা এমনি কদর্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পথ দিয়ে হাঁটে, সে পথে শূদ্র হাঁট্‌তে পারে না। বড় বড় সহরে-গ্রামে উচ্চবর্ণের লোকেরা থাকবেন, আর ওই দূরে,

সীমার বাইরে ওরা থাকবে। শূদ্রের ছায়াও যদি কোনও উচ্চবর্ণকে স্পর্শ করে, তাকে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। শূদ্র যদি কোনও একটা জিনিষ ছুঁয়ে দিল তো তা অপবিত্র কলুষিত হয়ে গেল, উচ্চবর্ণের লোকেরা আর তা ব্যবহার করতে পারবে না। এই সমস্ত ছোট জাতের লোকেরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সমাজের সেবা করে; তার বদলে উচ্চ জাতেরা পাতের এঁটো-কাঁটাটা তাদের ছুঁড়ে দেয়, তাই দিয়ে বেচারীদের পেট ভরাতে হয়।

হয়ত এমন সব কথা তোমাদের শোনাতে হবে যা তোমরা কস্মিন্‌কালে শোননি; তার জন্ম রামকে তোমরা ক্ষমা করো। এই যে ছোট জাতের লোকেরা, এই যে শূদ্র পারিয়া বেচারীরা—এরা রাস্তা ঝাঁট দেয়, নিজহাতে নর্দ্দামার ময়লা কাচে, পায়খানা পরিষ্কার করে; আর তার বদলে পায় দুমুঠো পাত-কুড়োনো বাসী ভাত! তাদের সম্পত্তি করবার উপায় নাই; বেচারীরা অতি গরীব। ওদের কথা ভাব্‌তে গেলে রামের বুক ফেটে যায়। বড় জাতের ছেলেপিলেরা যে ইস্কুলে পড়ে, এদের ছেলে-পিলেরা সেখানে যেতে পারে না, কেননা তাদের সাথে এরা একত্রে বস্‌লে তারা যে অশুচি হয়ে যাবে। এমনি করে যাদের পায়ের তলায় রাখা হয়েছে, তারা শিক্ষা পাবে কোথায়? কোনও রকমে তারা কায়-ক্লেশে দিন গুজরাণ করে। ভারতবর্ষ তো মহামারীর আরামনিকেতন কিনা; আর এই শূদ্র বেচারীরা এমন নোঙ্‌রা বস্তিতে থাকে যে যতরকম ছোঁয়াচে রোগের আতিথ্যসৎকারে তাদের আর জুড়ি পাওয়া যায় না। কলেরা, প্লেগ, দুর্ভিক্ষকে তারা সাদরে আমন্ত্রণ করে আনে মরণের মহোৎসবে! যারা গরীব, যারা ছোট, তারা হচ্ছে সমাজের পা বা খুঁটী বা অবলম্বন। যে স্পর্দ্ধিত সমাজ এই নিম্নজাতির উন্নতিতে বাধা দেয়, তাদের কুঁড়িয়ে রাখে, যে সমাজ তাদের ওপর অত্যাচার করে, শিক্ষার আলোক থেকে তাদের বঞ্চিত করে, সে সমাজ তার নিজের পায়ে কুড়ুল মারে। সে সমাজ অধঃপাতে যাবে না তো যাবে কে?

এই ছোট জাতেরা অধিকাংশই ছিল ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী। যে আর্য্যদের তোমরা হিন্দু বল, তারা এই আদিম অধিবাসীদের জয় করে এই হীন দাসত্বের রসাতলে তলিয়ে দিয়েছে, তাদের এই দুর্দ্দশা করেছে। যে পাপ তারা করেছিল, আজ তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আর্য্য হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদিম-অধিবাসীদের প্রতি কুব্যবহারে যে কর্ম্ম-বীজ বপন করেছিল, আজ শত শত বছর ধরে বিদেশীর পরাধীনতায় তারই ফলভোগ করছে। এই হচ্ছে কর্ম্মবাদ বা প্রকৃতির রোক-শোধ!

রাম আজ তোমাদের কাছে কথা বল্‌তে এসেছেন—হিন্দু হয়ে নয়, ভারতবাসী হয়ে নয়, কোনও জাতির কোনও সংস্কার কেউ কিছু হয়ে নয়। রামের প্রতিষ্ঠা সত্যের ওপর—অখণ্ড সত্যের ওপর; সত্য ছাড়া আর কাউকে তিনি মানেন না। রামের এই দেহ ভারতবর্ষের উচ্চতম বর্ণ হতে জন্মেছে, কিন্তু আজ তিনি তোমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন জগতের সব চেয়ে লাঞ্ছিত জাতির আর্জী নিয়ে। ন্যায়ের নামে, সত্যের নামে, যিনি পারিয়ারও আত্মা, সেই আত্মস্বরূপের নামে বল্‌ছি—এই সাম্প্রদায়িকতা আর ভেদবাদের আবরণ ছিঁড়ে ফেল—লাঞ্ছিত নির্য্যাতিতকে বুকে তুলে নাও।

এই জাতিভেদ সমস্ত দেশটাকে কি করে তলিয়ে দিচ্ছে, জান? পূর্ব্বে এর উদ্দেশ্য ছিল, কর্ম্মে ভেদ, প্রেমে ঐক্য। কিন্তু এটা আজ যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সব ওলটপালট হয়ে গেছে, ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতা হয়েছে। আজ দেখ্‌ছি—প্রেম আর সামঞ্জস্যের মাঝে সহস্র ভেদ, অথচ এদিকে সেই প্রাচীন যুগের কর্ম্মবিভাগকে বজায় রাখবার চেষ্টা।

এর রূপান্তর হওয়া উচিত ছিল না কি? আজ ছেলের হাত-পা বেড়েছে, জামাজুতায় আঁট হয়; তা এখনো তাকে সেই পুরোনো জামাজুতা দিয়ে আঁটসাট করে বাঁধা হচ্ছে! তাই চীনা মেয়েদের পায়ের মত হিন্দুর মনটা সংস্কারের ছাঁচে চেপে কুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আঁট জামাজুতার কসাকসি সর্ব্বত্র। গোঁড়া হিন্দুর শিক্ষাটা হচ্ছে দুটো দেওয়ালের ভিতর দিয়ে ছুটে চলার মত।

একটা লোক দুটো রোগে ভুগ্‌ছিল। তার পেটে ব্যথাও ছিল, চোখে জ্বালাও ছিল। ডাক্তার দেখানোতে তিনি তাকে দুটো ওষুধ দিয়ে বললেন, এইটা চোখের জন্য, আর এইটা পেটের জন্য। সে দুটোকে ঘুলিয়ে ফেল্‌ল। যে ওষুধটা পেটের জন্য ছিল, তাতে গোলমরিচ, লবণ ইত্যাদি ঝাঁঝালো জিনিষ ছিল; আর যেটা চোখের জন্য, তাতে ছিল রসাঞ্জন, দস্তা ইত্যাদি। জানই তো রসাঞ্জন খাওয়া যায় না, ওটা বিষ। আবার লবণ-মরিচ খাওয়া চলে, কিন্তু চোখে দেওয়া চলে না। লোকটা অষুধ দুটোতে গোলমাল করে যেটা খেতে হবে সেটা দিল চোখে, আর যেটা চোখে দিতে হবে, সেটা ফেল্‌ল খেয়ে। তাতে একদিক দিয়ে যেমন চোখের জ্বালা বাড়্‌ল, আর একদিক দিয়ে তেমনি পেটেরও যাতনা সুরু হল। আজ ভারতবর্ষেও এই ব্যাপারই চলছে। কার্য্যে ভেদ আর ভাবে ঐক্য—এই থাকাই না উচিত ছিল। কিন্তু এমনি দেশের দুর্ভাগ্য বা মূঢ়তা, অন্তরের ভাবে এল ভেদ, আর বাইরের কাজে হল ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা!

মামুলী আচারের এমনি বিষনজর যে, তাতে দেশের প্রাণ আর প্রতিভা জমে পাথর হয়ে গেছে। নিষ্ঠার অর্থ দাঁড়িয়েছে একোলসেঁড়ে নীতি, নিরানন্দবাদ আর মূঢ় রক্ষণশীলতা। যারা উচ্চবর্ণের, বাস্তবজীবনে তারা আত্মস্বরূপের মহিমা ও শুচিতা ভুলে গিয়েছে—বেদান্তের সত্যকে, আত্মাকে পদদলিত করে সাংসারিক খ্যাতিপ্রতিপত্তি আর আত্মকর্ম্মের ঝাঁকে ডুবে গিয়েছে। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা, কি করে তাদের মান বাঁচিয়ে রাখবে, কি করে আরো প্রতিপত্তি অর্জন করবে, স্বার্থের পরিধি কি করে আরো বাড়াবে! সাম্‌না দিয়ে তাদের কণাকড়িটিও যায় না, কিন্তু পেছন দিয়ে ছালাও পার হচ্ছে। এতেই উচ্চবর্ণের অধঃপতন ঘটিয়েছে, আর যে ছোট জাতেরা তাদের ফাঁপিয়ে তুলেছিল, তাদের মোহ আর অহঙ্কারের রসদ জুগিয়েছিল, তাদেরও সর্ব্বনাশ হয়েছে।

এর প্রতীকার কি? শূদ্রের প্রতি এমনি অত্যাচার করেছে বলে আর্য্যদের আজ পিষে মারতে হবে? এতে কি সব সমস্যার মীমাংসা হবে? না—না! কেউ যদি বেসুরো বাজায় তো তার প্রতি সবচেয়ে কঠোর দণ্ড হচ্ছে এই যে—তার সুরতাল ঠিক করে দাও! অপরাধীর প্রতি সব চেয়ে কঠোর দণ্ড হচ্ছে তাকে শিক্ষাদ্বারা উদ্বুদ্ধ করা, তার মনের অন্ধকার নাশ করা। পাপীকে যদি মারতে হয় তো মানুষকে মারলে চলে না; আসল পাপী হচ্ছে তার মনের অবিদ্যা। তাকে শিক্ষা দাও, তার অবিদ্যা দূর কর; তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই হচ্ছে প্রতীকারের পথ। সমস্ত ব্যাধির বীজ যে অবিদ্যা—তার ধ্বংস কর।

আর্য্য হিন্দুরা কি কম ভুগেছে? শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আজ আর আমেরিকা বা ইউরোপ থেকে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে না। পাপের শাস্তি তারা যথেষ্ট ভুগেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশীর পায়ের তলায় তারা পিষ্ট হয়েছে, দাসত্বে জীবন কাটিয়েছে। আফ্‌গানিস্থান থেকে বিদেশীরা এসে তাদের জয় করেছে, শাসন করেছে। গ্রীস থেকে বিদেশীরা এসে তাদের শাসন করেছে, পারসীকরা এসে তাদের ঠেঙিয়েছে। পৃথিবীর চার ধার থেকে কোন্ জাত এসে তাদের না ঠেঙিয়েছে? অপরাধের যথেষ্ট

শান্তি তারা পেয়েছে। আজ তোমরা গিয়ে সান্ত্বনা দাও, তাদের উদ্বুদ্ধ কর, যে বেদান্তবিরোধী অবিদ্যা জাতিপাঁতির গোতে তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাকে বিধ্বস্ত কর!

এই জাতিভেদের কল্পনায় তাদের উৎসাহ আর শক্তির যে অপচয় হচ্ছে, তা কি নিদারুণ, কি করুণ! নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক সব ব্যাপারেই দলাদলিতে, রেষারেষিতে বিদ্বেষবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হচ্ছে—আর তার মূলে হচ্ছে এই জাতিভেদ। ধর একজন দর্শন কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান পড়তে যাচ্ছে। যদি তার চিত্ত চঞ্চল থাকে, তার দ্বারা পড়াশুনা তো সম্ভব নয়। শিক্ষা পেতে হলে আমাদের মনটাকে স্থির রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মনকে লক্ষ্যচ্যুত করছে কিসে? কিসে আমাদের মনকে বিপর্য্যস্ত করছে? এই ভেদবুদ্ধিতে। যারা তোমার স্বগণ, তাদের সঙ্গে থাকলে ভেদ হয় না, কারু সঙ্গে ঠেলাঠেলি মারামারি হয় না—তখন পড়া-শুনা নির্ঝঞ্ঝাটে চলে। কিন্তু বিরুদ্ধ ভাবের আবর্ত্তে যদি পড়, চারদিকেই যদি তোমার প্রতিকূলতা থাকে, তোমার পড়াশুনা হবে না, কিছুতেই হবে না। এইটী মনে রেখো। আমার ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি যদি আমার কাছে থাকে, আমার পড়াশুনা বেশ চল্‌বে, কোনও গোলমাল হবে না। মনে তোলপাড় হয় কখন? যখন এমন সব ব্যাপার এসে হাজির হয়, যা আমার মনে বাজে, আমার অন্তরের সঙ্গে যা খাপ খায় না, যা আমার বহিরঙ্গ। জাতিভেদে ভারতবর্ষের চিন্তাশক্তিকে খর্ব্ব করছে, কেননা এ থাকাতে মনে হয়, আমার পারিপার্শ্বিক সর্ব্বদাই প্রতিকূল; আমার আশেপাশে যারা রয়েছে, তাদের আমি পর ভাবি, পৃথক্ ভাবি, তাতে আমার মনটা সর্ব্বদাই অস্বস্তিতে ভরে থাকে। আর তাতেই চার দিকে জাগে রেষারেষি, ঈর্ষ্যা, দলাদলি ইত্যাদি। চারটা বড় বড় জাত তো আছেই, তাদের আবার প্রত্যেকটার শত শত উপজাত—এমনি করে জাত গুণে কূলকিনারা পাওয়ার যো নাই। তার ওপর ধর মুসলমান এক জাত, খৃষ্টানরাও এক জাত হয়ে উঠ্‌ছে। তার ওপরেও থিয়জফি আছে। এমনিতর দিনে দিনে ব্যাঙের ছাতার মত কত সম্প্রদায় গজাচ্ছে আর রকম-বেরকম নামের ঝাঁকে দিন দিন নূতন নূতন জাতের সৃষ্টি করছে। আজ যদি একজন মুসলমান আসে তো হিন্দু ফাঁফরে পড়ে যায়, ক্রীশ্চান এলে হিন্দু ফাঁফরে পড়ে! এমন কি ভিন্ন জাতের এক হিন্দুর যদি আবির্ভাব হয় তো উচ্চবর্ণের হিন্দুর মনে কত না তোলাপাড়ার সৃষ্টি হয়।

এই যে জাতিভেদের এমন বিষম বাড়াবাড়ি, এতে ভারতবর্ষের মননশক্তিকে বাড়তে দিচ্ছে না —এ দেখতে পাচ্ছ না! এতে তাদের শিক্ষাও পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে না। ভারতবর্ষের শিক্ষাকে যদি সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করতে হয় তো চারদিককার আবহাওয়া এমন করতে হবে যাতে ভারতবাসীর মন অচঞ্চল থাকে। আর মন নিশ্চল হবে তখনই, যখন অস্বাভাবিক ভেদ সব দূর হয়ে যাবে, যখন এই জাতিপাঁতির সংস্কার ঘুচে যাবে।

রাম এমন কথা বল্‌ছেন না যে তোমরা আমেরিকানরাও জাতিসংস্কার থেকে মুক্ত। তোমরাও মুক্ত নও। তুমি খৃষ্টান, একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ দেখলে আঁৎকে ওঠ; এটা কি? এই তো জাতের সংস্কার। তুমি আমেরিকান; একজন স্পেনবাসী বা ইংরাজ তোমার চক্ষুশূল;—এই তো রাষ্ট্রীয় জাতিবিদ্বেষ। তোমার শাদা চামড়া; তুমি একজন নিগ্রোর সঙ্গে একজায়গায় কাজ করতে পর্য্যন্ত রাজী নও;—এই তো তোমার সামাজিক জাতিবিদ্বেষ। যদি তোমার

প্রতিবেশী বা প্রতিযোগীকে ঈর্ষ্যা কর, তাহলে তুমিও জাতিবিদ্বেষ থেকে মুক্ত নও। ঈর্ষ্যা হয় কেন? ঈর্ষ্যার মূলই হচ্ছে জাতিভেদ, আর কিছুই নয়। তোমার সহকর্ম্মীকে তোমার সামনে প্রশংসা করলে গা জ্বালা করে—এই তোমার জাতিবিদ্বেষ। আমেরিকার জাতিভেদের প্রধান বিধাতা হচ্ছেন সর্ব্বশক্তিমান "ডলার!" আমেরিকাতেও সামাজিক কুরীতি যথেষ্ট। তার নিজের চোখের পরদা খসানো উচিত, তারও সংস্কার প্রয়োজন। আমেরিকার সমাজব্যবস্থা মোটেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। আমেরিকারও বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা এর চাইতেও শোচনীয়। আমেরিকার জাতিভেদ পরিবর্ত্তসহ, নমনীয়—জীবন্ত পদার্থের যা নাকি ধর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতিভেদ হচ্ছে দম ফুরিয়ে যাওয়া ঘড়ীর মত—সে অনড়, পাথুরে—এ দেশের দোকানে যে মোমের পুতুল দেখতে পাওয়া যায়—একভাবে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তেমনি! (ক্রমশঃ)

—(*)—

অভিমান

—*—

আমার বুকের গোপন কথা
মুখে তোমায় বল্‌ব না—
যতই তাতে আসুক আঘাত
একটুও তায় টলব না।

বাদ্‌লা দিনের কাঁদন ভরা
বুকের এ সুর ঘুচবে না—
চাইনি, তবু পরশ বিনে
আঁখির এ জল মুছবে না।

জীবনভরা অনেক ব্যথা
একটী কথায় ফুট্‌বে না—
মনের কোণের মেঘখানি আজ
এটুক্ হাওয়ায় টুট্‌বে না।

জগৎভরা রূপ দিয়েছ,
সুর দিয়েছ ভুল্‌ব না—
দায়ী কে তাই এ বেদনার
সে কথা আর ভুল্‌ব না।

নীরব, শুধু আঁখির পাতে
দেখ্‌ব কিছু বলব না—
যতই তাতে আসুক আঘাত
ও মুখ চেয়ে টল্‌ব না।

যোগ

—(*)—

"যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে"—যোগ করিবে কিসের দরুণ? না, আত্মশুদ্ধি বা মনঃশুদ্ধি হইবে বলিয়া। কাজেই দেখিতে পাই, যোগের কথা বলিলেই যে কতকগুলি ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতির কথাই আমাদের মনে জাগে—সেটাই ঠিক যোগের প্রকৃত অর্থ নয়। আসল কথা হইল চিত্তশুদ্ধি নিয়া। যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিব এই আশা পোষণ করি না। নয়—যোগদ্বারা আত্মশোধন হইবে, এই ব্যাকুলতা লইয়া যোগ করিতে হইবে।

তাহা হইলেই দেখিতেছি, যোগ সকলেরই করা প্রয়োজন এবং যোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সকলেরই এক পন্থা নয় বটে—কারও বা কর্ম্ম দ্বারা, কারও বা ভক্তি দ্বারা, কারও বা বিবেক দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি করিবার সার্ব্বভৌম অধিকার সকলেরই আছে।

কতকগুলি বিষয়ে আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে—যোগ করা, সাধন-ভজন করা—এ শুধু সাধুদেরই একচেটিয়া, তাতে যেন আর কাহারও অধিকার বা প্রয়োজন নাই। যোগ করিবার কথা বলিলেই অনেকে বলেন, কেন, আমি তো সাধু নই! যেন সাধু ব্যক্তি ছাড়া কারও চিত্তও নাই, আর চিত্তশুদ্ধি করিবার দরকারও নাই।

মন পবিত্র হোক্ কে না চায়? কাজেই যোগ করিবার কথা বলিলেই কি সেটা দোষের হইল? যোগ তো এই আত্মবিশুদ্ধির দরুণই। যোগ না করিলে জ্ঞান-ভক্তি কিছুই ফুটিতে পারে না অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হইলে কোন কিছুই হইবার নয়। শুদ্ধ-চিত্তে জ্ঞান-ভক্তির প্লাবন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই যোগ করাও সকলের প্রয়োজন।

বিভূতির লোভে নয়, বিশুদ্ধির চেষ্টায় যোগ করিতে হইবে। অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলেরই কি ইহাতে অধিকার নাই? যে যে-যোগই অবলম্বন কর না কেন, আসল লক্ষ্য হইল চিত্তশুদ্ধি। কোদাল মার, কুঠার মার, যে কোন কাজই কর না কেন, সর্ব্বদা এই ভাবনা মনের ভিতর পোষণ করিয়া চলিবে যে, যাহা কিছু করিতেছি, সমস্তই চিত্তশুদ্ধির দরুণ।

নাক টেপা বা প্রাণায়াম করাই যোগ নয়—যাহাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার নামই যোগ। গীতাতেও দেখিতে পাই, যোগ কথাটার খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখিতেছি, যে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি চায়, তাহাকেই প্রথমে যোগ করিতে হইবে, চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। শুদ্ধচিত্তেই ভগবানের অধিষ্ঠান।

সাধনা বলিতে তাহা হইলে যোগ সাধনাই বুঝিতে হইবে। কেননা চিত্তশুদ্ধি ছাড়া ভগবান লাভের আর কোন উপায় নাই। যাহারা বাস্তবিকই ভগবান্‌কে চায়, তাহারা হৃদয়ে-মনে-প্রাণে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভব চায়। ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নও ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া লাভ হয় না—ইন্দ্রিয়কে বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন আপনি হইয়া যায়। কাজেই যোগ-পথই একমাত্র পথ। ভক্তির কোন সাধনা নাই, বেদান্তের কোন সাধনা নাই—এই সব হইল আজন্মসিদ্ধ ভাব। ঊর্দ্ধলোক হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইলে তো কথাই নাই—কিন্তু তোমাকেই যদি আলোর সন্ধান নিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমেই পথের বাধাকে নির্মূল করিতে হইবে তোমায় যোগদ্বারা।

মন খাঁটী হইয়া গেলে আর চাই কি? তখন তো তোমার হাতের মুঠোয় সব। ইহা আর নূতন ঐশ্বর্য্যই বা কি, চিত্তশুদ্ধি হইলে সবাই সব আয়ত্ত করিতে পারে। যোগ করিতে চাই না বলাও যা, আর আমি আমার উন্নতি চাই না বলাও তা। কেননা যোগদ্বারাই আত্মশুদ্ধি—আর আত্মশুদ্ধি হইতেই জীবনের উন্নতি।

যোগী বলিয়া অন্যকে ঠাট্টা করিতে যাইতেছ কেন? তুমি নিজেও যে যোগী—কেননা তুমি কি তোমার চিত্তশুদ্ধি চাও না? মোটের ওপর হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া যদি দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাক, তাহা হইলে তোমাকে যোগ করিতেই হইবে। তারপর ইহাও ভাবি, নিজের যদি উঠিবার চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে অপরে আর টানিয়া কতদূরই বা তুলিতে পারে? আর সে তো কচ্ছপের স্বর্গারোহণ মাত্র। সেই অবলম্বন থাকিবে না—অমনি একেবারে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

তুমি নিজেই তোমার অবলম্বন। শুধু মুখে বলিলেই চলিবে না—উপলব্ধি চাই, তাহা হইলেই আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। বৈদান্তিকের এত জোর কিসের দরুণ?—না তাঁহার আত্মোপলব্ধি হইয়া গিয়াছে—আত্মা হইতে তিনি কোন অবস্থাতেই বিযুক্ত নন। একবার কোনমতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেলে আর পতনের আশঙ্কা নাই—তখন কেবল ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধ দিকে গতি।

গীতায় আরও আছে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—সুকৌশল কর্ম্মের নামই যোগ। ইহাই যোগের সার্ব্বভৌম ব্যাপক সংজ্ঞা। স্বভাবে বা প্রকৃতির তাড়নায় যে কর্ম্ম হইতেছে তাহাকে যোগ বলিব না. যোগ বলিব তাহাকেই যাহাতে আমাকে কৌশল খাটাইতে হইতেছে, আমার চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইতেছে। কৌশল খাটাইবার কথা উঠিলেই মনে হয়, আমার একটা নিরূপিত লক্ষ্য নিশ্চয় আছে, নতুবা স্বভাবের ব্যবস্থায় আমি তুষ্ট থাকিতে পারিতেছি না কেন? এই যে লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা ও তাহার লাভ সম্বন্ধে উদ্যোগ—ইহাই যোগের মূল। মূলতঃ যোগ কর্ম্ম বটে, কিন্তু উহা স্বভাবের পথে গড়াইয়া গড়াইয়া কর্ম্ম করা নয়। যোগ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই—তাহাকে আত্মার অধীন করিবার দরুণ। এই জন্য আচার্য্যেরা যোগের বলকেই একমাত্র বল বলিয়াছেন—"নাস্তি যোগসমং বলম্।" উপনিষদেও আছে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা—সে বহু দূরের কথা। মানুষ ততদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সে চায় নিজের জেদে একটা কিছু ঘটাইয়া তুলিতে। ইহাই তো মনুষ্যত্বের পরিচয়, উর্দ্ধতন প্রকৃতির, দৈবী প্রকৃতির প্রেরণা। এ প্রেরণা যাহার ভিতর স্তিমিত, তাহাকে মানুষ বলিব? যে মানুষ, সে নিশ্চয় 'যুঞ্জান' অর্থাৎ যোগরত। গীতায় ভগবান বারম্বার অর্জ্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, যোগী হও—যোগী হও। যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপর বসিয়া নাক টিপিতে নিশ্চয়ই বলেন নাই। অর্জ্জুন এলাইয়া পড়িয়াছিলেন; ভগবান্ বলিলেন, "সঙ্কটের সময় এ কি তোমার বায়নাক্কা! এ কি আর্য্যের সাধনা? স্বর্গের সাধনা? কীর্ত্তির সাধনা? এ যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা শুধু! তুচ্ছ এ সব! ওঠ, জাগ. বীরের মুঠিতে গাণ্ডীব চাপিয়া ধর! যোগী হও!"

যোগী হও—মানে উদ্‌যোগী হও! বসিয়া বসিয়া কেবল ঝিমাইও না। একটা কিছু করা চাই। তুমি মানুষ, ভগবানের ডান হাত, সৃষ্টির বিদ্যুন্ময়ী দ্যোতনা। আর সবাই প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল হইতে পারে; কিন্তু তুমি? - তুমি যে যোগী! তোমাকে নূতন একটা কিছু করিতেই হইবে—কর্ম্মচক্রের সনাতন "লিট্" ছাড়িয়া নূতন একটা পথ

আবিষ্কার করিতেই হইবে, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিতেই হইবে, কর্ম্মের নিত্য নূতন কৌশল আবিষ্কার করিতে হইবে।

একটা বজ্রদৃঢ় ইচ্ছার প্রবল স্ফুরণ, ইহাই যোগৈশ্বর্য্য। জগতে যাহারা অভিনবের আবিষ্কর্ত্তা, তাহারাই যোগী; শুধু সিদ্ধি নয়, ঋদ্ধিও তাদের করায়ত্ত। প্রাণশক্তিতে যাহারা স্পন্দমান, তাহারাই যোগী। মহাযোগেশ্বরের এই বাণী।—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ!—যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ!" এই তো যোগ।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উত্তরকাশী

এই স্থানের নাম উত্তরকাশী হওয়ার কারণ—মহর্ষি বেদব্যাস দেব যখন নূতন কাশী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন আদ্যাশক্তি ভগবতী মায়াবলে তাঁর তপঃ ভঙ্গ করলে, কাশীপুরাধিপতি শ্রীশ্রীভগবান্ বিশ্বনাথ, ভগবতীর মায়াবলের কথা শুনতে পেয়ে, অন্নপূর্ণার স্বর্ণপুরী কাশীধামের উপর অভিসম্পাত করেন যে, "কলির আগমনে কাশীর মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং বহুবিধ ব্যভিচারে কাশী শাপগ্রস্ত হবে।" এই অভিসম্পাত শুনে সমস্ত দেবদেবী মুনিঋষিগণ বিশেষ ব্যাকুল হয়ে, উৎকণ্ঠিত ভাবে কৈলাসে এসে মহাদেবকে নানাপ্রকার স্তবস্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। কলির আগমনে ধরা পাপভারে পীড়িত হলে, জীবের মুক্তি কি ভাবে হবে জিজ্ঞাসা করেন। দেবাদিদেব তাঁদের তপস্যায় এবং স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে আদেশ করেন, "উত্তরাখণ্ডে যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরাভিমুখী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন, তোমরা সকলে সেই স্থানে গিয়ে নূতন কাশী রচনা কর এবং আমিও কলির আগমনে অন্নপূর্ণা সহ বারাণসী কাশীধাম ছেড়ে উত্তরকাশীতে এসে অধিষ্ঠিত হব।" তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে সমস্ত দেবদেবী মুনিঋষিগণ এখানে এসে কাশী রচনা করেন। যে স্থানে কেদারঘাট বিদ্যমান, সেই স্থান হতে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরবাহিনী; এ ছাড়া ভাগীরথী গঙ্গা আর কোথাও (বারাণসী কাশীধাম ছাড়া) উত্তরবাহিনী হয়ে প্রবাহিত নন।

উত্তরকাশী নামের কারণ ও উৎপত্তির বিবরণ

উত্তরকাশীধাম ভাগিরথী গঙ্গা, বরুণা ও অসি এই তিনটী নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত বলে উল্লেখ আছে। পঞ্চ ক্রোশের ভিতর তিনটী নদীই আছে বটে, কিন্তু কাশীতে কেবলমাত্র ভাগীরথী গঙ্গাই মাত্র বিদ্যমান। উত্তরকাশী হতে গঙ্গোত্তরীর পথে অসি-গঙ্গার সঙ্গমস্থান এবং নাকুরী চটী হতে উত্তরকাশী আসার সময় বরুণা-গঙ্গার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র কাঠের পুল হতে বরুণা-গঙ্গার সঙ্গমস্থান দেখতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত অসি-গঙ্গা ও কাশীধামের মধ্যে আরও একটী ছোট নদী বা বড় ঝরণা পাওয়া যায়—তার নাম বায়ুগঙ্গা। বায়ুগঙ্গা ভাগিরথী গঙ্গাতে মিশেছে।

ত্রিবেণী-বেষ্টিত উত্তরকাশীধাম

চারদিকে উচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত মাঝখানে অনেকটা সমতল স্থানের উপর উত্তরকাশী অবস্থিত। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পথে উত্তরকাশীর মত সমৃদ্ধিশালী ও রমণীয় স্থান আর কোথাও নাই।

উত্তর কাশীর দ্রষ্টব্য স্থান ও বিবরণ

উত্তরকাশীর অন্য নাম **সৌম্য বারাণসী** বা **বড়হাট**। উত্তরকাশী টিহরী রাজ্যের একটী সব্‌ডিভিসন। এখানে একজন ডিপুটী কলেক্টর সমুদয় যমুনোত্রী গঙ্গোত্তরীর দিকের উত্তরাখণ্ড শাসন করে থাকেন। এ ছাড়া ডাকবাংলা, ডিভিসনাল ফরেষ্ট-আফিস, পুলিশ ষ্টেশন, দাতব্য ঔষধালয়, হাসপাতাল, পোষ্টাফিস, সংস্কৃত বিদ্যালয়, ইংরাজী স্কুল, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম, অনেক ধর্ম্মশালা, যথা—বাবা কালী কম্বলীবালার ধর্ম্মশালা, শ্রীমৎ স্বজনানন্দজীর ব্রহ্মচারী মহারাজের ধর্ম্মশালা, জয়পুরের মহারাণী বড় রাঠোরজীর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীশ্রীঅম্বাজি ও অম্বিকেশ্বরাদি একাদশ রুদ্র-মূর্ত্তির মন্দিরসংযুক্ত ধর্ম্মশালা, শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীর ধর্ম্মশালা, পাঞ্জাবী পঞ্চায়েতী ছত্রের ধর্ম্মশালা, এবং আরও ১৫।১৬টী বড় বড় ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। এ ছাড়া বাবা কালীকম্বলীবালার ছত্রশালা, অম্বাজির মন্দিরের ছত্রশালা, পাঞ্জাবী ছত্রের ছত্রশালা, কৈলাস আশ্রমের ছত্রশালা প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। খাদ্যদ্রব্যের এবং ২।৪ প্রকার মিষ্টির ৫।৭ টী দোকান আছে।

বারণসী কাশীতে যেমন বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠলে সমুদয় বারাণসী এবং তৎসংলগ্ন সমুদয় স্থান দেখা যায় তেমনি এই উত্তরকাশীধামের উত্তরদিকস্থিত বরুণাগঙ্গা ও অসিগঙ্গার মধ্যবর্ত্তী বারণাবত

বারণাবত পর্ব্বত

পর্ব্বতের চূড়ায় উঠলে উত্তরকাশীধামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউএর মত শুধু পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়ে দর্শকের প্রাণে এক অফুরন্ত আনন্দের স্রোত উৎসারিত করে। মহাভারত পাঠে জানা যায়, পাণ্ডবগণ **বারণাবত** পর্ব্বতে অবস্থান কালে দুর্য্যোধন আপন রাজ্য নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য "জতুগৃহ" দাহ করেছিলেন। সেই "জতুগৃহ" দাহ এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং পাণ্ডবগণ এখানেই বাস করেছিলেন। স্থানীয় পাণ্ডাদের বললে তারা "জতুগৃহ" দাহের স্থান দেখিয়ে দেয়। উক্ত বারণাবত পর্ব্বতের শিখর দেশ হতে

শ্রীশ্রীবিমলেশ্বর মহাদেব

আরও এক মাইল উপরের দিকে উঠলে **শ্রীশ্রীবিমলেশ্বর** মহাদেবের মন্দির পাওয়া যায়। গ্রাম্য লোকেরাই তাঁর পূজাদি সম্পন্ন করে থাকে। উক্ত স্থান হতে আরও ৩।৪ মাইল উপরে চড়াই করলে **শ্রীশ্রীবরুণেশ্বর** মহাদেবের মন্দির পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীবরুণেশ্বর মহাদেব

এ স্থান অত্যধিক উচ্চ বলিয়া চারদিকের উপত্যকা ভূমি ও পর্ব্বতমালার শৃঙ্গদেশের শোভায় মন প্রাণ মোহিত করে তুলে। উক্ত বরুণেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী যে, যখন পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হয়ে জলাভাবে জনপ্রাণীর বিশেষ কষ্ট হতে থাকে, তখন গ্রামবাসিগণ সকলে একত্রিত হয়ে "গরম ভাত" দিয়ে বরুণেশ্বরদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আচ্ছাদিত করে দেয়, সেই ভাত ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘে ছেয়ে গিয়ে অবিলম্বে বৃষ্টি হতে আরম্ভ হয়। স্থানীয় পাণ্ডাগণ ছাড়া উপরোক্ত স্থানগুলি দর্শন করা অসম্ভব।

উত্তরকাশীর নিকটে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য একটী হাঁসপাতাল আছে শুনতে পেলাম, দেখবার সুবিধা হল না। কুষ্ঠাশ্রমটি জ্ঞানবাপী কুণ্ড হতে

কুষ্ঠাশ্রম

দুই তিন ফার্লং দূরে পশ্চিম দিকে ভাগীরথীগঙ্গার পারে, টিহরী মহারাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। হিমালয়ের ভিতর কুষ্ঠব্যাধি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। হিমালয়বাসীরা যেরূপ নোংরা অবস্থায় কালাতিপাত করে, তাতে এতদিন তারা যে

কি করে জীবিত আছে, তাই আশ্চর্য্য! উক্ত আশ্রম দেখতে হলে স্থানীয় ডাক্তার সাহেবের অনুমতি ও উপদেশ মত ব্যবস্থা করে যেতে হয়।

ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেবালয়ের মত উত্তরকাশীধামের পরশুরামদেবের মন্দিরেও দেবদাসীর প্রথা আছে। দেবদাসীগণ পূর্ব্বে সকলেই চিরকুমারী অবস্থায় থেকে শুদ্ধস্বভাবা ও চরিত্রবতী হত এবং সর্ব্বদাই দেবপূজার্চ্চনা ও সাধন-ভজন ব্যতীত অন্য কোন কাজই করত না। কিন্তু বর্ত্তমানে দেবদাসীগণ উপরোক্ত গুণাবলীর ঠিক বিপরীত গুণদ্বারা বিভূষিত হয়ে বিরাজ করে থাকে। এ রকম সুমনোরম স্থানেও এরূপ ব্যবস্থা কি করে উৎপত্তি হল, চিন্তার বিষয় বটে। আশা করি, সদাশয় টিহরী গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসী সজ্জনগণ এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য রক্ষা করতে যত্নবান হবেন।

দেবদাসী

স্থানীয় মাইনর স্কুলে বর্দ্ধমানের নিকটস্থ কোন ক্ষুদ্র পল্লীর চিরকুমার শ্রীযুত রামানন্দ ঘোষ মহাশয় বিদ্যাশিক্ষা দানে ব্রতী আছেন * তিনি জন্মাবধি পিতার সহিত বিদেশেই ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তাঁর মাতার মৃত্যু হলে তিনি জগতের নশ্বরতা উপলব্ধি করতঃ বাকী জীবন সাধুভাবে কাটাবার উদ্দেশ্যে চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করে উত্তরকাশীধামে বাস করছেন। এ জায়গায় সকলেই তাঁকে বিশেষ সম্মান করে থাকেন। ৪ বৎসর হল তিনি এখানে এসেছেন, তিনি অনেক দিন হরিদ্বারে গুরুকুলে ও ঋষিকুলেও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশেষ সৎ লোক, ব্যবহার অতীব মধুর। স্কুলটীতে বর্ত্তমানে ১২০ জন ছেলে আছে। গরমের সময় স্কুল বন্ধ থাকে, তাই আজকাল স্কুল বন্ধ। স্কুলে সংস্কৃতে B. A. পর্য্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা আছে, এবং কাশীর মধ্যমা পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের মাহিনা নাই—সবই অবৈতনিক (free)। বিদেশী কোন ছেলে বোর্ডিএ থেকে স্কুলে পড়িলে টিহরী সরকার তার খরচ বহন করে থাকেন। প্রতি বৎসর টিহরি সরকার স্কুলের জন্য ৬০০০৲ টাকা ব্যয় করে থাকেন।

এ স্থানের বর্ত্তমান ডিপুটী কালেক্টর ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান পণ্ডিত উমা দত্ত (বাংলার কায়স্থ নয়—ব্রাহ্মণ) ডাঙ্গোয়াল B. A., L. L. B. মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হওয়ার পর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অল্প দিন হল তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করে মরণাপন্ন কাতর হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন সুফল না হওয়ায় আমাকে চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। আমি তাকে দুদিন চিকিৎসা করে অনেকটা সুস্থ করে তুলি। তিনি আমাকে সেখানে কিছুদিন থাকার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীয় সকলেই গঙ্গোত্তরী যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি।

সঙ্গে নোট থাকলে এখানেই ভাঙ্গিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ এর ওপরে নোট ভাঙ্গা কষ্টকর। দশ টাকার নোটে হয় তো দু'টাকা বাঁটা দিয়েও ভাঙ্গাতে কষ্ট হবে। আমরা অনেক চেষ্টা করে কোথাও নোট ভাঙ্গাতে না পারায় ডিপুটী কালেক্টর উমা দত্ত মহাশয়কে নোট ভাঙ্গিয়ে দিতে অনুরোধ করি। তিনি ট্রেজারী হতে ১০০৲ টাকার দশ খানা নোট ভাঙ্গিয়ে দিলেন এরা বেশী দিতে পারলেন না। এই ১০০৲ টাকাই তাঁর কাছে ট্রেজারিতে ছিল না। তিনি চেষ্টা করে দোকানদারদের নিকট হতে জোর করে আদায় করে নোট ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন—কাজেই আমাদের বাঁটা লাগেনি।

টিহরী থাকার সময় শুনতে পাই, টিহরীর আয় ২৪।২৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু এখানে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে

* শ্রীযুত ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমানে 'কুতুবপুর নিগমানন্দ সারস্বত মন্দিরে' অধ্যাপকতা করিতেছেন।

পেলাম, খরচ বাদে আয় সোয়া লক্ষ টাকা। কোন কোন বৎসর জঙ্গল বিভাগে সামান্য আয় বাড়ে বটে। টিহরীর যত আয় প্রায় অধিকাংশই জঙ্গল বিভাগে-- মধ্য হিমালয়ের "চীর" গাছের দ্বারা। চীর গাছ দেখতে অনেকটা বড় বড় ঝাউ গাছের মত। এই গাছ হতেই তার্পিন তৈল উৎপন্ন হয়ে থাকে। চীর-গাছের বায়ু সেবনে কাশ, যক্ষ্মা প্রভৃতি হৃদ্‌যন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগসমূহ আরোগ্য হয়। বড় বড় চীর

চারীগাছ

গাছ কেটে টিহরীরাজ কড়ি, বর্গা, তক্তা, স্লীপার প্রভৃতি তৈরী করে বর্ষাকালে নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠ বিনা খরচায় নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে ভেসে অল্প দিনের মধ্যেই হরিদ্বারের নিকটে এলে সেগুলি তুলে বিক্রি হয়। চীর গাছ ছাড়া শাল, দেবদারু প্রভৃতি নানা-বিধ জঙ্গলী বড় বড় গাছও ঐ ভাবে কেটে নদীতে ভাসিয়ে, হরিদ্বারে তুলে বিক্রী করে থাকে। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য বনস্পতি, ঔষধির নানাবিধ জড়িবুটি, নানা-প্রকার বাগান ও কৃষিক্ষেত্র আছে—আম, জাম,

টিহরীর আয় ও কৃষি বাণিজ্যাদি

কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লিচু, আম-লকী, আখরোট, ন্যাসপাতি, আপেল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের গাছ, ধান, গম, যব, কলাই, অরহর, মরুয়া, সরিষা, রাম-দানা, ছোলা, মটর, মুগ, লংকা, আদা, তিল, মসুর, ভুট্টা, পিঁয়াজ, ভাং, আলু, শশা, মূলা, ঢেঁরস, মিষ্টিকুমড়া প্রভৃতিও স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া তামাক, তুলা, চা, বাঁশ নানাপ্রকার লাঠির গাছ প্রভৃতিও হিমাচলের স্থানে স্থানে জন্মে। চির-তুষারাবৃত প্রদেশে ভূর্জ্জপত্রের গাছ ও কস্তুরী হরিণ অনেক আছে। ভূর্জ্জবৃক্ষের ছালে লিখবার কাগজ হয়, এবং পার্ব্বত্য লোকেরা ঘরের ছাউনীর কাজে লাগায়। পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত ধান্যাদি এবং দশ হাজার ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত গম, সরিষা, যবাদি জন্মে।

উত্তরকাশী সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে আম আখরোট, ডালিম, পীচ, আঞ্জীর (বাংলার ডুমুরের মত ফল বিশেষ—তবে ডুমুর হতে বড় হয়), আলুবোখরা প্রভৃতি ফল ও নানাপ্রকার ফুলের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। শীত-কালে কোন কোন বৎসর এখানেও ২।৩ ফুট পর্য্যন্ত বরফ পড়ে—তখন খুব ঠাণ্ডা হয়। বর্ত্তমানে এখানে ১৫।১৬ জন বাঙ্গালী সাধু সাধন-ভজনে কালাতিপাত করছেন। অন্য সময় ৬০।৭০ জন সাধু এখানে থাকেন। সম্প্রতি অত্যধিক গরম পড়ায় তাঁরা সব গঙ্গোত্তরীর পথে তীর্থদর্শনে বের হয়েছেন। এখন এখানে দিনের বেলায় খুব গরম হলেও কিন্তু রাত্রি-বেলা বেশ ঠাণ্ডা—কম্বল দরকার হয়।

কৈলাসাশ্রম হতে ৩।৪ শত গজ দূরে আরও একটী মনোরম আশ্রম আছে—এ ছাড়া আর কোন আশ্রম দেখিনি। বর্ত্তমানে এখানে পাঞ্জাবী ছত্রে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বিরাজিত আছেন—তাঁর নাম স্বামী শ্রীশ্রীমৎ বিশ্বেশ্বরানন্দ তীর্থ মহারাজ। জয়পুরের মহারাণীর ছত্র হতে গঙ্গোত্তরীর পথে ধরালীতে সদাব্রত দেওয়ার প্রথা আছে। আমরা উক্ত ছত্র হতে প্রত্যেক ভিখারীই এক একখান সদাব্রতের চিঠি নিলাম। সে চিঠি দ্বারা যাবার আসবার সময় ধরালীতে দুইবার সদাব্রত পেয়ে-ছিলাম।

এ স্থানের হাঁসপাতালের অবস্থা অতীব শোচনীয়, ঔষধ মোটেই নাই বল্লেই হয়—যদিও হাঁসপাতালটি টিহরী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। উত্তরকাশীর পশ্চিম দিকে ভাগীরথী গঙ্গা পার হওয়ার জন্য একটী দড়ির ঝোলা আছে। ঝোলাটি খারাপ হয়ে গেছে। প্রতিবৎসরই ঐ ঝোলা হতে ৬।৭ জন লোক ভাগী-

বিজ্ঞপ্তি

রথী গঙ্গার প্রবল স্রোতে পড়ে মারা যায়। বর্ত্তমান ডিপুটী কালেক্টর মহাশয় অতি সজ্জন। তিনি চেষ্টা করে ভিক্ষা দ্বারা ৭০০৲

হাজার টাকা চাঁদা তুলেছেন। আরও ৪৷৫ হাজার টাকা হলে ঝোলাটি পাকা পুলে পরিণত হয়ে যায়। তিনি আমায় খবরের কাগজে এ বিষয়ে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করলেন। কোন সদাশয় দাতা যদি এ বিষয়ে সাহায্য করতে চান, তা হলে তিনি উক্ত ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুত উমা দত্ত B. A., L. L. B. মহাশয়ের নামে P. O. Uttar Kashi, Tehri, U. P. এই ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে পাহাড়ীদের অপমৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করে পুণ্য সঞ্চয় করবেন।

গঙ্গোত্তরীর পথে এই উত্তরকাশীর পোষ্টাফিসটাই শেষ পোষ্টাফিস। এর পর আর কোন পোষ্টাফিস নাই। টেলিগ্রাফ আফিস তো টিহরী ও মুসুরী ভিন্ন এ পথে আর কোথাও নাই। আমরা কয়েকখানা পত্র উত্তরকাশীতে পেলাম—অনেকে টাকাও পেলেন। এখানকার বর্ত্তমান পোষ্টমাষ্টারটী অতি বদ্ লোক। কিছু প্রাপ্তির আশায় আমাদের চিঠিপত্র দিতে এবং টাকা দিতে খুব গোল করছিল। পরে কালেক্টর সাহেবকে বলে দেওয়ায় আর গোল করেনি। তথাপি আমার একটী মণিঅর্ডার গত কালও দেয়নি—আজও না। মণিঅর্ডার আসেনি বলে স্পষ্ট বলে দেয়। কিন্তু আমি পিয়নের মারফত পূর্ব্বেই খবর পেয়েছিলাম—টাকা এসেছে। এ টাকা আগামী কাল রাতে অনেক ঝগড়ার পর আদায় করি। টাকা না দেবার কারণ, পোষ্টমাষ্টারের পোষ্টাফিসের সংলগ্ন নিজের একটী দোকান আছে; টিহরী বা মুসুরী হতে মণিঅর্ডার যাবার সঙ্গে সঙ্গে টাকাও যায় এবং সেখানে টাকা দীর্ঘদিন ডিপোজিট রাখবার নিয়ম। টাকাটি ডেলিভারী না দিলে ততদিন তো খাটিয়ে নিতে পারে—কাজেই ক্ষতি কি?

এখান হতেই যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্তরীর চিঠিপত্রাদি সব বিলি হয়। পিয়ন ভায়া প্রতি মাসে একবার করে ঐ সব স্থানে চিঠি বিলি করতে যায়। এরূপ ভাবে চিঠি বিলি করা কিরূপ ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার, পাঠকগণ একবার বুঝে দেখুন!

১৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১ মে মঙ্গলবার—আজও উত্তর কাশী থাকৃতে হল। সকালবেলা সদাব্রতের রুটী ডাল এত পেয়েছিলাম যে সঙ্গীয় সমস্ত লোকের আহার হয়েও অনেক বেঁচেছিল। পথে চটীতে কোথাও ভাল সুজী চিনি পাওয়া যায় না বলে পথের জন্য কিছু সুজী চিনি কিনে ঝোলায় পুরে নিলাম। পাগলী-মার দল আজ যমুনোত্রী হতে এসে আমাদের সঙ্গে মিশলেন।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীকাশী-বিশ্বনাথজীর মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আরতি দর্শন করে বিশেষ আনন্দিত হলাম। আরতির পর হিন্দুস্থানী সাধু-সন্ন্যাসিগণ সমস্বরে স্তোত্রপাঠ করলেন,—"জয় শিব ওঁকারা" প্রভৃতি, যে স্তোত্র আমাদের মঠে ও শাখা আশ্রম সমূহে নিত্যপাঠ হয়। আমরাও তাঁদের স্তোত্রপাঠের পর শঙ্কর ও পার্ব্বতীর মিলিত স্তোত্র গান করলাম।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১ জুন বুধবার—সকাল ৬টার সময় আমরা উত্তরকাশী ত্যাগ করে গঙ্গোত্তরীর পথে রওনা হলাম। টিহরী হতে উত্তরকাশী ৪৪ মাইল, হরিদ্বার হতে মুসুরী হয়ে উত্তরকাশী ১৩১ মাইল এবং যমুনোত্তরী হতে ৪৫ মাইল; গঙ্গোত্তরী হতে ৫৬ মাইল। উত্তর কাশীর ধর্ম্মশালা হতে ১ মাইল যাবার পর সামান্য চড়াই পাওয়া গেল। মাঝে বায়ুগঙ্গার উপরিস্থিত পুলটী পার হয়ে এসেছি।

গঙ্গোরী চটী
৩ মাইল

উত্তরকাশী হতে তিন মাইল দূরে অসিগঙ্গার উপর আবার পুল পার হলাম। এখানে একটী ছোট চটীও আছে—নাম **গঙ্গোরী**। এখানে থাকার কোন সুবিধা নাই। উত্তরকাশী নিকটেই বলে কেউ বড় এখানে থাকে না। গঙ্গোরী চটী হতে বের

নেতালী ৩ মাইল

হয়ে মাইল তিন দূরে **নেতালী** নামে চটী পেলাম। এ চটীটিও গঙ্গোরী চটীরই যমজ ভ্রাতা—অতি খারাপ, কোনরূপে পয়সা উপায়ের ব্যবস্থা করে রেখেছে মাত্র। মাঝে একটী বড় ঝরণার উপর সামান্য কাঠের পুল পার হয়ে এসেছি। নেতালী চটী হতে বের হয়ে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করার পর **মনোরী** চটী পেলাম।

মনোরী ৪ মাইল

পাশেই প্রকাণ্ড ঝরণা গঙ্গাতে পড়েছে। আজকার পথ অতি সুন্দর; তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ১০ মাইল পথ অতিক্রম করে এলেও কোন কষ্টই হয়নি বরং আনন্দই হয়েছে। আমরা সকাল ৯ টার সময় মনোরী চটীতে পৌঁছি। মনোরীর দোকানদারগণ কিন্তু বিশ্বাসই করতে চায় না, আমরা উত্তরকাশী হতে অত সকালেই ১০ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছি। কারণ ১০ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাদের যে সারা দিন চলে যায়!

এখানে গঙ্গার গর্ভে যে সকল পাথর এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে, সেগুলি খুব কাল। এমন ঘোর কাল পাথর হিমালয়ের ভিতর আর কোথাও দেখতে পাইনি। ঝরণায় স্নান না করে গঙ্গাতেই স্নান করলাম। শ্রীমৎ স্বজনানন্দজী ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত একটী দোতালা ধর্ম্মশালার দোতালায় আমরা স্থান নিই। এ ছাড়া আরও দুটী ধর্ম্মশালা আছে। নিকটেই একজন দোকানদার আছে, তারও ঘর আছে বটে, তবে ধর্ম্মশালাতেই সুবিধা হওয়ায় ধর্ম্মশালাতেই থাকি। এখানে মাছির উপদ্রব খুব বেশী। জিনিষপত্রের দর মন্দ নয়। ভাল বাঁশমতি চাউল টাকায় ⁄১। মোটা ⁄২॥—⁄৩ সের, আটা ⁄৪ সের, ঘী ⁄॥ সের, আলু ⁄৬ সের, দুধ ।॰ আনা সের। এখানে গঙ্গার ধারে একজন মুচি আছে, সে নূতন জুতা তৈরী করে দেয়, দাম ৸৹—১৲ জোড়া। কিন্তু কাঁচা চাম্‌ড়া হওয়ায় সে জুতা ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর বটে। হরিদ্বার হতে নূতন kiddsএর জুতা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেও কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের জুতা ছিঁড়তে আরম্ভ হয়েছে। উত্তর কাশীতে একবার মুচীর দ্বারা মেরামত করে নিলেও আজ মাত্র এই দশ মাইল পথ আস্‌তেই আবার ছিঁড়ে গেছে,—এখানে আবার মেরামত করে নিলাম।

দ্বিপ্রহরের আহারের পরই বিশ্রাম না করে আরও এগিয়ে যাবার জন্য বের হয়ে পড়লাম। আজকার রাস্তা বেশ ভাল। সামান্য সামান্য চড়াই উৎরাই থাক্‌লেও বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি। ৪ মাইল

কুমালটি ৪ মাইল

পথ অতিক্রম করে একটী ছোট চটি পেলাম—নাম **কুমালটি।** চটিটি দেখে বোধ হল, এবার কুম্ভমেলার জন্য অতিরিক্ত যাত্রী হবে আশাতে, কিছু লাভের জন্য লতাপাতা দ্বারা সামান্য একটী ঘর করে চটি খুলেছে। তাতে ৩.৪ জন লোকের বেশী থাকা যায় না। আমাদের সঙ্গের অত লোকের আশ্রয় সে চটিতে হতে পারে না। অধিকন্তু যে ৩।৪ জন থাকার ব্যবস্থা আছে, তারাও হয়তো বৃষ্টি হলে বাইরে থাকার মত কষ্ট ভোগ করবে। কাজেই আমরা আর না থেমে আবার চলতে লাগলাম। উক্ত চটী হতে

মাল্লাচটী ২ মাইল

দু মাইল এসে আবার একটী চটী পেলাম —নাম **মাল্লা** চটী, মাল্লা চটির অবস্থাও পূর্ব্বোক্ত চটীর মত অতীব হীন। কাজেই এখানেও না থেমে আবার চলতে লাগলাম। ধীরে ধীরে দুমাইল পথ অতিক্রম করে **ভটবাড়ী জংশনে** পৌঁছি। তখন সূর্য্যাস্ত হলেও কিন্তু

ভটবাড়ী জংশন ২ মাইল

আঁধার হয়নি। এই ভটবাড়ী জংশন হতে বুড়াকেদার হয়ে ত্রিযুগী নারায়ণের পথে ভীষণ পাকদণ্ডীর বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে যেতে হয়।

সেই ভীষণ বিপদসঙ্কুল পথের বিবরণ পরে বলবো। আমরা এই পথেই ত্রিযুগী নারায়ণ হয়ে কেদার বদরী গিয়েছিলাম।

ভটবাড়ীর অন্য নাম **ভাস্কর প্রয়াগ।** ভাস্কর প্রয়াগ ভাস্কর গঙ্গা ও ভাগিরথী গঙ্গার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এখানে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভাস্করেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। বাবা কালীকম্বলীবালার স্থাপিত প্রকাণ্ড দোতালা ধর্ম্মশালাও আছে, উক্ত ধর্মশালার নীচেই ভাগীরথী গঙ্গা ও ভাস্কর গঙ্গার সঙ্গমস্থল অবস্থিত। স্থানটী সমৃদ্ধিশালী ও জংশন বলে অনেক লোক পূর্ব্বেই এসে ধর্ম্মশালা অধিকার করে বসেছে। ধর্ম্মশালায় তিলমাত্র স্থান নাই। একজন দোকানদার আছে বটে, কিন্তু তার কোন ঘর নাই। দোকানদারটি লোক ভাল। অনেক অনুসন্ধান করে কোথাও জায়গা না পাওয়ায় ডাকবাংলার পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত প্রান্তরেই থাকা স্থির করলাম। ক্রমে রাত হয়ে অন্ধকার হতে লাগলো, আজ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। সাথীরা কেউ এসে পৌছায়নি, তাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। অন্ধকারের আবছায়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে প্রায় সকলেই এসে পৌছলেন, কিন্তু হরিদাস ভায়া ও মণিরাম কুলীর কোন খোঁজ নাই। বাধ্য হয়ে তাদের খোঁজ করার জন্য হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধে গেছে, মাইলখানেকের উপর যাবার পর দেখতে পেলাম, দুজনাই পাথরের উপর বসে সিগারেটের সুমধুর স্বাদ গ্রহণ করছে। অতি পরিশ্রমের পর হতাশ হৃদয়ে সিগারেট এক আনন্দের জিনিষ বটে! (অবশ্য যারা খায় তাদের পক্ষে!) চাঁদনী রাতের পর অন্ধকার জমাট বেঁধে যাওয়ায়, পথ দেখা যায় না বলেই তাদের আস্‌তে কষ্ট হচ্ছিল। হরিদাস ভায়ার নিকট যে টর্চ্চ লাইট ছিল সেটী মণিরামের বোঝার ভিতর থাকায় এতক্ষণ বের করেনি, এখন বসে বসে চিন্তা করছেন, বোঝাটি খুলে টর্চ্চ লাইট টা বের করে নিই! এ পথে একটী ভাল টর্চ্চলাইট বিশেষ উপকারে আসে। আমি পৌছে যাওয়ায় আর টর্চ্চ লাইট খোলবার দরকার হল না, তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম। আজ সমস্ত দিনে আমরা এই পার্ব্বত্য ভূমি ১৮ মাইল অতিক্রম করলেও কিন্তু পথ ভাল থাকায় কোন কষ্ট হয়নি।

ভাস্কর প্রয়াগ বা ভটবাড়ীর বিবরণ

এখানেও পাণ্ডা আছে, বেচারার এমন ঝোঁক যে রাতেই ভাস্কর প্রয়াগে তীর্থকৃত্য করার জন্য খুব অনুরোধ করল। আমরা ফিরে এসে করব বলে তাকে সান্ত্বনা দিই। ফিরে এসে কিন্তু করার সুবিধা হয়নি। এ পথে ফিরে এসে কিছু করব, এ সংকল্প মনেও স্থান দিতে নাই। শুধু এ পথে কেন, পরে করব বলে কাজটী ডিপোজিট রাখলে সে কাজ হওয়া সুকঠিন।

আজ অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য প্রায় সকলেই সেই উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সবুজ ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমরা কয়েকজন চটীবালার পাকশালাতেই আলু ভাতে ভাত করে নিলাম। রাত্রে কিন্তু বেশ শীত লেগেছিল। (ক্রমশঃ)

একটা পথ

—✱—

বুঝেছি, এখনও অন্তরে ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা আসেনি। পাওয়ার ইচ্ছা যদি খাঁটী হত তাহলে কি আর পাওয়ার বস্তু দুর্লভ হত? অভাব জাগে বটে, সময় সময় প্রাণের আকুলতায় অধীরও হয়ে যাই—কিন্তু তাতে দেখছি বরং ক্ষতিই হয়; কেননা উত্তেজনার পর অবসাদ আসবেই। একটা শান্ত স্নিগ্ধ প্রেরণার অনাবিল প্রকাশ যদি অন্তরে জাগ্রত হয়ে উঠত, তাহলেই বোধ হয় বেদনার হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেতাম। কিন্তু কৈ, প্রাণে তো সে আকুলতা আসে না। এখনও যে মন-বুদ্ধি জড়, কোন কিছুই স্পষ্ট চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে না; যেন সব আবছায়া—কিছুতেই বিশ্বাস নাই—কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নাই। সত্য বস্তুর লাভের এই কি পূর্ব্ব লক্ষণ?

ভগবান নিজেই বলেছেন, "যে আমাকে পেতে চায়, আমি তাকে নিজেই উপায় বলে দিই।" কিন্তু কৈ, আমি তো একটা নিশ্চিত উপায়ের অনুসন্ধান এখনো পেলাম না। ভগবানকে চাই—মিথ্যে কথা! প্রাণের সে অদম্য উৎসাহ কোথায়? জীবনপাতী তপস্যার অবিচলিত নিষ্ঠাই বা কোথায়? শুধু শুধুই বলছি, ভগবানকে চেয়েও পাচ্ছি না।

আমার এই নিঃস্ব দুর্ব্বল প্রার্থনায় কে কর্ণপাত করবে? একেবারে চাই না, এ কথাই বা বলি কেমন করে? তাহলে এই আর্ত্তনাদ—অভাবের এই উৎপীড়ন কেন? বুঝেছি, একেবারে অচেতন নয় আমার হৃদয়—তবে কিনা এখনো ঠিক পথ ধরতে পারিনি। পথ পাওয়ার দরুণ এখনও অনেক বাহুল্য পথে ঘুরে মরছি!

পাতঞ্জলেও আছে, 'তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।' তীব্রসংবেগসম্পন্ন যোগীরই সমাধি আসন্ন। কাজেই পাওয়ার দরুণ ভিতরে যখন তাগিদ আসে, তখন আর কোন বাধা-বিপত্তি কিম্বা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে পারে না। চেয়েও পাচ্ছি না, এ কথা বললে মারাত্মক ভুল করা হয়। বরঞ্চ চাওয়াকে খাঁটী করার দরুণ তাঁর কাছে দৈনন্দিন প্রার্থনা কর। অন্তরে যাতে অদম্য আকুলতা আসে, তার দরুণ ভিতরে তীব্র সংবেগ উৎপন্ন কর!

মোট কথা, সব সময়ের দরুণ ভিতরটা জ্বলতে থাকবে। অতৃপ্তির অগ্নিশিখা, বাঞ্ছিতের অপ্রাপ্তিতে বেদনা বোধ কিছুতেই লাঘব হবে না—উত্তরোত্তর কেবল বাড়তেই থাকবে। বাস্তবিক যার ভিতর বিরহাগুনে জ্বলে গিয়েছে—তার পক্ষে সাময়িক তৃপ্তি তো অতি তুচ্ছ।

মন যখন সচেতন থাকে, তোমার দেহ হয়ত তখন নানা ওজর-আপত্তি তুলে বিঘ্ন ঘটিয়ে বসে। দৈনন্দিন সাধনায় মাঝেই তো দেখতে পাও—হয়ত মন তোমার বেশ প্রফুল্ল, তুমি মনে করেছ আজ রাত জেগে সাধনা করবে, কিন্তু কতক্ষণ সে জোর থাকে বল দেখি? একটুখানি বসলেই মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে আসে, ঘুমে অচেতন করে ফেলে। তবু তো সাধন-ভজন করার ইচ্ছা যায় না। আমি বলি ঠিক ঠিক সাধন-ভজন করার বাসনা জন্মে থাকলে, এত প্রতিবন্ধক এসে জুটবে কেন আর যদিই বা এসে জোটে তাহলেই তাদের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়বে কেন? তাই বলি, বৃথা তোমার অহঙ্কার—বৃথা তোমার গর্ব্ব! "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই তোমার পথ।

আর তোমার কথায় বিশ্বাসই বা করি কেমন করে? সত্যি সত্যি যদি সত্যলাভের পিপাসা তোমার ভিতর জাগ্রত হয়ে উঠত, তাহলে একমিনিট সময়ও যে তোমার বৃথা অপব্যয় হত না। ঠিক ঠিক আকুলতা এসে থাকলে সব সময় সে আকুলতা লেগে থাকবে—একে কি আর মুলতবী রাখা যায় তখন, যে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে তারপর আমার আকুলতাকে জাগ্রত করব? বিশ্লেষণ কর, দেখবে কত ভণ্ডামী বের হয়ে পড়ে।

মিথ্যা অভিমানের চেয়ে আত্মসমর্পণ শতগুণে শ্রেয়ঃ। বরঞ্চ প্রার্থনায় একটু জোর পাবে—অন্তর বিনম্র হলে একটু আধটু কৃপাও হয়ত বর্ষণ হতে পারে। আত্মশক্তির অভিনয় দেখিয়ে কি লাভ! শক্তি নাই অথচ লাফালাফি, একেই তো গীতায় বলছে—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে।" কাণাকড়ির সামর্থ্য নাই অথচ সাধন-ভজন করে ভগবান লাভ করব এ স্পর্দ্ধাটুকু ষোল আনাই আছে!

শুধু শুভ ইচ্ছা থাকলে তো চলবে না—দেহে বল থাকা চাই, মনে-প্রাণে অদম্য উৎসাহ চাই, তবে না সিদ্ধিলাভ। যেখানে দেখছ, শক্তি-সামর্থ্যে অপারগ তুমি, সেখানে আত্মসমর্পণ করতে বাধা কি তোমার? লাফালাফি, ঝাঁপা ঝাঁপি না করে বরঞ্চ বল—প্রভু! আমি শক্তিহীন, সঙ্কল্প করেও তা সাধন করে উঠতে পারি না—কাজেই অন্তরে আমায় বল দাও!

দীনতায় তোমায় মলিন করবে না। বরঞ্চ ভিতরের সম্পদে তুমি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তখন। করেও কিছু হল না, এ বলার অধিকার তোমার নাই—কেন না শেষ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার ধৈর্য্য এবং শক্তি তোমার নাই। সহজ কথায় প্রাণের ভাব অভিব্যক্ত কর—বল, প্রভু! আমার অমন শক্তি নাই যে আত্মবলে তোমায় লাভ করতে পারি। আমি তোমার শরণাগত—প্রপন্ন!

একটা পথ ধর—মাঝামাঝি পড়ে এ টানা-হ্যাঁচড়াতে তো তো কোন লাভ নেই। বরঞ্চ এতে দিন দিন ক্ষতিই হচ্ছে। সাধন করবার একতিল শক্তি নাই—অথচ সাধন-ভজন করবই। বেশ তো, ভালই ছিল, এ জিদ যদি সব সময়ের দরুণ থাকত। কিন্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে তোমার রুচির পরিবর্ত্তন! এমন অব্যবস্থিত চিত্ত নিয়ে সাধন ভজন চলে?

যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়, তার চেয়ে বেশী আশা পোষণ করতে যেও না। কল্পনাবিহারী হয়ে কি লাভ! দেখছই তো এতে কেবল অশান্তিই বাড়ছে দিন দিন। আদর্শ মহৎ থাকুক কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যেন একেবারে নিঃসম্পর্ক না হয়। অচল আদর্শের কোন সার্থকতা নাই—আদর্শ যদি জীবন্ত হয়, তাহলে তোমার প্রাণে অসীম বল আসবে। যা চাও তা তুমি যে কোন উপায়েই হোক লাভ করবেই করবে। জগতে প্রাপ্যের অভাব নাই, পিপাসা যদি ঠিক্ ঠিকই লেগে থাকে, তাহলে পিপাসা না মিটিয়ে স্বস্তি নাই।

এখনও ঢের সময় আছে, সঙ্কল্প স্থির করে ফেল। ভিতরে বল পাও তো "উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানং"—আত্মশক্তি দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার কর, নতুবা "শরণং ব্রজ।" সবার দরুণ তো আর এক পথ নয়। মোট কথা, ভিতরে কোন রকম প্রবঞ্চনা যেন না থাকে। তোমা দ্বারা যা হবার নয়, তার দরুণ প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। চোখ বুজেও যদি কোদাল-কুঠার মারবার চিন্তাই জাগে—বেশ তো, তাতেই বা ক্ষতি কি! কোদাল কুঠার নিয়ে লেগে পড়। তবু দোহাই তোমার, ভণ্ডামী করে যেন জীবনের উন্নতি-পথের সর্ব্বনাশ না কর! ধৈর্য্য ধর, প্রার্থনা কর, সময় হলে সব হয়ে যাবে। কেন মিছামিছি হা-হুতাশায় দিন অতিবাহিত করছ? দেখাদেখি নাচাতে কোন ফল নাই। আজ হয়ত এক যোগীর কথা শুনলে, অমনি যোগসাধনা আরম্ভ করে দিলে, কাল হয়ত আর একজন প্রেমিকের কথা শুনলে, অমনি প্রেম-সাধনা আরম্ভ করে দিলে—এতে তো কোন লাভ নাই। প্রমত্ত না হয়ে, বেশ স্থির-ধীর গম্ভীর চিত্তে জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অনুসন্ধান কর। গুরুকৃপায় যদি সন্ধান মিলে যায়, তাহলে আর চিন্তা কি—অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে পথেই জীবনকে চালিয়ে দাও।

—*—

রহস্যময়

ঘটনা-বিপর্যয়ের সঙ্গে বা ভাল-মন্দ বিচারাড়ম্বরের ঘুলাইয়া না ফেলিয়া জীবনটাকে যাঁরা একক ভাবে এবং বেশ তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দেখিবেন—সব চেয়ে আনন্দকর বোদ্ধব্য নিজের মাঝেই আছে, আবার বুঝিয়া শেষ পাওয়া যায় না এমনি বস্তুও সেইখানেই। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় বিস্ময়কর ব্যাপারই হইল একটী জীবের জীবন লীলা। সে কিসে বাঁচিয়া আছে, কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে—ইহার অনুসন্ধানে নিত্য নব নব রহস্যকে আবিষ্কার করিয়া হৃদয় ধন্য হইতেছে। আমারই সব অথচ আমার হাতে কিছু নয়—এ এক অপরূপ রহস্য বটে! সে শূন্য না পূর্ণ—প্রমাণ নাই। তবু অহরহঃ প্রমাণ পাইবার চেষ্টা চলিতেছে। মনে হয়, আমার কিছু করিবার নাই জানিয়াও আমাকে করিতেই হইবে, অথবা আপন খুসীতে আমি করিয়াই চলিয়াছি। হিসাব দিতে হীন বোধ হয়, হিসাব চাহিতেও প্রবৃত্তি নাই;—শুধু ঘটে ঘটে দেখিতেছি আমারই প্রতিচ্ছায়া—এক অভিনব সুবোধ-দুর্বোধ রহস্যময় জীবনলীলা। আমাদের খানিকটা আমরা জানি, খানিকটা জানি না—দুশ্চেষ্টা করিবার কিছু নাই—চরম আশ্বাস ইহাই।

এই রহস্য আমাদের মাঝে আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি; শুধু গতানুগতিক ভাবে টিকিয়া থাকা নয়, আমারা আনন্দে বাঁচিয়া আছি। নিত্য নূতন রহস্য সৃষ্টি করিতেছি, পালন করিতেছি, সংহার করিতেছি; ব্রহ্মাণ্ডের লীলা এই দেহপিণ্ডে হইতেছে ঐ রহস্যকে কেন্দ্র করিয়াই। সাধারণতঃ জীবনের সে দিককে আমরা জানি না, জানার অপেক্ষাও সে করে না—রহস্যময়ের রহস্যলীলা স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

ধর্ম্মাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি অন্তর্ম্মুখীনতা হয়, তবে বলিব—জীবন-রহস্য মন্থন করিয়া যে রহস্যামৃত উদ্ভূত হইবে, তাহাই ধর্ম্মের প্রাণ, ঐ রহস্যরসই ধর্ম্মের স্বরূপ।

কর্ম্মমত্ত জীবন ইহাকে অজ্ঞাত রাখিয়া অহংএ মজিয়া আছে; তাই তার আকুলিবিকুলির অন্ত নাই।

মহাপুরুষেরা জগতে আসেন আমাদের ঐ ভুল ভাঙ্গিতে; কর্ম্ম নয় শুধু, ধর্ম্মও করিতে হইবে; অহঙ্কারেই সব আয়ত্ত হয় না, দর্পহারীর চরণতলে শির অবনত করাও দরকার বটে। কেননা স্বরূপতঃ আমরা সান্ত নই, আমরা অনন্ত, অগম্য, রহস্যময়। এই দিকটায় চোখ ফিরাইয়া দেওয়ার চেয়ে বড় হিত কেহ কাহারও করিতে পারিবে না, কোনদিন পারেও নাই। প্রত্যেকে নিজের ভিতর সেই রহস্যময় আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করুক—ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য।

আমাদের জীবনের যে অংশকে আমরা কিছু নয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছি, অথবা বাজে চিন্তায় কাল কাটাইতেছি, আসলে হয়ত ঐখান হইতেই যাবতীয় কিছুর যোগান আসিতেছে। ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। নিজের ঘুম কি নিজে বুঝিতে পারা যায়? যদি যাইত, তবেই তো দুনিয়ার শাহানশাহ হইতে পারিতাম। দেহের ঘুম, মনের ঘুম আমাদের ঐ রহস্যময় সত্যে নিয়া বিশ্রাম করাইয়া আনে বলিয়াই ফুরাইয়া যাওয়া শক্তিকে আমরা পুনরায় ফিরিয়া পাই।

তর্কের তোড়ে মুখে হয়ত তাহাকে মানিব না, কিন্তু প্রাণ নাচার—কেননা সেই হইল জীবনের রহস্যভাণ্ডারের ভাণ্ডারী। আমাদের প্রাণে প্রাণে

ঐ দুর্ব্বোধ বস্তুটীর প্রতি একটী অযৌক্তিক আকর্ষণ আছে! হয়ত সাধকেরা যে মনে-প্রাণে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাতেই ধ্যানস্থ—বুঝি বা এই বস্তুটির প্রতিই তাঁরা আকৃষ্ট!

আমাদের কর্ম্মকোলাহলের মাঝেও ঐ রহস্য নিষ্প্রয়োজন নয়। কোথাও ঠেকিয়া পড়িলেই, যখন আর ব্যক্তিগত বিচারে বা শক্তিতে মীমাংসা পাওয়া অসাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা সেই অব্যক্ত "কিছু-না"র দিকেই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও বলিতে পার, বাধ্য হইয়াও বলিতে পার—মুখ ফিরাইয়া থাকি। সেখান হইতে চাপরাশ না আসা পর্য্যন্ত আমাদের নড়িবার সাধ্য থাকে না। আমাদের সমস্ত কিছু যে ঐ কিছু-নার কটাক্ষে স্তম্ভিত হইয়া যায়, ইহা তখনই বোঝা যায়। নানা ব্যাপারে যখন বুদ্ধি শ্রান্ত হইয়া শেষে শূন্য অনালম্বন হয়, তখনি ঠিক সত্য ফোটে।

তবু আমরা ব্যর্থ চেষ্টা করি। একটা কিছু করিতেই হইবে বলিয়া থাকি। বুঝি এমনি করিয়া আমাদের নাচাইয়া ফিরাইয়া রহস্যময়ের কিছু সুখ আছে ;—ঐ সেই সনাতন যুক্তি—মিথ্যা না থাকিলে সত্যের প্রকাশ হইত না বুঝি! যাই হোক, এ সম্বন্ধে সব 'কেন'র একান্ত কৈফিয়ৎ দেওয়া চলিবে না। তবু মানিয়া লইতে হইবে—আমার বুদ্ধিতে আমার শেষ আমি পাইব না, একটা কিছু রহস্য এ জীবনসৃষ্টির মূলে আছে, যাহা বুঝিয়া দেখিলেই সেই-দিন হইতে কাজের সংসারে ভাত উঠিবে। সবই বুঝিয়া-শুনিয়া নিজকে ফুরাইয়া ফেলিলে কাজ চলিবে কিসের আকর্ষণে?

গুরুর কাছে একটা কিছু পাইবার আশা করিয়া শিষ্য আসে। সে বস্তুটী কি, সে তাহা জানে না। ঐ থানটীতে গুরুও রহস্যময় হইয়াই বসিয়া আছেন। চিত্তের বাচালতা থামাইয়া মানিয়া লইতে হইবে শুধু-হাঁ, একটা কিছু আছে এবং উহাই আমার চরম প্রাপ্তব্য। সর্ব্বদা এড়াইবার চেষ্টা নয়—পর্য্যাপ্ত থাকিবার স্থৈর্য্য—ইহাতেই ক্রমশঃ তাহা সুস্পষ্ট হইবে।

ঐ রহস্যময় বস্তুটী চিরভবিষ্যৎ। তাহাকে পাইব পাইব জানিয়াই কত আনন্দ! যখন পাওয়া হইবে, তখন আর আমাতে আমি থাকিব কিনা, সে বিচার কে করে! গুরুনির্ভর বলিতে এই রহস্যের অস্তিত্বে সুবিশ্বস্ত হওয়া। তিনিও মনের গোমর ভাঙ্গিবার জন্য রহস্যকে চাপিয়াই রাখিতেছেন। আমার প্রাপ্তব্য এবং প্রাপ্ত—এই উভয়ে যুগলমিলন কেন ঘটিবে না ইহা ইহা তো বুঝিতে পারি না। তিনিও তো ব্যর্থ-শঙ্কার নিরাসই প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। সমস্ত বিরহজ্বালার মাঝেও ঐ রহস্যময় মিলনের প্রশান্ত আভাস অনুভব কর না কি? যে মুহূর্ত্তে তন্ময় হইব, সেই মুহূর্ত্তে পাইব—ইহা কি সত্য নয়?

মনের মাঝেও এই রহস্যময় দিকটাই রহিয়াছে। সে ভালমন্দ দুই-ই হইতে চায়। সে যে জীবন্ত, তার চাঞ্চল্য দিয়া সে তাহাই পরিব্যক্ত করে। আর বাস্তবিক যদি তা না থাকিত, জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিত। যে কোন দিকে আমাদের যাইবার রাস্তা রহিয়াছে বলিয়াই বিশেষ একদিকে যাওয়ার মাঝে আমরা যেমন সার্থকতা পাই, তেমনি গৌরবও অনুভব করি। মনের মত এমন একটা রহস্যময় বস্তু হাতে না পাইলে কি লইয়া যে আমাদের দিন কাটিত, তাহাই ভাবি। মুহুর্মুহুঃ মনোদর্পণে সেই চিররহস্যময়েরই প্রতিচ্ছায়া পড়িতেছে।

তুমি স্বাধীন—তাহার অর্থ হইল এই, তোমার হাতে এমন কতকগুলি জিনিষ দেওয়া হইয়াছে, যাহা-দের কোন তালের ঠিক নাই, খামখেয়ালের ইতি নাই; কেবল লম্ফঝম্ফ আর তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়া সংসারটাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি-তেই প্রতিনিয়ত ব্যগ্র তাহারা; তাহাদের লইয়া তোমাকে তালে তালে কাজ করিতে হইবে, সেই

জন্যই নিজকে তুমি নিজের অধীন করিয়াছ, তাই তুমি স্বাধীন। উপাদান সর্ব্বত্রই এক, কিন্তু কে যে কি দিয়া ফুটাইয়া তুলিবে, এইটাই অনিশ্চিত রহস্য-নিমজ্জিত। কেহই তো জানে না, তাহাদ্বারা কি হইতে পারে না পারে!

শেষ পর্য্যন্ত না বুঝিয়া আপাতবুদ্ধিতে যা তা একটা রায় দিয়া বসি, অল্প লইয়া থাকি, অল্পেই ফুরাইয়া যাই। যায় কোথায়? কিছুই তো যাইবার নয়। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সত্যবস্তুর আভাসও যাহারা পাইয়াছে, তাহারা প্রতি খণ্ড ব্যাপারের পিছনে সেই অখণ্ড রহস্যময় সত্তার ইঙ্গিত অনুভব করিবে। চোখ ফুটিয়াছে মনে করিয়া অহঙ্কারে দিশেহারা হই; সত্যি যদি চোখ ফুটিত, তবে দেখিতাম—চোখ বুজিয়া থাকিলেই দেখা যায় ভাল; ধ্যানস্থ হইতে পারিলেই স্বরূপ মিলে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আমাদের ঠকাইতেছে, জগতের যথার্থ রহস্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। পাইয়াছি মনে করার মত ভুল নাই—

"এ সংসারের হাটে, আমার যতই দিবস কাটে,
(আমার) যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে;—
কিছুই আমার হয়নি পাওয়া—যেন এই কথাই রয় মনে!—
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে-স্বপনে!"

ক্ষণে ক্ষণে লাভ করি এই রহস্যময় সত্তার বিরহ, তাঁহার জন্যই জ্বলিয়া-পুড়িয়া ধন্য হই। অন্তরের দিকে এই চক্ষু আমাদের ফুটুক—বাহিরের 'ফুরিয়ে-যাওয়া' দৃষ্টি অবনত শিরে সেই মহৎ প্রভাবকে স্বীকার করুক!

অন্তরে অনুভবের অভাব ঘটিলেই বাহিরের ছোটখাট অভাবে চঞ্চল করে—দিশেহারা হইয়া মানুষ যা-তা করিয়া বসে। রহস্য বুঝিবার প্রতীক্ষায় জাগ্রত একাগ্রচিত্ত হইয়া না থাকিলে অনুভব পাইবে কেন? প্রকৃতির নিয়মে পাইতে পারিতে; সুষুপ্তি-দশায় কিছুটা পাও বটে। কিন্তু সে পাওয়া চরম নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি রোমকূপ দিয়া পুলকভরে যে সত্তাকে পান করিবার কথা, তাহাকে ক্ষণিকের পাওয়ার সঙ্গে ঘুলাইয়া ফেলিবার কিছু নাই, হারাইবার বস্তুও সে নয়!

এইখানেই যার শেষ হইয়া গেল, এর বেশী বলিতে গেলে যার রসভঙ্গ হইবে, আমার বুদ্ধির দৌরাত্ম্যে আমি তাহার জের টানিয়া চলিতে চাই। দেশ এবং কালজ্ঞান আমাকে পরাজিত করে। একটার সঙ্গে আর একটা মনে মনে জোড়া তাড়া দিয়া মন একটা কিছু খাড়া করে—বলে হাঁ, এই চরম সিদ্ধান্ত, ইহাকে স্বীকার কর! কিন্তু সত্যপ্রিয় হৃদয় কাহাকেও শেষ করিয়া ফেলিতে চায় না, সে বলে, তুমি থাক, কিন্তু আমার চিরকালের না-পাওয়া হইয়া থাক; এইখানে এখনই যদি তোমার শেষ পাইয়া ফেলি, তাহা হইলে……উঃ সে যে কি বিষম রিক্ততা! না, না, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না! আমার বিরহই ভাল! যদি তুমি সত্যিকার পরম প্রিয় হও, তবে তুমি শুধু আজকার নও, তুমি চিরদিনকার, প্রতি ক্ষণে নিত্য নূতন করিয়া পাইবার!

জীবনকেও এমনি রহস্যমণ্ডিত বলিয়া জানি। কেবল নীরবে চাহিয়া থাকা—কিসের পর কি হয়, দেখিয়া যাওয়া। হয়ত যেটাকে তুমি 'আত্মশক্তি' ভাবিয়া বড়াই করিতেছ, উহা আসলে শক্তি নয়, আলেয়া মাত্র। কেন বৃথা আড়ম্বর? কেন ভাবনার জাল বোনা? যথার্থ রস পাইতেছ তুমি নির্ভাবনার নীরব অবসর হইতেই। থাকিয়া থাকিয়া তোমার অজান্তেও তুমি সেই অগমলোকে ছুটিয়া যাও—না গিয়া প্রাণ বাঁচে না। সে রহস্যকে স্বীকার করিবে না কি?………

এ সমস্তই কিন্তু সংসার প্রয়োজনের বাহিরের কথা। চোখের দেখা কাজে-কর্ম্মে সেই রহস্য-

ময়ের সঞ্চার কোন্ পথে, তা হয়ত সব সময় ধরিতে পার না, তাই বলিতে পার, অমন ভাবে আমার প্রয়োজন নাই: উহাতে কি আমার ভরণ পোষণের প্রয়োজন মিটিবে ? সে কথা ঠিকই ; মুখে গ্রাস তুলিয়া চিবাইবার ভার যদি সেই রহস্যময়ের ভরসায় ফেলিয়া রাখ, তবে সত্যি বড় অবিচার হইবে। ঠাট্টার "ভাবুকতা" বলে ইহাকেই। সংসার প্রয়োজনে যেমন খাটা দরকার তেমনি খাটিতেই হইবে, কোথায়ও ফাঁকি দিলে চলিবে না: কিন্তু হৃদয়ের গুহাহিত কেন্দ্রে একটু-খানি স্থান রাখিবে পবিত্র দেবালয়ের মত, যেখানে তিন বেলা ত্রিসন্ধ্যা রহস্যময়ের ধ্যানে তন্ময় হইতে পার। আসল কারবার ঐখানেই হইতেছে। উহার সংসারের সহিত কোন বিরোধ নাই, আবার ঢলাঢলিও নাই। রহস্যময়ের ভাবনা যদি তোমাকে কর্ম্মে শিথিল করে, তবে বুঝিব, বুদ্ধির ভুল ঘটি-তেছে, ভাবের ঘরে চুরী হইতেছে। বরঞ্চ তিনিই তোমার সকল কর্ম্মের প্রেরয়িতা। তাঁহার হইয়া শুধু এই কথাটুকু বলিতেছি—সবই করিয়া চল, কিন্তু উতলা হইও না ; অথবা উতলা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। উতলা হইয়া যখন আরও বেশী জোরে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে থাকি, তখনি বলি, উতলা হওয়া সার্থক। কিন্তু যদি হতাশা দেখি, অবসাদ দেখি—তবে আদেশ করিতেছি—রহস্যময়ের সহিত কোন সম্পর্ক তোমার চলিবে না। তবু জানিও, জীবনভরা খাটিয়া মরিতেছ যে তাঁহারই দরুণ! কেবল মনে রাখ—সজাগ থাক।

একদিন তোমাকে আবিষ্কার করিতেই হইবে—তোমার মাঝে কি সে অপরূপ রহস্য লুকাইয়া ছিল! কিন্তু আজই গায়ের জোরে কিছু উন্মো-চন করা চলিবে না। যে তোমার সম্পূর্ণ অধীন, তার উপর জোর খাটাইতে পার, কিন্তু জোর খাটানোর প্রয়োজন নাই ; আবার যে তোমার হাতে নাই বা নয়, তার উপর জোর খাটানও অনধিকারচর্চ্চা। সুতরাং দেখ, জোর করিয়া কিছু হয় না—অর্থাৎ অভিমানকে কোন-মতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। অভিমানকে প্রশ্রয় দিলেই তাঁরও অভিমান হইবে, হয়ত কত-দিন কথা বন্ধ থাকিবে।

প্রয়োজন অনুযায়ী, কর্ম্মফল অনুযায়ী একটার পর একটা অবস্থা জীবনে আসিতেছে। শ্রদ্ধা-ভরে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই আমির অতীতেই যথার্থ আমি—এ সংসারের কিছুই আমার চরম নয়—কাকে দিয়া কি লীলা হইবে, অন্তর্যামীই জানেন। ভাব দিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে সংযত কর—কর্ম্ম দ্বারা শক্তির উচ্ছ্বাসকে সার্থক কর—পূর্ণ প্রাণে সর্ব্বসম্ভবের প্রতীক্ষায় থাক।

ধৈর্য্য আর বিশ্বাস হারাইয়াই তো সকল মাটী কর। সত্যি করিয়া বল দেখি, করিতে হইবে বলিয়াই কাজ করিতেছ, না প্রাণের বেগে কাজ করিতেছ ? যদি নিরানন্দের চেষ্টা হয়, সে অভিমানকে বলি দাও—আনন্দময় হইতে বিবিক্ত হইয়া কোন কাজ করিও না! বিশ্বাসে তোমায় আনন্দিত করে ; অধৈর্য্য অস্বস্তি নিরানন্দ আনে। যাহা হইবার ঠিক তাহাই হইতেছে—রহস্য বুঝিতেছ না তাই ভাবিয়া মরিতেছ! ব্যস্ত হইবার কিছু নাই, গোলমালে এলাইয়া পড়াই অবিশ্বাস। জান তো, তোমার হাতে তাঁর হাত।

জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিষ এই নির্ভরটুকু। তোমার বুদ্ধিমত তুমি নও, কোন্ এক মহাশক্তির প্রেরণায় তোমার জীবন-রহস্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে ; তুমি শুধু দেখ! কর্ম্মাভিমান ব্যর্থ আলেয়া মাত্র। যথার্থ আত্মশক্তি স্তব্ধ, সমাহিত, প্রশান্ত। তিনি গভীর ধ্যানে তোমার নিয়তিনাট্য রচনা করিতেছেন—তুমিও ধ্যানস্থ হইয়া গিয়া রঙ্গশালার

পাশে বস; দেখ শুধু এক একটা জীবন কি অপূর্ব্ব রস রহস্যময়, কত বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার বিকাশ!

সুখ কি, দুঃখ কি, সকল তলাইয়া যায় ঐ অনুভবে। থাকে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় চিরমুক্ত সত্তা। আকুলি-বিকুলি মায়া নয় কি? অভিমান-ভরে আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হেঁয়ালী নয় কি? যখন বুঝিতেছি মনে করি. তখনি সব চেয়ে ভুল বুঝি; যখন মনের আনন্দে অভিমান ভুলিয়া লুটাইয়া পড়ি, তখনি বুঝি, সকল কিছুই লীলা-ময়ের ইঙ্গিতে সুন্দর তালে লয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহিয়া চলিতেছে। কে আমি? আমার কি?—শুধু শূন্য—নিত্যানন্দে পূর্ণ! এই রিক্ত-তার চেয়ে, এই রহস্যময় রিক্ততার চেয়ে দুনি-য়ার কোন সত্যকেই বড় বলিতে পারি না; আর কোন সুখই প্রাণকে এমন পূর্ণ করিতে পারে না!

অন্তরের অন্তরে ঐ সুধাতেই মাতাল যে, তারও যে কাজের সংসার ঠেকিয়া থাকিবে, এমন অবিশ্বাস তো আসে না। সুতরাং যে আমায় পাগল বলিবে, তার উপরও আমার রাগ হয় না।······আচ্ছা তুই দেখ্ না ভাই একবার আকুলি-বিকুলি ছাড়িয়া দিয়া—অন্তরের অন্তরে তলাইয়া গিয়া। কিছুই কি ঠেকিয়া থাকে? ভ্রান্ত অভিমান তোর! সেই অনাবিল মুক্তির আনন্দকে হারাইয়া কিসের বন্ধন-বিভ্রমে ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছিস্? শক্তি যখন দুকূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখনও কেবল নিঃশেষে নিজকে ধ্যানী-বুদ্ধের চরণতলে নোয়াইয়া দেওয়া—তারপর?··· সে যে কি, সে হিসাব তোমার নয়!

জগতের যতটুকু জানিয়াছি, ইহাই তাহার সমগ্র নয়, ইহা স্বীকার করিব; কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র অভিমানের মায়ায় যতটুকু জগৎকে আত্মগত বলিয়া সাজাইয়া লইয়াছি, আমার ততটুকু সংসারে ঐ রহস্য বস্তুটীর মত অমূল্য বস্তু, ওর চেয়ে দুর্লভ বস্তু আর কিছু পাই নাই। আর এ কথাও বিশ্বাস করি, শুধু আমার সংসার কেন, এই বিশ্বসংসারেরই রাজার রাজা সে—প্রাণের প্রাণ সে! অভিমানী মনকে বলি, হৃদয়মন্দিরের ঐ ঠাকুরটীকে লইয়াই তুমি থাক, অন্য ভাবনার প্রয়োজন নাই! তুমি তোমার কাজ কর—সবাই সবার কাজ করিতেছে!

জানি না কোন কুশলী পুরুষ একটী অপরূপ অনির্ব্বাচ্য অন্তর্ম্মুখী টানে সবার অন্তরকে আপন অন্তরে টানিয়া লইতেছেন! তাঁহাকে না ভালবাসে এমন কেহ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। আর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এই অন্তর্ম্মুখী আবেগ যখন না থাকে, অর্থাৎ যখন ভুলিয়া যাই, অন্ধ আত্মপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ তখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

তাঁহার চরণে নিজকে সঁপিয়া দিয়াই যেন আমাকে আমি অধিক শক্তিমন্তরূপে পাই; অকূল সংসারে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস বুকে জাগে। সকল সমস্যার সমাধান তোমাতে হে রহস্যময়, আমি তোমাকে স্বীকার করিলাম! ইহার অধিক আজ আর বলিতে চাহি না।



নির্ভীক পন্থা



কোন কিছুতে বিকম্পিত হতে নাই। সব সংস্কার বর্জন করে শুধু আত্মপ্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে তোমাকে। তাকে শূন্য বল, বিভীষিকা বল; কিন্তু কিছুতেই যেন বিকম্পিত করে না তুলে তোমাকে। "ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি।"

শুধু নিজকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে হবে। সংস্কার—এর তো সীমা-পরিসীমাই নেই। ভাল সংস্কার কি আর সংস্কার নয়? নির্দ্দয় হয়ে তারও মায়া ছাড়তে হবে তোমাকে। সংস্কারে যে তোমায় গিলে রেখেছে, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করবে তুমি কেমন করে?

জীবনভরা কেবল পরের কথায় বিশ্বাস করে, সায় দিয়েই চলে এসেছ—বল তো, জীবনে প্রত্যক্ষ করেছ তার কয়টা? ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি কিছুই বুঝছি না তবু মেনে চলছি—এই মেনে চলাটাই কি চরম সার্থকতা? এতে তুমি কি হচ্ছ? পরের কথায়, পরের ভাবনায় তুমি একেবারে জড়িত হয়ে গেলে। তোমার আত্মস্বরূপ তো ফুটবার অবকাশই পেল না। তার ঘাড়ে কতকগুলো সংস্কারের বোঝা তুলে দিয়ে একেবারে চেপে রাখলে তাকে। এ ভাবে কি অজ্ঞানতা দূর হতে পারে?

ঠিক ঠিক আত্মাকে জাগিয়ে তুলবার পন্থা অনুসরণ করতে হলেই তোমাকে আবার নূতন জন্ম নিতে হবে। জীবনে যত কিছু জানতে, সব ভুলে যেতে হবে। আবার তোমার প্রথম থেকে শিক্ষা আরম্ভ হবে।

অন্ধভাবে অনুসরণ করার ফল—আত্মবিস্মৃতি, প্রকৃতিলয়। তাতেই তোমার মৃত্যু হল। আর উপনিষদও বলে রেখেছেন, যারা আত্মঘাতী, তাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য নামক লোকে গতি হয়। পরের কথায় তো তুমি নিজকে পেলে না—পেলে অন্যের অভিমত একটা কিছু।

পরের কথায় যে কোন মূল্য নাই—তা বলছি না, কিন্তু অবশ হয়ে অনুকরণ করো না। জ্ঞানটা যেন টন্‌টনে থাকে। নিজকে অবিশ্বাস করে কেবল পরের কথার মাধুর্য্যে ভুলে গেলে তো চল্‌বে না। নিতেই যদি হয়, তো সব বাজিয়ে নেবে।

বিশ্বাসে তো সহজেই মিলে যায়, অবিশ্বাস করে কি পাও, তাও একবার পরখ করে দেখ না। সবাই হয়ত চীৎকার করে বলে উঠ্‌বে—আরে ও পথে কি যেতে আছে? নাস্তিকতার পথে গেলে যে মরণ! আমি বলি, নিজে না বুঝে—পরের বুঝ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর তাতে তো ভালই, আর দশজনেরও কোন দায় থাকবে না।

বুদ্ধদেব নিজের আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে চলেছিলেন, এর দরুণ তাঁকে শূন্যবাদী নাস্তিক বলা হয়েছে। কিন্তু পরিশেষে তিনি যে সম্পদ্ বিলিয়ে গেলেন তা নাস্তিক দর্শন হলেও আস্তিক দর্শনের চেয়ে কোন দিকে ন্যূন নয়। বরঞ্চ স্বাধীন চিন্তার ফলে তিনি এক নূতন পথ আবিষ্কার করে গিয়েছেন।

শ্রুতি আর আগম যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার স্বাধীন চিন্তার পথে তারা আরও বেশী সহায়তা করবে। সবই তো স্বাধীন চিন্তারই ফল। আর ঠিক সম্প্রদায় পরম্পরায় যদি এই স্বাধীনতা না চলে আসে, তাহলে গুরু, দাদাগুরু তাদের দোহাই দিয়ে আর কয়দিন টিকিয়ে রাখা যাবে সাম্প্রদায়কে?

আর প্রত্যক্ষ দেখ্‌তেও পাই, এক একটা সম্প্রদায়ের পতন হয় তখনি, যখন তার মাঝে প্রাণবান্ সত্য-সাধক না থাকে!

সম্প্রদায় যদি মান, গুরুপরম্পরাই যদি স্বীকার কর, তাহলে গুরু যে সম্পদ্ দিয়ে গিয়েছেন, তাকে রক্ষা করে আরও সম্পদ্‌শালী করে তুলতে হবে। কাজেই গুরু যা দিয়েছেন তা তো দিয়েছেনই—স্বাধীন চিন্তার দ্বারা, অবিকম্প যোগ দ্বারা আরও নূতন কিছু সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে। এ ভাবে চললে নব সম্প্রদায় সজীব থাকে, তা-না হলে dead institution দাঁড়িয়ে যায়!

প্রত্যেকেই উপার্জ্জন করলে যেমন সংসার সচ্ছল হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি সম্প্রদায়ের ভিতরও যদি প্রত্যেকের প্রাণে সত্যলাভের দরুণ স্বাধীন পিপাসা থাকে, তবে না সম্প্রদায় বেঁচে থাকে বেশ সচ্ছল হয়ে!

স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সম্পদ্ বাড়িয়ে যেতে হবে, তা না হলে তুমি ঋণী। কাজেই আপ্তবাক্যকে মেনে চললেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হল না। ভাণ্ডারে আরও কিছু নূতন সঞ্চয় করে যেতে হবে! জেনো, চিন্তায়, ভাবনায় স্বাধীন হওয়াটা দোষের নয়।

প্রত্যেকের চিন্তা-প্রসূত বাণী বা অন্তরের অনুভূতি বিভিন্ন হয়েও চিরকাল উজ্জ্বল থাক্‌বে। কাজেই যদি স্বাধীন চিন্তা দ্বারা আমি সত্যলাভের একটা নব পথ আবিষ্কার করে যাই—তাহলে পূর্ব্বের পথকে অবরুদ্ধ করা হল না। নূতন কিছু বল্‌লেই বা করলেই পুরাতনকে অবহেলা করা হয় না।

নজীরের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু সব ক্ষেত্রে নজীরকে অনুসরণ করে চললে আর নূতন lawর সৃষ্টি হতে পারে না। তারপর যতই চিন্তা করতে থাক্‌বে, ততই তো চিন্তা খাঁটী (refined) হবে। নজীরের মাঝে কি আর কোন দোষ-ত্রুটী থাক্‌তে পারে না? "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং"—কবির এ কথাটীকে বেশ মনে রেখে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সবকে যাচাই করে চলতে হবে। সত্য যদি খাঁটীই হয়—তাহলে যে কোন উপায়েই পরখ কর না—তাতে সত্যের কোন হানি হবে না।

দেবতার ঠাঁই

মক্কার মুস্লিম কহে উচ্চে তুলি শির,
"বিশ্বমাঝে মাত্র এক মহম্মদ পীর।
কাফেরের ধর্ম্মমত মিছে, মিথ্যে, ফাঁকা—
খোদাই সরল সত্য, বাকী পথ বাঁকা।"

রোম থেকে পাদ্রিরাজ পোপ বলে হেসে,
"গড্‌ই পরমগুরু,—সব সর্ব্বনেশে।
খৃষ্টের শিষ্যের দল অস্ত্রে করে জয়—
হিদেনের ধর্ম্মরাজ্য কালে পাবে ক্ষয়।"

কাশীর পণ্ডিত কহে ধরি উপবীত,—
"বিশ্বনাথ সৃষ্টিকর্ত্তা, এ কথা নিশ্চিত।
মুস্লিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ যত পাপাচারী,
লভিবে না স্বর্গে স্থান, দূরে দিবে দ্বারী।"

দ্বন্দ্ব দেখি মনে মনে হাসেন দেবতা—
"মন্দির, মসজিদ্, গির্জ্জা সব এক কথা।
কোন স্থানে আমি নহি, সর্ব্বঘটে আমি—
অন্তর খুঁজিয়া দেখো, মূঢ় মুক্তিকামী॥"

—*—

মোহমুদ্গার

—(*)—

আশা-আকাঙ্ক্ষা কি মানুষের বুকে জাগে না? এই জগৎটাকে তার মনের মত করিয়া পাইতে কি তাহার ইচ্ছা হয় না?

এ গুলি বাস্তব। অধ্যাত্মবাদী আসিয়া বলিবেন, ওই তো অবিদ্যার জড়, ও সব ছাড়। যতদিন তোমার খেয়ালখুসী নিয়া থাকিবে, ততদিন শান্তি পাইবে না। নির্ব্বিকার হইয়া যাও, নৈরাশ্যে হৃদয়কে কঠিন কর—জান, সব ফাঁকা!

হাঁ, সব ফাঁকা জানিলে ল্যাঠা চুকিয়া যায় বটে। কিন্তু এ তো রোগ আরাম করা নয়, রোগীকে শুদ্ধ আরাম করা যে!

কথা হইতেছে, মনোবৃত্তির স্পন্দন অহরহই আমার ভিতর চলিতেছে, ইচ্ছার প্রকাশ অহরহ ঘটিতেছে। এগুলির মাঝে একটা সুসমঞ্জস পরিণতি কি একেবারেই অসম্ভব? চাপিয়া মারার নীতিটাই কি এই প্রাণস্পন্দনের শেষ মীমাংসা?

অনেক রকমফের জবাব আছে এর, তা জানি। কেহ বলিবেন, নির্ব্বিকার, সাক্ষী হইয়া যাও; কেহ বলিবেন, সব তাঁহাকে সঁপিয়া দাও; কেহ বলিবেন, চিত্তের পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও রূপ বদ্‌লায়, অতএব দুঃখ কি?

কিন্তু যদি বলি, এ সব বুদ্ধির সান্ত্বনা মাত্র; এ একরকম আফিমের নেশা? রোগীর যন্ত্রণা কমাইবার দরুণ আফিং খাওয়াইয়া দিলাম; সে বুঝিতে পারিল না বটে যে তাহার যন্ত্রণা আছে; কিন্তু আমি তো জানিতেছি, এটা চিকিৎসার ফাঁকি!

কথাটা এমন করিয়া বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। জানি, আমাদের দেশে ধর্ম্মের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলিয়া একটা কিম্বদন্তী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং যাহা চুকিয়া-বুকিয়া গিয়াছে, তাহাকেই আবার যুক্তির কাঠগড়ায় টানিয়া আনিয়া দাঁড় করানো নিরাপদ নয়, তাহাও বুঝি। কিন্তু যদি কেহ আফিং গিলিয়া ব্যথা না ভুলিতে চায়, তাহার উপায় কি? আমি যদি সচেতন থাকিয়া আমার অস্ত্রোপচার দেখিতে চাই, তুমি আপত্তি করিতে যাও কেন?

আর একটা কথা। ওই যে বড় বড় সান্ত্বনার বুলিগুলি আওড়াইয়াছি, উহার চূড়ান্ত পরীক্ষা কয়জনার কাছে হইয়াছে, তাহার হিসাব আছে কি? কয়টা লোক নিজের মনোবৃত্তির আন্দোলনের সঠিক সংবাদ রাখে? বাঁধাগৎ আওড়ানো ছাড়া সত্যিকার অনুভবকে কয়জন ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে? কথাটা চমকাইয়া উঠিবার মত, তবুও বলি, এই যে আমরা জাতকে-জাত সান্ত্বনার বুলি আওড়াইয়া পরম স্থবিরত্ব লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, এ যে আমাদের সত্যিকার অনুভবের ঠিক বিপরীত প্রকাশই নয়, তাহারই বা প্রমাণ কি? বলিতে পার, মানুষ নিজে যাহা অনুভব করে, তাহা ব্যক্ত করিতে কথনো কি ভুল-চুক হয়? মনোবিদ্ বলিবেন, হয়; অভ্যাসের দ্বারা মনোবৃত্তিকে এমনি আয়ত্ত করা যায় যে, যাহা অনুভব করিতেছি, তাহার বিপরীতটা প্রকাশ করিতেও কোথায়ও ঠেকে না; নির্জ্জীব মন কেবল পরের মনের প্রতিধ্বনিও হইতে পারে।

এ ক্ষেত্রে উপায় কি?—আমি উপায় কিছু বাৎলাইয়া দিতে চাহি না। জানি, জগতে সম্মোহনেরই জয়। জোর করিয়া যদি একটা কথা

বলিতে পারি তো সেটা মিথ্যা হইলেও সত্যের মুখোস পরিয়া দিব্যি চলিয়া যাইবে কেহ তাহাকে সন্দেহও করিবে না। 'যাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই সত্য'; 'দশে যাহা বলে তাহাই সত্য'—ইত্যাকার সত্যের কিম্ভূতকিমাকার সংজ্ঞা অনেকই চলিয়া আসিয়াছে; সব ওই সম্মোহনের কারসাজি। তাই নূতন করিয়া আমি একট সম্মোহনের সৃষ্টি করিতে চাহি না। সম্মোহন প্রয়োজন বটে, কিন্তু সেটা সচেতন থাকিয়া নিজের উপর প্রয়োগ করাই ভাল। আর সত্য যতই ব্যাপক হয়, ব্যবহারিক জগতে ততই তাহার মূল্য কমিয়া আসে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত দরদের সত্যটাই চরম,—এই কথাটাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে বলি।

সংশয়ে মন দুর্ব্বল হয়, তাহা স্বীকার করি; আর বিশ্বাসে কৃষ্ণ যে শীঘ্র শীঘ্র মিলে বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাও মানিয়া লইতে রাজী আছি। কিন্তু দুর্ব্বল মনের পক্ষে সংশয়ে যেমন মারাত্মক, বিশ্বাসও তেমনি মারাত্মক। আমাদের ধাঁ করিয়া সংশয় জাগে, আবার ধাঁ করিয়া তাহার মীমাংসাও হইয়া যায়। ইহা কি মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ?

সংশয়ের একটা সবল প্রকাশও আছে; উহা সত্য জানিবার তীব্র পিপাসা। সে পিপাসা আমাদের বোধ হয় বহুকাল মিটিয়া গিয়াছে! আমাদের কাছে আজ জগতের কোনও রহস্যই বুঝি অমীমাংসিত নাই। ইহকাল পরকালের যে কোনও প্রশ্নই করিয়া বস না কেন, একটা দশবছরের আর্য্য-বালকও তোমাকে চোট্‌পাট্ তাহার জবাব শুনাইয়া থ বানাইয়া দিবে। যদি তুমি ইহার পরেও সংশয় প্রকাশ কর তো তোমার চতুর্দ্দশপুরুষের জন্য পরলোকে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার কল্পনাতেও তোমার পিলে চমকাইয়া উঠিবে।—অতএব সাবধান!

আবার আর একশ্রেণীর নিঃসংশয়বাদী দেখা দিয়াছে—তাহারা বলে, ও সব ফাঁকী; এসো খাই-দাই, মজালুটি; ভাবিয়া মরিয়া লাভ কি? কিন্তু লাভ আছে বই কি! প্রকৃতি তো মস্তিষ্কটাকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেয় না; সেখানে দেবতার মজলিশ না বসাও তো সে সেখানে সয়তানের কারখানা পাতিয়া বসিবে। তাই দেখি, আমাদের দেশে নিঃসংশয়ী সুবিধাবাদীর দল দ্বারা কোনও একটা বড় কাজই সুসিদ্ধ হইতে চাহে না।

এই তো আমাদের মনের অবস্থা। এ মনকে সবল বলিব কি? এই দুর্ব্বল, চিন্তাবিমুখ মনের দরুণ যে সুলভ তত্ত্বমীমাংসার মৌতাতের ব্যবস্থা, তাহাকেই বলিব আধ্যাত্মিকতার পরিচয়?

জীবনের গোড়াতেই পরের মুখের শোনা একটা সিদ্ধান্তকে আমার লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম; আমার প্রবৃত্তির গতি কোন্ দিকে, তাহার বিচার করিলাম না, আমার অন্তঃপ্রকৃতি কি চায়, তাহা ভাবিলাম না, নিজকে ফুটাইয়া তুলিবার কোনও দায়িত্বই গ্রহণ করিলাম না,—নির্ব্বিচারে ছুটিলাম ওই ভয়াবহ পরধর্ম্মের আলেয়ার পিছনে পিছনে! বুঝি, আধ্যাত্মিক আয়েসবাদী আসিয়া বলিবেন, বাপু, নূতন রাস্তা খুঁজিতে গিয়া কোথায় বিঘোরে প্রাণ হারাইবে, তার চাইতে এই যে সনাতন পন্থা পড়িয়া রহিয়াছে, চোখ বুজিয়াই দিব্যি আরামসে যে রাস্তায় চলা যায়, তাহাই ধরিয়া চল, তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে। ইষ্টসিদ্ধি অনেকেরই হয়—তবে কিনা সেটা আসলে ইষ্ট কি অনিষ্ট, তাহার বিচার করিবার কেহ থাকে না! নেশায় যে তলাইয়া গেল, তাহার আবার ইষ্টানিষ্টের তোয়াক্কা কি? বুঁদ হইয়া থাকাটাই না তাহার ইষ্ট!

তারপর বিঘোরে প্রাণ হারানোটাই কি বড় ভয়ের কথা হইল? কিসের এত প্রাণের মমতা? এই না শুনি, আত্মা অজর, অমর ইত্যাদি? জগতের দুঃখ কমাইবার দরুণ কত জন তো কত পথ

বাৎলাইয়া গেলেন, দুঃখ একতিল কমিল কি? তবে মিছামিছি এই পরদুঃখকাতরতার ভান করিয়া চিত্তের স্বাধীন ও সবল প্রকাশকে পিষিয়া মারা কেন?

জড়ের ধর্ম্ম হইতেছে পরাধীনতা; আর প্রাণের ধর্ম্ম স্বাধীনতা। জড় পরম নিশ্চিন্ত; নিজেও নিশ্চিন্ত, যাহারা তাহাকে লইয়া কারবার করে, তাহারাও নিশ্চিন্ত। চেয়ারটার পায়ে দড়ি দিবার প্রয়োজন নাই, তাহাকে যেখানে বসাইয়া রাখিব, আমি আসিয়া না নাড়িয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সে বিনীত শিষ্যের মত সেখানেই বসিয়া থাকিবে। কিন্তু একটা গরুকেও আমার বিশ্বাস নাই; কখন বা সে কি করিয়া বসে! চাই কি, পায়ের দড়িও ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে।—যে প্রাণের আবেগে নড়িয়া-চড়িয়া নিজের সুপ্তি তথা পরের আরামের ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকে বিশ্বাস করিও না, উচ্ছৃঙ্খল নাস্তিক বলিয়া তাহাকে গালি দিও—এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ! আজ দেশ জুড়িয়া এই সনাতন জড়ত্বের সাধন চলিতেছে! প্রাণের পথে চলিতে কেহ কাহাকেও উৎসাহিত করিবে না, সে দিকে গুরুগিরি করিবার লোক মিলিবে না; কিন্তু বাঁধা রাস্তায় গড়াইয়া দিবার লোকের অভাব কোথায়ও হইবে না!

এই জড়ের ধর্ম্ম ইহকাল আর পরকাল, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, সংসার আর বৈরাগ্যের মাঝে মিছামিছি একটা ভেদরেখা টানিয়া দিয়াছে। যেন এরা আলো আর আঁধারের মতই পরস্পরের বিরোধী! গত হাজার বছরের দার্শনিক চিন্তা ঘাঁটিয়া দেখ, চিন্তার স্রোত এমনি করিয়া জমিয়া পাথর হইয়া রহিয়াছে। এই এক দিক, আর ওই এক দিক; তোমাকে চোখ-কাণ বুজিয়া এই দিক হইতে ওই দিকে লাফাইয়া পড়িতে হইবে; কি লভ্য হইবে, তাহা এখন বুঝিয়া কাজ নাই; আগে বেড়া ডিঙ্গাইয়া ওপারে তো লাফাইয়া পড়—তারপর বুঝিবে সেখানে কি মজা!—সমস্ত দর্শনগুলির practicality ওই অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বুদ্ধিবাদে পর্য্যবসিত।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে বুদ্ধি দিয়া তুমি আমাকে এই হঠাৎ-সিদ্ধির নীতি বুঝাইতে আসিয়াছ, সে বুদ্ধিরও কি একটা পরিণাম নাই? স্তরে স্তরে বিকাশ নাই? কি দিয়া কি হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া দিলে আমি কি বুঝিতে পারিতাম না? জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতেছি প্রাণের স্ফুরণ; আর সে স্ফুরণ ক্রমিক, লীলায়িত। কেবল আমার এই বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিই বুঝি প্রাণহীন? সেখানে বাঁধা নিয়মে কলরব করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই বুঝি নাই?

বলিও না, বুদ্ধিকে ঠেকাইয়া তুমি আমাকে প্রপঞ্চের অতীত ভূমিতে লইয়া যাইতেছ। তুমি আমাকে যাহা কিছু সত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিতেছ, তাহাও প্রকারান্তরে ওই প্রপঞ্চের সঙ্গে একটা রফা মাত্র, বুদ্ধিকে আফিং খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখা মাত্র। এ তোমার দর্শনবাদ চিরিয়া চিরিয়া আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি।—ওই নিরানন্দ জড়বাদের সয়তানী আর নয়—"উদীর্ধ্বং—জীব অসুর্ন আগাৎ"—ওঠ জাগ, নিজকে প্রাণে স্পন্দিত কর, যিনি জীবন্ত প্রাণ, ওই তিনি আসিতেছেন!—আজ কে আমাকে বৈদিক ঋষির এই আবেগভরা প্রাণের বাণী শোনাইবে?

ওই আলো-আঁধারের উপমাটাও ফাঁকি—শঙ্কর যাহার উপর তাঁহার দর্শনের ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আর ওই একান্ত বিবিক্ত বৈপরীত্যবাদই তো আমাদের চিন্তা ও আচারের-হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া গিয়া প্রাণটাকে পাথর করিয়া দিয়াছে! কে বলে আলো আর আঁধারে বিপরীত সম্বন্ধ? উষা সে সাক্ষ্য দেয় না, গোধূলি সে কথা বলে না। অনন্তপ্রবাহী ক্ষণ-পরম্পরার মাঝখানটাকে মুছিয়া ফেলিয়া দুইটা প্রান্তকেই ধ্রুব বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে; ইহা বুদ্ধির জড়ত্ব নয় কি?

চাই প্রাণ—চাই পরিণাম – চাই উচ্ছলতা ! এই অবজ্ঞাত (অথচ একান্ত প্রয়োজন) দেহ হইতে সুরু করিয়া ওই সর্ব্বজনমান্য আত্মা পর্য্যন্ত একটা সুসমঞ্জস পরিণতি রহিয়াছে, একটা প্রাণের স্পন্দন লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে। কিছুই মিথ্যা নয় জগতে, কিছুই অসুন্দর নয়, কিছুই বর্জ্জনীয় নয়—সবই সত্যসুন্দরের প্রকাশ। বৈদিক ঋষির এই ভাবের দ্বারা যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদের জীবনের নূতন দর্শন গড়িতে হইবে। সে দর্শনে প্রাচীনের সবই থাকিবে, কিন্তু নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া থাকিবে। কয়েকটা বাঁধাধরা পথে মাত্র সকলকে টানিয়া নিলে চলিবে না, একটা দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র দিয়া একটা প্রাণবন্ত তত্ত্বের বিচিত্র প্রকাশকে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে চলিবে না। মানুষের চিন্তা হইবে স্বাধীন, কর্ম্ম প্রাণবন্ত, লক্ষ্য অনন্ত-বিচিত্র, বুদ্ধি প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল ! ইহাতে প্রাচীন নিরানন্দ জড়বাদের জীর্ণভিত্তি যদি ধসিয়া পড়ে তো পড়ুক্—অসুন্দরকে মারিয়া শিবস্বরূপ তাহার বুকে সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলিবেন। প্রাণের যজ্ঞভূমিতে সেই মরণের দেবতাই হইবেন যজ্ঞেশ্বর।

সাহস চাই—শক্তির পরিচয় দেওয়া চাই। যে দর্শনে হৃদয়ে শক্তিরূপিণীর আবির্ভাব হয় না, সে শক্তি কুণ্ঠাহীন কর্ম্মে স্ফুরিত হয় না, সে কর্ম্ম জগৎকে নূতন সৃষ্টিতে ভূষিত করে না, এই জীবনকে, এই জগৎকে যে দর্শন প্রত্যাখান করিতে শিখায় শুধু—সে দর্শন নির্ব্বীর্য্য, তাহা কাপুরুষতারই নামান্তর। শক্তিহীন জ্ঞানের সাধনায় বুদ্ধি কেবল ঝিমায় আর মায়ার স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে আঁৎকাইয়া ওঠে; আজগুবির বিভীষিকা ছাড়া আর কিছু তাহার নজরে পড়ে না। এই বুদ্ধির মৌতাতের নেশা ছুটিয়া যাক—সত্যকে সে সহজভাবে অথচ বীর্য্যের সহিত স্বীকার করিতে শিখুক, প্রাণতত্ত্বকে তাহার ধাত্রী বলিয়া মানিয়া লউক, সহস্রদল পদ্মের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে জীবনকে ফুটাইয়া তুলুক। ইহাতে যদি প্রাচীন সংস্কার টুটিয়া যায়—যাক্, তাহার জন্য দুঃখ করি না !

দর্শন

—•—

প্রাণের দরদ নিয়ে মানুষ যে মানুষকে ভেবেছে, মানুষাতীতকে মানুষের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছে—যে শক্তিতে করেছে, সেই শক্তিই দর্শনের প্রাণ। দর্শন মানে শুধু দেখা নয়, দর্শন পড়ে শুধু জানা নয়, বুদ্ধিকে তার সীমায় পৌছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতে বলা নয়; —দর্শনের উদ্দেশ্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই অসীমের প্রতিও অঙ্গুলি-সঙ্কেত করা, সীমায় অসীমকে বিশ্বাসের বলে প্রত্যক্ষ করা। দর্শন আয়ত্ত করে একটা অন্তর্ম্মুখী শক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে উঠ্‌বে—তবেই না দর্শন সার্থক ! ভারতীয় উপনিষদের ছত্রে ছত্রে আমরা এই সত্যের প্রকাশ দেখ্‌তে পাই। সে মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লেই এক অনন্যলব্ধ অনুভবে অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে !

দেখাই তো 'দর্শন' কথার অর্থ। কিন্তু সে শুধু চোখের দেখা নয়। যার প্রাণ বুঝি, এমন একটী মানুষ এসে সাম্‌নে দাঁড়াক্। কি দেখবশুধু ?—

মানুষটুকুকেই ? যতটুকু তার দেখা যায়, তদধিক এবং যা আমার ও তার উভয়ের মাঝে আনন্দ-তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তা'ও কি সেখানে দেখব না ? তুমি-আমিতে ভেদেও অভেদের বার্ত্তা কি সেখানে এসে পৌঁছুবে না ?

এমনি করে নিজের মাঝে যাকে দেখছি, তাকেই ঠিক দেখা হচ্ছে—যেহেতু সে দেখায় আমি আত্মানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠ হচ্ছি। সুতরাং দর্শন মানে আত্ম-দর্শন ; দর্শন মানে জগৎকে নিজের মাঝে দর্শন। দর্শন হচ্ছে একাধারে জ্ঞান, আনন্দ ও অনুভব। আসল জিনিষ প্রাণ হতে প্রাণের সঞ্চার—সূত্র তার বাহন মাত্র।

জগৎকে যে আনন্দসহকারে অন্তরে বাইরে সামঞ্জস্য রেখে দেখতে পায়, সেই দার্শনিক। ইন্দ্রিয়ের স্বতঃপ্রবুদ্ধ বহির্ম্মুখীনতাকে নিরুদ্ধই কর আর ব্যাপ্তই কর, যেদিন স্বেচ্ছায় নিজের হাল নিজে ছেড়ে দিতে পারবে, সেদিন থেকেই দর্শন সুরু হবে। তুমিও যে তোমার দ্রষ্টব্য ; তবে কিনা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অন্ধকূপের মাঝে পড়ে থেকে কখনো দেখা যায় না ; দেখতে হলে সবার চেয়ে—এই তোমার আত্ম-জীবনকে ছাপিয়েও উচ্চস্তরে উঠতে হবে। নীচ বাসনায় নিবদ্ধ হয়ে থাক্‌লেও দর্শন হবে বটে, অন্ধকার দর্শন—সেখানে না থাক্‌বে অনুভব, না জাগবে আনন্দ। ক্ষুদ্র হয়ে থাক্‌লে পলে পলে কেবল ফুরিয়ে যাওয়া, আসলে ফুরিয়ে যাক্ না যাক্, নকল অস্বস্তির মায়াই তোমাকে এমন ধাঁধিয়ে ফিরাবে যে, উঁচু হওয়া ছাড়া আর কূল দেখবে না তখন তুমি। এই যে নিজকে অতিক্রম করে থাক্‌বার চেষ্টা মানুষের অন্তরতম সত্য, এ থেকেই দর্শনের উদ্ভব হচ্ছে।

যা চিরকালের নির্ব্বিশেষ, তাই তিলে তিলে বিশেষ হয়ে সবার চোখে এবং বুকে যুগপৎ ফুটে উঠছে। পরান্নপুষ্ট জীবনে সুখ নাই—পুঁথিপড়া কথা আর তোমার প্রাণের কথায় নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। কিন্তু এই তফাৎটা তো আসলে ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমিও যে জীবনে বিশেষ করে একটা কিছু চাও, তোমার নিজের ওপর যে তোমার এমন অসীম দরদ—এটা তো আনকোরা নূতন একটা কিছু নয়। তোমাকে বিশেষ করে তুমি যে অনুভব করছ, এ তো তাঁরই চিরন্তন প্রসাদ। কোন কিছুই সেই পুরাণ পুরুষকে অতি-ক্রম করে নূতন নয়, অথচ নূতন নূতন লাগে ক্ষণে ক্ষণে জনে জনে—দর্শনের এ-ও এক ধারা বটে। বুকের মাঝে যে কথাগুলো উদ্বেল হয়ে ওঠে, সব সময় তার ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত কত জীবনের চেষ্টায় একটা ছন্দোবদ্ধ হৃদয়রহস্যের সাক্ষাৎ মিলে, ভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হয়—শাস্ত্রদর্শনের সূত্রে সূত্রে আমরা পাই সেই মিলনোন্মুখ প্রাণশক্তিরই আদানপ্রদান। অতীতের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমানের প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে—এই তাৎপর্য্য নিয়েই দর্শন আমাদের কর্ম্মপথে সাথের সাথী হতে নেমে আসে।

সেই চিরপুরাতন এবং চিরনূতনকে যুগপৎ পরম প্রেমে সম্মিলিত দেখাই খাঁটী দর্শন। যিনি চিরকাল নিত্য নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছেন, তিনি উপনিষদের ঋত ; আর যিনি চিরপুরাতন হয়ে সর্ব্বপরিবর্ত্তনের আধারীভূত অধিষ্ঠানরূপে রয়েছেন, তিনি সত্য। ঋত—গতি ; সত্য—স্থিতি। দর্শন এই দুই মহান্ত হৃদয়ের মিলনরহস্য অনুভব।

বাস্তবিক দুই না হয়ে আর কিই বা হতে পারত ? শুধু এক হলে, অদ্বৈত বল্‌তে সাধারণতঃ যা মনে আসে, তা হলে কি যে হত, তা ভেবে পাই না। অথচ বাস্তবিক মূলতঃ সবই তো ঐ অদ্বৈত সত্যে নিগীর্ণ হয়ে আছে—তাই আমাদের দ্বৈতবুদ্ধিতে জগৎকে দেখে-বুঝে জেনে শুনেও আমরা অন্ত পাই না। একটা অনাদি-অনন্ত বিরহ এবং মিলনতত্ত্বের আভাস আত্মার দ্রষ্টৃত্বশক্তির মাঝে অনুস্যূত দেখতে পাই

না কি? ঐ অদ্ভুতের ব্যাখ্যাই কি দর্শন নয়?

প্রাণের বাণী আর মুখের কথা—একটা সত্য, আর একটা ঋত। ঋতকে আমরা বৌদ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাই, আর সত্যকে পাই অনুভবাকারে। একই দেখা বাইরে ও ভিতরে। দেখাটাই জগতে আসল, ঐটুকুই আত্মবৈশিষ্ট্য। যে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, তার কাছে জগৎ থেকেও নাই। অদ্বৈত এই দেখার মাঝে, আমির অতীত আত্মানুভবের মাঝে। অদ্বৈতই খাঁটী দর্শন, যা থেকে দ্বৈতও বাদ যায় না, অদ্বৈত কাউকে নাকচ করে না। সে এক অদ্ভুত।

অদ্বৈত মানে এক নয়, অথচ দ্বৈতেরও ব্যাপক; দুই আর এক যুগপৎ। আলো ও আঁধার কেমন করে মিলে থাকে, একটা প্রস্ফুরন্ত মানবপ্রাণকে অনুভব করে দেখ। অদ্বৈতকে প্রাপ্তব্য বলে পাওয়া যায় না, পেয়ে আছি বলেই চোখ মেলে দেখি শুধু। আবার যে চোখ না মেলেও দেখা যায়, সেই চোখের দেখাই খাঁটী দর্শন।

অন্তর বাইর যার দর্শনে পূর্ণ হয়ে উপ্‌চে পড়্‌ছে, সেই ঠিক ঠিক জগতের রহস্য বুঝ্‌তে পেরেছে। যত কিছু বিকার শুধু দেখ্‌বারই হেরফের মাত্র; এইটুকু বুঝ্‌লেই তো ভবসংক্রম সংচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন কেবল মুক্তধারা।

আমি যা চাই এবং যা আছি, দুয়ে মিলেই খাঁটী দর্শন। তাহলেই সুখদুঃখ একাকার হয়ে গেল। হয়ত দুঃখে আছি, তাই সুখ চাই; যদি সুখে থাক্‌তাম, কিছু চাইতাম না। যাকে সুখ বল্‌ছি, তাও তো সুখ নয়—কেননা তা হলে আর চাওয়ার জ্বালা থাকতো না। সুখ যে সুখ নয়, তার প্রমাণ—সুখেও ক্লিষ্ট অন্তরের আকুলিবিকুলি।

তাই বলি, যা চাচ্ছি এবং যা চাচ্ছি না, উভয়কেই যদি আত্মশক্তিবলে সমান মূল্য দিয়ে গ্রহণ করলাম, তবেই সুখে দুঃখে মিলনাকার বিচিত্র আনন্দ-বেদনাময় অনুভবে জীবন ফুটে উঠ্‌ল। এই যে মিলনপূর্ণ, সুরসাল, সুসমঞ্জস, পরম-সুস্থির, যাবতীয় জাগতিক অস্থিরতাতেও অব্যগ্র অনুভব, এই অপরূপ সত্যিকার হৃদয়ব্যাপারটাই দার্শনিকের দর্শন। আমরা দর্শনকে এমনি করেই পাচ্ছি।

দর্শন ছাড়া একান্ত সুখ কোথাও নাই। গতিময় সুখ নয়—স্থিতিপ্রবাহ আনন্দপরম্পরা। বুভুক্ষার মায়া অপসারিত হয়ে এই সত্যসুন্দর দর্শনের দীপ্তিতে যে দশদিশে উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছে, সেই দার্শনিক—আত্মসত্যে সে প্রতিষ্ঠ, অজর অমরতার বাণীতে তার প্রাণ মুখর—সেই সংযমী, সেই সদাজাগৃতি-সম্পন্ন মুনি মনীষী। তাদের প্রাণের কথাই আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে জাগিয়ে তুল্‌ছে। দর্শনের সার্থকতা হোক্‌ এই প্রাণের আরতিতে। অন্ধ অনুবর্ত্তন নয়—চাই আলো হতে আলোর উৎসার — দর্শনের অঙ্কে অঙ্কে এই উৎসবেরই সঙ্কেত। মুহুর্মুহুঃ ঐ তথাগত মহাপ্রাণদের প্রাণের বাণী আমাদেরো প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে। সকল বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই অনাহত বাণী শ্রবণই আমাদের দর্শনালোচনার লক্ষ্য হোক, আমরা অন্ধতমো হতে জ্যোতির্ম্ময়ের অভিমুখে অগ্রসর হই।



আলোচনা

সাম্প্রদায়িকতা বা স্বাদেশিকতা বিশ্বপ্রেমের চেয়ে যে খাটো ধর্ম্ম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু জগতে সব জিনিষেরই একটা প্রাকৃতিক পরিণাম আছে। প্রকৃতির ধারাকে অনুসরণ না করিয়া বিশ্বপ্রেম যদি একটা ভুইফোঁড় মনোবৃত্তিরূপে রাতারাতি গজাইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা বস্তুতঃ সৌভাগ্যের কারণ না হইয়া দুর্ভাগ্যের কারণই হইয়া থাকে। মনোবৃত্তির অনুশীলন হয় বিপরীত বৃত্তির প্রতিঘাতে—ইহা একটা মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্য। বিকারের ভিতর দিয়া পার হইয়া না আসিলে, নির্ব্বিকার হওয়া যায় না। আবার যে সমস্ত ধর্ম্ম অতি উদার, তাহার অধিকারও বেশী দূর বিস্তৃত হইতে পারে না; কেননা অতি উচ্চভাব ধারণা করিতে গেলে মস্তিষ্ক যে পরিমাণে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন, জনসাধারণের মস্তিষ্ক কখনো সেরূপ হয় না। অত্যুদার ধর্ম্মকে এই জন্য সার্ব্বভৌমরূপে প্রচার করিতে গিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত হইয়া যায়। বিশ্বপ্রেমের বুলি সম্বন্ধেও বোধ হয় এই কথাটা খাটে। জগৎকে আমরা অতি সহজেই আপনার করিয়া লই, কেননা সে জগৎ তো একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়; তাহাকে আপনার করিয়া লইতে সিকি পয়সাও খরচ নাই, মুখ হইতে একটা কথা খসাইলেই হইল। কিন্তু ঘরের দুটী লোককে আপনার করিতে গেলে বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন কোথায় উবিয়া যায়! আমাদের জাতীয় চরিত্রে এইজন্য অসামঞ্জস্য আর অসঙ্গতির সীমা-পরিসীমা নাই। বড় বড় ধর্ম্মের বুলি আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু অতি ছোট একটা ধর্ম্মও আমরা পালন করিতে পারি না। পরের কাছে গুঁতা খাইবার সময় বৈষ্ণবোচিত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রেমের বুলি আওড়াই; অথচ নিজের অন্তঃপুর-শাসনের বেলায় আমরা এক একজন মূর্ত্তিমান্ বীররস! ধর্ম্মের পরিণামজ্ঞান না থাকাতেই এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। আসল কথা আমরা শক্তিহীন। কাজেই যে ধর্ম্মের আচরণ করিতে গিয়া দেহের বা মনের এতটুকু শক্তিও ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় না, আমরা দলে দলে সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। অথচ শক্তিহীনের মাঝেও তো প্রবৃত্তির তাড়না থাকে; সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় যাহা কিছু করিতে যাই, আমরা শক্তিহীন বলিয়াই তাহা অকর্ম্মও হয় না, বরং দুষ্কর্ম্মরূপেই ফুটিয়া উঠে। যে দুর্ব্বল, সে যে কাহারও কিছু করিতে পারে না, তাহা নয়; সে নিজের কিম্বা পরের ভাল করিতে পারে না বটে, কিন্তু মন্দটুকু পুরাপুরিই করিতে পারে। এই দুর্ব্বলের হাতে পড়িয়া আজ বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মের কি যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে কি?

*

যে জাতির অতীত নাই, সে জাতির ভবিষ্যতও নাই। আমাদের একটা অতীত আছে বটে, কিন্তু সে অতীত না থাকারই সামিল। অতীতের খাঁটী ইতিহাস বলিতে আমাদের কিছু আছে কি? ইতিহাসে নিখুঁত কালজ্ঞানের প্রয়োজন, কালের ক্রমিক ধারা সম্বন্ধে একটা

সংস্কার থাকা প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় মনের সে বালাই নাই। আমাদের ঐতিহাসিক কাল-জ্ঞান বড় জোর বাপ-ঠাকুরদাদার আমল পর্য্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়—তারপর একেবারে চোখ বুজিয়া মহাকালের আঁধার বক্ষে ঝাঁপ দেয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাস যে কালপরিমাণের আর্য্যা আওড়ায়, তাহার মাঝে শতাব্দীর হিসাব নাই—আছে যুগ, মন্বন্তরের হিসাব। যাহা কিছু আমি দেখি নাই, কিম্বা আমার ঠাকুরদাদা দেখেন নাই, তাহাই মান্ধাতার আমলের বা সত্যযুগের। ইহাতে অতীতটাও যেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হইয়া যায়, ভবিষ্যৎটাও তেমনি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে। অতীতের স্মৃতিকে ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করিতে আমরা কসুর করি না, কিন্তু বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার সমন্বয় সাধনের কথা উঠিলেই আতঙ্কে দশহাত পিছাইয়া যাই! 'অতীত স্বচ্ছন্দে পূজার বেদীতে বসিয়া আমাদের কষ্টার্জ্জিত চাল-কলার নৈবেদ্য ধ্বংস করিতে থাকুন, আর ভবিষ্যৎটা পড়িয়া থাক্ নিয়তির খোস্‌খেয়ালের উপর; বর্ত্তমানের জন্য চিন্তার কথা বলিতেছ? বর্ত্তমানের চিনি চিন্তামণিই যোগাইবেন!' তিন কালের মীমাংসা আমরা এইরূপেই করিয়া রাখিয়াছি; এবং এই মীমাংসার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আধ্যাত্মিকতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এ কথা যে অস্বীকার করিবে, তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকবাসের ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত আছি! ঐতিহাসিক কালজ্ঞানের অভাব দেশের চিন্তাশক্তিকে যে কতখানি খর্ব্ব করিয়াছে, গত হাজার বছর ধরিয়া দেশের চিন্তাধারাকে যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁদের মস্তিষ্কে প্রায়শঃই ব্যক্তি স্থানচ্যুত হইয়াছে, ভাব তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে;—ফলে প্রত্যেক ভাবই হইয়া দাঁড়াইয়াছে সনাতন অতএব অকাট্য এবং পরম পূজনীয়! ইহার পর ভাবে, অভাবে আর দুর্ভাবে একটা জগাখিচুড়ী পাকানো হইয়াছে, এবং দেশ অমৃত-বোধে সে মহাপ্রসাদ চক্ষু বুজিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে। কোনও ভাবেরই ইতিহাস জানিবার প্রয়োজন নাই—সব সনাতন! কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই—সব স্বয়ম্ভূ! অতএব কোনও ভাবের প্রামাণ্য বিচারেরও প্রয়োজন নাই। ভাবের মূলে যদি ব্যক্তি খুঁজিতে যাও তো এমন একজনের নাম শুনিবে, যাঁহার দেখা পাইতে হইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগও ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে। সব কিছুকে এমনি সনাতন করিয়া তুলিবার মোহে ঝুড়ি-ঝুড়ি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ (অথচ হিন্দু বুক ফুলাইয়া বলিবে, বেদ অপৌরুষেয়) পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে মনীষীরা সঙ্কুচিত হন নাই! যে কোনও একটা মতবাদকে যদি জো-জা করিয়া সত্য-যুগের কোঠায় ঠেলিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত—উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে আর কোনও গোল উঠিবে না; কেহ কথা বলিতে গেলেই সনাতনী ধমক দিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব না!—এমনি করিয়া স্বাধীন চিন্তা, সত্যানুসন্ধিৎসা সব তলাইয়া গেল—জাগিয়া থাকিল শুধু অলৌকিক অতীতের প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি আর ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি! শ্রাদ্ধ আর কাহাকে বলে?

*

জ্ঞান ও প্রেম খুবই বড় আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিলে জগতের সকল সমস্যারই মীমাংসা হইয়া যায়; "আচণ্ডালে দিব কোল" বলিলে ভাবুকতার চূড়ান্ত আদর্শ প্রকটিত করা হয় বটে। কিন্তু এই জ্ঞান ও প্রেম যদি শক্তির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ না করে, তাহা হইলে ওই নির্জ্জীব সিদ্ধান্তের মূল্য কতটুকু? শক্তির পরিচয় প্রাণে; প্রাণের পরিচয় নিত্য নূতন সৃষ্টিতে, অভি-

নবের আবির্ভাবে। জ্ঞান যদি বুদ্ধিকে স্তিমিত করিয়া তুরীয় আদর্শ হইয়াই রহিল, আত্মবুদ্ধিকে বা পর-বুদ্ধিকে প্রাণের পথে সঞ্চালিত না করিল, তাহা হইলে সে জ্ঞানের সার্থকতা কি? প্রেম যদি আত্মার বীর্য্যাধান করিয়া নূতন জগৎ না গ'ড়িয়া তুলিল, তাহা হইলে সে প্রেমেরই সার্থকতা কি? শক্তিরও দুই রূপ আছে—এক সহিষ্ণুতা, অপর সৃজনী প্রতিভা। আমরা শক্তি বলিতেই বুঝি সহ্যশক্তি। যত পার সহিয়া যাও—মুখ বুজিয়া সহিয়া যাও—এই কথাই আজ দেশের পাণ্ডারা হাজার বছর ধরিয়া আওড়াইয়া আসিতেছেন। যে যত সহিতে পারে, সে তত বড় ধার্ম্মিক। কিন্তু কোনটারই তো বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শুধুই সহিয়া যাইব, নূতন কিছু সৃষ্টি করিব না—প্রকৃতির এই কি সনাতন প্রেরণা? আজ দেশে যে নূতন পথ কাটিতে যাইবে, তাহার পেছনেই অক্ষম ফেরুপালের চীৎকার শোনা যাইবে—সামাজিক বীরপুঙ্গবেরা তাহারই ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন!—কেন, প্রাণের পথে এত কাঁটা কেন? বড় বড় সিদ্ধান্ত ধুইয়া কি জল খাইব, যদি সেই সিদ্ধান্তের আলোকে নূতন পথ আবিষ্কার না করিতে পারিলাম? "নূতন পথ আর কি আবিষ্কার করিবে, পূর্ব্বপুরুষেরা তো সবই করিয়া গিয়াছেন, এখন শুধু সেই শ্লোকগুলি মুখস্থ কর"—এই বুলিই আমাদের শিক্ষার ধারাকে চিরকাল নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মানবমনের পরিণতি সম্বন্ধে ইহাই কি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত? আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, নিত্য নূতন রহস্যের সন্ধানে মানব প্রাণ আন্দোলিত হইয়া উঠে নাই মনে করিয়াছ? সে তোমাদের শাস্ত্রানুমোদিত bonafide পথে চলে নাই, কিন্তু প্রচলিত সমাজ-ধর্ম্মের সমস্ত ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছে। অভিন-ববর্জনের কুসংস্কারবশতঃ আমরা চিরদিন ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি এবং তাহার ফলে প্রাণের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকাশকে রুদ্ধ করিতে গিয়া সমাজের স্বাস্থ্যকে আরো কলুষিত করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রে এত বড় বড় সমন্বয়ের বুলি থাকা সত্ত্বেও সামান্য একটা সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার আমরা সমাধান করিতে পারি না কেন?—আমরা সৃজনী প্রতিভা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া। আমরা বিপ্লব ঘটাইয়া আয়েস ভঙ্গ করিতে চাই না, নূতন পথ খুঁজিতে যাই না, আবর্জনাস্তূপকে ঘেঁটাইয়া দূর করিবার সাহস আমাদের নাই (কেন না উহাও যে সনাতনের অঙ্গ!), তাহার উপর আবার নূতন আবর্জনা স্তূপীকৃত করিয়া সমাজের স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি করাই আমরা ধর্ম্ম মনে করি। জ্ঞান আমাদের কাছে বুলি মাত্র; প্রেম শুধু কীর্ত্তন-নর্ত্তনে পর্য্যবসিত। প্রাণহীন ধর্ম্মের সাধনায় বাস্তবিকতার আমেজ নাই—আছে শুধু কসরত! ফলে যে কি অষ্টরম্ভা লাভ হইতেছে, তাহাও কাহারও ভাবিয়া দেখিবার শক্তি নাই।

*

জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবারও সূক্ষ্মশিল্প আছে। সে শিল্পের সঙ্কেত প্রাণেরই আয়ত্ত। প্রাণ কি?—শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ততাই প্রাণ। আনন্দে আন্দোলিত হওয়াই প্রাণের পরিচয়, সুন্দরের উদ্বোধনে প্রাণের আরতি। প্রাণ অস্থির, প্রাণ দুর্দ্দম; কিন্তু সে অস্থিরতাতেও ছন্দ আছে। প্রাণ নৃত্যরূপ। প্রাণ ভাঙ্গে, কেন না ভাঙ্গিয়া গড়িবার শক্তি ও সাহস তাহার আছে। প্রাণ এই দেহটাকে ভাঙ্গিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন করিয়া গড়িতেছে বলিয়াই না এই জড়দেহেরও এত লাবণ্য? আমাদের দেশ যে স্থবিরত্বকে দর্শন-বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য ভাবিয়া অচল হইয়া বসিয়া আছে, সে দেশ বেদ-পন্থী বলিয়া নিজকে জাহির করিলেও বেদের প্রাণবস্তু সরল ধর্ম্ম

হইতে আজ সহস্র যোজন দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাণ রক্ষা করিয়া চলিবার হীনতাকে মানিতে চাহে না, সে চায় অন্তর্নিহিত আবেগের বলে নিজকে ফুটাইয়া তুলিতে। আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতায় বিশ্ব-প্রাণ নিত্য স্পন্দিত; আমরাই কেবল সত্যের দিবালোককে চক্ষুঃশূল ভাবিয়া পেচকের মত কোটরে মুখ গুঁজিয়া রহিয়াছি। আমাদের সমাজে, ধর্ম্মে, শিক্ষায় কেবল রফা, কেবল গোঁজামিল, কেবল জুজুর ভয়। সঙ্কোচ বা ভয় প্রাণের ধর্ম্ম নয়, উহা প্রাণের বিকার। প্রাণ অনিশ্চিতের ভরসায় বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে পারে না, সে বুক ফুলাইয়া বলিয়া উঠে—"ইহ চেদবেদীদ্, অথ সত্যমস্তি; ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"—এই এখানে যদি বিশ্বের রহস্য জানিতে পারা যায়, বলি সত্য আছে; আর এখানে যদি না জানা যায়, তাহা হইলে আছে মহাবিনাশ।" আত্মসাধনায় কোথায় আমাদের এই সবল প্রাণের প্রকাশ?

আরণ্যক

—(*)—

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

*

যেমন মরণের জন্য তৈরী হওয়ার উপদেশ পাও, তেমনি ঘুমের জন্যও তৈরী হতে শেখ। মর্‌তে জানলে যদি জন্মান্তর সুখের হয়, তাহলে ঘুমাতে জান্‌লে নবজাগরণও সুখের হবে, শক্তির হবে। বিশ্বাস না হয়, পরখ করে দেখ। ঘুম যে সহজ সমাধি।

*

এই কথাটা সার জেনো, যেখানে অস্বস্তি, তারই মূলে আছে কামনা। হয়ত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, শুধু শুধু দিনের মাঝে দশবার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে; কারণ কি আর বাইরে খুঁজলে মিলবে? কারণ রয়েছে নিজেরই মাঝে। নিশ্চয়ই কোথায়ও কামনা জেগেছে, আর তারই প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত বিকল হয়ে পড়ছে—এ কথা জ্যামিতিক সত্যের মত অকাট্য। আনন্দের অধিকার সহজ; কেবল কামনা ছাড়তে হবে। নিজকে ফাঁকা করে ফেললে আনন্দ উপচে পড়বে গো, তার জন্য আয়োজন করতে হবে না। সেই আনন্দই তো তোমার ইষ্ট, তোমার ভগবান! বাসনা ছাড়, ভগবান্ সহজে পাবে, দেখবে, বুকের ফাঁক ভরে জাগছেন শুধু তিনি!

'অমুক আমার নিন্দা করেছে'—এ কথা শুনে যার কষ্ট হয়, তার বুকে কামনা পোরা আছে। আর যার কামনা নাই, কর্ম্মে অভিমান নাই, নিন্দা শুন্‌লে তার হাসি পায়। সে ভাবে, আহা কি

ছেলেমানুষী, দেখ দেখি! নিন্দা শুনে যে বেজার হয়, তাকেও বলি, আচ্ছা ছেলেমানুষ তো তুই! মনের কথাটা মুখ ফুটে বেরিয়েছে বলে এত গোসা! মুখে না হয় সরাচাপা দিলি, পরের মনকে চাপবি কি দিয়ে? কাকের মত চোখ বুজে লঙ্কা গুঁজে ভাবছিস্ কেউ দেখ্তে পাবে না?

*

আজ জান্তে পার্লে, অমুকে তলে তলে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে। এরপর তাকে দেখে যদি মুখভার কর, তা হলেই বিপদ। যারা গোপনে শত্রুতা করে, তারা ভীতু, নিজকে ধরা দিতে চায় না। কিন্তু তোমার মুখভার দেখে ধরা পড়ে গিয়ে আরও বেঁকে যায়। যদি হাসিমুখে তাদের সঙ্গে কথা কইতে পার, তারা ভিতরে ভিতরে লজ্জা পাবে, তোমার ক্ষমায় তাদের বিদ্বেষ মরে যাবে—এ একেবারে ধ্রুব।

*

আনন্দময়ী, পরের মুখে নিজের বাহবা শুনে কি খুসী হই? তা নয়; ভাবি সে তো তোমারই স্তুতি, তাই হাসি। কণ্ঠে গান ফোটে তোমার সুরে—তাই শুনেই না আমার আনন্দ। 'আমি'কে ঢেকে আছ 'তুমি'—সেই তো পাওয়া।

*

গদ্য একটানা, কিন্তু পদ্যের মাঝে যতি আছে। তাই কবিতা শুন্তে মিষ্টি, যদিও আমাদের আটপৌরে কথা আমরা গদ্যেই চালাই। কিন্তু মনের মাঝে যদি একটু কবিতার রেশ থাকত, তাহলে জগৎ মধুময় হয়ে যেত। যাকে তোমরা সংযম ভেবে ভয় কর, রসিকের কাছে তা নেহাৎ কবিতা ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ লোক বৃত্তিগুলো গদ্যে চালায়—সেটা চল্তি হলেও নীরস। বৃত্তিগুলো সব সময় সচলও রাখতে হবে না, একেবারে অচল করেও ফেলতে হবে না—ওদের চলার ফাঁকে ফাঁকে বিরাম দিতে হবে। তাহলেই দেখবে, নিতান্ত গদ্যময় জগতও কবিতা হয়ে উঠেছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠ্ল, সবার ওপর তিক্ত হয়ে শাসন সুরু করলাম। এই শাসনটা যদি গদ্যে চালাই, তাহলে শুধু বদমেজাজের পরিচয় দেওয়া হবে; তাতে যেমন শক্তির অপব্যয়, তেমনি রসের অভাব। কিন্তু সংযমে বেঁধে যতি রেখে পদ্যে এই মেজাজটা চালালে নিজেরও পুষ্টি হয়, পরেরও অকারণ রুষ্টি হতে বাঁচা যায়।

*

প্রথমতঃ মানুষের মন্দটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা থাকে। তারপরে কিন্তু ভাল হওয়ার ইচ্ছাটাও চলে যায়। তবে চোখে তখন ঘুম থাকলে চলবে না। ভালমন্দ গলাগলি করে চলেছে, আমি দেখছি—এই না আর্ট।

*

নিজের কাজ না হলে গরজ হয় না। সেবা করব আবার কার? পরের মাঝেও যদি নিজকে না দেখতে পাই, সেবা করে কি সুখ আছে?

*

কাকে পাই, কি লাভ হয় তা জানি না; তবে কিনা সংশয় দূর হয়, হতাশা ঘুচে যায়—এমন একটা অবস্থা আমরা মাঝে মাঝে পাই। যাকে আমরা আকস্মিক বলি, চিত্ত স্থির হলে তার নিত্য স্পন্দন অনুভবে হতে থাকে। অসামঞ্জস্য কোথায়ও নাই। যত গণ্ডগোল সব মনের চঞ্চলতায়!

*

অন্তঃস্থলে কোন গুমোট না রেখে যে অনুভূতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, তাকেই বিশ্বাস কর। স্বার্থজড়িত ভাবনার মাঝে অনেক অসত্যের বীজ নিহিত থাকে। সংস্কারনির্ম্মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবকে কখনো অবিশ্বাস করতে নাই।

বিদ্যুতের মত যে আলোক ক্ষণেকের মাঝে জীবনের সমস্ত তিমিরকে ধ্বংস করে দেয়, ধ্যানে সমাহিত হলে কি সে বিদ্যুৎপ্রবাহের একটা রহস্য আবিষ্কার করতে পারা যায় না? ধর্ম্ম যদি ব্যতিক্রম না হয়ে স্বভাব হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝেও তার একটা ছন্দ-সামঞ্জস্য খুঁজে পাব !

*

কামনার বেগকে সয়ে যেতে হবে। একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করে থাকলেই দেখবে অনেক কামনা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার লয় পেয়ে যায়। ব্যর্থ কামনার আবেদনই বেশী, সফল কামনা তার মাঝে মাত্র দু'চারটী।

*

বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার দরুণই আরও বেশী করে সংশয় করবে। সে সংশয়ে তো তোমার কোন ক্ষতির কারণ নাই। যাকে সত্য করে পেয়েছ, সে তোমার হকের ধন। তোমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবার অধিকার কার?

*

দুদিকে যদি সামাল দিয়ে চল্‌তে পার, সে তো খুবই ভাল; তা না হলে মাঝে মাঝে কর্ম্মকোলাহল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে আত্মস্থ হতে হয়। কর্ম্ম করছ আত্মারই প্রেরণায়। কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে সে প্রেরণার উৎস বন্ধ হয়ে গেলে তো আর নূতন কোন কর্ম্ম করার শক্তিই পাবে না। কাজেই একবার এদিক, আবার ওদিক দুদিকেই ছুটাছুটি করতে হবে। কোনদিকেই অভিভূত হয়ে পড়লে চল্‌বে না।

*

যখন যে অবস্থাটাই আসে তাকেই আমরা চরম বলে মনে করে নিই, তাই বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের কিম্বা অতীতের কোন সামঞ্জস্য দেখতে পাই না। একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে বিচার করলেই দেখতে পাই, সমস্ত ঘটনাই পর পর সাজানো আছে। অন্তর্দর্শী মাত্রেই স্থির-ধীর গম্ভীর, কেননা তাঁরা অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের মাঝে একটা সামঞ্জস্যসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

*

জীবনে এক এক সময় এক একটা অগ্নিপরীক্ষা আসে। চিত্তের এই জ্বলুনীকে সহ্য করতে না পেরে অনেকেই অভীষ্ট পথ ছেড়ে পালায়। কিন্তু ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত যারা অবিচলিত নিষ্ঠায় আপন লক্ষ্যে যুক্ত থাকে, তারাই জয়ী হয়।

*

নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন। তবে কিনা ক্ষেত্রবিশেষে আঘাত না করাটাও অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। যে ক্ষেত্রে বেশ বুঝ্‌ছ, কি কর্ম্ম এবং কোথায় তার পরিণাম, কি তার ফল, তবু পিছিয়ে আছ—শুধু অস্বস্তি সইতে পারবে না, এই ভয়েই তো? সেই ক্ষেত্রে বলি—হে অপ্রধৃষ্য, তুমি অপরাধী নও—অকুণ্ঠ চিত্তে আঘাত কর এবং প্রতিঘাত মেনে নাও। পিছিয়ে থাকা কাপুরুষতা, মূর্খতা!

*

আঘাত পেয়ে বুঝি, কামনা যায়নি। পেলেও ত্যাগ করা উচিত ছিল, তবু করিনি। নিজে থেকে ফিরিয়ে দিইনি বলেই তিনি কেড়ে নিলেন, তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কি আছে?

*

মনের সাক্ষাৎ সহজে পাইনি; যদিও পেয়েছি, লুকালুকি করতেই কতদিন কেটে গিয়েছে। কেবল জ্বালা, অস্বস্তি, অবিরাম সংশয়ের পর সংশয়—কেবল হরঘড়ী জবাব আস্‌ছে "জানি না" আর "বুঝতে পারি না!" সত্যি বটে, কে জানে কার কিসে কি হবে; তবু ভাবতাম, একটা লক্ষ্য চাই, একটা বজ্রদৃঢ় অভিমান চাই—ভিতরফাঁকা দুর্ভাবনার হট্টগোলের মাঝেও যা অন্তরকে অটল

রাখে। ক্রমশঃ যখন নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখলাম, নিরালম্বযোগ তখনি সিদ্ধ হল। আদিতেও ফাঁকা, অন্তেও ফাঁকা—মাঝেই যা একটু। ঐটুকুই তো খাঁটী বৈশিষ্ট্য। বোঝাপড়া সুরু হয়েছে যখন—মিট্‌মাট্ না হয়ে যায় কোথায়?

*

মনের কথা মনকে শোনাই, তাতে প্রচুর লাভ। নিজের খবরদারী নিজে কর্‌তে পার্‌লেই তো মানুষ মানুষ হয়ে গেল।

*

আমার ইচ্ছাকেও ছেড়ে দেওয়া চলে না, আবার তাঁর ইচ্ছাকেও বরণ করতে হবে। ব্যালান্স্ ঠিক রাখাই শক্ত; অবাধে চলা তো দূরের কথা। কিছুই না বুঝি যেখানে, সেখানেও হাল ছেড়ে না দিয়ে নিঃসংশয়ে নিজের বুদ্ধিতেই চল্‌তে হচ্ছে; কিন্তু প্রতীক্ষা রেখেছি উর্দ্ধপানে—যেমনি ইঙ্গিত পাব, অমনি মৎলব ছেড়ে দেব। যাঁর বোঝা তিনিই বওয়াচ্ছেন। আমার চেয়ে বড় কাউকে না পেতেই যদি আমাকে ছেড়ে দিই, তাতে কি আত্মলোপ হবে না?

*

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লড়াই করে পার তো রোগ সার; কিন্তু না পার্‌লেও সয়ে নেবার ধৈর্য্য-টুকু চাই। ধৈর্য্য মানেই হল—যা চাচ্ছি তা আস্‌ছে ধীরে ধীরে। খুঁৎখুঁতিতে কেবল শক্তির অপব্যয় নয় কি?

*

সবি আছে নিজেরই মাঝে—কেবল চালিয়ে-চরিয়ে নিতে হবে। উপকরণের অভাব কোথায়? চাই সৃষ্টিশক্তি, অর্থাৎ তপস্যার প্রতি প্রণয়—আর কিছু নয়। হাঁ করে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? খুঁজে দেখ না, আপন ঘরে কি আছে!

*

ব্যবহারে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাবে কেন? চাও বলেই তো ক্ষুব্ধ হও। তোমার ইচ্ছার চেয়ে বড় কোন ইচ্ছায় এই জগৎ-চরাচর চল্‌ছে ভাব্‌তে ভয় পাও—ভাব বুঝি, তোমার সাজানো সংসার এলোমেলো হয়ে যাবে? ও কৃপণতা দূর কর; কত আস্‌বে কত যাবে—কেবল আনন্দ-ভরে দেখে যাওয়া—এই তো আসল পাওনা-দেনা।

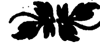
*

ধরে রাখ্‌তে পারি না, কিন্তু মনে সে থেকে যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে পড়ে যায়। ঐ যে চিত্তের স্নিগ্ধতা, চিন্তার বিরতি—এই কি আমার সে? আমার আত্মা বল্‌তে কি এই শুদ্ধ চিত্তই নয়?

*

আমার মন আমাকে সব চেয়ে বেশী ভোলায়। কিন্তু আমি যেদিন তাকে ভোলাতে পারি, সেদিন আর আনন্দের সীমা থাকে না।

উৎসবে দান-প্রাপ্তি



শ্রীযুত তারানাথ দাস মণ্ডল	১০৲
শ্রীযুত গোবর্দ্ধনচন্দ্র কুণ্ডু	৫৲
ঐ (জন্মোৎসব)	২॥০
শ্রীযুত বিন্দুচরণ দাস	৫৲
শ্রীযুত গগনচন্দ্র দেব	৪৸৵০
শ্রীযুত রমেশচন্দ্র গুহ	৫৲
শ্রীযুত নীহাররঞ্জন নন্দী	৫৲
বরগোদা সারস্বত-সঙ্ঘ	১৫৸০
[শ্রীঅন্নদাচরণ মাইতি	১০৲
শ্রীকুমুদবান্ধব "	১৲
শ্রীভূতনাথ "	।০
শ্রীহারাধন দাস	।০
শ্রীবামাচরণ দাস	।০
শ্রীজন্মেজয় দাস	।০
শ্রীযুতা বিদ্যাসুন্দরী	।০
শ্রীসতীশচন্দ্র মণ্ডল	।০
শ্রীজ্ঞানদাচরণ মাইতি	।০
শ্রীঅমরনাথ মণ্ডল	॥০
শ্রীকেনারাম মণ্ডল	।০
শ্রীকামদেব মহাপাত্র	॥০
শ্রীকেদারনাথ দাস	।০
শ্রীধরণীভূষণ দাস	॥০
শ্রীযামিনীভূষণ দাস	।৵০
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস	।০
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুজা	।০
শ্রীঅধরচন্দ্র সেন	।০]
শ্রীসারদাচরণ দাস	২৲
শ্রীবরদাচরণ দাস	১৲
শ্রীযুক্তা মানদাসুন্দরী দত্ত	॥০
শ্রীজানকীরায় চৌধুরী	১৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়	২॥০
শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ	২৲
শ্রীঅমূল্যকুমার দাস	॥০
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস	২॥০
শ্রীরাধানাথ দে	১৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়	২৲
শ্রীউমেশচন্দ্র পাল চৌধুরী	॥০
শ্রীকুমুদিনীকান্ত সাহা	১৲
শ্রীআশুতোষ দাস	২৲
গিরীশচন্দ্র ঘোষ	২॥০
M. L. Sen	২৲
শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী	২৲
শ্রীযুক্তা বিনোদিনী সরকার	২৲
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দত্ত	১৲
শ্রীনলিনীকান্ত দে	॥০
শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	॥০
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৲
শ্রীনলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
শ্রীপ্রিয়নাথ হালদার	১৲
শ্রীপ্রিয়নাথ চন্দ	১৲
শ্রীনৃসিংহপদ পাল	১॥০
শ্রীহরপ্রসাদ রায়	১৲
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পুততুণ্ড	১৲
শ্রীশশিকুমার দাসগুপ্ত	॥০
শ্রীকরুণাসিন্ধু প্রামাণিক	১৲
শ্রীনৃপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৲
শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরী	॥০

আশ্রম-সংবাদ

বিগত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সারস্বত মঠের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক উৎসব ও পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যথাবিধি পূজা, হোম, আরতি, বেদ ও গীতা চণ্ডী পাঠ এবং নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজান্তে সকলেই যজ্ঞীয় তিলকাদি ধারণ করেন এবং উপস্থিত ভদ্রগণের মধ্যে ফলমূল, খেচারান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রসাদ বিতরিত হয়। নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও সহরের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্য কোন স্থান হইতে ভক্তসমাগম অধিক হয় নাই।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র

২৩শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

আষাঢ়—১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৪৩ — তৃতীয় সংখ্যা

উদ্বোধনং

—(*)—

সব জায়গাতেই অনুকূল স্রোত পাওয়া কঠিন। মাঝিকে কতদূর পর্য্যন্ত উজান স্রোতের সঙ্গে লড়াই করিয়াই চলিতে হয়, তারপর ভাটিয়াল স্রোতে নৌকা আপনি তর্‌তর্‌ করিয়া চলিয়া যায়; কতকদূর পর্য্যন্ত সকলকেই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই চলিতে হয়—অনাবিল ভাব-স্রোতের সন্ধান ক্রমশঃ মিলে। চঞ্চল দুঃখজগতের অন্তরালে শান্ত স্নিগ্ধ ভাবের লহরী অপ্রতিহতবেগে বহিতেছে বটে; কিন্তু সেই অনাবিল স্রোতের সন্ধান পাইতে হইলেও কত অসংখ্য তরঙ্গবিক্ষোভকে যে বুকে ঠেলিয়া বিধ্বস্ত করিতে হইবে তাহার সীমা নাই। কাজেই জীবনের গতিকে ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত করিতে হইলেও শক্তির প্রয়োজন। খানিক পর্য্যন্ত সাঁতরাইয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িলে সেই অনন্ত সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া দায় হইয়া উঠিবে—অনুকূল স্রোত পাওয়া তো দূরের কথা। কোন দিনই কোলাহলের অন্ত হইবে না—জগতের এই হট্টগোল চলিবেই, কিন্তু এর মাঝেই যদি তুমি আনন্দের আস্বাদন পাইতে চাও, তাহা হইলে একমাত্র আত্মনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। আত্মনিষ্ঠ হইতে গিয়াই দেখিবে—ধর্ম্ম-বিঘ্ন তোমার কত। এই বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া গেলে তারপর প্রকৃতি তোমার অনুকূল হইবে।

সংগ্রাম করাই চরম লক্ষ্য নয়, আমরা চাই সেই 'স্থিতিপ্রবাহ'। কাজেই অসংখ্য দিক হইতে আমাদের

চেষ্টা জাগ্রত হইয়া উঠে। জানি, কোনমতে যদি সেই অনুকূল স্রোতে গিয়া পড়িতে পারি—তাহা হইলেই এত করিয়া আর বেগ পাইতে হইবে না। গতি নিরুদ্ধ হইবে না তখনো, কিন্তু কি সহজ-সরল অনায়াস সে গতি! জীবনভরা আমরা দ্বন্দ্ব করিয়া চলিয়াছি কিসের দরুণ, যাহাতে সেই সহজ জীবনেরই সন্ধান পাই। কাজেই প্রাথমিক চেষ্টার মাঝে যে উগ্রতা প্রকাশ পায়, মহৎ লক্ষ্যের বিচারে তা ক্ষমার্হ হইতে পারে না কি?

অচঞ্চলকে এখনো পাই নাই বলিয়াই আমাদের হৃদয় ছানিয়া এই উন্মত্ত তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। জানি ইহাতে একদিকে শক্তির অপব্যয় হইতেছে; কিন্তু কৈ শক্তির জোগানও তো আবার পাইতেছি। কাজেই কোন দিন পথের সন্ধান পাইব না, এই বলিয়া তো মন আশাশূন্য হইয়াও পড়িতেছে না।

কি করিয়া বলি, মায়িক আকর্ষণই বড় আকর্ষণ! আমার অজ্ঞাতে যে আকর্ষণ-শক্তির লীলা চলিতেছে—তাহার আকর্ষণ যে আরও প্রচণ্ড! যাও তো অন্যায়ের পথেই, তুমি কতদিন চলিতে পার দেখি! প্রশান্ত সাগরের বুকে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা যে আবার তাহাতে লয় পাইয়া যাইবে। মানুষ না বুঝিয়া স্পর্দ্ধা করে শুধু!

সাধক তুমি—লক্ষ্য তোমার অচঞ্চল ভাবপারাবার। কিন্তু সহজে তাহা লাভ করিতে পারিবে না। মনে হইতেছে যেন এ তো খুবই কাছে—কিন্তু ঝাঁপ দিয়া দেখ, চারিদিকে তোমার অকূল সাগর। ভাবিলে চলিবে না—চলিতে চলিতেই দেখিবে, একদিন কেমন করিয়া যেন ভাবের "উত্তমাশা অন্তরীপ" আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। পথের দুঃখ-গ্লানি তখন সার্থক হইয়া উঠিবে—তোমার এই দুঃখ-কষ্টের জীবনই অমৃতানন্দে ভরিয়া উঠিবে।

অহরহ তোমার মনে যে আশা জাগিয়া উঠিতেছে—তাহা মিথ্যা নয়, অলীক নয়। কিন্তু তুমি তাহার প্রতি মোটেই আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছ না—কাজেই বলিতেছ, কৈ পথের সন্ধান তো এখনো পাইলাম না। তুমি না ভাবিলেও—তোমার আত্মা কিন্তু সেই অজপা জপই জপিয়া যাইতেছেন। "ওঠ! জাগ! এই সত্যের পথ"—সর্ব্বদা তোমাকে এই বাণীতে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তিনি! শুনিবার দরুণ তুমি উন্মুখ হইয়া আছ কৈ?

আবার বলি, স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও অজ্ঞাতে সেই শক্তিই প্রাণে এক দুর্ণিবার চেষ্টা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। মোট কথা, আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। পথের সন্ধানেই পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছি। এমন করিয়াই হয়ত একদিন পথের সন্ধান মিলিয়া যাইবে।

সত্য চিরজাগ্রত, কিন্তু সত্যকে তো উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। হয়ত কাহারও কাছে সত্য জ্বলন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আমি যে এখনো অন্ধতমিস্রায় নিমজ্জিত। কাজেই সিদ্ধের লক্ষণ অনুসরণ করিয়া চলিলে তো আমার চলিবে না। সিদ্ধের যা লক্ষণ, সাধকের পক্ষে তাই সাধন।

মনকে অচঞ্চল রাখা কঠিন, কিন্তু ইহার দরুণই তো অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাধনা। সাধনার অনভ্যাসেই তো সমস্ত ইন্দ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে—কাজেই সাধনার অভ্যাস করিলেই তো আবার তাহাদের গতি ফিরিয়া যাইবে। এই সহজ কথাটা বুঝিতে অবশ্য সময় লাগে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা ইন্দ্রিয়কে সংযত করিবার চেষ্টা করি আমরা কয়জনা?

প্রত্যেকের জীবনেই শান্ত সমাহিত ভাব রহিয়াছে—কিন্তু সেই ভাবের সঙ্গে নিজকে মিলিত করিতে না পারিলে তো বাহিরের উত্তেজনাতেই চিত্ত কেবল উন্মত্ত হইবে। মানুষ শান্তি পায় না কেন?—অথচ শান্তি তো তাহার নিজের অন্তরেই রহিয়াছে। কথা হইল এই যে, ভাব থাকিলেই চলিবে না—ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই।

আমরা মনে করি, হয়ত সহসা একদিন চিত্ত স্থির হইয়া যাইবে—তখন সমাধি আপনি আসিবে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই কথা বলে না। সমাধি উৎপন্ন করিতে হইলেও সমাধি লাভের সাধনা করিতে হইবে। সমাধি আচমকা আসে না—সমাধি 'উপায় প্রত্যয়', কাজেই সমাধিও পর পর উপায় অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়। সে উপায় কি ?—শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা—অন্তরে ইহাদের জাগাও!

প্রত্যেকের মাঝেই অনবরত বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিতেছে, কিন্তু অন্তর-বাহির উজ্জ্বল একরস করিয়া তুলিতে না পারিলে, সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের তো কোন সার্থকতাই নাই। অনেক কিছু আবর্জনা জঞ্জালকে ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে হইবে, তবে না সেই ভাগবত জীবন ফুটিয়া উঠিবে। তখন ইহসংসারই নিত্যবৃন্দাবনে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই ভাগবত জীবন লাভ করিতে হইলেই প্রথম তোমাকে বাক্যে, চিন্তায়, কর্মে সংযত হইতে হইবে। বিনা সাধনে কোন দিন সহজ অবস্থা আসিতে পারে না।

তারপর সহজ অবস্থা আসিলেই কি তোমার বিরামের দিন আসিয়া পড়িল ভাব? তা নয়! নূতন নূতন ভাবস্রোতে, উৎসব হইতে উৎসবে তখন তোমার গতি। সে গতিতে ক্লান্তি নাই—অবসাদ নাই, একটানা স্রোতে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া নিয়া চলিবে। মোট কথা, আর তোমার পতনাশঙ্কা নাই তখন। মাধ্যাকর্ষণের অতীত হইয়া গেলে তুমি!

কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করিতে হইলেই তীব্র সংবেগ চাই। শক্তি যেখানে শেষ হইয়া যাওয়ার কথা, সেইখানেও তোমার অফুরন্ত শক্তি পুঞ্জীভূত থাকা চাই—তবে না তুমি মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া ভাবলোকে যাইতে সক্ষম হইবে। ইহার পূর্ব্বে ক্লান্তি কিম্বা অবসাদ আসিয়া পড়িলেই তো সঙ্কট।

চেষ্টাই তো জীবনের পরিচয়। তবে কিনা চেষ্টারও ভাল-মন্দ বিচার রহিয়াছে। মানুষ যখন তুমি, তোমার পক্ষে উন্নত প্রচেষ্টাই আদর্শ হওয়া প্রয়োজন। অজ্ঞানীর পক্ষে সব একাকার হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানী অর্থাৎ যাহার চেতনা প্রদীপ্ত, তিনি এই কথা স্বীকার করিবেন কেন? জ্ঞানীকে যদি ভাব-স্রোতে ভাসাইয়াও নিয়া চলে—তবু তিনি সজ্ঞানে ভাসিয়া চলেন, অর্থাৎ তিনি যে ভাসিয়া চলিয়াছেন এ কথা তিনি জানেন। কিন্তু অজ্ঞানীর কাছে তো সব অব্যক্ত, সব অন্ধকার! স্বপ্নে, জাগ্রতে, সুষুপ্তিতে কোথায়ও অচেতন হইয়া পড়িলে চলিবে না। কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, সব দিকের খবর রাখিয়া চলিতে হইবে তোমাকে।

কক্ষনো ভাবিও না যে "সহসা একদা আপনা হইতে" অমৃতের কলসী আসিয়া তোমার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর পড়িলেই বা কি অপরের দেওয়া প্রসাদে তোমার তৃপ্তি হইবে কেন? নিজের চেষ্টায় যাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলে, যে বিদ্যা অপরের দেওয়া বিদ্যা, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অভিমানী যাজ্ঞবল্ক্যের মত উদ্গীরণ করিয়া ফেল। সত্য তোমার হকের ধন, কেহই তাহাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। উদ্ধত হইতে বলি না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে যে তুমি নিজের শক্তি খাটাইয়া একটা কিছু করিতে পার এই বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাকা চাই। শক্তিমান্ ভক্ত না হইতে পারিলে প্রসাদের মর্য্যাদাই বা বুঝিবে কে? প্রসাদের মহিমা কেবল উদর পরিপূরণে নয়—আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশে।

সত্য তোমার মাঝেই নিহিত, কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে মিশিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। নিছক সত্যের কত জোর তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না। তীব্র আকুলতা দ্বারা সব

জড়ত্ব উন্মোচন কর—দেখিবে সত্যের কি উজ্জ্বল মহিমা—কি প্রচণ্ড শক্তি!

মহাশক্তি রহিয়াছে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ব্যষ্টি শক্তিকেও অবিশ্বাস করি না। ইচ্ছা করিলে আমিও কিছু করিতে পারি। অলক্ষ্যে কে হয়ত আমাকে শুভ পথে প্রচোদিত করিতেছে—কিন্তু আমার চেষ্টা নিরপেক্ষ হইয়া সেই শক্তির মহিমাও বেশীক্ষণ উজ্জ্বল থাকে না। সহজ কথায় বলি, কাহারও প্রভাব হয়ত আমার উপর রহিয়াছে, অর্থাৎ আমার জীবন যাহাতে সৎপথে পরিচালিত হয় তাহার দরুণ তিনি কল্যাণ কামনায় নিয়ত—কিন্তু এই কথাও একেবারে নিছক্ সত্য, আমার ভিতর যদি ভাল হইবার চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে হাজার মঙ্গল কামনায়ও আমার কিছু করিতে পারিবে না। আর সাধারণতঃ দেখিতেও পাই—যেখানে তুইটা মহৎ হৃদয়ের সংযোগ হইয়াছে, সেইখানেই আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্চর্য্য স্ফুরণ হইতে পারিয়াছে। যেমন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ। কিন্তু ইহাও ঠিক, বিবেকানন্দ যদি বিবেকানন্দ হইতে না চাহিতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের শত কান্নাকাটীতেও কিছু হইত না।

তোমার জীবনের রহস্যের সন্ধান অপরে আসিয়া বলিয়া দিবে—ইহা প্রবঞ্চনার কথা। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" তুমি নিজেই তোমার নিজের রহস্য আবিষ্কর্ত্তা। আর আত্মবলেই যখন জানিতে হইবে—তখন অসংখ্য প্রকার পথ আবিষ্কৃত হইবে। ভয় কি? না হয় চরম লক্ষ্যে পৌছিতে দুদিন দেরী হইবে, তবু তো তুমি এই বলিয়া বিজয়দুন্দুভি বাজাইতে পারিবে—"আমি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল পথে বিচরণ করিতে করিতেই পথের সন্ধান পাইয়াছি।" তোমার প্রাণের উদ্বোধন আরও কত জনের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিবে দেখিতে পাইবে। আত্মশক্তি যাহার ভিতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই তো গুরু। এই আত্মাকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

সাধক তুমি, তপস্বী তুমি,—আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করাই তোমার একান্ত লক্ষ্য—এই কথাটী যেন কখনো না ভুল।

আত্মপ্রচার

মানুষ চায় নিজকে ব্যক্ত করতে। যে অনাদি রসের প্রস্রবণ তার মাঝে নিত্য বর্ত্তমান, কণামাত্র যখনি তা সে অনুভব করে, অমনি তা প্রকাশ করে দশজনকে দেখিয়ে তবে সেই আনন্দের তৃপ্তি অনুভব করে। যত জানি, জানিনা তার বহুগুণ, কিন্তু তবু ঐটুকু পেয়েই সেই অজানার দুঃখটা ভুলে যেত মানুষ ব্যগ্র হয়ে উঠে। এজন্য মানুষকে বোকা বলা যায় না, বরং বলা যায় যে মানুষ বড় ছেলেমানুষ। অর্থাৎ বুদ্ধি নাই নয়, বুদ্ধি এখনও ফোটে নাই। মানুষের মনের এই শৈশব বড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। হয়ত কত জন্মজন্মান্তর কেটে যায় শুধু একটা মাত্র ভুল ভাঙ্‌তে। যেমন, যেটা সুখ নয়, সেটাই সুখ বলে মনে হওয়া, দুঃখময় জেনেও মন মেতে যাওয়া—এতো সব সময়েই আমাদের অজ্ঞাতসারেই হয় না। সব বুঝেও তো মন ফিরে না—কাজেই অজানা বলি কি করে? জেনেশুনে বিবেক-

রূপী অভিভাবকের নিষেধ না মেনে ভোলা মন-শিশুটী কতবার এমনি বস্তুর দিকে দৌড়ে যায়, তারপর ঘা খেয়ে আবার চোখ মুছতে মুছতে এসে দেবতার কাছে মাথা নত করে দাঁড়ায়। কিন্তু ছেলের মনে কতক্ষণ সে ভাব স্থায়ী হয়! আবার ছুটে, আবার পড়ে, আবার উঠে, আবার নামে। এমনি ওঠা-নামা চলে কত জীবন ধরে! এই তো প্রপঞ্চ জগতের তুফানময় জীবন! মানুষ এরই আবার গর্ব্ব করে—ঢেউয়ের দোলায় অনবরত দোল খেয়েও তারি মাঝে নিজের পুঁজিপাটা অপরকে দেখায়—ভাবে বুঝি সব বুকে করে ম'লেই সঙ্গে যাবে!

মানুষের যে এই চিরকাল বর্ত্তমান থাকার ইচ্ছা, এ তার স্বাভাবিক অর্থাৎ আত্মার ধর্ম। আত্মা অমর, সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই মানুষের না মরার ইচ্ছা, স্ব-আসন সর্ব্বোত্তোপরি স্থাপনের চেষ্টা প্রভৃতির বীজ তার অন্তরেই নিহিত। কিন্তু এ বীজকে উপ্ত করতে গিয়ে মানুষ গোলমাল করে বসে। যেই মহীরুহের বীজে তার জন্ম, তাতে সে যে বড়, সে কথা প্রচার করতে গিয়ে অভিমানের আড়াল দিয়ে আত্মার জ্যোতিকে মেঘের মত ঢেকে ফেলে। তাই মানুষ আঁধারে থেকে ছোট হয়ে যায়।

আমরা মানুষকে অহঙ্কারী বলে গাল দেই কখন? যখন দেখি, তার অন্তরের যে দিব্য তেজ নীরবে অপরকে আলোকিত করছিল, সেই তেজের চেয়ে প্রদীপের সেই উজ্জ্বল বিভার চেয়ে তার কালো ধোঁয়াই অন্য মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায়, শক্তির উৎস বস্তুটী যে আসলে কি তা ভুলে যায়, তখন সেই বিকৃত বুদ্ধির বড়াইকেই আমরা ঘৃণা করি। কারণ তখন দেখতে পাই, আসল মানুষ আবৃত হয়ে গিয়ে তার উপরের অভিমানের মুখোস-টাই নিজকে কর্ত্তা বলে জাহির করতে সুরু করেছে; আত্মাকে, আসল মানুষটীকে ছোট করে ফেলেছে; তাঁর অপরিসীম শক্তির আরাধনা ভুলে গিয়ে সংহত ক্ষুদ্র শক্তির আস্ফালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! এই কি আত্মার ধর্ম্ম? কখনই নয়।

আত্মা সর্ব্বশক্তিমান হয়েও অটল। আর মানুষ সামান্য শক্তি লাভেই চঞ্চল! চঞ্চলতায় কিন্তু শক্তির প্রচার হয় না। বরং হয়রান্ হয়ে গিয়ে নিজের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যস্থলে স্থির আছেন বলেই সবিতৃদেবতার বিমল জ্যোতিতে জগৎ প্রাণবন্ত। নতুবা সমস্তই ধ্বংস হত। জীবনটাও তেমনি। সুখ-দুঃখ, শক্তির প্রকাশ-অপ্রকাশ সমস্তই এসে একবার করে সমুদ্রে ডোবা পাহাড়ের মত এই জীবনকে ঢেউয়ের সঙ্গে নিঃশেষ করে দিতে চায়। সে ঢেউয়ের ঘটা, শক্তির আস্ফালন, বুদ্ধিমানকে মাতিয়ে তোলে না; বরং মরণের দূত জেনে আরও দৃঢ় গম্ভীর করে।

শক্তি কর্ম্মের দেবতা। কর্ম্ম যথার্থরূপে সম্পন্ন হলে শক্তি ও আনন্দ এসে উভয়ে উভয়কে বর্দ্ধিত করে। কাজেই কর্ম্মের সাফল্য, শক্তির প্রকাশ প্রমাণিত হবে হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে। শক্তিমানের বুকে শক্তির যে আনন্দ, বাইরের লোকে তার কি বুঝবে? তারা তো শুধু কর্ম্মরূপে যেটুকু তার প্রসাদ পাবে, তাই দিয়েই শক্তির পরিমাণ করবে—আনন্দের ভাগ তো তারা পাবে না। কবির কাব্য জগৎকে একধারার আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ তাঁর বুকে যে দীপ্তি আনে, অপরে তা পাবে কোথায়?

কিন্তু মানুষ চায় নিজের এই আনন্দকে অপরের মাঝে সংক্রামিত করতে। এইখানেই তার ভুল হয়ে যায়। ভগবান আদি কবি। আমাদের বিচারে সু-কু যাই বলি না কেন, তিনি সবই সৃষ্টি করেন। এখনও আমার তাঁর সেই অনন্ত সৃষ্টির কতক অংশকে সু অর্থাৎ সুন্দর আখ্যা দিয়ে তার স্তবে আত্মহারা হই, আবার কখনও বা কতক

অংশকে কুৎসিৎ ভেবে মুখ বিকৃত করে তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠি। কিন্তু ভগবানের তাতে কিছু যায় আসে না। লীলাচ্ছলে সৃষ্টির যে অপরূপ মাধুর্য্যে স্রষ্টার বক্ষ পরিপূর্ণ, নিন্দা-স্তুতির জনশ্রুতি সেখানে কলরব তুলতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ণতার আকর্ষণে ভালমন্দ সব আসছে। সবই আসছে, কিন্তু স্থান কাল-পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন বা অবস্থানুযায়ী কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ বলে গৃহীত হচ্ছে। তাই আজ যা ভাল, দুদিন পরে তা মন্দ বলে গণ্য হতে পারে। আবার আমার কাছে যা মন্দ, অপরের কাছে তা ভাল হয়। কাজেই ভাল-মন্দের বিচার মূঢ়ের নয়।

মানুষের সৃষ্টিও যখন সেই আদি কবি ভগবানের সত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন তা নিন্দা-স্তুতিতে উদ্বেল হয় না। কিন্তু চিত্তের সেই দেবভূমি যখন অসুরে দখল করে, তখনই হয় জাহিরী ভাব। নতুবা দেবভূমিতে অবস্থিত থেকে যে বিশ্বময় প্রেমে আত্ম-প্রসার হয়, তাতে চঞ্চলতা নাই—আছে প্রশান্ত গভীর আনন্দ; দুঃখের আঘাত সেখানে বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করে না। মানুষের এই আত্মপ্রসার চিরস্থায়ী, কিন্তু আত্মপ্রচার ক্ষণবিধ্বংসী। "বিশ্বের সমুদয় ভাব-সম্পদ আপন বুকে আছড়িয়ে পড়ুক আর প্রতি জীবে আমার অস্তিত্ব বোধে আনন্দ দ্যোতনায় তা ছড়িয়ে পড়ুক"—এই যে চির প্রয়াস, অভাব তাড়নায় এর মাঝে হাহাকার তুলবে কখন? অভাব কোথায় যে প্রচার করবে? আত্মপ্রসারিতের দৃষ্টিতে সবই যে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদ-চ্যতে!" কাজেই আত্মপ্রচার নয়—চাই আত্ম প্রসার।

যাচাই

তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ তোমার ইচ্ছার মাঝে কোথায়ও গলদ আছে কিনা! তুমি যা চাও, তা যদি ঠিক প্রাণের চাওয়াই হয়, তাহলে না পাওয়ার আশঙ্কা তো তোমার মনে জাগতেই পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন—"যারা সততযুক্ত তাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি।"

পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, অথচ ক্ষুধা নিবারণের কোন চেষ্টাই নাই, এ কি হতে পারে? তাই যদি হয়, তাহলে বলব, তোমার ঠিক্ ঠিক্ ক্ষুধা লাগেনি—অর্থাৎ এখন তোমার না খেলেও চলে। ভগবানকে চাওয়ার বেলাতেও এই দৃষ্টান্তটা খাটে, অর্থাৎ ভগবানকে আমরা চাই বটে, কিন্তু তাকে না পেলেও আমাদের চলে। দিব্যি সংসার করছি—ছেলেপেলে পোষণ করছি—কৈ কোন দিক দিয়ে তো ঠেকছে না। তবে যে মাঝে মাঝে ভগবানের নাম নেই—সেটা হচ্ছে বিলাস। খাঁটী কথা বলতে গেলে—ভগবান লাভ বিষয়ে এরূপ অগ্নিমান্দ্য ভাব প্রায় প্রত্যেকের মাঝেই পরিপূর্ণ নয় কি? অথচ আমরাই আবার ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপাই যে কৈ ভগবানকে তো ডেকেও পেলেম না। ভগবান কি এতই সহজলভ্য বিলাসের সামগ্রী? তাহলে সাধক অনাহারে অনিদ্রায় ভগবদাকুলতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যেত না। ভগবানকে না হলে যাদের একতিল সময়ও কাটানো দায় হয়ে উঠে—

তারাই যে সাধক-ভক্ত। প্রাণ না থাকলে যেমন আমরা বাঁচতে পারি না, তেমনি ভক্তের নিকট ইষ্টও তার প্রাণ। এই প্রাণকে যারা নিত্যসঙ্গী করতে পারেনি—তাদের ভিতর একটা অনির্ব্বাণ আকুলতা থাকবে না? প্রাণকে যে উপলব্ধি করতে না পেরেছে, তার আবার শান্তি?—ছট্‌ফটানিতে যে তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যাওয়ার কথা! কাজেই জীবনের প্রথম থেকেই এ প্রশ্নটা তলিয়ে বুঝতে হবে যে —"আমি কি চাই।" অবশ্য চাওয়ার হয়ত অন্ত না-ও থাকতে পারে, আজ যে অবস্থায় আছি, তাতে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই এর চেয়েও একটা উঁচু অবস্থার দরুণ আমার প্রাণ আকুল, কিন্তু কে জানে সে অবস্থা পেলেও আবার আমার অতৃপ্তি জেগে না উঠবে। কাজেই জীবনের মাঝে একটা শেষ সীমারেখা টেনে অন্ধের মত তৃপ্ত হয়ে বসে থাকাতে কি লাভ? আমি তো দেখছি জীবন বৈচিত্র্যময় এবং কোথাও তার শেষ নাই। তাই সিদ্ধি কথাটা শুনলেই আমার বড় ভয় হয়—কেননা সিদ্ধ হলেই তো আর জানবার শুনবার কিছুই থাকবে না। জ্ঞানের কিম্বা অজ্ঞানের একটা প্রলেপ আমার উজ্জ্বল দৃষ্টিকে শক্তিকে প্রাণের অফুরন্ত আকুলতাকে নিরোধ করে রাখবে। আমার বাঁচবার ইচ্ছা আছে, অথচ বাঁচবার কোন উপায় নাই—এ হলে যেমন প্রাণে অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হয়, তেমনি অনন্ত জগতে অনন্ত জানবার বুঝবার রয়েছে—অথচ তৌষ্টিকতার কুহেলিকায় সব আবৃত করে রাখবে, এর চেয়ে নিদারুণ জ্বালা আর কি থাকতে পারে? আমি বলি চাওয়ারও অন্ত নাই—পাওয়ারও অন্ত নাই। নিত্য নূতন ভাব। এ জগতের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি গিয়ে একটা অন্ধকারময় নির্ব্বিশেষ বৃহৎ গুহায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকবে ভাবছ। তা নয়—তখন তোমার ভাবজগৎ খুলে যাবে। সাধারণ লোকের যে কেবল মাত্র বহির্জীবনটাই পরিস্ফুট—অন্তর্জীবনে যে এর চেয়েও কত সুমহৎ আস্বাদনের বস্তু রয়েছে।

চাইব বটে, কিন্তু চাওয়ার মাঝেও একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। যখন যা চাইব তাতেই সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে হবে। তখন আর অন্য কোন কিছুর দরুণ চিত্তকে বিচলিত করলে চলবে না। একেই বলে প্রাণ দিয়ে চাওয়া। যা চাইব, তা এতেই আয়ত্ত হবে।

কোন রফা নয়, যুক্তি নয়—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি,
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ!

সত্য যদি পাই, তাহলে এখানেই পাব, আর এখানে না পেলে কোথায়ও পাব না। কাজেই ধর্ম্মভাবকে ইহকাল পরকাল দুই ভাগে ভাগ করা চলে না। যাঁর প্রাণে এই অদম্য আকুলতা এসেছে —জ্ঞানী হয়েও তিনি বুকে ছুরি বসান, তার্কিক হয়েও ভগবৎ আকুলতায় মাতোয়ারা হয়ে যান। তখন বিচার যুক্তি সব ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রয়ে সয়ে, আস্তে আস্তে ভগবানকে পেতে হবে—এ কথায় খাঁটী সাধকের প্রাণ মানতে চাইবে কেন? ছেলে যখন মায়ের কোলে যাবে বলেই স্থির করে তখন তাকে কোন যুক্তি দিয়ে—খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারা যায়? রফা করছে কে?— তুমি আমি। কিন্তু যার প্রাণে আকুলতা এসেছে সে যে আপন ভাবে মসগুল!

ইচ্ছার জোর বলেও তো একটা কথা আছে। তুমি যা চাও তা ঘটাতে পার নাকি? তবে কিনা ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও সহযোগ থাকা চাই। শুধু ইচ্ছাতে কিছু হয় না, তার মাঝে একটা will-force থাকা চাই। আমি যা চাচ্ছি তা আছে এবং পাব, এই দৃঢ় বিশ্বাসের নামই তো শ্রদ্ধা। কাজেই কোন ইচ্ছাই বার্থ হবার নয়—শুধু তার মাঝে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর!

তীব্র ইচ্ছা সফল হবেই হবে—স্বয়ং প্রকৃতিই তখন তোমার সাহায্য করবে। জগতে কারও তীব্র বাসনা অপূর্ণ থাকে না। যে যা আত্যন্তিক ভাবে চায়—প্রকৃতি তাকে তাই পরিবেশন করে তুষ্ট করে। বিতরণে প্রকৃতির এতটুকু কার্পণ্যও নাই—কাজেই "চেয়েও পাচ্ছি না"—একথা বলা ভুল। তুমি কি চাও ঠিক ঠিক তা প্রকাশ করতে পারছ না বলেই বঞ্চিত, অর্থাৎ চাওয়ার বস্তু তোমার চোখে এখনো ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা—আরও সহজ করে বলতে গেলে—তোমার এখনো ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা আসেনি। ব্যাকুলতাই ঊষা, এরপর অরুণোদয় অবশ্যম্ভাবী। আত্মস্থ হয়ে ভাব, তোমার অন্তর কি চায়?

যে পথ ধরে চলেছ তাতে যদি আনন্দ না পাও, ভরসা না পাও, ভিতরে বল সঞ্চার না হয়, তাহলে সে পথ যে মরণের পথ—ধ্বংসের পথ। মরণ জেনে-শুনেও আর কোন উপায় নেই বলে একদল দুর্ব্বল প্রাণী আছে তারা তিল্ তিল্ করে মরতেই থাকে; কিন্তু তোমার তো সে আশঙ্কা নাই—তোমার সম্মুখে যে alternative রয়েছে। আর কিছু না, আমি বলি ভান করো না। আর ধর্ম্ম লাভের তো বিচিত্র পথই রয়েছে—কাজেই অন্যের আদর্শের সঙ্গে তোমার মিলন না ঘট্‌লেই যে অনুশোচনা করে বসে থাকতে হবে, তা তো নয়। বরঞ্চ আত্মস্থ হয়ে তোমার স্বভাব জানতে পারলে এবং সেই পথ ধরে চললে উন্নতি ধ্রুব। তোমার চিত্তসত্ত্বই তোমার আদর্শ, অপরের সঙ্গে হয়ত কোন কোন বিষয়ে না-ও মিলতে পারে। তাতে আশঙ্কা করবার কি রয়েছে?

সাধনায় মানুষকে সবল করে তুলবে। যেমন বৈদিক সাধনা—তন্ত্রের সাধনা। তাদের মাঝেও প্রার্থনা ছিল; কিন্তু সে প্রার্থনায় দুর্ব্বলতার লেশও নাই। প্রচণ্ড একটা ইচ্ছার প্রতাপ ছিল তাদের মাঝে। তাদের ইচ্ছা বা প্রার্থনা ব্যর্থ হবে, এ তারা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু আমরা ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করে যখন একটু সাড়াও পাই না, তখন মনকে এই বলে আশ্বাস দিই বা ভণ্ডামী করি যে "এখনও ভগবানকে পাওয়ার সময় হয়নি—কিম্বা ডাক ঠিক হয়নি।" দুর্ব্বল মন এতেই প্রবোধ মানে বটে, কিন্তু সবল মন এরই প্রতিকারের চেষ্টা আবার অন্য উপায়ে করে থাকে। "ডাকতে জানলে দিত দেখা"—এ বলে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। তার অন্তরে নব আবাহন উদ্দীপিত হয়ে উঠে। শেষ পর্য্যন্ত তার সিদ্ধি লাভ না হয়ে পারে না।

কাজেই সিদ্ধি অসিদ্ধির বিচার করতে হবে মৃদু-মধ্য-তীব্র ইচ্ছার তারতম্য দিয়ে। সিদ্ধি লাভ আকস্মিক হতে পারে না কখনো—আস্তে আস্তে চিত্তকে তীব্র সংবেগসম্পন্ন করতে হয়। তুমি যতখানি জোর দিবে—তোমার ইচ্ছা যত তীক্ষ্ণ এবং সংবেগ সম্পন্ন হবে, লক্ষ্যও আয়ত্ত হবে তোমার সেই অনুপাতে। ধাপের পর ধাপ চিত্তকে সংযত করে ঊর্দ্ধাভিমুখী করতে হয়।

জীবনটা পণ্ড হয়ে যাক, এ কারও ইচ্ছা নয়। কিন্তু সচরাচর দেখি, অনেকের জীবনই পণ্ড হয়ে যাবার পথে চল্‌ছে। এর কারণ কি? কারণ, কেউ নিজকে তলিয়ে বুঝে না, তৃণের মত বন্যার স্রোতে ভেসে ভেসেই চলছে সবাই। অন্তরে কত ইচ্ছারই উদ্ভব হচ্ছে, কিন্তু কোন ইচ্ছাটা প্রাণের ইচ্ছা তাকেই যাচাই করে দেখে না। প্রত্যেক মানুষই অসাধারণত্ব নিয়ে জন্মিয়েছে কিন্তু সেই অসাধারণত্বের ধ্রুবা স্মৃতি নিয়ে নিজকে যাচাই করে চলে কয় জনা?

আত্মাধীন মন

—(*)—

মনটা ছেলেমানুষ। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাল পথে নিয়ে আস্‌তে থাক—ক্রমশঃ ভাল পথে চলাই তার অভ্যাস হয়ে যাবে। তার হাতে খেল্‌না দাও, খেলা নিয়েই মেতে থাক্‌বে; আবার খেলাচ্ছলে কাজ এগিয়ে দাও তো তাতেও সে কসুর কর্‌বে না। একটা কিছুতে তার লেগে থাকা চাই—তাকে কাজ না দিলেই সে অকাজ করে বেড়াবে। কোন কিছুতে লেগে থাকাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক—আশ্রয় ছাড়া সে দাঁড়াতে পারে না।

মন এটা চায়, ওটা চায়—দোষের কথা নয়, সে তো চাইবেই। কিন্তু সে অন্ধ চাওয়া—কি চায় জানে না, সে ছেলেমানুষ, সে শুধু চাইতেই জানে। চাওয়া মিটাবেন যিনি, হুঁসিয়ার হতে হবে তাঁকেই। প্রত্যেকের মনের দায়িত্ব তার বিবেকের উপর। যেমনটী অভ্যাস করাবে, তেমনটী তার বুদ্ধি হবে। যে ভাল অভ্যাস করে, তার ভাল দিকে টান হবে; যে মন্দ অভ্যাস করবে, মন্দ তাকে পেয়ে বস্‌বে।

ছড়িয়ে পড়া শক্তির ধর্ম্ম; কিন্তু শক্তিকে যে গুটিয়ে এনে বিশেষ কোন লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত কর্‌তে পারে, সেই লাভবান্ হয়। আমরা শক্তি হাতে পেয়েও কাজে খাটাতে পার্‌ছি না—মনের একাগ্রতার অভাবে।

উন্নত ইচ্ছা কতই না প্রাণে জাগে—সাময়িক তার দরুণ লাগি; কিন্তু নিষ্ঠা নাই, লেগে থাক্‌বার ধৈর্য্য নাই, দুদিন পরেই সব বান্‌চাল হয়ে যায়, উৎসাহ কমে যায়। জাগ্রত চেতনার নিয়ন্ত্রণ অভাবেই মন একাগ্রতা হারায়।

মনের কতগুলি স্বভাব আছে, যেগুলোকে কায়দামত খাটাতে পার্‌লে আরো নূতন শক্তির উদ্ভব হয়। ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা আছে, অবসর আছে—নাই শুধু পরিচালক; এরি দরুণ কত মন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে।

সুশৃঙ্খল করবার দায়িত্ব কার? যার অভাববোধ জেগেছে, বিশৃঙ্খলা দেখে যার মনে কষ্ট হচ্ছে। মনকে নিজের বশে আনলেই জীবন সুশৃঙ্খল হয়। যে শক্তিতে মনকে নিজের আয়ত্তে রেখে চালানো যায়, তাকেই বলে আত্মশক্তি। আত্মশক্তি বলতে একটা কিম্ভূতকিমাকার কিছু নয়—খুব সরল অর্থ কর—আত্মশক্তি মানে হচ্ছে নিজের ক্ষমতা। তোমার কতটুকু শক্তি, তার তুমি যাচাই করবে না?

আত্মশক্তিকে মনের খেয়ালের চেয়েও প্রবল করে তোল। নিজের মনের ওপর নিজের একটা অধিকার থাক্‌বে। তার যা খুসী সে কর্‌তে পাবে না, আমার যা খুসী তাকে করাবো। এ বিরোধ আপাতবিরোধ। শেষকালে এমন হয়, যখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তার হাতে ঘরকন্নার ভার তুলে দিতে পারি। মনের উপর সে বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত চাই কেবল কড়া পাহারা—আর কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট সুঅভ্যাসে তাকে অভ্যস্ত করা। যেহেতু সে ছেলেমানুষ, তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে নিতে হবে।

মাঝে মাঝে মানুষের বাসনা ওঠে—এটা ভাল লাগে না, এই চাই, ওই চাই! কেবল ছট্‌ফটি। এতে মনকে ভারী বান্‌চাল করে। এটা ভাল লাগে না, ওটা ভাল লাগে না,—এর

মত দুর্ব্বল যুক্তি আর দুনিয়ায় নাই ! ভাল লাগুক্ না লাগুক্, যা কর্ত্তব্য তা করতেই হবে। ভাল লাগাটা একটা মোহমাত্র ; যা ভাল লাগে, তাই যদি ভাল হত, তাহলে এ জগতে কারো অধঃপতন হত না এবং কাউকে জোর করে ভাল হতেও হত না।

কর্ত্তব্য যদি কিছু থাকে তো ঐ নিজের মনের উপর জোর খাটানো। ঐটীতে যে যত ওস্তাদ, সে তত উন্নত, সে তত কাজের লোক। নিষ্কর্ম্মা হয়ে সোয়াস্তি নাই—কেননা কর্ম্ম করতেই জগতে এসেছ। তা অকর্ম্ম বা উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্ম করে আটকের মেয়াদ বাড়িয়ে লাভ কি—তাল-মান ঠিক করা একখানা সঙ্গীতের মত সুর বেঁধে ফেল জীবনটাকে। পেয়ে সবার আনন্দ ! এমনি সুকর্ম্মের জীবনই সার্থক জীবন নয় কি ?

ভাল লাগার খাঁটী স্বরূপ যখন মানুষ চিনতে পারে, তখন থেকেই জীবনের উন্নতি সুরু হয়। সত্য তো, কেবল তাড়া দিয়ে আর ধমকি দিয়ে কতদিন মানুষকে চালানো যায় ? চালাতে চালাতে একটা ভাল লাগার ভাব জন্মিয়ে দিতে পারলেই নিয়ন্তার মুক্তি। প্রথম প্রথম যা ভাল লাগে, তার সবগুলোই আসলে ভাল থাকে না ; তার মাঝ থেকে খাঁটী ভাল বিবেকে বেছে নিতে হবে। নানা রকমের নানা সুখের কথা শাস্ত্রে আমারা পাই। আত্মসুখের বস্তু নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা ভারী বিপদ ; বোকার মত যা ভাল লাগে তাই ভাল বলে আত্মসাৎ করতে থাকলে কেবল আবর্জনা আর অস্বস্তিই বাড়বে।

সব চেয়ে নির্ব্বিবাদ বড় সুখ বলা হয়েছে তাকেই, গীতায় যার বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে—প্রথমে বিষের মত ঠেকলেও পরিণামে অমৃতোপম, এবং যা আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ। অর্থাৎ মন যাতে সুস্থির থাকে সুস্থ থাকে, তাই খাঁটী সুখ। বদভ্যাসে মন অসাড় হয়ে গেলে এই মানসিক স্বাস্থ্যের সূক্ষ্ম অনুভবটুকু থাকে না।

অনেক সৎকাজই প্রথমে বিষের মতই ঠেকে, অথচ মনে মনে বেশ জানি যে, কাজটা হিতকর। একটুখানি বাইরের আরাম পাবার লোভে আপাত-বিষবৎ সু-অভ্যাসের চরম অমৃত থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

এইখানে আত্মশক্তি খাটাতে হবে—ভাল না লাগলেও আসলে যাকে ভাল বলে জেনেছি, এক-গুঁয়ের মত তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে হবে।

সুখ আসতে বাধ্য। সুখই তো চাই, যা ভাল লাগে, তাই তো করতে হবে—কিন্তু যাতে ঠকতে না হয়, সুখের মাঝে দুঃখের ভেজাল না থাকে।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে মন আপনা থেকেই এগিয়ে যায় স্বীকার করি। যার মন আপনি উঠে যায়, সে ভাগ্যবান্। কিন্তু একথাও ঠিক, এই ভাগ্যও তাকে কোন না কোন জন্মে গড়ে রাখতে হয়েছিল। হঠাৎ পাওয়ার মাদকতা আমার ইহজন্মের চেষ্টাকে এলোমেলো করে দেবে কেন ? আমার যা দরকার, তা আমি গড়ে নেব—না হয় এ জন্ম গড়তেই গেল—পড়ে-পাওয়া সুখের ওপর লোভ কেন ? যার মূল্য দিই নি, তা গ্রহণ করব না, কারু কাছে ভিখারী হব না, নিজের পায়ে নিজে ভর করে দাঁড়াব—এমনি একটা জেদ্ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় চাই।

সর্ব্বদা নির্ব্বিরোধ নির্ম্মল অহঙ্কার অনুভব কর। যেমন করে হোক্, জীবনের ঘটনাপরম্পরা হতে মনটাকে উঁচিয়ে রাখ। পদে পদে আত্মনিয়ন্ত্রণের মর্য্যাদা অনুভব কর। চোক কাণ বুজে ভেসে চলা হীনতা। নিজকেই বিশ্বাস নাই, পরকে বিশ্বাস করবে কেমন করে ? নিজের কাছে নিজে খাঁটী

হলে, বিশ্বস্ত হলে—পরের সঙ্গে সম্বন্ধটা মুলতবী থাকুলই বা! আত্মা জেগে উঠলে আত্মধর্ম্ম আপনি পরকে আপন করে নেবে।

মনকে দিয়ে যা খুসী তা করতে পার। জগতের যত বড় বড় মহাজন তাই করে গেছেন। তুমিও ইচ্ছা করলে পার। শুধু ঘরের কোণে বসে ইচ্ছা করা নয়, কাজে নেমে পড়তে হবে, নেমে বিরুদ্ধ ঘটনার মাঝেও সে ইচ্ছাকে অব্যাহত রাখতে হবে—যা ভেবেছি, তা করবই বলে প্রাণপণ করতে হবে।

ইচ্ছা যখন প্রবল হয়, তা থেকেই কর্ম্ম গড়ে ওঠে। ইচ্ছার একাগ্রতা, চিত্তের ধৈর্য্য, সুখে অলোভ, ত্যাগস্বীকারে তৃপ্তি—এইগুলিই মানুষের সবলতার পরিচয়। এইগুলিই মনের সদভ্যাস। ছেলেমানুষ মনকে শিখিয়ে পড়িয়ে ক্রমে সেয়ানা করে নাও। তখন কত সুখ!

সাধা এবং বশীভূত মনই আত্মশক্তি। আত্মাধীন মনই স্বাধীনতার রাজসিংহাসন, অন্তরে সুখের স্বর্গ!

"তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

—*—

মানুষের এই দেখাই দেখা নয়, এই শোনাই শোনা নয়—এই দশেন্দ্রিয়ের ভোগই ভোগ নয়। তার প্রমাণ—হৃদয়ের অতৃপ্তি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ মানুষের ভোগের সর্ব্বপ্রকার উপকরণের এত প্রাচুর্য্য বহন করেও তাকে তৃপ্তি দিতে পারল না—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তার দাউ দাউ করে বেড়েই চলেছে। পাশ্চাত্য নব বিজ্ঞান এত করে সেই ভোগের মুখে ইন্ধন জুগিয়েও আর পেরে উঠছে না। অবিদ্যারাক্ষসীর বিশ্বগ্রাসী আকর্ষণে যা কাছে আসছে, মুহূর্ত্তের মাঝে তাই জীর্ণ হয়ে গিয়ে আবার 'দেহি দেহি' রব উঠছে।

কি করবে এই চোখ? সে তো চেয়েই আছে—জন্মকাল হতে আজ পর্য্যন্ত শত শত দৃশ্য তার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়ে কত বার তাকে মুগ্ধ করেছে—কত বার সে আপনাকে নূতন রূপে উপভোগ করে বলেছে—"ধন্যোঽহম্ কৃতকৃত্যশ্চ।—ধন্য আমি—যা করবার তা হয়ে গেছে। আর কি চাই—এর চেয়ে আর কি সুখ আছে! আহা এ দিন যেন আমার চিরদিন থাকে! ভগবান্, মনে প্রাণে আমি বুঝেছি, তুমিই আমায় যা দেবার দিচ্ছ—এ জগৎ বড় সুন্দর—বড় মধুর" ইত্যাদি। কিন্তু ক'দিন এই সুখ-ভোগ? কতক্ষণ এই সোণালী মায়ায় জগৎ আবৃত থাকে? এই মোহন সৌন্দর্য্যের মাঝে একটা "তবে যদি" এসে যত রস মাটী করে বলে ওঠে—"হাঁ। সবই সুন্দর, তবে যদি আরো এইটুকু হয়, তবেই সব হয়, ষোলকলা পূর্ণ হয়।" অর্থাৎ প্রাপ্ত ভাগ্যে পূর্ণ নই—আরও কিছু চাই, তবেই বোধ হয় তৃপ্তি আসবে।

কিন্তু বৃথাই তৃপ্তির আশা। কামনার অগ্নিকণিকা ক্রমশঃ বিশ্বধ্বংসী প্রবল আকারে সমস্ত

ইন্দ্রিয় উদ্দাম করে—দেহকেও জীর্ণ না করে ছাড়ে না—সে বলে, "হল না হল না, যা চেয়েছিলাম তা পেলাম না। দেহ, দেহ, আরও দেহ, একবার দেহ—।" এমনি দেহ দেহ রব হতেই এই দেহের উৎপত্তি। এই রোগ শোক জরা জীর্ণ দেহ দিয়ে আর ভোগ করা চলে না—তাও বলছে—"দেহ—অর্থাৎ আরও দেহ।" ক্রমশঃ এ দেহ পাত হল, কিন্তু কামনার পতন অর্থাৎ উচ্ছেদ নাই। সে সেই বিদেহ অবস্থাতেও মানুষকে পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ভোগের পথে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু দেহ নাই, ভোগ করবে কে? তাই আবার বলে "দেহ দেহ। ওগো আর একটীবার দেহ দাও—একটীবার ভোগ করে নিই। তবে এবার গিয়ে আর ভুলব না। শুধু এইটুকু মাত্র ভোগ করেই চলে আসব!" কিন্তু অমনি যে আরও কতবারের "দেহ দেহ" রব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা তো সে তখন স্মরণ করে না। তার সুস্পষ্ট স্মরণ না হলেও সংস্কার তাকে ভুলিয়ে আবার যোগ্য গৃহপরিজন মধ্যে জন্মিয়ে দেয়। যাতে কামনার খাদ পূরণ হয়, সে জন্যে এম্নি যাতায়াত চলে কতশত বার। এই চক্ষু-কর্ণাদি রূপ ভোগের করণ তো কতবার পেয়েছে—ইন্দ্রিয়ের পিপাসা তবু তো পূরণ হয় না!

এমনি করে মানুষ যখন আর পারে না—আপনা থেকে তখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাকেই বলে বৈরাগ্য। হয়রাণ হয়ে বিপরীত দিকে সিদ্ধি খুঁজবার যে একান্ত অনুরাগ, বাইরের সুখ ছেড়ে অন্তর্মুখী হবার যে আকুলতা, তাই বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য ভীতির বস্তু নয়। বি-রাগ অর্থাৎ বিপরীত দিকে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ, তাই বিরাগ বা বৈরাগ্য। যে হৃদয় দিয়ে এই সংসারের বিষয় ভোগ, প্রিয় পরিজনকে ভালবাসা, সে হৃদয় তখনো থাকে। তার ধর্ম্ম যে প্রেমোপলব্ধি, তা তখনও থাকে। বরং পূর্ব্বে বিষয় ভোগের জন্য যে আকর্ষণ হৃদয়ে অনুভূত হত, তার চেয়ে আরও মহত্তম তৃপ্তির দিকে মন ধাবিত হয়। বিষয় ভোগের জন্য যে প্রবল টান ছিল, সেই টান অন্তর্মুখী হয়ে তার গতি আরও প্রবল হলে তবেই সে বৈরাগ্যসিদ্ধির কারণ হয়। বৈরাগ্য সুখ-দুঃখের উচ্ছেদ নয়, বরং সমস্ত প্রকার সুখ দুঃখই বৈরাগ্যের টানে তুচ্ছ হয়ে যায়। তৃপ্তির কিছু সত্যি আছে বলেই মানুষ ইন্দ্রিয় ভোগের চেয়ে সেই দিকে এমন করে ছুটে যায়। অনুরাগ যেমন মানুষের ধর্ম্ম, বিরাগও তেমনি মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; তাই ভোগেও মানুষের বিরক্তি এক সময়ে স্বভাবতঃই আসে।

উপনিষদ্ এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগৎকে **অবর** জগৎ এবং তাতে বিরক্ত হয়ে যে বিপরীত অর্থাৎ অন্তর্জগতের দিকে বৈরাগ্যপূর্ণ মন ধাবিত হয়, তাকে **পর** জগৎ বলেছেন। এই অবর জগতের ভোগ-কামনা এবং সেই পর জগতের ভোগের কামনা বা জানার কামনা উভয়ই তৃপ্ত হয় একমাত্র জ্ঞানে। জ্ঞান-নেত্রে এই উভয় লোকের অন্তর্যামীকে দেখলে কিরূপ অবস্থা হয়, তা উপনিষদে বলছেন—

> ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পর ও অবরকে দেখলে হৃদয়গ্রন্থির ছেদ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন, সমস্ত 'কেন'র জবাব হয়ে যায়, তখন আর কর্ম্ম থাকে না। শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের বীজ ভস্মীভূত হয়ে গিয়ে ক্রিয়মাণ বা সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ঠিক তৃপ্তিলাভ করে তখনই। যেই হৃদয়ের গ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে এই জগৎকে এত করে বার বার জড়িয়ে ধরছি, পরম প্রেমস্বরূপকে দেখে আর সে বন্ধন থাকে না—যে বেড়াজাল ছিন্ন করতে বিজ্ঞান নিত্য নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করেও লক্ষাংশের এক অংশ পূরণ করতে পারে না—সেই সর্ব্বোচ্ছেদক সংশয় আর

থাকে না। মূল কারণ জানায় সমস্ত সংশয়ই হৃদয়ে মীমাংসিত হতে পারে। শুভাশুভ সংস্কার আর "এটা ভাল, এটা চাই—ওটা মন্দ, ওটা চাই না" ইত্যাকার জ্ঞানে আর সুখের কামনায় জ্বলেপুড়ে মরে না; নূতন কর্ম্মও সৃষ্টি করে না। গীতা বলেন—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

—যা লাভ করে আর কিছু লাভ করার থাকে না, আর কিছু পাওয়ার যোগ্য বস্তু জগতে আছে বলে মনে হয় না—শত দারুণ দুঃখেও যে অমৃতকে বুকে পেয়ে প্রাণ বিচলিত হয় না।"—এমনই সেই পরম বস্তু। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার দর্শন হয় না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যনেত্র দিয়ে বলেছিলেন—

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি—আমার সেই ঈশ্বরীয় রূপ দেখ। জ্ঞানই এই দিব্য চক্ষুঃ এবং সকলেই একদিন এই দিব্যচক্ষু লাভের অধিকারী হবে। যাঁরাই এই পথের পথিক হবেন, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে"।

—যে আমার পথের পথিক হয়, তাকে আমি এমন বুদ্ধি দিই, যাতে সে আমায় পেতে পারে। সেই বুদ্ধিই দিব্যচক্ষু—যাতে পরাবর তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। আপন মনে পথে চলে চলে পথভোলা মন আকুল হয়ে পড়ে, তখন অন্তর্দ্দেবতা তাঁকে পথ দেখিয়ে বলে দেন—"ভয় নাই, আমি আছি, এই পথে আয়!"

এই যে তাঁর আহ্বান, এ সকলকেই একদিন ঘর-ছাড়া করে পথে বার করবে। সেই টানে পড়লে ঘরের টান থাকবে না, বিষয়ের রঙীন নেশা ফিকে হয়ে যাবে। কিন্তু সে বহু পরে। কবে যে ঘুরতে ঘুরতে প্রবৃত্তির পিচ্ছিল পথে আঘাত পেয়ে সেই পূর্ব্ব বন্ধুর কথা মনে পড়বে, তার কিছুই স্থিরতা নাই। তাই, সাধু-শাস্ত্র পথের ধারে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন—আয় তোরা, কে যাবি অমৃতের সন্ধানে। সেই সুরপুরের রাস্তা নিবৃত্তিপথেই সহজ। 'প্রবৃত্তিরষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—প্রবৃত্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হলেও নিবৃত্তিই পরম ফলপ্রদ। —শুধু চাই গতির মুখ ফেরানো।

প্রতিষ্ঠা



কল্যাণ কোথায়?—কল্যাণ আত্মপ্রতিষ্ঠায়। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মসংস্কার বিনা হতে পারে না। নিজের ভাল-মন্দ সুখ দুঃখমূলক বুদ্ধিবিভ্রমগুলোর বিবেক করতে শিখেছ? তাই আত্মসংস্কার। ঐটাই সর্ব্বাগ্রে দরকার। অন্তরে প্রলয় তাণ্ডব জাগিয়ে দাও—দিয়ে এক আসনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে বসে সব দেখ! ভয় পাই, সংস্কারে সঙ্কুচিত করে রাখে—তাইতে জীবন সত্যের উপলব্ধি হারিয়ে বসে আছে; নিজের জীবনকে সে নিজে ভয় করে—তাই সে স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে লীলায়িত হতে পারছে না।

নির্ভর শাশ্বত প্রতিষ্ঠার স্থল যদি খুঁজে না পেয়ে থাক, তবে থেমে যেয়ো না—লড়াইর মাত্রা আরো বাড়িয়ে দাও—বিশ্বের অজ্ঞাতে নিজের মাঝে নিজে প্রচণ্ড হয়ে জেগে ওঠ। জেগে ওঠাই জাগানো—শক্তি অনুভবই শক্তিযজ্ঞ। প্রচণ্ড একটা পারমার্থিক ক্ষুধা যদি তোমার সমস্ত ঐহিক ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষুধাকে অবশ করে ফেলতে না পারে, তবে কেন বৃথা এই ক্ষ্যাপামীর পথের পথিক হয়েছ? জান তো এ পথে কোন লাভের লোভ নাই, ঐশ্বর্য্যের আশা নাই, মায়ার বাঁধন নাই—একদিক দিয়ে নিষ্ঠুর নির্ম্মম, নিরবকাশ; আবার অপরদিকে প্রশান্ত, উদার, চিরমুক্ত। বন্ধমোক্ষের ভয়ভাবনা হতে মুক্ত, অথচ সকল বাঁধন সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে বসে আছে। এই ক্ষ্যাপামি একটা অদ্ভুত সমন্বয়—এর একটা অফুরন্ত মূল্য আছে—বুকের তাজা রক্ত দিয়ে যাকে কিনে রাখতে সাধ হয়—যাকে নইলে প্রাণ তিলেক আনন্দে বাঁচে না। আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা ওই উদার তাণ্ডবে, ওই অদ্ভুতাবগম্য নৃত্যচ্ছন্দে!

প্রথম কথাই হচ্ছে, নিজের প্রতি নির্ম্মম হতে পেরেছি কি না! কোন সুখের আশা মনের কোণে বাসা বেঁধে আছে কি না! থাকবে বটে সুখের আশা—কিন্তু সে কাউকে বঞ্চিত করে নয়—প্রাণে তার দরুণ কোন মারাত্মক ব্যাকুলতা থাকবে না। শুধু সমস্তখানি হৃদয় উন্মুক্ত করে প্রাণ ভরে জেগে থাকবে, মুহুর্মুহুঃ জ্বলে-পুড়ে মরবে—আনন্দের গৌরবে! পেয়েছ এমন জিনিষ অন্তরে—যা তোমাকে নিভে যেতে দেয় না, সুখাবেশে এলিয়ে পড়তে দেয় না, অতন্দ্রিত আত্মপ্রতিষ্ঠায় সদা উদগ্র হয়ে থাকে? তা যদি না থাকে, সব বৃথা, সব বৃথা—ঠিক জেনো, এ জগতে কারু কাছে তোমার কিছু পাবার নাই একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া! তোমাকে তুমি যত নিষ্পেষণ করবে, খাঁটী করবে, অপরের মাঝে থেকেও ততই খাঁটী জিনিষ চুম্বকের টানে লোহার মত স্বভাবতঃ তোমার পানে ছুটে আসবে। আত্মার জাগরণে বিশ্বের জাগরণ! এই তো সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, অপূর্ব্ব মায়া! এই অনির্ব্বচনীয় আবেশে যদি সর্ব্বদা জেগে থাকতে পার, কিসের ভয়, কিসের বন্ধন? বিশ্বজগৎ তোমার হাতের পুতুল—আত্মজীবনের নায়ক যে, বিশ্বের চালক সে! নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রাণের শিখা জ্বলছে তখন—বাঃ, কি চমৎকার আয়োজন! কোন ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর নাই—শুধু আমি, আমি—ওঁ!

কি চাও, এবং শক্তি কতখানি, বেশ করে তলিয়ে বুঝতে হবে। যদি শক্তিতে কুলায়, কেন চাইবে না? নিজের জীবনপণে যাকে কিনে নেবে, সেখানে কিসের তোয়াক্কা! সুখ তোমার, দুঃখও তোমার—নিজের খুসীতে নিজের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, কারো কাছে কোন অনুযোগ-অভিযোগ নেই তো! যদি থাকে, তবে চাইবার সাহস কোরো না—অক্ষমের কামনা লোভ বলে অবজ্ঞাত হবে। 'যদি কৃপা হয় তো পাব' এতো তোমার এখনকার কর্ত্তব্য কথা নয়—ও তো অক্ষমের মনভুলানো যুক্তি মাত্র। কৃপার স্বরূপ যে পায়, সে কি আর মুখ ফুটে নিজের সাফাই নিজে গাইতে বসে? জীবনটাকে ভাব, একটা বিরাট অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যভার—অনেকখানি অনায়ত্ত শক্তিপ্রয়াসী আত্মসাধন। যাকে তুমি পেয়েও পাচ্ছ না, ঘুম-ঘোর টুটছে না বলে;—একবার তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও, শক্তিতে আয়ত্ত কর, প্রেমে বশ কর। যা আছে, তা থাকার মত থাক্—একটা বজ্রদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের করায়ত্ত হয়ে থাক্।

দিনের মাঝে দশবার হয়ত অবসাদ আসছে, মুষড়ে পড়ছ—ভাবছ, বুঝি কিছুই হল না। কিন্তু তা বলে সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে নিরালম্ব হয়েই বা যেতে পারলে কই? তা যদি পারতে, তবু তো একদিক হোতো। বৃথা দোটানায় পড়ে অপব্যবহার কেন?

যার যা ধর্ম্ম, যার যা বিশ্বাস ;—ঠিক তাই ধরে তাকে চলতে হবে। তোমার যদি ধর্ম্ম হয় লড়াই, তুমি বেদপাঠীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলে চলবে না। কারো সঙ্গে কারো তুলনা নাই ; যে যেমন অধিকারী, তার তেমন ক্ষেত্র জোটে। যদি যুদ্ধের আহ্বান প্রাণের মাঝে শুনতে পেয়ে থাক, আর কিছুকে গ্রাহ্য কোরো না—সমস্ত তুচ্ছ করে আত্মাহুতি দাও—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ !' মোট কথা, যেমন করেই হোক প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে সর্ব্বদা—অবসাদে এলিয়ে পড়লে চলবে না। যার যাতে প্রাণ জাগে, সে তাই কর। জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখ, কিসে তুমি স্থিতি লাভ করেছ, কি তোমার ধর্ম্ম।

'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—অথচ স্বধর্ম্মে এবং পরধর্ম্মে জগাখিচুড়ী নয়। যে ভাবে চললে তুমি জয়ী হও, তেমনি ভাবেই চল। অন্ধ পরমুখাপেক্ষিতাই যার স্বধর্ম্ম, সে তেমনি চলুক। শুধু তলিয়ে বোঝা চাই—যে পথ ধরেছি, 'উত এষ বরেণ্যো ন বেতি।' অজ্ঞান হয়ে কেউ স্বধর্ম্ম পালন করতে পারে না—বিশেষতঃ মানুষ পারে না ; অজ্ঞানাচরিত স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম। আর পশুর সংস্কার যার ভিতর, তার তো লড়াই ছাড়া সাধনাই থাকতে পারে না।

কিছু পাবার জন্য লড়াই নয়—নিজেকে তলিয়ে বুঝবার জন্য লড়াই। যেদিন বুঝবে, এই আমার ধর্ম্ম, এই আমার পথ,—সেদিন বুঝবে, এইবার লড়াই স্বভাবজাত হয়ে গেল, এখন আর বেগ পেতে হবে না, অথচ বেগ হারাবও না!

এই অনায়াস জীবনচালন নৈপুণ্যই আত্মপ্রতিষ্ঠা। অবস্থার চরম হচ্ছে এই। চেষ্টার সীমা এই পর্য্যন্তই। ব্যাকুলতার রূপান্তর হল সহজস্থিতিপ্রবাহে—তখন যে যার ধর্ম্ম পেল।

কোন ধরাবাঁধা ছক্ জীবন্ত মনের চরম আশ্রয় হতে পারে না। ভাবের আদর্শ অনেক জানি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সব সময় মিলে না—জ্ঞানে বড় হয়েও প্রাণে বড় হওয়া যায় না—একটা ভ্রান্ত অসামঞ্জস্য পদে পদে আমাদের সচেতন করে দিতে থাকে। আসলে অসামঞ্জস্য মাত্রেই চিত্তের তরঙ্গমাত্র। কিন্তু ঐ তরঙ্গই জীবন। অবস্থার চরম অবস্থা আত্মপ্রতিষ্ঠা—তরঙ্গকে যে সয়ে থাকতে পরে। চিত্ততরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলা অথচ তলিয়ে বোঝা—দুটোই দরকার। এমন সুকৌশলে দুদিক রেখে চলতে হবে, যেন কোন দিক ক্ষুণ্ণ না হয়, কোন পক্ষের ক্ষোভ না থাকে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—নিজকে নিজের বাধ্য করতে হবে। খুঁজে দেখো—মনের মাঝে দুটো বৃত্তিতে সর্ব্বদা লড়াই হচ্ছে। জয়-পরাজয় উভয়েরই হচ্ছে। কোনদিকে জোর দিতে হবে, সে বিষয়ে তোমার ঔচিত্যবোধ নাই, সুতরাং তোমার মনোবৃত্তি তোমার আয়ত্তে রইল না। মনের মাঝে যা খুসী হচ্ছে, অথচ তোমার অখণ্ড স্বাধীনতার স্পৃহা অহরহঃ তোমায় দগ্ধ করছে। কি চাও তুমি? চাও মিলন, চাও সামঞ্জস্য—কিন্তু আবার তোমারি স্বভাবের মাঝে এমন একটা দিক আছে, যে তোমাকে অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে অসামঞ্জস্য ও বিদ্রোহের মাঝে নিয়ে ফেলছে। এই অসামঞ্জস্যের প্রতীকার করতে হলে নিজের সুপ্ত শুভ ইচ্ছাকে সজাগ করে তুলতে হবে। কক্ষনো অবশ হয়ে কারো অনুসরণ করবে না—সর্ব্বদা কড়া পাহারা চাই। যা ভেবেছি, যা চেয়েছি, তার অন্যথা কোনমতেই হতে দেব না—সর্ব্বদা জেগে থেকে নজর রাখব, কে আমার শুভ ইচ্ছার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আসে! প্রথম একটু বেগ পেতে হয়—অভ্যাসমাত্রেই আপাতকঠিন ; আন্তরিক শুভেচ্ছার সবলতা সে কঠিনকে ক্রমশঃ এমন সহজ করে আনে, তখন একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব হয়। সেই সুখই আধ্যাত্মিক সুখ—আত্মপ্রতিষ্ঠার সুখ ; দুঃখভরা চেষ্টার নিরন্তর

অভ্যাসে যাকে আয়ত্ত করা গিয়েছে। এমনি করে প্রতি ব্যাপারে সুখলিপ্সু স্বভাবের বিরুদ্ধে দুঃখকে স্বীকার করে নেবার জন্য মনের একটুখানি গোঁ থাকা চাই; দুঃখস্বীকারের প্রতি প্রেম না থাকলে নিজকে নিজের বাধ্য করা যায় না। অথচ নিজের বাধ্য নিজে না হলে জীবনে সামঞ্জস্য বা শান্তি আসে না।

যারা যা করব ভাবে তাই করবার জন্য প্রাণপাত করে যায়, তারা যদি দৈবচক্রান্তে হেরেও যায়, তবু তাদের গৌরব। এই বলে তাদের গৌরব যে, কখনো একমুখে দুকথা কইনি—এক পথ ধরেছি, এক লক্ষ্যে—আজ না পাই, একদিন তো পাবই।

শক্তির বিকীরণ স্বাভাবিক। দশটী লোকের মাঝে একটী লোক যদি কোন বিষয়ে একটা দৃঢ়তা বা শক্তির পরিচায়ক সংযমমূলক কোন ভাব নিয়ে চলে, তার ব্যক্তিগত চেষ্টার অসমাপ্ত গতিবেগ অপরাপর অন্তরাত্মায় স্বতঃপ্রবুদ্ধভাবে সঞ্চারিত হয়—তার ইচ্ছা পূর্ণ করবার দায়িত্ব ভগবান নেন, অর্থাৎ সমষ্টি মনের শুভবৃত্তি তার প্রতি উন্মুখ হয়। হাজার দুঃখ স্বীকার করেও নিজে বড় হতে পারাটা মানুষের স্বভাবজ অত্যজ্য গৌরব। সবাই চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা—তবে কিনা কারো দৃষ্টি ক্ষুদ্র, কারো বৃহৎ। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই সবাই উন্নত হয়ে চলছে। চরম পূর্ণতা হচ্ছে একটা বিরাট্ আত্মপ্রতিষ্ঠা—একটা অখণ্ড গৌরবময় অধিকার।

নিজের সংকল্পের কাছে বারবার হেরে যেতে হচ্ছে, তা জানি। একটা অব্যর্থ সংকল্পের অভিমান আজই সফল হবে, এ আশাও অত্যাশা। আশা বড় থাক্—তবু যা জুটছে তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে, কারো কাছে ভিখারী থাকলে চলবে না। তোমার সত্যসংকল্পের অধিকার ও তার দরুণ আপ্রাণ চেষ্টার অধিকার মাত্র। চেষ্টাটা আত্মগত, আর ফলটা বিশ্বগত বা বিশ্বাত্মগত। তোমার চেষ্টার ফল তুমি একা ভোগ করবে না—যে কোন প্রকারেই হোক, তা সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং তোমার শুধু অকৃত্রিম চেষ্টার অধিকার। শুধু আত্ম-সুখের দরুণ তো কিছু নাই। তবে আর জয়-পরাজয় তুচ্ছ হবে না কেন? জগতের কিছু করছি, মনে করা ভুল—আত্মনিয়োগই আসল কথা। অটল শুভসংকল্প নিয়ে কাজ করে যাও—ফলে কি হচ্ছে ভেবো না—দৃঢ় বিশ্বাস রেখো নিজের উপরে। আমি কাউকে ঠকাচ্ছি না—অপরে ঠকালই বা, তাতে কিছু যায় আসে না!

চরম কথা হচ্ছে—প্রতি মুহূর্ত্তে নিজকে বন্ধনমুক্ত অনুভব করা। আমি এই করব আর ওই করব বলে কারু কাছে খৎ লিখে দিইনি। সর্ব্বদা সচকিত আছি, সমনস্ক আছি—ঝোপ বুঝে কোপ দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কারো অধীন নই, এমন কি জীবন-টাকে সুখে রাখবার অভিলাষীও নই। ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছি, যে দিকে খুসী নিয়ে যাক্—দেখে নিই কার সীমা কত দূর! আমার চেষ্টার শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত নিবেদন করেও তারপর যদি আমার ইচ্ছাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আমার জীবন নিয়ে যা খুসী তা করতে কেউ চায়, সে করুক, সে অধিকারও তাকে দিচ্ছি। আমাকে নিয়ে যার যেমন খুসী তেমনি রাগ, যে যা চাও কেড়ে নাও লুটে নাও—কিন্তু আমি কারো অধীন নই, কেননা আমি মুক্ত—যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করেছি; সেহেতু আমার সংকল্প আছে, কিন্তু পূর্ণ ফলটী পাবার দরুণ কারু কাছে কাকুতি নাই।

অভিমানের উগ্রতা দোষের নয়—যদি বুক না কাঁপে! অভাববোধ জেগেছে, অভাব দূর করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে না? ভুল একশবার হোক—একটা কিছু চরম না দেখে তো ছাড়তে পারি না। চাই কোন একটা নিঃস্বার্থ অভিমান, সঙ্গে সঙ্গে অকপট চেষ্টা—একটা উজ্জ্বল আদর্শকে ধ্রুবতারা

বলে ধরে নিচ্ছি—হাতজোড় করে চাইব না কারো কাছে, নিজের চেষ্টায় ফুটিয়ে তুলব।

তোমার কল্যাণ তোমার হাতে এবং তোমারই আত্মপ্রতিষ্ঠায়। বললে স্পর্দ্ধা প্রকাশ হয়, নতুবা বলতে পারি—আমার কল্যাণ যদি ঠিক ঠিক আমার দ্বারা হতে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণও হতে বাধ্য—কেননা আত্মার অধীন জগৎ, জগতের অধীন আত্মা নয়। যে নিজে জেগেছে, অপরের ঘুম ভাঙ্গানোতে তারই অধিকার।

বিপ্লবাভিসারী চিত্তকে ব্যর্থ হবার ভয় দেখিও না—আশার উৎসাহে তার বুক ভরে দাও—উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর লোকে এগিয়ে চল। এই অন্ধতমিস্রাময় অতিজড় অবস্থার মাঝে খানিকটা বিপ্লববুদ্ধিই প্রয়োজন—ভ্রান্ত কুসংস্কারকে সুসংস্কারে গড়ে তোলাই যে বিপ্লবের লক্ষ্য। উগ্র-প্রশান্ত, রুদ্র-মধুর কোমল-কঠোর একটা তীব্রসত্য স্বপ্রতিষ্ঠ নিঃস্বার্থ হৃদয়বৃত্তি—এতেই সবার কল্যাণ নিহিত দেখতে পাচ্ছি। সে কল্যাণ আমার হাতে, তোমার হাতে—সবার হাতে! একবার নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়—দেখ, তোমাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না! যদি না থাকে, তবে ডুবে যাক্ যথা সর্ব্বস্ব অতল তলে—কোন ধর্ম্ম, কোন কর্ম্ম, কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। আত্মরক্ষার ক্ষমতা যে জাতির নাই, তার নাম মুছে যাক্ জগতের ইতিহাস হতে। হয় মুছে যাক্—নয় তো চিরন্তন গৌরবময় অক্ষয় অব্যয় হয়ে সবার ওপরে জেগে থাক্!—দোটানা আর কিছুতেই নয়!

কর্ম্ম-রহস্য

—(*)—

কাজ ছাড়তে নাই। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" এমন কি জনকাদি মহাত্মাগণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করেই জ্ঞান লাভ করেছেন। উপনিষদেও আছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেই শত বৎসর বেঁচে থাক। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন" কিন্তু তবু আমি "বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।" কোন কর্ত্তব্য নাই, অথচ তিনি কর্ম্ম করে গিয়েছেন। তাহলে নিশ্চয়ই কর্ম্ম করবার একটা নিগূঢ় অর্থ রয়েছে!

আর কিছু না হোক, অন্ততঃ লোককে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। এটা তো খুবই বড় কথা—শ্রীকৃষ্ণের মত আদর্শ পুরুষের যোগ্য উপদেশই বটে। কিন্তু আমি বলি, লোকসংগ্রহ ছাড়া তোমার নিজেরই যে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে কর্ম্মের। কর্ম্ম ছাড়া যে তুমি থাকতে পার না—তুমি কেন, কোন জীবই নয়। কাজেই কর্ম্ম কর—কর্ম্ম করে কর্ম্ম ক্ষয় কর!

তুমি না হয় ভাবের তরণী আশ্রয় করে 'গোলক'-ধামে চলে গেলে—কিন্তু তোমার এ দেহ মন বুদ্ধি

ইত্যাদির কি দশা হবে তাহলে? তাদের তো পুরা-পুরি ফাঁকি দিয়ে গেলে তুমি। তারপর তাদের মাঝেও একটা তৃপ্তি এনে দিতে না পারলে—তারাই যে তোমার পথের শত্রু হবে শেষে। তারা কাজ চায়—ভাব চায় না। কর্ম্মেই তাদের আনন্দ—কর্ম্মের ভিতর দিয়েই তাদের মুক্তি। বাস্তবকে এক-মাত্র অন্ধ ছাড়া জ্ঞানীও অবজ্ঞা করে না। আচ্ছা! ঠিক করে বল তো যতক্ষণ তুমি কাজে তন্ময় থাক ততক্ষণ ভাল থাক কিনা? কৃপাবাদের কথাই যদি তোল—তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কম কৃপা করেননি। কত দিব্য দর্শন, কত দিব্য অনুভূতি হল অর্জ্জুনের—কিন্তু তা বলে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ তো শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কোথাও দেননি। কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিতে হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "বধূ যখন পূর্ণ গর্ভবতী হয়, তখন শ্বাশুড়ী আপনি তার কাজ কমিয়ে দেয়।" তার দরুণ শ্বাশুড়ীর কাছে মিনতি করতে হয় না। কাজেই কর্ম্মে যখন নিবৃত্তি আসবে তোমার কর্ম্মই তখন তোমায় মুক্তি দিবে। জোর করে ছাড়তে যাও—দেখবে দুদিন পর কর্ম্মের বোঝাতে বুক ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হবে।

আসল কথা হল, সবারই পরিণতির একটা নির্দ্দিষ্ট কাল রয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি, বাড়ীর কর্ত্তা যিনি, যিনি বয়সে বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি কোন কাজ না করলেও হয়—ইচ্ছা করে যদি তিনি কিছু করেন তাহলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সংসারে একটা যুবক ছেলে যদি কুড়ে অকর্ম্মা হয়, তাহলে সকলের কাছে সে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ কি? না, তার কাজ করবার বয়স আছে, শক্তি-সামর্থ্য আছে।

আচ্ছা, না হয় কাজ না-ই করলে, কিন্তু দেহে মনে-প্রাণে নির্ব্বিকার থাক। কিন্তু কাজ ছেড়েও তো দেখছি কতজন কেবল বৃথা পরনিন্দা, পরকুৎসা নিয়েই ব্যস্ত। বরঞ্চ এমন অনেকের মুখে শুনেছি, তারা প্রাণ খুলে এসে বলেছে, "মশাই যতদিন কাজ-কর্ম্মে মন ছিল ততদিন তো ইন্দ্রিয়ের এত উত্তেজনা ছিল না, কিন্তু কাজ কর্ম্ম ছাড়াতে এখন তাদের বেশী অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে।" এ কথাটাকে বিশ্লেষণ করে বুঝলে, এই অর্থ বের হয়, কাজ ছাড়বার সময় তার তখনো হয়নি। অসময়ে সে কাজ ছেড়েছিল—তাই ইন্দ্রিয়েরা এখন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে এক একটা দৈত্য বিশেষ। তাদের কর্ম্মে নিযুক্ত না করলে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। তাই তাদের মাথায় একটা না একটা কাজের বোঝা চাপিয়ে রাখতেই হয়। ছোট বেলায় এক দৈত্যের কথা পড়েছিলাম, তাকে নাকি কাজ দিয়ে দিয়ে শেষে আর কোনমতে তার সঙ্গে পেরে না উঠায় কুকুরের লেজ সোজা করতে দেওয়া হয়েছিল। এ গল্পটার মাঝে বেশ একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। দৃষ্টান্তটা ইন্দ্রিয়ের বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা বলবান ইন্দ্রিয়ও দৈত্যের মত নাছোড়বান্দা—তারা বসে থাকতে পারে না—বসে থাকতে চায় না; অতএব সর্ব্বদা তাদের একটা কাজ দিয়ে রাখতে হয়। আর কিছু কাজ না পেলেও অন্ততঃ কুকুরের লেজ সোজা করবার মত একটা নিরর্থক কাজ দিয়েও তাদের ভুলিয়ে রাখতে হয়। কাজ বেশী কর, কম কর ক্ষতি নাই—কিন্তু কাজ করা চাই। তাহলে ইন্দ্রিয়ের মহলেও বিদ্রোহ জেগে উঠবার আশঙ্কা থাকে না। তা না হলে যে শেষে তারা দৈত্যের মত এসে তোমার ইষ্ট না করে অনিষ্টই করতে আরম্ভ করে দিবে। কাজেই সাব-ধান—সাবধান! সর্ব্বদা মনে রেখো, কাজ দিবে বলে কতকগুলি দৈত্যকে পোষণ করছ। বেশী ভাব করতে গিয়ে কর্ম্মে ঔদাসীন্য দেখালে, দৈত্যেরা সব ভাব টাব শেষে উলটিয়ে ভেঙ্গেচুরে হাস্তন্যাস্ত করে দিবে। হয় তো তোমার মহান্ প্রভাবে দৈত্যের ভিতরও কর্ম্মের রুচি বদলে যেতে পারে—আর তা

হয়ও। কেননা সাধু মহাপুরুষরাও ইন্দ্রিয়গুলোকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখেন; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রুচির রাত-দিন পার্থক্য হয়ে যায় তখন। কিন্তু কাজ করাই যাদের স্বভাব, তাদের কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত রাখতেই হবে!

তা বলে আমি অমন বলছি না যে, ভাবের মোটেই প্রয়োজনীয়তা নাই। ভাব দ্বারা অন্তরের পরিপুষ্টি এবং কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি হবে। কর্ম্মেই ইন্দ্রিয়ের আনন্দ। কাজেই মহানন্দপূর্ণতার দ্বারা ইন্দ্রিয় আপনি বৃত্তিরহিত হয়ে যাবে—মানে তার মাঝে তখন চঞ্চলতা থাকবে না। যার যা স্বভাব; তাকে তার ভিতর দিয়েই অতিক্রম করে উন্নতির পথে যেতে হবে। আর কিছু না হোক কর্ম্ম দ্বারা, কৃচ্ছতা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা নিজকে শক্ত-মক্ত করে না তুললে, যার নাকি দিনরাত্র অনুভূতি হয় বলছ—তার এত ভাবের ঠেলা সহ্য হবে কিসে?

সঙ্কল্পে অটল থাক—বাইরের কাজ ছাড়তে হবে কেন? পূর্ণতাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, আর এই দেহ মন-প্রাণ নিয়েই যদি পূর্ণ হতে চাও—তাহলে ভাবেরও প্রয়োজন, কর্ম্মেরও প্রয়োজন। মোটকথা, যা দিয়ে যাকে আপ্যায়িত করা যায়। আদর্শের কি অন্ত আছে? হও না, রবীন্দ্রনাথের ভাবুক, গান্ধীর মত কর্ম্মযোগী, আর অরবিন্দের মত ধ্যানগম্ভীরতায় স্তব্ধ। পূর্ণ হতে হলে কর্ম্ম জ্ঞান-ভক্তি এই তিনটী সম্বন্ধ চাই-ই। কাজেই কাজ কর—ভাব কর—ভাব ছড়াও। খবরদার, একটাকে নিয়ে মেতে পড়ো না!

ত্যাগধর্ম্ম



ত্যাগে আনন্দ আছে বুঝি! সে আনন্দে কেবল অন্তরকে আলোকিত করে তা নয়, অন্তর বাহির দুইই সে আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সে আনন্দ ক্ষণিক নয়, বা দুর্ব্বল চিত্তের উচ্ছ্বাস নয়। ত্যাগের মহিমায় দুর্ব্বল মন শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সোয়াস্তি এবং শান্তিতে জীবন পূর্ণ হয়ে উঠে।

কিন্তু এ স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমের চেয়েও সুন্দর পবিত্র শান্তিময় বস্তু কয়জনে উপলব্ধি করে জীবনকে নবরসে পরিপুষ্ট করতে শিখেছে—তা আমি বলতে পারি না। যার কামনা আছে, যে কামনার লেলিহান দহনে পুড়ে ছাই হয়েছে, সে ত্যাগের মহিমায় নিজের জীবনকে মহিমা-মণ্ডিত করে তুলতে পারে না। যে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্যে কিম্বা জড়ত্বে, অলসতায় ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তা হলে সে স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত-সৌরভের অধিকারী হতে পারল না। সে এখনো সেই স্বর্গীয় সুখ হতে বহু দূরে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করে অর্জ্জুনকে বীরধর্ম্মে প্রযোজিত করতে চেয়ে বলেছিলেন—"হে পরন্তপ, উঠ, জাগ! হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করে বীরধর্ম্ম পালন কর এবং সম্মুখ সমরে যুদ্ধ জয়ী হয়ে বীরের অগ্রণী এবং যশস্বী হও। তুমি জ্ঞাতিবধের ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পণ্ডিতের মত কথা বলছ, কিন্তু সেটা মোটেই জ্ঞানীর কথা নয়।

এ শুধু জড়ের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জ্ঞানী কাউকে হতও দেখে না, হনন করতেও দেখে না। একবার উঠ, নিজের কর্ত্তব্য পালন কর।" কিন্তু ভারত আজ গীতার বীরবাণী ভুলে গিয়ে জড়ধর্ম্মের পক্ষপাতী হয়ে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বীরের যোগ্য ভোগকে পরিত্যাগ করেছে। আমাদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।" জগৎটা বীরের জন্যেই বটে, তা বলে ধর্মটাও দুর্ব্বল হৃদয়ের সন্তাপহরণ নয়। যে যোগ এবং ভোগকে সুসমঞ্জস করতে না পেরেছে, তার যোগ এবং ভোগ দুইই পরের মুখে ঝাল খাওয়া মাত্র।

ত্যাগের নামে আমরা যত ভয় করি, কিন্তু এতে ভয় পাবার এমন কিছু নাই, বরং এতে আছে শান্তি এবং আনন্দ আরও আছে শক্তির জয়জয়কার। ত্যাগ দুই রকমেই হতে পারে। কায়িক ত্যাগ এবং মানসিক ত্যাগ। কিন্তু উভয়তঃ সংযোগ আছে। কেননা, আলো আঁধারের সঙ্গে যেমন অতি নিকট-বর্ত্তী সম্বন্ধ এবং একে অপরকে প্রকাশের যোগ্যতম করে তুলেছে, তেমনি মন এবং শরীরের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ। ত্যাগের মধ্যে মানসিক ত্যাগই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এই জন্যে জ্ঞানযোগী রাজর্ষি জনক রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও পরম যোগী হয়ে অপার্থিব বস্তুর অধিকারী হতে পেরেছিলেন। আবার এই-দিকে ফল-মূল-কন্দাহারী দরিদ্র পর্ণকুটিরবাসীও রাজরাজেশ্বর বলে পূজিত হন। পৃথিবীর একছত্রা-ধিপতি রাজা সম্রাটেরা ত্যাগীর চরণে শির নত করেন। ফলতঃ মানসিক শক্তিকে বর্দ্ধিত করবার জন্যেই শারীরিক ত্যাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, "গাছ যখন চারা থাকে তখনই বেড়ার প্রয়োজন, চারা যখন গাছে পরিণত হয়, তখন আর বেড়ার প্রয়োজন থাকে না। শারীরিক এবং মানসিক সংযমের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঐ পর্য্যন্তই, যে পর্য্যন্ত ভোগ এবং যোগের সুসমঞ্জস কেন্দ্রে না পৌঁছেছি। তা হলে আমরা বুঝতে পারি ত্যাগের অর্থই হল ক্ষুদ্রকে ছেড়ে মহৎকে পাওয়া। কথাটাকে আমরা জটিল করে তুলি তর্কের দ্বারা, কিন্তু এ তর্কের বস্তু নয়, এর মধ্যে আছে সাধকের হৃদয়ের সহজ সরল উপ-লব্ধি। ত্যাগে অনাবিল আনন্দ। যে না বোঝে, তার কাছে পর্য্যন্ত এ কথা সত্য; যে বোঝে, তার তো কথাই নাই। উপনিষদেও ঋষি বলে গেছেন-- "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"—একমাত্র ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়েছিল। যে পরের জন্য স্বার্থসুখ ত্যাগ করতে পেরেছে, তারি জীবন পূর্ণ হয়েছে।



প্রেমে সন্ন্যাস

—*—

সন্ন্যাস বলতে বুঝি আসক্তি বিসর্জ্জন। জ্ঞানী সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ক্রমশঃ আসক্তি পরিত্যাগ করে বিধি নিষেধের অতীত হয়ে যান। একেই বলে জ্ঞানের সন্ন্যাস। আবার প্রেমেরও সন্ন্যাস আছে। জ্ঞানী প্রেমিকের এক অবস্থা। প্রেমেও আসক্তি বর্জ্জন হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বেশ সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

নিগূঢ় প্রেমের মাধুরীতেও সব ভয় লোপ পেয়ে যায়। গোপীদের এই অবস্থাকে প্রেমোন্মাদ অবস্থা বলা হয়েছে। প্রেমে চিত্তে অসাধারণ বল উৎপন্ন করে—সেবক ভক্তকে বাঞ্ছিতের দিকে আরও বেশী করে আকর্ষণ করে। কাজেই কৃষ্ণপ্রেমে গোপীদের বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম সব ফিকে হয়ে যেত। পাতঞ্জলের ভাষায় বলতে গেলে তখন তাদের "অর্থ-মাত্রনির্ভাসক"—এই সমাপত্তি। অর্থাৎ জগৎ সংসারময় তাদের ইষ্টভাব ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল মাত্র ইষ্টই চোখের সামনে অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র ফুটে উঠেছে। গোপী তখন বিধি নিষেধের পরপারে। এই প্রেমকে এই জন্যই অপ্রাকৃত প্রেম বলা হয়েছে। সন্ন্যাসীও বিধি-নিষেধের পরপারে, প্রেমিক ভক্তও বিধি-নিষেধের পরপারে। কাজেই জ্ঞানী এবং ভক্তের চরম অবস্থাতে কোন পার্থক্য নাই।

তারপর চৈতন্যচরিতমৃত আর একজায়গায় বলছেন—

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥

কাজেই গোপীদের দ্রষ্টৃত্ব জ্ঞানও ছিল বলতে হবে। তাদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ কি সুখ উপভোগ করতেন—গোপীরা তাও উপলব্ধি করতে পারত। কাজেই জ্ঞানীর মত Subjective জ্ঞান তাদেরও ছিল।

জ্ঞানীর অহং-বোধ লয় পেয়ে যায়। অথবা বিরাট হয়ে ফুটে উঠে। গোপীদেরও তো আত্ম-সমর্পণের ফলে বিরাট্ অহং-বোধ জেগে উঠত। প্রেমোন্মাদের চরম অবস্থায় গোপীরাও বলত—"এই আমরাই শ্রীকৃষ্ণ—আমরাই গোবর্দ্ধন ধারণ করে-ছিলাম"—ইত্যাদি! জ্ঞানীর যেমন বিরাটত্বের অনুভব, তেমনি ভক্তেরও বিরাটত্বের অনুভব আছে।

কখনো কখনো সিন্ধুতে বিন্দুতে একাকার, আবার কখনো কখনো সিন্ধুর মাঝেই বিন্দুর উদ্দীপনা। ভক্ত-জ্ঞানী সবারই এই অবস্থা। ব্রহ্মই জীব হচ্ছেন, আবার জীবই ব্রহ্ম হচ্ছেন। এই তো লীলা। পরিণামে জ্ঞানী কিম্বা ভক্ত কারও ক্ষুদ্র অহং-বোধ থাকছে না।

কামে অভিনিবেশত্ব থাকে, কিন্তু প্রেমে তো তা নাই। প্রেম এই জন্যই সহজে বিরাট হয়ে পড়ত। শ্রীকৃষ্ণ তো গোপীদের কাছে একটা স্থূল দেহ মাত্রই ছিলেন না—তিনি ছিলেন ভাবময়। গোপীরা সর্ব্বত্র সেই ভাবেই আস্বাদন করে গিয়েছেন।

সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে বিচার করলেও প্রেমিক ভক্ত এবং জ্ঞানীতে কোন তফাৎ নাই। তমাল দেখে, মেঘের বরণ দেখে শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা হত। কেননা শ্রীকৃষ্ণের বরণ আর এদের বরণ যে এক। কাজেই এদের দেখেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে যেত। এই অবস্থাটা তো স্থূলের নয়—সূক্ষ্ম ভাবেরই অনুভূতি। জ্ঞানী সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ক্রমশঃ দেহ বোধকে লোপ করেন, আর ভক্তের শুদ্ধ ভালবাসায় দেহজ্ঞান তিরোহিত হয়। কাজেই পরিণাম হিসাবে বিচার করলে—জ্ঞানী প্রেমিকের একই অবস্থা।

অনাদরের মহিমা

—*—

ভালবাসা দিয়ে মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে, সচেতন করে তুলতে পারে, কিন্তু অনাদর দেখিলেও মানুষ মানুষকে কেমন করে জাগিয়ে তুলতে পারে আমার জীবনে তা আমি বেশ অনুভব করেছি। তাই মনে হয়, সব সময় সকলের পক্ষে ভালবাসাতেও সুফল হয় না, বরঞ্চ অনাদরে অনাদৃতের বুকে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাতে সে সর্ব্বাবস্থায় সচেতন থেকে, নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ তার আপন লক্ষ্যকে অটল রাখতে পারে। আঘাতে সবাই যে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, তা' নয়।

আমি যাকে আমার মনে আদর্শ বলে স্থান দিয়েছিলাম—তাকে একদিকে আমি প্রাণ ভরে হিংসাও করতাম—অর্থাৎ আমিও তার সমান হতে পারব এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা আমার মনে মনে খেলত। আমার সম্বন্ধে সে কি বলে, কি ভাবে তা জানবার দরুণ আমি সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক্‌তাম—কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য (তখন মনে হ'ত), সে কোন দিন আমার সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোন অভিমত প্রকাশ করেনি। তার মুখে আর অনেকেরই প্রশংসা শুনতে পেতাম—কিন্তু আমার সম্বন্ধে সে সব সময় নির্ব্বাক্। এই অনাদর এবং উপেক্ষার দৃষ্টিকে সহ্য করে নিতে যে আমায় কত ক্লেশ পেতে হত, তা অন্তর্য্যামীই জানেন। মনের ক্ষোভে তাকে কতই না অভিশাপ দিয়েছি। কিন্তু আজ সকল সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি বলেই বুঝতে পারছি, তার অনাদর দৃষ্টি অজ্ঞাতে আমার জীবনের উন্নতির পক্ষে কত বড় বন্ধুর মতই না কাজ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে তার অনাদরেই আমি ঠিক মানুষ হতে পেরেছি।

তার কাছ থেকে একটু সহানুভূতি বা ভরসার কথা পেলে তখন হয়ত একেবারে কৃতার্থ হয়ে যেতাম, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাইর থেকে এক টুকু ভরসাও পাইনি আমি। এতে যেন আমার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আরও শত গুণে বেড়ে উঠ্‌ত। নিজের মনেই নিজে পাক্ খেয়ে মর্‌তাম—কিন্তু তাতেই যেন আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। বাইর থেকে এত আঘাত, এত উপেক্ষা; কিন্তু কিছুতেই আমাকে দুর্ব্বল করতে পারেনি। হিংসা কর্‌তাম বটে—কিন্তু সে হিংসায় যেন আমাকে তার দিকে আরও বেশী করে এগিয়ে দিত।

বাইরে থেকে যে যাই বলুক না কেন, তার অবজ্ঞাত দানেই যে আমার অন্তরকে পূর্ণ করে তুলেছে, এ আমি কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারব না। অনেকেই বলে, আমি অভিমানী এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্ বলেই নাকি—বাহিরের উপেক্ষায় বা অবজ্ঞায় আমার কোন পতন হয়নি; কিন্তু আমি বলি, পরের মুখের একটু প্রশংসা শুনেই উচ্ছ্বসিত না হয়ে প্রত্যেকেরই নিজের আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে চলাই উচিত নয় কি? মানুষ নিজের পায়ে ভর দিয়ে যদি না দাঁড়াতে পারল, অপরের সাহায্য ছাড়াও যদি নিছক নিজের প্রাণের আপ্যায়নেই নিজের পরিপুষ্টি না হল, তাহলে বাইর থেকে কে এসে তাকে সাহায্য করে উন্নত করে দিবে?

অবজ্ঞা পেয়েই আত্মশক্তিতে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। তা বলে আমি বলতে চাই না যে, ভালবাসায় মানুষ উন্নত হতে পারে না। বিচিত্র পথ রয়েছে, কিন্তু একথা ঠিক, নিজের প্রাণে বল না থাকলে, নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা বিশ্বাস না থাকলে জীবনে কেউ উন্নতি করতে পারে না।

আশ্বাস

সারা জীবন ধরেই যদি
চলেই আবাহন—
(তবু) করিস্‌নে রোদন।

প্রাণ মাতিয়ে রাখ্‌রে শুধু
তাঁরই আয়োজন—
আসবেই যে জন।

কেমন করে কি দিয়ে তুই
করবি রে বরণ—
(হবে) কি তার ধরণ?

সেই ভাবনায় থাক্‌ রে মজে
গুণিস্‌নে তায় ক্ষণ—
(ওরে) আসবেই সে জন।

ঝড়ের হাওয়া দেয় দুলিয়ে
প্রাণ ধরে কাঁপন,
(জানিস্) আস্‌ছে রে আপন।

এমনি করেই আকাশখানি
হলেই আলোড়ন,
(হয়) প্রকট সে গোপন।

মেঘের আড়েই রয় বলে সে
ঝড়ের প্রয়োজন—
(তায়) কাঁপিস্‌নে অমন,
(ওরে) অবোধ শিশু-মন।

অপূর্ব্ব সঙ্কেত

—*—

"সেই অনন্ত-শূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্য-শব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব!"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি!"

* * *

ছোট বেলায় আনন্দ-মঠ পড়েছিলাম, কিন্তু এ কথাগুলোর ভিতর যে এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি নিহিত আছে, তখন তা একটুও বুঝতে পারিনি! আজ আবার যেন সম্পূর্ণ নূতন প্রেরণায় বিদ্যুতের আলোক-ঝলকের মত এ কথাগুলোর অর্থ প্রাণের মাঝে উদ্দীপিত হয়ে উঠ্‌ছে। ভিতর থেকে যেন কে বার বার বল্‌ছে—"ধর্ম্মলাভ করতে এসেছ? —কি পণ তোমার বল দেখি?"

ধর্ম্মলাভ করতে এসেও হেলায় খেলায় কত বৎসর কেটে গেল; ভেবেছিলাম, ধর্ম্মলাভের দরুণ আবার ত্যাগ কিসের? সব কৃপা, তাঁর ইচ্ছা হলে এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে—সত্যের আলোকে সব ঝল্‌সে উঠ্‌তে পারে! কিন্তু কৈ কৃপা! কৃপা করে তো কেবল অন্ধকারই বাড়্‌ছে দিন দিন। সত্যের আলোকে কোন নূতন পথের সন্ধান তো পাচ্ছি না। এক এক সময় মনের মাঝে অনিবার্য্য আকুলতায় কেবলই প্রশ্ন হতে থাকে, "তাই তো, এত বৎসর চলে গেল বলে আক্ষেপ করছ, তা তো ঠিক, কিন্তু এর মাঝে কতটুকু সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে তোমার, যাকে অবলম্বন করে তুমি অতৃপ্ত মনকে প্রবোধ দিতে পার? সত্যই কি কেবল ধর্ম্মলাভের দরুণ জীবনসর্ব্বস্ব পণ করেছ? তোমার আর কোন মোহ নাই, আসক্তি নাই? সত্যের দরুণ তুমি ধন মান ঐশ্বর্য্য জীবন অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্পণ কর্‌তে পেরেছ?"

মনস্কাম যাতে সিদ্ধ হয় তা তুমি চাইছ বটে, কিন্তু মনস্কাম সিদ্ধির কোন উপায় তো তুমি এখনো অবলম্বন করনি। সব বজায় থাক্‌বে অথচ ফাঁকতালে ধর্ম্মলাভ হয়ে যাবে—এই পর্য্যন্তই তোমার বিশ্বাসের দৌড়। অকপট চিত্তে বল তো দেখি, তোমার মাঝে কোন ভণ্ডামী আছে কিনা? যদিই বা কেউ গুরু-বাক্যে শ্রদ্ধা করে অবিচারে তা পালন করেছে, অমনি হয়ত সমালোচনা করে বলে ফেলেছ—ওঃ এ তো শুধু অন্ধ বিশ্বাস! নিঃশেষে প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে যে যাই কর্‌তে গিয়েছে, অমনি হয়ত বলে বসেছ——এ তো শুধু emotion, কোন বিচার নাই, যুক্তি নাই!

যুক্তিতে প্রাণ মানে? কোন দিক দিয়ে এর কোন পরখ হয়নি জীবনে! বল তো দেখি,

যুক্তি দিয়ে, সূক্ষ্ম বিচার দিয়ে কি হয়েছে ? মস্তিষ্কের কতগুলি ফেকড়ি বেড়েছে মাত্র—কিন্তু কৈ এতে তো হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্বালার অবসান হল না। বেদনাভরে বল্‌ছ—না, জীবনে শান্তি পেলেম না !

রাষ্ট্রের দরুণ, ধর্ম্মের দরুণ, সবের দরুণ প্রাণের মায়া ছাড়্‌তে হবে, তবে না অসিদ্ধ মনস্কাম সিদ্ধ হবে। দেশকে উদ্ধার করবে, ধর্ম্মকে উদ্ধার করবে—কত দায়িত্ব দেখ দেখি ! হিন্দুর religion নাকি dogmaতেই পরিপূর্ণ—বেশ তো এক একটা dogmaর ভিতর কি গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, প্রাণ দিয়ে তন্ন তন্ন করে তাই অনুসন্ধান করে দেখ না ! যদি কিছু সত্য পাও, দ্বিগুণ উৎসাহে তা প্রচার কর, আর যদি বুঝ সব ভণ্ডামী, তাহলে আর অভিনয়ে কি প্রয়োজন ? নূতন পথ অবলম্বন কর। সত্যি সত্যি মানুষকে একটা কিছু দিতে না পারলে শুধু মুখের কথার সান্ত্বনায় আর কত কাল চলবে বল তো দেখি। তাই বলছি, প্রাণ দাও—শুধু তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না, আরও অনেকের অতৃপ্ত উন্মুখীন কামনা সফল হবে। দুঃখ কিসের, ভয় কিসের ? ৮৪ লক্ষ যোনিই যদি ভ্রমণ করে বেড়াতে পারলে, এবার না হয় বুঝে শুনে একটা জন্ম সত্যের দরুণ experiment করেই কেটে গেল। এ কথা জেনে রেখো, কেউ কারও পথ সহজে ছাড়ে না। সত্য যদি থাকে বিশ্বাস কর, তাহলে সে সত্যও সহজে তোমায় ধরা দেবে না—সাধন চাই, প্রাণের মমতা বিসর্জন দেওয়া চাই ! মনস্কাম সিদ্ধ হবে না কেন ? তীব্র সংবেগ থাকা চাই।

mob-consciousnessএ নয় ; সজ্ঞানে সত্যের দরুণ প্রাণ দিতে হবে। জীবন-মরণ পণ। অগস্ত্যের মত যাত্রা—সত্যলাভ করবার দরুণ দুর্লঙ্ঘ্য পথে জেনে শুনেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অদম্য আকুলতা।

কি এতটুকু প্রাণ তোমার ? অনন্ত প্রাণের সঙ্গে তাকে সম্মিলিত করে দাও। একেই বলছি প্রাণ বিসর্জন। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাক্—বাইরের শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হলেই বা কি ? তন্ময় হয়ে তুমি মহাপ্রাণের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই কিন্তু তোমার মুক্তি। আর কিছু না, নিজকে সবল ইচ্ছার আধার করে ফেল। প্রয়োজন হলেও যে শক্তির বিকাশ দেখাতে পারে না, তার ভিতর potentially শক্তি আছে, এ কথা জেনেই বা কি লাভ ?

অবিশ্বাসী হতে বলছি না—কিন্তু তৌষ্টিকতার নেশায় যেন পেয়ে না বসে। বিশ্বাসকে বুকে রেখেই তো অনন্ত পথের যাত্রিক হতে হবে তোমাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্বাসের কেন্দ্র থেকে তোমার ভিতর নূতন বল সঞ্চার হতে থাকবে। সেই বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্রই তো রণ-ভেরীর ন্যায় প্রাণে বেজে উঠবে। উল্লাসে তখন তুমি কেবল এগিয়ে চলবে, এগিয়ে চলবে।

জগতের সবাই তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দরুণ। তুমি যে শক্তিধর, তাই শক্তিসঞ্চার করাই তোমার জীবনের মহাব্রত। মহাশক্তির সঙ্গে সর্ব্বদা তোমার যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংলগ্ন থাকবে। প্রাণের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা করছ—তা হবে কেন ? অগাধ জলধির সঙ্গে তোমার প্রাণের ধারা মিলে যাবে ! পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদে একটা সূত্র আছে—

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্‌॥

মহাব্রত কি, তাই বলছেন।—জাতি, দেশ, কাল সময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়ে, অবিশ্রান্ত ভাবে যে নিয়ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই বলে মহাব্রত। প্রত্যেকের জীবনেই এক একটা মহাব্রত থাকা চাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই মহাব্রতে অচল অটল নিষ্ঠা রেখে চলতে হবে। এক জীবনে সেই মহাব্রতের

কোন ফল পাওয়া নাই বা গেল—কিন্তু অবিশ্বাস করে দুর্ব্বলের মত ক্ষীণ প্রাণের স্পন্দন নিয়ে মরার চেয়ে—to die boldly for an idea কি শত গুণে গৌরবের বিষয় নয়? একটা চলতি কথা আছে, "যাক্ প্রাণ—থাক্ মান"—প্রাণ তো তুচ্ছ! মহৎ যারা, তারাই মহৎ আদর্শের দরুণ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। তোমার মাঝে কি সেই মহান্ পুরুষদের রক্তের ধারা বইছে না? তোমার ভিতরেও কি একটা বজ্রদৃঢ় ইচ্ছার স্ফুরণ হতে পারে না?

প্রাণের ভয়ে পালায় কারা? যারা দুর্ব্বল, ভীরু! যার জীবনে কোন সঙ্কল্প নাই, আর সঙ্কল্প করেও যে সন্দিগ্ধ চিত্তে তা উল্লঙ্ঘন করে চলে, সে তো নরাধম। ব্রতহীন জীবনকেই তো একদিকে পশুজীব বলা যেতে পারে। পশুও তো প্রবৃত্তির বন্যায় ভেসে চলেছে।

যে ideaর দরুণ মানুষ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে সে যে কত বড় মহান্ idea! সেই ideaর কাছে তো জীবন তুচ্ছ হবেই।

জীবনে যারা কোন না কোন বিষয়ে একটা মহাব্রত নিয়ে চলেছে, প্রায়ই তাদের গোঁড়া বলে, প্রাণশক্তি নাই বলে আক্রমণ করা হয়; কিন্তু আজীবন যে একটা প্রাণহীন ideaকেই অবলম্বন করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে—তার ভিতর যে কত বড় প্রাণশক্তির জোর, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখ্‌লে এতে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয় না কি? এই গোঁড়ামী নিয়ে আজ সমস্ত জগৎময় গান্ধী কি এক ভাবের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি বলেন, ছোট-খাটো মহাব্রতানুষ্ঠানের ফলেই নাকি তাঁর ভিতর এত শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। প্রাণশক্তির অভাব থাকলে—অক্ষুণ্ণ ভাবে কেউ ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে না, কোন না কোন দিক্ দিয়ে অঙ্গহানি হয়ই হয়।

আসল কথা হল প্রাণের আবেগ নিয়ে। আত্মবলে সর্ব্বত্র যিনি প্রাণকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারেন—তিনিই তো দশের, দেশের, এমন কি জগতের কর্ণধার। খোল-করতাল নিয়ে সবাই তো কীর্ত্তন করে, কিন্তু মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে এত লোক আকৃষ্ট হত কেন? কীর্ত্তনে তিনি শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, এই তার তাৎপর্য্য। আবার এই শক্তি তিল তিল করেই আয়ত্ত করতে হয়। কাজেই অভ্যাস চাই— সাধনা চাই।

কারও মনস্কামনা অপূর্ণ থাকবে না, তবে কিনা মৃদু মধ্য তীব্র সংবেগের তারতম্যে মনস্কামনা সিদ্ধির সময়ের বেশকম হতে পারে মাত্র। কাজেই কারও নিরাশ হওয়ার আশঙ্কা নাই। কিন্তু যার ভিতর তীব্র সংবেগের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে—তার সিদ্ধি তো অচিরাৎ হতে বাধ্য। আর কিছু না, সিদ্ধি লাভের মনস্কামনাকেই একটু জোরালো করতে হবে, তার পর সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী।

তিল তিল করে ধৈর্য্য অবলম্বন করে নিরন্তর সাধনা করে যেতে হবে, প্রয়োজন হলে নির্ম্মম হয়ে প্রাণের আশাও ছাড়তে হবে, তারপর তোমার মনস্কামনা অপূর্ণ থাকে কি না বলো দেখি!

বীর সাধক

প্রসাদ মাগে ভিক্ষুক। ভিক্ষা করতে করতে চিত্তবৃত্তিও হীন হয়ে যায়, আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস এসে পড়ে। শেষে দেখি, সুস্থ সবল মানুষও ভাবে, একমাত্র ভিক্ষা ছাড়া যেন তাদের জীবন ধারণের আর কোন উপায় নাই। ভিক্ষা মাত্রেই দূষণীয়—সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে যে কোন বিষয়েই হোক্ না কেন। ধর্ম্মলাভ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের বেশ সুন্দর একটী উক্তি আছে। তিনি বল্‌ছেন

অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে,
যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো পুরুষঃ সোঽহমস্মি!

—আমি ভিক্ষুকের ন্যায় যাচ্ঞা কর্‌ছি না। আমি জানি, তুমি আর আমি এক; আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষে আর আমাতে কোন প্রভেদ নাই!

কাজেই ভগবানের কৃপা হলে ভগবান্‌কে জান্‌তে পার্‌বে, তা না হলে চিরকাল অন্ধকারময় নৈরাশ্যে পড়ে থাক্‌তে হবে, এ কেমন কথা? ভগবান যে তোমার আত্মস্বরূপ। কৃপাই যদি স্বীকার কর তাহলে উভয়ই সমান সমান—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু-বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তো শ্রেয়ো পরম্ অবাপ্স্যথ॥

কেউ কারও চেয়ে ছোটও নয়, বড়ও নয়। আদান প্রদান চল্‌ছে সমান সমান বলেই। কাজেই চিত্তে দুর্ব্বলতা আস্‌বে কেন? ভগবান্ যদি তোমারই কেউ হয়ে থাকেন—তাহলে তিনিই তো তোমার কেবল ঠাকুর নন।

আত্মীয়তার মাঝে তো কোন ব্যবধান থাক্‌তে পারে না। আর ভগবান্ তো আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এত ভয় আর কৃপাবাদের উপর নির্ভর করে এমন সঙ্কুচিত হয়ে থাকার প্রয়োজন কি? বরঞ্চ Walt Whitman এর মত বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে বল—And I know that the hand of God is the promise of my own.—ভগবান আর কেউ নন, তোমারই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জ্বলন্ত বিগ্রহ। তোমারই আত্মস্বরূপ ভগবান্, একথা যেন কখনো ভুলে না যাও।

অত্যগ্র ইচ্ছার আবেগে রূপ ধরে ফুটে উঠেন তিনি। এখানেও বলব তাঁরই কৃপা! আমি বলি, প্রত্যেক নিজ নিজ ইচ্ছাকে খাঁটী কর, ইচ্ছার উপর জোর দাও, তখন দেখ্‌বে কৃপাবাদের নূতন এক অর্থ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে।

কোন কিছু চাইতে নাই—মিছে কথা, ভণ্ডামী। চাইবে না কেন—সমস্ত প্রাণ দিয়ে চাইবে। কৃপাবাদের তো কোন কথাই উঠ্‌তে পারে না। এ যে সাম্যে সাম্যে মৈত্রী!

না চেয়ে যখন থাক্‌তে পার্‌ছ না, তখন চাওয়াটাকেই কেন খাঁটী কর না? ভিখারীর মত পথে পড়ে পড়ে ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ ফট্‌ করে মরার চেয়ে—কৃপা এগিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখ না কিছু মিলে কি না! আর মিলবেই না বা কেন?

হঠাৎ কেউ হয়ত সুনজরে পড়ে যায়, কারও ভাগ্য হয়ত সুপ্রসন্ন হয়ে উঠে—কিন্তু বাস্তবিক যদি সে নিষ্ঠাবান্ সাধক না হয়, তাহলে প্রাপ্তধনের কোন মর্য্যাদা থাকে না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজের মুখের কথা—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। আসল কথা হল, না চাইতে চাইতে তোমার ইচ্ছাশক্তিই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বরঞ্চ কৃপা—কৃপা না করে, তোমার ইচ্ছাশক্তি আবার যাতে জাগ্রত হয়ে উঠে, তারই চেষ্টা কর। ভগবান্ দয়া করে তোমায় দেখা দিবেন না।—দেখা না দিয়ে পার্‌বেন না তিনি। রাম প্রসাদের ভাষায় বল্‌তে গেলে,—

"বৎস পাছে গাভী যেমন,
ধাবা পাছে পাছে তেমন"—

গাভী যেমন বৎসের পিছনে পিছনে ছুটে যায়, তেমনি ভগবান্‌ও তোমার পিছনে পিছনে ছুটবেন।

শক্তিতে সবই সম্ভব। ইচ্ছাশক্তিতে যদি তা হতে পারে, কেন তুমি নিজের ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ হতে দেবে না? তুমি যখন তন্ময় হয়ে যাও, তখনই এসে তোমায় ভগবান্ দেখা দেন। কাজেই ভগবানের দেখা দেওয়াটাই বড় হল, না তোমার তন্ময় হয়ে যাওয়টাই বড় হল? নিজের চিত্তটাকে আয়নার মত স্বচ্ছ করে ফেল, দেখ্‌বে তখন তাতে সর্ব্বময়ের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে!

চাইবে না কেন? কিন্তু সাবধান, বাজে প্রার্থনা করে যেন দুর্ব্বলতার পরিচয় না দাও। আলেকজাণ্ডার যখন পুরু রাজাকে পরাস্ত করে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তুমি আমার কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার পেতে চাও?" প্রত্যুত্তরে পুরু রাজা বল্‌লেন —"রাজার মত!" এমনি নির্ভীক চিত্ত থাকা চাই। হেরেও যদি যাও—তবু যেন অন্তরের গৌরববোধ লোপ পেয়ে না যায়।

তারপর বেদ উপনিষদের কথাই যদি ধর, একদিকে যেমন উপনিষদ্ বল্‌ছেন "আত্মা যাকে নিজে বরণ করেন—সেই একমাত্র তাঁর দর্শন পায়" তেমনি আবার এ ও বল্‌ছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।—দুর্ব্বলের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না।" কাজেই উপনিষদের যুগেও কৃপাবাদ ছিল, একথা যদি বল, তাহলেও সে কৃপাবাদ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের মত নয়। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিতে যে প্রার্থনার মন্ত্র রয়েছে, তার প্রত্যেকটী ছত্রে যেন ঋষিদের অদম্য প্রাণের তেজের আভা বিচ্ছুরিত হয়ে আস্‌ছে। কোন জায়গায় একটুও দুর্ব্বলতা নাই!

প্রার্থনা কর্‌বে না কেন—কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, তুমি যার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছ সে তোমার প্রভু নয়—সে তোমার আত্মীয় বন্ধু—সখা। তুমি যা চাও, তা তুমিই; তোমার শক্তিতেই তুমি তোমার আয়ত্ত হবে। আত্মপর ভেদ রাখ্‌লেই পরের ভরসা। ধিক্ সে কৃপণতায়! প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব কর, সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি!—এই তো বীরসাধকের প্রাণের কথা।

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৯ জ্যৈষ্ঠ ২জুন বৃহস্পতিবার—

পাহাড়ের কোলে ভটবাড়ী গ্রাম। বেশ সমৃদ্ধিশালী ও বহুলোকজন পরিপূর্ণ। এখানেও কাঁচা চামড়ার জুতা পাওয়া যায়। তার উপরের দিকটা কম্বল ও নীচের দিকটা কাঁচা চামড়ায় তৈরী। দেখ্‌লে মনে হয় পর্‌তে আরাম কিন্তু আসলে তা নয়। আজকাল আমাদের জুতার ভাবনা বেশী হয়েছে বাস্তবিক জুতা ছাড়া এ পার্ব্বত্য পথে চলাও মুস্কিল। এখানকার মুচিগুলি বেশ হুঁসিয়ার। যাত্রীদের চালচলন ভাবভাব, চেহারা দেখে জুতার দাম চড়ে! ভগবানের কৃপায় চেহারাটি ভাল, সুতরাং জুতার দাম কম কেমন করে হবে? যে জুতা পাহাড়ীদের কাছে ॥৵০ ×৵০ আনা, আমাদের দেখে তার দাম উঠ্‌লো ৩৲ টাকা; অন্তে ২৲টাকায় নামলেও আমরা পেছ-পা হলাম, নিলাম না।

কাল রাত্রে টিহরীরাজের ডাকবাংলায় থাকার জন্য চৌকিদারকে অনেক অনুরোধ করে ছিলাম। বেচারা শুনে নাই; পরে ভয় দেখিয়েছিলাম—Report করবো। অনেক রাত্রে আমাদের সঙ্গীয় প্রায় সকলেই ঘুমুলে বেচারা চটীবালার সঙ্গে এসে ডাকবাংলায় থাকার জন্য অনেক তোষামোদ করল; কিন্তু তখন আর কে যায় সে আরামদায়ক তৃণশয্যা ছেড়ে? এখানে বাবা কালীকম্বলীলার সদাব্রত দেবার ব্যবস্থা আছে, আমরা ফিরবার দিন সে সদাব্রত নিয়েছিলাম। এখানের ঝরণাটী বেশ সুন্দর—এই ঝরণাটীর নামই **ভাস্করগঙ্গা**! জলের বেশ সুবিধা।

কাল রাত্রে আহারাদি করে শুতে আমাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সকালে ঘুম ভাঙ্গতেও দেরী হল। তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী চটীতে এই বেলাই যেয়ে থাকবো সংকল্প থাকলেও কার্য্যতঃ হল না।

অতিসত্বর শৌচাদি সমাধা করে রওনা হয়ে পড়লাম। অল্প অল্প ক্রমোচ্চ চড়াই করতে করতে চার মাইল পথ অতিক্রম করে আবার সামান্য সামান্য ক্রম-নিম্ন পথে ২ মাইল উৎরাই করে ভাগীরথী গঙ্গার উপরিস্থিত একটা কাঠের পুল পার হয়েই একটা চটী পেলাম। এ চটীটী একেবারে ভাগীরথী গঙ্গার উপরই অবস্থিত।

ভুক্কিকা পুল বা ভুখী চটী
৬ মাইল

গঙ্গার জল দিয়েই খাওয়া-নাওয়া সব কাজ করতে হয়। এ চটীটির নাম **ভুক্কিকাপুল** বা **ভুখী-চটী**। এখানকার ভাগীরথী গঙ্গার ভীষণ শব্দায়মান স্রোতের বেগে কথা পর্য্যন্ত শুনা যায় না। এ কয়দিন বৃষ্টি হওয়ায় ভাগীরথী গঙ্গাতে অত্যধিক জল বৃদ্ধি পাওয়াতেই শব্দ বেশী হচ্ছে। অনেক লোক এখানে আড্ডা নিয়ে পাক কচ্ছে। বেলাও বেশ হয়েছিল। আজ আমাদের এবেলা এখানেই থাকার ইচ্ছা হলেও কিন্তু কাল রাত্রির জায়গার অসুবিধার কথা স্মরণ হওয়ায় তাড়াতাড়ি গঙ্গানদী চটীতে জায়গা দখল করার জন্য রওনা হয়ে পড়লাম। এই ভুক্কিকাপুল চটীতে মাত্র একজন দোকানদার, থাকার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। কাজেই দেরী না করে এখান হতে বের হয়ে পড়েছিলাম।

ভাগীরথী গঙ্গা বাঁ হাতে রেখে ছোট ছোট চড়াই উৎরাই করতে করতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ভাগিরথী গঙ্গার উপরিস্থিত ঝোলান পুল পার হয়েই ভাগীরথী

গঙ্গা ডান হাতে রেখে চলতে লাগলাম। এক ফার্লং দূরেই একটী চটী। এরই নাম **গঙ্গানানী চটী**।

গঙ্গানানী
৩ মাইল

ভুক্কিকাপুল হতে যে তিন মাইল পথ এসেছি, এ তিন মাইল পথ খুব খারাপ। অত্যধিক বৃষ্টির তোড়ে মাটী ধুয়ে যাওয়ায় শুধু কুচি কুচি কাঁকর, ছোট মাঝারী বড় নানা রকমের পাথর এলোমেলো ভাবে থেকে অনবরত পায়ে চোট লেগেছিল। মাঝে মাঝে পথ ধসে এমন খারাপ হয়ে গেছে, একটু পা হড়কে গেলেই হাজার ফুট নীচে খরস্রোতা গঙ্গাগর্ভে পতন ও নিমেষে নশ্বর জীবনের লয়। কাজেই প্রাণের মায়াতে সাবধানে অতিসন্তর্পণে এ পথটুকু অতিক্রম করতে হয়েছে। আজ সকালে এই ৯ মাইল পথ আসতেই খুব কষ্ট অনুভব করেছি, কাল কিন্তু সমস্ত দিন ১৮ মাইল পথ চলেও যেন আনন্দ হয়েছিল।

গঙ্গানানী চটীর এক ফার্লং দক্ষিণ দিকে যেখানে আমরা ভাগীরথী গঙ্গার উপরিস্থিত পুল পার হয়ে এসেছি, সেই পুলের অন্য পারে (গঙ্গার পূর্ব্ব পাড়ে) একটী গরম জলের কুণ্ড ও ফোয়ারা আছে। আমি ও চিদানন্দদাদা সেই গরম জলের কুণ্ডে স্নান করবার জন্য গেলাম। গঙ্গা পার হয়ে পথ হতে এক ফার্লং পরিমাণ খাড়া পাহাড় চড়াই করেই কুণ্ডটী পেলাম। কুণ্ডটীর পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে **শ্রীমন্মহর্ষি পরাশর** দেবের মূর্ত্তি বিরাজিত। পরাশর মুনির বিবরণ ও উৎকট তপস্যার কথা বোধহয় আমার সমস্ত বাঙ্গালী ভ্রাতাগণই জানেন। এখানেই তাঁর আশ্রম ছিল। স্থানটীর চারিদিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ; পার্ব্বত্য সানুদেশ স্নিগ্ধ শ্যামল বিবিধ বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন। মন্দিরটীর তলদেশ হতে একটী গরম জলের ঝরণা যে কুণ্ডে পতিত হচ্ছে, তারই নাম **ঋষিকুণ্ড**। কুণ্ডের জল ঈষৎ কষায় স্বাদবিশিষ্ট এবং বেশ গরম, তবে যমুনোত্তরীর কুণ্ডের মত অত গরম নয়। কিন্তু এতেও স্নান করতে আমাদের কষ্ট হল। যেখান হতে গরম জলের ফোয়ারা বের হয়ে কুণ্ডে পড়ছে, সেখানকার পাথরগুলি হলদে ও সবুজ রঙ্গে এমন সুন্দর রূপে রঞ্জিত হয়েছে দেখলেই মনে হয় নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ সহস্র ফণাধারী কালীয় নাগের উপর দণ্ডায়মান। সৌন্দর্য্য এমনই হৃদয়গ্রাহী যে আমরা উভয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখলাম। অত দীর্ঘ সময় দেখেও যেন তৃপ্তি হল না, পুনঃ পুনঃ দেখতে ইচ্ছা হল। চমৎকার চিত্তাকর্ষক দৃশ্য! এ স্থানটীও গন্ধকের গন্ধে ভরপূর—মশগুল। দুটী কুঁড়ে ঘরে দুজন সাধু মহাত্মা বিরাজ কচ্ছেন, তাঁদের পাশেই কুঁড়ে ঘরে যাত্রীদের থাকার জায়গা। ছোট দোকানও একটী আছে। ঐ কুণ্ডের বা ফোয়ারার জল পানে বাতাদি রোগ ও খোষ পাঁচড়া ইত্যাদি রক্তবিকারজ যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। জলে Sulpher (গন্ধক)এর ভাগ খুব বেশী, কাজেই ওরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

পরাশর আশ্রম ও
ঋষিকুণ্ড

গঙ্গানানীতে একটি দ্বিতল ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিয়েছি। এ ছাড়া আরও একটি অতি বড় দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে, তাতে ভয়ানক মাছির উপদ্রব বলে বাহিরে অবস্থিত ছোট ধর্ম্মশালাটিতেই আড্ডা নিলাম—বিশেষতঃ এই ধর্ম্মশালাটির নিকটেই একটি বড় ঝরণা আছে বলে। এই ছোট ধর্ম্মশালাটী পালিভাতিনিবাসী রাজা ললিতপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ মহাশয়দ্বয়ের দ্বারা এবং বড় ধর্ম্মশালাটি রাজারাম ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার সঙ্গে আলাদা রান্না করবার ঘরও আছে। একজন মাত্র দোকানদার; রাজার দিক হতে একদিন সাধুদের সদাব্রত দেবারও ব্যবস্থা আছে। দোকানদার ভারী খারাপ লোক—সেই সদাব্রত দেবার মালিক। অন্য সাধুদের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখে আমরা আর সদাব্রত নেই নাই। যেখানে একজন

মাত্র দোকানদার, সেইখানেই দোকানদারদের এই-রকম খারাপ ব্যবহার দেখেছি। কেদারবদরীর পথে কিন্তু প্রত্যেক চটীতে অনেক দোকান থাকায় সেখানের দোকানদাররা অত বদমেজাজী নয়। এখানে চারিদিকে অসংখ্য বন জঙ্গল থাকা সত্ত্বেও কাঠের দর অত্যন্ত বেশী। আমাদের পাঁচ ছয় জন লোকের এক বেলার পাক করতেই ছয় আনার কাঠ লাগলো, অন্য চটীতে এক আনা দেড় আনার বেশী লাগ্‌তো না। বৃন্দাবনের মাতাজীগণ আসার সময় পথে ঝরণার পাশে পাক করে খেয়ে এসেছিলেন।

পথে অনেক বড় বড় ঝরণা ফেলে এসেছি, তার পাশে পাক করে খাওয়ার বিশেষ সুবিধা ছিল। কাঠের অভাব তো মোটেই নাই, চাল, ডাল লবণ থাক্‌লেই হল। পূর্ব্বেই বলেছি এ চটীটির পার্শ্বেই একটি বড় ঝরণা আছে, আমরা কুণ্ডের জলে স্নান করেও আবার ঝরণার জলে স্নান করে নিলাম। এখানে চাউল ১৲ টাকা সের, চিনি ১।৴০ আনা সের, সপোষা ডাল ॥৴০ আনা, ঘী ২৸০ আনা, দুধ ।৴০ আনা, আলু ৵১০ আনা সের। একজন দোকানদার থাকলে এমন মজা, সে জিনিষের দাম যা চাবে সেই দামেই কিনতে হবে, নতুবা খাবে কি ?

দ্বিপ্রহরের আহারের সঙ্গে এক পশলা প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল; আমরা ভাল জায়গায় ছিলাম, কোন কষ্ট হয় নাই। বিকেলেও এখানে থাকা গেল। ভাগীরথী গঙ্গা কাছে থাকায় তার প্রবল শব্দে আচ্ছন্ন করে দেয়, মনে হয় যেন সমুদ্রের কিনারায় আছি। শব্দটী একটানা, এবং শ্রুতিমধুর—বেশ আনন্দদায়ক, যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের চিরপরিচিত অনাহত নাদ !

এখানকার পর্ব্বতগুলি যেমনি উচ্চ, ভাগীরথী গঙ্গাও তেমনি প্রবল বেগবতী, ভীষণ শব্দায়মানা। উচ্চ পর্ব্বতগুলি যেন ভাগীরথী গঙ্গার পবিত্র ধারাকে সর্ব্বদা নিজের পাশে রাখার জন্য আপনার উচ্চ উচ্চ শিখর হতে বড় বড় পাথরের টুকরো ভাগিরথীর বুকে ফেলে বাধা দিচ্ছে। গঙ্গার পবিত্র ধারার ভিতর এত বড় বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে, যার একখানা পাথরের টুকরো দ্বারা তিন চার তলা এক একটী পাকা বাড়ী তৈরী হতে পারে। নদীগর্ভে এত বড় বড় টুকরো পাথর পথে আর কোথাও দেখতে পাই নাই। যেখানে পাহাড়গুলি পড়ে গঙ্গার জলকে বাধা দিচ্ছে, সেখানেই গঙ্গার স্রোত আরও প্রবল রূপে প্রবাহিত হচ্ছে, শব্দও সেইখানে অতি প্রবল—যেন ভাগিরথী মা পাপী তাপী সন্তান-গণের মুক্তির জন্য এলোকেশে উন্মাদিনী হয়ে ছুটে চলেছেন। ভাগিরথী গঙ্গার জলের সে স্রোত ও ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। এতে কোনপ্রকারে পড়ে গেলে নিমেষের মাঝে সব শেষ হয়ে যাবে—চিহ্নমাত্রও থাকবে না। আমাদের পার্শ্বের চারিদিকে পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বরফ জমে থাকায় রাত্রে আজ বেশ শীত লেগেছিল।

২০ জ্যৈষ্ঠ ও জুন শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রওনা হলাম। কুচি কুচি পাথর কাঁকর-ময় পথে সামান্য সামান্য চড়াই উৎরাই করে, বন-জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে এক মাইল যাবার পর গঙ্গার উপর পুল পার হয়ে, ভাগীরথী গঙ্গা বাঁ হাতে রেখে আবার পূর্ব্বোক্তরূপ পথে এক মাইল যাবার পর ভাগিরথী গঙ্গার উপর আবার একটি ভাঙ্গা পুল পার হলাম। এবার পুল পার হয়ে একটি চড়াই করতে আরম্ভ করি। আমাদের ডান হাতে যদিও ভাগীরথী গঙ্গা, তথাপি আমরা চড়াই করে পর্ব্বতের অনেক উপরে উঠাতে ভাগীরথী গঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং ক্রমশঃ শব্দও কম হতে লাগ্‌লো। চড়াইটীও প্রায় এক মাইল হবে। চড়াই শেষ করেই আবার উৎরাই করতে লাগলাম, ১½ মাইল উৎরাই করার পর **লুহারী নাগ** চটী। চটীটি একে-

লুহারী নাগ
৪॥ মাইল

বারে ভাগীরথী গঙ্গার উপর অবস্থিত। চটী-বালার কোন ঘর নাই। শ্রীমৎ স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট ধর্ম্মশালা আছে, সেই ধর্ম্মশালারই এক পাশের একখানা ঘরে একজন দোকানদার সামান্য জিনিষপত্র রেখে যাত্রীদের অর্থ শোষণ কচ্ছে!

এখান হতে বের হয়ে, এক মাইল যাবার পর একটি বড় ঝরণার উপর পুল পার হয়ে আবার চড়াই আরম্ভ করি। ২½ মাইল ক্রমোচ্চ চড়াইয়ের পরে **সুখী** চটী। যেখান হতে পুলটি পার হয়ে ক্রমোচ্চ চড়াই আরম্ভ হয়,

সুখী চটী
৩॥ মাইল

সেখান হতে একটি খাড়া পাকদণ্ডী পথও এই চটী পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আমরা কিন্তু ক্রমোচ্চ চড়াই করেই এসেছি। ফিরবার দিন পাকদণ্ডীর পথে নেমে-ছিলাম। সুখী চটিতে বাবা কালীকম্বলীবালার একটা দোতালা ধর্ম্মশালা ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের একটা দোকান আছে। বাবা কালীকম্বলীবালার সদাব্রত পেলাম। ছোট একটি জলের ঝরণা আছে।

সুখী চটি অতি সুন্দর স্থানে পাহাড়ের বুকের উপর অবস্থিত। যমুনোত্তরীর পথে 'ওজরী বা বজ্রী চটী যেমন সুন্দর স্থানে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত, এ সুখী চটীও তদ্রূপ। এরও সামনের পর্ব্বতগুলির শিখরদেশ বরফাবৃত থাকায় সূর্য্যের কিরণে অতি সুন্দর দৃশ্যে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রায় আধ মাইল দূরে সুখী গ্রাম। গ্রামটি বড়, সুন্দর, বহুজনপূর্ণ ও শস্যশালী। ঘরগুলির দেওয়াল কাঠের এবং চাঁদনী শ্লেট-পাথর দ্বারা আবৃত। আখরোট জন্মে, যদিও আমরা এসময় চেষ্টা করেও পেলাম না।

দ্বিপ্রহরের আহারের পর ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করে রওনা হলাম। দেড় মাইল চড়াই করার পর (পাহাড়ীদের মতে আধ মাইল) পুনরায় ক্রমনিম্ন পথে উৎরাই করতে লাগলাম। এক মাইল উৎরাই করার পর **ঝালা**

ঝালাগ্রাম
২॥ মাইল

গ্রাম। ঝালাগ্রামটিও খুব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বটে, পার্ব্বত্য হিসাবে। সুখী পাহাড়-টির চড়াই প্রায় ৪ মাইল। ঝালাগ্রামে কোন চটী নাই- একটা মন্দির আছে, তাতে যাত্রীরা থাকতে পারে। তখন অনেক বেলা ছিল, আমরা না থেমে বরাবর উৎরাই করতে লাগলাম। পথের ধারে ধারে অনেক জমিতে খুব আলুর আবাদ হচ্ছে। এত বেশী আলুর আবাদ এ পথে আর কোথাও দেখি নাই। একবার অগ্রহায়ণ মাসে কালনা হতে কয়েক মাইল দূরে কোন পল্লীগ্রামে যাবার সময় সমুদয় পথটিই যেমন আলুর জমিতে পূর্ণ দেখে ছিলাম, এ পথটিও আজ তেমনি দেখতে পেলাম। ঝালাগ্রাম হইতে আরও দুমাইল উৎরাই করে একটা বড় নদীর মোহনা পাওয়া গেল। **সিঙ্গোট** নাম্নী নদীটি উত্তরদিককার বরফাবৃত পর্ব্বত হতে বের হয়ে এখানে এসে ভাগীরথী গঙ্গাতে আত্মসমর্পণ করেছে। সিঙ্গোট নদীটি প্রায় তিন ফার্লং চওড়া হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। ভাগীরথী গঙ্গ ও এখানে বিশেষ চওড়া—প্রায় আধ মাইলের উপর। এ অঞ্চলে প্রবেশ করে এত বেশী চওড়া নদী আলমোড়া ছাড়া হিমালয়ের ভিতর আর কোথাও দেখি নাই। ভাগীরথী গঙ্গার সুপবিত্র জল অতি নম্রভাবে, ধীর, মৃদুমন্দ গতিতে বালুকা-রাশির উপর দিয়ে সন্তর্পণে প্রবাহিত হচ্ছে। এ স্থানটি দেখে আমাদের খুব আনন্দ হল—ঠিক যেন বাংলার কার্ত্তিক মাসের নদী। কাল গঙ্গানানী চটিতে ভাগীরথী গঙ্গার কি উত্তাল শব্দ, আর আজ এখানে ভাগিরথী গঙ্গা কি প্রশান্ত, কি মৃদু মন্দ মাতৃস্নেহসুমধুর!

আমরা সিঙ্গোট নদীটি হেঁটে পার হলাম। নদীতে সামান্য জল আছে, পার হওয়া কোনই কষ্ট নয়। সিঙ্গোট গঙ্গা পার হয়ে, ভাগীরথী গঙ্গা ডান হাতে রেখে, তারই উত্তর পার দিয়ে সামান্য সামান্য চড়াই উৎরাই করে পূর্ব্বদিকে দেড় মাইল যাবার পর হরশিল গ্রাম পেলাম। এ দেড় মাইল পথ ভাগীরথী নদীর চড়া দিয়েই এসেছি—প্রথমে সামান্য চড়াই ছিল, পরে সব সোজা উৎরাই, কাজেই কোন কষ্ট হয় নাই। এই হরশিলে টিহরীরাজের একটি কাছারী বাড়ী, একজন কাঠের কণ্ট্রাক্টারের দোকান, পার্ব্বত্য সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। ভুটিয়াদের বাড়ী, ঘর, লোকজন, গরু-বাছুর, ঘোড়া, ছাগল, চমরী গাই সবি আছে। তিব্বতের সঙ্গে টিহরী বা ভারতের এদিককার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল এই হরশিল। অসংখ্য ভুটীয়া কাঠের ঘর তুলে বাস কচ্ছে। একসঙ্গে অতগুলি ভুটিয়া স্ত্রীপুরুষ দেখে আমাদের রাক্ষস বলে ভ্রম হয়েছিল। তাদের যেমনি চেহারা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিও তেমনি।

হরশিল ৩॥ মাইল

আজ সকালে আসার সময় তিনজন ভুটিয়াকে বড় বড় শিংবালা মসৃণ লোমযুক্ত প্রায় ২৫০ শত ছাগলের পিঠে জিনিষপত্র নিয়ে যেতে দেখেছি। পথে আমাদের সঙ্গে মুহারী নাগের কাছে দেখা হয়েছিল। এদের আকৃতি গৌরবর্ণ। পূর্ণ স্বাস্থ্যের চিহ্ন স্বরূপ গণ্ডস্থল গোলাপের ন্যায় রক্তাভ, চোখ ছোট ছোট, নাক চ্যাপ্টা, শরীর লম্বাচৌড়া; আকারে-প্রকারে খুব বলিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী। আমরা গঙ্গোত্তরী হতে ফিরবার সময় সুখীচটীতে একজন ভুটিয়াকে দেখেছিলাম। তাকে দেখে কিন্তু অনেকক্ষণ অবাক্ হয়ে থাকতে হয়েছিল। আমি তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, কোমর পর্য্যন্তও হই নাই। সে বেচারা যেমনি লম্বা তেমনি হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ; হাত-পাগুলি যেন একটা ছোট হাতীর মত! এমন বিরাট আকৃতির লোক জীবনে আর একটিও দেখিনি। তারা প্রায়ই নীচে (সমতল ভূমিতে) আসে না। এমন কি উত্তরকাশী—টিহরীতেও আসতে নারাজ। তাকে দেখলে কিন্তু দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের নাম বা কুম্ভকর্ণের নাম আপনা আপনিই মনে জাগে।

ভুটিয়াদের পরিচয়

এই ভুটীয়ারাই হিমালয়ে ব্যবসা করে বেড়ায়। তারা বাংলাদেশের বেদের মত দল বেঁধে গরু, ঘোড়া, ছাগল, তাঁবু ইত্যাদি সারা সংসারময় ঘুরে বেড়ায়। যেখানে আড্ডা নেয়, সেইখানেই তাদের সংসার; ছাগ, মেষ, চমরী গাই এদের প্রধান সম্পত্তি। কারণ ঐ জানোয়ার নিয়েই তারা পাহাড়ে ব্যবসা করে থাকে। ওরাই পাহাড়ে মালগাড়ী বা Goods Train বিশেষ। এরা পথে চলতে চলতে সর্ব্বদাই ছাগল ও মেষের রোম দিয়ে সূতা কাটে; ঐ সব সূতায় নিজেদের জামা কাপড় তৈরী করে। কেউ বাঙ্গালীর মত দাবা-পাশা, তাস খেলে সময় কাটায় না বা পরচর্চ্চা করে দিন কাটায় না। যদিও দিনের মধ্যে তাদের বিশেষ কোন কাজ নাই বল্লেই হয়। গাড়োয়ালবাসীগণ সর্ব্বদাই সূতো কাটে। পথ চলবার সময় বা কথা বলবার সময়ও তাদের সূতো কাটা বন্ধ হয় না। এরা সাধারণতঃ আটা ও মাংস পেলেই সন্তুষ্ট, অন্য কোন জিনিষের স্বাদ বিশেষ জানে না। এদের ভাষা ভুটিয়া ও তিব্বতী, ধর্ম্ম হিন্দু এবং বৌদ্ধ; মুসলিম এবং ঈশার ধর্ম্ম সে দেশে এখনও প্রবেশ করে নাই। তাদের মাঝে সাধারণত তিনটী জাত দেখতে পাওয়া যায়—রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও ডোম। ডোমদের অতি ঘৃণার চোখে

দেশে। তিব্বত হতে লবণ, সোহাগা, পশম, ছাগল মেষ, চামরী গাই, শিলাজতু, মৃগনাভি, ভূর্জ্জপত্র, মধু, দারুচিনি, চামর, ভুটিয়া কম্বল, ভঙ্গেলা*, মৃগচর্ম্ম, নানা প্রকার ঔষধের জড়িবটী, শালম-মিশ্রী প্রভৃতি জিনিষ তিব্বত হতে আনে এবং এ দেশ হতে শস্য, বস্ত্র, চিনি, ঘী, লঙ্কা, চা, কেরোসিন প্রভৃতি নিয়ে যায়।

শিল্প ও ব্যবসায়

ভুটিয়াদের আবাসভূমি হতে আধ মাইল দূরে অতীব মনোরম কাননভূমির ভিতর দিয়ে, একটি বড় ঝরণার পুল পার হয়ে দুই ফার্লং পরিমাণ পথ এগুলেই শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণদেবের মন্দির ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা। আমরা এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলাম। হরিদ্বার হতে বের হয়ে সত্যনারায়ণ চটীতে সদাহাস্যযুক্ত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণদেবের যেমন মূর্ত্তি দেখেছিলাম, এস্থানের শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণদেবের মূর্ত্তিও তেমনি সদা হাস্যযুক্ত—দেখে খুব আনন্দ হল, এমন মধুর মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। উক্ত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের মূর্ত্তি, মন্দির ও ধর্ম্মশালা সদানন্দজী ব্রহ্মচারী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভটবাড়ীতেও একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজকাল তিনি বিবাহ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেও কিন্তু এই মন্দির ও ধর্ম্মশালা তাঁরই তত্ত্বাবধানে চলছে। অদূরে বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালাও আছে, সেখানেও অনেক যাত্রী জায়গা নিয়ে থাকে। হরশিল গ্রামের বড় বড় সুদীর্ঘ সরল বৃক্ষরাজির নিম্নস্থ ছায়াযুক্ত পথ এবং বৃহৎ নির্ঝরিণীর মনোরম দৃশ্য চমৎকার। নির্ঝরিণীর পারে একটি শিবমন্দির। একটি দ্বিতল ঘর ও সর্ব্বপ্রকার পার্ব্বত্য খাদ্যদ্রব্যের একটি দোকানও আছে। বড় রাস্তা হতে এই সত্যনারায়ণ চটীতে প্রবেশের মুখেই অন্য একটী দোকান আছে। এ মন্দির ও ধর্ম্মশালাটি অনেকটা জায়গা ঘেরা। তার ভিতরেই আখরোট, আপেল প্রভৃতির গাছ। ধর্ম্মশালাটির দক্ষিণ দিক দিয়েই ভাগীরথী গঙ্গা মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যাচ্ছেন। গত কাল ভাগীরথীর ভীষণ শব্দে সমুদ্র গর্জ্জনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আজকের ভাগীরথীর মৃদু মধুর ধ্বনিতে কিন্তু কি যেন এক অজানা আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়ে দিচ্ছিল। রাত্রে এখানে কেরোসিন তৈল না পাওয়ায় চীরকাঠ জ্বালিয়েই রাত্রির আহার শেষ করলাম।

শ্রীশ্রীসত্য-নারায়ণ দেবের মন্দির

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণদেবের আরতি দর্শন করলাম। আমাদের চারিদিক অভ্রভেদী পার্ব্বত্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেকটা পর্ব্বতই যেন রৌপ্যনির্ম্মিত বরফের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তারা ভাগিরথী মায়ের স্তুতিগানে আত্মহারা। স্থানটিও বেশ মনোরম। এহেন স্থানে আরতির পর আমরাও তাঁরই মধুময় নামের হিল্লোলে মন-প্রাণ মাতায়ে তাঁর জয় গান গাইতে লাগলাম :—

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস-দানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন॥
জয় কেশীমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনা-বক নাশন॥
জয় গোপবল্লভ, ভক্তসুলভ, দেবদুর্ল্লভবন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দকখণ্ডন।
জয় কান্ত কালীয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিরয়মোচন॥
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন।
জয় দেবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন।

(ক্রমশঃ)

* ভাংগাছকে পাটের মত পচিয়ে তা হতে সুতো বের করে যে মোটা কাপড় বা কম্বল তৈরী হয়, তাকে 'ভঙ্গলা' বলে। বদরীনারায়ণ হতে নামবার সময় একটি এনেছিলাম, পথে অযোধ্যার নিকট সুলতানপুরের বড়মার বৃদ্ধ পিতাকে সেটী দান করতে হয়েছিল।

ফকিরের ফিকির



সুখ ও আনন্দ কে না চায়? সংসারী সেজে ওই যে দিনরাত স্ত্রী-পুত্রের সেবা করছে, ও ও যেমন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির আশায়, আর এই যে গৃহবিরাগী কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসী, কে বলে সেও সেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আশাতেই বিরাগী নয়? তবে এদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য ঐ সুখেরই উপাদানে ও অনুভূতিতে। সংসারী সুখের আশায় দুহাত বাড়িয়ে যে ছুটেছে, পদে পদে তাতে আহত হয়েও নিজের শুকনো হাড় চিবিয়ে মুখ চিরে আপন রক্ত আপনি চাখার মত ভ্রান্ত আনন্দে বিভোর রয়েছে। সংসারের শত দুঃখ বিপদের প্রবল ঘাতাভিঘাতেও সে সুখ বৃন্তচ্যুত হয়েও হয় না।—এমনি মমতার ডোরে বাঁধা এ সংসার! —মহামায়া নাকি একদিনের জন্য তাঁর শক্তি সংহরণ করে উদাসী শিবের হাতে এই জগৎ-সংসারের ভার দিয়েছিলেন - আর জগৎ উচ্ছন্ন যাবার বো হয়েছিল! মহামায়ার এমনি প্রভাব! কি করবে সংসারী জীব?

পাগল সন্ন্যাসীও কি সংসারী নয়? যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জগতের ও পরজগতের সমস্ত সুখ নিজের মাঝে আস্তৃত দেখে সন্ন্যাসী সমাধিস্থ থাকেন, ততক্ষণ তিনি সংসার বুকে করেও উদাসী শিবের মত ঊর্দ্ধ নেত্র। কিন্তু যখন সন্ন্যাসীর নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান রয়েছে, কম হোক, বেশী হোক, তিনিও সংসারী বৈ কি! তবে তাঁর সুখের উপকরণ ও অনুভূতি ভিন্ন রকমের। ছোট ছেলের মন ভোলে খেল্‌নাতে—চুম্‌কীতে। দুদিন বাদে যে তা ভেঙ্গে যাবে, তা তার খেয়াল নাই, আপাতচাক্‌চিক্যে তার মন ভুলে যায়। এই হচ্ছে সাধারণ সংসারীর মন। আর সন্ন্যাসীর মন হল প্রবীণ, বিবেচক। সে বেছে বেছে যা টিক্‌সই, তার অন্বেষণে ব্যস্ত। ছেলে হয়ে ছেলে-খেলা সেও একসময়ে করেছে নিশ্চয়, আর তাতে বারবার ঠকেই না তবে সে আজ বিবেচনা করতে শিখেছে? সেও অবশ্য সুখেরই অন্বেষী—তবে কিনা সে চায় পাকা ঘরের পাকা সুখ। মুখরুচিতে তার মন ভোলে না, সে চায় খাঁটী রস। বড় দরের স্বার্থপর আর সুখান্বেষী তবে কে?

কিন্তু এই 'স্ব'এর অর্থ বহুব্যাপক, সমগ্রকে কুক্ষিগত করে। স্বার্থ-পর ও পর-স্বার্থ সেখানে এক হয়ে গেছে। সুখও সেখানে লৌকিক দুঃখকে আত্ম-গত করে নেয়। একই অনুভবের এপিঠ ওপিঠ হয়ে দুটোই সেখানে সমভাবে গৃহীত হয়। লোকে দেখে সন্ন্যাসী রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে; কিন্তু যে অব্যক্ত আনন্দে সন্ন্যাসীর দেহ আবৃত রয়েছে, শত রোদ-বৃষ্টির ঝামেলাতেও যে তা ছেদ হয় না—সে আবরণ এমনি! কিন্তু আমাদের সুখ-দুঃখের সংস্কার এমনি মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে যে, এখন আর সে বেদনা পৃথক হয়ে অনুভব করবার অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব বজায় রাখবার মত শক্তি আমাদের নাই। সুখ দুঃখের উপাদান দেখে আগেই অনেক সময়ে আমরা অভি ভূত হয়ে পড়ি—ঠিক যেন বাঘের কামড়ের আগেই বাঘ দেখেই heart fail করে মরা। এমনি আমা দের মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই মনেরই আবার উল্টাদিকে ফিরবার শক্তি এখনও যথেষ্ট রয়েছে। নতুবা এই বিংশশতাব্দীর মানুষের দেহ ধারণ করেই ভাস্করানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ শুধু অভ্যাস বশেই নগ্ন দেহে অমন প্রবল শীতাতপ সহ্য করতে সমর্থ হতেন না।

কি করে অমন হওয়া যায়? বছর বছর এত টাকা খরচ করে জামা-জুতো দিয়ে দেহ ঘিরে কাপড়ের পোষাকের পুঁটুলি হয়েও শীতাতপ থেকে দেহ রক্ষা হয় না, নিত্য নূতন রোগ এসে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহটাকে জরাজীর্ণ করে তুলছে, আর ওঁদের দেহ সম্বন্ধে কি নিশ্চিন্ত ভাব—কত স্বাধীন! শুধু কি তাই? যেমন দেহটা, তেমনি উঁহাদের মনও কত গভীর আনন্দের নিলয়। তাঁদের দুঃখ বলে কোনও বস্তু নাই। সাংসারিক লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত করে মাথা কুটে একটা পয়সা আদায় করতে পারে না, আর সেই অত দুঃখের পয়সা কিনা ওঁরা না চাইতেই লোকে ওঁদের পায়ে সঁপে দিয়ে যায়! এ দেখে কার না হিংসা হয়! বুঝি ভগবান্ সংসারীদের মন ফিরাবার জন্যে এমনি সব আশ্চর্য্য মহালাভের পথ দেখাচ্ছেন! এ দেখে যে সবারই ফাঁদে পড়তে ইচ্ছা করে! কিন্তু মহামায়ার এমনি প্রভাব—ধরা পড়ে দুএকটা!

সন্ন্যাসী কিন্তু চতুর চিরদিন। যে দিন সে মহামায়াকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর এত সাধের জগৎখানিকে নস্যাৎ করতে শিখেছে, সেই দিন থেকে তার চতুরালী সুরু হয়েছে। সেও যত চোখ বুজে থেকে দেখবে না বলে, ততই তার সামনে নিত্য নূতন মোহন রূপ নিয়ে জগৎ এসে হাজির হয়! জ্ঞানের নেতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রেমের অভিমান দিন দিন মহাশক্তির সঙ্গে তার লীলামাধুরী এমনি বাড়িয়ে চলেছে। এ প্রেমের সঙ্গে সাধারণ প্রেমের তুলন হয় না। শক্তিমান না হলে মহাশক্তি আসেন না—ভূতনাথ না হলে ভূত নিয়ে খেলা করা চলে না। তাতে ঘাড় মটকানোর ভয় পদে পদে। বিলাসী, ভোগেচ্ছু মন নিয়ে সন্ন্যাসীর আনন্দ উপভোগ করা যায় না। যে মুহূর্ত্তে মন অমন টলে পড়বে, প্রকৃতির করাল মূর্ত্তি অমনি তাকে সেই মুহূর্ত্তে গ্রাস করবে। কাজেই সুখভোগের কামনায় সন্ন্যাসী হলেও সে এই লৌকিক সুখ নয়। বরং লৌকিক ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিলে তবেই সে স্বর্গসুখের প্রথম ধাপে আরোহণ করা যায়।

প্রকৃত সুখের বা ভোগের শক্তি বাড়ে কিসে? সংযমে। অজ্ঞাতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে শক্তি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে, অপচয় হচ্ছে, সংযমে তা কেন্দ্রীকৃত হয়ে মহাশক্তির আধার হয়। এক একটা করে ইন্দ্রিয় এমনি অন্তরমুখে ব্যাবৃত্ত করে অনন্তশক্তিসম্পন্ন করা যায়। বাইরের টানে আকৃষ্ট করে অতি সামান্য অংশ দিয়ে বিষয়সুখ ভোগ করিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হৃতশক্তি হয়ে পড়ে; শক্তি ফিরে চাই বলেই সত্যলাভেচ্ছুর পক্ষে বিষয়-বিরাগ প্রয়োজন। সাংখ্যের নেতিবাদের মূলেও ঐ শক্তিকে আয়ত্ত করে প্রতিষ্ঠা বা আত্মজ্ঞান লাভ করা। পাতঞ্জলের লয় যোগ বা হঠ যোগেও এমনি চিত্তকে এই জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ করা বা পরমাত্মাতে লীন করার কৌশলই শিক্ষা দেয়। জাগতিক মন হয়ত প্রথমেই চম্‌কে উঠে বলবে, এই জগতই যদি না রইল, তবে আর আমার রইল কি? বিবেকী হেসে বলেন, ভয় নাই, হারাবে না—আরও বেশী করে পাবে!

কেমন করে এই জগৎ থেকে মনকে তুলে পর-জগতের সঙ্গে যোগ করব? সে কৌশল কি? যোগী বলছেন, দৃষ্টিকে ত্রাটকে অবরুদ্ধ কর, কর্ণকে অনাহত নাদ শ্রবণে নিযুক্ত কর, জিহ্বাকে খেচরী মুদ্রা যোগে অমৃতের আস্বাদন দাও; বিশ্বকে আত্মগত অনুভব কর। জগৎরহস্য ভেদ হয়ে জগৎ আরও মধুময় হবে। ভক্ত প্রেমিক বলছেন, সব তাঁতে সঁপে দাও—রসময়কে স্পর্শ করে অপ্রাকৃত দেহ হবে। বেদান্ত বলছেন, ক্ষুদ্র দেহের গণ্ডীতে মনকে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বময় তাকে প্রসারিত করে দাও—

ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই সেই এক কথা—আগে এটাকে ছাড়, তবে গিয়ে ওটাকে পাবে। ভোগ যোগ দু টো এক সঙ্গে হবে না। "যোগী কভু ভোগী হয়, ভোগী যোগী নয়।" এটা লাখ কথার এক কথা। পরীক্ষা করেই দেখ না কেন। একদিন কথা বন্ধ রেখে মনটাকে জপে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করে দেখ, যদি সম্পূর্ণ নাও পার, যতটুকু করবে, তাতেই দেখবে কি অনাবিল আনন্দ—কোথায় লাগে এর কাছে ভোগের আনন্দ! এমনি সব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই।

আগে বিষয়শূন্য হও। তারপর সেই নির্ব্বিষয়ী মনকে নিয়ে খেলা কর—দেখবে, কিছু নাই, শূন্য থেকে ভোজবাজীর মত আনন্দ এসে মন কেড়ে নিবে। আনন্দের উপকরণ তখন ভূরি ভূরি এলেও তা হবে তুচ্ছ, গ্রহণ করা না করা ইচ্ছাধীন। কেননা উপকরণ দিয়ে যে সুখ বা আনন্দের সংগ্রহ হয়, তার চেয়ে কোটীগুণ শক্তিসম্পন্ন আনন্দের উৎস যে তখন নিজের ভিতরে! তাই সন্ন্যাসী ছাই মেখে গাছতলায় বসে, আবার লক্ষটাকার গদিতেও বসতে পারে। কারণ তার আনন্দ তখন ও দুটোর একটাতেও আবদ্ধ নয়! ও দুটোর যেটাই সে গ্রহণ করুক, তাতে বাইরে তোমার আমার চোখে যেমনই লাগুক, দুটোই ফকীরের সেই আনন্দ সংবরণ বা আত্মগোপনের ফিকির। তাই ফকীরের ফিকিরে ব্রহ্মময়ী এসে ধরা দেন; তুমি-আমি যে প্রলুব্ধ হব, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ফিকিরটী আয়ত্ত করে কয়জনে?

আন্দোলন

সংস্কার অর্জ্জনের ফল ভাল মন্দ দুই হতে পারে, সুতরাং সংস্কারেরও সমালোচনা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার নাম করে অলক্ষ্যে অনেক সময় আমাদের মাঝে ভণ্ডামী প্রবেশ করে। আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম অবস্থায় না পৌছেই অনেক সময় আমাদের দুর্ব্বল স্নায়ুকেন্দ্র অবশ হয়ে পড়ে, তখন আমরাও বলি "ওঃ, সে যে কি অব্যক্ত আনন্দ—ভাষায় কি তা প্রকাশ করা যায়!" এই অব্যক্ত সংজ্ঞা প্রয়োগ করেই যেন সকল রকম কর্ত্তব্য থেকেই আমরা রেহাই পাই। কিন্তু অনেক সময় দেখি, আমাদের অব্যক্ত অবস্থা, একটু কষ্ট করে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে তা বড় একটা আচম্‌কার জিনিষ নয়। ঋষিও চরম অবস্থায় পৌছে গিয়ে বলেছেন, 'ব্রহ্মকে মুখে বলে বুঝানো যায় না—তিনি বাক্য-মনের অতীত,' আর আমরাও সঙ্কীর্ত্তনে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসে বলি,—"ভাই, আজ যে কি অব্যক্ত আনন্দ পেলাম, তা আর ভাষায় প্রকাশ করবার যোগ্য নয়। সে যে কি তা কি আর বলব?" দুটাই অব্যক্ত অবস্থা বটে; কিন্তু এর মাঝে কি কোন পার্থক্য নাই?

খাঁটী অবস্থা লাভ কর্‌বার পূর্ব্বেই যে অন্ধ-সংস্কারের প্ররোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতার ভান করে চলি—এ এক রকম দুরারোগ্য আধি বিশেষ। একটু বিশ্লেষণ-দৃষ্টি নিয়ে দেখলে যে সমস্যার সমাধান অনায়াসে হয়ে যেতে পারে, তাকে

ভাবুকতার দুর্ব্বল প্রলেপ দিয়ে রহস্যময় করে তোলা আমাদের যেন স্বভাব হয়ে পড়েছে। এমনি করে বিশ্লেষণশক্তির চর্চ্চার অভাবে, আমাদের ঠুনকো ভাব-ভক্তির মাত্রা কেবল বেড়েই চলেছে। ভুলে যদি কেউ আধ্যাত্মিকতার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ চায়, তাহলে তাকে নিম্ন অধিকারী বলে কটাক্ষও করি। এই isolated religion-এর ফলে হচ্ছে কি, ধর্ম্ম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝে একটা সামঞ্জস্যের সুর বাজিয়ে তুলতে পারছে না—আমরা ধর্ম্মও করি, আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মও বেশ চলে যায়। ভারতবর্ষ বিশেষ করে আধ্যাত্মিক আলোচনায় কেন্দ্র বটে, এখানে অনেক ঋষি-মুনিও জন্মেছেন বটে; কিন্তু জাতির মাঝে অকালে যে জরার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, এটা কিন্তু কখনো সুস্থ সবল ধর্ম্মের লক্ষণ নয়। কাজেই ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক কুসংস্কারে আমাদের পেয়ে বসেছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

উপনিষদে আছে, ব্রহ্মকে তর্ক দ্বারা, যুক্তি দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা কিছুতেই পাওয়া যায় না, কিন্তু তর্ক করতে, বিচার করতে উপনিষদ্ তো কাউকে বারণ করেন নি। আর এই বাণী যে ঋষির মুখে নিঃসৃত, তিনি নিজে নিশ্চয়ই যুক্তিবিচার করে শ্রান্ত হয়েই একথা বলেছেন। হয়ত তাঁর ব্যষ্টি বুদ্ধি আর বিচার করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তা বলে আর কেউ যে যুক্তি বিচারের পথে আরও কিছু অগ্রসর হতে না পারবে তাই বা কে জোর গলায় বলতে পারে? চরম অবস্থা হয়ত এক হতে পারে, কিন্তু মাঝের অবস্থাগুলোর যে একটা সুস্পষ্ট পরম্পরা কেউ দেখাতে পারবে না, এমন অসম্ভব কথায় কে বিশ্বাস করবে? রহস্য বা Mysticism বলে যে বিষয়ে আমরা নীরব, কে জানে একদিন মানব বুদ্ধিতে সেই রহস্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠবে? রহস্য যে চিরকালই রহস্য থেকে যাবে, তার কি মানে আছে?

বুদ্ধিকে প্রয়োজনে না খাটালে যে বুদ্ধি আমাদের ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়, সেই বুদ্ধিই আবার অচল হয়ে উন্নতির পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে চললে, অভিনিবেশত্বের প্রলোভন আর আমাদের ঠেকাতে পারে না, তখন কেবল নব নব উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে যাওয়ারই প্রেরণা জাগ্রত হয়ে উঠে। যে কোন ভাবকে বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝি, তার চেয়েও বড় ভাব রয়েছে। কাজেই বুদ্ধি জীবনের উন্নতিপথের বিঘ্ন নয়—বরং এই বুদ্ধিই নানাপ্রকার মোহ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করে।

অগ্র্যা বুদ্ধির অভাবেই তৌষ্টিকতায় আমাদের গ্রাস করে বসে। কেননা যে অবস্থা আমরা লাভ করি, তাকে তো বাজিয়ে পরখ করে দেখি না—যা পাই তাই যেন চরম! রহস্যবাদের দুর্ব্বল বেষ্টন দ্বারা যে ভাবকে আমরা আদরে লালিত পালিত করে তুলি, যুক্তিবাদীর এক মুহূর্ত্তের যুক্তিতে তা নস্যাৎ হয়ে যাবার উপক্রম হয়! ভাবকে রক্ষা করবার সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করি না বলেই, ভাব এসেও নির্ম্মম ভাবে আমাদের অভাবে ফেলে চলে যায়।

অন্ধকারে মানুষ সত্যলাভ করে? এর কোন যুক্তিবিচার, বা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা থাকতে পারে না? সত্যলাভের পথে কি মানুষ খানিক রাস্তায় চোখ বুজে চলে, আর গন্তব্যস্থলে পৌছলেই কি অমনি তাদের চোখ ফুটে উঠে? কি কি অবস্থার ভিতর দিয়ে সত্যান্বেষী সাধক অতিক্রম করে এসেছে তা কি তার বোঝা দরকার নয়? যে মুহূর্ত্ত থেকে সত্যলাভের পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে ছুটেছে, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তো সাধক সত্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই সত্যলাভের উপায় বলতে গেলে—প্রচেষ্টার শেষ আবেগটী পর্য্যন্ত গণনা করতে হবে। কাউকে বাদ দিলে তো চলবে না।

খাঁটী সত্য মানুষকে কোন দিক দিয়ে ফাঁকি দেয় না। সাধক চলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে কোন্ পথে চল্‌ছে সে, পরিণামের আভাস বিদ্যুতের ঝলকের মত তার প্রাণে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। কোথাও অন্ধকার নাই, কুহেলিকা নাই—আবরণ নাই, সব স্বচ্ছ সব নির্ম্মল। কাজেই সত্যান্বেষী সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতির মাঝের ক্রমগুলির কেন সন্ধান পাবে না? সে তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সত্য লাভ করেনি! সত্যকে সে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেছে, কাজেই সত্য তার কাছে রহস্য নয়। সত্যের একটা ধারা সে বুঝতে পেরেছে।

একথা সত্য যে, There are no degrees of truth, There are only degrees of approach to it. কাজেই সত্য না হয় অব্যক্ত বাক্য-মনের অগোচরই থেকে গেলেন, কিন্তু সত্য লাভের পথে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, একথা তো ঠিক। কাজেই বিশ্লেষণবুদ্ধি নিয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাধনার একটা প্রণালী প্রত্যেকেই ইচ্ছা কর্‌লে বিবৃত কর্‌তে পারেন—এতে সত্যের বিকাশের পথে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করা হয় না। আমরা processটার উপর জোর না দিয়ে ঝোঁক রাখি resultএর দিকে। আর process-এর কথা ভুলে যাই বলেই—সত্য যেন হঠাৎলভ্য বস্তুর মত আমাদের চমকিয়ে তুলে। একটু বিশ্লেষণ বুদ্ধি থাকলেই দেখি, 'সত্য সহসা একদা আপনা হইতে' ফুটে উঠেনি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সাধনার সঙ্গে সত্য সংযুক্ত।

চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হলে তাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু চেষ্টায় ত্রুটী রেখে যারা কৃতকার্য্য হল না বলে আক্ষেপ করে, তাদের জীবন আক্ষেপ করতে কর্‌তেই যায়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি অব্যক্ত হতে পারে, কিন্তু তাকে ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা করেছেন অথচ অকৃতকার্য্য হয়েছেন এমন কয়জনা? প্রায় সবাই সেই মামুলী বচন ঝেড়ে মন বুদ্ধিকে স্তব্ধ করে বেশ নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সবার মুখেই শুনি, "ভাই আজ যে হঠাৎ কি দেখলাম, কি হল...!" এই 'হঠাৎ'এর কোন তাৎপর্য্য নাই, জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর নাই—কেবল অব্যক্ত—অব্যক্ত!

যারা বিশ্লেষণের পথে চলেছে, তারা যে সত্যের সাক্ষাৎ পাবে না, এমন নয়। তবে কিনা তারা সত্যকে বেশ বাজিয়ে নিতে চায়। অনুভূতিতে গদ গদ হয়ে তাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণবুদ্ধি এত সহজে বন্যায় খড়কুটার ন্যায় ভেসে যায় না। এই জন্যই বিশ্লেষণের পর যাকে সত্য বলে একবার তারা আঁকড়িয়ে ধরে, তা থেকে তাদের কোন দিন বিচ্যুতি ঘটে না। অনুভূতি তাদের ছাপিয়ে উঠতে পারে না—অনুভূতিকে তারা জীবনের সঙ্গে বেশ সুন্দর ভাবে মিশিয়ে নেয়!

Pragmatic view of truth হচ্ছে সত্যের বিশিষ্ট দিক। Socrates এবং Aristotle উভয়ের মতই সত্য—"Virtue is both a kind of knowledge and a kind of habit." কাজেই সত্যের অব্যক্ত অংশ যেমন খাঁটী, তেমনি সত্যের ব্যক্ত অংশও অখাঁটী নয়। খাঁটী সত্য এই উভয়কে নিয়ে।

আধ্যাত্মিক প্রেরণা হচ্ছে character-building process—দৈনন্দিন জীবনে তার বিকাশ হবে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি যদি মানুষকে বিশৃঙ্খল করে তোলে, একটা অস্পষ্ট আবেশে অভিভূত করে রাখে তো সে খাঁটী প্রেরণা নয়। আধ্যাত্মিক জীবন সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন, কোন দিক দিয়ে তার মাঝে বাড়াবাড়ি নাই। বুদ্ধি জড় হয়ে যাবে, সাধনায় একটা সুশৃঙ্খল ধারা থাকবে না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা

করলে কিছু বলতে পারবে না, এই কি সত্যান্বেষী সাধকের লক্ষণ ?

যেমনি সংস্কার তেমনি ফল। সত্য হঠাৎ একদিন আচম্‌কা দেখা দেবেন বলে, "কেউ আমরা জ্যোতিঃ দেখি, কেউ বিশ্বরূপ দেখি, কেউ কৃষ্ণ দেখি, কেউ কালী দেখি," কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এই বিভূতি বা আশ্চর্য্য রূপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপান্তর আনতে পারে না। আলেয়া দর্শনের মত সাময়িক আমাদের চিত্ত বিস্ময়-রসে অভিভূত হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তারপর আবার যেই সেই। এ যেন জোয়ার ভাটার মত, হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। আধ্যাত্মিক জীবন বলতে কি এই ভেল্কীবাজীর জীবনই বুঝব ? না কি এর আরও কোন গভীর তাৎপর্য্য আছে ?

মানুষ ও শাস্ত্র

—*—

"ষড়-দর্শনে না পায় দরশন"—ষড়-দর্শন পড়লেই তাঁর দর্শন মিলে না। ষড় দর্শনের মাঝেই তাঁর প্রকাশ নয়, তাঁর প্রকাশ বেশী এই মানুষেরই প্রাণে। মানুষই তাঁকে বুঝে পেয়ে, তিনি কেমন, সে কথা বলতে গিয়ে দর্শন গড়ে তুলেছে। আচার-নিষ্ঠ আকুলপ্রাণ অধিকারী তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ-লব্ধ সত্যই শাস্ত্র সাধু গুরুবাক্য রূপে পেয়ে আরও নিঃসংশয়ী, দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। মানুষ অন্তরলব্ধ সত্য দিয়ে শাস্ত্র রচেছে বলেই তা আরও বেশী মহান্ হয়ে ওঠে। বেদ অপৌরুষেয় বা অলৌকিক হয়ে মাথাতেই থাকত, বুকে আর স্থান পেত না, যদি মানুষ তার সত্য অন্তরে উপলব্ধি না করত। আর সেই অজানিতের দিকে ভীতি-রহস্যময় শ্রদ্ধা বেশী দিন স্থায়ীও হয় না। তাই হিন্দুর বিধান—বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষা করবে।

এখানেও সেই প্রত্যক্ষদর্শী গুরুই শিক্ষক, বা পথপ্রদর্শক। শুধু শাস্ত্র নয়। তাই শাস্ত্র পড়ে আপন অধিকার বেছে নিয়ে গুরু করা নয়, বরং ঠিক তার উল্টো ; আগে সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে পন্থা ঠিক করে, তার পর শাস্ত্র পড়া। এই রূপ অধি-কারীই ভাগ্যবান্ কেননা সে আগে পায় প্রত্যক্ষ অনুভূতি, তার পর শাস্ত্রের মাঝ দিয়ে লোকহিতার্থে তা প্রকাশের ভঙ্গী দেখে ! কিন্তু সকলের ভাগ্যে তা হয় না ; তাই শাস্ত্র পড়ে, তিনি আছেন বা তাঁকে পাওয়া যায়, এই কথা যতই জানতে থাকে পিপাসুর আকুলতা ততই বেড়ে যায়। পরিশেষে সেই আকুলতার আকর্ষণে গুরু এসে নিজেই কৃপা করে ধরা দেন ও পথ বলে দেন। ধ্রুব প্রভৃতি প্রাচীন সাধক হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান যুগের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি আধুনিক সাধুদের মাঝেও আমরা এমনি আগে পাই আকুলতা, তার পর গুরু দর্শন। পথের কথা বলে দেবার লোকের অভাব হয় না—যদি তাতে চল্‌বার শক্তির অভাব না থাকে। প্রথম অধিকারীর উচ্ছল আবেগ যখন গভীর হয়ে অন্তরে খাত কাটতে থাকে, সেই ফল্গুধারা বয়ে

অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশ তখন সাধক আপনার মাঝেই পেতে থাকে। তার পর ক্রমে আকুলতা আরও পরিনিষ্ঠিত হয়ে সেই অন্তর্য্যামীকে বাহিরেও প্রকট করায়।

কিন্তু সর্ব্বত্র চাই সাধকেরই প্রবল আকর্ষণ। ভাবি, মানুষের শক্তিতে কিছু হবার নয়, তিনি নিজে ধরা না দিলে কেহ তাঁকে ধরতে পারে না—কিন্তু না, তবু 'যমেব এষ বৃণুতে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যকে ভুল বুঝলে চলবে না। 'কালেন বিন্দতি' তো আছেই। কিন্তু সে যে কোন কালটা, তা কি ভগবান বলে দিয়েছেন? কে জানে আজ বাদে কাল, অথবা আজই—এই এখনই সেই কাল নয়? তৃষ্ণায় যার ছাতি ফাটে, সে কি আর 'সবুরে মেওয়া ফলে' শুনতে পারে? সে বলে, 'আমার এক্ষুণি চাই, সে জন্য কি করতে হবে বল, আমি সব পারব।' পুরুষকারের প্রবল উন্মাদনা তাকে পাওয়ার নামে উতলা করে। দুর্দ্দান্ত ছেলের আব্দার মা না রেখে পারে না। দুচারটা চড়কিল দিলেও যখন ছেলে নিরস্ত না হয়, তখন তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিতেই হয়।

শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি বা এই জগৎ থেকে আমরা অহরহঃ কেবল পাওয়ার কথা—আশার কথাই শুনি। যে সমস্ত আপাতনিরাশার কথা শুনি, অপেক্ষা করলে তারও পরিণাম শুভ ও আশাপ্রদই হয়। জগৎ দুঃখময় বলে যে দর্শন গোড়াতেই দুঃখ দিয়ে সুরু, তাও শেষে আনন্দের সন্ধান দিয়েই সমাপ্ত হয়েছে। চরম দুঃখ মরণের পরেও আবার নবশক্তির উদ্বোধন রূপে নূতন লোকে জন্মের বিধান! শীতই শেষ নয়, পরক্ষণেই বসন্ত। আঁধারের পাশেই আলোর ব্যবস্থা। এই স্থূল রাজ্যের এসব অনুভূতি যেমন আমাদের সহজ বোধগম্য, সূক্ষ্মেরগুলি তেমন হয়ে উঠে না বলেই আমাদের অবিশ্বাস ঘুচাতে শাস্ত্রের প্রকাশ। যাঁর সে অবিশ্বাস নাই, উর্দ্ধলোকের জ্যোতিঃপ্লাবিত হয়ে যিনি আপনার মাঝেই প্রচণ্ড বেগ অনুভব করেন, তাঁর পক্ষে গতানুগতিকতা প্রয়োজন নাই! তাঁর চলার ভঙ্গীই নূতন শাস্ত্র গড়ে তোলে। সেই মহাপুরুষের পথচিহ্নই অপরের পক্ষে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠে।

কিন্তু প্রত্যেকের জীবনেই এই মহাপুরুষত্বের দাবী রয়েছে। ভগবান বলেছেন বটে, 'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' কিন্তু কে জানে তুমিই যে সেই কশ্চিৎ নও? বরং প্রত্যেকেরই মাঝে যখন 'আমার মত কেউ নয়' বলে অহঙ্কার রয়েছে, তখন 'আমিই পাব আমিই তাঁর প্রিয়' এমনি ধরণের নীরব অভিমান খুবই ভাল। যাতে মন ভাল থাকে, তেমনি ধরণের দুচারটা অভিমান থাকলেই কি দোষের হল? বস্তুতঃ অমন নীরব অভিমানই আত্মবিশ্বাস! লোকের কাছে বলে না বেড়িয়ে যে আপন মনে তাঁর ভজনা করে, সেই যথার্থ আত্মবিশ্বাসী। তাঁর পক্ষে অমন অভিমান স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মপ্রচারে তাঁর প্রেম লাভ হয় না। যথার্থ যদি ভালবাসা যায়, তবে কি সে কথা কেউ মুখ ফুটে বলে? 'আমি তাঁর, আমি বিশ্বব্যাপী' এগুলিও তেমনি বাইরে শুধু বলার কথা নয়, ভিতরে অনুভবের বস্তু।

শাস্ত্রে যা শুনেছি, তাই যে আমার জীবনে সব সময়ে প্রকট হবে, তাই বা কোথায় পেলাম? শাস্ত্রের কথা কি সবই বুঝে ফেলেছি? আমার না বুঝার অংশ থেকেও তো কত কিছু জীবনে ঘটতে পারে! কজনে তার ব্যাখ্যা দিবে? হয়ত পাওয়ার পরে সে কথা শোনাতে গিয়ে আমিই দেখব যে অন্য আকারে শাস্ত্রে তার প্রকাশ রয়েছে বা নাই। তখন আমিই হয়ত নূতন একটা পথের আবিষ্কারক বা শাস্ত্রবাক্যের নূতন ব্যাখ্যাতা হতে পারি! এমনি হয়েছে বলেই তো জগতে, বিশেষ করে ভারতে নিত্য নূতন সিদ্ধ মহাপুরুষ নিত্যনূতন আধ্যাত্মিক ভাবের

উদ্বোধন এনে এত মত ও পথ আবিষ্কার করে গেছেন। কে জানে অনন্ত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ভগবান পঙ্গুকে দিয়েই গিরিলঙ্ঘন না করাবেন ?

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'One cannot bathe twice in the same stream'—এক স্রোতে দুবার স্নান হয় না। আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যে বস্তু যে ভাবে গ্রহণ করি অপরেও সে ঠিক তেমনি করে তাকে বলতে পারে ? শক্তি অনুযায়ী গ্রহণের তারতম্য হবেই। একই খাবারে কারও হয় অসুখ, কেউ থাকে সুস্থ। একই দৃশ্যে, গানে, স্পর্শে বা ঘ্রাণে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির বা অনুভূতির উদ্বোধন হয়। তবে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বেলাতেই কি তা হবে না ? নিশ্চয় হবে। প্রত্যেক সাধনপন্থাই বিভিন্ন জীবনের আবেষ্টনীতে নূতন রসের উদ্বোধক, নূতন অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হতে পারে। হয়ত পরিণামে সব গিয়ে একজায়গায় মিলতে পারে, কিন্তু সাধনপন্থায় প্রত্যেক তেজীয়ান্ সাধকেরই বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে ও থাকে। তাই তাঁরা পরিণামে এক একটা সম্প্রদায়ের চূড়া বা আবিষ্কারক হন। এই দিক দিয়ে বলতে গেলে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র সৃষ্টি আর যাই হোক, সাধনপথে শক্তিমান্ সাধকের বৈচিত্র্য প্রমাণ করে।

মোট কথা, আমিই চৈতন্যময়, পথ জড়—এই না হয়ে যেখানে পন্থাই সচল, পথিক অচল, সেখানে পথিকেরই মাটী চাপা পড়বার সম্ভাবনা বেশী। শাস্ত্র অন্ধকার দূর করে, আত্মজাগরণের জগদ্দল পাথররূপী কুসংস্কারকে দূর করে যদি সত্যের দিকে, ধ্রুবের দিকে আমাদিগকে দিন দিন উদ্বুদ্ধ না করে, আকুল না করে, সত্যলাভের দিকে একটা দুর্দ্দম বীর্য্যোৎসাহ বা তেজের সঞ্চার না করে, তবে বুঝতে হবে, সে প্রাণহীন শাস্ত্রপাঠে কোনও ফল নাই। বরং আপনাকে খুঁড়ে খুঁড়ে যা পাওয়া যাবে, তাই একদিন শাস্ত্রের মহিমা নূতন ভাবে প্রচার করবে।

আলোচনা

—*—

কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সংশয় অবশ্যম্ভাবী, পদে পদে অকৃতকার্য্যতার বিভীষিকায় মন ভীত। এই মনের উপরও আত্মার অপ্রতিহত প্রভাব রহিয়াছে। যাঁহারা অমোঘ আত্মিক বল নিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টা কোন দিন ব্যর্থ হয় নাই। শক্তিশালী সাধকগণ অহরহঃ তপঃপূত প্রচেষ্টা দ্বারা, নব নব পথ আবিষ্কার করিয়া দেশবাসীর প্রাণে সৎসাহসের সঞ্চার করিতেছেন। দেখিতেছি, অসম্ভব বলিয়া কোন কথা নাই। আত্মশক্তি নিয়া যাঁহারা কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই মানুষের কল্পনাতীত কার্য্য অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়া আত্মবলের অশেষ সম্ভাব্যতার পরিচয় দিতেছেন। আজ দেশের বিচিত্র ঘটনায় এরূপ প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, কয়েক বৎসর আগে হয়ত এই সম্বন্ধে আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। সব দিকেই পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে যে

উত্তেজনার প্রমত্ততা নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু প্রাণশক্তির যখন সঞ্চার হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবেরও সন্ধান সকলে পাইবেন। আপাত বিক্ষোভ দেখিয়াই নিরাশ হইয়া যাওয়ার কোন কথা নাই। আন্দোলনকে আমরা চরম বলি না, আবার একেবারে নিঝুম অবস্থাকেও চরম বলি না—সত্য বিক্ষোভ এবং প্রশান্তি উভয়কে নিয়া। আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবের প্রশস্ত বক্ষে চঞ্চলতার তাণ্ডব নৃত্য—বারিধির অতল সমাধির ন্যায়, একদিকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ অপর দিকে অন্তরের অবিচল প্রশান্ত আত্মমহিমা। সুতরাং দেশের সমস্ত আন্দোলনের মূলেই দেশসেবকের অন্তর্মুখী আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবেরও অতীব প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই দিক দিয়া মহাত্মা গান্ধীই আদর্শ। ঝড়ের আগে যেমন সমস্ত প্রকৃতি নিঝুম না হইয়া প্রচণ্ড ঝড় হয় না, তেমনি যে কোন আন্দোলনের মূলেই যদি একদিকের আবার শান্ত স্তব্ধ ভাব না থাকে, তাহা হইলে সেই আন্দোলন স্থায়ী হয় না এবং তাহাতে কোন স্থায়ী ফলও হয় না। সকলের মন যদি এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠে, তাহা হইলে বিবিক্ত সাধনায় আর কোন প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে যাহাতে আদর্শের মালিন্য না ঘটে। বিবেকশূন্য উন্মত্ততা কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় নয়। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—আত্মজ্ঞানেই নিখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি।

* * *

প্রয়োজন হইলে যে জাতি সব করিতে সক্ষম, তাহাকেই বলিব জীবন্ত জাতি। কি আধ্যাত্মিক, কি লৌকিক সর্ব্বত্রই তীব্র সংবেগ না থাকিলে ইষ্ট সিদ্ধি হওয়ার আশা করা বৃথা। মরণ পণ সংকল্প চাই। ভাবী সৃষ্টির ইহাই হইল মূল উপাদান। আসল কথা হইল প্রাণশক্তি নিয়া। প্রাণ ত্যাগ শেষ উপায়, আরও কত উপায় আছে। লক্ষ্যে পৌঁছিবার নিদারুণ আকুলতা যাহাদের ভিতর জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কিছুতেই দমিবে না। দেশের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের বহিরঙ্গ ত্যাগই একমাত্র প্রশংসনীয় কিম্বা আদর্শ হইতে পারে না। এই ত্যাগের পেছনে যে প্রচণ্ড আত্মশক্তির প্রশান্ত মহিমা রহিয়াছে, তাহাই খাঁটী জিনিষ। দেখাদেখি ত্যাগ অনেকেই করে বটে, কিন্তু মূলে আত্মশক্তির মহিমা না থাকায়, ত্যাগ দুদিন যাইতে না যাইতেই অনেকের কাছে দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। আমরা অনেক সময় বাহিরটাকেই কদর করি বেশী, কিন্তু আসল জিনিষ রহিয়াছে অন্তরে। কেন্দ্র হইতে যদি তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবে সেই তরঙ্গ কেবল অগ্রসর হইয়াই চলিবে, কেননা তাহা মহাশক্তির সহিত সংযুক্ত। আজ দেশের সর্ব্বত্রই প্রাণের সঞ্চার প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে, কিন্তু সকলের প্রাণই কেন্দ্র হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই। বাহিরের শোনা কথার সাময়িক উচ্ছ্বাসই অধিক। প্রাণ দেওয়ার মূলে ভাবের ভিত্তি সকলেরই সুদৃঢ় নয়। তবুও এই নিদ্রিত দেশে এইটুকু জাগরণই যথালাভ। আসল নকল সকল মিশিয়া যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, ইহার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিণতির প্রত্যাশা আমরা রাখি এবং সমবেদনাভরে স্নিগ্ধ হৃদয়ে এই আপাতচঞ্চলতার পরভাবী প্রশান্তিরই প্রতীক্ষা করি।

* * *

'সবুরে মেওয়া ফলে' ইহাও পরখ করিয়া দেখিবারই কথা। ধৈর্য্য ধরিয়া থাকার ফলে যদি মেওয়া ফলা দূরে থাকুক কিছুই না ফলে, তাহা পরিতাপের বিষয়। কল্পিত আশ্বাসে অনেক সময় আমাদের নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে। প্রকৃত নির্ভরতায় অন্তরে অবসাদ আসিবার কথা নয়, কেননা আত্মসমর্পণকারীর চিত্ত সদা জাগ্রত। অন্তরে বাহিরে সামঞ্জস্য

হইলেই বুঝিব যে, বাহিরের কথার মূল্য আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিজের অন্তরের খাটী সুখ দুঃখের বেদনাকে অবজ্ঞা করিয়া পরের কথায় মজিয়া আপন লক্ষ্য ভুলিয়া যাই। সার্ব্বভৌম উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তাহার সার্ব্বভৌম ক্রিয়া হইবে তাহার কোন গ্যারাণ্টি নাই। আসল কথা হইল—সর্ব্বদা অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তারপর বিধি-নিষেধের তাৎপর্য্য গ্রহণ। জাগ্রত অন্তরকে উপবাসী রাখিয়া, বাহিরের অনুকরণে কোন ফলই হয় না। প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান নিজের অন্তরের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। প্রতীক্ষা করিব বটে, নিশ্চেষ্ট হইয়া নয়; প্রতীক্ষায় অন্তরকে প্রশান্ত রাখিবে, অস্থির উন্মাদনায় অধীর হইতে দিবে না, শক্তিকে সংযত করিবে।

* * *

ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিবিষ্ট ভাবেরও সামঞ্জস্য থাকা চাই। যাহারা নীরব কর্ম্মী, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মও সম্পাদন করেন, আবার সর্ব্বদা আত্মকেন্দ্রেও মনকে নিয়োজিত রাখেন। খাঁটী কাজ নীরব কর্ম্মী ছাড়া হইতেই পারে না। উত্তেজনাবিহীন আনন্দও আছে, এই আনন্দের আস্বাদন যাহারা পাইয়াছে, তাহারা অলস হইয়া বসিয়া থাকে না, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অযোগ্য নয়; তাহারা কাজ করে, কিন্তু কোলাহল করিয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিতে চায় না। লক্ষ্যকে জাগ্রত রাখিবার জন্যই কর্ম্ম, কোন সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির দরুণ নয়। দেবশক্তিদ্বারা পশু শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সমস্যা উত্থিত হইবেই, উদার বক্ষে স্থান দিয়া ধৈর্য্যের সহিত সব দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া মীমাংসার পথ দেখিতে হইবে।

* * *

চিন্তার প্রভাব তুচ্ছ নয়। কর্ম্ম করিবার আগে কর্ম্মের চিন্তা জাগে। আপাততঃ সফল না হইলেও যে উহা ব্যর্থ, বা মিথ্যা, তাহা মনে করা ভুল। ব্যক্তকে কুক্ষিগত করিয়া অব্যক্তের বিলাস। কথা বলি আমরা কয়টা? অন্তরের চিন্তার লহর বাহিরের মৌখিক অভিব্যক্তি হইতে বেশী নয় কি? প্রকাশ করিবার ভঙ্গী বিচিত্র হইয়া থাকে, কিন্তু একই চিন্তা ছোট বড় সকলের ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে। যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, অথচ ক্ষমতার পরিচয় দেয় না, এমনও তো লোক আছে। ক্ষমতার পরিচয় না পাইলেই কি বলিব তাহাদের ক্ষমতা নাই? যাহারা বাস্তবিকই শক্তিধর তাহাদের শক্তির মহিমা এক ভাবে না একভাবে সকলের মাঝে ক্রিয়া করেই করে।

* * *

যাঁহারা নিছক্ কল্যাণচিন্তায় তন্ময় হইয়া আছেন, তাঁহাদের আমরা প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করি। দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবার দরুণ একদিকে যেমন চাই অবিশ্রাম কর্ম্মযোগ, অপর দিকে ত্যাগী সন্ন্যাসী হৃদয়ের নিগূঢ় আত্মসমাধান। ব্যাপ্তি স্বতঃই হইবে, চাই আত্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা। শান্ত হইয়া কাজে লাগিতে হইবে। হুজুগে মাতিয়া কোন ফল নাই, অথচ হুজুগকে বাধা দেওয়াও সব সময় প্রয়োজন নয়। হুজুগ চলুক হুজুগের মত; অভাববোধ যত গভীর হইবে, হুজুগ ততই কমিয়া আসিবে। যাঁহারা বুঝদার, তাঁহারা তীব্র হুজুগের মাঝে কল্যাণকামনায় ভরপুর থাকুন, শান্তমনে প্রতীক্ষা করুন। আত্মকর্ম্মে ক্রটী না হয়, ইহাই আসল কথা। একই তরঙ্গ চিরদিন থাকে না; দেশে এক একবার এক এক তরঙ্গ উঠে, তাহা আমাদের এক এক শিক্ষা দিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের বুদ্ধি লইয়া ভারতের মর্ম্মেতিহাসটী তলাইয়া বুঝিয়া, কোথাও দুকথা বলিতে হইবে, কোথাও চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে, কোথাও বাধা দিতে হইবে;—সবই

সদ্বিবেচনার কথা, ঠাণ্ডা মাথায় তলাইয়া বুঝিবার কথা। যা হওয়া উচিত, তাই সর্ব্বত্র হইতেছে কি? যাহা হইয়া গেল, তাহার জন্য অস্থির হওয়াই বা কেন? দেশের কল্যাণ আদর্শ চিন্তায় যত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, কর্ম্মক্ষেত্রের চঞ্চলতা ততই কমিবে। যাঁহারা আজ এই অন্তর্ম্মুখীনতার আদর্শকেই সবলে মনন করিতেছেন, যথার্থ দায়িত্ব তাঁহাদের হাতেই রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। বিচারে অগ্রসর অথচ আচারে পশ্চাৎপদ—ইহা অসামঞ্জস্য। কর্ম্মশক্তি চিন্তাশক্তি উভয়ই সমজাগ্রত হইবে, সুবিবেচিত চিন্তাকেন্দ্র হইতে কর্ম্মচেষ্টা বিকীরিত হইবে, দেশের অধিকাংশ প্রাণে এই সামঞ্জস্যের ভাব ফুটিয়া উঠুক—তবেই যথার্থ কল্যাণ হইবে, আন্দোলন সার্থক হইবে, দেশসেবা চরিতার্থতা লাভ করিবে।

শেষ ঝলক

—*—

শির পেতে নে আজকে তোরা
　অস্ত-রবির ওই ঝলক্—
দান করে যায় জীবন ভরে'
　দেয় না বিরাম এক পলক!

ওই দেখে যা রক্তরাগে
　রাঙিয়ে দেছে চক্রবাল—
বিদায়-শেষের ম্লান হাসিটুক্
　বিলিয়ে হল অন্তরাল!

অমনি করে জগৎ তরে
　নিঃশেষে সব বিলিয়ে যাস্;—
রাখিস্ নে রে মনের কোণে
　ফিরিয়ে পাবার একটু আশ।

তবেই জীবন মহান্ হবে
　মরণ হবে রঙমহাল—
আনন্দময় শেষের সাঁঝও
　আনন্দময় সেই সকাল

আরণ্যক

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

সংসার কি? ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন। আর মুক্তি? বৃহৎ স্বার্থে আত্মপ্রসার।

*

নিদ্রালস্য প্রমাদও কম সুখের নয়—সুখময়ী নিদ্রা সর্ব্বসন্তাপহরা। পুত্রশোকাতুরার শোক, ক্ষুধিতের ক্ষুধা, তৃষিতের তৃষ্ণা সব সে ভুলিয়ে দেয়। প্রমাদ বা ভুলে থাকাটাও তেমনি মন্দ নয়—যদি ভুলে থাকা যায়! কিন্তু এমনি মজা যে তা হয় না। এক সময় না এক সময়ে ভুল, নিদ্রা ভাঙ্গেই, সেই দুঃখ পেতেই হয়। তাই এসমস্ত দুঃখেরই প্রতিরূপ। গীতা বলেন, এ সুখ তামসিক সুখ। সংসারে মজে থাকার যে সুখ, তাও এই ঘুমিয়ে থাকার সুখের মত। ঘুম ভাঙ্গলেই কাঁদতে হবে—এবং সে ঘুমও সুনিদ্রা নয়।

*

মনটা তো চায় সকলই। এর মধ্যে যেটা অত্যন্ত প্রবল হয়ে মরণকালের দুঃখের মাঝেও থাকে, সেইটাই পরকালের নিয়ামক বা ভোগের ব্যবস্থাকারী।

*

শুধু চাইনা মুখে বল্‌লেই হবেনা—মন থেকেও মুছে ফেলতে হবে। আসক্তি থেকেই স্মৃতি বা সংস্কার জাগে। সেই সংস্কার নষ্ট হয়ে গেলে মনের মাঝে প্রত্যেক বস্তুর গুণ বদলে যায়, অর্থাৎ উত্তেজক না হয়ে উদ্দীপক হয়, কাম না হয়ে প্রেমের হয়, ক্রোধ না হয়ে তেজ হয় ইত্যাদি। এম্‌নি প্রথমে ত্যাগ, পরে নিরপেক্ষতা এবং তারপরে শুভ সংস্কার উৎপন্ন হলে ভাগ্য বা ভোগের রূপ বদলে যায়। তারই নাম অনাসক্ত ভোগ। সম্পূর্ণ এপিঠ ওপিঠ; ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

মনের কোণে পাপ, যেন জ্বরের তাপ। সাদা চোখে তা দেখা যায় না বটে, কিন্তু গায়ে হাত দিলেই টের পাওয়া যায়। লুকাবার যো নাই। প্রথমে পরের মনে, তারপরে প্রত্যক্ষে ধরা পড়বেই। তবে দু'দশ দিন আগুপিছু মাত্র। কিন্তু মনেই যদি তাকে শুভ চিন্তার আশ্রয় দিয়ে আবিষ্ট করা যায়—তবেই রক্ষা।

*

আনন্দ-মুহূর্ত্তে 'এদিন চিরদিন থাকবে না'—এ কথা মনেপ্রাণে ঠিক আসে না। সে ক্ষণটুকু বিভোর হয়েই কাট্‌তে চায়। দুঃখের সময়টায় কিন্তু সেটা এড়িয়ে আনন্দ চায়। কাজেই মনের স্বভাব বা ইচ্ছা আনন্দে থাকা। কিন্তু তাকে রাখা মানুষের হাত। দুঃখের অনুভূতিও যদি আনন্দের বলে তাকে গ্রহণ করতে শেখানো যায়, তাই হবে বেদান্ত।

*

সত্যসাধকের আনন্দেও স্থির থাকা চাই। দুঃখে, বিপদে মনের প্রহরী সজাগ থাকে। সে সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বিপদ যতটা আসবার সুবিধা পায়, তার চেয়ে ঢের বেশী সুযোগ পায় আনন্দ-মনের অসতর্ক অবস্থায়। দুঃখ বা সাধন-পথের বেগ বরং সহনীয়, কিন্তু সিদ্ধির মোহনায় যে আনন্দবেগ, তা দুঃসহ। সমুদ্রের মত গম্ভীর হলে, তবেই সে সে বেগ সামলানো যায়।

*

সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফেঁপে উঠে, আর দিকে দিকে নদনদীতে জোয়ারের বান ডেকে যায়। একটী মাত্র আকুলপ্রাণ ভক্তের আবেগে শ্রীভগবান ধরা দেন, আর চতুর্দ্দিকে ভক্তির জোয়ার—প্রেমের বন্যা সুরু হয়। গলাবাজী করে শক্তি সংক্রমণ হয় না। একটী প্রাণের উদ্বোধনে বিশ্বপ্রাণ জাগিয়ে তোলে। তা হয় নীরব সাধনায়।

দানপ্রাপ্তি



জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রমে—

(শিষ্য-ভক্ত হইতে—)

মাগুড়া কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত ভেলুরাম বর্ম্মা ২৫৲ শ্রীযুক্ত টাহিরা বর্ম্মা ১৬৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন সেন ১৫৲ শ্রীযুক্ত চাটাম বর্ম্মা ৯৲ শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন সেন ৯৲ শ্রীযুক্ত বটেশ্বর বর্ম্মা ৫৲ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন ৩৲ শ্রীযুক্ত অঙ্গরায় বর্ম্মা ২৲ শ্রীযুক্ত হেদেলা বর্ম্মা ২৲

জগদ্দল—দ্বারিকামারী—শ্রীযুক্ত রাজমোহন সরকার ২০৲ শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় প্রথম দফে—৫৲ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় ১৲

গাভরা কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ ২৫৲ শ্রীযুক্ত পদকান্ত রায় ২০৲ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় ১০৲ শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় ৫৲ শ্রীযুক্ত চণ্ডীমোহন রায় ৫৲

চান্দামারী কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রায় বর্ম্মা ৫৪৲ শ্রীযুক্ত শব্দলাল বর্ম্মা ২১৲ শ্রীযুক্ত ধুলারাম পাল ২০৲ শ্রীযুক্ত কান্দুরা রায় ১৭৲ শ্রীযুক্ত খোদন রায় ১৮৲ শ্রীযুক্ত লঙ্কেশ্বর রায় ১০৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত রায় ৯৲ শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন রায় ৯৲ শ্রীযুক্ত বুদ্ধেশ্বর বর্ম্মা ৯৲ শ্রীযুক্ত জগমোহন বর্ম্মা ৭৲ শ্রীযুক্ত অশোকলাল রায় ৬৲ শ্রীযুক্ত শূদ্রকান্ত বর্ম্মা ৬. শ্রীযুক্ত লবামু রায় ৬৲ শ্রীযুক্ত শ্রীমতিসিং রায় ৬৲ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন রায় ৬৲ শ্রীযুক্ত চন্দু রায় ৬৲ শ্রীযুক্ত রতিকান্ত বর্ম্মা ৫৲ শ্রীযুক্ত প্রেমকান্ত রায় ৫৲ শ্রীযুক্ত জয়নাথ রায় ৫৲ শ্রীযুক্ত ২ল্লন সিং ২৲

জেলা দার্জ্জিলিং

শিলিগুড়ি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার ১০৲

হাঁস খোয়াড়—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় ২৲

(সাধারণ হইতে)

ফাঁসীদেওয়া—শ্রীযুক্ত কালা বণিক ৫৲ শ্রীযুক্ত সুরতলাল বসাক, ডাক্তার ২৲ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত সাহা ২৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র মোদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মোদক শ্রীযুক্ত রাম খেলন বণিক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী হেডমাষ্টার

খালপাড়া— শ্রীযুক্ত লবণ সিং ২৲। এক টাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত মঙ্গলু রায় শ্রীযুক্ত বাবুলাল সিং শ্রীযুক্ত পদকান্ত রায় শ্রীযুক্ত জয় সিং শ্রীযুক্ত সুকুর চাঁদ (১) শ্রীযুক্ত সুকুর চাঁদ (২) শ্রীযুক্ত তিলক সিং শ্রীযুক্ত ধন সিং শ্রীযুক্ত রঘু সিং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ সিং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল। শ্রীযুক্ত বাধল সিং ।৵০ শ্রীযুক্ত সুকুর চাঁদ (৩) ।০

মহীপাল জোত—শ্রীযুক্ত পতিকান্ত রায় ৩৲ শ্রীযুক্ত হরিকান্ত রায় ৩৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত ঘিকিলিং রায় শ্রীযুক্ত হবল সিং শ্রীযুক্ত ছিলু সিং

কান্তি ভিটা—শ্রীযুক্ত ঢুধারাম রায় ২৲ শ্রীযুক্ত কালু সিং ২৲ শ্রীযুক্ত বুড়াকামী সিং ২৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ সিং শ্রীযুক্ত লেক নাই সিং শ্রীযুক্ত স্বরূপ চাঁদ শ্রীযুক্ত ওনেশ্বর দেবশর্ম্মা।

লেম্বুটারী—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় ২৲ শ্রীযুক্ত বদন সিং ২৲ শ্রীযুক্ত ভবল সিং ২৲ শ্রীযুক্ত আমার গণেশ ২৲ শ্রীযুক্ত হাওয়া সিং ১৲

লছুভিটা—শ্রীযুক্ত পরাশর সিং ৭৲

ধামনাগছ—শ্রীযুক্ত ফুলেশ্বরী বেওয়া ২৲

সাহাসন জোত—শ্রীযুক্ত খুলালন সিং ৪৲ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সিং ৪৲ শ্রীযুক্ত গর্জনাথ রায় ১৲

দনিজোত—শ্রীযুক্ত ভুগু সি, ২৲ শ্রীযুক্ত বুধু সিং ২৲

কদমি জোত—শ্রীযুক্ত সরমোহন রায় ২৲। একটাকা করিয়া—উমেশচন্দ্র রায় যোগেন্দ্র নাথ রায়

উমাকান্ত জোত—শ্রীযুক্ত গেরু সিং ১৲

নিজবাড়ী জোত—দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্ত ভালন সিং নরেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীযুক্ত অবুর সিং ১৲

হাঁস খোয়াড়—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ মুখার্জী ম্যানেজার ভোজনারায়ণ টি কোং ৪৲ শ্রীযুক্ত রতীন্দ্রনাথ চতুর্ব্বেদী ১৲ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সরকার ॥০।

খড়িবাড়ী—শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ রায় সরকার ১৫৲ শ্রীযুক্ত নীরদ বাবু ৫৲ শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ রায় ২৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—কফুরচন্দ্র সিংহ নিতাই সিংহ গুরুপ্রসাদ সিংহ রতন সিংহ বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী রামবল্লা সিংহ মেঘলাল সিংহ কনক সিং ধনেশ্বর সিং ঢুষারাম সিং। চারি আনা করিয়া—শ্রীযোগেন সিংহ শ্রীপ্রসাদেশ্বরী বর্ম্মাণী।

ভাতা জোত—শ্রীযুক্ত কহিনুরপ্রসাদ রায় চৌধুরী ৭৲ সুরথচন্দ্র রায় চৌধুরী ৪৲ লক্ষ্মীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

কেশুরডোবা জোত—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় ২৲ একটাকা করিয়া—বিরিক রায় রতনলাল রায়

টারী জোত—শ্রীযুক্ত সহদেব রায় ৪॥০

কুকরাজোত—শ্রীযুক্ত বেদেং গণেশ ৪৲। দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—জোনাকু সিং দিনভোলা গণেশ। শ্রীযুক্ত ভক্তলাল গণেশ ১৲

বিন্নাবাড়ী—শ্রীযুক্ত থনারাম সিং ২৲

গায়ন জোত—দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ জোনাকু সিংহ খোদনলাল রায়। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায় মতিলাল রায় বঙ্গেশ্বর সিংহ নিসাবু সিংহ কেরকু সিংহ মাঝিলাল সিংহ আট আনা করিয়া শ্রীযুক্তাঃ—হবলাল সিংহ ভালুক সিংহ।

অধিকারী—শ্রীযুক্ত বস্তি রায় ৩৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—ভেটু রায় গাধর রায় বাগুরু রায় রূপলাল রায় বচন সিং। শ্রীযুক্ত কনকলাল সিং ।০

পানিশালি—শ্রীযুক্ত খেলারাম রায় ২৲ শ্রীযুক্ত লেভিসিং (১) ১৲ শ্রীযুক্ত লেভিসিং (২) ॥০

নাকশল বাড়ী—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় ২৲ শ্রীযুক্ত জিহালাল কর্ম্মকার ১৲। বাগডোগরা—শ্রীযুক্ত ছগনলাল বাবু ২৲ শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার কার্যী ১॥০ রাণীগঞ্জ শ্রীযুক্ত হীরাসিংহ ১৲

জেলা পূর্ণিয়া

ফটামারি - শ্রীযুক্ত মাখনলাল দাস ৭॥০ শ্রীযুক্ত রতনলাল দাস ৩৲। চকচকি—শ্রীযুক্ত বড়ম সিংহ১॥০

মালিগছ—শ্রীযুক্ত সাতালু সিং ২৲। করণগছ—শ্রীবাংঠু রায় ১৲। হেড়াগছ—শ্রীহলকলাল রায় ১।০ শ্রীসন্তুলাল সিংহ ১৲ শ্রীকমলাকান্ত রায় ২৲ রাঙ্গাগছ—শ্রীসুবলচন্দ্র রায় ৫৲ শ্রীকইর সিং রায় ২৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ উধর সিং অশোক লাল রায় ধরণীমোহন রায়। দুলালী—শ্রীগোবর্দ্ধন সিংহ ১৶০ শ্রীপৃথ্বীলাল সিংহ ১॥০। বলাইগছ—শ্রীসন্তরাম সিংহ ২৲। কুকরাজোত—শ্রীনলিনীকান্ত রায় ১৲

জেলা জলপাইগুড়ি

গাড্‌রা—শ্রীরুক্মসুন্দর সিকদার ৫৲ শ্রীহরিপদ ডাক্তার ৩৲ শ্রীইন্দ্রমোহন রায় ২৲। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ ভোগনারায়ণ সিংহ রুদ্রকান্ত রায় জনৈক হিতৈষী। শ্রীদুর্য্যকান্ত রায় ॥০। মাগুড়া—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ পর্ত্তনচন্দ্র সেন হরিদাস সেন অশোকান্ত বর্ম্মণ অশোকান্ত চৌকীদার।

পশ্চিম বাঙ্গালা সরস্বত আশ্রমে—

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—জি, সি, মিত্র জনৈক উকীল, কে, ডাম্‌জী কাচ্ছি, রজনীভূষণ মুখোপাধ্যায় ডাঃ পরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি রামকিঙ্কর মাঝি, কেশবচন্দ্র জানা পরমানন্দ দে, লালমোহন নন্দী, চৌঃ গিরীশচন্দ্র মহাপাত্র, হরেকৃষ্ণ নন্দী, চৌঃ গৌরহরি দাস মহাপাত্র, হরিচরণ পুরিচ্ছা, গৌরমোহন অধিকারী, ব্রজলাল গিরি, মহেন্দ্রনাথ গুচ্ছাৎ, ডাঃ সাধুচরণ ঘোষ, চৌঃ গজেন্দ্রনাথ রায়, রাজীবলোচন কর মহাপাত্র, বাবু মাইতি, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী, গিরীশচন্দ্র গিরি, অক্রুর মণ্ডল, লোকনাথ মাইতি, গোপীনাথ কুণ্ড, ত্রৈলোক্যনাথ ভূঞা, লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি। রায় বাহাদুর শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় ১০৲ চিন্তামণি অধিকারী ১৲ খুচরা ৫৲

সংবাদ ও মন্তব্য

জন্মমহোৎসব

আগামী ২৪শে শ্রাবণ শনিবার ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মদিবস উপলক্ষে কুতুবপুর গুরুধামে (পোঃ কাথুলী, জেলা নদীয়া) মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সাধু, ভক্ত এবং আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবৃন্দকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। গুরুধামেই সার্ব্বভৌমভাবে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল বিভাগের ভক্তগণেরই উৎসবে যোগদান বাঞ্ছনীয়।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ স্বয়ং উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।



২৩শ বর্ষ | ১ম খণ্ড।
শ্রাবণ—১৩৩৭
সমষ্টি সং ২৪৪ | চতুর্থ সংখ্যা

বলম্ উপাস্স্ব

—*—

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে, স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি; বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌঃ বলেন পর্ব্বতা বলেন দেব-মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্ব ইতি ॥৭।৮॥১

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"বল অর্থাৎ মনের প্রাংভাশক্তি বিজ্ঞান হইতেও অধিক। একজন বলবান্ পুরুষ বিজ্ঞান সম্পন্ন একশত জনকেও কম্পিত—পরাজিত করিতে পারেন। মানুষ যখন বলবান হয়, তখন সে উত্থিত হয় অর্থাৎ আলস্যাদি দোষ ত্যাগ করিয়া উদ্যমশীল হয়। উত্থানশীল হইলে গুরুর পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হয়, পরিচর্য্যা-পরায়ণ হইলে গুরুর অন্তরঙ্গ হইতে পারে; গুরু সমীপে উপসন্ন হইয়া তখন সে দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, বোধ করে, তদনুরূপ কার্য্য করে এবং পরিশেষে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেও সমর্থ হয়।" অতএব বলের উপাসনা কর—বলের উপাসনা কর।

"বলেই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলেই অন্ত-

রীক্ষ অবস্থান করিতেছে, বলেই দ্যুলোক অবস্থান করিতেছে। বলেই পর্ব্বতসমূহ দাঁড়াইয়া আছে, বলেই দেবতা, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-বৃক্ষ, শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তুগণ অবস্থান করিতেছে, এমন কি কীট-পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত বলের দ্বারাই অবস্থান করিতেছে। অতএব বলের উপাসনা কর—বলের উপাসনা কর।"

—সত্যেরই জয়, হয় কিন্তু সত্য—সে এক মহাবল। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সত্য—সত্যের পথে প্রচোদিত করে সত্য। সত্যকে ছাড়িয়া মানুষ এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

আত্মবল হইতে শ্রেষ্ঠ বল নাই, আত্মাকে জানিতে পারিলে সব জানা হয়। আত্মবিদের অগম্য কিছুই নাই। আত্মাকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন—সমস্ত জগৎ তাঁহার করায়ত্ত। আত্মবিদের যোগ-বিভূতির শেষ নাই।

আত্মাকে জাগাইয়া তোল, নিজকে জাগাইয়া তোল, দেখিবে প্রাণে অসীম বল সঞ্চার হইবে। সে বল অক্ষয় অনন্ত, তাহার শেষ নাই, ক্ষয় নাই। সাধনা বলিতে আর কিছু না, এই আত্মসাধনাকেই বুঝিবে। আত্ম-সাধনা দ্বারাই আত্ম-বল উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে। কাজেই আত্মার উপাসনা কর—বলের উপাসনা কর।

আত্মাকে জানে না বলিয়াই মানুষ অলস হইয়া বসিয়া থাকে। আত্মাকে যে জানিতে পারিয়াছে, সে নিরলস—উদ্যোগী। নির্জীবের মত বসিয়া থাকে কাহারা? যাহাদের প্রাণে বল নাই, যাহাদের মুখে বিষাদের ছায়া লাগিয়াই রহিয়াছে।

যে জাতির প্রাণশক্তি নাই, বলের উপাসনা করিতে জানে না যে জাতি, তাহার আবার উন্নতির আশা কিসের? প্রাণের উপাসনা—বলের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই জাতির আজ এত অধঃপতন। যাহারা আজ উত্থানশীল তাহাদেরই প্রাণের উপাসক বলিয়া জানিবে।

আত্মার যাহাতে জাগরণ হয়, তাহারই চেষ্টা কর। আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে আর সব শত্রু আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে। আত্মজাগরণশীল জাতির শক্তি অমোঘ। তাহারাই দ্রষ্টা—তাহারাই নিয়ন্তা!

একা নয়, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রার্থনা কর। সমষ্টি প্রাণের আকুলতায়, মহাশক্তির আবির্ভাব হইবেই হইবে। চাই শুধু প্রাণ—চাই একত্ববোধ!

শক্তির লোপ হয় নাই। শুধু অন্তরের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইতে হইবে। এই অন্তর্মুখী সাধনালব্ধ দ্বারাই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হইবে।

অতএব মহাশক্তির উপাসনা কর!

উন্নতির-সোপান

—•*•—

কেবল অতিক্রম, অতিক্রম—যা আছি তাই থাকব না, আমি যে জীবন্ত, আমার মাঝে প্রাণ নাচ্ছে যে!

এমনি করেই সাধ করে দুঃখ ডেকে এনে মানুষ এগিয়ে চলে। যা ছিল, বেশ তো ছিল; —তবু আরো চাই।

তার মানেই হল, তুমি দৃশ্যবস্তু হতে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টজীবন হতে আরো বড়—তুমি তার জ্ঞাতা, তুমি দ্রষ্টা!

এতটুকু নিয়ে থাকতে পারিনা, তাই ছটফট করি; এই ছটফটানী দুঃখ ডেকে আনে; দুঃখ আমাদের জাগিয়ে রাখে; জেগে থাক্‌লেই এগিয়ে চল্‌বার চেষ্টা, অতিক্রম কর্‌বার ঝোঁক।

—এই করেই ক্রমোন্নতি হচ্ছে না কি? বর্ত্তমানের কল্পিত পূর্ত্তি বা অপূর্ণতার দরুণ অস্বস্তিই ভবিষ্যৎ উন্নতির এবং সর্ব্বাতিগ আত্ম-মহত্ত্বের সূচক নয় কি?

যতটুকু পেয়েছ, তাতে তুমি সুখী নও—আরো চাও; তার মানেই হল তুমি সবার বড়। কি বলছ, কামনা ছাড়তে হবে! আমি বলি, কামনা বাড়াতে হবে—একটুখানি ছেড়ে সে সমগ্র বিশ্বটাকে গ্রাস কর্‌বে! এই তো কামনার তাৎপর্য্য!

*　　　*　　　*

সব ফীল্ডেই বোধ হয় এমনি "পদ্মপত্রমিবাম্ভসি" হয়ে থাক্‌তে হবে! "আমার" বাহাদুরী কোথাও নাই।

এইটাই জীবনের আসল সুর। কোথাও যে লিপ্ত হওয়া চল্‌লনা! সংসার জানে, আমার দায়িত্ব, অথচ আমার ঘরে আমি দিব্যি সাফা!

এ বড় সুন্দর ফাঁকি। জানিনা তাঁরা কি করেন। একটুখানি সংশয় এখনো মনের কোণে লুকিয়ে আছে—এমনি ভাবা ফাঁকা হয়ে যাওয়া ন্যায্য কিনা!

ঐ সংশয়টুকু দূর করবার জন্যই মাঝে মাঝে কাজে নামতে হয়, "নিজের চেষ্টা" নামক ব্যক্তিটীকে প্রশ্রয় দিতে হয়। দিয়ে কিন্তু বাধাই পাই। পরে ভেবে দেখি কি অপব্যয় হয়েছে। সুতরাং ও বেচারিকে যে মাঠে মারা যেতে হবে, তা কি সে বুঝ্‌ছেনা?

কর্ম্মসংসারীর ভাষায় এ বৃত্তি "মাঠে মারা" বটে, কিন্তু আমি জানি, কর্ম্মসংসারে এমনি নির্লিপ্ত হয়ে থাকা মহাগৌরব, মহাস্বস্তি। সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথের ত্রি-পুরবিহার। কে বলে, এই রিক্ততার মূল্য আছে? কিছুতেই না, সে যে অমূল্য ধন! বৃথা ভেবে মরে মানুষ। আসলে নির্ভাবনাতেই কর্ম্মফল পাকে ভাল।

*　　　*　　　*

বহুদিনের কদভ্যাসে সঞ্চিত অস্বাভাবিকতা দূর কর্‌তেই নির্ম্মম নিষ্পেষণের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সেটা নিজের ওপর নিজে।

তুমি তোমাকে নিষ্পেষণ কর্‌তে পার—পরকে নয়। শুধু এইটুকু পার, তার ভিতর ন্যায়সম্মত কৌশলে বা প্রেমের পরশমণি স্পর্শে এমন বুদ্ধি জাগাতে পার, যাতে সে নিজকে নিজে নিষ্পেষণ

করতে চায়। অথবা তোমার অতি আপন যে, তাকে ঠিক তোমারই মত তুমি নিষ্পেষণ করতেও পার; কিন্তু সে সহস্রে একজন হয়ত।

শিক্ষা দেবার এই নূতন ধারা—নূতন নয়, আসলে সনাতন। এই ধারাই চিরসার্থক সত্য-ধারা। সবার ভিতর আত্মবোধ জাগাও—জাগ্‌তে সাহায্য কর। লক্ষ্যে মন অটুট রাখ। শত সহস্রের দুয়ারে ব্যর্থ হয়েও একটী হৃদয়ে এমনি করে প্রবেশ করতে পারলেই জীবন সার্থক!

* * *

প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত প্রেরণার উৎস খুলে যাক্। জোর করে করাতে গেলে কোন কাজই ইন্টারেষ্টিং হয়না। কাজ অল্প হোক্ বেশী হোক্, সব্বাই প্রাণ থেকে করুক—এই চাই।

কাজের তাড়ায় কাজ করে করে হয়রাণ হবে, এ কক্ষনো কর্ম্মসংসারের প্রাণের কথা নয়। কাজ হবে আনন্দে, ত্যাগে, প্রেমে।

ত্যাগমূলে অপ্রমত্ত আত্মজাগরণ, এই হচ্ছে লক্ষ্য; আর হাতে-পায়ে খাটা তার নিরপেক্ষ উপায় মাত্র। কর্ম্মই কখনো সর্ব্বেসর্ব্বা নয়—কর্ম্মফলে কর্ম্মক্ষয়, কর্ম্মক্ষয়ে চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান বা ভাবের সঞ্চার, আনন্দের উদ্ভব। তা করতে হলেই দেখ, কাজের তাড়ার দায়ে ঠেকে কাজ করাটা নিশ্চয়ই পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করতে গিয়েই তো মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কর্ম্মের জালে আরো বেশী করে জড়ায়। মুক্তিলক্ষ্যে কর্ম্ম হবে অন্তর্মুখী—প্রাণ থেকে তার জোগান আস্‌বে অফুরন্ত; নিজে থাক্‌বে সদানন্দ, নির্ম্মল। এই তো আত্মার বিলাস—সনাতন কর্ম্মরহস্য।

* * *

এটা বোধহয় একটা সত্যি কথা যে, যখন যা দ্বারা যা হওয়া দরকার, তার মনটাকে প্রকৃতিই তখন ঠিক তদ্‌যোগ্য করে গড়ে তোলেন।

দুর্ব্বল দৈববাদীর মত বলে এ কথাটাকে অগ্রাহ্য করতে পারতাম, কিন্তু এখন যেন ভিত্তিহীন ব্যর্থ সবলতার উৎক্রোশটা আর পছন্দ হয়না;—স্বেচ্ছায় বিবেচনাপূর্ব্বক এই দুর্ব্বলতার পথটাই বেছে নিতে হয়েছে। আর আসলে দুর্ব্বল না সবল, তাই বা ঠিক ঠিক কি করে বলি? মনের খেয়াল খুসীকে অগ্রাহ্য করে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা ধরে যে চলা, তা কি দুর্ব্বলের কাজ? দুর্ব্বল কাকে বলে? মন যাকে কানে ধরে ঘোরায়, সেই না দুর্ব্বল? আর যে মনের মন থেকে প্রকৃতির ইঙ্গিত বুঝে জীবনে চলে, সে কি সবল নয়? সবল দুর্ব্বল বিচার ছেড়ে দিলেও এটা আমি স্বীকার্য্য সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি যে, মানুষ নিজের খুসীতে কিছুই করতে পারেনা—তার চেয়ে মহৎ কোন ইচ্ছা দিবারাত্রি তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করছে। যদি সে তার সঙ্গে মিল্‌তে পারে, তবেই তার জীবন সার্থক।

* * *

অন্তর্দৃষ্টি নৈলে পরিচালনা হতে পারেনা। একটা নিয়মের খাপে সকলকে পূরে ফেল্‌তে চাওয়া বর্ব্বরতা।

অথবা পরিচালনা কখনো পরগত নয়, আত্মগত আশে-পাশের মনগুলো বুঝে তুমি তোমাকে সু-কৌশলে চালাবে—এরি নাম পরিচালনা। mass কে organise করা আর সুপ্ত আত্মবোধ আত্মশক্তিকে realise করা আধ্যাত্মিকতঃ একই ব্যাপার।

নেতৃত্ব সম্বন্ধে এই দিক দিয়ে আমরা অপ্রস্তুত তাইতে সমাজ নিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়ি। আসলে নিজের মাঝে যে শক্তি জাগাতে পারছিনা—এই কথাটী মনে রাখ্‌তে হবে; অযথা অপরের উপর চটে ওঠার কোন পৌরুষ নাই। পরকে দায়ী করতে যাওয়া নিজের দুর্ব্বলতার নামান্তর মাত্র।

স্বার্থে-পরার্থে মায়াময় বিনিময়-আসলে যা তাই থেকে যাচ্ছে। অপরের সুখ-দুঃখ তোমাকে বুঝ্‌তে হবে। আত্মমিশ্রণ থেকে আত্মজাগরণ; আত্মদান মানেই আত্মলাভ।

* * *

মিলন-স্মৃতি

—(*)—

যে বাঁশী শুনিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিলাম, বুঝি বা সে আর বাজে না। ঘনঘটায় আচ্ছন্ন আকাশ—কোন্ রহস্যের সূচনা, কি ঘটাইতে কে আসিয়াছে কে জানে! আশার-কুহকে মুগ্ধ হইলেই বুঝি এমনি হতাশ প্রতিক্রিয়া আসে। ভয় করি না, কিন্তু নির্ম্মম প্রতিকূলতায় প্রাণের প্রদীপ নিভাইয়া দিতে চাহিতেছে। যুদ্ধ করিব কতকাল? পরীক্ষা কি শেষ হইল না? একটা অধীর আবেগে প্রপীড়িত করিতেছে। কোন কিছু পাইবার আশা ছাড়িয়া দিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়; সাধ করিয়া, শক্তির অধিক ভক্তি দেখাইতে গিয়া জঞ্জালে জড়াই কেন?

অলঙ্ঘ্য ভবিতব্যতা। তুমি আমাকে দিয়া জোর করিয়া বোঝা বওয়াইবে। ভবিষ্যৎ জানি না, কিন্তু বর্ত্তমানের আভাস প্রাণকে উত্তরোত্তর জ্বালাময় করিয়াই তুলিতেছে। নির্জীবের মত পড়িয়া থাকিতে সে দিবে না;—জীবলোকে শ্রেষ্ঠ জীব হইতে হইবে, শিবত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই যেন এ জ্বলিয়া মরাই নিয়তি—নির্ভয়ে মহাসংসারের প্রমত্ত কোলাহলের ভিতর দিয়াই ঈপ্সিততম স্থানটীতে পৌঁছাইবার চেষ্টা করা হৃদয়ের ধর্ম্ম।

স্বত্বত্যাগ তো করিতে চাই, কিন্তু পারি কই? অকালনৈষ্কর্ম্মের ব্যবসায় ব্যর্থ হয়—এক অলক্ষ্য প্রেরণা অব্যর্থ উৎসাহে জাগিয়া উঠে—কেবল কর্ম্ম, কর্ম্ম—কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া যে উপায় নাই। যতদিন মনে কোন না কোন চেষ্টা আকুলিবিকুলি করিতেছে, ততদিন কর্ম্মই যে অন্ধের যষ্টি। জঞ্জালে না জড়াইয়া সোয়াস্তি নাই;—আবার ভাবদৃষ্টিতে দেখি, যাহা উৎপাত, তাহাই আবদার—অগ্রাহ্য করিয়া পারা যায় কি? আমি যেখানে চাই না, অথচ আমাকে যেখানে চায়—সেইখানেই এই মায়াময় জঞ্জালের না প্রেমের দাসত্ব নবাব প্রভুত্বের সংসার জাঁকিয়া ওঠে না কি? সে সংসারকে অকূলে ভাসাইয়া আত্মসুখে বিভোর থাকিতে প্রাণ মানে কই!

আসল কথা হইল—মুক্তি। কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে বন্ধনের তীব্রতা কসিয়া অনুভব করা চাই। ইহাই প্রাকৃত বিধান। অভাববোধ তীব্র না হইলে বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয় না। স্থূল বুদ্ধির পাটোয়ারী বিচারে নিজের মনের যথার্থ তত্ত্ব মিলে না। অগ্র্যা বুদ্ধিতে ভাবময়ের পরিচয় অতি সহজ। তুমি যাহার জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া খাঁক হইতেছ, সে কি ধরা না দিয়া পারে? তুমি ভাবিতেছ, পুড়িয়া খাঁক হইতেছি, সে জানে খাঁটী হইতেছ। কিছুই বৃথা নয়।

ফ্যাসাদ যতটুকু বাধিবার বাধিবেই। অবোধের মত কেবল দোষারোপ না করিয়া অভাবমোচনের পন্থা দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সত্যি কি বোঝ না কিসে কি হয়? মনের কোণে কোন না কোন ভয় লুকাইয়া আছে বলিয়াই গা বাঁচাইবার চেষ্টা আসে? নির্ভয় অকুতোভয় প্রাণ যে আত্মদান না করিয়া পারে না!

স্বীকার করিলাম, শ্রুতি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে না, অর্থাৎ সর্ব্বদাই আদেশ শুনিতে পাও না; কিন্তু স্মৃতি তো থাকে, সেও কি নীরব হইয়া যায়? সবই মনে আছে, অথচ কিছুই ভাল লাগিতেছে না বলিয়া সর্ব্বনাশের দরজাটা খুলিয়া বসিয়া আছ—এমন আধ্যাত্মিক জড়তা কি কখনো পাইয়া বসে না? তখনের অন্তরের শ্রুতি নীরব; কিন্তু তা বলিয়া স্মৃতি

লুপ্ত হইবে কেন? প্রাণপণে মনে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যে কথাটী ভুলিবার নয়, যাহাকে ভুলিলে তোমার সর্ব্বনাশ হয় বরাবর দেখিয়া আসিয়াছ, তাহাকে নিজের জোরে আঁকড়িয়া থাকিতে হইবে। কোনক্রমে ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে মেঘ কাটিয়া গেল—আবার অনাহত শ্রুতির তান প্রাণে বাজিয়া উঠিল; তখন আবার আলো, আবার উৎসাহ, আবার পথ চলা!

আধ্যাত্মিক জীবনে এই দিন-রাত্রির আবর্ত্তন—প্রত্যক্ষ কথা। শুধু আধ্যাত্মিক কেন, যে কোন জীবনেই এই উঠানামা চলিতেছে। সুখদুঃখ, উন্নতি-অবনতি, আশা-নিরাশা—স্মৃতির মঞ্জুষায় সম্পুটিত এই একই অভিজ্ঞতা। ইহা সংসারধর্ম্ম, ইহাই মায়ার খেলা, প্রকৃতির লীলা।

এর পরের কথাটী নাই শ্রুতিতে—অর্থাৎ শুনিতে পাই, যাঁহারা সর্ব্বদা অন্তর হইতে আত্মবাণী শুনিতে পান, তাঁহাদের মুখ হইতে জানি, এর পরও একটা কিছু আছে, যাহা সকল সমস্যার সমাধান, যাহা আপনাতে আপনি পূর্ণ। আত্মোদর পূরণের চেষ্টায় পরের প্রতীক্ষায় থাকিবে কেন, সাধিয়া লও ঐ বস্তুটী। নিজের সাধ্যসাধনায় মিলিবে সে বস্তু—যদি চেষ্টা থাকে অকপট, যাচিয়া আসিয়া কোল ভরিয়া দিতে কেহই কৃপণতা করিবেন না।

স্মৃতি তখন অভ্যাসে অর্থাৎ মঙ্গলমননের পৌনঃপুন্যে ধ্রুবা প্রতিষ্ঠা লাভ করে—অন্তরের অন্তরতম কেন্দ্র হইতে উত্থিত অনাহত শ্রোত প্রেরণার সহিত এক হইয়া যায়। অন্তরে-বাহিরে ঝগড়া থাকে না; বাহিরে সংসার যাহা দাবী করে, অন্তর হইতে সেই স্বভাবই আত্মদানের দরুণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

শ্রুতি অপৌরুষেয়, স্মৃতি তাহার বাহন। শ্রুতি অগ্র্যাবুদ্ধিগম্য, স্মৃতি ইহবুদ্ধিপ্রসাদস্থ। মনকে স্নিগ্ধ রাখিতে হইবে, সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—আমি এই চাই, এই-ই চাই!

দুঃখস্মৃতি নয়, সুখস্মৃতি। যাহাতে জাগরণ মধুময় হয়। বাঁশীর তান শুনিতে পাইতেছি না, কিন্তু যার বাঁশী তাকে মনে আছে। মনে মনে তাহাকে টান। বাঁশীর তানে সে মন টানিয়া লইয়াছে—তাহার কাজই ঐ। শ্রুতিসুখাবেশে পাগলপারা করিয়া দিয়া সে মনোচোর পলাইয়াছে, নিরন্তর স্মৃতিতে একান্তে মননই এখন তোমার সম্বল। স্মৃতির টানে আবার যদি সে শ্রুতিকে ফিরাইয়া আনিতে পার তাহাই সাধনা।...

ভাবিয়াছিলাম, মীমাংসা এমনি করিয়া হইবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতা চৌদিকে বেড়িয়া ধরিয়াছে, অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। আশার পরপারে গিয়া তবে বুঝি তাহার সম্পূরণ। একবিন্দু চেষ্টা, একবিন্দু সফলতার লোভকে তো সে জীয়াইয়া রাখিতে দিল না। ঘটনাবৈচিত্র্যের প্রবল নিষ্পেষণে আমিত্বের দর্প চূর্ণ করিয়া না জানি কি অবশিষ্ট থাকিবে, যাহা দ্বারা কাজের কাজ হইবে।

মোটকথা, আমার দিক হইতে কোন দাবী রহিল না। অধিকারের দাবী? জগতে সব্বারই সমান অধিকার। স্নেহের দাবী—সে তো মায়ামাত্র। যে দাবীই করিতে যাইব, তাহার মূলেই অভিমানের জড় থাকিয়া যাইতেছে। তিনি চান তাহার নিরসন। তোমার বলিয়া কোন দাবী না থাক্, অথচ সবাইকে আপন কর—সকল সংসারের দায়িত্ব লও। তোমার কোঠা বলিয়াই একটা কিছু থাকিবে না। ঐ সেই মুক্তিবাদের হাওয়া। এ অদ্ভুত মুক্তি আর অমায়িক বন্ধন যে একই কথা।

মায়িক সংসারে আর মায়ার পরপারে বি-রজ-ধামে লীলার পার্থক্য কোথায়? একটীতে আত্ম-সুখের রজ্জুতে বাঁধা; আর একটীতে নিঃস্বার্থ প্রেমডোর;—একটীতে ধরা পড়িয়াছ, আর একটীতে ধরা দিয়াছ। একটীতে অন্ধ আবেশ আর মত্ততা; অপরটীতে জানিয়া-শুনিয়া সাধ করিয়া বিপদবরণের উদ্দীপনা।...

তত্ত্বকথায় সবি ধরা পড়িয়াছে গো—কিন্তু প্রাণের জ্বালা মিটিল না। কিসের এ দাবদাহ! জানিয়াও মন বোঝে না, পাইয়াও তিয়াস মিটে না—কিসের এ আকুলতা? সমস্ত দিক বুঝিয়া লইয়াও সামাল দিতে পারিতেছি না। পারি না, অথচ ষোলআনা অভিমানটুকু আছে। কিছুতেই মাথা নোয়াইতে দিবে না—এদিকে বোঝার ভারে শ্রান্ত তনু ভাঙ্গিয়া পড়ে যে! দুর্জ্জয় মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—যা চাহিতে পারে, তার চেয়ে অনেক কোটীগুণ বেশী করিয়া সে চায়। শুধু তাই নয়, ভাবে, আমিই পাবার যোগ্য।

কাহারো নিঃস্বার্থ প্রেমকেও মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিই না, অথচ আমার আত্মসুখের যে কোন একটা মূল্য নাই, ইহাও বলি না। সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়া আমারও একটা বড়দরের সুখলাভ হয় বৈ কি। আসলে নিজের জন্যই তো পরকে সুখ দিতে চাই। বাহির হইতে দেখিলে সর্ব্বত্যাগীর কত লাঞ্ছনা, কিন্তু অন্তরে তার অমৃত, সব কিছু তেয়াগিয়া নিজের মাঝে যে অমৃতের সন্ধান সে পাইয়াছে, আনন্দভরে তাহার মননেই যে মসগুল!

সামঞ্জস্য আর শান্তি কেবল ঐ অন্তরের এক-বিন্দু ভাবের মাঝে। সংসার চিরকালই জঞ্জাল। কিন্তু ধ্রুব জানিও, অন্তরের ঐ অমৃতবিন্দুই অন্তহীন শক্তিপারাবার। ঐ বিন্দু হইতে অফুরন্ত উৎসাহের প্রবাহ নামিয়া আসে। জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশার অন্ধকার, পশ্চাত্তাপের তুষানল, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা—এমনি ভাষায় দুঃখময় সংসারের যত ভাষ্যই করনা কেন, সে এক বিরাট ব্যাপার মনে হইবে। যত চিন্তা করিতে থাকিবে, বোঝার ভার যেন ততই বিষম মনে হইবে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ঐ ভাবকেন্দ্রে পৌছাইয়া এক বিন্দুতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া বাহিরকে তুচ্ছ কর—তুচ্ছ মনে না হইলেও তুচ্ছ বলিয়া বিশ্বাস কর—ভুলিতে না চাহিলেও ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যাও; ইহাই উদারতা, সাধুতা, নিঃস্বার্থ আত্মসুখলাভের একমাত্র উপায়। আত্মসুখেই মশগুল থাকিবে, কিন্তু সে দুঃখকে এড়াইয়া গিয়া নয়, কৌশলে দুঃখের সহিত মিতালি পাতাইয়া। এই রহস্যময় পন্থাই দুঃখ মোচনের সনাতন পন্থা, সব চেয়ে উদার ব্যবস্থা। দুঃখকে যাহারা ভয় করে, তাহাদের প্রাণে ঐ ভাববিন্দুর সঞ্জীবন-প্রভাত অপরিচিত থাকিয়া গিয়াছে। নিজেকে নিজে জান—অজ্ঞাত অবুদ্ধ সমস্ত স্বভাব ভাবের প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

অভাববোধকে বলি, জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। বাঁশীর তান বিস্মৃত হইয়াছিলাম, স্মৃতিতে তার পুলকময় আভাস ধরা দিল। বুঝিলাম, আমার ভাণ্ডারে এই এক বস্তু নাই। নাই, নাই—এই নাস্তিকতার উর্ব্বরক্ষেত্রে আস্তিক্যের বীজ রোপণ করিল সেই বাঁশীর তান, যাহা কোন কালে একবার শ্রবণ করিয়াছিলাম। নিত্যনিরন্তর সাধনায় আমার সংসঙ্কল্পের বীজ হইতে মহৎকর্ম্মফল ভরাবনত মহীরুহ প্রতীক্ষু জগতের মাঝে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার সেই লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ভব, শ্রুতিতে আবার সেই বাঁশীরব! তখন অবিরতই শুনিতে পাই—অতীতে ভবিষ্যতে বর্ত্তমানে কোথাও অনিশ্চয়াত্মক বিভীষিকা নাই—সকল উদ্দেশ্য স্পষ্ট, ক্ষুদ্র অভিপ্রায়টী পর্য্যন্ত সার্থক। যাহাকে হারাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি, তাহাকে তখন পাইয়াছি। সে যে নাই, ইহা বুঝিলাম অভাববোধ হইতে; আবেগকম্পিত স্মৃতিতে তাঁহার ব্যাকুল আহ্বান আসিয়া পৌছিল। আর অন্তরের ভাববিন্দু দিল তাহার পরিচয়—অত্যল্পপরিমাণ অব্যর্থ বিশ্বাস। নিভৃত সাধনায় স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিতে করিতে ক্রমশঃ নিজেরই অন্তরের মাঝে নিত্যবৃন্দাবনে সেই সুখস্মৃতি অনাহত অপৌরুষেয় বস্তুটীর সন্ধান মিলিল। মায়াবদ্ধ জীবনে এই তো অমায়িকতার ধ্রুববিন্দু—ওইখানেই তো অটল থাকিতে হইবে।

জ্বালাজঞ্জালময় সংসার, তোমাকে তাড়াইতে চাহিনা। তুমি আমার আশ্রিত। প্রয়োজন হইলে বুকের রক্তও সময় বুঝিয়া বুক চিরিয়া পান করিও। তোমাকে সহ্য করা আমার কর্ত্তব্য। তোমাকে ভয় করিনা, সুতরাং এড়াইতেও চাহিনা। তোমার কাজে আমি বাধা দিবনা। স্বেচ্ছায় তোমাকে হাতে নিয়াছি। যতদিন মেয়াদ আছে, থাক। তুমিও থাক, আমিও থাকি; তুমি থাক আমাকে নিয়া আর আমি থাকি আমার মনচোরাকে নিয়া—তার সুধাবংশীরব শ্রবণে তন্ময় হইয়া, মধুমিলন-স্মৃতিতে মতোয়ালা বনিয়া!

প্রাণবন্ত-ধর্ম্ম

—*—

বৈদিক যুগের চিন্তার ধারা, একমাত্র গীতার মাঝেই অনেক জায়গায় বজায় রয়েছে। সমস্ত গীতাখানা পড়লে প্রাণে একটা অভূতপূর্ব্ব বল সঞ্চার হয়। কোন দুর্ব্বলতাকে আধ্যাত্মিকতার হিরণ্ময় আবরণ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা দেখি না গীতাতে। অর্জ্জুনকেও প্রথমে সাংখ্য যোগে পেয়ে বসেছিল—অর্থাৎ তিনি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কৈবল্য-মার্গে নিঃসঙ্গ হয়ে বসে থাকতে চেয়েছিলেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তাকে সে দুর্ব্বলতা থেকে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন।

ফাঁকি দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়াকে গীতাকার বার বার কাপুরুষতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। মুক্তিরও—নিবৃত্তিমার্গেরও একটা ক্রম-পরিণতি রয়েছে। কিন্তু জাতি যতই দুর্ব্বল হতে লাগল, ততই কেবল সহজ সংক্ষেপ রাস্তার প্রণালীই আবিষ্কার হতে থাক্‌ল।

আমরা নাকি খুব sensitive, তাই বৈদিক যুগে যে সাধনায় হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হত, আমাদের একরাত্রে তা সিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই sensitivenessটা যে দুর্ব্বলতা নয় তারই বা প্রমাণ কি? ফললাভে যারা অত্যন্ত ব্যগ্র—তারা যে পথে ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করে তাই বা কে জানে?

আধ্যাত্মিকতা একটা অলৌকিক কিছু, এ ধারণা অর্জ্জুনের মনেও ছিল। তাই দেখতে পাই, সব ছেড়ে দিয়ে তিনি আধ্যাত্মিকতা চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য দেখানোর এই এক মাত্র কারণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্জ্জুনকে সহজ পথেই চালিত করলেন। আধ্যাত্মিকতা দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। ধর্ম্ম-কর্ম্ম এখানেই, সংসারের বিচিত্র কর্ত্তব্য প্রতিপালনের ভিতর দিয়েই লাভ হতে পারে—এই উপদেশ অর্জ্জুনকে দিলেন!

সম্মুখ যুদ্ধে যারা ভীত - তারা নিশ্চয়ই কাপুরুষ। এ দুর্ব্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে অনেক দিক্ থেকে morality'র question এসে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে যে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেননি এমন নয়—কিন্তু নিবৃত্তিরও একটা সময় আছে। আগ থেকেই তার দরুণ দুর্ব্বলের মত সংস্কার অর্জ্জন করতে যাওয়া অনুচিত। নির্ব্বিকার, নির্দ্বন্দ্ব হতে উপদেশ দিয়েছেন বটে—কিন্তু নির্ব্বিকারের অর্থ এই নয় যে বিকারময় জগতের সঙ্গে non-co-operation করে কৈবল্য গুহায় গিয়ে বাসা নিতে হবে। সংস্কার এবং যুগ প্রভাবে অর্জ্জুনকে বারবার এসে এই দুর্ব্বল ধারণায় আক্রমণ করে বসত। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সহায় ছিলেন বলেই—অর্জ্জুন রক্ষা পেয়েছিল।

কর্ম্মত্যাগের উপদেশও আছে, কিন্তু কি করে কর্ম্মত্যাগ হয় তার উদাহরণ দিয়েছেন "কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" কর্ম্ম করতে করতেই কর্ম্মত্যাগ—অর্থাৎ নিরাসক্তভাবে আরও প্রচুর কর্ম্ম করার প্রেরণা পাওয়া।

একটা কথা প্রায়ই শুনা যায়, কর্ম্ম মানুষের বন্ধন। শঙ্করাচার্য্যও জ্ঞান কর্ম্মের অহিনকুল সম্পর্ক দেখিয়েছেন। কিন্তু অভ্যাসে কি কর্ম্মকে এমন ভাবে আয়ত্ত করা যায় না, যে, তা কিছুতেই বন্ধনের কারণ হয় না? অভ্যাসে তো কর্ম্মটা mechanical হয়ে যেতে পারে। তখন মনে মনে নিবৃত্তির আস্বাদন করতে কে মানা করে? জনকের সম্বন্ধে রামপ্রসাদের একটা গান আছে। সহজভাবে জনকের অধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য্য এর মাঝে বেশ পাওয়া যায়। "এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটী।" জ্ঞান-কর্ম্মের সামঞ্জস্যই বোধ হয় এর তাৎপর্য্য।

কর্ম্মকে আমরা বন্ধন মনে করি বলেই বন্ধন! কর্ম্মে আমাদের তাই আবদ্ধ করে রাখে। কৈ পাশ্চাত্য জাতি যে কর্ম্মকে বন্ধন বলে মনে করে না—এতে কি তারা মুক্তি লাভে বঞ্চিত। বরঞ্চ মুক্তি কাকে বলে, তারা ইহ-লোক থেকেই তার প্রমাণ করে দেখাচ্ছে। আমরা মুক্তি চেয়েও বদ্ধ—আর তারা মুক্তি না চেয়েও মুক্ত। গীতার কথায় বলতে গেলে, ফলের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু কর্ম্মের আনন্দে কর্ম্ম করে যাওয়া, এ একমাত্র পাশ্চাত্য জাতির চরিত্রেই প্রমাণিত। গীতাকে follow করছে কারা?

গীতার মাঝেই একটু-আধটু বৈদিক spirit দেখা যায়। এর পরেই কেবল সাংখ্য—কৈবল্য—self-stupefaction এই জাতিটাকে জর্জরিত করে ফেলেছে। ধর্ম্ম জিনিষটা spontenious—নাক টিপে, জোর করে যে ধর্ম আয়ত্ত করি তা পরধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে জাতির প্রাণ শোষণ করে একটা অন্ধকারময় নৈরাশ্যে ফেলে শুধু। abstract idea নয় শুধু, যা পড়লে প্রাণ উল্লসিত হয়ে উঠে—ভয়-আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যায় তাকেই ঠিক প্রাণের বাণী বলি। গীতা পড়ে আমরা প্রাণে সেই বলই পাই।

ভারতবর্ষ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—•—

বংশানুক্রম এবং শিক্ষার নীতি অনুযায়ী জীবনের ক্রমবিকাশ হয়। ইতর-জীবজগতে বংশানুক্রম-নীতিরই জয়জয়কার। মানুষের শারীরিক বল ও ইন্দ্রিয়শক্তিও তো বংশানুক্রমেরই ফল। কিন্তু মানুষ শুদ্ধ হয়, সিদ্ধ হয়, পূর্ণ সুষমায় ফুটে ওঠে শিক্ষার গুণে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে। মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে ফুটতেই দেখা যায়, পিতামাতার সব গুণ তাদের মাঝে বর্ত্তেছে। কতকগুলি পাখী জন্মাবার পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বপুরুষদের মত পোকামাকড় ঠুকরে খেতে যায়। পিতামাতার যত গুণ, সবই তারা পায় আর তাতেই তাদের ক্রমোন্নতির শতম হয়। আবার দেখ, মানুষের যে ক্রমোন্নতি

হচ্ছে, সে কেবল তার শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের দরুণ। মানব-শিশু কুকুর ছানার মতই বোকা; বরং মানুষের বাচ্চার চেয়ে কুকুরের বাচ্চা কোনও কোনও বিষয়ে বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু মানুষ আর জানোয়ারে মস্ত তফাৎটাই এই যে কুকুর-ছানাটার জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করবার দরুণ যা কিছু দরকার, তার সবই তার বাপ-মার কাছ থেকে পেয়েছে; কিন্তু শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকের গুণে মানবশিশু বংশানুগত গুণগুলির এমনি বিকাশ ঘটাতে পারে যে একদিন সমস্ত জগৎ হয়ত তার পদানত হবে। হিন্দুর ভুল হচ্ছে এইখানে যে শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিক যে মানুষের কল্যাণ করতে পারে সে কথা সে একরকম মানতেই চায় না; আর সমস্তটা সমাজের ওপর বংশানুক্রমের নীতিটা সে এমন জোরে চালাতে চায় যে মানুষ তাতে জানোয়ার বা গাছ-পালার সামিল হয়ে পড়ে। আত্মার অনন্ত সম্ভাব্যতার ওপর তার বাস্তবিক আস্থাই নাই। শিক্ষার গুণে শূদ্রকে যে ব্রাহ্মণ করে তোলা যেতে পারে, সে বিশ্বাস তাদের নাই। তারা শূদ্রকে শূদ্র করেই রাখবে, বৈশ্যকে বৈশ্য করেই রাখবে—অজুহাত এই যে ডুমুরের বীজে তো ডুমুর গাছই হবে, কুকুরের পেটে তো কুকুরই জন্মাবে! চোখের ওপর দিনের পর দিন তারা এই যুক্তির ব্যতিক্রম দেখছে, তবুও তারা নাছোড়বান্দা। যাঁরা একদিন জগদ্বরেণ্য ঋষি ছিলেন, চিত্তবৃত্তির কল্পনাতীত উৎকর্ষ করে-ছিলেন, দর্শন-বিজ্ঞানের যাঁরা অদ্বিতীয় ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা আজ তাঁদেরই বংশধর সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে আজ সে ব্রাহ্মণের অধিকাংশ শুধু বুদ্ধিহীন নয়, স্থলবিশেষে একেবারে গোবর-গণেশ। আর যারা অপেক্ষাকৃত অসভ্য ও অনুন্নত অবস্থায় ছিল, তাদেরই বংশধর ইংরাজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি, শিক্ষা, স্বাধীনপ্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে আজ শারীরিক, মানসিক ও রাজ-নীতিক ক্ষমতার চরমে উঠে নাই কি? ভগবান তো জাত-কুল বা কৌলীন্য দেখে বিচার করেন না। যে খাটতে পারবে, তারই জিৎ। যে নিজকে শিক্ষায়-দীক্ষায় বড় করে তুলতে পারবে, সেই জগতে সার্থক হবে।

রাম এ কথা বল্‌ছেন না যে তোমরা জগতের সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত, কিন্তু তোমাদের চেয়ে ভারতবাসীরা এ রোগে ভোগছে বেশী। তোমরা সহজেই এ সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পার, অধিকাংশ ভারতবাসীই তা পারে না। ভারতবাসীদের চেয়ে তোমরা রামের বেশী কাছাকাছি আছ কোন কোন বিষয়ে। রাম তোমাদের মাঝে এই স্বাধীনতার ভাবটা আরও ফুটিয়ে তুলতে চান; এ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুক, আরও সুন্দর হোক্—ভারতবাসীদের মাঝেও এ ভাব জেগে উঠুক, তোমরা যে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছ তা-ও তারা ভোগ করুক। এমনি করে আমরা এ পাপের মূলোচ্ছেদ করতে পারি। এই দ্বৈতবোধ থেকে, এই ভেদ জ্ঞান থেকেই মানুষ দেহে, মনে, আত্মার সর্ব্বনাশ করে। আর এই দ্বৈতবোধই তো বেদান্তের ধর্ম্মের বিরোধী—একে-বারে বিপরীত শিক্ষা!

এই রোগ সম্বন্ধে আর দুটী-চারটী কথা বলব। ব্রাহ্মণ উচ্চশ্রেণীর, কাজেই কোনও কায়িক পরিশ্রমের কাজ করা তাঁর পক্ষে অপমানজনক। আচারে যা অনুমোদন করে না, এমন কোনও কাজ উচ্চ-জাতের কেউ করে না, তাহলে তাদের মর্য্যাদা নষ্ট হবে। যেমন উচ্চশ্রেণীর তিনটী জাত আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এরা কখনো মুচি, নাপিত, নেয়ে, কামার, কুমার, ছুতোর, দরজী, রাজমিস্ত্রী বা মুটে মজুরের কাজ করবে না—ঝাড়ুদার মেথরের কাজ তো দূরের কথা। এমন কাজ ছোঁয়ার চেয়ে তারা বরং মরে যাবে। চামড়ার কারবার তারা কক্ষনো করবে না। উঁচু জাতের লোকের গাঁটে পয়সা আছে,

অথচ তারা এ সব কাজ ছোঁবে না, এ সব কাজ পড়বে গিয়ে নীচু জাতের লোকদের ঘাড়ে—সে বেচারীদের কানাকড়ি মূল ধন নাই, তাহলে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয় কি করে বল দেখি? এই শিল্প বাণিজ্যের দরুণই তো তোমাদের দেশ আজ এত ধনী, তেমনি ইংলণ্ড, ইউরোপও শিল্প-বানিজ্যের দরুণই এত সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। আর এই শিল্প-বাণিজ্য চালাচ্ছে কারা—যাদের হাতে প্রচুর মূলধন রয়েছে। আচ্ছা বল তো দেখি, যে দেশের অধিকাংশ লোকই শিল্প-বাণিজ্যকে অবহেলা করে কেবল প্রাণহীন কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানকেই আঁকড়িয়ে ধরে পড়ে থাকতে চায়, সে দেশের লোক দিয়ে কি হবে?

অতীতের প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং বাজে কতকগুলি কুসংস্কারের ফলেই, স্বভাবতঃই ভারতের সামাজিক জীবনেও অনেক দিক দিয়ে অত্যন্ত গলদ ঢুকেছে—সে সব এখানে বলে আর কোন প্রয়োজন নাই। বল তো, যাদের মাথায় কুসংস্কারের এত নিদারুণ বোঝা, তাদের দিয়ে কি আশা ভরসা? যদি পার, তাদের গিয়ে সাহায্য কর, টেনে তোল, —দাসত্বে যেন তারা তলিয়ে না যায়। পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবকে ভিত্তি করে যেন তারা ক্রমশঃ আরও উন্নত হয়ে উঠে, তা না হলে শুধু শুধু অতীতের গৌরব করে কি লাভ? উত্তরাধিকার সূত্রে যা তাদের প্রাপ্য তা পেতে এবং রক্ষা করতে তাদের গিয়ে সাহায্য কর—তারা যেন দাস হয়ে না পড়ে। তাদের সম্পত্তি তারা নিজেরা অর্জন করুক—পূর্ব্ব-পুরুষের কৃপার অপেক্ষায় যেন তারা বসে না থাকে।

ভারতের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য রীতি-নীতি যে অনেক দিক দিয়ে কল্যাণকর এবং প্রশংসনীয় তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু প্রায় সবাই অজ্ঞ এবং অন্ধের মত সে সব আচারকে অনুসরণ করে চলে বলেই জীবন নীরস এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ে। ভারতে প্রায় দেড়লক্ষ নারী রয়েছে, সংখ্যায় তোমাদের ইউনাইটেড ষ্টেটের সমস্ত লোকের চেয়ে দ্বিগুণ হবে তারা, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাদের মাঝে একশতটী তাদের নামটী পর্য্যন্ত লিখতে পারে কিনা সন্দেহ। এ সব কদর্য্য-কুসংস্কার এবং ভীরুতা ক্রমশঃ পরবর্ত্তী বংশধরগণের মাঝে সঞ্চারিত হবে না কি?

উপনিষদের এবং বেদান্তের উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের স্থলে এসে এখন গোঁড়ামী প্রবেশ করেছে। আর এখনকার ধর্ম্ম হচ্ছে শুধু খাওয়া-পড়ায় বাছবিচার এবং নিয়ম-কানুন নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা। কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন যারা ভর্‌ভর্ করে আউড়িয়ে যেতে পারেন, তাঁরাই হলেন বড় বড় পণ্ডিত; এমন কি যারা স্বাধীন এবং মৌলিক গবেষণা করেন, তাদের চেয়েও তাদের সম্মান-প্রতিপত্তি বেশী। তুমি যদি বেদ কিম্বা পুরাণ থেকে কতকগুলি বড় বড় বচন আউড়িয়ে সবকে থ বানিয়ে দিতে পার, তাহলেই তুমি একজন নামজাদা পণ্ডিত হয়ে গেলে আর কি? স্নান করবার সময় কতবার ভর্‌ভর্ করে কতকগুলি মন্ত্র আউড়াতে হবে—এ ধরণের জটিল প্রশ্ন নিয়েই হয়ত অনেকে মাথা ঘামাচ্ছেন সেখানে বসে বসে! (ক্রমশঃ)

আদি কবি-গুরু

—(*)—

পরমব্রহ্মই একমাত্র গুরু, তিনি জগৎগুরু, হিরণ্য-গর্ভেরও গুরু। তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত স্পন্দনই হিরণ্যগর্ভে প্রথম অনুভূত হয়—আর সেই ছন্দেই ব্যষ্টির জীবন স্পন্দিত। প্রকট জগতের মাঝে হিরণ্য-গর্ভই হলেন আদি গুরু, কেননা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের scheme or ideation তাহারই মাঝে সুপ্ত। কিন্তু হিরণ্যগর্ভই শেষ নন, তাহার চেয়েও গুরুতর কেহ আছেন। ভাগবতে তাহারই কথা বর্ণন করিয়াছেন—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ॥

—মনীষিরা যাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়-স্পন্দন দ্বারা আদি কবিতে (হিরণ্য-গর্ভে) যিনি সঞ্চারিত করিলেন।”

হিরণ্যগর্ভও প্রথম প্রেরণা পাইলেন সেই পরম-সত্য জগৎগুরু হইতে। কিন্তু সে প্রেরণার মাঝে একটু বিশেষত্ব রহিয়াছে—আর এই বিশেষত্ব দ্বারাই গুরু-মহিমা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পরমগুরু মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু হৃদয়-স্পন্দন দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে বেদকে অপৌরুষেয় বলা হইয়া থাকে—ইহার কারণ বেদ তো কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় নাই—প্রাণ হইতে ভাব-স্পন্দন উদ্দীপ্ত হইয়া আবার প্রাণেই তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে। কাজেই প্রাণের স্পন্দন প্রাণেই অনুভূত হইবে।

ভাবকে আগে নিজে আয়ত্ত করিয়া তাহার পর এই ভাবকে যিনি অপরের মাঝেও সঞ্চারিত করিতে পারেন—তিনিই গুরু। কাজেই গুরু যিনি তাহার দুইটী শক্তিই আয়ত্ত থাকে, ইচ্ছা হইলে তিনি চুপ করিয়া সমস্ত শক্তি নিজের মাঝে গুটাইয়া বসিয়াও থাকিতে পারেন, তেমনি আবার ইচ্ছা হইলে অনায়াসে সেই শক্তি অপরের মাঝেও সঞ্চারিত করিতে পারেন। এই শক্তি-সঞ্চার প্রণালীই গুরুর গুরুগিরি, তাহা না হইলে শুধু মৌখিক উপদেশে শিষ্যের আভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ রূপান্তর হয় না। মুখে বলার চেয়ে প্রাণের আবেগের শক্তি বেশী, তাই অনেক সময় গুরু যদি দূরে থাকেন, তাহা হইলে শিষ্যের বেশী কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। কথাটা খুবই সহজ—কিন্তু এই সহজ কথাটার মাঝেই গুহ্য-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। দূর হইতে গুরুর কল্যাণ শিষ্যের জীবনের উন্নতির পক্ষে এত কার্য্যকরী হয় কেন? এর মূলে রহিয়াছে চিন্তা-শক্তির অব্যর্থতা। কেননা নিরালায় বসিয়া যখন গুরু শিষ্যের চিন্তা দ্বারা নিজকে স্পন্দিত করেন, তখন সেই স্পন্দন অবাধগতিতে বায়ু হইতেও বেগশালী হইয়া শিষ্যের চিত্তে আসিয়া প্রবেশ করে। তখন শিষ্যের জীবনের উন্নতি না হইয়া পারে?

গুরু স্বীকার করিলে নাকি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব হয়, অনেকে আবার গুরু স্বীকারের দুর্ব্বলতাকে slave-mentality বলিয়াও আখ্যা দেন। কিন্তু স্থূল ভাবে স্বীকার না করিলেও—চিন্তা দ্বারা তো প্রভাবিত সবাই। এখন এই চিন্তা কি—ভাব-স্পন্দন মাত্র। ভাবের মূলে তো কেহ আছেন? (অবশ্য স্থূলে না হউক সূক্ষ্মে), ভাগবত তাঁহাকেই **পরং সত্যং** বলে আখ্যা দিয়াছেন। কথাটা সূক্ষ্মের দিকে চলিয়া যায় কিনা, তাই স্থূল মনের মাঝে হঠাৎ যেন কেমন একটা খট্‌কা লাগে।

চিন্তার প্রভাবে যদি মানুষ প্রভাবিত হইতে পারে, তাহা হইলে কেহ যদি স্থূলে চিন্তা করেন,

তাহা হইলে সেই চিন্তা কি অপরের মাঝে সংক্রামিত হইতে পারে না? সূক্ষ্মতার দিক দিয়া তো একই থাকিয়া গেল, কেননা স্থূল শরীরধারী গুরু যে চিন্তা করেন—সে চিন্তাও তো সূক্ষ্ম চিন্তাই। শক্তিশালীর প্রভাবে অপরেও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে ইহা তো বড় একটা আশ্চর্য্যের কথা নয়, আর ইহা স্বীকার করিতেও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না; কেননা গুরু তো কল্যাণ চিন্তারই শুদ্ধ-আধার মাত্র। গুরুকে নরাকার পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে এই জন্যই। তিনি একদিকে নরাকার আবার অন্যদিকে সত্যরূপী পরব্রহ্ম। এই সামঞ্জস্য সম্ভব বলিয়া দেহধারী মানুষই গুরু হইয়া যাইতে পারেন। গুরু ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্ত—এই হইল তাঁর তত্ত্ব। কাজেই গুরু মানুষও আবার পরব্রহ্মও। দুটো ভাব একসঙ্গে মনন করার ক্ষমতা জন্মিলে তবে গুরুর মহিমা বুঝা সম্ভবপর।

চিন্তার অমোঘ শক্তি। সৎ চিন্তা মাত্রেরই একটা প্রভাব রহিয়াছে। গান্ধী একজায়গায় বলিয়াছেন, তিনি নাকি টলষ্টয় এবং রাস্কিনের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু ঐ দুটী মনিষী তো আমাদের দেশের নয়। কাজেই চিন্তার প্রভাব দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। সার্ব্বভৌম মহৎ-চিন্তারই যখন এরূপ প্রভাব, বিশিষ্ট শুভ-চিন্তার প্রভাব যে তাহার চেয়েও বলশালী হইবে তাহাতে তো আর কোন সন্দেহই নাই। আমার অজানাতে যদি আমার কোন কল্যাণকামী আমার সম্বন্ধে শুভ চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া গেলে তো কোন ক্ষতির কারণ নাই, কিম্বা হইলেও ইহা তো দুর্ব্বলতার লক্ষণ নয়। কেননা আমরা তো জীবনের বিশুদ্ধ উন্নতিই চাই। চিন্তার প্রভাবে মলিন সংস্কার অপসারিত হইয়া গেলে, তাহাতে বরঞ্চ আমাদেরই উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

Emotion বা ভাব স্পন্দনই সৃষ্টির আদি সূক্ষ্ম-বিকাশ। ব্রহ্ম আগে নিজকে জগৎ সৃষ্টির চিন্তায় বিভোর করিয়া তাহার পর স্থূল জগৎ সৃষ্টি করিলেন। কাজেই জগৎ সৃষ্টির আগে, তিনি নিজের মাঝে জগতের scheme কে অন্তরের রসায়নে মূর্ত্ত করিয়া তাহার পর—সেই শক্তি হিরণ্যগর্ভে সঞ্চারিত করিলেন। ভাবের দিক দিয়া পরব্রহ্মের সঙ্গে হিরণ্যগর্ভেরই নিকটতম সম্বন্ধ, তাই হিরণ্যগর্ভও গুরু। হিরণ্যগর্ভের বুকে সমস্ত জগতের তাল শান্ত নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে।

হিরণ্যগর্ভকে আদি কবি বলা হইয়াছে, কেননা তাঁহার সৃজনী শক্তি রহিয়াছে। কিন্তু হিরণ্যগর্ভেরও এই সৃজন প্রতিভা পরম গুরুরই ভাবস্পন্দনের স্থূল বিকাশ মাত্র। শুদ্ধ আধারে সদ্‌গুরুর মহিমা প্রকট না হইয়া পারে না, ইহাকে গুরু কৃপাই বল, আর নিজের চিত্তশুদ্ধির মহিমাই বল। মোটকথা ভাব জগতে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতেছেই, তবে কিনা বিশিষ্ট আধারে তাহার স্ফুরণ হইলে আত্মচেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। ব্যষ্টি সাধনারও প্রয়োজন এইখানে। জগতে কল্যাণশক্তি অব্যক্তভাবে সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইলেও, সেই শক্তির অনুভব সকলের জীবনে ফুটিয়া উঠে না—সকলের হৃদয় সেই ভাবস্পন্দনকে অনুভব করিবার দরুণ উন্মুখ নয়। কাজেই শক্তিসঞ্চার যাহার মাঝে হইবে, তাহার হৃদয়ে অফুরন্ত ব্যাকুলতা এবং অনুভব করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা চাই।

বুঝা আর অনুভব করা এক কথা নয়। একটী বুদ্ধি দ্বারা, অপরটী হৃদয়ের দ্বারা আয়ত্ত হয়। দার্শনিক হইতে পারেন অনেকেই কিন্তু Poet Philosopher সকলে হইতে পারেন না। কবির বিশিষ্ট-গুণই হইল—অনুভব করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। গাছ, পালা, পারিপার্শ্বিকের যত কিছু সব দেখিয়া-শুনিয়া আমরা হয়রাণ হইয়া যাই, কিন্তু কবির চোখে

কোন সময় অবসাদ বা ক্লান্তির আচ্ছন্নতা নাই। তাঁহার নিকট সব নূতন, এক একদিন এক এক ভাবে তিনি আস্বাদন করেন। আনন্দের অফুরন্ত রসদ তাঁহার ভিতর সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এই অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকিলেই সৃষ্টি করিবার শক্তি আপনি ফুটিয়া উঠে। আগে চাই হৃদয় দিয়া অনুভব। শিল্পী নিজের প্রতিভা এবং কল্পনা বলে যে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা নিজের মাঝে গড়িয়া তুলেন--- অপরকে তাহা বুঝাইবার দরুণই তো পরিশেষে তিনি ভাষার সাহায্যে বাহিরে তাঁহাকে রূপ দেন। হিরণ্যগর্ভকেও এই জন্যই কবি বলা হইয়াছে, একদিকে তিনি পরব্রহ্মের আবেগ-কম্পিত ভাবস্পন্দনকে হৃদয় দ্বারা অনুভব করিলেন, আবার তাঁহারই ভাবস্পন্দন জাহ্নবীধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। মোটকথা শক্তি আয়ত্ত হইলে আপনি তাহা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে থাকিবে ইহা ধ্রুব সত্য।

স্থূলকে ছাড়িয়া যতই আমরা ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই, ততই সূক্ষ্ম শক্তির অব্যর্থ ক্ষমতার নিদর্শন পাইতে থাকি। স্থূল জগতের প্রভাবকেই আমরা অন্ধের মত স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু এই স্থূল জগতের উপর ভাব-জগতের যে কতখানি প্রভাব রহিয়াছে তাহা বলিবার নয়। যতই স্থূলে নামিয়া আসিতেছি, ততই শক্তির বৃথা অপব্যয় সাধিত হইতেছে। গতি উভয় দিকেই বটে, কিন্তু স্থূলে শক্তির অপব্যয়; আর সূক্ষ্মে ক্রমশঃ শক্তি-সঞ্চয় হইতে থাকে। শেষে শক্তি ব্যয় না করিয়াও শুদ্ধমাত্র শক্তির প্রভাবেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইতে থাকে।

সাংখ্য বলেন, পুরুষ আছেন বলেই, পুরুষের অধ্যক্ষতার গুণেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। অথচ সাংখ্যের পুরুষ কিন্তু "কেবল"। কাজেই শুদ্ধমাত্র অবস্থিতি দ্বারাই প্রকৃতির প্রাণে সৃষ্টির বেগ সঞ্চিত হইল কেমন করিয়া! "কেবল" পুরুষটী মৌন হইয়া বসিয়া থাকিলেও প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার যোগ রহিয়াছে। পরস্পরের অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য সঙ্কেতেই পরস্পরের মাঝে ভাব-বিনিময় চলিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাবকে বাহির হইতে বুঝা যাইবে কেমন করিয়া?

শক্তি সঞ্চারের প্রক্রিয়া বাহিরের কিছু নয়—হৃদয় দ্বারা হৃদয়কে আকর্ষণ করা মাত্র। মৌখিক অভিব্যক্তির কোন প্রয়োজনই হয়না এখানে—শুধু অন্তরের দীপ্তিতেই অপরের অন্তরও আলোকে, জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহাকেই বলি মহান - যিনি নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও মহান করিয়া তুলিতে পারেন। গুরু শিষ্য করেন পদ-সেবার দরুণ নয়, শিষ্যের মাঝেও আত্মশক্তির জাগরণ হোক ইহাই গুরুর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। আর সেবা করিতে করিতে শিষ্যের মনেও যদি মুক্ত-আত্মার সাক্ষাৎকার বাসনা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই সেবায় নিশ্চয় ভণ্ডামী রহিয়াছে। যাহার সেবা করিব, তাহার প্রভাব আমার উপর অলক্ষ্যেই ক্রিয়া করিতে থাকিবে। জীবন-মুক্ত মহাপুরুষের সেবা করিতে করিতে যদি জীবন্মুক্ত হওয়ার বাসনাই উদ্দীপ্ত হইয়া না উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নিশ্চয়ই হৃদয়হীন জড়ের মতই সেবা করিয়া চলিয়াছি। সে সেবায় জীবনের উন্নতি হওয়ার আশা নাই, বরঞ্চ সেবা করে চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

অনেক সময় দেখি, কেহ হাজার বলিয়া কিম্বা শাসন করিয়াও ভৃত্য দ্বারা কাজ আদায় করিতে পারে না, আবার কেহ কেহ কিছু না বলিয়াও ভৃত্যের দ্বারা যন্ত্রের মত কাজ আদায় করিয়া লয়। কাজ হাসিল করিয়া লওয়া উভয়েরই অভিপ্রায় বটে, কিন্তু একজন আত্মশক্তির মহিমাকে

খর্ব্ব করিয়া অত্যন্ত স্থূলে নামিয়া আসিলেন, আর একজন আত্ম-কেন্দ্র হইতেই ভৃত্যের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগরণের সহায়তা করিলেন। এখন কোন্ পন্থাটী প্রকৃষ্ট পন্থা।

ভাবেই কাজ হয়—ভাব উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি নির্ব্বাক—"বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ।" তাহারই অন্তরের ভাব-স্পন্দন অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া সকলকেই সজীব-কর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে। যিনি মৌন তাঁহার নিকট হইতে মৌখিক কিছু লাভ করিবার আশা না থাকিলেও—অন্তরে অন্তরে ভাব-বিনিময় হওয়ার অপূর্ব্ব সুযোগ রহিয়াছে। তিনি চুপ বটে, কিন্তু আমরা তো চোপ হইয়া থাকিতে পারিতেছিনা। কাজেই অলক্ষ্যে আমাদের মাঝে শক্তি-সঞ্চারিত হইতেছে না কি? হৃদয়ে হৃদয়েই তোমাতে আমাতে যোগাযোগ, ইহাই হইল আসল কথা। বাহিরের সম্বন্ধ আপেক্ষিক সম্বন্ধ মাত্র। পরম সত্য হৃদয় দ্বারা আদি-কবিতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই আদি-কবি হইতে হৃদয়ে হৃদয়েই শক্তি সঞ্চার প্রণালী চলিয়া আসিয়াছে।

সিদ্ধির-সঙ্কেত

— * —

যোগাগ্নি দ্বারা শরীরকে পুড়াইয়া ছারখার করিলে, তারপর রসাস্বাদনের অধিকার জন্মে। এর পূর্ব্বে আস্বাদনের প্রলোভনে পড়িলে শরীরময় এক আবিলতার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। কাজেই জীবনকে যাহারা আস্বাদন করিতে চায়, তাহাদের প্রথমেই যোগ-পথ অবলম্বন করিতে হয়। আত্মশোধন হইয়া গেলে এই স্থূল-ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ব্বিকার চিত্তে সাত্ত্বিক ভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মে। মানুষ ভোগ চায় বটে, কিন্তু ভোগে প্রমত্ত হয়ে পরিশেষে সে অমন আত্মহারা হয়ে যায় যে, সে কিসের দরুণ কি করিতেছে কিছুই তাহার মনে থাকে না। সর্ব্ব অঙ্গে তার এক নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত হয়। ভোগ করিতে গিয়া সে আরও পাগল হইয়া উঠে।

ভোগ করিতে পারে কাহারা? যাহাদের সূক্ষ্মানুভূতি রহিয়াছে। শ্রীরাধিকা নাকি দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুমধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আনন্দে উল্লাসে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তমালকে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া শ্রীরাধিকা আকুল হইয়া উঠিতেন। এই সব লক্ষণ কি উপভোগের লক্ষণ নয়? তবে কিনা এই ভোগকে স্থূল ভোগের সামিল করা যায় না, ইহা সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ। বিশুদ্ধ আকুলতা দ্বারা রসাস্বাদনের দরুণ নূতন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়; কিম্বা এই ইন্দ্রিয়ই রূপান্তরিত হইয়া যায়। অল্প means—অথচ প্রচুর আনন্দ হয় তখন। অন্তর সচেতন থাকে বলিয়াই একটুখানি উপলক্ষ পাইলেই স্মৃতি সহজে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। অন্তর-বিশুদ্ধ হইয়া গেলে—ভোগও ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে চলিয়া যায়, পরিশেষে স্থূলকে না হইলেও চলে। যাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়কে সাধনাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাও ভোগ করে বটে, কিন্তু ভোগের রুচির তখন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। পেটুকের মত নিজ হাতে সব চটকাইয়া উদরস্থ না করিলেও,

দূর হইতে দেখিয়াই তাহাদের তৃপ্তি জন্মিয়া যায়। মানুষ চায় তৃপ্তি—কিন্তু অগ্রসর হয় অতৃপ্তির দিকে। ইহা এক রহস্য বটে!

উপভোগ করিতেই চায় মানুষ, কিন্তু বিশুদ্ধ-ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ইচ্ছামাত্র উপভোগ করিবার শক্তিই জন্মে সে কথা একবারও ভাবিয়া দেখে না। মানুষের চেতনা যতই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, ততই অতি তুচ্ছ ঘটনা হইতেও সে রসাস্বাদনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে। উপভোগ করিতে হইলে অন্তরকেই সর্ব্বাগ্রে শোধন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবিশুদ্ধ চিত্ত নিয়াই উপভোগ করিবার দরুণ ঝাঁপাইয়া পড়ে!

তীক্ষ্ণ অনুভূতি-সম্পন্ন মানব অতীন্দ্রিয়-জগৎ হইতেও সাড়া পায়, কাজেই ইহ জগতই শুধু তাহাদের আনন্দের জোগান সংগ্রহ করিয়া আনে না। তাহাদের উপলব্ধির ক্ষেত্র বহুদূর ব্যাপ্ত। অত্যন্ত ভোগী যে, সে-ও এই জগৎ ছাড়া আর কোনও ভোগের জগতের অনুসন্ধান পায় না। কিন্তু যাহার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় সংযত, তাহার কাছে নূতন নূতন আস্বাদনের লোক ফুটিয়া উঠে। আনন্দ হইতে আনন্দ লোকে, উৎসব হইতে উৎসবেই তাহার গতি উত্তরোত্তর উন্নীত হইতে থাকে!

অন্তরকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে ইহাই হইল আসল কথা, আর তাহার উপায় হইল যোগ। এই যোগ বড় নির্ম্মম, নির্দ্দয়—আপোষ মীমাংসায় তাহার বেগ থামানো যায় না। তাহার অভিষ্ট-সিদ্ধি হইলে আপনি যে শান্ত হইয়া যায়। কিন্তু এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত একটু গলদ থাকিবে চিত্তে সে পর্য্যন্ত যোগ নির্দ্দয় প্রহরীর মত তাহার আপন কর্ত্তব্য সাধিত করিয়া যাইবেই। যোগের দ্বারা যখন অন্তর বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তখন স্থূল ভোগের অভাবে প্রথমতঃ সহস্র-বৃশ্চিক জ্বালা অনুভব হয়। অনেকে এই জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া যোগের পথ হইতে আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু এই জ্বালাকে অন্তরের ভাগবত-শক্তি দিয়া সহ্য করিয়া যাইতে পারিলে, শেষে চিত্তে আপনি প্রসাদ আসে।

জীবন জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে—
রাগের ভজন জানিও যখন
আগুণি লইয়া খেলা—

—এই পথ সহজ পথ নয়, আরাম করিয়া পরের মুখে ঝাল আস্বাদন করা নয়—নিজকে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে হয়। তবে কিনা এই জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে ক্রমশঃ আত্ম-প্রসাদও জন্মিতে থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতকার বেশ সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন—

বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত॥

আর এক জায়গায় বলিয়াছেন—

এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

যাহার অন্তরে খাঁটী ব্যাকুলতা আসিয়াছে, সে একদিকে এমনি জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে, তবু তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের মত সাধন-নিষ্ঠা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই জ্বলুনির সঙ্গে সঙ্গে যে অন্যদিকে প্রেমাস্পদের কৃপা-বারি বর্ষণ হইতে থাকে। কিন্তু এই কথা মনে রাখিতে হইবে, নিজকে বাঁচাইয়া চলার ফিকির যদি ভিতরে ভিতরে থাকে, তাহা হইলে এই যোগে সিদ্ধি নাই। একবিন্দু আশা না রাখিয়া অকূল-সায়রে ঝাঁপ দিতে হইবে। দেহ-মন-প্রাণ, স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সব আহুতি দিতে হইবে। এক একটী আহুতি পাইয়া ভিতরের হোমাগ্নি আরও অধিক দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। শেষে সর্ব্ব অঙ্গ অগ্নিময় হইয়া যাইবে, ইহাই হইল আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্ম-শোধনের উপায়।

সব আশা জলাঞ্জলি দিয়া, সকলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কাহারও কাহারও চিত্ত ভয়ে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কাজেই গীতায় যে বলিয়াছেন, সহস্রের মাঝে হয়ত একটী সাধকের মত সাধক মিলে। ইহা মিথ্যা নয়। জানিয়া-শুনিয়া মরণের পথকে বরণ করিয়া লওয়ার মত বুকে বল আছে কয় জনার? কাজেই কিছু না কিছু ভোগের আশা পেছনে রাখিয়া তারপর সকলেই ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে নামেন।

আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিলেই বড় একটা শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল না, নিজকে অর্থাৎ নিজের দেহ-মন-প্রাণ এই সবকেও আহুতি দিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া কেবল মাত্র আত্ম-ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতে পারিলে বুঝিব, তুমি সত্য সত্যই সন্ন্যাসী, ত্যাগী! প্রলোভনের সংখ্যার শেষ নাই, তুমি যে নিজকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া শুধু অপরের উপদেশের প্রলোভনে ব্যগ্র হইয়া আছ—ইহা কি তোমার পরিত্যাজ্য নয়। নির্ম্মম হইলে সকলের প্রতিই নির্ম্মম হইতে হইবে!

অগস্ত্য-যাত্রার দরুণ তৈরী হইতে হইবে। ফিরিয়া আসিব, এই ভরসা বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে স্থান পাইবে না। তার পরেও যদি ফিরে আসিতে হয়, তাহা হইলে সে আসা কামনার দরুণ আসা নয়, উপর হইতে কাহারও অনির্দ্দেশ্য শক্তি প্রভাবেই অবতরণ হইবে। তখন সেই জীবনই হবে সহজ জীবন, বা ভাগবত-জীবন। আর বাস্তবিক যাহারা জীবন্মুক্ত তাহারাই জগৎকে ঠিক ঠিক আস্বাদন করিতে পারেন। কিন্তু এই জীবন্মুক্তির পথ সহজ পথ নয়, মরে গিয়ে আবার নূতন জন্ম নিয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়।

প্রাণ-আবিষ্কার

চেতন-অচেতন সকলের মাঝেই আত্মাকে জাগিয়ে তোলাই হল আসল কাজ। তন্দ্রায়, ঘুমে সবাই আচ্ছন্ন - কেউ তার অন্তর্নিহিত আত্মার সাড়া অনুভব করতে পার্‌ছে না। আমরা যাকে জড় বলি, তার কি বাস্তবিকই প্রাণ নাই? তারও প্রাণ আছে বটে, কিন্তু সে প্রাণের পরিচয় পেতে হলে নিজকে একটু গভীর দেশে তলিয়ে যেতে হয়। গাছকে আমরা জড় বলেই জান্‌তাম, কিন্তু জগদীশ বসু তাঁর নিজের আত্ম শক্তির গভীরতা দ্বারা গাছ-পালার মাঝেও প্রাণের পরিচয় পেলেন। তিনি জড়ের কাছ থেকেও সাড়া পেলেন। আত্মায় আত্মায় ভাব-বিনিময় হতে লাগল। এখন তিনি গাছের ভাব-ভাষা, সুখ-দুঃখ-বেদনা সব বুঝেন!

এই জড়ের মাঝে প্রাণকে আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁকে ধ্যানে স্তব্ধ হতে হয়েছিল। নিজের প্রাণবায়ু স্তব্ধ হয়ে গেল; প্রাণ আছে কি নাই এই নিস্পন্দ অবস্থায় অপরের প্রাণের সাড়া এসে তাঁর প্রাণে বাজ্‌তে লাগল। তখন তিনি বুঝলেন—প্রাণ শুধু চেতনেই যে আছে তা নয়—অচেতন জড় পদার্থেও প্রাণের ক্রিয়া ঠিক একইভাবে চল্‌ছে।

সকল বস্তুর মাঝেই এই প্রাণকেই আবিষ্কার কর্‌তে হবে। আর এই প্রাণকে প্রাণ দিয়েই

আবিষ্কার করতে হবে—প্রাণের মায়া থাক্‌লে প্রাণ আবিষ্কার হয় না। মরে গিয়ে তবে আবার চেতনা লাভ।

উপনিষদেও আছে—"ঈশাবাস্তমিদং সর্ব্বং।" কিন্তু আমরা যা দেখি, তা তো ঈশা দ্বারা ব্যাপ্ত দেখি না। আমাদের গভীর দৃষ্টি নাই—তীব্র আকুলতা নাই। আমাদের কাছে সবই চির পুরাতন, কেননা নূতন কোন তত্ত্ব তো আমাদের অন্তরে জাগ্‌ছে না। সংসার আমাদের কাছে কারাগার, এখানে আমরা আনন্দের কোন উপাদান খুঁজে পাই না। আর আনন্দ পাই না বলেই বৈরাগী সাজি, তা না হলে নিছক আত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়জন আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি?

প্রাণকে আবিষ্কার করতে হলেই হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিতে হবে। যতই আমরা বহির্জগতের দিকে অগ্রসর হই, ততই কেবল ভেদের, মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে থাকে; আর ঐক্যের সন্ধান পাই যতই নাকি অন্তর্মুখী হতে থাকি। আমাদের সবার প্রাণই যে এক, বাহির থেকে এ কথা বুঝা যায় না; কিন্তু আত্মস্থ হয়ে গিয়ে দেখতে পাই সকলের মাঝেই একই প্রাণের স্পন্দন। যাঁরা মৌলিক গবেষণা করেন, আত্মস্থ না হলে কখনো তাঁরা সমস্যার একটা সুস্পষ্ট মীমাংসা পান না। উপর-ভাসা চিন্তা সবাই করতে পারে, কিন্তু মৌলিক চিন্তায় সকলের মন নিবিষ্ট হয় না। যে-কোন মনীষিই নূতন কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যায় যে, তারা এক একটা চিন্তা নিয়ে দিনের পর দিন অনাহার-অনিদ্রায় কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনি ভাবে সমস্ত চঞ্চলতাকে আত্ম-শক্তির অমোঘ বলে স্তব্ধ করে তারপর গিয়ে তারা একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

জড়-চেতন সবার মাঝে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে আমাদের আত্মা যে বিরাট এই ধারণা হয়। যাঁরা ধ্যানে স্তব্ধ হয়ে সর্ব্বত্র এই বিরাট-আত্মার অনুসন্ধান পেয়েছেন তাঁরাই হলেন বিশ্বমৈত্রীর অগ্রদূত। আর সবারই প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, কিন্তু বৈদান্তিকের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; কেননা বৈদান্তিক সবার মাঝে বিরাট আত্মার নিদর্শন পেয়েছেন। জড় বলে তিনি কাউকে উপেক্ষা করেন নি। সবাই যাকে জড় বলে উপেক্ষা করেছে, বৈদান্তিক নিজেরই অফুরন্ত প্রাণশক্তি দ্বারা তারও সুপ্ত প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে সর্ব্বত্রই যে একই প্রাণের স্পন্দন চল্‌ছে তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ধর্ম্মে যদি মানুষকে এক করে, তাহলে এই উদার বৈদান্তিক ধর্ম্মের দ্বারাই একদিন সে আশা সুফল হবে।

সাড়া উপলব্ধি করবার মতন সতৃষ্ণ হৃদয় নাই আমাদের। ঠিক বলতে গেলে আমরাই জড়, আমরাই চিরকাল সবকে উপেক্ষা করে চলে এসেছি —অনাত্মীয় করে রেখেছি। এই নির্দ্দয় ব্যবহারের দরুণ জগতে আমাদের অসংখ্য শত্রু, আর এই শত্রুর হাত থেকে নিজকে নিরাপদ করবার দরুণই আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্যের অপব্যয় হচ্ছে। আধ্যাত্মিক পথে চল্‌তে গিয়েই দেখছি—দেহ বিরোধী মন বিরোধী, শত্রুর বেড়-জালের মাঝেই যেন পড়ে আছি। কাজেই আত্মানুভবের দিকে প্রচেষ্টা না হয়ে, শরীরকে শুকিয়ে মারবার দরুণ হঠযোগ, মনকে স্থির করবার দরুণ পর্ব্বত-গুহা অবলম্বন ইত্যাদি যত কিছু অস্বাভাবিক উপায় আছে, তার দিকেই মন প্রধাবিত হয়।

জগতে কেউ কারও শত্রু নয়, কিন্তু আমরা শত্রু সৃজন করি, নিজেদেরই নির্দ্দয় ব্যবহার দ্বারা। সাংখ্যের "কেবল" পুরুষের এত ভয় কেন?

ভয় কেন ? তিনি গিয়ে কৈবল্যগুহায় আশ্রয় নিয়ে-শুধু শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবার বিভীষিকায়। তিনি তো সবকে জড় বলে অবজ্ঞা করে এসেছেন!

মনে মনে ভয় রেখে মুক্তির আস্বাদন কেউ করতে পারেন না। তাই যাঁরা যথার্থতঃ মুক্ত, তারা পারিপার্শ্বিককে বন্ধন দশায় ফেলে মুক্তির আস্বাদন করতে চান না। সকলের মাঝে আত্মানুভবকে জাগ্রত করে তোল্‌বার দরুণই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা।

বিবেকানন্দ একজায়গায় বলেছিলেন—"Greatest of all guru is he, who realises most deeply the freedom of the disciple." যিনি বাস্তবিকই সকলকে মুক্ত বলে ভাবতে পারেন, আর তাঁর এই সবল ভাবনা দ্বারা অপরেও বুঝতে পারে যে হঁ্যা, সে মুক্ত, তবে না বুঝ্‌ব তিনি আসল মুক্ত-পুরুষ। আত্মা সকলের মাঝেই অনুস্যূত এ কথা সকলেই জানে—কিন্তু এ জানা তো হৃদয় দিয়ে জানা নয়—পুঁথি-পুস্তক থেকে জানা।

শুভ-সংস্কার যদি পেছনে থাকে, তাহলে বেশ ভালই, কিন্তু সে সংস্কার নিয়ে সাধনায়, তপস্তায় নাম্‌তে হবে। গাছ-পালার প্রাণ আবিষ্কার করতে, উপনিষদের সার্ব্বভৌম উদার-বাণী জগদীশ বসুকে সাহায্য করেছিল বটে, কিন্তু আত্মশক্তি দ্বারাই তিনি সে বাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। "সর্ব্বত্র একই প্রাণ"—এ কথা তো সবাই জানতাম, কিন্তু সে জানা কথা সত্য কিনা তার পরখের দরুণ কেউ তো সাধনক্ষেত্রে নামিনি। কাজেই "প্রাণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে" এ কথা জানা সত্ত্বেও, আমরা এখনো জড় বলে অনেককেই অবজ্ঞা করে চলে আস্‌ছি। তাহলে প্রাণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত—এ কথার কোন মূল্য নাই আমাদের কাছে! আমাদের সেই ভাগবত-দৃষ্টি এখনো খুলেনি!

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, যিনি এই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ মুখ্য প্রাণকে জানেন তিনি—"জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি।" তিনিই মহৎ, তিনিই শ্রেষ্ঠ হন। মুখ্য প্রাণকে জানতে হলে, এই স্থূল প্রাণকে নিরুদ্ধ করতে হবে। মুখ্য প্রাণ—"প্রাণস্য প্রাণঃ।" তিনি প্রাণেরও প্রাণ। আমরা মনে করি এই শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলেই বুঝি বেঁচে আছি, এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ হয়ে গেলে আর বুঝি বাঁচতে পারবনা। কিন্তু যোগীরা এই প্রাণ-বায়ুকেও নিরোধ করে কি ভাবে বেঁচে থাকেন? কাজেই বুঝ্‌তে হবে, এই স্থূল প্রাণের চেয়েও আরও সূক্ষ্ম শক্তিশালী প্রাণ রয়েছে। উপনিষদে তাঁকেই মুখ্য প্রাণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কেউ জগতে প্রাণহীন নয়, এ কথা শুধু মুখে বল্‌লে চল্‌বে না, অপরের প্রাণের স্পন্দন নিজের মাঝে উপলব্ধি কর্‌বার দরুণ ব্যাকুল হতে হবে, শুদ্ধ হতে হবে। অহরহঃ আমাদের কাছে নূতন নূতন সাড়া আসছে—কিন্তু আমরা থাকি বহির্জগৎ নিয়ে ব্যস্ত; কাজেই অন্তরের সাড়া পেয়েও উপলব্ধি করতে পারি না। প্রাণকে দেখতে পাই না বলেই বলি, মরা কিম্বা জড়। কিন্তু প্রাণকে পেতে হলে অন্তরের কত গভীরতম প্রদেশে যে তলিয়ে যেতে হয় সে দিকে লক্ষ্য করি না। মানুষ চেতন বলেই তো তার বিষম দায়িত্ব রয়েছে, যাদের মাঝে চেতনা সুপ্ত তাদেরও জাগিয়ে তুলতে হবে। "প্রাণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত"—এই আবেগ নিয়ে সকলের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। আগে নিজের মাঝে প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা চাই, তার পর সেই স্পন্দন যে জগৎজোড়া তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

অনেকেই বেঁচে আছে—কিন্তু সে বাঁচা মরারই মতন। তারা একটু সহায়তা পেলে, একটু সহানুভূতি-সম্পন্ন দরদের দৃষ্টি পেলে, আবার তাজা প্রাণ নিয়ে লাফিয়ে উঠবে। কাজেই আগে নিজে প্রাণকে উপলব্ধি কর—তারপর সেই প্রাণকে ব্যাপ্ত করে দাও!

শাস্ত্র-পাঠ

—(*)—

শাস্ত্র পড়ে হৃদয়ের হাহাকার মিটেনা, বরং বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে প্রাণের অশান্তি আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে শাস্ত্র পড়া কেন? এত দর্শনেও যদি দর্শন না মিলে, তবে জগৎ থেকে এগুলির অদর্শন ঘটে না কেন? অদর্শন লোপেরই সামিল বটে কিন্তু তবু তার ক্রিয়া থাক্‌তে পারে। সমস্ত ভারত থেকে তাই আজ দর্শনের প্রায় অদর্শন ঘটতে বস্‌লেও তার ক্রিয়া লুপ্ত হয়নি। দর্শন পড়ে সেই ব্রহ্মরূপ দর্শনের জন্য মন প্রাণ উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে এমন অধিকারীই যদি না মিল্‌ল, তবে দর্শনের অদর্শন ঘট্‌ছে বল্‌লে অত্যুক্তি হয়না। কিন্তু সত্য জিনিষের লোপ ঘটেনা। অতি সবল-প্রাণ ঋষিদের আকুল-অনুসন্ধিৎসার ফলে যে দর্শনের উৎপত্তি, তা এখন শুধু পুঁথিগত বিদ্যা হয়ে পড়্‌লেও, সকলের কাছেই তাই নয়। শুধু পাণ্ডিত্য অর্জ্জনই সকলের দর্শন পাঠের উদ্দেশ্য নয়। যাদের তাই উদ্দেশ্য, তাদের কাছেই দর্শন অদর্শনের নিদান—পাণ্ডিত্যবুদ্ধিবিজৃম্ভিত নাস্তিকতার জগা-খিচুড়ী। এই শ্রেণীর অধিকারী বেশী বলেই দর্শনের অমন অপবাদ।

চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে—মাটীর ঢেলাকে নয়। মাটীর ঢেলাকে একখণ্ড চুম্বকের উপর রেখে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে সেটা তার সঙ্গে লেগে থাকে বলা যায়না। দর্শন বা শাস্ত্র যেন চুম্বক, যোগ্য অধিকারী লৌহবৎ। অনেক সময়ে দেখা যায় দর্শনের বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অপর সাধারণকে স্তম্ভিত করে পণ্ডিত নাম কেনা যায়, কিন্তু তাতে বুদ্ধির তৃপ্তি ভিন্ন হৃদয়ের অলৌকিক স্পন্দন মিলেনা। কেন মিলেনা, তার উত্তর—সে তা চায়নি। যে চেয়েছে পাণ্ডিত্য, কল্পতরু তাকে তাই দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকার যে দর্শন চেয়েছে, "তাঁর" দেখা পাওয়া যায় বলেই দর্শন—এই নাম শুনে যে আকুল হয়ে ছুটে এসেছে, তার পক্ষে দর্শন দর্শনের উপায় না হয়েই পারেনা। প্রত্যেক দর্শনের প্রথমেই রয়েছে অধিকারী বিচার। জহুরীর কাছেই মাণিক্যের আদর-সম্মান, তাঁরা তারাই মূল্য জানে। এই কথাটী বুঝেই শাস্ত্রকার যাকে-তাকে তাঁর শাস্ত্র দিতেন না। অধুনা শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ এজন্য অপর জাতির কাছে স্বার্থপর বলে গালি খেলেও তাঁরা ঠিক জান্‌তেন—যতই বলুক, অধিকার অর্জ্জন না কর্‌লে কিছুতেই দানের যোগ্য হয়ে গ্রহণও করতে পার্‌বে না—ফলও ঠিক ফল্‌বেনা। বরং হিতে বিপরীত ঘটবে। সেকথা না মেনে হয়েছেও তাই।

ভাল এবং সুন্দর জিনিষের উপর লোভ থাকে সকলেরই। কিন্তু শুধু প্রলুব্ধ হলেই তো চলে না। মূল্য দিয়ে তাকে লাভ করে প্রতিষ্ঠিত রাখার শক্তিও তো চাই। তা আছে কিনা, তাই বুঝবার জন্যই অধিকার বিচার। সে বিচার তো আর কিছুই নয়—শুধু, "এই এই হলে—এমনি করলে, তবে সে পাবার যোগ্য হবে"—এমন ধারার কতগুলি পরীক্ষা। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করতে যেয়েও কতকগুলি সর্ত্ত পালন করতে হয়। যার গরজ সে তাতে আপত্তি করে না। এই ভাব বা আকুলতা, আর লোভ এক কথা নয়। লোভীর সাধ আছে—হজমের সাধ্য নাই। আপনাকে বিচার করে, দুর্ব্বলতা বুঝে সবল হওয়ার সাধনার সবুর সয়না। প্রাণপণ ব্যাকুলতা নিয়েও অপেক্ষা কর্‌বার মত স্থৈর্য্য তার নাই। সে চঞ্চল ঘূর্ণীহাওয়ায় কিছু টিকেনা। ঘুরে ঘুরে স্থান চ্যুত হয়ে অন্যত্র ছিট্‌কিয়ে পড়ে। আর আকুলতা ঠিক উল্টো। যার আকুলতা জেগেছে, তার পক্ষে 'পাব' এই বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে অটল-ধৈর্য্যে, সাধনায়,

কাল কাটান কিছুই নয়। তাই মহাপ্রভুর মুখে ভক্ত চারশো বছর পরে মুক্তি পাবে শুনেও "পাব তো" বলে আনন্দে নেচে উঠেছিল—হতাশ হয়নি।

পাওয়ার জন্য যে ব্যাকুল, অধিকার অর্জ্জনের সাধনা শত দুর্লঙ্ঘ্য হলেও তাকে হতাশ করে না। আকুলতায় প্রাণে অপূর্ব্ব অমিত বলের সঞ্চার করে। সেখানে একান্ত ইষ্টের জন্য তৃষিতের এই স্থূল ইন্দ্রিয়-গুলি পর্য্যন্ত অলৌকিক সূক্ষ্ম শক্তি লাভ করে। তাই কবির কল্পনায় প্রেমিকের পক্ষে শত যোজন দূরস্থ প্রেমাস্পদের পদধ্বনি শ্রবণ, তাকে প্রত্যক্ষ দর্শন কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই চাই আগে পাও-য়ার জন্য তীব্র আকুলতা। পাথরের মত শক্ত মাটীর ঢেলা বৈশাখের রৌদ্রে শুকিয়ে ঝন্ ঝনে হয়ে থাকে বলেই আষাঢ়ের বর্ষণ মাত্রেই নরম হয়ে গলে যায়। তেমনি পাওয়ার আগে সাধনায় নিজকে তৈরী করা চাই। সাধনাগ্নি দ্বারা নিজকে আগে অগ্নিময় করতেই হবে। তারপর সে সাধনায় কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময়ের শান্ত শীতল পরশে আপনি প্রাণ গলে গিয়ে তাঁর চরণে মিশে যাবে।

জগতে যা কিছু পাওয়ার আগে অমনি নিজকে তৈরী করে নিতে হবে। শাস্ত্র পড়তে হলেও অমনি আগে তার অধিকার অর্জ্জন চাই। অধিকারী হয়ে শাস্ত্র অলোচনা করলে তার ফল না ফলেই পারেনা। ঋষির জীবন দিয়ে যে সত্য আবিষ্কার করে গিয়েছেন সে সত্যকে অবলম্বন করে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কত-জন অমৃত লাভ করেছেন, আমাদের বেলাতেই কি সে সত্য অসত্য হয়ে পড়্ল? কখনই নয়। তবে ফলপ্রসূ হয়না কেন? প্রাণের যে অবস্থা নিয়ে, যে আচার অবলম্বন করে এই মহাবস্তুর সমীপে যেতে হয়, কয়জন তা যান? আগে তেমনি ভাবে যথাযথ-রূপে তৈরী হয়ে শাস্ত্র পড়লে, উপযুক্ত গুরু যদি নাও মিলে, শিষ্যের একান্ত আকর্ষণের প্রবল টানে সত্যবস্তু শাস্ত্রের মাঝ দিয়েই তাঁকে পাওয়ার নির্দ্দেশ বলে দিবে। তখন আর অগাধ শাস্ত্র সমুদ্র সাঁতড়াতে হয়না। এক ডুবেই রত্ন মিলে।

কিন্তু সেই একদিককার নির্দ্দেশ পাওয়ার জন্যে প্রাণ পণ করে তা খুঁজতে হবেই। আর সেই নির্দ্দে-শের পরেও তা ধরে চলবার পথও বলে দিবে ঐ শাস্ত্র। মহাজনগণের উপলব্ধ তথ্যই শাস্ত্র। যদি তা বুঝা না যায়, তবেই গুরুর দরকার। সে পরম ও চরম গুহ্য-তত্ত্ব কেহই নিজে নিজে বুঝ্তে পারে-না। তাই প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ সাধকের কাছেই যিনি নিজে পেয়েছেন, সেই সদ্‌গুরু এক সময়ে এসে কৃপা করে ধরা দেন। কিন্তু তার আগে সাধু ও শাস্ত্র বাক্য ধরেই চল্‌তে হয়। পরম শক্তি-ধর সাধক হলেও, প্রাচীন শাস্ত্র বা সাধুবাক্য না মেনে যদি সে নিজেই অভিনব সাধনপন্থা আবি-ষ্কার করে, তবুও গুরুর প্রয়োজন এক সময়ে না এক সময়ে তার নিশ্চয় হয়েছিল বুঝ্তে হবে। কাজেই তাঁর বাক্য ধরে চল্‌তে যখন হয়েছে, তখন প্রকারান্তরে সেই শাস্ত্র বাক্যই মানা হয়েছে তবে শাস্ত্র শব্দের অর্থ সেখানে হয়ত বিভিন্ন হতে পারে। তেমনি গুরু বলতে যে কি, তাও বিভিন্ন-স্তরের সাধকের বিভিন্ন অনুভূতি। কিন্তু সত্যলাভ করতে হলে সকলকেই মানতে হবে যে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক।

তবে শাস্ত্র নিজেই বলছেন—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ
যদ্যপ্যধীতা সহসা ষড়ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥

আচার হীন ব্যক্তি সহসা ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করলেও বেদ সমূহ তাকে পবিত্র করতে পারে না।

পক্ষোদ্গম হইলেও পাখীর ছানাগুলি যেমন জলে পড়লে হাবুডুবু খায়, তার পাখা তখন তাকে রক্ষা করতে পারেনা, তেমনি মৃত্যুকালে সেই আচারহীন বেদ-পাঠককে সমস্ত বেদ পরিত্যাগ করে। চলতি ভাষায় বলে "পোষা টিয়া সারা-জীবন হরিনাম আওরিয়ে মরতে বসে সেই তার ট্যাঁ ট্যাঁ বুলিই সার হয়।" সর্ব্বপ্রকার শীলাচার পালন করে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে শাস্ত্রকে যে নিজের জীবনে মূর্ত্ত করে তোলে, কে বলে তার দর্শনে দর্শন হয়না? বুদ্ধ, শঙ্কর, সবার ঐ এক বাণী—যঃ আচারবান্ পুরুষঃ স বেদঃ। সুতরাং নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয় নায়।

আমার চাওয়া

—*—

বিশ্ব যখন দুল্‌বে তোমার অঙ্গুলির ওই সঙ্কেতে—
হয়ত আমায় রাখ্‌বে তখন লুকিয়ে তোমার অঙ্কেতে
দোল্ খাবনা কাঁপন, দোলায় জীবন আমার চল্‌বে ঠিক
তাই কি সুখ? তাই কি আরাম? চাইনা তারে শতেক
ধিক।
ডুবিয়ে যদি দেয় গো তুফান ধরিত্রীর এই বক্ষকে,
সবার সাথে মৃত্যু ভাল, চাইনা আরাম—কক্ষকে।
আমার বুকে দাও সবারে, সবার মাঝে তোমায় পাই—
সবার মুখে লুকিয়ে ও-মুখ—সেই সে মধুর দেখ্‌তে চাই।
সেই প্রচণ্ড লীলায় যে সুখ, ডরিনা তায় দুঃখকে—
আসল তোমায় থাক্‌লে চেনা, ভয়কি ওরূপ রুক্ষকে?
আমায় নিয়ে তোমার খেলায় বিশ্ব জুড়ে লাগুক্ টান—
মোর জীবনের রসায়নে জগৎ মাঝে জাগুক প্রাণ।

সৌন্দর্য্যের সাধনা

—*—

সত্যের সৌন্দর্য্য আলাদা জিনিষ। সে সৌন্দর্য্য কামনাকে উত্তেজিত করিয়া অন্তর্দাহের সৃষ্টি করে না; বরঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ণ হয় তাহাতে। সত্যকে ভিত্তি করিয়া যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, সে সৌন্দর্য্য মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া পরিণামে দুঃখ দেয় না—সে সৌন্দর্য্যের দৈবী-প্রভাবে কামনাতুর মানুষেরও অন্তর্জ্বালা নিবারিত হইয়া যায়। কাজেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিত Baungarten (বমগার্টেন) যে বলিয়াছেন, "The aim of beauty itself is to Please and excite a desire"—ইহা ঠিক খাঁটী সৌন্দর্য্যের লক্ষণ নয়। আসল সৌন্দর্য্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত—সে সৌন্দর্য্যের আভায় কামনার প্রশান্তি হয়। সেই সৌন্দর্য্যকে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করা যায় না, তাহার উপভোগ সূক্ষ্ম উপভোগ; সর্ব্ব অঙ্গ শীতল হইয়া যায় সেই সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় মাধুরীতে। উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে বুঝিবে, সেই সৌন্দর্য্যের মাঝে কামনার বীজ নিহিত রহিয়াছে, আর চিত্ত যদি সংযত হইয়া ক্রমশঃ প্রশান্তির পথে অগ্রসর হয় তাহা হইলে বুঝিবে সে সৌন্দর্য্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

এই জন্যই খাঁটী সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে সংযমের প্রয়োজন। কুমার সম্ভবের পঞ্চম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

> ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
> সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
> অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
> তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ॥ ২

—"পার্ব্বতী সৌন্দর্য্য বলে মহাদেবকে বশীভূত করিতে না পারিয়া তপঃপ্রভাবে তাঁহার প্রেম আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোক্তা হইলেন। (হইবারই তো কথা) এরূপ না হইলে, তাদৃশ প্রেম ও মৃত্যুঞ্জয়রূপ পতি, এই দুইটী কেমন করিয়া লাভ হইতে পারে?"

পার্ব্বতী প্রথমতঃ যে সৌন্দর্য্য লইয়া মহাদেবকে ভুলাইতে গিয়াছিলেন, তাহা রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট দেহের স্থূল সৌন্দর্য্য মাত্র। মহাদেব এই সৌন্দর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেননা তিনি এই স্থূল সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল নন। পার্ব্বতী উপেক্ষিত হইয়া নিজের এই সৌন্দর্য্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাহার পর তপঃক্লিষ্ট দেহ নিয়া যখন পুনরায় পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন মহাদেব সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় পার্ব্বতী ক্ষীণ-কলেবরা হইয়া গিয়াছিলেন, তবুও সাধন-ক্লিষ্ট দেহের যে অপূর্ব্ব সুষমা তাহাই মহাদেবের মন হরণ করিতে পারিয়াছিল। কাজেই সংযমীর মনকে আকৃষ্ট করিতে হইলে সত্যে প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যেরই প্রয়োজন। সাধনাগ্নি দ্বারা শরীরের মলিনতা বিদগ্ধ হইয়া গেলে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহাই পবিত্র সৌন্দর্য্য; সেই সৌন্দর্য্য দ্বারা দেবতার মনকেও হরণ করিতে পারা যায়। Ruskin Modern-Painterএ একজায়গায় বলিয়াছেন—"Nothing can be beautiful which is not true." প্রাচ্যের ধারণার সঙ্গে ইহা বেশ মিলিয়া যায়। বাস্তবিক যাহা সত্য নয়, তাহা সুন্দরও নয়। যৌবনের সৌন্দর্য্য সত্য নয়, কেননা তাহা জোয়ারের প্লাবনের মত অকস্মাৎ ভেসে উঠে, আবার অল্প সময়ের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু যৌবনে যদি সাধনা দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল-সৌন্দর্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, তখন, এই যৌবনই স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠে।

শক্তির উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ কখনই সৌন্দর্য্য নয়। সৌন্দর্য্য জিনিষটী সংযমকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ণ বিকশিত হয়। যৌবনে স্বভাবতঃই অফুরন্ত শক্তি

আসে, কিন্তু এই শক্তি সংযমের অভাবে মানুষকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট উত্তেজনায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জীবনকে সৌন্দর্য্যে-সুষমায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলেও এই যৌবনাবস্থায়ই সাধনার প্রয়োজন। এক কথায় বলিতে গেলে তপস্যা ছাড়া কখনো আসল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

চিত্ত অবিশুদ্ধ বলিয়াই, স্বভাবতঃ যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহাকেও আমরা অসংযমের দৃষ্টি দ্বারা আহত করি। কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে সেই তথ্যের দিকে মনোনিবেশ না করিয়া—বাহিরের সৌন্দর্য্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা না হইলে সৌন্দর্য্যের নিদান খুঁজিতে গেলেই চিত্ত সংযত না হইয়া পারে না। যে শিল্পী যত গভীর-ধ্যানপরায়ণ, যত সংযমী, তাহার সৃষ্টিও তত সূক্ষ্ম-সংযত-সৌন্দর্য্যের আধার হয়। আর চিত্ত সংযত না হইলে, সুন্দরের সৃষ্টি হইতে পারে না। আদি শিল্পী ভগবান এই জগৎ সৃজনের পূর্ব্বে ধ্যানে কতকাল স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি।

রুচি ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া আসে। কাজেই কোন্‌টা ঠিক খাঁটী রুচি, তাহা প্রথমেই ধরা পড়ে না। স্থূল হইতে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা একটু আত্মানন্দের আভাস কোন সময় পাইয়াছে, তাহাদের চিত্তের গতি ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর না হইয়া পারে না। ধ্যানে স্তব্ধ হইয়া এমন করিয়াই ক্রমশঃ শিল্পী সৌন্দর্য্যের মূল নিদানের সন্ধান পায়। তখন শিল্পীর সৃষ্টি অত্যন্ত সহজ-সরল হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সহজ সরল সৌন্দর্য্যের মূল্যই হয় বেশী। অনেক শিল্পী ছোট ছেলেদের সহজ সরল ভাব ফুটাইয়া তুলিবার দরুণই আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সাধনা বাস্তবিকই সত্যের সাধনা। ছোট ছেলেদের অন্তঃকরণে মালিন্য প্রবেশ করে নাই, তাই তাহারা যাহা করে তাহাই এত সুন্দর লাগে। তাহাদের ভিতর প্রবঞ্চনা নাই, তাই তাহাদের সৌন্দর্য্যে আমাদের প্রবঞ্চিত করে না।

সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাকে অক্ষত রাখিতে হইলেই অন্তরের লোলুপতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। অর্থাৎ ভিতরের কামনার দৈত্যটীকে নির্জ্জিত রাখিতে হইবে। দৈত্যের পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা; তাই সে উপভোগের ধার ধারে না, সে সবকে গ্রাস করিতে চায়। ভোগীও সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করিতে চায়, কিন্তু ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়ে বলিয়াই সৌন্দর্য্যের যে মহিমাটুকু রহিয়াছে তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইবার অবকাশ পায় না। সুন্দরকে সে কখনো শ্রদ্ধা করিতে পারে না—তাই সুন্দরকে উপ-ভোগ করিবার সৌভাগ্যও তাহার কস্মিন্‌কালে হইয়া উঠে না। বাহিরের প্রয়োজন মিটাইতে পারিলেই যেন সৌন্দর্য্যের কাজ শেষ হইয়া যায়, কাজেই সুন্দরকে সে তাহার স্থূল-ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর অধিক কিছু ভাবিতে পারে না। কামনায় অন্ধ হইয়া তাহার দৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করিবে আর কে?

পেটের ক্ষুধা যাহা, তাহা সাধারণ কিছু দিয়াই মিটানো যায় বটে, কিন্তু যাহারা পেটুক নয়, যাহাদের ভিতর সংযম শক্তি রহিয়াছে তাহারা দুই দণ্ড অপেক্ষা করিয়া থাকিতেও রাজী, কিন্তু তাহারা কিছুতেই যাহা-তাহা গিলিতে পারে না। ভোগ উভয়ই চায় বটে, কিন্তু সংযমী আর অসংযমী পেটুকের মাঝে এই পার্থক্য। একজনের না হইলেই চলে না—সে দাস; আর একজনের হইলেও চলে, না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। সংযমী অপেক্ষা করিতে পারে—ইহাই তাহার বিশেষত্ব।

কামনায় দিশেহারা হইয়া যাহাকে আমরা বুকের কাছে টানিয়া আনিতে চাই, তাহা যে আমাদের বুকেই রহিয়াছে। তাহার সঙ্গে যে আমাদের পুর্ব্বেই মিলন হইয়া আছে—আবার মিলন কিসের? ভাল-

বাসা মানেই হইল—আত্মরতি। কিন্তু মানুষ আসল ছাড়িয়া তাহার ছায়ার দিকেই ছুটিতে ভালবাসে। যাহাকে অন্তরে পাইয়াছি, তাহার মূল্য বেশী নয়, যাহাকে বাহিরে পাওয়ার দরুণ চঞ্চল তাহার মূল্যই যেন বেশী। এমন করিয়াই মানুষ পাওয়া-ধনকেও অবজ্ঞা করিয়া চলে! কিন্তু এই ছুটাছুটীতে কি মানুষের ভিতর তৃপ্তি আনিতে পারিয়াছে?

সংস্কার চাই—সাধনা চাই। যাহা পাইয়াছি, সাধনার অভাবে তাহাতেও যথেষ্ট মালিন্য প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই আত্ম-শোধন করিতে হইবে প্রথমেই। আনন্দ কর, কিন্তু খবরদার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইও না!

পেটের ক্ষুধা মিটানো ছাড়া জিনিষের আরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধার্হ, কাজেই তাহা প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে। সৌন্দর্য্যকে সংযমের দৃষ্টি দ্বারা উপভোগ করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে যাওয়া অন্যায়।

ভিতরে কামনার কীট থাকিলে সৌন্দর্য্যকে দংশন করিবেই করিবে। কাজেই অনাহত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, সাধনাগ্নি দ্বারা শরীর-মনকে বিশুদ্ধ করিয়া ফেলিলে তারপর। বিনা সাধনায় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যকে অটুট রাখিতে হইলেই সাধনার প্রয়োজন।

সৌন্দর্য্য শুধু কমনীয়তায়ই প্রকাশ পায় না, পাহাড়-পর্ব্বতের মাঝে কমনীয়তা মোটেই নাই, অথচ পাহাড়-পর্ব্বত দর্শনে মন বিরাট-আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া যায়। পর্ব্বত সত্যেরই প্রতীক, তাহার অচল অটল মহিমায় সকলকেই মুগ্ধ করে। বাহিরে তাঁহার সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু অন্তরের বিরাট গম্ভীর মহিমায় সকলকেই সে সত্যের দিকে আকর্ষণ করে। খাঁটী সৌন্দর্য্য ভিতরে একটা স্বর্গীয় আনন্দের স্থিতি-প্রবাহ সৃষ্টি করে, হৃদয়ের ঊর্দ্ধে ছাড়া নীচে তাহার গতি নাই!

জগতে সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র, কিন্তু সেই সুন্দরকে অটুট রাখিবার শক্তি, পবিত্রকে হৃদয়ের নির্ম্মলতা দ্বারা আবাহন করিবার যোগ্যতা আমাদের মোটেই নাই। যিনি সত্যং, শিবং, সুন্দরং—তাঁহাকে হৃদয়ে আসন দিতে হইলে আগে চাই চিত্তের বিশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলেই সাধনার প্রয়োজন।

ভিতর-বাইর



নীরব রবো ভাবি যখন
চিত্তে কলরব—
মৌন বাহির, অন্তরেতে
শুধুই হাহারব।

চাইনা অমন সাধুগিরি,
মুক্ত কর মোরে—
ভিতর কর সুন্দর আগে
থাক্‌বেনা বা'র প'ড়ে।

রাসলীলা

—*—

একটা চলতি কথা আছে যে "দেবতার বেলায় লীলা-খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।" শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা পরীক্ষিৎও এই সন্দেহ নিয়াই ব্রহ্মজ্ঞ শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

> সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
> অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বর।
> স কথং ধর্ম্ম সেতূনাং বক্তা-কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
> প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ ২৭

—হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমন নিমিত্তই ভগবান্ জগদীশ্বর অংশে অবতীর্ণ হন, তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম-মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়াও কিরূপে তদ্বিপরীত (অধর্ম্ম) আচরণ করিলেন? হে মুনে! ইহা কলঙ্ক ভক্ষণাদিবৎ অধর্ম্ম মাত্রই নহে, কিন্তু পরস্ত্রীসংস্পর্শ মহা সাহস!

যদি বলেন—

> আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।
> কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ২৮

—আপ্তকাম পুরুষের ইহা অধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে যদুপতি তো আপ্তকামই, তিনি কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন। হে সুব্রত! ইহাতে আমার মহান্ সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয়ের নিরসন করুন।

প্রত্যুত্তরে শুকদেব বলিলেন—

> ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
> তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ২৯
> নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বর।
> বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোহব্ধিজং বিষং॥ ৩০
> ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবা চরিতং ক্বচিৎ।
> তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তদৃসমাচরেৎ॥ ৩১

—"হে রাজন! প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অধীশ্বর দিগেরও ধর্ম্মব্যতিক্রম ও সাহস দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা তেজস্বী ছিলেন, এই জন্যই তাঁহাদের কোন দোষ বা পাপ হয় নাই, যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ নহে। কিন্তু যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহাদের মন দ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে। যেমন রুদ্র ব্যতীত অন্যব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে বিনষ্ট হয়, তেমনি মূঢ়, দেহপরতন্ত্র পুরুষ ঐরূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে।

হে মহারাজ! আপনি আশঙ্কা করিবেন না যে, তাহা হইলে সদাচারের প্রামণ্য কি প্রকারে সম্ভব? তাহার সমাধান এই যে, ঈশ্বরদিকের বচন সত্য, অতএব তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা অবশ্যই আচরণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের আচরিত সর্ব্বত্র সত্য নহে. কোথাও কোথাও সত্য হয়; অতএব তাঁহাদের বাক্যে যাহা যাহা কথিত অবিরুদ্ধ সেই সকলেরই আচরণ কর্ত্তব্য।"

অল্প কথা দ্বারাই শুকদেব পরীক্ষিতের সংশয় ভঞ্জন করিলেন। এখন দেখিতে হইবে, এই শ্লোক গুলির মর্ম্মার্থ কি? পরীক্ষিতের মনে যে সন্দেহ উঠিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক এবং সকল মানুষের ভিতরই এই সন্দেহ জাগে। এই জায়গায় শুকদেবের দুইটী কথাই প্রনিধান যোগ্য। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন, যাঁহারা ব্যতিক্রম করিয়াছেন এবং অস্বাভাবিক সাহস দেখাইয়াছেন, তাঁহারা তেজীয়ান। আর তেজীয়ানের গায়ে কোন দোষই স্পর্শ করিতে পারে না। উদাহরণ দিয়াছেন—অগ্নিকে। অগ্নি সমস্তকে পুড়াইয়া উদরস্থ করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন পাপ হয় না। কেননা অগ্নিও তো প্রচণ্ড তেজশালী! ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তেজীয়ান

পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি যে গোপীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, ইহা দোষের নয়।

এই উপদেশের পরও শুকদেব আর একটী মূল্যবান কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, মহান্ পুরুষদিগের বচনই সত্য, আচরণ সর্ব্বত্র সত্য নহে, সুতরাং বুদ্ধিবান ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের বাক্যই প্রতিপালন করিবেন। ইহা কিন্তু খুব খাঁটী কথা। আর আমাদের পতনও হয় এই কথাটাকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে পারি না বলেই। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া, অনেক সময় আমরা বিলাসের পথে অগ্রসর হই। তাঁহারা গুণাতীত, অতএব তাঁহারা যাহা আচরণ করিবেন, প্রবর্ত্তক সাধকের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্যাণকর নয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে, কঠোর নিয়ম সংযম পালন করিয়া চলার ব্যবস্থা রহিয়াছে, এখন সেই ব্রহ্মচারী যদি একজন পরমহংসের শিষ্য হইয়া থাকেন, এবং নিয়মকানুনের প্রতি নিষ্ঠা না রাখিয়া পরমহংসের মতই আচরণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার জীবনে উন্নতি হওয়ার কোন আশা আছে? গুণাতীত যিনি, তাহার দ্বারা নিয়ম সংযমের বিধি প্রতিপালিত না হইলেও কোন প্রত্যবায় বা অকল্যাণ হয় না, কিন্তু গুণাধীনের পক্ষে সে যে নজীর খাটিবে না। তাহাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রত পালন করিয়া চলিতেই হইবে।

তেজীয়ানের পক্ষে কোন দোষ হয়না বটে, কিন্তু সেই তেজীয়ান্ সহজ তেজীয়ান্ নয়। অগ্নির মত, রুদ্রের মত তেজীয়ান হওয়া চাই; গরল দিলেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। অমৃত-হলাহল যাঁহার কাছে সমতুল্য, তিনি নির্ব্বিকার, আসক্তিরহিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভোগকে ছাড়িয়া নির্ব্বিকার চিত্তে নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে কি? তারপর হলাহলকে যিনি হজম করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে সর্ব্বদা ধ্যানে বিভোর হইয়াই থাকিতেন। তিনি ছিলেন চির তপস্বী—যতি!

দুর্ব্বল মানুষ ভোগের, বিলাসের পথকেই নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে জানিয়াই শুকদেব পরের উপদেশটি দিলেন। "তেজীয়ানের পক্ষে কোন দোষ হয়না" এই সার্ব্বভৌম উপদেশে দুর্ব্বল অসংযমী, যাহাদের ভিতর এখনো সংযম দ্বারা বীর্য্য স্থিতিলাভ করে নাই তাহারাও তেজীয়ানের মত ব্যতিক্রমের পথেই চলিতে চাইবে। সুতরাং শুকদেব দূরদৃষ্টি দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া আগেই সেইদিক্ সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়া রাখিলেন।

চোখের সম্মুখে যাহা দেখিতে পায়, তাহাকেই মানুষ স্বভাবতঃ অনুসরণ করিয়া চলে। স্থূল আচরণ দেখিয়া, অকল্যাণের পথে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, শুকদেব মহাপুরুষদের বাক্যকেই আদর্শ ধরিয়া চলিতে বলিয়াছেন। তাহার পর এই কথাও বলিয়া রাখিয়াছেন, আচরণ যদি অবিরুদ্ধ হয়, তাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে কোন ক্ষতির কারণ নাই।

রাসক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সংযমের নিদর্শন পাই, তাহাতে বাস্তবিকই তিনি যে একজন শক্তিধর তেজীয়ান্ মহান পুরুষ ছিলেন ইহাতে আর কোন সন্দেহই উপস্থিত হয়না। রাস-ক্রীড়ার বর্ণন, যথা—

এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ

—সত্য সঙ্কল্প ভগবান্ অনুরাগী সখিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শারদীয় পূর্ণিমা নিশীথে কামজয় পূর্ব্বক ক্রীড়া-সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

টীকাকার শ্রীধর স্বামী আরও স্পষ্ট করিয়া ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরম ধাতুঃ নতু স্খলিতো মন্তেতি কামজয়োক্তিঃ।

পরন্তু ভগবান্ ঐরূপে যুবতীবৃন্দ সহ কেলি করিলেও তাঁহার চরম ধাতু (শুক্র) আপনাতেই অবরুদ্ধ ছিল, স্খলিত হয় নাই। কতখানি সংযম-শক্তি থাকিলে পর মানুষ এইরূপ নির্ব্বিকার হইয়া থাকিতে পারে? ইহা কি সহজ কথা? যুবতী রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও যাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা জাগেনা—যিনি ইন্দ্রিয়কে এত আত্মাধীনে রাখিয়াছেন তিনি বাস্তবিকই তেজীয়ান্ বটে। এইরূপ তেজীয়ানের পক্ষে রাস-লীলা তো কোন দোষের নয়।

এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ গোপী-দের নিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই লীলা সার্থক হইয়াছিল। রাস-লীলা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—সহজ, কিন্তু সেই লীলার মূলে অর্থাৎ যিনি লীলার আধার তাঁহাকে কঠোর আত্ম-পীড়ন করিতে হইয়াছিল। কামকে যিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি তেজীয়ান্ নন? ইচ্ছামাত্র যিনি চঞ্চল মনোবৃত্তিকে সংযত করিতে পারেন, তাঁহাকে কি কম সাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছে? ভোগের বস্তু সন্মুখে রাখিয়া যিনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন—তিনি কি সহজ মানুষ?

অনুকরণ করি আমরা বাহিরটাকে, কিন্তু বাহিরের এই সৌন্দর্য্য বা বিলাসের মূলে যে আত্ম-নিপীড়নের কত কঠোর তপঃশক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহার দিকে তো একবারও ভ্রূক্ষেপ করি না। কামুক আত্মাবরুদ্ধ বিহারের মহিমা কি বুঝিবে? সংযমশক্তি দ্বারা মানুষ যে উপভোগ করে, সেই উপভোগের তুলনায় কামনা-জর্জ্জরিত ভোগ কত তুচ্ছ!

সাধনা না করিয়াই চায় মানুষ সিদ্ধ হইতে। শাস্ত্র ঘাঁটিয়া কেবল সুযোগ সুবিধার সূত্রগুলিই বাহির করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা নিয়া, রুচির বিকারে কতজনই কত অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকারের ব্যাখ্যাটী একটু তলাইয়া বুঝিলেই, রাস-লীলার নিগূঢ় অর্থের স্বর্গীয়-জ্যোতিতে অন্তর আপনি নিবৃত্তিভাবাপন্ন হইয়া যায়।

চিন্তার খসড়া

—(*)—

কারও কারও সহজেই একটা কথা তীরের মত এসে প্রাণে বিঁধে যায়, কারও চিত্ত বিনা চেষ্টায় তন্ময় হয়ে যায়, কিন্তু যাদের চিত্ত সহজে এক বিষয়ে নিবিষ্ট হতে চায় না তাদের কি চিত্ত নিবিষ্ট করার কোন উপায় নাই? এটা জানা কথা যে প্রায় সবাই বল্‌বেন যখন চিত্ত স্থির হতে চায় না, তখন তাকে জোর করে এক বিষয়ে নিবিষ্ট করে রাখ্‌তে হবে, এ কথাটার মূল্য কতদূর তা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে নেমেই বুঝতে পারি। এক বিষয়ে চিত্ত স্থির হতে চাচ্ছে না, তবুও তার উপর জোর-জুলুম করে চিত্ত যে আরও কত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তা বল্‌বার নয়। আরও বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পরার কারণ শাস্ত্র-ভয়। ধ্যান করতে বলা মাত্রই যদি তোমার চিত্ত স্থির না হয়ে গেল তাহলে তো আর তোমার উপায়ই নাই। আতঙ্কে, ত্রাসে যতই আমরা চিত্তকে স্থির করতে যাই, ততই দেখি চিত্ত অস্থির হয়ে উঠে বেশী। যে

চিন্তা জাগে তাকেই গলা টিপে মেরে ফেলতে গিয়ে রক্তবীজের মত আরও অসংখ্য বাজে-চিন্তার সৃজনের প্রশ্রয় দিই আমরা। এতে হয় কি—ধ্যান করতে বসে চিত্ত স্থির হওয়া দূরে থাকুক, বাজে চিন্তার ঝাঁকুনিতে আমাদের আরও বেশী চঞ্চল করে তোলে। লক্ষ্যটাও আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন হতে থাকে তখন অর্থাৎ চিত্তকে নিবিষ্ট করার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে, চিত্ত-চাঞ্চল্যের উপদ্রব গুলিকে বিনষ্ট করার দিকেই বেশী ঝোঁক এসে পড়ে। এমনি করে পূজা, জপ-তপ যে কোন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানই করতে বসি না কেন, চিত্তের দিক দিয়া কোন শুভ পরিণাম দেখি না বলে, ক্রমশঃ চিত্তের মাঝে একটা অবিশ্বাস সহজেই এসে পড়ে। তখন তপ-জপ-ধ্যান সব ফুৎকারে উড়িয়ে দেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই অশুভ পরিণামের দরুণ দায়ী কে?

আর কিছু না, বল্‌তে গেলে সবই শিক্ষার দোষ। আমরা চাই চিত্ত স্থির থাক্, কিন্তু চিত্ত-স্থিরের উপায়গুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ তার বিরোধী। প্রথম ধ্যান কর্‌তে বসে গিয়ে মনের মাঝে অলক্ষ্যে অনেক চিন্তা জাগে, কিন্তু সে সব চিন্তাকে জাগ্‌তে দিয়ে যদি আমরা আসল লক্ষ্যের প্রতি মনটাকে নিয়োজিত রাখতে পারি, তাহলেই কতক্ষণ পর দেখি, আপনি সব জঞ্জাল সাফা হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন আর প্রতিকূল বলে কোন কিছু থাকে না, কাজেই ধ্যানেও চিত্ত সহজে তন্ময় হয়ে যায়। আসন করে বসবা মাত্রই অম্‌নি চিত্ত স্থির হয়ে যাওয়া সহজ নয়, এমনও মানুষ আছে, যারা naturallyই scatter-brained, তাদের দিয়ে কি কোন মহৎ কাজ হয় না, বা তাদের চিত্ত-স্থিরের কি কোন উপায় নাই? William James একজায়গায় বলেছেন—"Some of the most efficient workers I know are of the ultra-scatter brained type. One freind, who does a prcdigious quantity of work to get ideas on any subject, he sits down to work at something else, his best results coming through his mind wanderings."

অবশ্য সবারই যে এই অবস্থা তা নয়, কারও কারও চিত্ত বিনা ভ্রমণেও সহজেই এক বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এ কথা ঠিক—"From an unchaning subject the attention inevitably wanders away" অনেক সময় দেখা যায়, এক বিষয়ে চিত্ত যখন স্থির হয়ে আসে, তখন বাজে অনেকগুলি চিন্তার ফেঁকৃরি মনের মাঝে উদয় হতে থাকে।

আধ্যাত্মিক জগতে বিলাস না থাকতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য থাকবে না কেন? চিত্ত স্থির হওয়ার অর্থ আমরা এই ধরে নিই যে, একবিষয় ছাড়া মনে আর কোন চিন্তাই জাগ্‌বে না, জাগ্‌লে আহলে আর চিত্ত-স্থির হল কৈ? এই ধারণার বশবর্ত্তী যারা, তাদের অনেকের কথা জানি, ধ্যান করতে গিয়ে এত সহজে তাদের চিত্ত নিবিষ্ট হয়ে যায় যে, শেষে তারা একেবারে নিদ্রায় অচেতন, সেই ঘুম যখন ভাঙ্গে তখন কোন রকম একটা সাত্ত্বিক ভাবেরও লক্ষণ দেখ্‌তে পাই না তাদের চোখে-মুখে। কাজেই এরূপ ধ্যানে কি লাভ?

চিত্ত স্থির হয়ে এলে, নূতন নূতন অসংখ্য ভাবের স্রোত এসে হৃদয়ে প্রবেশ করবে। পরিণাম বন্ধ হবে না, তবে কিনা সে পরিণাম হবে ঊর্দ্ধ পরিণাম। আর সেই পরিণাম পরিণামের মতই হতে থাকবে কিন্তু লক্ষ্য থাকবে এক। অর্থাৎ এক বিষয়ে চিত্তটা নিয়োজিত রেখে অসংখ্য ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিলে, লক্ষ্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মোটকথা প্রাণের আবেগ থাকা চাই, প্রাণে যে একটা কিছু চাচ্ছে, এতে আর কোন সন্দেহ না

থাকলেই হল, তারপর লক্ষ্য আপনি ঠিক হয়ে আসবে। এ সম্বন্ধে Jamesও বেশ সুন্দর বলেছেন, "No matter how scatter-brained the type of a mans successive fields of consciousness may be, if he really care for a subject, he will return to it incessantly from his incessant wanderings, and first to last do more with it and get more results from it, than another person whose attention may be more continuous duing a given interval, but whose passion for the subject is of more languid and less permanent sort."

যোগ-শিক্ষা সম্বন্ধেও এই cumpulsionএর দরুণ অনেক শ্রম বৃথা পণ্ড হয়েছে। মনের দিকে না তাকিয়ে, চিন্তার-বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করে, শুদ্ধমাত্র কতকগুলি যোগের কসরৎ শিক্ষাতে লাভ হয়েছে কি, না, কতকগুলো চিম্‌টা পিটানোতে ওস্তাদ যোগীর সৃষ্টি হয়েছে। তপস্যার ক্লেশে তাদের বুদ্ধি বিচারের ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। যোগ করার এই কি তাৎপর্য্য? অথচ শাস্ত্র বলে, এই যোগ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

চিন্তা, ভাবনা, আদর্শ যদি highly abstract হয়, তাহলে তাকে চিত্তে সতত উজ্জ্বল রাখতে হলেই concrete examplesএর প্রয়োজন। তা না হলে চিত্ত সহজেই এলিয়ে পড়ে, অবসাদগ্রস্ত হয়। "ব্রহ্ম এক," জগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম ছাড়া জগতে কিছু নাই, এই তত্ত্বগুলি বুঝাতে গিয়েই শাস্ত্রকার কত উপদেশ, উদাহরণ, তটস্থ লক্ষণ দিয়েছেন তার অন্ত নাই; এ সবের উদ্দেশ্য কি? না, ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা স্পষ্টোজ্জ্বল অনুভূতি নিয়ে সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে থাকা। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, ব্রহ্ম মনের মাঝে আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেন।

যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি মুনিও সমাধিপাদের এক সূত্র দিয়েছেন—"যথাভিমতধ্যানাদ্বা।" অর্থাৎ যাতে তোমার মন প্রফুল্ল হয়, শান্ত হয় তারই ধ্যান কর। এই একটা সূত্র দ্বারাই তো ধ্যানের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা হল। কত উপায় রয়েছে, সবই যে এক পথ ধরেই সিদ্ধিলাভ করবে তারই বা কি মানে?

এমন অনেক আছে, যাদের একঘেঁয়ে কীর্ত্তন, ধ্যান, জপ-তপ ভাল লাগে না; হয়ত তারা যদি সে দায় হতে মুক্ত হয়, তাহলে অন্য একটা interesting কাজ নিয়ে আপনি তন্ময় হয়ে যায়। কিন্তু আমরা করব কি? না, তাকে শেষ পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে ঘুরপাক খাইয়েই মারব। এমনি করে যাদের ভিতর সত্যিকার স্বাতন্ত্র্যও জাগে, তাদেরও আমরা সকলের সঙ্গে বহিরঙ্গ আচার, নিয়মানুষ্ঠানেই আবদ্ধ রেখে প্রাণকে নিস্তেজ করে দিই। এতে হচ্ছে কি? ধর্ম্মে, সমাজে সর্ব্বত্র একটা প্রাণহীন ভাবে ছেয়ে ফেলেছে!

যাদের ভিতর নূতন নূতন চিন্তা জাগে না, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা যারা মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে নিতে চায় না, তাদের পক্ষে যে কোন একটা সাধন-ভজনের অভ্যস্থ পথ ধরে চল্‌লেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাস্তবিকই যাদের প্রাণ শুনা-কথায়, বা আদেশ-উপদেশে মান্‌তে চাচ্ছে না, তাদের কি স্বাতন্ত্র্য দিলে তারা ধ্বংসের পথে যাবে? এ কথনো হতে পারে না? যাদের প্রাণ একটা কিছুকে চাচ্ছে, এবং সে চাওয়া আত্যন্তিক চাওয়া, তারা বিভিন্ন পথে ঘুরে মরলেও আবার এসে একজায়গায় স্থির হবেই হবে। তাদের সে ঘুরা নিরর্থক নয়—বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তাতে! আর তারা তো একলক্ষ্যের আকুলতায়ই অমন চঞ্চল হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিল।

একজন হয়ত এসে বল্‌লে, ধ্যান কর্‌তে বসে তো আমার মন স্থির হয় না, আরও বাজে চিন্তা জাগে;

তখন তার প্রতি কি উপদেশ দেওয়া হয়, না, চিন্তা জাগলে হবে কি করে? এত বড় একটা সমস্যার উত্তর এক কথাতেই নিষ্পত্তি। এর ফলও হচ্ছে তেমনি, উপদেষ্টার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা লোপ পেতে বসেছে। তারপর কেউ যদি একটু সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে উপদেশ দেন, তিনিও বল্‌বেন, মন যখন চঞ্চল হবে, তখন একলক্ষ্যে মনকে স্থির রাখতে চেষ্টা কর্‌বে। তাঁর উপদেশে এইটুকু নূতনত্ব যে একটা উপায় বলে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য দেখতে গেলে এ উপায়েরও কোন মূল্য নাই! অর্থাৎ যার ভিতর বাজে চিন্তা জাগ্‌ছেই, তাকে সেই চিন্তা নিয়েও পার হবার উপায় কেউ বলে দিতে পারল না! অথচ এই চঞ্চলতা নিবৃত্তির যে উপায় নাই তা-ও তো নয়! একটুখানি ছেড়ে দিলেই আপনি আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

সত্যকে নানা দিক্ থেকে বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে সত্য ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির মালিন্যও দূর হয়। কিন্তু প্রায়েরই লক্ষ্য কিম্বা আদর্শ যা, তা হচ্ছে অচল, প্রাণহীন, কাজেই প্রাণহীনের উপাসনা করে, সাধকের নিজের প্রাণও মরে যায়।

শঙ্করাচার্যের "নির্ব্বিশেষ বাদে" অনেক ক্ষতি করেছে। এই নির্ব্বিশেষ সত্যকে আদর্শ রেখে, অনেকেই এমন কি সাকার উপাসকের চেয়েও অধঃপতিত হয়েছে। নির্ব্বিশেষ বাদে, সাধকের মাঝে একটা ঔদাসীন্য এনে দেয়! তাতে হয় কি, লক্ষ্য ক্রমশঃই লক্ষ্য থেকে অদৃশ্য হতে থাকে, শেষে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে একটা অন্ধকার ময় নৈরাশ্যে পতিত হয় শুধু।

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এতে অনেকেই মনে করে জগৎ-জ্ঞান লোপ করে তবে বুঝি ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এ হচ্ছে নির্ব্বিশেষ-বাদেরই প্রতি-ক্রিয়া। আসলে কিন্তু তা নয়। জগৎকে চোখের সম্মুখে রেখে তবে না ব্রহ্ম-জ্ঞান আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে। জগৎ আছে বলিয়াই তো ব্রহ্ম আমাদের কাছে এত উজ্জ্বল আদর্শ। সকলকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম বড় হয় কি করে—সকলকে নিয়েই না ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বা বিরাটত্ব। মনন শক্তির উপর জোর না দিয়ে, জোর দিই আমরা কতকগুলি বাইরের কস্‌রৎএর উপর। এতে কি চিত্ত স্থির হয়? সত্য এক বটে, কিন্তু তাঁকে পাওয়ার প্রণালী এক নয়। কাজেই আগ থেকে মনকে এক চিন্তার ছাঁচে ঢালাই করে, যে সত্য মানুষের অন্তরে নব-নব রূপে উদ্ভাসিত হয়, তাকেই "কেবল" রূপে আমরা অনুভব করি। আর এই কেবল একটা বিরাট অন্ধকার মাত্র।

চিত্ত স্থির কর্‌বার উপায় সম্বন্ধে James আর একজায়গায় বেশ সুন্দর বলেছেন—Try to attend steadfastly to a dot on the paper or on the wall. You presently find that one or the other of two things has happened: either your field of vision has become blurred, so that you now see nothing distinct at all, or else you have involuntarily ceased to look at the dot in question, and are looking at something else. But, if you ask yourself successive questions about the dot,—how big it is, how far of, what shape, what shade of colour etc, in other words, if you turn it over, if you think of it in various ways and along with various kinds of associates—you can keep your mind on it for a comparatively long time.

গুরু হয়ত বলে দিলেন, ব্রহ্মে মনকে নিয়োজিত কর। কিন্তু শিষ্যের তো ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটেই ধারণা নাই, কাজেই তাকে অমন একটা লক্ষ্য বলে দেওয়া হল যার সঙ্গে তার সাধনার কোন সম্পর্কই নাই। হয়ত অনুগ্রহ করে বলে দিলেন, এই সাধনা কর্‌তে কর্‌তেই ব্রহ্ম কি তা বুঝতে পার্‌বে। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই শিষ্যের মন আবার যেই তিমিরে সেই তিমিরেই। কাজেই মানুষকে একটা isolated এবং abstract idea দিলেই কোন ফল হয়না, সেই লক্ষ্যকে, আদর্শকে চিত্তে উজ্জ্বল রাখ্‌বার দরুণ তার প্রণালীও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে হয়।

ভক্তি-শ্রদ্ধার দিক দিয়েও একই ব্যবস্থা, হয়ত একজনের শালগ্রাম শিলার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আস্‌ছে না, তাকেও বলা হবে এই এমনি পূজা কর্‌তে কর্‌তেই একদিন আপনি শ্রদ্ধা আস্‌বে। অবশ্য আচার অনুষ্ঠান এবং বাধ্য-বাধকতার ভিতর দিয়ে যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হতে পারেনা অমন কথা বল্‌ছি না, কিন্তু সত্যই যাদের মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট হতে চাচ্ছেনা, তাদের উপরও প্রচলিত-প্রণালীই কেন প্রয়োগ হয়। বরঞ্চ বাইরের ঠাকুরের ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উৎপন্ন করার দরুণ তাদের যে সময় এবং শক্তি অপব্যয় হয়, তা যদি নিজের অন্তরের ঠাকুরকে উদ্বুদ্ধ করে তোল্‌বার দরুণ ব্যয় হত তাহলে বোধ হয় তা শতগুণে শ্রেয় হত। রোগের নিদান না খুঁজে, বাইরে শুধু জোর-জুলুম এবং প্রলেপ দিলে কি হবে? জেনে-শুনেও আমরা এই ভাবেই এখনো চলে আস্‌ছি।

ব্রহ্ম কি তা হয়ত মুখে বলে বুঝানো যেতে না পারে, কিন্তু তাকে মনে রাখ্‌তে হলে তটস্থ লক্ষনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর সত্যকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রেখে, বিভিন্ন চিন্তায় বা ভাবে প্রবেশ কর্‌লে সত্য সম্বন্ধেই বিশেষ জ্ঞান হয়। James এ-সম্বন্ধেও একটী বেশ সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন প্রথমে একটী red-ball দেখ্‌লাম, তখনো কিন্তু তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হলনা, তার পর যখন চোখের সাম্‌নে দিয়ে একটী white-ball pass কর্‌ল, তখনই মনে strike কর্‌ল, ও এর আগে তো একটী লাল বল দেখেছি-লাম। এমনি করে By contrast, red-ball সম্বন্ধে idea টা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হতে থাক্‌ল। কাজেই সত্য বৈচিত্র্যের মাঝেই উজ্জ্বল—isolated সত্যের কোন দীপ্তি নাই। সত্য সম্বন্ধে যাদের এরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা তারাই ধূম-মার্গের যাত্রী।

শাস্ত্রে সাধনা



শাস্ত্রে যা আছে, মানুষ তা নিজ জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে দেখাতে পারে বলেই শাস্ত্রের এত মর্য্যাদা। মানুষ যা বলে, তা সে করতেও পারে। কাজেই শাস্ত্র শুধু মানসিক কল্পনা নয়। আর তাকেই বল্‌ব শাস্ত্রবিদ্ যিনি শাস্ত্রের উপদেশকে নিজের জীবনের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন। বিবেকানন্দ সত্যই বলেছিলেন, জীবনে যে অন্ততঃ পাঁচটা ideaকে assimilate করে নিতে পেরেছে, সে অনেক বড় বড় পণ্ডিতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা আমাদের অধিকাংশই যা বলি, তা নিজ জীবন দিয়ে সপ্রমান করতে পারিনা—অর্থাৎ বিদ্যা-অর্জ্জন করি শুধু, কিন্তু সাধনা দ্বারা মূল রহস্য আবিষ্কারে তৎপর হইনা। আমাদের কথায় যে কোন কাজ হয়না, তার প্রধান কারণই হল, আমরা সাধক নই—অর্থাৎ যা বলি তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্র থেকে দু'চারটী মাত্র উপদেশ নিয়ে যে নাকি সাধনায় লেগে গিয়েছে, তার জীবন দিয়েই অনেক জীবন উপকৃত হবে। শাস্ত্রের বাণী যে সত্য, তা সে নিজ জীবন দিয়ে পরখ করে নিয়েছে যে। অকুণ্ঠিত চিত্তে সে অপরকে আশ্বাস দিতে পার্‌বে। কিন্তু সাধনার সঙ্গে যাদের মোটে সম্পর্ক নাই, তারা অপরকে ভরসা দিবে কি, নিজেদের বুকই যে সর্ব্বদা দুরুদুরু কর্‌তে থাকে।

এমন অনেকের কথা জানি, যারা নিজেরাও শাস্ত্রকে critically পড়ে, অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করেও তৃপ্ত হতে পারেন নি। শেষে তারা কোন সাধকের শরণাপন্ন হয়ে, সাধকের নিজ জীবনের সাধন-অনুভূতি শুনে তৃপ্ত হয়েছেন। মানুষ চায় প্রাণের তৃপ্তি—কিন্তু সে তৃপ্তিকে খুঁজ্‌তে আরম্ভ করে নানা বাজে উপকরণের ভিতর দিয়ে। নানাদিক দেখে শুনে তারপর মানুষের সন্দেহ মিটে। এই সন্দেহ নিয়ে, প্রাণের আকুলতা নিয়ে অনেক দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট দর্শন হয়েছে তখনই, যখন মানুষের সন্দেহ মিটে গিয়েছে, লক্ষ্য স্থির হয়ে গিয়েছে, এবং নিশ্চিন্ত-ভরসা নিয়ে এক লক্ষ্যের প্রতি ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছে, আর অহৈতুক-ভাবে প্রাণের সেই অব্যক্ত আনন্দই ভাষায় প্রকাশ করে গিয়েছে। উপনিষদের মাঝে এই সহজ সরল আনন্দের অভিব্যক্তিই দেখ্‌তে পাই, তাই উপনিষদ পড়্‌তে পড়্‌তে যেন মনে হয় ঋষি সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার প্রাণের সাত্যকার অনুভূতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করে যাচ্ছেন। অমন করে প্রাণে সাড়া পাই কিসে? কেন উপনিষদ পড়ে প্রাণ জুড়িয়ে যায়? না, এ যে ঋষিদের প্রাণের কথা, প্রাণ দিয়ে আবিষ্কৃত সত্যেরই মহিমা বর্ণন। এমন অনেক সাধক আছেন, লৌকিক বিদ্যায় যাঁরা তত পারদর্শী নন, কিন্তু তাঁদের উপদেশের কি শক্তি কি ক্ষমতা! তাঁরা যা বলেন, তার শক্তিতে অপরের জীবনে রূপান্তর এনে দেয়; মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায় তাদের উপদেশ শুনে। তাহলেই নিশ্চয়ই কোথাও তাঁদের বিশেষত্ব রয়েছে? এই বিশেষত্বটা আর কিছু নয়? নিজেরই সাধন-লব্ধ সত্যের শক্তির স্ফুরণ মাত্র।

গীতা তো আমরা সবাই পড়ি, কিন্তু গীতার উপদেশ কয়জন প্রতিপালন করে চল্‌ছি। গীতা-পাঠ করে আসল মর্ম্ম উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই,

যাঁরা নিজেদের জীবনে গীতোক্ত ধর্ম্ম আচরণ করে দেখাতে পারছেন। আজ মহাত্মা গান্ধীর নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে কেন—তাঁর বিশেষত্ব কোন জায়গায়? তিনি মুখে যা বলেন প্রাণ দিয়ে তা সপ্রমান করতে চেষ্টা করেন, এইটুকুই তার বিশেষত্ব। গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম, সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উপদেশগুলি তিনি নিজ জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন। কত নির্যাতন, পারিপার্শ্বিকের কেবলই নিরাশাসূচক বাক্যে তাঁকে কতবার আন্দোলিত করে তুলেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি আপন লক্ষ্যে অচল—অটল। সত্য সঙ্কল্প থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারছেনা। সত্যের প্রতি যে তাঁর অবিচলিত-বিশ্বাস এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই, কেননা সত্যের দরুণ তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

কাজেই আসল কথা হল সাধনা নিয়ে। শাস্ত্রে যা বলেছে তা সত্য, যদি আমি আমার জীবনে সে সত্যের অনুভূতি পাই, তা না হলে পরের কথায় বিশ্বাস করে তো প্রাণে বল পাচ্ছিনা। বিবেকানন্দ যেমন রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?" আর রামকৃষ্ণও প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "হাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি, ইচ্ছা করলে তোমাকেও দেখাতে পারি।" এরূপ ভাবে নির্ভয়ে পরকে আশ্বাস দেবার ক্ষমতা জন্মিলে তবে না বুঝব তুমি সত্যকে পেয়েছ! তা না হলে শাস্ত্রে বলছে, ভগবান্ আছেন, এ কথায় তো কোন মূল্য নাই।

বুদ্ধিকে শানিত করাও প্রয়োজন, তার দরুণ বাহিরের শাস্ত্র পড়া কর্ত্তব্য; কিন্তু বুদ্ধির তৃপ্তিই চরম নয়—সে ও নির্ভয়ে ভরসা দিতে পারে না, সে নিজেই দুলছে। কাজেই বুদ্ধির উপর ভরসা করেও থাকা উচিত নয়—নিজের অন্তরের সাধনার মূল্য এর চেয়ে অনেক বেশী।

বুদ্ধির দিক দিয়ে আমরা খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু তাতে তো জীবনে বীর্য্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। নির্ভয়ে তো আমরা কোন কিছুই বলতে পারছি না। সন্দেহে আমাদের থেকেই যাচ্ছে। কাজেই কেবল বিচার দ্বারা মানুষের উন্নতি হয় না, বিচার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধন শক্তিও থাকা প্রয়োজন। একেবারে অন্ধ যারা তাদের চেয়ে একটু বিবেক বুদ্ধিও যাদের প্রাণে জেগেছে তারা মহৎ বটে, কিন্তু এই বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইলেই কেবল চলবে না, এই বিবেককে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তারপর সাধনায় তৎপর হতে হবে।

ঢের শাস্ত্র রচিত হয়ে গিয়েছে, আর শাস্ত্র বাড়ানোর প্রয়োজন নাই, এখন সাধকের প্রয়োজন—যারা জীবন দিয়ে শাস্ত্রের বাণীকে সার্থক করে তুলতে পারবে। বেশী না, প্রত্যেকের জীবনেই অন্ততঃ একটা মহাব্রত পালনের নিষ্ঠা থাকা চাই অর্থাৎ to die for an ideal শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার কমতি নাই, এখন শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের দরুণ সাধকের প্রয়োজন। সাধনা ছাড়া ধর্ম্ম বল, সাহিত্য বল এ সবের উন্নতি হবে কিসে? সাধনা ছাড়া যতই মোলায়েম করে, সহজ করে ধর্ম্মের, সাহিত্যের সৃষ্টি হোক্ না কেন, তার মাঝে দুর্ব্বলতা থেকে যাবেই যাবে। এক কথায় বলতে গেলে, সাধক ছাড়া সত্য-কথা সহজ-সরল ভাবে নির্ভীক কণ্ঠে বলবার শক্তি আর কারও নাই? হাজার বড়সাহিত্যিকই হোক না কেন, যে সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে তপস্যা নাই, সাধনা নাই; দুদিনের জন্য তা মানুষকে মুগ্ধ করলেও, Vital realization পক্ষে একটুও সাহায্য হয় না তাতে। সাহিত্য যদি মানুষকে কল্পনা প্রবণই করে তুলে শুধু, তাতে যদি বীর্য্য-সঞ্চার না হয়, তাহলে সেই সাহিত্যের মূল্য কি?

ঋগ্বেদ হচ্ছে বৈদিক-সাহিত্য, তা পড়লে তো কোন রঙীন-নেশায় দেহ-মন-প্রাণ এলিয়ে পড়ে না।

ঋষিদের প্রার্থনার মধ্যেও কি জোর ছিল—কি আবেগ ছিল। ঋগ্বেদের প্রত্যেকটী শব্দই যেন অব্যর্থ প্রাণ সঞ্চার হয়। এত শক্তি কিসের দরুণ? না, এ যে ঋষিদের অনুভূত সত্যেরই আনন্দোচ্ছ্বাস। তাঁরা যা বলে গিয়েছেন, নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে: তার মাঝে কোন ভণ্ডামী নাই। আর এর দরুণই তো ঋগ্বেদ হচ্ছে বৈদিক ঋষিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

ভণ্ডামী ছাড়্‌তে হবে, যা বল্‌বে সত্যি সত্যি অনুভব করেই বল্‌বে। মোট কথা মুখে যা বল্‌বে, আচার আচরণেও তা ফুটে উঠা চাই। জীবনে যেদিন এই সামঞ্জস্য আস্‌বে—সেদিনই সাধনার সিদ্ধি হল। আর আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও তো হচ্ছে এই সামঞ্জস্য আন্‌তে চেষ্টা করা। সাধক তুমি, তপস্বী তুমি—এ কথা যেন কখনো ভুলে যেও না।

বাণী

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—(*)—

যিনি আসল নেতা হতে ইচ্ছুক, তিনি যেন কখনো তার সাহায্যকারীর নির্ব্বুদ্ধিতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং জনসাধারণের ভুল-বুঝার দরুণ প্রতিবাদ না করেন।

*

বড় বড় মানুষ অথচ সঙ্কীর্ণ হৃদয়, এদের দিয়ে দেশের উন্নতি হয় না; ছোট হলেও যাদের হৃদয় প্রশস্ত, আদর্শ মহৎ—তারাই দেশের সম্পদ্।

*

ইউরোপ এবং আমেরিকার উন্নতি যীশুখ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়নি। আসল কারণ হল অজ্ঞাতে তারা বেদান্তের সাধনা করছে। বেদান্তের সাধনা লোপ পেয়েছে বলেই ভারতের এই অবনতি।

*

অপরের শাসন থেকে মুক্ত হতে হলেই, আগে তোমায় একটী আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রতিপালন করে চল্‌তে হবে। সে আধ্যাত্মিক নিয়মটী কি?—না, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসা।

*

তোমার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়রূপে প্রকাশ কর, হোক্ না সমাজ, দেশ তার বিরোধী!

*

জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ দান হল জ্ঞান দান। আজ হয়ত তুমি একজনকে পেট-ভরিয়ে খাইতে দিলে, কালই আবার সে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হবে; বরঞ্চ এক্ষেত্রে জীবিকা অর্জ্জনের একটা শিল্প শিখিয়ে দাও তাকে, যাতে সে নিজেই নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করে নিতে পারে।

*

নূতন কোন আলোক কিম্বা ভাবকে স্বীকার করতে এবং নিজের জীবনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে আর এখানে কেন, আর বিলম্ব করার প্রয়োজন কি? এখনই পিতৃলোকে যাত্রা কর না? আর নূতনকে স্বীকার করলেই বা কি, তাতে তো তোমার সনাতনত্ব টুটে যাবার কোন ভয় নাই—এই নূতন আলোক যে ঋষিদেরই অনুভূত চিরন্তন সত্যেরই আলোক। কেবল-মাত্র দেশ আর কালের ব্যবধান, আর তো কিছু নয়?

*

মেয়েদের, ছোট ছেলেদের, এবং মুটে মজুর শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা, প্রকারান্তরে আমরা যাদের সাহায্যে বেঁচে আছি তাদের হত্যা করারই সামিল। এতে জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

*

মাথা ধরা, বুকে যন্ত্রণা, কোমর নুইয়ে আসা, এসব হয় কিসের দরুণ?—না, পায়ের বদলে আমরা মাথা দিয়ে হাঁটি বলে। পা দিয়েই হাঁট, এবং মাথাকে ঠিক উপরে রেখেই চল—স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর করে। দৈবী প্রেরণাকে অস্বীকার করো না, পার্থিব চিন্তাকে মাথায় তুলো না. এ হলেই তুমি প্রকৃতিস্থ। অন্তর্নিহিত সত্য ছাড়া—বাইরের জগৎকে আঁকড়ে ধরো না।

*

সাধারণতঃ মানুষ যজ্ঞের মাঝে "হবন-ক্রিয়া"-কেই আসল অনুষ্ঠান বলে—অর্থাৎ যজ্ঞে ঘি ঢালা। আজকালকার অধিকাংশ লোকই একটি সাধারণ কথা বলেন যে, হবন দ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ হয় এবং তার পবিত্র গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। এতে আর বিশেষত্ব কি, যে কোন সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যই সাময়িক ভাবে আমাদের স্ফূর্ত্তিযুক্ত করে তুলে, কিন্তু এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় আবার অবসাদও আসে। উত্তেজনা দ্বারা সাময়িক ভাবে শক্তিকে ধার করে আনতে পারি বটে, কিন্তু সেই ধার শেষে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে নেয়।

*

তোমাদের শাস্ত্র বলে, যজ্ঞের সময় দেবতারা সশরীরে আবির্ভূত হন। একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা রামও স্বীকার করছেন। এ আর কিছু না, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মনকে এক কেন্দ্রে নিয়োজিত করারই ফল। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণও বলেন, যদি একই মনের চারটী লোক একত্রিত হয়ে কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তাহলে তাতে বেশী শক্তি সঞ্চার হয়। তাহলেই আসল কথা হল মনের ঐক্যতা নিয়ে—বাইরের অনুষ্ঠান নিয়ে নয়।

*

জনসাধারণের মাঝে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং ছোট ছোট ছেলেদের ভিতর প্রেম-ভালবাসা এবং ঐক্য সৃজনের সহজ সরল ক্রিয়াশীল উপায়ই হল নগরসঙ্কীর্ত্তন। সকলে একত্রিত হয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেশ ধুমধামের সহিত সত্যেরই যেন প্রচার করা হয় এতে।

সত্যকাম

—*—

পঞ্চকোষকে অতিক্রম করে যেতে হবে—তারপর সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কাজেই মাঝের যে কোন অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে পড়লেই চরম সত্যের সঙ্গে মিলন হল না।

উপনিষদে আছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

সত্য জ্যোতির্ম্ময় আবরণে আচ্ছাদিত, কাজেই আবরণের আভাতেই অনেকে তুষ্ট হয়ে ভিতরের আসল সত্যের সন্ধান পায় না। অন্তরের সমস্ত

আবেগ বাইরের এই উজ্জ্বল আভাতেই বিমুগ্ধ হয়ে যায়। কাজেই সত্যের কাছাকাছি গিয়েও অনেকে সত্যের দর্শন হতে বঞ্চিত হয়।

আনন্দে থাক্‌তে পার্‌লেই আমরা চরম মনে করি, কিন্তু এই আনন্দের বেগকেও যে চেপে যেতে হবে; প্রশান্ত হতে হবে—স্তব্ধ হতে হবে। উচ্ছ্বাস বাইরের জিনিষ—সত্য তারও অন্তরে। কাজেই সত্যকে পেতে হবে সাময়িক উচ্ছ্বাসকেও নিজের আয়ত্ত করে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে আনন্দকেও আয়ত্ত রেখে একেবারে গম্ভীর হয়ে থাকার শক্তিও অর্জ্জন কর্‌তে হবে। আসল কথা হল, থেমে যেতে নাই, যে পর্য্যন্ত সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখো-মুখি না হয়। কাজেই নিজের ভিতরই অনন্ত-আবেগের সৃষ্টি করা চাই। অপরে এসে সত্যকে বাইরে দিতে পারে না—যে পর্য্যন্ত তুমি নিজে সত্যের দরুণ উঠে না দাঁড়াও।

কেউ তোমাকে উদ্ধার করে দিতে পারবে না—তুমি যদি নিজের আত্মাকে—গুরুকে না জাগাও। গীতায়ও আছে—"আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ।" আত্মাই আত্মার উদ্ধার কর্ত্তা। তবু মানুষ বাইরের ভরসা করেই বসে থাকে—যদি কেউ এসে বৈতরণী পার করে দিয়ে যায়!

দোষ দেওয়া হয় ভগবান্‌কে, ভগবান্ নাকি জীবকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। মিথ্যে কথা—মানুষ বদ্ধ হয়ে থাকতে চায় বলেই বদ্ধ। আত্ম-প্রবঞ্চনা করে ধর্ম্মলাভ হতে পারে? পূজা করবে কিন্তু নিজের বুকের রক্ত দিতে ভয় হবে, আতঙ্ক উপস্থিত হবে, তাই একটা নিরীহ ছাগ-শিশুকে ধরে এনে পূজোপহার দেওয়া হয়। কেবল বিনিময়—বিনিময়; ধর্ম্মের লাভের বেলায়ও তাই হচ্ছে, ধর্ম্ম স্বয়ং না এসে তিনি তার প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ আসল জিনিষ চায় না—চায় নকলকেই। ধর্ম্মের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠানই বড় হয়ে গিয়েছে। তুমি ধার্ম্মিক যদি তুমি প্রাতঃস্নান কর, তুমি ধার্ম্মিক যদি তুমি মালা টপ্‌কাতে পার। কিন্তু ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ভগবানই জানেন! অবশ্য আচার অনুষ্ঠানকে যে অবজ্ঞা করতে হবে তা নয়—কিন্তু কেন পূজা কর্‌ছি, হোম কর্‌ছি এ সব তলিয়ে বুঝতে হবে। না বুঝে কর্ম্ম করার নামই তো অজ্ঞানতা—বন্ধন। মানুষ স্বেচ্ছায় এ বন্ধনকে স্বীকার করে বসে থাকে দেখ্‌তে পাই।

আচার অনুষ্ঠানের মূলে কি, তাই একবার অনু-সন্ধান করে দেখতে হবে। চণ্ডীতে পাই, রাজা সুরথ এবং বৈশ্যবর সমাধি এই দুইজন বুকের রক্ত দিয়ে মাকে পূজা করেছিলেন। কিন্তু এখন তা পশুবলির আচারে দাঁড়িয়েছে। মানুষ প্রথমতঃ কি উদ্দেশ্য নিয়ে কি করেছিল তা-ও একটু অনুসন্ধান করে জেনে নিতে হবে। ভাল মন্দ সব সময়ই বিচার করে চল্‌তে হবে, প্রয়োজন হলে নিয়ম-কানু-নের পরিবর্ত্তনও করে নিতে হবে। মানুষ পাথর নয়—সজীব সচেতন প্রাণী, এ কথা মনে রেখে চলা উচিত নয় কি?

যা কিছু করি সব পরের মন রক্ষার্থে—নিজের প্রাণের আবদার তো একটুও রক্ষা করে চলি না। কেবল আত্ম নির্য্যাতন, তার দরুণ নিজের আত্মাই শেষে নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসমর্পণ মানে কি পরের দাস হয়ে চলা? তাই যদি হয় তাহলে এমন আত্মসমর্পণের কি প্রয়োজন?

সত্য পৈতৃক ধন নয়, যে বিনা চেষ্টায়ও উত্তরা-ধিকার সূত্রে তা পাওয়া যাবে। প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায়ই সত্যলাভ করে নিতে হবে। যিনি সত্যলাভ করেছেন তিনি সে সত্যকে বিলিয়ে দিতে পারেন না, মাত্র অপরকে সত্যলাভের দরুণ উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন। কৃপা বল, শক্তি-সঞ্চার বল, সর্ব্বত্র যিনি অপরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন—তিনিই মহৎ। সত্যের দরুণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হবে—

কেননা সত্য যে সবার চেয়ে প্রিয়। যাকে ভালবাসি তার দরুণ আত্মত্যাগ করা তো একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

তলিয়ে দেখতে হবে, কেননা সত্যের জ্যোতিঃ যদি প্রবঞ্চিত করে। সত্যের কাছে গিয়েও যদি সত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আস্‌তে হয় এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর নাই।

নিজের অন্তরের আবেগের বলেই উপরে উঠতে হবে। চাই শুধু জ্বালা—তাপ। পেয়েও পাচ্ছি না—কেবল অতৃপ্তি—অতৃপ্তি। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা কেবল বেড়েই চল্‌বে। কে জানে কবে এই জ্বালার অবসান হবে! আর অবসান তো চাই না। এই জ্বলে পুড়ে মরতেই তো আনন্দ। পলকে পলকে সুখে-দুঃখে তারই সাড়া অনুভব কর্‌ছি।

না পেয়েও যে পেয়েছি বলে মনে করা এরই নাম তৌষ্টিকতা। চরম সত্যকে না পেয়েও আমরা মনে করি, এই বুঝি সত্যের শেষ। সত্যের শেষ নাই—তোমার আবেগই নিঃশেষ হয়ে যায়। তোমার বুদ্ধিই আর ধারণা করতে সক্ষম হয় না। তা না'হলে সত্যের কি অবধি আছে?...

ওগো! আমায় আনন্দ দিয়ে ভুলিয়ে যেয়ো না। আমি তেমন ছেলে নই যে খেলনা পেয়েই ভুলে যাব। আমার শেষ প্রার্থনা—সকল আবরণকে আমার সম্মুখ হতে বিদূরিত কর। আমি সত্যকে একবার নিজ চোখে দেখে তৃপ্ত হতে চাই!

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)



২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন শনিবার সকালে বের হয়ে সূর্যোদয় দেখতে পেলাম। রাত্রে ধর্ম্মশালার ঘরটিতে জায়গা না হওয়ায় মায়েদের ঘরে জায়গা দিয়ে আমরা বারান্দায় শুয়েছিলাম। অত্যন্ত শীত পড়ায় প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিনিদ্রভাবে কাটাতে হয়েছে। চারিদিকে বরফাবৃত পর্ব্বত থাকাতেই রাত্রে এত বেশী শীত অনুভব হয়েছিল। কাল একজন বাঙ্গালী সাধুর সাথে এই চটীতেই কথাবার্ত্তা হয়। তিনি ভুটিয়াদের সঙ্গে নীলং মঠ হয়ে তিব্বত দিয়ে কৈলাস যাবার ব্যবস্থা কচ্ছেন। আমাদের যখন কথাবার্ত্তা হয়, সে সময় আরও কয়েকজন হিন্দুস্থানী সাধু ছিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর গোমুখীর কথা উঠাতে তিনি বললেন, "আমি গোমুখী গিয়েছি। সে অতি কঠিন পথ, সে পথ হতে শতকরা পাঁচজন যাত্রীও ফিরে না। আপনারা যেতে পারবেন না" বলে বিজ্ঞতার হাসি হাস্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন হিন্দুস্থানী সাধুও তার কথার সায় দিয়ে অবজ্ঞার হাসি হাস্‌লেন। আমি কিন্তু তাদের বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞাতে তখনই স্থির করলাম, যেমন করেই হোক্ গোমুখী যাব। এ সঙ্কল্প আমার সঙ্গী কাউকেও কিছুই জান্‌তে দিই নাই। পরে নানা ঝগ্‌ড়াঝাঁটির পর কেমন করে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করেছিলাম, যথাসময়ে সে কথা বলবো।

চটী হতে বের হয়ে একটি বড় ঝরণার উপর পুল পার হয়ে দুইটী পথ পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের পথটি গঙ্গোত্তরীর পথ, পূর্ব্ব দিকের পথটী গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাদের গ্রাম মুখু বা মঠ গ্রামে যাবার পথ; অবশ্য এ পথেও গঙ্গোত্তরী যাওয়া যায়, তবে কষ্টকর বটে! আমাদের দক্ষিণ দিকের পথে যেতে হবে। আমরা দক্ষিণ দিকের পথে রওনা হয়ে, ভাগিরথী-গঙ্গার উপর দিয়ে একটি পুল পার হয়ে, ভাগিরথীগঙ্গা বাঁ হাতে রেখে পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে ক্রমশঃ বন জঙ্গলের ভিতর পূর্ব্বদিকে চল্‌তে লাগলাম। পথ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য। দুই মাইল যাবার পর

ধরালী ২ মাইল

ধরালী চটী। এখানে বাবা কালীকম্বলী বালার ও জয়পুরের মহারাণীর সদাব্রত নিলাম। ধরণী গ্রামটি বেশ শ্রীসম্পন্ন এবং প্রচুর সমৃদ্ধ—পথ হতে একটু উপরে অবস্থিত। এখানেও যথেষ্ট আলুর চাষ হয়। স্থানীয় লোকজন শান্ত-শিষ্ট ও ধর্ম্মপ্রাণ। যমুনোত্তরীর পথের সঙ্গে গঙ্গোত্তরীর কোন তুলনাই হয় না। যমুনোত্তরীর পথ যেমন উৎকট, চড়াই উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলিও যেমন অতি ধূর্ত্ত, গ্রামগুলিও তেমন সম্পন্ন নয়। গঙ্গোত্তরীর পথ কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। এ পথে যেমন অনেকগুলি ভাল ভাল গ্রাম ও চটী পাওয়া যায়, যমুনোত্তরীর পথে সেরূপ ভাল গ্রাম বা ভাল চটী, ভাল ধর্ম্মশালা প্রভৃতি বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

এখানে বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু জয়পুরের মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত কাঠের দ্বিতল-ধর্ম্মশালাটী তার চেয়ে ভাল। একটী দোকানও আছে। ভাগিরথী গঙ্গাতে বাঁধান দুটী ঘাট আছে ঘাটের উপর দুটী শিবমন্দির; কিন্তু শিবঠাকুর জলের ভিতর অদৃশ্য ভাবে বিরাজ কচ্ছেন। প্রথম দেখলে মনে হয় যেন দুটা জলেরই কুণ্ড। স্থানীয় পাণ্ডা আমাদের সে ভ্রম দূর করেছিল।

এই চটীর প্রবেশ দ্বারে **দুগ্ধগঙ্গা** নামীয় একটী বড় ঝরণার উপর সামান্য কাঠের পুল পার হয়ে আসতে হয়। দুধগঙ্গা পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হতে উৎপন্ন হয়ে ভাগিরথী গঙ্গার বাঁধান ঘাটের পার্শ্বেই ভাগিরথীতে এসে মিশেছে। সেই সঙ্গমস্থলেই উপরোক্ত শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত।

এই ধরালীচটীর অপরপারে **মুখু** বা **মঠ** গ্রাম। উক্তগ্রামে গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডারা বাস করছে। শীতকালে গঙ্গা দেবীর মন্দির বরফাচ্ছন্ন হলে পাণ্ডারা

মুখু বা মঠ গ্রাম

গ্রামেই গঙ্গা মাতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি বিশেষ সমারোহের সহিত এনে সমস্ত শীতকাল পূজা করে থাকে। পাণ্ডাদের দ্বিতল ত্রিতল প্রায় ৫০।৬০ খানা বাড়ী এ পার থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। যমুনোত্তরীর পাণ্ডার চেয়ে এরা শিক্ষিত, ভদ্র, শিষ্ট, অমায়িক এবং বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। এই গ্রাম

মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম

হতে এক মাইল দূরে **শ্রীমন্মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম** আছে। যাঁর কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ **"মার্কণ্ডেয় চণ্ডী"** আজও ভারতের ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে থাকে। এ সব স্থানেও শীতকালে বরফ জমে যায়, কিন্তু দিনের বেলায় আবার সূর্য্যকিরণে অনেক গলে যায়। এখানে রাত্রে বেশ শীত লাগে।

ধরালী হতে বের হয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ জঙ্গলাবৃত পথে তিন মাইল আসার পর একটী বড় ঝরণা পেলাম। ঝরণাটি বরফে আবৃত। আমাদের বরফের উপর দিয়ে পার হতে হবে। বরফ এমন ঢালু ভাবে অবস্থিত এবং এত পিচ্ছিল যে বহু কষ্টে অতি সাবধানে আমরা সেই ৩০।৪০ ফুট বরফ পার হলাম। যদি দৈবাৎ পা চড়কে যেত, তাহলে হাজার ফুট নীচে অবস্থিত ভাগিরথী গঙ্গার গভীর স্রোতে চিরসমাধি লাভ করতে হত। আবার বরফের উপর দিয়ে আসবার সময় যদি

বরফ ভেঙ্গে বসে যায়, তাহলে আরও বিপদ। প্রথম অবস্থায় তবুও মুক্তি লাভ হলেও হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা হতে মুক্তি লাভ অসম্ভব। এই জন্যই আগে লোকে বরফ পার হবার সময় মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে একটু দূরে দূরে প্রত্যেকের কোমর বেঁধে নিত। যদি হঠাৎ কোন লোক বরফ ভেঙ্গে ভিতরে পড়ে যেত, তবু অন্য লোকের কোমরে বাঁধা দড়ির অপর প্রান্ত থাকায় তাকে টেনে তোলা তত কষ্টকর হত না। তবে আজকাল আর পূর্ব্বের মত বিপদসঙ্কুল পথ নাই। তবু বরফে চলবার সময় মোটা দড়িতে পরস্পর কোমর বেঁধে চললে তত ভয়ের কোন কারণ থাকে না। আমরা যে ভাবে যমুনোত্তরীর উপরে বরফের উপর দিয়ে চলেছিলাম তাতে তো ঐরূপ ভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে চলা বিশেষ দরকার। যারা বরফের দেশে ঘুরতে চান, তাদের সঙ্গে বেশ মোটা শক্ত দড়ি একগাছ রাখা অতীব আবশ্যক। পরে আমরা অনেকবার বরফের উপর দিয়ে পার হয়েছি, তখন তত ভয় হয় নাই। তবে এবার সর্ব্বপ্রথম বলেই ভয় হচ্ছিল।

চীর বীথির মাঝ দিয়ে চড়াই উৎরাই করে এক মাইল এগিয়ে **জঙ্গলা** চটী পেলাম। তখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেখানেই থাকা গেল। জঙ্গলা চটী অত্যন্ত খারাপ চটী। গঙ্গোত্তরী পথে এমন খারাপ চটী নাই। চটীবালার মাত্র একখানা ছোট ঘর। সেই ঘরের ভিতর চটীবালা বাদশার মত আসর জমিয়ে টাকা-পয়সার হিসাব কচ্ছে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি তার বিশেষ লক্ষ্য নাই বা যাত্রীদের থাকবার মোটেই ব্যবস্থা নাই। চটী হতে গঙ্গার উপর পুল পার হয়ে প্রায় দেড় ফার্লং চড়াই করলেই টিহরীরাজের ডাকবাংলা পাওয়া যায়। সে ডাকবাংলার চৌকীদারও এই চটীর দোকানদার মহারাজ। আমরা সেই ডাকবাংলার বারান্দায় জায়গা নিলাম। ডাকবাংলাটি বেশ বড়, কাঠের তৈরী, এমন কি মেজেও কাঠ দ্বারাই আবৃত—ব্রহ্মদেশের ঘরের মত। তার বারান্দাটীও বেশ চওড়া, বারান্দার মেজেটিও কাঠ দিয়েই তৈরী। এবার ভাগিরথী গঙ্গা আমাদের ডাইনে রইল। আমরা যখন এই চটি হতে ভাগিরথী গঙ্গার উপরিস্থিত পুল পার হয়েছি, তখন একটী চীর গাছের নীচে ছায়া পাওয়ায় আমার লোটা কম্বল প্রভৃতি নামিয়ে সেই গাছের নীচে রাখার সঙ্গে সঙ্গে লোটাটী এমন গড়াতে লাগলেন যে, চেষ্টা করেও ধরা অসম্ভব হয়ে পড়লো; অবিলম্বে প্রায় সহস্র ফুট নীচে প্রবাহিতা ভাগিরথীর প্রবল স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মায়াপাশ ছিন্ন করে প্রস্থান আর কি!—সঙ্গে সঙ্গে একদল সাধু ও যাত্রী "গঙ্গে হর হর" বলে উচ্চ জয়ধ্বনি করে উঠলেন।

জঙ্গলা চটী
৪ মাইল

এদিকে আমরা আসবার ঘণ্টা খানেকের ভিতরও যখন আমাদের মণিরাম কুলী তার বিরাট বপু ও বিরাট বোঝা সহ এসে পৌছল না, তখন তার জন্য আমরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলাম। সে রোজই আমাদের আসার ঘণ্টাখানেকের ভিতর এসে থাকে। বেচারা হরশিল হতে বের হয়ে, দক্ষিণের পথে না যেয়ে, ভুলে পূর্ব্বের পথ ধরে ভাগিরথী গঙ্গার উত্তর পার দিয়ে (আমরা দক্ষিণ পার দিয়ে এসেছি) পাণ্ডাদের বসতি মুখু বা মঠ গ্রামের ভিতর দিয়ে পাকদণ্ডী পথে ঘুরে ঘুরে বেলা ১টার সময় এসে হাজির হল, এপথে স্থানটী ছয় মাইল হলেও এ পথে কোন যাত্রী চলে না, শুধু গ্রামবাসীরাই যাতায়াত করে থাকে—পাকদণ্ডী পথ।

জঙ্গলা চটী হতে বের হয়ে কিছুদূর গেলে দু'টী পথ পাওয়া যায়। উপরের পথটি নীলং মঠ হয়ে তিব্বত দিয়ে কৈলাস গিয়াছে।

জঙ্গলা চটী হতে **নীলং মঠ** ২০ মাইল। নীলং মঠ হতে মানস-সরোবর ও কৈলাসের পথ ১৮৫০০ ফুট উচ্চ গিরিবর্ত্ম দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। মাঝে প্রায়ই Table land পড়ে। নীলংমঠ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তিব্বতবাসী রাজপুত্তদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। গাড়োয়াল জেলার পাহাড়ীরা তাদের ভূটিয়া বলে থাকে। নীলং মঠ ভারতের অন্তর্গত হলেও বৃটিশের অধীন নয়—তিব্বত রাজার অধীন। অত্যধিক উচ্চস্থান বলে শীতকালে ঐ সব স্থান বরফাবৃত হলে তথাকার অধিবাসী তিব্বতীগণ ভটবাড়ীর হরশীল, উত্তরকাশী অঞ্চলে এসে বাস করে, আবার গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই চলে যায়। আমরা হরশিলে যাদের দেখেছিলাম, তারাও নীলংমঠ অঞ্চলের বাসিন্দা। তারা প্রত্যেকেই (স্ত্রী-পুরুষ) কোন না কোন প্রকার নেশা করে। উক্ত স্থানে গেলে Glaciers বা জমান বরফ সর্ব্বদা দেখা যায়। এদিকে গাড়োয়ালের মধ্যে যেমন হরশিল ব্যবসার কেন্দ্রস্থান, তিব্বতের এদিকটায় তেমনি নীলং মঠ ব্যবসার কেন্দ্রস্থান। উক্ত তিব্বতীরা খুব শীত সহ্য করতে পারে। বর্ত্তমানে গঙ্গোত্তরীতে বাংলা দেশের মাঘ মাসের ঝড় বৃষ্টির পর শীত যেমন, তেমনি, আমরা তো শীতে জমে যাবার উপক্রম, আর তারা গরমের চোটে আইঢাই কচ্ছে যেমন আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে করে থাকি এবং বলছে "ইস মুল্লুক বড়া গরম হৈঁ, অব্ উপরমেঁ জানে হোগা" এ সব লোক আইসল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ডে গেলেও শীতের দাপটে কাতর হবে না বলেই মনে হয়।

নীলং মঠ
২০ মাইল

উপরের পথটি নীলং মঠের, নীচের পথটি গঙ্গোত্তরী যাবার। আমরা নীচের পথে রওনা হয়ে ক্রমশঃ ছোট ছোট দুটী চড়াই উৎরাই করে ভাগিরথী গঙ্গা ও জাহ্নবী গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এসে উপনীত হলাম। সঙ্গমস্থলে পৌছবার কিছু আগে আরও একটি পুরাতন পথ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সেই পথ দিয়েই ক্রমশঃ পাহাড়টী চরাই করে, পাহাড়ের শিখর-দেশ হতে **জাহ্নবী গঙ্গার** উপর ঝোলাপুল পার হয়ে লোকে গঙ্গোত্তরী যেত। উপরোক্ত ঐ ঝোলাই **ভৈরব ঝোলা** নামে খ্যাত। বর্ত্তমানে উক্ত ভৈরব ঝোলা ভগ্নাবস্থাতে পতিত হলেও লোকলোচনের অগোচর হয় নাই। আমরা নীচে হতে উপরের দিকে তাকিয়ে সে বিখ্যাত ঝোলাটি দেখে নিলাম। সে অনেক উচ্চে অবস্থিত ঝোলা। এই ভৈরব ঝোলা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী শুনতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক লোক ভৈরব ঝোলা হতে দেহত্যাগ করার মানসে জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত; এখন গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সে দুক্রিয়া বন্ধ হয়েছে। সে স্থানটি জাহ্নবী গঙ্গা হতে হাজার ফুটেরও উচ্চে অবস্থিত। আমরা জাহ্নবী গঙ্গার উপরিস্থিত যে কাঠের পুলটী পার হলাম, সে পুলটি জাহ্নবী গঙ্গা হতে ১০০ ফুটের বেশী উচ্চ হবে না। জাহ্নবী গঙ্গা প্রচণ্ড বেগবতী। জাহ্নবী গঙ্গা কৈলাসের চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশিখর হতে জন্ম নিয়ে তিব্বতের ভিতর দিয়ে নীলং মঠ হয়ে, ভাগিরথী গঙ্গাতে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। জাহ্নবীর জল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং ঘোর নীলবর্ণ। এমন পরিষ্কার জল হিমালয়ে আর কোথাও দেখি নাই; কিন্তু ভাগিরথী গঙ্গার জল খুব ঘোলা। যে স্থানে ভাগিরথী গঙ্গা ও জাহ্নবী গঙ্গা মিশেছে, সে স্থানটির দৃশ্য চমৎকার; শব্দ এত ভীষণ যে কোন কথা শুনা যায় না। পূর্ব্বে উক্ত ভৈরব ঝোলা পার হলেই পর্ব্বতশিখরস্থ ভৈরবঘাটী চটী পাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল সে পথ বন্ধ হওয়ায়, এই নীচের পথ দিয়ে এসে, পুলটি পার হয়ে একটী উৎকট চড়াই করে ভৈরবঘাটী চটী পেলাম। এই উৎকট চড়াই

ভৈরব ঝোলা

জাহ্নবী গঙ্গা

করার সময় ভাগিরথী গঙ্গার অপর পারের পর্ব্বত-শুলির দৃশ্য দেখা অতীব আবশ্যক। সে পর্ব্বত-শুলি ভাগিরথী গঙ্গা হতে একদম খাড়া অবস্থায় দাঁড়ান দেখে মনে হয়, যেন অসংখ্য বড় বড় উচ্চচূড়া বিশিষ্ট গির্জ্জা আপন গৌরবে বুক ঠুকে বীরের মত দণ্ডায়মান। বড়ই সুদৃশ্য!

পূর্ব্বে জঙ্গলা চটী হতে সামান্য চড়াই কর্‌লেই ভৈরব ঘাটী আসা যেত। তবে ভৈরব ঝোলাটী পার হওয়া খুব বিপদ-সঙ্কুল ছিল। কিন্তু আজকাল আর বিপদ-সঙ্কুল পথ নাই। তবে জঙ্গলা চটী হতে বের হয়ে, দুটী চড়াই উৎরাই করে. ভৈরব ঝোলার নীচের পুলটী পার হয়ে, একমাইল খাড়া উৎকট চড়াই করতে হয়। পাহাড়ীরা এই চড়াইকেই গঙ্গোত্তরীর পথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চড়াই মনে করে। বাস্তবিক পক্ষেও এই চড়াইটী খুবই কষ্টকর; একদম খাড়া উপরে উঠতে হয়। এই চড়াইটীর মুখে হরিদ্রাবর্ণের একটী সামান্য নির্ঝরিণী পাওয়া যায়। প্রবাদ—তার জল পান করলে পেটের অসুখ আরোগ্য হয়। সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখি নাই।

ভৈরব ঘাটী ৩ মাইল

ভৈরবঘাটী চটীটি পর্ব্বতের শিখরস্থ সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। চারিদিকে অসংখ্য কুঞ্জ থাকায় স্থানটির শোভা অতীব চিত্তাকর্ষক এবং আগন্তুকের মনে এক নব ভাবের উদয় করে দেয়। এখানে ভৈরবজীর মন্দির, বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্ম-শালা, সদাব্রত দেবার ব্যবস্থা এবং একটী দোকানও আছে। কিন্তু জলের খুব কষ্ট। প্রায় একমাইল দূর হতে চীরগাছের কাঠ দ্বারা সামান্য drain করে চটীতে জল এনেছে বটে, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত নয়। সেই জল দ্বারাই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এদিকে চীরগাছ অসংখ্য। এই চীরগাছগুলির সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত চীরগাছগুলির সৌসাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। এর সরু সরু পাতাগুলো তিন ইঞ্চির বেশী নয় এবং ময়ূরপুচ্ছের মত উপর দিকে বেশ বাঁকান; পূর্ব্বেরগুলি ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ময়ূর-পুচ্ছের মত নয় এই পার্থক্য। অসংখ্য শুক্‌নো চীর-কাঠ এলো-মেলো ভাবে এদিক সেদিক পড়ে আছে। দোকানদারারা কাঠ বিক্রি করে না, বলে—জঙ্গল হতে নিয়ে এস। আমি ও হরিদাস ভায়া চীরগাছের কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে ঘুরে অনেক কাঠ জড় করেছিলাম, তা দিয়েই রাত্রিবেলা পাক করে তারপর ধুনী করে-ছিলাম। শীত যথেষ্ট! আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

যমুনোত্তরী হতে আসার সময় সিমলী চটীতে বদরী নারায়ণ দাগা নামীয় একজন বাঙ্গালী হিন্দু-স্থানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, পাঠকগণের স্মরণ থাকতে পারে। আমরা উত্তর কাশীতে থাকার সময় তারা গঙ্গোত্তরীতে রওনা হয়। আজ এখানে আবার তাদের সঙ্গে দেখা হল, তারা গঙ্গোত্তরী হতে শীঘ্র ফিরছে। তার বৃদ্ধা ঠাকুর মা'টীর আমাশা হয়েছে। যেরূপ তার অবস্থা দেখলাম, তাতে বোধ হয়, সে বুড়ী আর হিমালয় হতে ফিরে নাই. আমাশার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ঔষধ আমরা হিমালয়ে অনেক ব্যবহার করেছি শুষণী শাকের মত ছয় পাতাবালা এক প্রকার শাক হয়। তার নাম **আমরুল শাক**। আমরুল হিমালয়ের ঠাণ্ডা প্রদেশে খুব মিলে। সেই আমরুলের কতকগুলি পাতা জলে ধুয়ে পুছে নিতে হবে। সেই রস সকালে একবার মাত্র দুই তিন ফোঁটা রোগীর দুই চক্ষুতে দিলে প্রায় একদিনেই আমাশা আরোগ্য হয়ে যায়। কারো কারো দুই তিনও লাগে। কিন্তু আমাশার প্রথম তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ। আমি অনেক রোগীকে এই ঔষধ দিয়ে বিশেষ উপকার

আমাশার ঔষধ

পেয়েছি। পাঠকগণ ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন, বাংলা দেশে এর টক পাক করে খায়। পাগলী মা প্রায়ই এর টক পাক করতেন এবং চিদানন্দ দাদাকে দিতেন। এ ছাড়া থানকুণী পাতা (মণ্ডূকপর্ণী) বা ঘলঘষে (দ্রোণপুষ্প) পাতার রসও উপরোক্ত ভাবে চক্ষুতে দিলে যে কোন প্রকার আমাশা নিশ্চয়ই আরোগ্য হবে। ঔষধ কয়টিই পরীক্ষিত। (ক্রমশঃ)

সুপ্তি-ভঙ্গে

সুষুপ্তি লোক থেকে নূতন শক্তি আহরণ করে জেগে উঠ। ঘুম—ঘুমেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু মনে রেখো ঘুম হচ্ছে নূতন কর্ম্ম শক্তি নিয়ে ফিরে আসার দরুণই। সুপ্ত বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে কত রত্ন, তাঁর সঙ্গে মিশ—তন্ময় হয়ে যাও, দেখবে কত রত্নের আহরণ করে আনতে পার!

সুষুপ্তি লোকে সব একাকার, আবার দেখছি যার যার ব্যষ্টি চেতনা নিয়ে সবাই জেগে উঠছে। পশু, পাখী, মানুষ সমস্ত প্রাণীই—যার যার চেতনা যেন ফিরে পেয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে। ওই শোন—প্রভাতে বিহগের কি সুমিষ্ট কাকলি। আনন্দে তাদের প্রাণ নাচ্ছে। তারা ঘুমের মাঝে বিশ্ব-স্রষ্টার অমিয়-পরশ পেয়েছে। ঘুমের জড়ত্ব নাই—কেবল আনন্দ, আনন্দ। যে যতটুকু পেয়েছে, সেই তাই বিলিয়ে দিতে ব্যগ্র।

বেণু-বনে সারস ও বকের আনন্দসম্মিলনী বসে গিয়েছে। তাদের মাঝে কি আলোচনা হল যদিও তা বুঝতে পারিনি, তবু তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে আমার প্রাণও নেচে উঠল। সভাভঙ্গ হওয়া মাত্রই দেখি, বলাকার শ্রেণী দলবদ্ধ হয়ে অনন্ত আকাশের গায়ে মিশে গিয়ে যেন পাখা দুলিয়ে দুলিয়ে আনন্দে উল্লাসে কোথায় যাত্রা করেছে। বাঃ, কি সুন্দর! আনন্দ পেলে কেউ স্থির থাকতে পারে না, আপনি কর্ম্মের উদ্যম জেগে উঠে।

বিধাতা কাউকে শক্তি-সঞ্চার করতে কৃপণতা করেননি। তাঁর কল্যাণময় আশিষ সকলের প্রাণকেই স্পর্শ করে গিয়েছে। কেউ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

সুষুপ্তিতে যা পেয়েছিলে তাকেই আবার স্মৃতিতে উদ্বোধিত করে তুলতে হবে। ভুলে যেও না। চোখ মেলে একবার সুন্দর জগতের পানে তাকাও, দেখ্বে তখন অপরের আনন্দ দেখেই তোমার আনন্দ-স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। আনন্দ দেখে তখন ঈর্ষা হবে না, কেননা তুমিও যে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওনি।

স্বাতন্ত্র্য নিয়েও আমরা এক হতে পারি, সুষুপ্তিই তার নিদর্শন। সেখানে ভেদ নাই, পার্থক্য নাই, রাজা-প্রজা, ধনী-কাঙ্গাল সবাই সমান। কিন্তু সুষুপ্তির মাঝে কারও ব্যষ্টি চেতনা লোপ পায়নি, তাই জেগে এক একজন এক একরকমের আনন্দানুভূতি প্রকাশ করছে। এই তো সুন্দর, একদিকে সবাই একাকার, আবার প্রত্যেকের মাঝেই বৈচিত্র্যের মাধুর্য্য আছে। কেউ হীন নয়—আপন গর্ব্ব নিয়ে সবাই রাজাধিরাজ!

মোট কথা যার যতটুকু আধার, সে ততটুকুই ধরে রেখেছে, কিন্তু আনন্দ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। চারিদিকেই তো আনন্দের কলরব শুনতে পাচ্ছি। বল তো কে প্রাণে সাড়া পায়নি?

ঘুমের মাঝে অচেতন হয়ে আমরা এক হই, কিন্তু যাঁর চেতনা চিরোজ্জ্বল তিনি তো সবার ঘুমকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ইচ্ছা করলে, প্রাণের আবেগ থাকলে, সেই দ্রষ্টার সঙ্গে আমরা এক হতে পারি। তখন যে ঘুমও আস্বাদনেরবস্তু হয়ে উঠে। আর আস্বাদন করতে হলেইনিজকে সব সময় চেতন করতে হবে। চেতনা-লুপ্ত ঐক্যের কোন মূল্য নাই, পরক্ষণেই তা আবার ভেদ সৃষ্টি করে। কাজেই সুষুপ্তির মাঝেও জেগে থেকে একাকার হতে চাই। সুষুপ্তি এক রহস্য—তার চেয়েও গভীরতর রহস্য সুষুপ্তির মাঝেও কি করে চেতনাকে উজ্জ্বল রাখতে পারা যায়।

প্রভাতে উঠে চারদিকে যে আনন্দের প্রকাশ দেখতে পাই, সে তো স্মৃত মাত্র। কি যেন পেয়েছিল সবাই, তারই আনন্দে এখন সকলে মেতে উঠেছে। কিন্তু স্মৃতি নয়—সব সময় প্রত্যক্ষানুভূতি চাই। যথার্থ পাওয়ার সময়ও অচেতন থাকতে চাই না—প্রাণে প্রাণে কি সম্বন্ধ রয়েছে, আদান-প্রদান, কিম্বা শক্তি-সঞ্চারে সময়ও তা আমি নিজ চোখে দেখতে চাই।

সুষুপ্তি ভাল—কিন্তু তার মাঝেও আমি চাই আত্ম-প্রবুদ্ধ হয়ে জেগে থাকতে।

ত্যাগ মহিমায়

—(*)—

ত্যাগের পথ প্রশস্ত এবং উৎকৃষ্ট জানি বটে, শাস্ত্র, ভাগবৎ, সাধু-গুরু সকলেই একবাক্যে ত্যাগের মহিমা ঘোষণা করে থাকেন। ত্যাগে শান্তি, ত্যাগে শক্তি, ত্যাগে অমৃত ক্ষরণ হয়ে থাকে! সব জেনে-শুনেও আমরা সে প্রশস্ত রাস্তায় চলতে পারি কয় জন?

"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—বলতে বলতে অনেক বলে ফেলেছি—কি করি, বলতেই হবে। যতদিন দেহটা রয়েছে, একমুঠো অন্ন দিয়ে তার জীবনীশক্তির পুষ্টি রাখতেই হবে, এ ধ্রুব সত্য। অন্নের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়া না এসেও যায় না। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী যখন একদিন দেহটা জন্মালই, দেহের সঙ্গে সঙ্গে আহারের ব্যবস্থাটাও নিজকেই করতে হচ্ছে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও হতে থাকে, তাহলে সে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে কোথায় ফেলে দিই বল দেখি! সৃষ্টির পাতনির কোন মুহূর্ত্তে এ দেহটা পেয়ে ফেলেছি, আজ তার গলদ ঘুচাতে গিয়েই না নিজকে শেষ করে ফেলেছি।

কথাটা শুনতে নিতান্তই ক্ষ্যাপামীর মতই হয়ে উঠে। আবশ্যক হলে ক্ষেপেও যেতে হবে। কেননা, আমি তো আর দুঃখ-কষ্টের ভিতরে থাকি এটা আমার অভিপ্রেত নয়। নেহাৎ ভাল মানুষটির মতই না প্রকৃতির দেওয়া এই সব দুঃখ-কষ্টে নিজকে অভ্যস্ত করে তুলেছি। যাক, ওসব বালাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। আমার আদৎ স্বভাবই হল, সুখ এবং আনন্দ। সুখ এবং আনন্দ খুঁজতে গিয়েই তো দুঃখের খাদে আজ নিজকে পুড়িয়েছি।

তাহলেই নিশ্চয় স্বীকার্য্য—নিজের বলে কিছু নাই। নিজের বলে যাকে আঁকড়িয়ে ধরে পড়ে আছি, সবই যে পরের—এতদিন তো বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে আমার স্বভাবের বিরুদ্ধটা আসে কেন? সেখানেই যে আমার অন্তর নাড়া দিতে চায়। সেখানেই যে নিজের দখলীস্বত্বের ওপর দাবী ছাড়তে হচ্ছে।

আমার স্বভাবই হচ্ছে আনন্দে থাকা। তার উপরি পাওনা যেটা সেটা হল বিভীষিকা। কেননা যে দুর্ব্বল তারই পাওয়ার দাবীটাও বেশী। দুর্ব্বল যে অবলম্বন ছাড়া থাকতে পারে না। সেই জন্যে দুর্ব্বল পেয়ে দুর্ব্বলের কাছেই আসে দুঃখটাও। এই চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে এত অসামঞ্জস্য বলেই আমরা ঠিক জীবনের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করে নিতে চাই। এই বোঝাপড়া করতে গেলেই করতে হয় ত্যাগ। যেমন আমরা দুঃখ পেয়ে আঁৎকে উঠি, তেমনি আমরা ত্যাগকে বিভিন্ন দিক হতে দেখি বলেই, সুখটাকে ত্যাগ করাই আমাদের জীবন সার্থক মনে করি। কিন্তু সত্যের খাতিরে এও বলতে হচ্ছে, আমরা জীবনে সুখকে পরিত্যাগ করে চিরকালই দুঃখের মধ্যে থাকি, এটাও তো আমাদের খাঁটী উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা আমাদের উদ্দেশ্যই হল আমরা দুঃখকে পরিত্যাগ করি। কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই কৈ? যত ছাড়তে চাই ততই যেন জড়িয়েই পড়ি। তাই আমাদের সুখ-দুঃখ উভয়কে ত্যাগ করতে শিখতে হবে। সুখ এবং দুঃখ উভয়ের পরপারে যেতে হবে। প্রথম বৈরাগ্য নিয়ে যখন এসেছিলাম, বোধ হয় এটাকেই বুঝে নিয়েছিলাম, জীবনের সব চেয়ে যেটা কাম্য—অর্থাৎ সুখ, সেটাকেই ত্যাগ করে দুঃখকে বরণ করে নেওয়াই বৈরাগ্যের উৎকর্ষ। হাঁ, কতকটা তাও বটে, কিন্তু যেমন নিজকে সুখকে ত্যাগ করতে অভ্যস্ত করে তুলেছি, তেমনি দুঃখেও অটল থাকতে হবে। ইচ্ছা করে দুটীকেই বুকের মধ্যে পূরে নিতে হবে। অর্থাৎ সুখে-দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও বিগতস্পৃহ হতে হবে।

বুদ্ধদেবকেও বোধ হয় এই ভ্রমে পতিত হতে হয়েছিল। কেননা বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়েই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন দেখতে পাই। বোধ হয় শরীরকে শীতাতপে বাত্যাঝঞ্ঝায় ক্লেশ দেওয়াই নিবৃত্তির চরম মনে করেছিলেন। ছবছর ধরে কঠোর তপস্যায়ও যখন সত্যলাভ হল না তখন বুদ্ধদেব শরীরকে নিয়মিত আহার দিয়ে, শরীরের যন্ত্রগুলিকে যথাযথ ভাবে রেখে তবে সাধনার সত্য বস্তু লাভ করেছিলেন।

শরীরকে ক্লেশ দেওয়াটা শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য নয়। কেননা সত্যলাভের পথে মনটি একেবারেই আকাশের মত নির্ম্মুক্ত হওয়া চাই। ক্লেশ অক্লেশ সব থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে হয়, তবেই সেখানে সত্যের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হবে। মোটকথা আমি দেহের "হাঁ"তেও নাই—"না"তেও নাই। দেহের কাজ দেহে করুক, আমি আমার অন্তরতম প্রদেশ হতে হাঁ-না উভয়ের রস উপভোগ করতে থাকলাম। তাহলে আমার জীবনের জন্য আমার কোনো প্রত্যবায় থাকল না, তাকে নিয়ে আমাকে আর বিব্রত হতেও হল না। কেননা আমি আদতেই জানলাম আমার জীবনটা একটা রেখার মত চলেছে আর আমি একটী বিন্দুর মত আপন মহিমায় জ্বলতে থাকলাম।

আমরা অধ্যাত্মরাজ্যে কচি অবস্থায় ভুলকে সংশোধন করতে চাই—কিন্তু ভুলকে পরিত্যাগ করতে চাই না। তাই আমরা একূল ছেড়েও ছাড়তে পারি না, ওকূল ধরতে গিয়েও বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আমাদের দুর্ব্বলতাগুলিকে সত্য বলে মেনে নিই বলেই জীবনটাকে আরও ভারী করে তুলেছি। পারতপক্ষে আমাদের দুর্ব্বলতাগুলিকে দুর্ব্বল বলেই মেনে নিই যদি, তাহলে আর সুখ

এবং দুঃখ উভয়তঃ ত্যাগ করতে কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা দুর্ব্বলের সঙ্গে আর বাজে শক্তি নষ্ট করবার কি দরকার। সে দুর্ব্বল, যাবে আসবে, তাতে আমার যায় আসে কি? সেখানে যে আমার মহিমায় আমি নিজেই খাঁটি। কিন্তু সব সময় আমরা আমাদের পাওয়ার সঙ্গে জীবনের দৈনন্দিন খুঁটি-নাটির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারি না বলে জীবনের গলদটাও বাড়িয়ে তুলে নিজের আত্মমহিমাকে খর্ব্ব করি।

জগৎ কর্ম্মময়। জীবকে প্রকৃতির দ্বারাই জগতে কর্ম করতে হয়। কর্ম্ম করায় পুণ্য আছে মানি, কিন্তু কর্ম্মের ফলের প্রতি আসক্তিশূন্য হতে না পারিলে সে কর্ম্মে গলদ এসে পড়ে। এই জন্যে বলতে হচ্ছে পাপটা যেমন দুর্ব্বলের পুণ্যটাও দুর্ব্বলের। আমরা পাপটাকে মন্দ বলে পুণ্য অর্জনে মন দিই, কিন্তু সেও দুর্ব্বলেরই পুষ্টি হয়ে থাকে। আমরা কৌশল করে পুণ্য অর্জ্জন করে পাপ পরিত্যাগে অভ্যস্ত হই তেমনি পাপ আর পুণ্য উভয়কে ত্যাগ করতে হবে আত্মাকে কেন্দ্র করেই। তবে সেটা একদিনে হল না বলে আমরা যেন হতাশ হয়ে না পড়ি। অভ্যাসের দ্বারা সবই সাধন হয়। একটা ভাবকে ধরে থাকলে সে ভাবের পুষ্টি হবেই। তবে চাই ধৈর্য্য, অধ্যবসায়। তাড়াতাড়ি করতে নাই, বরং তাতে হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি ত্যাগ—ত্যাগ হয়ে উঠে না—তাতে দুর্ব্বলেরই একটা দিক ছেড়ে আর একটা দিকের বোঝা ভারী হয়!

কর্ম্ম করতে হবে ওখান হতেই, যেখানে পাপকে যেমন সহজে ছাড়তে পারি তেমনি পুণ্যকেও আসক্তিবর্জ্জিত হয়ে ধরতে পারি। তাহলে আমাদের কর্ম্মের জয়ে পরাজয়ে বা লাভালাভে হর্ষ-বিষাদ কিছু থাকবে না। আবার তার উপরি পাওনাও রইল, কেননা কর্ম্মের দ্বারা আমার জীবনযাত্রাও চলল, সাধনাও চলল, আবার ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করে একটা অনাবিল আনন্দও পাওয়া গেল। কেননা কর্ম্মের মধ্যে যে নিজকে বিলিয়ে দেওয়া হল। আমি আমার সব দিলাম অথচ সব দিয়েও আমি বেশ দিব্যি আরামে একটা নিরিবিলি জায়গায় আপন ভাবে বসে রইলাম। আমার বাহিরে ভিতরে কর্ম্ম হতে থাকল আর আমি সবাইর ওপরে সম্রাট হয়ে বসে রইলাম, আর যেন সবাই আমারই হুকুম তামিল করতে থাকল।

সবকে ত্যাগ করতে গিয়ে অর্থাৎ আমি আমার চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করলাম এটা যেন প্রথম প্রথম কেমন ঠেকে, আর ভয়ও এসে থাকে। কিন্তু এতে ভয় পেলে চলবে না। প্রকৃতি কত যুগ সাধনার পর এই নশ্বর দেহটাকেও নশ্বর ভোগের উপযোগী করে তুলতে পেরেছে। তেমনি মুক্তির শ্বাস ফেলতে হলেও নিজকে কিছুদিন আত্মসাধনায় নিয়োগ করতে হবে। প্রদীপ নিভবার সময় আলোটা একবার জোর দিয়ে উঠেই। কেননা কিছুটা বিষয় বৈরাগ্য হওয়াতে আত্মার জ্যোতিঃ এসে মনের ওপর প্রতিফলিত হয়ে, মনও আত্মার চৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত হয়ে জোরালো হয়। এতে মন যেদিকে জোর দেয় সেদিকটাই প্রবল বলে বোধ হয়। কেননা এদিকে সাধকের গুণক্ষয় না হওয়ার দরুণ বিষয়ও ত্যাগ করতে পারছে না, আবার ঝাপসা ঝাপসার মত আত্মার জ্যোতিঃ পেয়ে বিষয় ভোগেও সে রকম প্রবৃত্তিতে কুলায় না। এতে মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একবার ওপরদিকে একবার নীচের পানে তাকাতে থাকে। আত্মার শক্তিতে মন শক্তিমান হওয়াতে মন যখন ইন্দ্রিয়যুক্ত হয় তখন ইন্দ্রিয়গুলো বড়ই প্রবল বলে বোধ হয়। তখন মনে হয় ইন্দ্রিয়-সুখ ছাড়া বুঝি আর ত্রিজগতে সুখ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পর যখন সীমাবদ্ধ দেহকে গ্লানি ভোগ করতে হয় তখন আবার মন অনুতাপানলে

জলেপুড়ে ছাই হতে থাকে। কিন্তু তা বলে ভয় পেলে চলিবে না; সমুদ্রের সঙ্গে নিজকে মিশিয়ে দেবার জন্যে নদ-নদী পাহাড় থেকে তার অপ্রতিহত বেগ নিয়েই নেমে আসে। তার সে শক্তিকে রোধ করবার ক্ষমতা জগতে কারও নাই। আমাদের মধ্যে আমাদেরও সেই মহাসমুদ্রে মিশিয়ে দেবার জন্যে অপ্রতিহত বেগ আছে। কিন্তু সেটাকে জাগানো চাই। আমরা ইন্দ্রিয়শক্তিকে কুৎসিৎ বলে থাকি, সে নীচুমুখী শক্তিকে ওপরমুখী করে দিলেই একটী মহাশক্তির কাজ করে থাকে। ইন্দ্রিয়-শক্তিকে থামাতে পারলেই তো আমাদের অন্তরে শক্তির পুষ্টি হয়ে আনন্দ সঞ্চারিত করে। মহা-শক্তির যে রসধারা নীচুমুখী প্রবাহিত হচ্ছে, সেই তো ইন্দ্রিয়শক্তি। তাই বলি ত্যাগের পথে ভয় পাবার মত কিছু নাই। বরং ত্যাগের মহিমাতে জড় এবং নশ্বর দেহও মহিমান্বিত হয়ে উঠে।

ব্যাপ্তি

—*—

যেখানে থাকি, সেখান থেকে Post office হবে প্রায় ২ মাইল কি ২॥ মাইল। ডাক আনার দরুণ রোজই যেতে হয়, কেননা সপ্তাহের মাঝে পিয়নের মাত্র দুদিন আসার কথা। রোজই যাওয়া হয় বলে, পিয়ন এই দুদিনের মাঝেও কোন কোন দিন আস্তে ব্যতিক্রম করে। গরজটা আমাদেরই বেশী কিনা—তাই আমাদেরই নিয়মিত ভাবে দৌড়াতে হয়।

যাক্ সে দিন তো পোষ্টফিস্ অভিমুখে রওনা হয়েছি। আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে চল্‌ছি—আর মনে মনে একটা চিন্তাও কর্‌ছি। পোষ্টাফিসে রেল-লাইন ধরেই যেতে হয়, লাইনের বাম ধারে অল্প কিছু দূরেই ব্রহ্মপুত্র নদ। একটু হাওয়াও দিচ্ছিল, জলকণাবাহী মৃদু-মন্দ হাওয়াতে শরীরমনপ্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে এল। বেশ চল্‌ছি—হঠাৎ আমার চিন্তা-ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন আর নিয়মিত ভাবে পড়্‌ছেনা। সম্মুখে যা দেখ্‌তে পেয়ে-ছিলাম, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, ঘর-বাড়ী, নদী-পর্ব্বত, আকাশ, সবের সঙ্গে যেন আমি মিশে গিয়েছি—আর কি আশ্চর্য্য, তখন যেন আমি সবের ভাষাও বুঝতে পেরেছিলাম। আমার আনন্দ কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই কাঁপছিল। বেশী নয়, মিনিট ১০।১২ এই অবস্থায় ছিলাম, তারপর হঠাৎ গাড়ীর হুইসেলে যেন চমক ভাঙ্গল। ভগবানই রক্ষাকর্ত্তা, বেশী না আর কয়েক মিনিট এই অবস্থায় থাক্‌লেই হয়ত গাড়ী-চাপা পড়্‌তাম।

সে দিনের ব্যাপ্তির আনন্দের কথা আজও ভুল্‌তে পারিনি—তার স্মৃতিতেও কত আনন্দ!

যাত্রী

—*—

ভাই!

প্রতি বৎসরই শুনি কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে কতজন প্রাণ দিয়েছেন—এখনো সেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করার প্রচেষ্টা ক্ষান্ত হয়নি। মরণ জেনেও মানুষ মরণের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে যাচ্ছে। বাস্তবিক এই দুঃসাহস, আর অসীম ক্ষমতা আছে বলেই না মানুষ অব্যক্ত থেকে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছে। প্রাণটা যেন এখন একটা তুচ্ছ সামগ্রী হয়ে উঠ্‌ছে, এর চেয়েও মহৎ বস্তুর দরুণ মানুষের মন পাগল হয়ে উঠেছে—তাই প্রাণকেও বিসর্জ্জন দিতে আজ কেউ কুণ্ঠিত নয়।

অভিযান আজ সব দিকেই চল্‌ছে ভাই—দেশভ্রমণে, দেশোদ্ধারে অসংখ্য মানবের প্রাণ উত্তেজিত—উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। তুমি জান্‌তে চেয়েছ—আমি কোন্ পথের যাত্রিক। বাস্তবিকই প্রাণ খুলে বল্‌ছি ভাই—আমার কিন্তু এসব কিছুতেই তৃপ্তি আস্‌ছে না। মৈত্রেয়ীর প্রাণে একদিন যেমন অতৃপ্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল, আর যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে—"যেনাহং নামৃতাং স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং?" রত্ন দিয়ে কি আমি অমর হতে পার্‌ব? তা-ই যদি না হল, তাহলে এসব ধন-রত্ন দিয়ে আমি কি কর্‌ব?" আমার প্রাণেও আজ অতৃপ্তির দাবানল জ্বলে উঠেছে—আমি আজ সত্যের দরুণই পাগল! আমার অভিযান সত্যের প্রতি, সে সত্য কোথায় জানি না—তবে কিনা তারই অদৃশ্য আকর্ষণে আমার মন-প্রাণ-দেহ সবই যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে ছুটে চল্‌ছে!

আমি যে সত্যের পানে ছুটেছি, তা কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চেয়েও কঠিন—দুষ্কর। যাত্রাপথে আমার সব আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে মুক্ত নিঃসঙ্গ হয়ে চল্‌তে হবে। এই কঠিন সত্যের কল্পনাতেও অনেকে ভয় পায়—কিন্তু আমি আজ দুর্দ্দম, আমার বুকে আজ অফুরন্ত বল: সে বল কোথা থেকে পেয়েছি, তোমরা বল্‌তে পার কি?

আমাকে তোমরা নিষ্ঠুর, স্বার্থপর বল্‌তে পার, কিন্তু আমি আজ সত্যের দরুণ সব গঞ্জনা একান্ত মনে সহ্য করে নিতে পার্‌ব। মনে করো না, অভিমানে—গর্ব্বে আমি সবাকে অবজ্ঞা করে চল্‌ছি, আমার প্রাণ প্রত্যেকের দরুণই আকুল—কিন্তু এ আকর্ষণ, এ ভালবাসা অন্ধের মত, কেন কি হচ্ছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! বুকে যে বেদনা অনুভব কর্‌ছি, তারই মূল নিদান স্বচক্ষে আমি দেখ্‌তে চাই—পরের চোখে নয়, পরের শোনা কথায় নয়।

পথিক—বন্ধু!

আরণ্যক



যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

দুঃখ কি? চিন্তার চাপ। আনন্দে সে চাপ উড়িয়ে দেওয়া।

*

আলো কি? যা আঁধার নাশ করে। মনের আলো জ্ঞান।

*

সুখ-দুঃখ আখ্যা মানুষের, ভগবানের নয়। তাই তার কাছে সবাই সমান। কিন্তু কর্ম্মফলানুযায়ী সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে তাঁকে আড়াল করি আমরাই। ভগবান্ সব করান যার মনে হয়, সেই দ্বন্দ্বাতীত।

*

তিনিই যখন সব করান, তখন অসৎ কর্ম্মও তো তিনিই করাচ্ছেন, এই বলে যারা মনকে প্রবোধ দেয়, তাদের একথাও স্মরণ করা উচিত যে, এর পরে যে শাস্তিটা আসবে, তাও কিন্তু তিনিই দিচ্ছেন। সুতরাং হাসিমুখে আনন্দে যেন তা বরণ করা হয়।

*

যে-দুঃখে মন খাক্ করে নেয়, সেই দুঃখেই শক্তি সঞ্চয় হয়। সুখে থাকা শিশুরই সম্ভব। কেননা তার সঞ্চয়ের শক্তি কম, দুঃখও কম।

*

সুখে পালিত হওয়া পৌরুষ নয়, মনটাকে সুখে রাখাই পৌরুষের ব্যাপার।

*

আনন্দই সহজ। দুঃখটা আবরণ মাত্র। নইলে যে মানুষ বাঁচত না।

*

ডাকি, প্রাণে সাড়া পাই না—ছিপ কোশাকুষি ঘসেই জীবন গেল! কেন এমন হয়? প্রাণে আকুলতা নাই—তাই। তেজীয়ান বলবেন, দাও ওসব গঙ্গায় বিসর্জন! মনে যা চায় তাই কর—উদ্দাম গতিতে চলে যাও। তাতে এমন মঙ্গল মুহূর্ত্ত আসবে, যা এক মুহূর্ত্তে অজস্র দিনের সংস্কার ভেঙ্গে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু চাই ওই তীব্র সংবেগ।

*

অন্তর জয় করতে চাই দেবশক্তি। বাহির জয় পশুশক্তিতেও হয়। ভোগে পশুশক্তি আয়ত্ত হতে পারে, কিন্তু দেবশক্তি আয়ত্তের উপায় যোগ বা তপস্যা। অন্তর জয়ে বাহির আপনি আসে, কিন্তু বাহির জয়ে অন্তর ধরা দেয় কি?

*

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে

দানপ্রাপ্তি

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ২৫৲ পূর্ব্ববাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম ৫৲ মধ্যবাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম ৫৲ উত্তর বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম ৫৲ জোড় পাকড়ী আশ্রম ২৲

নদীয়া—দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—কালীপদ দাস প্রিয়নাথ ভৌমিক ত্রৈলোক্য বিশ্বাস রামকৃষ্ণ পাল ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—রামব্রহ্ম পাল রসিক বিশ্বাস রাজকৃষ্ণ পাল

চট্টগ্রাম—হেমন্তকুমার ঘোষ ২৲

হাওড়া ও হুগলি—পাঁচটাকা করিয়া—ফণিভূষণ মিত্র প্রকাশচরণ আঢ্য ; দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—হেমচন্দ্র ঘোষ সন্ন্যাসিচরণ আঢ্য ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী।

রাজসাহী—একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত রজনীকান্ত প্রামাণিক দেবেন্দ্রনাথকর্ম্মকার

২৪ পরগণা—দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—নারায়ণ দাস নন্দী শরৎচন্দ্র বানার্জ্জি ; একটাকা করিয়া—বীরেন্দ্রকুমার সরকার উপেন্দ্রকুমার সমাদার প্রিয়নাথ হালদার ২১৵০।

বগুড়া—শ্রীযুক্ত জগতিনারায়ণ চাকী ২৲ ; একটাকা করিয়া—হরপ্রসাদ রায় সুরেন্দ্র গুপ্ত গোবিন্দ পূততুণ্ড, শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকার ৷৷ ।

কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট—দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—গগনচন্দ্র দাস বিহারীমোহন শর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত রাধানাথ দে ১৲ ।

মেদিনীপুর—বড়গোদা সারস্বত সংঘ ৫৲ তমলুক সংঘ ভীমাচরণ ৯৲ ; একটাকা করিয়া—মৃগেন্দ্র চৌধুরী যোগেন্দ্র চৌধুরী।

বর্দ্ধমান শ্রীযুক্ত নলিনী বানার্জি ২৲ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সাহা ৫৲ উচালন সংঘ ১৫৮/০।

ঢাকা ও ফরিদপুর—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ২৲ ; একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—গোপালচন্দ্র নিয়োগী যতীন বানার্জি কুমদিনী কান্ত সাহা ।

সন্দীপ—শ্রীমতী সত্যভামা সাহা ২৲ মহিলা-সংঘ ৪৲ ।

জেমসেদপুর—শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার ঘোষ ২৲ ।

মানভূম—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বানার্জি ১৲

কলিকাতা—শ্রীযুত সুদর্শন দাস ১৲

চিলমারী—জানকীমোহন রায়চৌধুরী ১৲

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী ১৲

একটাকা করিয়া শ্রীযুক্তাঃ—চন্দ্রকুমার নাথ রাই বিনোদ পাল বৈকুণ্ঠচন্দ্র নমঃ সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী নরেশচন্দ্র ধর বিপিনবিহারী সাহা আটআনা করিয়া—শ্রীযুক্তঃ মহেন্দ্রচন্দ্র পাল শরৎচন্দ্র পাল শ্রীযুক্ত রাধানাথ দে ৭৲

শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ পাল ৪৲ । একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—ভরতচন্দ্র পাল ঈশ্বরচন্দ্র দাস রঘুনাথ দাস রাধামোহন ঘোষ যামিনীমোহন দত্ত মহিরাম শীল কানুরাম দাস শরৎচন্দ্র দালাল সুরেশচন্দ্র শর্ম্মা বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস সূর্য্যমণি দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস সূর্য্যরাম নমঃ কুঞ্জরাম নমঃ তিলকচন্দ্র নমঃ উদয়চন্দ্র নমঃ হরিধন নমঃ। খুচরা সংগৃহীত ২২৷৷১০ । বদরপুর অঞ্চল হইতে কামেশচন্দ্র পাল সংগৃহীত ২১৷৷০ ।

সংবাদ ও মন্তব্য

জন্মমহোৎসব—বিগত ২৪শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে সারস্বত-মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের সার্ব্বভৌম জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, আরতি, হোম, বেদপাঠ, ব্রহ্মনামযজ্ঞ ও নগরসংকীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। পূজান্তে কীর্ত্তনাদির পর সমাগত ভক্তমণ্ডলী গঙ্গীয় তিলক ধারণ ও লুচিমিষ্টান্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বগুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বরিশাল, হুগলী হইতে ভক্তসমাগম হইয়াছিল।

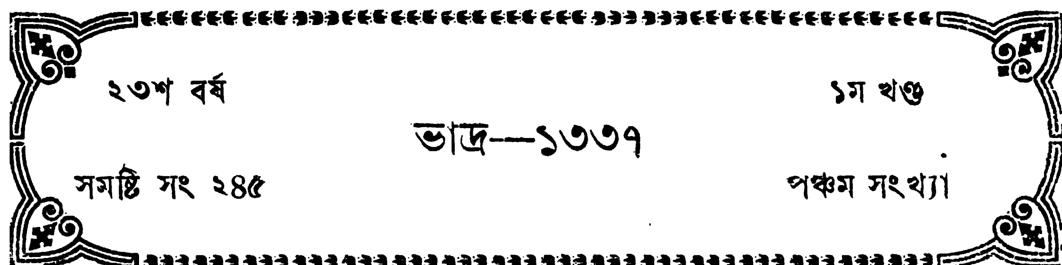
পরদিন বেলা ১০টার সময় শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজের সভাপতিত্বে একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থানীয় ভক্তগণ যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ সরস্বতী, তত্রত্য নিগমানন্দ সারস্বত মন্দির শিক্ষালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন এম্-এ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র, শ্রীযুক্ত পশুপতি দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ সংঘ-শক্তি ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনাদি করেন। বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ, অনুপস্থিতগণের পত্রপাঠ ইত্যাদির পর সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হয়।

গ্রাহকগণের প্রতি—নানা দৈব প্রতিবন্ধক হেতু শ্রাবণের পত্রিকা অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশিত হইল। ভাদ্র-মাসের পত্রিকা আশ্বিনের শেষভাগে প্রকাশিত হইবে। এবিষয়ে সদাশয় গ্রাহকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।



"ব্রহ্মবিদিব বৈ ভাসি!"

—*—

ব্রহ্মবিদিব বৈ সৌম্য ভাসি, কো নু ত্বানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি প্রতিজজ্ঞে, ভগবান্ স্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ॥

২৮১।২ ছান্দোগ্যোপনিষৎ

আচার্য্য বলিলেন—"হে সৌম্য, তুমি যেন ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ! জিজ্ঞাসা করি, কে তোমাকে উপদেশ দিলেন? সত্যকাম প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই মনুষ্য ভিন্ন (অর্থাৎ পশু প্রভৃতিরা) অন্য কেহ, অতএব আপনিই আমার অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।"

—২৫

গুরুর নিকট যাইতে হইবে, অন্তরের সাধনায় দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া। গুরু যেন মুখ দেখিয়াই অন্তরের অনির্ব্বাণ আকুলতার পরিচয় পান। খাঁটী শিষ্যের এই লক্ষণ!

গুরুর কাছে শিষ্যকে পরিচয় দিতে হয় না—শিষ্যের মুখ দেখিয়াই গুরু সব বুঝিতে পারেন। তোমার অন্তর যদি সাধনাগ্নি দ্বারা নির্ম্মল হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশুদ্ধ চিত্তের দীপ্তি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। খাঁটী জিনিষ পাইলে তাহাকে আর আড়াল করিয়া রাখা যায় না।

চাই শুধু সত্যকামের মতন নীরব সাধনা। সত্যকাম সত্যেরই সাধনা করিয়াছিলেন—গোচারণ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে কোন অবস্থায়ই পড় না কেন, আপন লক্ষ্যে অচল-অটল থাকিয়া নিয়ত সাধনা করিয়া যাইতে পারিলে সত্যকামের মতন সত্যের দীপ্তিতে তোমারও একদিন চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন তুমিই "ব্রহ্মবিদিব বৈ ভাসি!"

অবিশুদ্ধ চিত্ত লইয়া গুরুর কাছে যাইতে নাই। চিত্তকে নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় নির্ম্মল বিশুদ্ধ করিয়া নিরভিমানী হইয়া গুরু সন্নিধানে যাইতে হইবে। তোমাকেই সব করিতে হইবে—গুরুর প্রসন্ন দৃষ্টি মাত্র তোমাকে নিশ্চিন্ত কৃতার্থ করিয়া দিবে।

সত্যকাম বৃষদেহে আবির্ভূত বায়ু, অগ্নি, আদিত্যের উপদেশ পাইয়াও, সাক্ষাৎ মানুষ-গুরুর উপদেশ প্রার্থী হইলেন। অন্তর্য্যামী আত্মা, দেবতা ইত্যাদির উপদেশ পাইয়াও মানুষের সন্দেহ ঠিক মানুষের মুখ হইতে কিছু না শুনিলে বিদূরিত হয় না। এইখানেই মানুষ-গুরুর মহিমা। কিন্তু এই কথাটী মনে রাখিও, সত্যকামই যদি তোমার আদর্শ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সত্যের প্রতিজ্ঞা অটুটভাবে পরিপালন করিয়া তারপর গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে!

আত্মোপলব্ধির বিরাট যজ্ঞে, তোমারই দেহ মন-প্রাণ সব বিসর্জন দিতে হইবে, ইহাই হইল যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। অগ্নিস্বরূপ আত্মা তখনই সন্তুষ্ট হইবেন।

অগ্নিস্বরূপ আত্মার দীপ্তি তোমার দেহকে পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনু"—ইহার তাৎপর্য্য এই। রক্ত-মাংসের শরীরই তখন দেবশরীরে পরিণত হইয়া যায়।

গুরুর মুখপানে চাহিয়া থাকিও না—আত্মসাধনার প্রতি লক্ষ্য কর। গুরুকে প্রসন্ন করিতে পারে কাহারা?—যাহারা আত্মনির্ভরশীল।

নিজের দিক হইতে যাহা কিছু করিবার, নিঃশেষে তাহা সাধন করিয়া, তারপর উপদেশপ্রার্থী হইও। প্রথমতঃ অন্তরের আকুলতা দ্বারাই অন্তর্য্যামী গুরুকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাঁহার নির্দেশ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে প্রতিপালিত হইলে পর—দৃঢ়নিশ্চয় হওয়ার দরুণ বাহিরের গুরু খুঁজিও। তাহা হইলেই জীবনের আর অধঃপতনের কোন কারণ থাকিবে না।

নিজের দিকে ফিরিয়া তাকাও, আত্মনিরত হও। তাহা হইলেই এক এক করিয়া সবই পাইবে। গুরুকে শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর; কিন্তু বিনা সাধনায় গুরুর কাছে কৃপা-ভিক্ষা করিতে যাইও না।

প্রসন্নেন্দ্রিয়, প্রহসিতবদন, নিশ্চিন্ত, কৃতার্থ ব্রহ্মবিদেরন্যায় নীরব সাধনায় তন্ময় হইয়া থাক!

পথনির্দ্দেশ

—(৬)—

চারিদিকের বিভীষিকা দেখিয়া পিছু হটিয়া গেলে চলিবে না, হৃদয়দৌর্ব্বল্য বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বীরের মত ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এতটুকু কর্ত্তব্য থাকিতে ছুটি নেওয়ার প্রলোভন যেন না আসে। কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছ; কিন্তু সে কর্ম্মের মাঝে আমিত্বের কোন গন্ধ নাই, নিঃশেষে পরার্থে নিজের জীবনকে তিলে তিলে বিলাইয়া দিতে হইবে। তুমি সাধক—তুমি সেবক! জীবনের লক্ষ্য তোমার পরকে তৃপ্ত করা। পরকে তৃপ্ত করিয়া যে আনন্দ পাইবে, সেই আনন্দই তোমার নূতন প্রেরণার প্রাণ। জীবন দিতে পারিলে তবে তোমার সাধনা পূর্ণ হইবে। এর আগ পর্য্যন্ত নীরবে তোমায় আত্মদান করিয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি কিম্বা আনন্দ না পাইলেও মনে করিও না, তোমার সব বিফল হইল! মনে রাখিও, তোমার সাধনার সিদ্ধি হয়ত এই জীবনে নাও হইতে পারে। হয়ত তোমার শ্রমের সার্থকতা তুমি নিজে চোখে না দেখিয়াও যাইতে পার, কিন্তু ভাবিও না আত্মদানে আত্মলোপ হইবে। আবার হয়ত তুমিই অসমাপ্ত কর্ম্মপ্রেরণা নিয়া দ্বিগুণ বল নিয়া কোথাও জন্ম পরিগ্রহ করিবে। সাধনা কোন দিন বিফল হইবার নয়, এই বিশ্বাসটুকু হৃদয়ে পোষণ করিয়া অন্ধকার কিম্বা মরুভূমি দিয়াও যদি তোমার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহাতেই বা ভয় কিসের? অর্দ্ধপথেও যদি শ্রান্ত হইয়া তুমি আর পারিয়া না উঠ, তাহা হইলেও সেইখানেই তোমার সাধনার বিরাম হইবে না, আবার অসমাপ্ত পথ হইতেই তোমার মাঝে সাধনার নব-বল সঞ্চারিত হইবে।

'আর পারি না' ইহা তো দুর্ব্বলের মত কথা। মরণ জানিয়াও নির্ভীক-চিত্তে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতে পারিলে তবে না বুঝিব তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক! পারিপার্শ্বিকের চিন্তায়-ভাবনায়, দুর্ব্বলতায় তোমাকেও যদি আন্দোলিত করিয়া তুলে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তোমার মাঝে সাধনার জোর নাই, সঙ্কল্পের প্রবল আবেগ নাই। জগৎ তোমায় গোঁড়া বলে গালি দিক্, কিন্তু তোমার জীবনেরশেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত যদি আপন আদর্শের দরুণ ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে কেমন করিয়া? সমস্ত জগৎ দ্বিধায় আন্দোলিত হইতে পারে, কিন্তু তুমি জগতের সঙ্গে উঠিবে-পড়িবে, ইহা কেমন কথা? তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে তোমায় কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। কেননা তুমি যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র পাইয়াছ—শুধু পাওয়া কেন, তুমি যে সেই কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। তোমার জীবনের প্রত্যেকটী স্পন্দনের মূল হইতেছে সেই কেন্দ্র হইতে উত্থিত আবেগ। সকলের সঙ্গে তুমিও ভাসিয়া যাইবে, তাহা হইলে কি তুমি স্রোতের খড়-কুটা?

মানি, তুমি মানুষ, জড় নও। পারিপার্শ্বিকের সুখ-দুঃখের ঢেউ আসিয়া তোমাকে আঘাত করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিবে, ইহা অসম্ভব কথা নয়। বেশ তো, দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ কর, পারিলে সাহায্য কর; কিন্তু তোমার আত্মকেন্দ্র হইতে শক্তি আহরণ করিয়া দুর্ব্বলকে কি তুমি একটু আশা-ভরসাও দিতে পার না? তোমার বলিয়া কি তোমার কিছুই নাই? শুধু সমবেদনা প্রকাশ

করাতেই সব শেষ হইল না, দুঃখে পড়িয়া যে হাবুডুবু খাইতেছে তাহাকে তোমায় বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। কাজেই দুঃখীর সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিলেই চলিবে না, যাহাতে তাহার দুঃখ বিদূরিত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে তোমাকেই।

চেতন বলিয়াই অপরের সুখ-দুঃখও তোমার বুকে আসিয় বাজে, কিন্তু বুক দিয়া শুধু দুঃখকে অনুভব করিতে পারিলেই তো তোমার কর্ত্তব্যের ইতি হইল না। অপরের দুঃখ তুমি অনুভব করিতে পার ইহাতেই তুমি ভাগ্যবান, কিন্তু এর চেয়েও তোমার জীবনের মূল্য অধিক যে তুমি দুঃখীকে নিজের প্রাণ দিয়া সাহায্যও করিতে পার! কাজেই প্রাণ থাকিতে তুমি নিশ্চেষ্ট callous হইতে পার কি করিয়া? ইহা হইতেও যদি তুমি বড় জিনিষ পাইয়া থাক, তাহা হইলে তাহা আমাদের আদর্শেই মাথার মণি হইয়া থাকুক, বাস্তব জগতে সেই আদর্শের কতখানি প্রয়োজনীয়তা, তাহা বিচার্য্য।

পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে বলিয়াই যাহারা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনবাস করিতে যায়, তাহাদের প্রাণের দিকে তাকাইয়াই আপাততঃ কর্ম্মের শৈথিল্যে মনের মাঝে কোন ক্ষোভ সঞ্চয় করিতে পারে না। তাহাদের ভিতর কোন দুর্ব্বলতা নাই, জগৎকে প্রাণ দিয়া সেবা করিবে বলিয়াই শক্তিসংগ্রহের দরুণ তাহাদের এত ব্যাকুলতা। বিবিক্ত সাধনার মাঝেও যদি এই মহৎ সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কৈবল্যের সাধনা বলিতে চাই না।

আসল কথা হইল প্রাণে জ্বালা আসা চাই। সেই জ্বালার নির্ব্বাণ যে সকলেরই এক পথ ধরিয়াই হইবে তাহার তো কোন মানে নাই। সশঙ্কিত, ব্যস্ত, আন্দোলিত জগতের সবাই, কিন্তু কেহই কি জগতে কর্ণধার নাই? যেখানে প্রায় সকলেই বিভ্রান্ত, সেখানে আপন আদর্শে লক্ষ্যে অচল-অটল থাকিতে পারাটাই তো একটা মহৎ কাজ। চারিদিকের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছে, আজকাল এই নিষ্ঠারই প্রয়োজন। সে নিষ্ঠা, ঋষি-বালক নচিকেতার মত হইবে। কোন সংশয়, কোন বিভীষিকা সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না।

না হয় একটা জীবন আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেই সমর্পিত হইল। নিজের মনের সমস্ত সঙ্কল্পকে এক লক্ষ্য—এক সাধনার প্রণালীতে যুক্ত রাখিতে পারা কি কম শক্তির কাজ? Freedom of will বলিতে কি স্বেচ্ছাচারিতা—যা খুসী তাই বুঝায়? না, নিজের ইচ্ছাশক্তিকে আয়ত্ত রাখার নামই স্বাধীনতা! বাহিরের প্রভাবকে অস্বীকার করিতে বলি না, কিন্তু তাহাকে জীর্ণ করিয়া আত্মগত করিয়া লইতে হইবে। প্রাচ্যের সাধনায় ইহাই গূঢ় রহস্য। বর্জ্জন করিতে বলি না, কিন্তু তাহা যেন পরের জিনিষ বলিয়া কোন দিক দিয়া আপন ভাবকে আহত না করে। প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের মাঝে নিজের ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার নামই যদি গোঁড়ামি হয়, তাহা হইলে হোক না তাহা গোঁড়ামি- লক্ষ্যভ্রষ্ট সাধক হইতে গোঁড়া সাধক সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"—সেই বীর্য্য শুধু ধর্ম্মে নয়, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র তাহার আত্মমহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। কাজেই ধার্ম্মিক হইলেই যে সে একঘরে হইয়া থাকিবে তাহা নয়, তাঁহার জীবন তখন বিচিত্র সমস্যায় সমাধানস্বরূপ হইবে। যে পথ ধরিয়াই চল না কেন, বীর্য্য না থাকিলে কোন পথেই সিদ্ধি নাই। ঋষিজীবনে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তাঁহারা এই ঘর সংসার করিয়াও এক একজন ঋষি-পদবাচ্য হইয়াছিলেন। ইহার মূল কারণই হইল, তাঁহারা সাধনা দ্বারা বীর্য্যকে অচল—অটল রাখিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই যে কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হইত, তাঁহারা নিজেরাই তাহার সমাধান করিয়া লইতে পারিতেন, অপরের সাহায্যের দরুণ

তাঁহাদিগকে ভিক্ষুক সাজিতে হইত না। নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম মিটাইয়াও তাঁহারা যে আত্ম গৌরব রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণই সাধনার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাণে অসাধারণ বল ছিল বলিয়াই কর্ম্মের সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদ এতটা বিচার না করিয়াই, আপন কাজ বলিয়াই তাঁহারা যখন যে সমস্যা উপস্থিত হইত তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। বেশী বেশী ব্যবস্থা প্রণয়ন, সজীব ধর্ম্মের লক্ষণ নয়। যেখানে প্রাণ দিয়া সকলেই আপন কাজ সম্পন্ন করিতে ব্যগ্র, সেইখানে তো বিধি-নিয়মের খসড়া কোন প্রয়োজন হয় না।

দুর্ব্বলতা সর্ব্বত্রই হেয়; আধ্যাত্মিকতার মাঝে যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কি ক্ষমার দৃষ্টি দিয়া পোষণ করিতে হইবে! যাহারা ধর্ম্মকে সামাজিক জীবন হইতে একেবারে বিভিন্ন করিয়া নিয়াছেন, বাস্তবিকই তাহাদের সেই ধর্ম্মের কি মূল্য তাঁহারাই জানেন, কিন্তু যাহারা আধ্যাত্মিক সামাজিক সকল দিকের অভাব মিটাইবেন বলিয়াই প্রাণের জ্বালা নিয়া কোথাও নীরব সাধনায় মগ্ন, তাহাদের প্রাণবন্ত সাধনা সকলেরই আদর্শ। সুখে দুঃখে মানুষের প্রাণ যদি মানুষের দরুণ না কাঁদে, তাহা হইলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিশেসত্ব কি?

বাস্তবিক যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের অমৃত স্পর্শ পাইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যবোধ যে আরও বেশী করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে। তাই বুদ্ধদেব সামান্য একটা ছাগশিশুর দরুণও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিলেন। স্থূলে সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া পড়ে, তাঁহাদের সুখ-দুঃখ বেদনা-বোধ অনন্ত।

ধার্ম্মিক হইলে মানুষ পাষাণ হয় না। বরঞ্চ অপ-রের দরুণ তখন তাঁহার প্রাণ আরও বেশী করিয়া কাঁদে। নিজের জীবনকে পরের দরুণ উৎসর্গ করিতে তাঁহারা বুকে আরও বেশী বল পান। বাস্তবিক তুমি যদি মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্যই হইল মানুষকে মানুষ হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

ধর্ম্ম যদি বিশিষ্ট স্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, বিশেষ জায়গায় না গেলে যদি ধর্ম্মপ্রেরণা না জাগে, তাহা হইলে বিচিত্র কর্ম্মের মাঝে আশ্বাস প্রদান করিবে কে? তখন কি শুধু জ্বালা নিয়াই অস্থির হইতে হইবে? অবশ্য বিশিষ্ট স্থানের মহিমায় যে ধর্ম্মপ্রেরণা উজ্জ্বলতর হইয়া না উঠে তাহা নয়, কিন্তু ধর্ম্ম যদি আমাদের constant friend (নিত্য-সহচর) না হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম দিয়া আমাদের জীবনের কি উন্নতি হইল? এমনিও তো কত সময় অলক্ষিতে শুভ প্রেরণার দীপ্তিতে আমাদের চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা হইলে শুধু এই ব্যতিক্রমটাই কি ধর্ম্ম?

অন্তরের সঙ্গে ভাল করিয়া বোঝা-পড়া করিয়া লও। আপ্তের উপদেশে, আর তোমার হৃদয়ানুভূত সত্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে অপরের আদর্শ ধরিবার আর কোন প্রয়োজনই নাই। অবিরাম শুধু তাহাই সাধন করিতে লাগিয়া যাও। কিন্তু দ্বিধা থাকিলে, সংশয় থাকিলে, যেখানে তোমার সন্দেহ-সংশয় মিটিবে বলিয়া আশা কর, সেইখানেই তোমাকে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। মতের বদল হইতে পারে, এইজন্য তোমার নিষ্ঠাচ্যুতি হইল বলিয়া অপরের সমালোচনায় চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিও না। আসল কথা হইল তুমি সত্যের সাধক, সত্যেই তোমার নিষ্ঠাকে আজীবন সংযুক্ত রাখিতে হইবে।

সামান্য কোন কিছুর উপদ্রবে মাথা ঘুলাইয়া গেলে চলিবে কি করিয়া? উপদ্রবের মাঝেই তোমাকে নিরুপদ্রব হইয়া থাকিতে হইবে। কাজেই বাহিরের উপর আধিপত্য না করিয়া আগে তোমায় অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইবে। তাহার পর তোমার মাঝে যে শক্তি

সঞ্চিত হইবে, সেই শক্তি-বলে তুমি বাহিরকেও তোমার অনুকূল করিয়া নিতে পারিবে। ইহা অসম্ভব নয়—অলীক স্বপ্ন নয়। personality বলিয়া যদি কোন কিছু স্বীকার কর, তাহা হইলে ইহাই হইল personality-র (ব্যক্তিত্বের) মহিমা।

জগতে সবাই স্বাধীন হইতে চায়। Lordship-এর প্রলোভন কাহার নাই? কিন্তু এই নায়ক শক্তি কোথা হইতে আসিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা তো এই স্থূল দৃষ্টি দ্বারা জানা অসম্ভব। আর কিছুই না, যেই নাকি অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, সেই সে শক্তির মূল রহস্য অবগত হইতে পারিয়াছে; আর বাহিরে সকলের সঙ্গে এক থাকিয়াও, অন্তরের শক্তির সন্ধান পাওয়ার দরুণ সকলের মাঝ হইতেই আপন মহিমায় সে উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। কাজেই বাহিরের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়াও মানুষ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে।

মানুষ প্রকৃতির দাস নয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিলেও তাহার কল্যাণ হয় না। "কালেনাত্মনি বিন্দতি" ইহা জানিয়াও মানুষ আত্মশক্তির বলেই আত্মমুক্তির পথ খুঁজিয়া লয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, অলক্ষ্যে প্রকৃতিও সাহায্য করিতেছে যথেষ্ট।

ভাবিও না, তোমার জীবন শুধু তোমার একলারই। অনেকেই তোমার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে; তোমার অবসাদে, শ্রান্তিতে তাহাদেরও মন ভাঙ্গিয়া যায়। আবার তুমি যখন আনন্দে আবেগে উৎফুল্ল হইয়া উঠ, তখন তাহাদের মাঝেও আনন্দকলরব শুনিতে পাই। দুঃখ জগতে অসংখ্যই রহিয়াছে, তুমি যেন আর তাহার সংখ্যা না বাড়াও। তোমার আসল কাজই হইল আনন্দে থাকা আর কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়া। কাজেই একসঙ্গে তোমাকে সাধক, এবং কর্ম্মী সাজিতে হইবে। অদৃশ্যভাবে চিন্তার প্রভাব দ্বারা যাঁহারা জগতের কল্যাণসাধন করিতেছেন তাঁহারা তেমনি অদৃশ্য আদর্শ, কিন্তু দৃষ্ট-জগতে সাধনা এবং কর্ম্মের সমন্বয় যাঁহাদের জীবনে দেখিতে পাইব—তাঁহারাই হইবেন জীবনের মুখ্য আদর্শ।

অভ্যাসের উপকারিতা

—*—

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই যদি চিত্ত ব্যাপৃত থাকে, তাহলে উচ্চ-চিন্তার অবকাশ হবে কোন্ সময়? তাই বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব মিটাবার দরুণ অভ্যাস দ্বারা এমন শক্তি অর্জ্জন করতে হয়, যাতে তার দরুণ আর বিশেষ করে মাথা ঘামাতে না হয়। আমরা লক্ষ্য করি না বলে, তা না হলে সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের যত সময় কেটে যায়, সে সব অমূল্য সময় একত্রিত করলে বেশ বোঝা যায় যে, এই সময়টুকু প্রশান্ত চিত্ত নিয়ে কোন উচ্চ-চিন্তায় মনটাকে নিয়োজিত করতে পারলে জীবনের কত দিকে কত উন্নতি হয়ে যেত। জীবনের অর্দ্ধেক কাল তো ঘুমে ঘুমেই কাটে, আর

বাকী অর্দ্ধেকের যে কতদিক দিয়ে কত অপব্যয় হয়, তার তো সীমা-পরিসীমাই নাই। এসব কারণেই অনেকে বলে থাকে, "মশাই, ধর্ম্মকর্ম্ম যে করব, সে সময় কোথা ?" বাস্তবিক তাদের কথাটা একদিকে সত্য বটে ; কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মাঝেও যদি মহৎ প্রচেষ্টা নিয়ে জীবনকে কি করে উন্নতির পথে পরিচালনা করা যায় সে চিন্তা নিয়ে তারা একটু আত্মস্থ হতে পারত, তাহলে বোধ হয় এর মাঝ থেকেও একটা উপায় আবিষ্কৃত হত। অভ্যাসের দ্বারা সব কাজই সহজ এবং অনায়াস হয়ে আসে। দৈনন্দিন জীবনের ভিতর কাজ-কর্ম্মকে অভ্যাসের দ্বারা সহজ সরল করে নিতে পার্‌লে, কর্ম্মের ভিতর দিয়েই উচ্চ-চিন্তার অবকাশ মিলে! তখন একদিকে কাজও চলে, আবার অন্যদিকে মনের মাঝে একটা আধ্যাত্মিক আনন্দানুভূতির অণুরণন চল্‌তে থাকে। ভাবে কর্ম্মে তখন অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়। আর এই সামঞ্জস্য আনাটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। দৈনন্দিন জীবনের গতিবিধির প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য রেখে চল্‌তে পার্‌লেই সহজেই সে শক্তি আয়ত্ত হয়ে পড়ে।

William James তাঁর "Talks to teachers" বইখানার একজায়গায় বলেছেন—The more of the details of our daily life we can hand over to the effortless custody of automatism, the more our higher powers of mind will be set free for their own proper look."

বাস্তবিকই মনের অসাধারণ শক্তি রয়েছে, তাকে যে দিকে লাগানো যায় সেই দিকের কাজই ওস্থল করে আন্‌তে পারা যায়। মনকে আমরাই খুঁটি-নাটী বিষয়ের জঞ্জালে ফেলে উত্যক্ত করে তুলি, কিন্তু তাকে এই বন্ধনদশা থেকে মাঝে মাঝে মুক্তি দিতে পার্‌লে, এই মন দ্বারাই ব্রহ্ম অনুসন্ধানও চলে। এই মনের শক্তির পরিধির ইয়ত্তা নাই। তার দরুণই দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম্মগুলিকে বেশ গুছিয়ে নিতে পার্‌লে—মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনের দিকেও এই মন নিয়েই বেশ অগ্রসর হতে পারে।

কাজ-কর্ম্মকে mechanical কর্‌তে হলেই, চাই অভ্যাসের সাধনা। প্রথম প্রথম মনকে মুক্তি দেওয়া কঠিন, তাই কর্ম্মের সঙ্গে প্রথমতঃ মনকে যুক্ত রাখ্‌তেই হয়। আস্তে আস্তে অভ্যাসের দ্বারা মনকে আত্মকেন্দ্রে গুটিয়ে আনতে হয়। তারপর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চল্‌বেই। একটু ইসারা পেলেই ইন্দ্রিয় তখন যার যার কাজে লেগে যাবে। তখন আর প্রভুকে অর্থাৎ মনকে সকলের সঙ্গে থেকে থেকে কাজকর্ম্ম করাতে হবে না। মনের অনুপস্থিতেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাজ বেশ শৃঙ্খলার সহিতই চল্‌তে থাক্‌বে। সমস্ত জগতই এই ভাবে চলছে। স্রষ্টার মন আত্মকেন্দ্রেই সংযুক্ত, তবু কিন্তু বহির্জ্জগৎ বেশ শৃঙ্খলার সহিতই চলে আস্‌ছে।

মনটাকে রাখতে হবে আত্মারই হেপাজতে—অবশ্য বাইরের কাজকর্ম্ম বন্ধ হয়ে যাবে না তা বলে। অনেকে কিন্তু এজায়গায়ই এসে বড় মুস্কিলে পড়েন। তাঁরা বলে থাকেন, মন যদি সর্ব্বদা আত্মানন্দেই বিভোর হয়ে থাকে, তাহলে এই বহির্জগতের কাজ-কর্ম্ম চলবে কেমন করে? বহির্জগতের কাজ বন্ধ হবে কেন ? তা তো পূর্ব্বের মতই চলতে থাকবে। বরঞ্চ কাজ তখন আরও অনায়াস হয়ে যাবে।

বাইরের ইন্দ্রিয়কেও একটা কাজে নিযুক্ত করতে হয়, তা না হলে তাদের ফাঁক দিলে, পরে তারাই আবার উপদ্রব আরম্ভ করে বেশী। অনেক সময় উচ্চ-চিন্তা করব বলে, আমরা বাহিরের কাজকর্ম্ম একেবারে ছাড়ান দিয়ে বস্‌তে চাই। এ কিন্তু ঠিক নয়। বরঞ্চ এরূপ কর্ম্মত্যাগে মন শান্ত না হয়ে আরও চঞ্চল হয়ে উঠে। কেননা বাইরের ইন্দ্রিয়ই তখন বিদ্রোহ আরম্ভ করে দেয়। তাই কাজকর্ম্ম একেবারে ছেড়ে দিয়ে উচ্চ-চিন্তা করব এরূপ ধারণা করে চলাও ঠিক নয়। বরঞ্চ কাজকর্ম্মকে অভ্যাস

দ্বারা আয়ত্ত করে ফেললেই, তখন আর মানসিক উচ্চ-চিন্তায় কোন ব্যাঘাত এসে পড়্তে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলোকে বেকার অবস্থায় রাখ্লেই তারা অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট করবে না। একটা না একটা কাজ দিয়ে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্তেই হয়। বিজ্ঞতার অভিমানে আমরা অনেক সময় ইন্দ্রিয়গুলোর উপর অযথা অত্যাচার এবং অবজ্ঞা করে চলি বলেই, ইন্দ্রিয়গুলোও এসে অনধিকারপ্রবেশ করে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এসে তারা উপদ্রব সুরু করে দেয়। তা না হলে উচ্চ চিন্তা করতে বসলে বাইরের ইন্দ্রিয় এসে উপদ্রব করবে কেন?

মনকে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা থেকে রেহাই না দিলে এই মন দ্বারা কিছুই লাভ করার আশা নাই। অথচ এই মন দ্বারাই কিন্তু মানুষ সব লাভ করতে সমর্থ হয়। প্রাণী মাত্রেই কর্ম্ম ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে পারে না। কিন্তু এই কর্ম্ম করবার প্রণালীর মাঝেই সব রহস্য নিহিত। কেউ কেউ কর্ম্ম করেও নির্লিপ্ত, আবার কেউ কেউ কর্ম্ম না করেও কর্ম্মেরই চিন্তায় সর্ব্বদা চঞ্চল। যার শক্তি বেশী সে অনায়াসেই কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট থেকে মনকে বেশ সাফা করে তুলে নিতে পারে; আবার কারও কারও মন কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটেই ঘাব্ড়িয়ে পড়ে। তবে কিনা অভ্যাসের দ্বারা একটু ইচ্ছা করলেই সবাই মনকে মুক্ত রাখবার সঙ্কেত অনায়াসে আয়ত্ত করে নিতে পারে। তাহলে কর্ম্ম থেকে মুক্তি বললে এই বুঝতে হবে যে, কর্ম্ম করেও মনটা ঠিক আত্মকেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সুতরাং কর্মটা যদি effortless এবং automatic না হয়, তাহলে কিছুতেই কর্ম্ম করার সঙ্গে সঙ্গে মনকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায় না। অর্থাৎ কর্ম্ম করার সঙ্গে সঙ্গে মনকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখ্বার অভ্যাস করলেই কর্ম্ম আপনা হতেই effortless এবং automatic হয়ে আসে।

অভ্যাসের দ্বারা কর্ম্মকে এরূপ সহজ এবং অনায়াস করতে পারা যায় বলেই, কর্ম্ম ত্যাগ না করেও বেশ আপন মনে চলাটা সম্ভবপর হয়। কর্ম্ম-যোগী বলতে এই বুঝি যে তারা একদিকে কর্ম্মও করেন, আবার অন্যদিকে যোগও করেন। জীবনে এই সামঞ্জস্যটা আনতে পার্লেই বোধ হয় কোন দিকে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। এক সঙ্গে কর্ম্ম এবং যোগ করার আদর্শের চেয়ে বড় আদর্শ আর কি হতে পারে?

সংসার ছেড়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না, যদি ঋষিদের মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করতে সক্ষম হওয়া যায়। আর ঋষিরা যে এত কৃচ্ছ্র সাধন করতেন, তার মূল লক্ষ্যই ছিল দৈনন্দিন জীবনের মাঝেও ভাবে কর্ম্মে বেশ একটা সামঞ্জস্য আনয়ন করা। আর এটা একেবারে খাঁটী কথা যারা আত্মানুসন্ধিৎসু নয়, বাইরের কাজকর্ম্মে তাদের মন বিগ্ড়িয়ে যাবেই যাবে। কর্ম্মের সংস্কারকে মন থেকে মুছে ফেল্তে হলে কম শক্তির প্রয়োজন হয় না। তারপর কর্ম্মকে অনায়াস করতে হলেও কি দু'এক দিনের সাধনায় কিছু হয়?

এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করে নিতে হবে, যা নাকি আত্মসাক্ষাৎকারের পক্ষেও অনুকূল। যেমন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠা, স্নান করে এসে পবিত্র মনে একটু ধ্যান করা ইত্যাদি। তার পর দিনের প্রথমেই কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেও মনে মনে বেশ একটা খস্ড়া তৈরী করে নিতে হয়—যে এই এই কাজ কর্বই। একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামলে, প্রাণে জোরও আসে আর তাতে কার্য্যও সিদ্ধি হয়। আধ্যাত্মিক কিম্বা বৈষয়িক কোন দিক দিয়েই Lethergyর ভাবটা আসলেই দিতে নাই। দিলেই চিত্ত ক্রমশঃ তমোগ্রস্ত হতে থাকে।

সু-অভ্যাসগুলি জীবনের অতি শৈশব কাল থেকেই আয়ত্ত করে নেবার চেষ্টা করতে হয়। যেন তার দরুণ পরে আর কোন বেগ পেতে না হয়। আর অভ্যাসগুলো আয়ত্ত হয়ে গেলে—তখন এই মন প্রাণ নিয়েই আধ্যাত্মিক পথেও দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়।

ভারতবর্ষ

—(*)—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে, এবং শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে হিন্দুর মাঝে এমন কতকগুলি ভ্রান্ত সংস্কারের সৃষ্টি করেছে যে দিন দিন তারা কেবল অজ্ঞানান্ধকারেই তলিয়ে যাচ্ছে, আর এই বাহ্যিক কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই তারা বেশ মজে আছে। ধর্ম্মের গুরুত্বের দিক দিয়ে, ভারতের বহুব্যাপক আচারের মাঝে গোজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানো একটা বিশেষ দিক। হিন্দুদের মাঝে কোন কোন জাতি হয়ত বিভিন্ন মতাবলম্বী, কিন্তু গরুকে শ্রদ্ধা করে সবাই। হিন্দুদের কাছে গরুর দেহ পরম পবিত্র এবং পূজ্য, গরুকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে সবাই তুল্য আকাঙ্ক্ষী। এই বিষয় নিয়ে কোন ব্যতিক্রম এবং নাড়াচাড়া করতে যাও, দেখ্‌বে হিন্দুরা কেমন উত্তেজিত রাগান্বিত হয়ে উঠে; এ নিয়ে কোন অবহেলা বা অবজ্ঞা হিন্দুদের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত দেয়। গরুকে উপলক্ষ করেই কত বিবাদ-বিসম্বাদ, মারামারি-কাটাকাটি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। গো-সম্বন্ধে কোন একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করেই, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এত বড় "সিপাই-বিদ্রোহ" হয়ে গেল। ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান বিজয় হিন্দুদের এই ভ্রান্ত দুর্ব্বল ধর্ম্মবিশ্বাসের দরুণই সম্ভবপর হয়েছিল। প্রথমবার ভারতকে আক্রমণ করতে এসে মহম্মদ ঘোরী, সাহসী নির্ভীক হিন্দু রাজপুতদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু আবার তিনি ফিরে এসে ভারতকে আক্রমণ করেন, আর এবার আগ থেকেই তিনি হিন্দুদের খাম-খেয়ালী ভ্রান্ত-মূলক ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়ে এসেছিলেন। এসব ফিকির ফন্দি জানা ছিল বলেই তিনি হিন্দুদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কথিত আছে, তিনি নাকি সারি সারি গরু সাজিয়ে সৈন্যদের চারদিক ঘিরেছিলেন। বাঃ, সৈন্যরক্ষার্থ কি অদ্ভুত দুর্গ! আর এর দরুণই হিন্দুরা সৈন্যদের আক্রমণ করতে পারল না! কেননা, তাহলে যে গো-বধ হবে। অনুকম্পাপরায়ণ হিন্দু গরুকে বাঁচাল বটে, কিন্তু দেশকে হারাল। তারপর শত শত বৎসর ধরে এমন কি আজ পর্য্যন্তও নির্দয় বিজেতাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ গরুর প্রাণ বধ হচ্ছে শুধু উদর পূর্ত্তির দরুণ। হয়ত এ ঘটনাটা হুবহু সত্য না-ও হতে পারে, কিন্তু ঠিক এই ধরণের ব্যাপার আজ পর্য্যন্তও ঘটে আস্‌ছে, এতে ভুল নেই। ধর্ম্মের নামে জাতীয় কুসংস্কার এমন ভাবে দিব্য চলে আস্‌ছে ভারতে।

এখন এর বিরুদ্ধ মত শাস্ত্র থেকেই উদ্ধার করে দেখাচ্ছি। হিন্দুদের পরম পবিত্র গ্রন্থ যে বেদ, তার মাঝেই যজ্ঞে গো-বধের বিধি রয়েছে—তাতে তো গো-মাংস ভক্ষণকে নিষেধ করা হয়নি। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের, চতুর্থ ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ শ্লোক যথাঃ—"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা ॥৪২৫॥১৮॥

—"যে লোক ইচ্ছা করে যে আমার পুত্র পণ্ডিত, দেশবিখ্যাত, সভাসদ্ এবং শ্রোতৃপ্রিয় বাগ্মী হউক,

এবং সে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করুক, সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক, তাহা হইলে সে ও তাহার পত্নী মাংসমিশ্রিত অন্ন পাক করিয়া ঘৃতযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে; যৌবনাবস্থ কিম্বা ততোধিকবয়স্ক ষাঁড়ের মাংস দ্বারা মিশ্রিত ওদন ভক্ষণ করিলে ঐরূপ পুত্র উৎপাদনে সমর্থ হওয়া যায়।”

হায়, কোথায় গেল সেই বেদান্তের বজ্রদৃঢ় নির্ভীক বাদ —একদিন শ্রীকৃষ্ণ যা প্রচার করে গিয়েছিলেন। বেদান্তের মাঝে তো কোন বন্ধন নাই, ভীরুতা নাই—সকল রকম বন্ধন থেকে মুক্ত করে এই বেদান্ত। বাপ-খুড়া, ঠাকুরদাদা, আত্মীয়স্বজন কারও বাঁধনে বাঁধা পড়ে না বৈদান্তিক। বেদান্তধর্ম্ম হচ্ছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—গরুকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা, গাছ-পালাকে পূজা করা এ সব সামান্য সামান্য বাহিক অনুষ্ঠানে নিজকে আবদ্ধ রাখাই বেদান্তের উদ্দেশ্য নয়। বেদান্ত আমাদের সকল রকম ভণ্ডামী থেকে মুক্ত করে।

ঘরে ঘরে এখন এই স্বাস্থ্যপূর্ণ, নির্ভীক বেদান্ত-বাদেরই প্রচার হওয়া প্রয়োজন। বেদান্ত মানুষকে অক্ষয়, অবিনশ্বর আত্মোপলব্ধিতে আরও দৃঢ় করে। এমন কি গ্রহ, নক্ষত্র, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও বৈদান্তিক অচল-অটল মহিমা থেকে এক মুহূর্ত্তের দরুণও বিচলিত হন না।

বুদ্ধি প্রতিভায়, দৈহিক শক্তিতে, এবং আধ্যাত্মিকতায় সব দিকেই ভারতবাসী সবল। কিন্তু তা হলেও তোমরা হয়ত উদক-বিজ্ঞানের সমষ্টি চাপ আর গড়ে চাপ পড়ার কথা জান। যে কোনও বস্তুর উপর সমষ্টি চাপের পরিমাণ অনন্ত হতে পারে, অথচ কাটাকুটি করে গড়ে তার ওপর মোটেই কোনও চাপ না পড়তেও পারে। এই ভারতবর্ষেও কি কম শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে? কিন্তু গড়ে গিয়ে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না কেননা সব শক্তিই পরস্পরবিরোধী—কারও সঙ্গে কারও মিল নাই, সামঞ্জস্য নাই।

ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কার, বাহ্যিক কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ভাব-ভক্তি দেখাবার প্রবল চেষ্টা, আর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকেই একমাত্র সত্য বলে আঁকড়িয়ে ধরে পড়ে থাকা—এসবের দরুণই ভারতে এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়েছে। আর ভারতের অধঃপতন হয়েছে বলতে গেলে এসব কুসংস্কার এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির দরুণই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিতেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারছে না! বাইরে ভেদ থাকলেও প্রাণে প্রাণে যদি একটা ঐক্যবোধ থাকত, তাহলে স্বভাবতঃই জাতির প্রাণ নবশক্তির স্পন্দনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। আর এই ঐক্য-বোধেই জাতির মাঝে মহাশক্তির সঞ্চার হয়। জন-সাধারণের প্রাণে এই বাস্তব বেদান্তের ভাব সঞ্চারিত হচ্ছে না বলেই, ভারতে আজ নিজেদের পরস্পরের মাঝেই এত দলাদলি। আর যে জায়গায় একটু মেলামেশা দেখা যাচ্ছে, তাও জোরজুলুম করে—মোট কথা স্বাভাবিক মিলন নয়।

ভারতের অনর্থের মূলই হল, এই জাতীয় বিদ্বেষ। হিন্দু-মুসলমানে আজ এত বিরোধ কেন?—না তার মূলে রয়েছে জাতীয় বিদ্বেষ এবং প্রতিহিংসা। এমন কি হিন্দুদের নিজেদের মাঝেও, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে এই লড়াই চলছে। আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যে কোন দিক দিয়েই হোক না কেন, ভারতকে যদি পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হয়, তাহলে এমন শিক্ষার প্রয়োজন, যাতে মানসিক উৎকর্ষ হয় এবং বাইরের ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, আলসেমি কুঁড়েমি যত কিছু ভেদমূলক গলদ রয়েছে, সব নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়।

ভারতের যদি উন্নতি বিধান করতে হয়, আবার যদি তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হয়, ইংলণ্ড আমেরিকা এমন কি সমস্ত জগতের সঙ্গে যদি তার

যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে হয়, তাহলে আর কিছু না—এই সমস্ত কুসংস্কারকেই প্রথমে ঝেঁটিয়ে নির্ম্মূল করতে হবে দেশ থেকে।

রোগীকে ভাল করি আমরা ঔষধ দিয়ে, কিন্তু সেই ঔষধ অন্তঃপ্রকৃতিকেই সাহায্য করে—প্রকৃতিই রোগ আরোগ্য করে—ঔষধ কেবল একটা বাহিরের সাহায্য মাত্র। আসলে প্রকৃতিই রোগ আরোগ্যের নিদান। তেমনি ভারতকে যদি তোমরা নব-জীবন দান করতে চাও, তাহলে এমন কিছুর প্রয়োজন যাতে অন্তঃপ্রকৃতি বেশ সুস্থ-সবল এবং সতেজ হয়।

এ সমস্তই হল ভারতের দুরারোগ্য ব্যাধি—যা তোমাদের এতক্ষণ বলে আস্‌লাম। এখন তার কোন প্রতিকারেরও উপায় আছে কিনা তাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

জগতের প্রায় সবারই ধারণা, শাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক নীতিবাগীশরাও সমর্থন করেন যে বিধি-নিয়ম এবং আদেশ-উপদেশ দ্বারাই এ সবের প্রতিকার হবে। এ কিন্তু কখনো সম্ভবপর নয়। আদেশ-উপদেশ, কৃত্রিম আচার-নিয়ম, এবং অস্বাভাবিক নীতি দ্বারা কক্ষনো এর কোন প্রতিকার হবে না। মনে রেখো, তোমার এটা করা উচিত এবং ওটা করা উচিত নয়, এ ধরণের বিধি-নিষেধ দ্বারা কোন খাঁটী পরিবর্ত্তন হয় না। এ সব বিধি-নিষেধ দ্বারাই যদি সব মিটে যেত, তাহলে এই ধরা কবেই স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়ে যেত—এই পৃথিবী আর পৃথিবী থাক্‌ত না, অমরাবতী হয়ে যেত। এ সব কোন কিছু দিয়েই সমস্যার সমাধান হবে না। শাস্তি দাও, নির্য্যাতন কর, জেলে আটকিয়ে রাখ, যা খুসী তাই কর না কেন, কিন্তু এ সব কোন কিছু দ্বারাই এর প্রতিকার হবে না। আজ না হয় কাল একদিন না একদিন সবারই ভুল ভাঙ্গবে, তখন তারা বুঝ্‌বে, মানুষকে বিধি নিষেধের সঙ্কীর্ণ কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা কত বড় উৎকট ভ্রম। ভয় দেখিয়ে এবং শাস্তি দিয়ে পাপ থেকে বিরত করা যায় না। বাস্তবিকই যদি এর কোন প্রতিকার করতে চাও, তাহলে ক্রমশঃ জ্ঞান-চর্চ্চার বিস্তার করতে হবে, আর সে জ্ঞান হওয়া চাই—জ্বলন্ত এবং জীবন্ত, তাই বিশেষ প্রয়োজন এখন।

লোকে বলে, এ সব ধার-করা সূক্ষ্ম জল্পনা-কল্পনা নিয়ে বক্‌বক্ করো না। কেবল মাত্র জল্পনা-কল্পনা দিয়ে আর আমাদের কি হবে?

কিন্তু হায় হতভাগা মানব! এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিসে?—আর কিছু না, কেবলমাত্র ভাব, ভাব, ভাব দ্বারা! তোমার অন্তরের জ্যোতিঃ এবং অন্তরের জ্ঞানই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। মানুষকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার চেয়ে, যে দোষী, তাকেও সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোক দেখাও। "জ্ঞানই ধর্ম্ম"—এ কথাটা যে নিছক্ সত্য, তার একটা প্রমাণ দেখাচ্ছি। ধর, এখানে একটী ছেলে বসে আছে। ছেলেটী আগুনে হাত দিয়ে হাতটী পুড়ে ফেলল। কেন অমন হল? কেননা আগুনে হাত দিলে যে হাত পুড়ে, এ সম্বন্ধে ছেলের কোন জ্ঞান নাই। আগুনে হাত দিলে যে হাত পুড়ে এ কথা ছেলেকে জানিয়ে দাও, দেখবে কখনো আর সে ছেলে আগুনে হাত দিতে যাবে না। জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তোল, মানুষকে খাঁটী আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে তোল—এই হল প্রতিকারের উপায়। এই পন্থাতে চললেও খুব আস্তে আস্তে উন্নতি হবে বটে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ ছাড়া আর অন্য কোন স্থায়ী প্রতিকারের উপায়ই নাই।

(ক্রমশঃ)

উপাসনা

—*—

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ভাষ্যভূমিকাতে উপাসনা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বেশ সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। উপাসনা কি ?—

"উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানকরণম্—তদ্বিলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরিতম্ ইতি।"

—শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত যে কোন একটী আলম্বন অবলম্বন করিয়া, তাহাতেই এমন ভাবে চিত্তবৃত্তির একাকার প্রবাহ সমুৎপাদন করিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে আর অন্য কোন বিষয়ের সংস্কার উৎপন্ন হইয়া কোন ব্যবধানই জন্মাইতে না পারে।"

ধ্যান করিতে বসিয়া যদি আলম্বনীয় বিষয় ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাই জাগিতে না পারে, তাহা হইলে ইষ্ট বিষয় যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া জ্বলন্ত ভাবে সাধকের সম্মুখে প্রতিভাত হইবে তাহাতে তো আর বিন্দুমাত্রই সন্দেহ নাই। ধ্যানতন্ময়তা দ্বারাই রূপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই রূপের আলম্বন আমাদেরই বুকে। ইচ্ছা করিলেই আমরা তন্ময়তা দ্বারা হৃদি-সন্নিবিষ্ট অরূপী ভগবানকে, রূপ-ঘন বিগ্রহ-মূর্ত্তিতে চোখের সম্মুখে দেখিতে পারি। কিন্তু তাহার একমাত্র উপায়ই হইল—"সমানচিত্তবৃত্তি-সন্তানকরণম্।"

সমান চিত্তবৃত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্য প্রথমে একটী যোদ্ধৃভাব থাকা চাই; অর্থাৎ বাহিরের বিক্ষেপকে প্রথমে জোর করিয়াই তাড়াইতে হয়, তাহার পর চিত্ত নিরুপদ্রব হইলে ধ্যানে চিত্ত সহজেই তন্ময় হইয়া আসে। আর ঠিক চিত্ত যখন ইষ্টের ধ্যানরসে একেবারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া যায়, তখনই ঠিক খাঁটী রূপ-দর্শন হয়। চক্ষুকে মুদ্রিত করিয়া প্রথমে ইষ্টের চিন্তায় বিভোর হইয়া যাইতে হয়, তারপর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া যে রূপ দর্শন হয়, তাহার দর্শনেই শরীর-মন-প্রাণ সব জুড়াইয়া যায়। তন্ময় হইয়া যাইতে পারিলে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থাকে না, তখন সর্ব্ব অঙ্গে ইষ্টের অনুভব সঞ্চারিত হইয়া যায়। সর্ব্ব শরীরে যখন এই অনুভব সঞ্চারিত হয়, তখনই দিব্যোন্মাদ অবস্থা আসে। শ্রীরাধিকার এই অবস্থা মুহুর্মুহু হইত! প্রথমে একটী স্থূল আলম্বনকে স্বীকার করিয়া তাহার পর তাহারই ভাবে ক্রমশঃ সূক্ষ্মানুভূতিতে তন্ময় হইয়া যাওয়াকেই পতঞ্জলি নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি বলিয়াছেন। তখন আর ধ্যানের বিষয় বলিয়া আলাদা শব্দ কিম্বা অর্থের স্মৃতি থাকে না। "স্মৃতি-পরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা" —কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুই যখন চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে, তখন নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি হয়।

শাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" "জানা" মানেই হইল "হওয়া।" দ্বৈত ভাব শেষ পর্য্যন্ত থাকে না।

দার্শনিকপ্রবর (Bergson) বার্গসোঁও বলিয়াছেন যে, "The best way to understand a thing is not to look at it from without going round and round but to get right into the heart of the thing by a movement of sympathy or of what he calls intuition, and then just to open an eye and see."—যে কোন বিষয়েরই হউক না কেন, যথার্থ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলেই তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে। বাহির হইতে পাটোয়ারী বুদ্ধি দ্বারা কোন

বিষয়েরই যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। Thing-in-itself (=যে কোন বিষয়েরই যথার্থ স্বরূপ) জানা এই জন্যই এত দুরূহ।

আমাদের প্রত্যেকটী চিন্তা-ভাবনারই এক একটী রূপ আছে। চিন্তায় যখন আত্মভোলা হইয়া যাওয়া যায়, তখন তাহার দৈবীরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। কোন একটা ভাবেই আমরা স্থির থাকিতে পারি না বলিয়াই—চিন্তারও কোন একটা পরম্পরা বা তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু মনকে একটী আলম্বনে স্থির করিতে পারিলেই ক্রমশঃ চিত্তে সব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

যাহাকেই জানিতে চাই, তাহাতেই চিত্ত লয় করিয়া দিতে হইবে। নিরন্তর ধ্যেয় বিষয়েরই ভাব-স্পন্দন দ্বারা যখন চিত্ত অধিকৃত থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে ধ্যান ঠিক ঠিক ভাবে হইতেছে। অন্য কোন ভাবের স্পন্দন হইলেই ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। প্রত্যেক জিনিষের মূল তত্ত্ব অবগত হইতে হইলেই তদ্বিষয়ে সমাধি অবলম্বন করিতে হইবে। যোগীরা যে নির্জ্জন গিরি গুহায় যোগ সাধনা করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিরুদ্ধ চিন্তার স্পন্দন আসিয়া তাহাদের সাধনায় বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। এক ভাব—এক চিন্তা লইয়া তাঁহারা সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহার পর তাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

তারপর মন যখন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম চিন্তার দিকে অগ্রসর হয়, তখন মনের অনুভবশক্তিও অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। একটুখানি বিরুদ্ধ চিন্তা বা বিরুদ্ধ ভাবই তখন অত্যন্ত অহিত সাধন করে। এই জন্যই যোগীরা যোগ সাধনের সময় এত সাবধানে থাকেন।

যে রূপ দেখিবার দরুণ মানুষ এত পাগল, সেই রূপের খনি যে মানুষের অন্তরেই বিরাজিত, তাহা তাহারা জানিয়াও জানে না? রূপ দর্শনাভিলাষে মানুষ এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, রূপটাই হয় তখন বড়, আর সেই রূপকে ফুটাইয়া তুলিবার মূলে যে স্থির চিত্তেরই অসাধারণ প্রভাব রহিয়াছে, তাহা একটুও ভাবিয়া দেখে না?

মন চঞ্চল বটে, কিন্তু সাধনা দ্বারা এই মনকেই নিজের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে। চঞ্চল মানসিক বৃত্তির উপর আধিপত্য না জন্মিলে, ইচ্ছানুযায়ী ধ্যানে চিত্তকে নিবিষ্ট করিতে পারা যায় না। আর ইচ্ছানুযায়ী যদি মনকে স্থির করিতেই পারা না গেল, তাহা হইলে আর কিই বা হইল।

বহুর উপাসনা হয় না, কেননা "সমানচিত্তবৃত্তি-সন্তানকরণ" এক বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই হয়। চিত্তে বহুভাব থাকিলে একাকার প্রবাহ চলিতেই পারে না। কাজেই উপাসনা করিতে হইবে একের। ইহাতেই চিত্ত স্থির হইবে, ধ্যানতন্ময়তা আসিবে।

আলম্বন হইল গৌণ. মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে চিত্তকে স্থির করিবার সাধনা করা। অবশ্য চিত্ত স্থিরের পক্ষে, একটী আলম্বনের প্রতি নিষ্ঠাও অনেক সাহায্য করে বটে, কিন্তু আলম্বনের মূলে শুদ্ধ চিত্তের স্থিতিপ্রবাহ না থাকিলে, কোন ফল লাভেরই আশা নাই।

উপাসনা কালে এক বিষয় নিয়াই শান্ত স্তব্ধ হইয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলেই ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু এক বিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট রাখা বহু সাধনসাপেক্ষ।

আদর্শের বাস্তবতা

— * —

আদর্শ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বল্‌তে পারেন, কিন্তু সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার প্রণালী মাথায় খেলে না, সেই জন্যই idealismএর পরে constuctive philosophyর প্রয়োজন হয়। শঙ্করাচার্য্যের idealism-র মাঝে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্ক যুক্তি এবং আলোচনা রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর প্রচারিত নির্ব্বিশেষবাদ হতে জাতির মাঝে তেমন একটা প্রাণের সঞ্চার হয়নি। যাঁরা প্রতিভাশালী, তাঁরাই মাত্র শঙ্করাচার্য্যের philosophyর মাঝে একটা intellectual আনন্দ উপভোগ করেন। প্রায় ক্ষেত্রেই শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত নির্ব্বিশেষ-বাদে মানুষের প্রাণে একটা শুষ্ক নীরস ভাবই এনে দিয়েছে। শঙ্করাচার্য্যের দর্শন খুব উঁচু দরের, কাজেই একমাত্র প্রতিভাশালী ছাড়া সাধারণের তা হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন। Kantকে যেমন একদিক দিয়ে Julias Cæsarএর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তেমনি শঙ্করাচার্য্যও ছিলেন ধর্ম্মজগতের একজন দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ। তর্ক-যুক্তি দ্বারা সকলকে পরাস্ত করে তারপর তিনি আপন মত প্রতিষ্ঠা করলেন। শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্ম প্রচারটা বুদ্ধ কিম্বা গৌরাঙ্গদেবের মত সহজ এবং অনায়াস ভাবে হয়নি। আর বিশেষতঃ His work was critical rather than constructive. শঙ্করাচার্য্যের idealismএ শেষে জাতিটাকে কেবল তর্কে যুক্তিতে সব দিক্ দিয়ে বচনবাগীশ করে তুলল, অথচ কাজের নামে ঠন্‌ঠন্। তারপর এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব সবাই বুঝ্‌তে না পেরে শেষে অন্ধকারে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল। কাজেই আদর্শ খুব উঁচু দরের কিম্বা abstract থাকলেই কোন কিছু আসে যায় না; আসল কথা হল সেই আদর্শকে জীবনে ফলিয়ে তুল্‌বার উপায় আবিষ্কার করতে হবে। এদিক দিয়ে বলতে গেলে Jamesএর Pragmatic view of truthএর মূল্য অনেক বেশী। অবশ্য highest truth অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় হতে পারে বটে, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে যেই যত একটা স্পষ্ট ধারণা কিম্বা ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন, তাঁর প্রচেষ্টাই যথার্থ প্রশংসার্হ। হয়ত কারও ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেল, কিন্তু তা বলে তাই যে চিন্তার limit তা তো নয়। কাজেই অপরের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিজের বুদ্ধি কিম্বা বিচারশক্তিকে জড় বানিয়ে বসে থাকার চেয়ে দুর্ব্বলতা কিম্বা নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই।

আদর্শের অভাব নাই আমাদের দেশে, শাস্ত্রে ভুরি ভুরি উপদেশ রয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের সে উপদেশ abstract—constructive philosophy তদনুপাতে অনেক কম। সবাই কেবল বলেন, সত্য বাক্য-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর, আর এই অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সবাই বেশ অন্ধকারেই তলিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কিন্তু এর মাঝেও যাঁরা আত্মশক্তিতে একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন, নির্ব্বিশেষ সত্যের যাচাইএ তাও নাকচ হয়ে যায়। অব্যক্তের প্রতি মানুষের অসাধারণ আকর্ষণ, তাই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগতের প্রতি মানুষের এত অবহেলা। কিন্তু এই জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ non-co-operation করে বাতাহারী হয়ে কয়জন থাকতে পারেন?

সত্য প্রয়োজনের ঊর্দ্ধেও, আবার প্রয়োজনের সঙ্গে সংমিশ্রিতও। উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই হল, "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং," কাজেই ব্রহ্ম জগৎ থেকে নিছক আলাদা কোন বস্তু নন। জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে ভাগবত সত্তা অনুপ্রবিষ্ট।

একজন আর একজনের হয়ে সত্যকে পাইয়ে দিতে পারে না, তবু যারা এরূপ সত্যলাভের ভরসায় নিশ্চিন্ত তারা বাস্তবিকই আজব প্রাণী বটে। প্রত্যেককেই আত্ম চেষ্টায়ই আত্মসাক্ষাৎকার করতে হয়, কাজেই প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত history of philosophy রয়েছে। সে সবকে যদি সূত্রে পরিণত করা যায়, তাহলে তার মাঝের ইতিহাস অনেক বাদ পড়ে। আমাদের শাস্ত্রেরও এই দশা। সূত্রের অভাব নাই বটে, কিন্তু যে সব সূত্রের সমষ্টি নিয়ে দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, সে সব দর্শন abstract—constructive নয়।

আধ্যাত্মিকতা বল্‌তে যদি কতকগুলো সূক্ষ্ম-চিন্তার জল্পনা কল্পনাকেই বুঝায়, আর সে সমস্ত বাদ-বিচার যদি দৈনন্দিন জীবনের কোন সার্থকতায় না লাগে, তাহলে সে আধ্যাত্মিকতা বনাম ভণ্ডামী দিয়ে কি লাভ? দর্শন-পুরাণে যদি জাতিকে সজীব কর্ম্মঠ এবং প্রাণবন্ত করে না তোলে, তাহলে তা কিসের দর্শন? দর্শন তো কাব্যের মত উপভোগের সামগ্রী নয়, জীবনের প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনায় তার সম্বন্ধ রয়েছে। দর্শন শুধু সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনারই আধার নয়, দর্শন মানুষের জীবন গঠনের উপাদান বিশেষ। কাজেই যে দর্শন constructive নয়, তা দিয়ে জীবনের বাস্তব সমস্যায় কি সমাধান হবে?

কাজেই জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে abstract philosophyর চেয়ে, constructive philosophy-রই প্রয়োজন বেশী। তাতে কোন দিক দিয়ে গলদ থাক্‌বার আশঙ্কা থাকে না। তা নাহলে নিছক ভাবুকতা করেও অনেকেই অনেকের মারাত্মক ভ্রম-প্রমাদকে অনায়াসে ঢেকে রাখ্‌তে পারে। আর সাধারণতঃ জাতীয় জীবনের অধঃপতনের সুরু হলেই চিন্তা-ভাবনারও মাঝে যথেষ্ট দুর্ব্বলতা এসে প্রবেশ করে। Max Muller, History of Ancient Sanskrit Literatureএ একজায়গায় যথার্থই বলেছেন যে—"But in times of national degradation the genius of great man turns away from the realities of life, and finds its only consolation in the search after truth in science and philosophy. Socrates, Plato and Aristotle arose when the Greek nation began to decline, while its immortal productions lived on, in the memory of other and free nations." আমাদের দশাও আজ তাই হয়েছে। আমাদেরই উপনিষদ, বেদ ইত্যাদি পড়ে অন্যান্য জাতি জীবন্ত প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, আর আমরা যেই—সেই। Emerson, Thoreau ভারতীয় দর্শনের চিন্তায় খুবই প্রভাবিত বটে, কিন্তু তাদের মুখ থেকে যে সব বজ্রবৎ বাণী বের হয়েছে, তাতে যে আমাদের চিত্তে যথেষ্ট সাড়া দেয়, তা তো অস্বীকার করবার কোন উপায় নাই। তাঁদের বাণীর মাঝে character-building force রয়েছে—তাঁদের philosophy constructive philosophy। তাঁরা শুধু বাগাড়ম্বর করেই বইয়ের পাতা পূর্ণ করেননি।

শুধু দার্শনিক বিচার দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার কোন সমাধান হয় না। আর যত সব অলৌকিকত্বের সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ এই দৈনন্দিন জীবনের প্রতি উপেক্ষা। ছোট বেলা থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে না, অথচ তার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়া চাইই চাই, কাজেই যে জিনিষ দৈনন্দিন সাধনা দ্বারাই লভ্য তাও তাদের কাছে অলৌকিক দুর্ল্লভ সামগ্রী হয়ে উঠে। এ সব দিক দিয়ে বুদ্ধদেবের পঞ্চশীল পালনে কত সাহায্য করে। জীবনকে শৈশব কাল থেকেই সংযমের পথে গঠন করে তুললে, অপরের কাছ থেকে আর এত উপদেশ নিতে হয় না—তার মাঝেই তখন আত্মা জেগে উঠে। অন্তরের সঞ্চিত বীর্য্যই তখন আত্মসাক্ষাৎকারের পথে বল প্রদান করে।

Mr. Bertrand Russel এক জায়গায়

বলেছেন—"Intellectually we are fine, but by action and mode of life, gross. The conflict is at the foundation of modern life. What is the remedey then? The cure will come only when intellectuals can find a career that embodies their creative impulses.

বুদ্ধিপ্রতিভার দিক দিয়ে উন্নত হলেই কেবল চলে না। জীবনের পক্ষে আরও প্রয়োজনীয় সমস্যা রয়েছে—সে সব ক্ষেত্রে বুদ্ধিপ্রতিভার বাস্তব নিদর্শন না পেলে (অর্থাৎ প্রয়োজনে যদি বুদ্ধিপ্রতিভা না খাটে) শুধু বুদ্ধিপ্রতিভার কোন সার্থকতা নাই। একটা nationকে গড়ে তুলতে হলে soul force এবং activity দুই-ই থাকা চাই; শুধু plan দ্বারা এবং abstract চিন্তা দ্বারা কোন কিছু হয় না!

এমনও কোন কোন মহাপুরুষের কথা শুনতে নাই, যাঁরা নাকি নিছক কল্যাণকামনা নিয়েই আত্মসমাহিত হয়ে আছেন। কিন্তু তাঁদের সে কল্যাণকামনা যদি অপরের মাঝে কল্যাণপ্রচেষ্টার উদ্ভব না করতে পারে তাহলে সে কল্যাণকামনার কি সার্থকতা?

পওহারী বাবার কথা বিবেকানন্দ শতমুখে প্রশংসা করেছেন—কিন্তু সেই আত্মসমাহিত মৌনী মহাপুরুষটীর কাছ থেকে বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রাণে অসীম বল সঞ্চার হয়—আর তিনি জগতের দরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে আরও বেশী করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। শক্তি আয়ত্ত হলে, তা নিজের জীবনে স্ফুরিত না হোক্, অপরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবেই তুলবে। কেননা, শক্তি তো কখনো নষ্ট হবার নয়।

দার্শনিক চিন্তার মাঝ থেকেই কতকগুলি চিন্তা বেছে নিতে হয়। দার্শনিক চিন্তার মাঝে সবই যে মূল্যবান্ এবং জীবন-গঠনোপযোগী তা নয়, অনেক বাজে তর্ক-বিতর্কও আছে। সে সব উপভোগ্য বটে, কিন্তু উপকারী নয়। শঙ্করাচার্য্যকে রীতিমত struggle করতে হয়েছিল তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করতে। কাজেই তাঁর দিগ্বিজয়ী দর্শনের মাঝে, আধুনিক কালের পক্ষে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও আছে, সে সব বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও বোধ হয় যথার্থ পাণ্ডিত্যের কোন ন্যূনতা ঘটবে না।

সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনার দিক্ দিয়ে আমাদের দর্শন তুরীয় লোকে পৌঁছেছে—এখন সে সব সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনাকে constructive philosophyতে পরিণত করাই হল আসল কাজ। আর এটা ঠিক যে—"When the battle for idealism had been fought and won, then comes the times for the deduction and organization which a constructive philosophy demands."

আমাদের দর্শন-পুরাণে যথেষ্ট মূল্যবান্ জিনিষ রয়েছে, কিন্তু অনেক অপ্রয়োজনীয় আলোচনার মাঝে পড়ে সে সব অনেক জায়গায় নিষ্প্রভও হয়ে আছে। কাজেই দর্শন-পুরাণের modification হলে কোন ক্ষতি হওয়ার কারণ নাই, বরঞ্চ অস্পষ্ট লক্ষ্য আমাদের কাছে আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।

আর কিছু না, এখন সাধকের প্রয়োজন, যারা জীবন দিয়ে শাস্ত্রীয় বচনগুলির সার্থকতা প্রমাণ করবে। বিচার দ্বারা আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নামলে বুঝা যায় কার্য্যসিদ্ধির পথে কত বাধা-বিঘ্ন! বচন দিয়ে সে সব বাধা-বিঘ্ন দূর করা যায় না, চাই প্রাণবন্ত সাধনা।

বুদ্ধির দিক্ দিয়ে, কিম্বা প্রতিভার দিক্ দিয়ে আর কোন উন্নতি না হলেও, যে সব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েই আছে তাদের মাঝ থেকে যে কোন একটি তত্ত্ব অবলম্বন করে প্রত্যেকেই যদি সাধন-নিরত হয়ে যায়, তাহলে ব্যষ্টি জীবন এবং সমষ্টি-জীবনে উভয়েরই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আধ্যাত্মিক

জগতে আমাদের যথেষ্ট অধিকার এবং যোগ্যতা আছে, কিন্তু বাস্তবিক জগতে এখনো আমরা অবুঝ শিশুর মত।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি মানব হিতার্থে অসংখ্য আদর্শ রেখে গিয়েছেন, কিন্তু সে আদর্শকে বাস্তব জীবনেও ফুটিয়ে তোলবার দরুণ আবার তাঁরই মত শক্তিসম্পন্ন সাধকের প্রয়োজন শঙ্করাচার্য্যের idealism আধ্যাত্মিক এবং সূক্ষ্ম বিচারের দিক দিয়ে চরম, তাতে মাত্র জাতির বুদ্ধির উৎকর্ষ হতে পারে. কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা আসে না।

ভাবুকতা জল্পনা কল্পনা, সূক্ষ্ম-বিচার শক্তি ইত্যাদি সবারই প্রয়োজন আছে আর একথা ঠিক জগতে যারা নাকি মহৎ কাজ করে গিয়েছেন, কল্পনার দিক দিয়ে তাঁদের অসীম শক্তি ছিল। কাজ করার আগে ভাবনা, চিন্তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু শুদ্ধ মাত্র ভাবুকতা দ্বারা কাজ হয় না। Excess of imaginationটা দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। তারা অনেক ক্ষেত্রে পাগল কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

জাতীয় উন্নতি অবনতির লক্ষণ সাহিত্যেই প্রকাশ পায়। কেননা সাহিত্য জাতীয় মনোভাবেরই দর্পণ মাত্র। ঋষিরাই যদি আমাদের জীবনের আদর্শ হয়, তাহলে বৈদিক সাহিত্য যে ঋগ্বেদ তার মাঝে ইহ জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও ঔদাসীন্য কিম্বা অবজ্ঞার ভাব নাই। তাঁরা যজ্ঞ করতেন, আর প্রার্থনা করতেন। কিন্তু সে প্রার্থনার মাঝেও কত প্রাণশক্তি। ঋগ্বেদের একটি সূক্তের মাঝেও তো ইহজীবন-বিমুখীনতার ভাব দেখা যায়না। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় একজায়গায় ঋষিদের প্রার্থনা আছে যে—"তাঁর প্রসাদে যেন আমরা শত বৎসর দেখতে পাই, যেন শত শরৎ জীবিত থাকি। যেন শত শরৎ শুনতে পাই! যেন শত শরৎ কথা বলতে পারি, যেন শত শরৎ অদীন ভাবে বর্ত্তমান থাকি।" কাজেই Maxmuller যে এক জায়গায় বলেছেন—"To the greek, existence is full of life and reality; To the Hindu it is a dream, an illusion. The Hindu enters this world as a stranger." একথাগুলি সত্য কিনা বৈদিক-সাহিত্য পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হতে পারে "They were a nation of philosophers." কিন্তু এ-জগতের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য ছিল কোথায়? ভাবে কর্ম্মে তাদের সামঞ্জস্য ছিল। তারপর জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে যে সব দার্শনিকদের উদ্ভব হতে লাগল, তারা বাস্তবিকই নিছক দার্শনিক। তাই আজ তাদের philosophy দেশকে, দেশের মনোভাবকে একটা সজীব সক্রিয় প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারছে না। কাজেই বৈদিক যুগকে আদর্শ ধরলেও—এখনো constructive philosophyর দিক দিয়ে অত্যন্ত অভাব।

সে অভাব পূর্ণ হবে, যদি দার্শনিকরা তাদের সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনাকে জীবন গঠনের দিকে নিয়োজিত করেন। এদিক দিয়ে পাতঞ্জল দর্শনকে শ্রেষ্ঠ দর্শন বলা যেতে পারে—কেননা তার মাঝে সাধনার, মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে গঠিত করে তোলবার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। মানুষকে একটা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট পথ দেখানো হয়েছে তার মাঝে!

যুক্তি-বিচার দিয়ে কিছু হবার নয়—চাই সাধনা। যুক্তি বিচারে যাকে পাওয়া যায়, তাকে প্রত্যক্ষও পাওয়া যেতে পারে। তার দরুণই সাধনা প্রয়োজন। একাধারে দার্শনিক সাধক হতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে!

ভাবের আকর্ষণ

—*—

জড়ে জড়ে আকর্ষণ রহিয়াছে, আর চেতন মানুষ চেতন মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাকি ছাদের উপরে উঠিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পারিষদগণকে আকুলকণ্ঠে ডাকিতেন—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ রে ছুটে আয়।" তাঁহার এই আকুল আহ্বানে যে সব যুবক প্রাণ ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে।

সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের হৃদয়ে সত্য-প্রচারের এই আকুলতা না আসিয়া পারে না। শক্তির আতিশয্যেই এই আকুল আহ্বান, কাজেই এই আহ্বানে যাহারা ছুটিয়া আসে, তাহাদের দেহ-মন প্রাণও শক্তিবন্ত হইয়া উঠে। এই শক্তি-সঞ্চারপ্রণালী শুধু আজ নয়, বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এক ঋষি যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার সময় আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন :—

> যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
> এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা॥

জল যেমন প্রবাহিত হইয়া গিয়া সমুদ্রে মিশে, মাস যেমন সম্বৎসরে অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতা, ব্রহ্মচারিগণ এইরূপে সকল দিক হইতে আমার নিকট ছুটিয়া আসুক।

মানুষ মানুষকে অকুতোভয়ে অভয় দিতে পারে, যদি অন্তরে শক্তিসঞ্চয় হয়। ঋষিরা প্রাণে প্রাণে সেই শক্তি অনুভব করিয়াই, নির্ভীক কণ্ঠে সত্যকে বিলাইবার দরুণ সকলকে ডাকিতেন। "বেদাহমেতম্ আদিত্যবর্ণং পুরুষং" এই বলিয়া দৃঢ় নিশ্চিত হইয়া সকলকে কাছে ডাকিয়া সেই সত্যই প্রাণে প্রাণে সঞ্চার করিয়া দিতেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জগতে এইরূপ ভাববিনিময় বহুকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। মানুষের অন্তর যখন ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, স্বভাবতঃই তখন প্রাণে একটা উচ্ছ্বাস আসে। তখন সেই পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে অফুরন্ত বিলাইয়াও আনন্দের কোন ন্যূনতা ঘটেনা।

সন্দিগ্ধ চিত্ত নিয়া অপরকে আশ্বাস কিংবা ভরসা দেওয়া যায় না, তাই যাহারা সত্যদর্শী মহাপুরুষ নয়, তাহাদের কথায় মনের সন্দেহ যেন মিটিয়াও মিটে না। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে এই জন্যই প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "আপনি যে ভগবান্ ভগবান্ করেন, তাঁহাকে কি আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন?" প্রত্যুত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "শুধু দেখিয়াছি কেন ইচ্ছা করিলে তোমাকেও দেখাইতে পারি।" এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় বাণী তিনি আর কাহারও মুখ হইতে পূর্ব্বে শুনেন নাই, তাহার পর রামকৃষ্ণদেব যখন প্রত্যক্ষ তাঁহাকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া দিলেন, তখন তো তাহার মনে আর কিছুমাত্র সংশয়ই রহিল না। কাজেই অপরকে যাহারা আশ্বাস দিতে যায়, তাহাদের নিজের বুকে যথেষ্ট বল থাকা প্রয়োজন। আর বলিতে গেলে, সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছাড়া আর কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে, অপরের প্রাণের দ্বন্দ্ব বুঝিয়া সেই অনুযায়ী তাহার সমাধান করিতে পারে।

ছোটবেলায় গল্প শুনিয়াছিলাম, যাহারা নাকি সাপের মন্ত্র জানে, তাহাদের সম্মুখে কোন সাপে-কাটা মড়া পড়িলে, আর সকল কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়াও তাহারা সেই মরাকে ঝেড়েঝুড়ে বাঁচাইয়া তুলে। মন্ত্র জানা থাকিলে একটা দায়ে পড়িতে হয় যেন। তেমনি সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদেরও যেন একটা

দায় আছে। যাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া যাহারা মুহ্যমান, তাহাদের জ্ঞানালোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাই যেন তাঁহাদের একটা প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য এই দায়িত্বের মাঝে কোন পীড়ন নাই। সত্যকে লাভ করিলেই পুলকে আনন্দে মন প্রাণ মাতিয়া উঠে, তখন অপরকে আনন্দ দ্বারা অভিষিক্ত করিবার দরুণ স্বাভাবিক একটা প্রেরণা আসে। এই প্রেরণায় মানুষ মানুষকে সাহায্য করিবার দরুণ উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুলিত হইয়া উঠেই।

মানুষের দরুণ মানুষের দরদ হওয়াটা একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু কেবল এই দরদ হইলেই তো চলে না; দরদ বুঝিয়া আবার তাহার প্রতিকারের ক্ষমতাও যদি নিজ হাতে থাকে তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত দরদী। দুঃখ দেখিয়া সকলের প্রাণেই সাময়িক অনুকম্পা হয়, কিন্তু দুঃখ-মোচনের ক্ষমতা না থাকিলে শুধু অনুকম্পা দ্বারা কিছু আসে যায় না। মানুষ তো আর জড় কিম্বা অচেতন নয়, কাজেই বোধশক্তিটা তাহাদের স্বভাবতঃই প্রবল, কিন্তু অপরের দুঃখ বোধ করাটাই দুঃখ মোচনের উপায় নয়। কল্পনা দ্বারা কাল্পনিক সাহায্যই হয়, বাস্তবক্ষেত্রে সাহায্য করিতে হইলেই হাতে-নাতে তোমাকে কিছু করিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক জগতেও যাঁহারা বাস্তবিকই উন্নত, তাঁহারা অপরকে প্রত্যক্ষভাবেই সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহাদের আদেশ কিম্বা উপদেশে এত যে ক্রিয়া হয় তাহার প্রধান কারণই হইল, তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা। অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা কখনো কথা বলেন না, অপরকে আশ্বাস দেন নিজেরই অনুভূত সত্যের মহিমাবলে।

সত্য লাভ করিলে আপন কেন্দ্রে থাকিয়াই তখন সমস্ত জগৎকে আলোড়িত করিয়া তুলিতে পারা যায়। ইহা আর কিছু নয়, শক্তিরই অব্যর্থ মহিমা। বাহিরের প্রচারের দরুণ সত্য অপ্রচারিত থাকিয়া যায় না। আত্মকেন্দ্রে অচল-অটল হইয়া থাকিলেও সত্যের মহিমা আপনি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ঋষিরা তাই আত্মসমাহিত হইয়া যজ্ঞে যে প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা সিদ্ধ না হইয়া পারিত না। প্রাণে প্রাণে যাঁহাদের আকর্ষণ করিতেন, সত্যেরই জ্বলন্ত মহিমার প্রভাবে, তাহারা ছুটিয়া না আসিয়া থাকিতে পারিত না।

কোথায় এক নিবিড় নিস্তব্ধ অরণ্যে বসিয়া ঋষি নিবিষ্ট মনে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন আর তাঁহারই প্রাণের আকুল আহ্বানে চারিদিক হইতে ব্রহ্মচারীরা ছুটিয়া আসিতেছে। সত্যের কি স্নেহময় সুন্দর আকর্ষণ! সত্যকে লাভ করিলে বুঝি মানুষ এমনি উদার প্রশান্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া যায়, আর যতই স্তব্ধ হয়, ততই যেন তাহার আকর্ষণশক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে।

এক জায়গায় বসিয়াও সকল মানবের প্রাণে সাড়া দেওয়া যায়, কেননা—"There is one mind common to all individual men." নিজের মনকে সেই বিরাট মনে সমাহিত করিতে পারিলে, তখন এই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত মানুষের প্রাণে অসীম বল আসে, সেই বল দ্বারা সমস্ত জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। আলেক্‌জাণ্ডার, নেপোলিয়ান তাঁহারা এক এক জন বড় বড় সাধক ছিলেন একদিক দিয়া, তাহা না হইলে এতগুলি লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া নেওয়া সহজ কথা নয়। নিজের মনকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই এই ঐশ্বর্য্য আপনি আসে।

জগতের নিয়ন্ত্রণশক্তি যাঁহার উপর, তিনি স্তব্ধ—শান্ত—সমাহিত। কাজেই যদি তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়া থাকে, তুমি যদি কর্ম্মবীরই হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে ধ্যানে একবার স্তব্ধ

হইতে হইবে। যোগযুক্ত না হইলে কর্ম্মের বল পাইবে কোথা হইতে? গীতায়ও আছে—"যোগই কর্ম্মের কৌশল।" কাজ করিবার আগে, কাজের প্ল্যান্ যদি ভাল করিয়া মনের মাঝে অঙ্কিত করিয়া নিতে চাও, তাহা হইলেই তোমাকে গভীর ধ্যানে স্তব্ধ না হইলে চলিবে না। কর্ম্ম এবং যোগের সাধনা এক সঙ্গে চলিলেই কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হয়। তাহা না হইলে কেবল কর্ম্ম করিয়া অনেকের চিত্তই শেষে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। তাহারা অপরকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে কি, কর্ম্ম-ক্লান্তির অবসাদে তাহারা নিজেরাই মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

যাঁহারা নেতা, যাঁহারা নায়ক যাঁহারা গুরু, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত তাঁহাদের অবিরাম সাধনা চলে। আর যাঁহারা সামান্য কোন একটা সিদ্ধিলাভ করিয়া, সাধনার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখেন না, তাহারা সাময়িক উচ্ছ্বাসে সকলকে আহ্বান করিয়া আনেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আশ্রিতদের তিনি এমন কিছু দিতে পারেন না যাহাতে তাহাদের মন প্রাণ দ্বন্দ্বাতীত হইয়া যায়। আচার্য্য শিষ্যের সম্বন্ধ শেষে একটা জঞ্জালের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

এই জন্যই উচ্ছ্বাসকে, আবেগকে প্রথম হজম করিয়া নিতে হয়, তাহার পর চিত্ত যখন অটল সত্যে স্থৈর্য্যলাভ করে তখন আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না। অপরকে বাঁচাইতে গিয়া যদি নিজকেই ডুবিতে হয়, তাহা হইলে তুমি না হয় সে ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্ত্তা না-ই হইলে! জগতের হিতটা পরে, আগে চাই আত্ম-মুক্তি। অনেকে এই ভাবের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বলেন, তাহা হইলে তো ইহা স্বার্থপরতা হইল, কিন্তু এই স্বার্থপরতা বজায় রাখিয়া যাহারা জগতের হিত করিতে লাগিয়াছেন, তাহারাই দেখি আজ পর্য্যন্তও অচল-অটলভাবে জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেন; আর যাহারা গোড়া হইতেই নিঃস্বার্থপর হইতে গিয়াছেন, দুদিন কাজ করিয়াই আপন মনের দ্বন্দ্ব নিয়াই কর্মক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। নিজের জীবনের দ্বন্দ্ব না মিটাইয়া অপরকে সাহায্য করিতে গিয়া বরঞ্চ সাহায্যপ্রার্থীর মনের সন্তাপ আরও বাড়াইয়া তোলা হয়। ইহাকেই বলে হিতে বিপরীত।

আধ্যাত্মিক জীবনে শক্তি-সঞ্চার বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা আর কিছু নয়, মানুষের দরুণই মানুষের প্রাণের অদম্য আবেগ—আকুলতা—ভালবাসা। নিজের ভিতর শক্তি অনুভব করিলেই, অপরকেও সেই শক্তি দ্বারা উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা স্বভাবতঃই আসে। আর এই যে আমরা শুনিতে পাই, অমুক মহাপুরুষ স্পর্শ দ্বারা তাহার শিষ্যের মনের ভাব-চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিল—ইহা অসম্ভব কথা নয় এবং অবিশ্বাস্যও নয়। জগতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কিনা শক্তি আয়ত্ত থাকা চাই।

ইচ্ছা থাকিলেই একজনের মাঝে অন্য একজনের ভাব অনায়াসে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়। ঋষিরা ছিলেন সেই ধরণের শক্তিধর মহাপুরুষ, কাজেই শক্তি সঞ্চার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলাটা তাঁহাদের পক্ষে এত কঠিন ব্যাপার ছিল না। অভয় দিতে পারাও কম শক্তির প্রয়োজন নয়। কেননা যাহাকে অভয় দিতে হইবে, তাহার জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ নিজকে বহন করিতে হইবে। সমর্পিত জীবনের যে গুরুতর দায়িত্ব, তাহা সকলেই বহন করিতে পারে না। বহন করিতে পারেন একমাত্র আত্মস্থ মহাপুরুষ।

সাময়িক উচ্ছ্বাস দ্বারাও ভক্ত জুটানো বড় একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু নিজের জীবনে শাশ্বত সত্যের সন্ধান না পাইয়া যাহারা অপরকে উদ্ধার করিতে যায়, তাহাদের শেষে অভিশাপের ভাগী হইতে হয়। কাজেই ঋষিরা যে চারিদিক হইতে সকলকে ডাকিয়া আনিতেন সত্য বিলাইতে, সেই সত্য জোয়ার-ভাটার মত ক্ষণকাল স্থায়ী আবেগ নয় শুধু—সেই সত্য দ্বারা মানবের অন্তর বাহির পরিশুদ্ধ হইত। কাজেই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটাও ছিল সে যুগে সহজ।

সাধন নিষ্ঠা

—*—

সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে কি অবস্থা হয়, তাহার লক্ষণ গীতাকার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ কি?—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

—যখন এই দেহে, আত্মোপলব্ধির সমুদয় করণে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশচিহ্ন দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ে আত্মার দীপ্তি স্বভাবতঃই স্ফুরিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে বিশুদ্ধ করিতে হইলেই সাধনা চাই। জ্ঞানাত্মক প্রকাশ এত সহজ নয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতিঃ ॥২৮

—যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইলে জ্ঞানের দীপ্তি হয় এবং সেই দীপ্তির বা প্রকাশের শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি। শ্রদ্ধা সহকারে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্ত-মন উন্মার্জ্জিত হয়। চিত্ত যখন উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয়, তখন আপনা হইতেই মোক্ষসাধক উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রজ্ঞা জন্মে। চিত্তকে যতই মার্জ্জিত করিবে, ততই তাহার প্রকাশশক্তি বাড়িবে। আর এই প্রকাশশক্তি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ততই আত্মসাক্ষাৎকারের পথে সন্নিকটবর্ত্তী হইবে। প্রকাশের শেষ সীমা বলা হইয়াছে—বিবেকখ্যাতি; কেননা বিবেকখ্যাতি হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। অবশ্য বিবেকখ্যাতির মাঝেও অনেক সূক্ষ্ম-বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু ইহা একেবারে ধ্রুব সত্য যে, বিবেকখ্যাতি জন্মিয়া গেলে আত্মসাক্ষাৎকার হইবেই হইবে।

এখন গীতার পূর্ব্ব শ্লোকের একটী কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। গীতাকার 'জ্ঞানাত্মক প্রকাশ' বলিয়া একটী কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জ্ঞানাত্মক প্রকাশ কি সহসা একদিন উপার্জ্জিত হইবে, না ইন্দ্রিয়বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রকাশশক্তির ক্রমবিবর্দ্ধন চলিবে? হঠাৎ যদি একদিন আত্মার দীপ্তি সকল ইন্দ্রিয়দ্বারকে আলোকিত করিয়া তুলে, তাহা হইলে তো আর দৈনন্দিন সাধনার কোন প্রয়োজনই থাকে না; আর তাহা না হইয়া যদি চিত্ত-বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রকাশ শক্তি বাড়ে এবং কমে, তাহা হইলে দৈনন্দিন সাধনার উপরই বিশেষ-ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অচল-অটলভাবে সাধন করিয়া যাইতে হইবে। পাতঞ্জল দর্শনের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যোগাঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের অবিশুদ্ধি ক্ষয় হইলে তখনই জ্ঞানদীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কাজেই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ফলের তারতম্য ঘটিতেছে। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা চিত্তের মলিনতা যতই অপসারিত হইবে, সাত্ত্বিক গুণও ততই বর্দ্ধিত হইবে। তাহা হইলে সাধকের চেষ্টার উপরই সম্পূর্ণভাবে ফল নির্ভর করিতেছে।

বিদ্যা-বুদ্ধির দিক দিয়া অনুশীলন না থাকিলেও শুধু নিয়ম-সংযম দ্বারাই ইন্দ্রিয়কে বিশুদ্ধ করিতে পারিলেও আত্মজ্ঞান জন্মাইতে পারে। Arthur Helps ও এ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর একটী কথা বলিয়াছেন। "The stone in which nothing is seen and polished metal which reflects all things are both alike hard and insensible." কাজেই একেবারে নিরেট অজ্ঞ-মূর্খও যদি চিত্তকে বিশুদ্ধ মার্জ্জিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা

হইলে অজ্ঞাতে তাহার মাঝেও আত্মজ্ঞানের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইবে। এই সম্বন্ধে স্বামী রামতীর্থেরও একটী বেশ সুন্দর গল্প আছে। দুইজন চিত্রকরকে দেওয়ালে একটী ছবি আঁকিতে দেওয়া হইয়াছিল, একজন তাড়াতাড়ি বেশ সুন্দর করিয়া ছবি অঙ্কিত করিল, আর একজন তাহারই বিপরীত পার্শ্বের দেওয়ালকে তখনো কেবল মাজা-ঘসাই করিতেছে। পরিদর্শক ছবি দেখিতে আসিয়া প্রথমেই দেখিল, যে নাকি দেওয়ালকে কেবল মাজিয়া-ঘসিয়া ঠিক করিয়াছিল তাহারই ছবি বেশ উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার, (আসলে কিন্তু সে ছবি মোটেই অঙ্কিত করে নাই অপর পার্শ্বের ছবির প্রতিফলন মাত্র আসিয়া তাহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পরিমার্জ্জিত দেওয়ালে পড়িয়াছে।) কাজেই তাহাকেই পুরস্কার দেওয়া হইল। ছবি আঁকিয়াও একজন পুরস্কার পাইল না, আর একজন শুধু ছবি অঙ্কিত করিবার স্থলটীকে বিশেষভাবে পরিমার্জ্জিত করার দরুণই পুরস্কার পাইয়া গেল। এই ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কি রহিয়াছে ? কোন্ দিকে আমাদের জীবনের আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে ?

সাধনা দ্বারা জীবনকে স্বচ্ছ নির্ম্মল করিতে পারিলে অলক্ষ্যে আত্মার জ্যোতিঃ আসিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারিলেই মহাপুরুষের কৃপাও এইরূপ অযাচিত ভাবেই আসিয়া শিষ্যের হৃদয়কে পবিত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া নির্ভর করি শুধু গুরুকৃপার উপর। কিন্তু এইরূপ গুরুকৃপার যে মোটেই তাৎপর্য্য এবং মূল্য নাই, তাহা বাস্তবক্ষেত্রে একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করি না। ইহার চেয়ে অন্ধ কুসংস্কার আর কি থাকিতে পারে ? সূর্য্যের আলো যদি স্বচ্ছ কাচের মাঝে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে সেই স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া পারিপার্শ্বিকের অন্যান্য জিনিষও উজ্জ্বল দেখায়। কাজেই স্বচ্ছ পবিত্র জীবনের মাহাত্ম্য শুধু নিজের জীবন নয় অপরের জীবনকেও শত দিক হইতে প্রেরণা দিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

পাতঞ্জলে আর একটী সুন্দর শ্লোক আছে—

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।

—সেই সময় জ্ঞানের বা বুদ্ধি-সত্ত্বের কোন প্রকার আবরণ না থাকায় জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তখন জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যোগী তখন সহজেই সর্ব্বজ্ঞ হন।

আমাদের কাছে সাধারণতঃ জ্ঞান অল্প কিন্তু জ্ঞেয় অনেক, কিন্তু যোগীদের সাধনালব্ধ তীব্র দৈবী দৃষ্টি থাকার দরুণ জ্ঞানই অনন্ত কিন্তু জ্ঞেয় অল্প। ইহার নিশ্চয় একটা গূঢ় রহস্য আছে। আমাদের এক একটা বিষয় জানিতে বা বুঝিতে যে এত বিলম্ব হয় তাহার প্রধান কারণ বুদ্ধির মালিন্য। সমগ্রভাবে (as a whole) আমরা কোন জিনিষই জানিতে পারি না, একটু একটু করিয়া কৃপণের মত আমরা জ্ঞান সঞ্চয় করি, কাজেই আমাদের "জ্ঞেয় জিনিষের" আর শেষ হইতেছে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যে ছেলের নাকি বুদ্ধি-প্রতিভা তীক্ষ্ণ এবং প্রখর তাহারা সহজেই একটা বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে, আর সাধারণ ছেলের তাই হয়ত আয়ত্ত করিতে কতদিন লাগে তাহার ঠিকানা নাই। কাজেই বুদ্ধি-প্রতিভার যে যত উৎকর্ষ করিতে পারিতেছে, লৌকিক আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই তাহারা সহজেই উন্নত হইতেছে। বুদ্ধি-সত্ত্ব নির্ম্মল হইয়া গেলে, প্রথম দৃষ্টিতেই জ্ঞেয় বস্তুর একেবারে মর্ম্মস্থল পর্য্যন্তও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে। চিত্তের উৎকর্ষ করাই হইল যথার্থ সাধনা। সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে শাণিত করিতে পারিলে অল্প সময়ে জগতের জ্ঞেয় সমস্ত বিষয়কে অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারা যায়।

যাঁহারা সাধক তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, জ্ঞান

অনন্ত এবং জ্ঞেয় অল্প ইহার অর্থ কি? আত্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জ্ঞেয়-জগৎ তখন জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য হইয়া যায়।

উপরোক্ত শ্লোকের ভোজরাজকৃত পাতঞ্জল টীকায় বেশ স্পষ্ট অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে—

"আব্রিয়তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি ক্লেশাস্তেভ্যোঽপেতস্য তদ্বিরহিতস্য জ্ঞানস্য শরদ্গগনপ্রতিমস্যানন্ত্যাদনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়মল্পং গণনাস্পদং ভবতি। অক্লেশেনৈব সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জানাতীত্যর্থঃ।"

শরৎকালীন গগনের মত বুদ্ধি যখন শুদ্ধ-স্বচ্ছ-নির্ম্মল অনন্ত হইয়া পড়ে তখন অক্লেশে সর্ব্ববস্তু আয়ত্ত করিতে পারা যায়। প্রথমে যে গীতার শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহারও তাৎপর্য্য এই। শরীরের প্রতি লোমকূপে যখন জ্ঞানের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে তখন সাত্ত্বিক গুণ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ শরৎকালের স্বচ্ছ নীলাকাশের মত জ্ঞানের দীপ্তিও অনন্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থা লাভ হইলে, বিশিষ্ট কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভ হইয়াছে ইহা মনে হয় না, যেন সর্ব্বশরীর দ্বারা তখন অনুভব হয়—জ্ঞান হয়। এইভাবে জানাই হইল খাঁটী জানা—কোন ইন্দ্রিয়েরই আর কোন সন্দেহ থাকে না, কেননা সকলেই তৃপ্ত—সকলেই আপ্যায়িত। এই আপ্যায়ন নিজে আত্মস্থ হইতে না পারিলে সহজে আসিয়া উপস্থিত হয় না। তাহার দরুণ সাধ্য-সাধনা করিতে হয়। অনাহূত ভাবে অকালে কেহই আসে না। সবকেই সাধ্য-সাধনা করিয়াই পাইতে হয়। মানবের ব্যষ্টি জ্ঞান অনন্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চাই সকল রকম বাধা-বিঘ্ন আবরণের উন্মোচন। এতটুকু মালিন্য থাকিতেও জ্ঞান অনন্ত হইতে পারিবে না। কাজেই বাহিরের জিনিষকে জানিবার দরুণ আমরা যত ব্যাকুল এবং উদ্গ্রীব হই, তাহার চেয়ে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যদি ধ্যানে স্তব্ধ হইতে পারিতাম আর সেইখান হইতে জ্ঞানের আলো নিয়া প্রত্যেক জিনিষকে বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় জ্ঞেয়কে জানিতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু প্রায় সকলেই আমরা উল্টা পথে চলিয়াছি—অর্থাৎ নিজের চোখকে কানা করিয়া তারপর জগতের যাবতীয় বস্তুকে দেখিতে-বুঝিতে চলিয়াছি। ইহাতে কি কখনো ইষ্টসিদ্ধির আশা করা যাইতে পারে?

জড় চিত্তের চেয়ে, যাহাদের প্রাণে জানিবার একটা আকুলতা আছে তাহারা শতগুণে শ্রেয়ঃ; কিন্তু জানিবার পদ্ধতিটা ভাল করিয়া জানা না থাকিলে, শুদ্ধ মাত্র আকুলতা দ্বারাও কিছু লাভ হয় না। চিত্তকে খুব পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে, এক জায়গায় বসিয়াও সমস্ত জগতের একটা ছক্ চিত্তে ভাসিয়া উঠে। ধ্যানে বা চিত্ত-তন্ময়তার সময় জগতের যে রূপ দর্শন হয়, তাহাই খাটী দর্শন—উহা অলীক কল্পনা নয়। প্রত্যেক বস্তুকেই আত্মার দীপ্তি নিয়া দেখিতে শিখিলে তাহাদিগকে স্বরূপতঃ জানা হয়। আর সচরাচর আমরা যে ভাবে জিনিষকে বুঝি কিম্বা দেখি, তাহা ঠিক ঠিক বুঝা কিম্বা দেখা নয়।

সাধনা দ্বারা জ্ঞান-শক্তিকেই বাড়াইতে হইবে, তাহার পর জ্ঞেয় আর চোখের আড়াল হইয়া থাকিতে পারিবে না। বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ উন্মোচনই হইল প্রকৃত সাধনা। সেখানে কোন গলদ না থাকিলে, বাহিরের কোন বস্তুই জানিতে বাকী থাকিবে না; আর মূলতঃ সেইখানে যদি কোন গণ্ডগোল থাকে, তাহা হইলে চোখ খুলিয়াও অনেক জিনিষ চোখের আড়ালই থাকিয়া যাইবে।

শুধু আলোচনা দ্বারা কিম্বা অনেক বই পড়িয়াও বুদ্ধির আন্তরিক মালিন্য দূর হয় না। শুধু পুথিগত বিদ্যার আলোচনায় প্রকৃত জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ইহাতে বুদ্ধির কসরৎ বাড়ে বুদ্ধি আরও জটিল এবং নীরস হইয়া উঠে। প্রকৃত জ্ঞান

অর্জ্জন করিতে হইলে বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিতে হইবে। জ্ঞেয় আমাদের কাছে অনন্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের অশান্তি আর কিছুতেই নিবারিত হইতেছে না। অথচ আত্মকেন্দ্র হইতে দেখিলে সব সমস্যারই কিন্তু সহজে সমাধান হইত। আমরা যেন রৌদ্রে নিজের ছায়া দেখিয়াই, তাহার পেছনে ছুটিয়া চলিয়াছি অথচ এক জায়গায় যদি স্থির হইয়া দাঁড়াই, তাহা হইলেই কিন্তু বুঝিতে পারি উহা আমাদের নিজেদেরই ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। স্থির হইলে যাহা কিছু জ্ঞেয় তাহা আমাদের মাঝেই লয় হয়, কিম্বা ধ্যানতন্ময়তায় আবার রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠে। কাজেই যে আকুলতা নিয়া, যে ব্যস্ততা নিয়া জ্ঞেয় জগতের পানে আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি, তাহার একাংশ শক্তিও যদি আত্ম-ধ্যানের দিকে নিয়োগ করিতাম তাহা হইলে সব দিকেই তৃপ্তি, শক্তি আসিত।

অবশ্য মানুষের ভিতর অতৃপ্তি আছে বলিয়াই মানুষ বড় হইতে পারিয়াছে ; কিন্তু সে অতৃপ্তি নিয়া শুধু বাহিরে ছুটাছুটি করিলেই কোন ফল হয় না। অতৃপ্তি নিয়াই আত্মস্থ হওয়ার সন্ধানও মিলে। শুনিয়াছি, জাপানী চিত্রকরেরা নাকি চিত্র অঙ্কিত করিবার আগে তাহার ধ্যানে স্তব্ধ—বিভোর হইয়া যায়, তাহার পর অন্তরের জ্যোতিঃ দ্বারা চিত্রের যে রূপ দর্শন করে, সেই রূপকেই যথা সম্ভব চিত্রে ফলাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। এই রূপ ধ্যানতন্ময়তা দ্বারা চিত্র সৃষ্টি করে বলিয়াই তাহাদের চিত্রের এত মূল্য। শুধু চিত্রে কেন, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, চিত্তকে গভীর ধ্যানে তন্ময় করিতে না পারিলে মূল উৎসের সঙ্গে এক করিতে না পারিলে সৃষ্টি সম্ভবপরও হয় না আর তাহা মৌলিকও হয় না।

সৃষ্টির প্রেরণা যাহারা আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে পাইয়াছে—তাহারাই আসল সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাদের সৃষ্টি দুই দিনেই পুরণো হয় না, কিম্বা ধ্বংসের পথে যায় না। সাহিত্য সৃষ্টি একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়, আত্মার সঙ্গে তাহার নিবিড়তর একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। কাজেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা শুধু অনেকগুলা বই পড়া, কিম্বা বহির্দৃষ্টিতে লোকচরিত্র আলোচনা নয়। সত্যের আলোকে, অন্তরের জ্যোতিঃতে দীপ্ত—উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে, শুধু বুদ্ধি বিচার কিম্বা তর্ক দ্বারা কোন সাফল্য লাভ করা যায় না।

বাহিরের চেষ্টা যত্ন দ্বারা যে কোন উপকার হয় না, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধির মালিন্য সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় না। যেটুকু মালিন্য তাহাদের গায়ে গায়ে একেবারে মিশিয়া থাকে, তাহা একমাত্র জ্ঞানাগ্নির তাপ ছাড়া কিছুতেই নির্জ্জিত দগ্ধ হয় না। কাজেই বাহিরের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অন্তর্মুখী হইয়া আত্মধ্যানে ডুবিয়া যাইতে না পারিলে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি মিলে না।

আমরা জ্ঞানের সাধনা না করিয়া, করি জ্ঞেয়ের সাধনা, অথচ জ্ঞেয় জগতকে জানিতে হইলেই যে জ্ঞানেরই প্রয়োজন সেই দিকে কোন লক্ষ্য করি না। এই স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারাই সব জানা যায়, তবে কিনা ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হইলে তাহাতে যে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, আর তাহাতে বস্তুর যে রূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার তুলনায় অপরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দর্শন হয় তাহা অতীব তুচ্ছ।

মোট কথা সাধন ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধও হয় না আর আত্মার জ্যোতিঃ পড়িয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় দীপ্তিবন্তও হয় না, কাজেই অবিশুদ্ধ দৃষ্টি নিয়া অবিশুদ্ধ দর্শনই হয়। যে দিকের শক্তিকে বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন তাহাকে রাখিয়াছি পঙ্গু করিয়া, আর যাহার কোন তেমন মূল্য নাই তাহাকেই ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিতেছি। তাহার পরিণামে জ্ঞান খুব অল্পই হইতেছে, অথচ জ্ঞেয় জগৎ অনন্ত হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের প্রাচ্য মুনি-ঋষিদের আদর্শ ছিল ইহার উল্টা। অর্থাৎ জ্ঞেয় জগতের প্রতি তত লক্ষ্য না করিয়া জ্ঞানের পরিধি বিস্তার। "আত্মানং বিদ্ধি" এই ছিল তাঁহাদের মূল মন্ত্র। আত্মাকে জানিয়া মুনি-ঋষিরা স্বচ্ছন্দে অনায়াসে দিব্যি ঘর-সংসারও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কোন দিক দিয়া অপটু কিম্বা বুদ্ধিবঞ্চিত ছিলেন না। বরঞ্চ জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার করিতেন বলিয়াই সংসারকে এমন সুশৃঙ্খলায় তাঁহারা পরিচালনা করিতে পারিতেন। জনক রাজাও সংসার করিয়াছিলেন, কিন্তু সংসার করার আগে তিনি আত্মজ্ঞানে নিজকে পাকা করিয়া নিয়াছিলেন।

প্রথমে যে গীতার শ্লোকটী, তাহার মাঝে যে লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মানুষ একটু চেষ্টা যত্ন করিলেই লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি করাটা অসম্ভব কিছু নয়। আর সর্বেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হইয়া উঠিলে, এই জগতেই নিরঙ্কুশ লীলাভিনয় চলিতে পারে।

আর কিছু না, ইহার দরুণ চাই শুধু সাধনা—সাধনা—সাধনা।

সেবা-ব্রত

—*—

গীতায় একটা কথা আছে, "প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" প্রসন্ন চিত্তে সর্ব্ব-দুঃখের লাঘব হয়! সেবকের জীবনে আমরা এই সত্যের প্রমাণ পাই। সমস্ত প্রকার দুঃখকে স্বেচ্ছায় পূর্ব্ব হ'তে বরণ করা হয় বলেই সেবকের জীবনে দুঃখের অভিঘাত এসে সাধারণ মানুষের মত তাকে টলাতে পারে না। দুঃখ মানুষের আসবেই, কারণ সেটা স্বাভাবিক—সুখকে যদি মানতে হয়, তবে দুঃখকেও মানতে হবে। সুখ-দুঃখ পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা হয়ে হাত ধরাধরি করে চলছে, একজনকে ডাকলে আর একজন না এসে থাকতে পারে না। তাই দুজনার একজনকে বরণ করলে আর একজন যে আসবে, তা অবধারিত। তাহলে সুখকে বরণ করলে যেমন দুঃখ আসবে—মোহগ্রস্ত তমোবিকৃত আরাম-সুখ নিয়ে মজে থেকে যেমন ভারতের ভাগ্যে তার শাস্তি অবধারিত—অপর পক্ষে দুঃখকে বরণ করলেও সুখ আসবেই, সেবকজীবনে স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখের পরিণামে সুখও অবধারিত। এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত সোনার ছেলেদের জননী যিনি, তিনি দীনা হইলেও চিরদিনই দীনা থাকবেন না—এ আশাও অমূলক নয়। কাজেই আজ যে দুঃখকে ভয় করে পিছনে পড়ে থাকছি, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়ই হচ্ছে—স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করা। বিবেকানন্দের একটা কথা আছে—face to the evil—(দুঃখ) পাপের ভয়ে পিছিয়ে না থেকে তার মুখোমুখী হয়ে বুকটান করে দাঁড়াতে পারলেই সে ভয়ে পালিয়ে যায়।

সেবা হওয়া চাই স্বেচ্ছা-প্রসূত। অনিচ্ছায় যে সেবা, তা সেবা নয় ধরে-বেঁধে পিরীতের মত একটা নিতান্ত বিরক্তিকর অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে হৃদয়ের যোগ মোটেই নাই, সেখানেও অনেক কাজ জগতে বাধ্য হয়েই করতে হয়, নইলে সংসার চলে না। হৃদয়, যুক্তি ও প্রয়োজন

—এই তিনটী মিলেই জগৎ চলে। শুধু একটী নিয়ে হয় না। কিন্তু সেবার কাজটাতে যুক্তি ও প্রয়োজন যতই থাক, সব চেয়ে হৃদয়ের দরদই দরকার বেশী। আমাদের দেশে এই হৃদয়ের বন্ধন ও মহত্ত্ব বেশী। কিন্তু ওদেশে ছেলেকে বাবা, বা বাবাকে ছেলে খেতে না দিয়ে যুক্তিবলে দেশময় হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকে। আমাদের দেশে যে পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি, তাতে কেহই স্বাবলম্বী হয় না, একথা বলা চলে না; বরং তার উপরে একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ গড়ে উঠবার সুযোগ পায় বেশী। এই পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে যে সেবা, পরের জন্য ঠিক তেমনি সেবা হয় না বলেই ওদেশে Nurse-এর ব্যবস্থা। ক্রমশঃ যে এখন এদেশেও তার প্রচলন হয়েছে, তার কারণও হচ্ছে এই যে, আমরাও ঐ সভ্যতায় শিক্ষিত হয়ে তাদের মতই অনেকটা হয়ে পড়েছি, তাই এদেশেও এখন সেবার অমন ব্যবস্থার হুজুগ উঠেছে। কিন্তু যেমন ব্যবস্থাই হউক, সেবার মাঝে হৃদয় যত বেশী ঢালা হবে, সেবাও তত সুষ্ঠু হবে। আর হৃদয় ঢালা কখনও অনিচ্ছায় হয় না। সেবক হলেই সে স্বেচ্ছায় সেবক হয়েছে বলেই আমরা ধরে নিই। সমস্ত প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করে অগ্রসর হওয়াই সেবকের কাজ।

কাজে সফলতা বিফলতা ভগবানের হাত; কিন্তু যে উৎসাহে একটা দীপ্ত প্রাণ স্পর্শে আরও একটী প্রাণ জ্বলে উঠে ক্রমশঃ সমগ্র দেশব্যাপী অসংখ্য সজীবতার সাড়া পড়ে যায়, দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল হচ্ছে তাই। মানুষ যখন জাগে, তখন সব দিকেই ক্রমশঃ দৃষ্টি পড়ে। উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে গিয়ে ক্রমশঃই আপন দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে ও তা সংশোধন করতে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়। আজ আমাদের যে অবস্থা, তাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সেবক হয়ে যার যেদিকে যেটুকু শক্তি বেশী রয়েছে, সেই দিকে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। আত্মশোধন হলে শক্তি আপনি তখন তাকে আশ্রয় করে। তাই শক্তিধারণার জন্য আজ প্রথমেই চাই আত্মশোধন।

সেবকজীবন সংগ্রামময়; সেবক জীবন—সন্ন্যাসী বা যোগীর জীবন। স্বেচ্ছায় সমস্ত পরিত্যাগ করে তপস্যার আগুনে খাঁটী হয়ে সেখানে তেজের সঞ্চয় হয়। কিন্তু পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি হৃদয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধনের স্থলগুলিও অতিক্রম করে এসে যদি ভোগস্পৃহায় সে পবিত্র জীবন কলঙ্কিত হয়, তবে তার চেয়ে আর পরিতাপের কি আছে? সাংখ্যযোগীর মত 'নেতি নেতি' করে সেবক সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করে মায়ের বুক কাঁদিয়ে এসে যদি তুচ্ছ প্রলোভনে আত্মাহুতি দেয়, তবে তার সমস্ত ত্যাগ শুধু ভোগের সঞ্চয় কৌশলমাত্র বলে বুঝতে হবে। তাই শুধু হুজুগে পড়ে, সম্মানের লোভে, বা লেখাপড়া কিম্বা সংসারের দায় এড়াবার জন্য যারা সেবাব্রত গ্রহণ করে, মনে মনে তাদের বুঝা উচিত যে, যে দুর্ব্বলতা মনের কোণে থেকে আজ তাকে ঘরের বার করছে, বিরাট ক্ষেত্র পেয়ে সেই আগুনের ফুলকীই ক্রমশঃ তার নিজের সমগ্র জীবন ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের দশের উন্নত প্রচেষ্টা সমস্তই ধ্বংস করতে পারে। তাই আগে চাই নিজকে বিচার করা, আত্মশোধন করা।

যে ভাবেই হোক, প্রাণ যদি সত্য সত্যই কেঁদে উঠে, আর সে প্রাণ যদি শুধু আবেগভরে না জ্বলে বিচারপ্রবণও হয়, তবে তার ডাক একদিন পড়বেই। বরং ততদিনে তৈরী হওয়ার যেটুকু প্রচেষ্টার অবসর হবে, সে সাধনায় হয়ত আসল উদ্দেশ্যের অনেকখানিই বেশী সফল হবে। তা ছাড়া যদি সেবক নাই হওয়া গেল, তবেই কি বর্ত্তমানের নাম পাওয়ার সুযোগটা গেল

বলে কাঁদতে হবে? একমাত্র পথের বার হওয়াই কি সেবা? এবং সকলের পক্ষেই তা প্রয়োজন? হয়ত এক শ্রেণীর পক্ষে তা সত্যই প্রয়োজন, কিন্তু তোমার জন্ম হয়ত তার চেয়েও উন্নত ধরণের কাজ রয়েছে।

যাদের মস্তিষ্কশক্তি বেশী, তারা তাই দিয়ে, যাদের দৈহিক শক্তি বেশী, তারা তাই দিয়েই সেবা করবে। প্রথম হতেই উচ্চ আদর্শ, যথা, গান্ধীর জীবন লাভ করার মত বিদ্যা-বুদ্ধি, ত্যাগ ও সংযম নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা চাই। আজ জগতে বোধ হয় গান্ধীর শত্রুও এমন কেউ নাই, যিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর ত্যাগ ও তপস্যাকে বস্তুতঃ প্রাণ থেকে শ্রদ্ধা না করেন।

প্রকৃত সেবক যদি হতে হয়, তবে আগে এই সব উচ্চ আদর্শে নিজের গঠন চাই আগে। মায়ের সন্তান বলে গর্ব্ব করতে যদি হয়, তবে তাঁর উচ্ছৃ-ঙ্খল সন্তান কেন হব? শক্তিমান বরপুত্র হয়ে সুন্দর জীবন আমাদের আরও সুন্দর করে তুলব। ত্যাগে সন্ন্যাসী, বিদ্যায় সরস্বতী, বুদ্ধিতে অমল সাত্ত্বিক হলে তবেই সে জীবন পূজার পুষ্প রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অপবিত্র ও কীট-দষ্ট জীবন কোন দেবকার্য্যেই লাগবে না জেনো।

হয়ত বলবে, সবাই কি অমন হতে পারে? সে কথা মানি, সবাই পারে না। তাই তারা যা ইচ্ছে হোকগে। কিন্তু তুমি কি এমনই নিজকে হীন ভেবেছ যে, রামা শ্যামার মত না হয়ে একটা উচ্চ আদর্শে জীবন চালাবার চেষ্টাটুকুও করতে পার না? কে জানে তোমার জীবন দিয়েই মহৎ কার্য্য সাধিত না হবে? যাদের আত্মবিশ্বাস নাই, তারা কি সেবক নামের যোগ্য? শুধু কেবল গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ছেড়ে দেওয়াই আত্মশক্তির পরাকাষ্ঠা যদি বুঝে থাক, তবে ভুল বুঝেছ। তুমি তুচ্ছ নও—বিচারশক্তিহীন তুমি নও। আগে আত্মসংগ্রামে জয়ী হও। জেনো—নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি!—মঙ্গল কামনা যে করে, এমন উচ্চমনা ব্যক্তির পরিণাম কখনও দুঃখময় হয় না। বাইরের শত অভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে প্রাণ তার আরও জলে ওঠে। সে আঘাত সইবার মত শক্তি আছে বলে স্বীকার করেছ বলেই না তুমি সেবক নাম নিতে চাও! কিন্তু জানবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্ব্বল হলে তাঁকে পাবে কি করে? দুর্ব্বলতাই সেবকের পাপ। তুমি তো পাপী নও!

সাধু-দর্শন

—*—

মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন,—

"অলখ্ পুরুখ্ কো আরসী সাধুহি কা দেহ;
লখ্ যো চাহে অলখ্ কো উন্‌হিমে লখ্ লেহ॥

—যিনি অলক্ষ্য পুরুষ (ব্রহ্ম), সাধুদিগের দেহই তাঁহাকে দেখিবার দর্পণস্বরূপ। যিনি সেই অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিতে চাহেন, সাধুর মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

পশ্চিম দেশের অনেক সাধু মনুষ্যমাত্রকেই ভগ-বান্ বলিয়া সম্বোধন করেন। সেখানে সর্ব্বত্র ভগবান্ বা ব্রহ্ম দর্শন করিবার পক্ষে বাহিরের এই ভাষা ব্যবহারে সর্ব্বত্র সেই পরম পুরুষ অনুভব করি-বার ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইরূপে একদিন যখন তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন, তখন বাস্তবিকই—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

যীশুখৃষ্টও বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পুত্রকে দেখিল, সেই পিতাকে দেখিল।

ইহাতে বাস্তবিক পক্ষে সাধুহৃদয়ের আশ্রয় নিয়াই যে সত্যান্বেষীরা একমাত্র তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাহা ভিন্ন যে আর উপায় নাই, এই কথাই ধ্বনিত হইতেছে। বেদান্তভাস্কর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আত্মার স্বপ্রকাশতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াও শেষে স্পষ্টরূপে তত্ত্বোপদেশ গ্রন্থে বলিতেছেন—

আত্মা প্রকাশমানোহপি মহাবাক্যৈস্তথৈকতা।
তত্ত্বমবোধাত্তেহথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ॥
তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা।
অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢ়ৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ॥

—আত্মা স্বয়ংপ্রকাশমান হইলেও এবং বেদান্তের পৌর্ব্বাপর্য্য সমস্ত বিচারানুসারে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অনুধাবন করিলেও, শ্রীগুরুর করুণা ভিন্ন পণ্ডিতম্মন্য মূঢ়ের দ্বারা অপরোক্ষানুভূতির সাক্ষাৎকার হয় না। ভগবান সর্ব্বত্রই বিরাজিত, তাঁহাকে দেখিতে আবার গুরুর প্রয়োজন কি বলিয়া যাহারা বড়াই করে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মত তেজীয়ান্ মহাপুরুষেরও তাহাদিগের প্রতি এই বাক্য বিশেষ অনুধাবনের বিষয়।

তুবার নাম নিয়াই যাহারা সহজ জীবনের দোহাই দিয়া আরামে জীবন যাপন করিতে চান, সহজ অবস্থা যে নিতান্তই সহজ নহে, তাহা জানাইয়া শাস্ত্র তাহাদিগকে বলিতেছেন—

দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা॥
(হঠযোগপ্রদীপিকা)

—সদ্গুরুর করুণা বিনা বিষয়ত্যাগ, তত্ত্বদর্শন এবং সহজ অবস্থা লাভ কঠিন।

কিন্তু এমন সদ্গুরু কোথায় গিয়া পাই? তথাকথিত সাধুদিগের মধ্যে বাহ্যিক ব্যাপার দেখিয়া দূর হইতে যেটুকু ভক্তি থাকে, কাছে গেলে স্বাভাবিক দূষিত মন আমাদের আরও দুষ্ট হইয়া হয়ত সেটুকুও হারাইতে বসে। একে ত এইরূপে সাধুদিগকে বাহিরের আচার দিয়া ধরিবার যো নাই, তদুপরি প্রাচীন কাল হইতে সাধুসমাজে প্রচলিত এবং প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট প্রমাণযোগ্য একটী শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে—

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
সন্ন্যাসিনোহপি দৃশ্যন্তে কলিসন্দূষিতাশয়াঃ॥

—সন্ন্যাসীদের মধ্যেও প্রমাদযুক্ত, বাহ্যবিষয়ে চিন্তাপরায়ণ, বিদ্বেষী ও কলহপরায়ণ অনেক লোক দৃষ্ট হয়। কলিরূপ পাপে তাহাদের আশয় বা মন দূষিত। দত্তাত্রেয়ের ভাষায় বলিলে—

"মুণ্ডী চ দণ্ডধারী বা কাষায়বসনোহপি বা।
নারায়ণবদো বাপি জটিলো ভস্মলেপনঃ॥
'নমঃ শিবায়' বাচো বা বহ্বর্চ্চাপূজকোহপি বা।
ক্রিয়াহীনোহথবা ক্রূরঃ কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ?
অন্নপানবিহীনাঃস্ম বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল।
উচ্চাবচৈর্বিপ্রলম্ভৈর্নতস্তে অশনালবাঃ॥"

—মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডধারী, কাষায়বসনপরিহিত মুখে নারায়ণ নাম, জটাজূটসমন্বিত, গায়ে ছাইমাখা, নমঃ শিবায় বলেন, বহু পূজার্চ্চনা করেন,— কিন্তু যদি যথার্থ ক্রিয়াবান্ না হয় অথবা ক্রুর প্রকৃতি হয়, তবে কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে? পানাহার না পাইয়া বা লোককে তিনি পানভোজন ত্যাগ করিয়াছেন দেখাইয়া, লম্বা-চওড়া কপট বাক্য বলিয়া যাহারা কেবল মানুষকে প্রবঞ্চিতই করে, রামদাস কাঠিয়া বাবা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "পেট্‌কো বাস্তে সাধু বন গয়া।" সত্যই সাধুসমাজে এইরূপ কু আদর্শ দেখাইয়া অনেকে অনেক সাধুভক্তের হৃদয়ে সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির হ্রাসই করিতেছে।

কাজেই সাধু চিনিব কি করিয়া? চিনিলে ত তাঁহার মাঝে ভগবদ্দর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হইবে— গুরুরূপে বরণ করিব? এইজন্য বলা হয়,—

যারে দেখ্‌লে প্রাণে ঢেউ ওঠে—
…নাম আপনি ফোটে—

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, যাঁহার সঙ্গ হইলে আপনি মুখে ইষ্টনাম আইসে—ইত্যাদি। অর্থাৎ চিনিতে হইবে বাহিরের বেশভূষা, আচার দিয়া নয়—আপন হৃদয় দিয়া। সত্যান্বেষীর একান্ত আকুলতায় স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত আপনি আসিয়া ধরা দেন, সাধু ত কোন ছার! প্রাণ যখন তেমন মানুষ পাইবার জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যিনি আমার পথ চাহিয়া দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কি আপনি আপনি আসিয়া বুকে না নিয়া পারেন? সামান্য পারিবারিক সম্বন্ধও যখন জন্মান্তরের কর্ম্ম বা সংযোগ বশতঃ সম্পাদিত হয়, তখন যিনি অমৃত দান করিবেন, সেই ইহ-পরকালের একান্ত দরদীর সঙ্গে কি জন্মান্তরীণ যোগ না থাকিয়া পারে? তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া—হৃদয় নাচিয়া যে উঠিবেই!

এই ত গেল অপ্রাকৃত সাধু বা প্রকৃষ্ট সাধুরূপী গুরুর কথা। সাধারণ সাধু সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার হইবে? বাবা গম্ভীরানাথজী বলিতেন, "সাধুর আদর্শ হৃদয়ে লইয়া সমস্ত সাধুকেই অর্থাৎ সাধুবেশীকেই আপনার কল্যাণোদ্দেশ্যে ইষ্ট স্মরণ পূর্ব্বক কিছু দান করা ভাল। কিন্তু ঐসব সাধুর সঙ্গে ত তোমার 'লেনা দেনা' নাই, তাহাদের সঙ্গে বিশেষ মেলা-মেশার প্রয়োজন কি?" কপট সাধু বলিয়া মনে হইলে তাহাদের অসৎ প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্য ঐরূপ বলিতেন। কিন্তু যাহাদিগকে কপট বলিয়া না বুঝিয়া ভাল বলিয়া জানা যায়, তাহারাও হয়ত পরে খারাপ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। তাহাতে দাতাভক্তের অনিষ্ট হয় না। স্বামী কুচরিত্রের হইলেও তাঁর প্রতি ভক্তি করিয়া সাধ্বী স্ত্রী যেমন নারায়ণকেই সেই স্বামীর ভিতর দিয়া পাইয়া থাকে, সাধু যাহাই হউন, তাঁহার প্রতি অর্পিত ভক্তিকে স্বয়ং দেবতা আসিয়া গ্রহণ করিয়া ভক্তকে বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন। কপট সাধু তার নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সত্যসাধকের পক্ষে সাধুভক্তি যেমন প্রয়োজন বা স্বাভাবিক, তেমনি তাঁহার সেই সঙ্গলাভের জন্য আকুল প্রাণ কখনও ঠকে না। বরং তাঁহার প্রাণে যে সত্যের আকর্ষণ, তাহাতে অসাধুকেও সাধু করিয়া তুলে। হয়ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে তেমন অভিমান অনেক সময়ে মারাত্মক হইতে পারে? কিন্তু আপন বুকে জোর থাকিবে না কেন? ভক্ত ও তেজীয়ান্ সাধক আপন বুকের জোরেই বলিয়াছিলেন,—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

তাহাতে তাঁহার পতন হয় নাই, বরং উন্নতিই হইয়াছিল। এমন কি, স্বয়ং ইষ্টদেবী আসিয়াও ব্রহ্মানন্দগিরিকে তাঁহার গুরুর ভ্রম বুঝাইতে চাহিলে তিনি সে ইষ্টদেবীকে বিদায় দিয়া বলিয়াছিলেন—"যখন তোমাকে চিনি নাই, তখন কে চিনাইয়া দিয়াছিলেন—তুমি যে এখন তাঁর নিন্দা করিতে আসিয়াছ, তখন কোথায় ছিলে? যাও, তোমাকে চাই না!" দেবী তাহাতে আরও সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন নাই। সাধু-দর্শন প্রসঙ্গে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সাধু দর্শন করিতে শুধু-হাতে যেতে নাই, অন্ততঃ কিছু ফলমূল নেওয়া উচিত।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে সাধু-ভক্তের মহিমাই প্রকটিত হয়। যাঁহারা সমস্ত ছাড়িয়া ভালর যদি বেশও ধারণ করে, অন্ততঃ বেশের জন্য লোকভয়েও তোমার আমার চেয়ে তাঁহাদিগকে অনেক খাঁটী থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। তাই "ভালর ভেলও ভাল।" জীবনে এত পাপ কর, তাহাতে কিছু হয় না, আর অকিঞ্চন নিঃসহায় জীবনের সাহায্যই কি সব চেয়ে বড় পাপ হইল? অবশ্য তুমি আমি যাহা করি, তাহা দ্বারা শাস্ত্রের সাধু-সেবার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু আমরাই বা কেন এমন জীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহায়ক হইয়া মহাকার্য্যের ভাগী

হইব না? সমস্ত সাধুই শাস্ত্রবর্ণিত সিদ্ধিলাভ এই জীবনেই নাও করিতে পারেন, সমস্ত বীজই অঙ্কুরিত নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই কি বীজ বপন ব্যর্থ বা অন্যায় হইবে?

ভগবান বা ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজিত, একথা শুনি। কিন্তু সাধু সংস্পর্শে বা তীর্থক্ষেত্রেই তাঁহার প্রভাব বা ধর্ম্মভাব জাগরিত হয় বেশী। সমস্ত ছাড়িয়া যাঁহারা তন্ময় হইয়া আছেন, সেই সাধুর দেহে যে ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের প্রকাশ সত্যই স্বাভাবিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হিন্দুর শাস্ত্রে তাই গুরুর দেহকে চিন্ময় দেহ বলা হয়। কাজেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই অলক্ষ্য পুরুষকে লক্ষ্য করিতে হইলে মহাত্মা কবীরের ভাষাতেই বলিতে হয়—

অলখ্ পুরুখ্ কো আরসী সাধুহি কা দেহ।
লখ্ যো চাহে অলখ্ কো উন্‌হিমে লখ্ লেহ॥

উপদেষ্টা

—(*)—

উপদেশ দিতে চায় সকলেই, কেননা শাস্ত্রে বলে, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য জিনিষটা প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আমি বড়, দশ জন থেকে অসাধারণ, একথা যদি সবাই মেনে নেয়, তবে কার না আনন্দ হয়? কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে চঞ্চল ধানুকীর নিক্ষিপ্ত তীর যেমন লক্ষ্যভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তেমনি অব্রহ্মচর্য্যশীল, অতপস্বী বা যার দিবার জন্য প্রাণ কাঁদে নাই, তার কথায় যতই কর্ণ-পটহ-বিদীর্ণকারী স্বরগ্রাম থাক্ তবু কারও তাতে প্রাণ গলে না। পক্ষান্তরে যার প্রাণ সত্যই কেঁদেছে, যে সত্যের সাড়া পেয়ে আকুল প্রাণে ঘর ছেড়েছে, তাঁর কথার মাঝে স্বরগ্রামের উচ্চতা বা বৈচিত্র্য যদি না থাকে, তবুও সবাই তার কথার জন্যই বিশেষ উৎকর্ণ, একটী ইঙ্গিতের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়।

কেন এমন হয়? যে যাই কিছু দিতে আসুক, অন্তরে তার যাই থাকুক, অন্ততঃ তখনকার জন্য তার মাঝেও তো দিবার জন্য একটা ভাব জেগেছে, তবে কেন সবাই তার কথা শুনবে না? কার্য্যকালের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতেই বলা যায়, তার কথা প্রথমোক্ত বক্তার মত সকলের হৃদয়াকর্ষক হয় না। তার কারণ হচ্ছে এই যে শেষোক্ত ব্যক্তি শুধু উপদেষ্টার আসনের লোভেই মোহবশতঃ বক্তৃতা দিচ্ছে, আর প্রথম বক্তা প্রাণের আবেগে যথার্থভাবে আপন হৃদয়ে অপরের বেদনা বহন করে তবে বক্তৃতা দিচ্ছেন। শুধু সাময়িক ভাবে উচ্ছ্বসিত তিনি নন। নিজের শক্তি না বুঝে যারা শুধু মোহ বশতঃ কার্য্য আরম্ভ করে, গীতায় শ্রীভগবান তাহাদিগকে তামস কর্ম্মী বলেছেন:—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥

প্রথমোক্ত অধিকারীদিগকে ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ঈশ্বরকোটীর থাক্।" এদের মাঝে চাপরাশ পেয়ে যারা লোকসমাজে প্রচারার্থ বহির্গত হন, তাঁরাই যথার্থ লোকহিতে সফলতা লাভ করেন। অন্যান্য সবাই কিছু কিছু পথ পরিষ্কারের কাজ করেন। তাঁদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'এরা জীবকোটীর থাক্।' প্রত্যেকে এরা নিজ জীবনের উন্নতিই লক্ষ্য রাখেন, সঙ্গে সঙ্গে হয়ত

দু'একজন উন্নত হয়ে যায়। যারা ঈশ্বরকোটীর থাক্, তারা আসেন বড় বড় ইঞ্জিনের মত অনেককে টেনে নিতে। তাঁদের নিজ জীবনে ঈশ্বরদত্ত বিশেষ ক্ষমতা নিয়েই তাঁরা জন্ম গ্রহণ করেন; সময়ে তা ফুটে উঠে মাত্র। তাই শক্তি স্বাভাবিকই বেশী হয়।

কিন্তু এই ঈশ্বরকোটীদের শক্তিও শুধুই অমনি ফুটে ওঠে না, বরং দেখা যায় যে তাঁদের শক্তি বেশী বলেই তাঁরা সাধারণের অচিন্তনীয় বেগ নিয়ে বিশিষ্ট একটা প্রচেষ্টায় জীবন পণ করেন। সেই প্রচণ্ড বেগের কাছে যেন সমস্ত বাধা উড়ে যায়—তাঁদের পথে মোহের আঁধার ঘুচে গিয়ে আপনি আলোর শিখা প্রসারিত হয়। কাজেই শক্তির তারতম্য বাদ দিলে আত্মচেষ্টার দিক দিয়ে তাঁরা কারও চেয়ে কিছু কম করেন না। তাঁদের মাঝে অমিত শক্তি থাকে বলেই প্রচেষ্টার মাঝ দিয়েও শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কতটা সাধনার পর যে সিদ্ধিলাভ হয়, তার আদর্শ দেখিয়ে যান। সাধনার ন্যূনতা রেখে কেহ সিদ্ধিলাভ করেন নাই।

এখানে প্রশ্ন আসে এই যে আপন জীবনে ঈশ্বর-কোটী বা জীবকোটীর মধ্যে নিজে কোন্‌টা তা কেমন করে বুঝব? এ প্রশ্নের সরল উত্তর এই যে, তা বুঝবার চেষ্টারই প্রয়োজন নাই। আসল লক্ষ্য থাক্‌বে আপন হৃদয়ের দিকে, বাইরের লোকের দিকে বা তাদের প্রদত্ত উপাধির দিকে নয়। শুধু হুজুগে মেতে নাম কিনবার জন্য যারা আসরে নেমে পড়েন, তাঁরাও অবশ্য মন্দের ভাল, কেননা, সে নাম কিন্‌তেও তাঁদের বেশ দাম দিতে হয়, কিন্তু গোড়ায় শুধু অমনি নীচু লক্ষ্য থাকাতে তাঁরা প্রথম স্থান পেতে পারেন না। প্রাণের টানে যিনি মানুষকে ভালবেসে তাদের সমস্ত অভাব আপন বুকে নিচ্ছেন, আর যিনি দয়া করে অথবা নামের জন্যে লোক-সমাজে মাঝে গিয়ে দাঁড়ান, তাঁদের দুয়ের মাঝে কত তফাৎ।

এই দুয়ের উদাহরণ দেখা যায়, বুদ্ধদেব ও দেবদত্তের মাঝে। জনসমাজে ও শিষ্যবর্গের ভিতর বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠা দেখে দেবদত্তও প্রতিষ্ঠ হবার জন্য বহু শিষ্য করেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের ধর্ম্মসেনাপতি আনন্দকে দেখে এক রাত্রির মাঝে দেবদত্তের পাঁচশত অর্থাৎ প্রায় সমস্ত শিষ্য এসে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমান হবার জন্য তাঁর সমস্ত চিহ্ন অর্থাৎ শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মাদি ধারণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি শক্তির বেলাতেও যেমন পরাজয় ঘটে, তেমনি অভিমান নিরসনের চিহ্নস্বরূপ ভৃগুপদ-চিহ্ন ধারণ করাও কষ্টকর হয়ে ওঠে। গোবর্দ্ধন ধারণের বা ধ্বংসের বল বুকে এলেও আসাটা বরং অনেক সময় সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু ভৃগুপদ-চিহ্ন ধারণ করাটা সব চেয়ে বেশী কষ্টকর। কেননা ভয় আছে—পাছে ছোট হয়ে যাই!

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাইরের বাহবার দিকে দৃষ্টি থাক্‌লে সেই ছিদ্রে অন্তর হতে বহু ভাল জিনিষ ঝরে যায়। সুতরাং দৃষ্টিটা বাইর হতে ভিতরে নয়—ভিতর হতে বাইরের দিকে রাখতে হয়। বাইরের লোকে কেমন বল্‌বে সে দিকে নয়, আমার অন্তর বাহিরের লোকের জন্য কি করবে সেইজন্য প্রাণ আকুল হওয়া চাই। সেখানে শক্তি অলক্ষ্যে স্বাভাবিক হয়ে আস্‌বে। কি দিয়ে কি হল জানতে পারে না, অথচ লোকের মন ভিজে যায়। আর যে লোক মজাতে চায়, তার পলে পলে দৃষ্টি থাকে যে, লোক মজল কিনা! সেখানে বাইরের সুরে অন্তরের সুর মিলে গিয়ে প্রাণবন্ত মোহন সঙ্গীতের সৃষ্টি করে না—বাইরের গ্লানি এসে অন্তরকে আবিল করে অরস আবর্ত্ত সৃষ্টি করে মাত্র। তাই অন্তরের সুরটী খুঁজতে হবে আগে। ক্রমশঃ সঙ্গীত হয়ে বাইরে তা আপনি জন-মন হরণ কর্‌বে।

অন্তর যেখানে দীপ্ত, বাইরে আলোক ফুটাতে সেখানে কোনও বাঙ্ নিষ্পত্তির প্রয়োজনই হয় না। একটা কথা আছে—গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।—গুরুর নীরব ব্যাখ্যায় শিষ্যের সংশয় নিরসন! অবশ্য বর্ত্তমান জনসমাজে তেমন আধারের গুরু বা শিষ্য খুবই কম, কিন্তু এখনও যে তার অসদ্ভাব নাই, সাধু মহাপুরুষদের বর্ত্তমান বহু লীলাপ্রসঙ্গে এখনও তাহা প্রমাণিত হয়। অনুসন্ধানে এখনও তেমন লোক মিলে।

উপদেশ বহু উঁচু ধাপের কথা। আমাদের চাই যেমন নিজের জন্য, তেমনি পরের জন্য প্রাণ কাঁদা। পরস্পরের অভাব যদি প্রত্যেকে আপন বুকে টেনে নিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করে, তবে যথার্থ ব্যথার ব্যথী পেয়ে দরদীর কাছে দরদ জানাতে সবাই আসে। তার মাঝে যার প্রাণশক্তি প্রচুর, তার ভিতর দিয়ে ভগবানের আশীর্ব্বাদ সকলের মস্তকে বর্ষিত হয়। ভাই ভাইয়ের হাত ধরে অনন্ত উন্নতির পথে তাদের গতি হয়। সেখানে কেই বা শ্রোতা আর কেই বা বক্তা—সব একরস!

—*—

ঘুম ভাঙা

—*—

আঁধার পথে জীবন গেল,
আলোক বুঝি ফুটল না—
এ ফুল বুঝি রইল পড়ে
মন-মধুপ্ আর জুটল না!

এমনি ভেবে কাঁদ্‌ছি বসে
নিরালাতে আনমনে—
এমন সময় রক্ত-রবির
কিরণ-রেখা ওই কোণে

কে দেয় টানি পূবের দিকে—
আঁধার তবে টুট্‌ল কি?
কর্‌লে এসে সব যে উজল
এ ঘুম তবে ছুট্‌ল কি!

———

হিমাচলের পথে

(পূর্বানুবৃত্তি)

—*—

২২ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন, রবিবার।—

স্মরণীয় শুভ দিন। আজ আমরা ত্রিভুবন-তারিণী, পতিতপাবনী, ভক্তহৃদ বিহারিণী ভাগীরথী গঙ্গার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম তীর্থ গঙ্গোত্তরী পৌঁছে এত দিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারবো আশায়, সকাল সকাল বের হয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত জোরে জোরে চলতে লাগলাম। প্রতিদিনের মত সম্মুখস্থ সমুদয় লোক পিছনে ফেলে আমি ও বড়-মা বেলা ৯টার সময় **গঙ্গোত্তরী তীর্থে** পৌঁছলাম। ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই সারদা ভায়া ও হরিদাস ভায়া এসে পৌঁছিল, ক্রমে সকলেই এসে পড়লেন।

এখানে কয়েকটি ধর্ম্মশালা থাকা সত্ত্বেও বাবা কালীকম্বলীবালার সদ্যোচ্চস্থিত ধর্ম্মশালায় একখানা বড় ঘর দখল করে সকলে জায়গা নিলাম। ভৈরবঘাট হতে গঙ্গোত্তরী ছয় মাইল। আসার সময় ছোট ছোট চড়াই উৎরাই অনেক করতে হয়েছে বটে, কিন্তু চীরগাছের মত এক প্রকার অসংখ্য বড় বড় গাছের নীচু দিয়ে আসায় রৌদ্রের তাপে কষ্ট পেতে হয়নি। তা ছাড়া এদিকটার ঠাণ্ডাও খুব বেশী; দ্বিতীয়তঃ আজ প্রাণে অত্যধিক আনন্দ ছিল—আমরা আজ গঙ্গোত্তরী পৌঁছব। কাল যে গাছগুলি দেখে আমরা চীরগাছ বলে ভুল করেছিলাম সেগুলি দেখতে চীরগাছের মত হলেও, সেগুলি চীরগাছ নয়, **দেবদাওয়ার** গাছ।

গঙ্গোত্তরী ৬ মাইল

আমি বলতে ভুলে গেছি, আমরা প্রত্যহই ভাগীরথী গঙ্গার তীর দিয়ে ভ্রমণ করার সময় ডি. এল. রায় মহাশয়ের ভাগীরথী গঙ্গা-মায়ের স্তবস্বরূপ "অম্বর হইতে সমশত ধারে" গানটি ভাগীরথী মায়ের শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তালে তালে গান করতে করতে কেমন করে যে সে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি, তা পতিতপাবনী মাই জানেন। এ গানটি ভাগিরথীর তালে তালে গান করার সময় কতই যে প্রাণের ভিতর আনন্দের লহর প্রবাহিত হয়ে গেছে, তা কি বুঝাব? পাঠকগণ যারা দুর্গম-দেশ ভ্রমণ করবেন, তারা যদি পথশ্রমের কথা না ভেবে, যে কোন গানের ভাবে বিভোর হয়ে তারই তালে তালে পদক্ষেপ করেন, তা হলে পথের কোন কষ্টই আপনাকে যাতনা দিতে পারবে না। পথ যতই সুদীর্ঘ হউক না কেন, আপনি অনায়াসে বিনা ক্লেশে সে সুদীর্ঘ পথ অল্প সময়ের মধ্যে অতিবাহিত করতে পারবেন। মোট কথা, মনটিকে অন্য ভাবে বিভোর রেখে বা কোন চিন্তায় নিযুক্ত রেখে, আপনি ভাবের ঘোরে যত পথই অতিক্রম করুন না কেন, আপনার কোন কষ্ট হবে না। পরম দয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই সঙ্কেতটী অনুসরণ করে আমরা সমগ্র পথক্লেশ অতি আনন্দের সহিত অতিক্রম করেছি। আমাদের সঙ্গীয় বৃন্দাবনে বৃদ্ধা মাতাজীগণও, যাদের কয়েক জনের বয়স ৭০ বৎসর পেরিয়ে গেলেও তাঁরা নানাপ্রকার ভজন গেয়ে এই সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য পথগুলি অতিক্রম করেছেন এবং নিরাপদে যাত্রা সুসম্পন্ন করে সুস্থ শরীরে বৃন্দাবনে ফিরেছেন।

গঙ্গোত্তরী পৌঁছে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর ভাগীরথী গঙ্গাতে স্নান করার উদ্দেশে জামা কাপড়াদি সহ অনেকটা উৎরাই করে ভাগীরথী গঙ্গার পারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। উঃ! কি ভীষণ ঠাণ্ডা! নেমে স্নান করে কার সাধ্যি! স্রোতও তেমনি প্রবল। কলিকাতার বরফ আধঘণ্টা তাতে রাখা যায়, এখানকার জলে এক মিনিট হাত রাখার উপায় নাই—হাত একেবারে অসাড় হয়ে যায়। বরফও বরং গরম কিন্তু বরফ-গলা জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। দুই-তিন ঘটী জল তুলে কোনরকমে মাথায় ঢেলে স্নান সমাপন করলাম।

পাণ্ডাজী মহারাজ কতকগুলো শুকনা কাঠ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্নান করে উঠেই তাতে আগুন ধরিয়ে হাত পা সেঁকে নিয়ে অনেকটা সুস্থ হলাম। বদরীনারায়ণেও বরফ-গলা জলে স্নান করেছি, কিন্তু সেখানে এত ঠাণ্ডা অনুভব হয় নাই। সে বোধ হয় আষাঢ় মাসের শেষ হবে বলে কিনা কে জানে?

স্নান করার পর শুষ্ক-বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে পাণ্ডা মহারাজের সাথে **শ্রীশ্রীভাগীরথী গঙ্গা-মাতার মন্দিরে** প্রবেশ করতঃ মা'জীকে দর্শন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ করে জীবন ধন্য করে, অপার আনন্দ লাভ করলাম। মাঝখানে ভাগীরথী গঙ্গা মাতার মূর্ত্তি, দক্ষিণে লক্ষ্মীমাতা, বামে যমুনা-মাতার মূর্ত্তি বিরাজমান। এছাড়া নীচের সারিতে মহারাজা ভগীরথের মূর্ত্তি, সরস্বতী মায়ের মূর্ত্তি, জাহ্নবী মায়ের মূর্ত্তি, অন্নপূর্ণা মায়ের মূর্ত্তি, শ্রীশ্রীজগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য দেবের মূর্ত্তি প্রভৃতি বিরাজমান। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করে বাহিরে এলাম।

এখানে তিনটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত দেবদেবীগণ মাঝখানের মন্দিরে বিরাজ কচ্ছেন। দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরে শ্রীশ্রীমহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি, হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি, নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রমথগণ সহ বিরাজ কচ্ছেন। উত্তর পার্শ্বের মন্দিরে শ্রীশ্রী-অন্নপূর্ণা দেবী বিরাজমান। উক্ত তিনটী মন্দিরই শঙ্করাবতার শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবের কীর্ত্তিমালার একাংশ মাত্র! কলিযুগে সর্ব্বপ্রথম তিনিই এই ভীষণ দুর্গম পুণ্যময় তীর্থ আবিষ্কার করে, মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ মায়ের প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিরসাপ্লুত ছন্দে গঙ্গার স্তব রচনা করেছিলেন। এখানে অন্য একটি *শিবমন্দিরে তিন প্রকার তিনটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন এবং শিবদুর্গা বৃষভারোহণে উপবিষ্টা। মূর্ত্তিটি শ্বেত-পাথরের উপর খোদিত থাকায় লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে থাকে।

গঙ্গোত্তরী তীর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০৩১৯ ফুট উচ্চে অবস্থিত; যমুনোত্তরীস্থ যমুনাদেবীর মন্দির হতে অনেক উপরে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত যমুনোত্তরীর চারিদিকে অতি নিকটবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত ঘেরা পর্ব্বতের জন্য স্থানটী অপ্রশস্ত হওয়ায় বড়ই অসুবিধা মনে হত; থাকবারও বিশেষ অসুবিধা, আনন্দ লাগতো না। কিন্তু এ স্থানটী ঠিক তার বিপরীত। চারিদিকে অসংখ্য পর্ব্বত থাকলেও কিন্তু স্থানটি খুব খোলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলোবাতাসের কোন অভাব নাই—স্থানটি দেখলেই প্রাণে আনন্দের লহর খেলে যায়। আমরা বরফাবৃত প্রদেশের (Glacier)-এর ভিতর প্রবেশ করলেও কিন্তু যমুনোত্তরীর মত ঠাণ্ডা অনুভব করি নাই। আমরা এ পথে ৩০ মাইল পূর্ব্ব হতেই বরফের পাহাড়ের নীচে বাস করতে আরম্ভ করেছি। কাজেই ৩০ মাইল বরফের ভিতর এলেও তত ঠাণ্ডা লাগে নাই, বোধ হয় চারিদিক খোলা এবং আলো-বাতাস-রৌদ্রই এর কারণ বা তীর্থেরই মাহাত্ম্য।

* শ্রীশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দেবমন্দিরগুলি স্থাপন করার পর অনেক দিন সংস্কার অভাবে জীর্ণ শীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা অমরসিংহ থাপা

কর্ত্তৃক মন্দিরগুলি সংস্কৃত হয়েছিল। তার পর অনেক দিন অতীত হওয়ার পর রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা স্বর্গীয় মাধু সিংহজী মহারাজ দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে সমুদয় মন্দিরটী খুব ভাল রূপ ভাবে সংস্কার করে দিয়েছেন। মন্দিরটী সংস্কার কর্‌তে দশ বৎসর লেগেছিল। বর্ত্তমানে মন্দিরটী দেখে পুরাতন মন্দির বলে কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন মন্দিরের দ্বার খোলা হয়। এবং কার্ত্তিক মাসের দীপাবলীর সময় দ্বার বন্ধ হয়। মন্দির বন্ধের পর পাণ্ডাদের বাসস্থান মুখু বা মঠ গ্রামে ভাগীরথী গঙ্গা মাতাজী সঙ্গীয় সমুদয় দেবদেবী সহ আগমন করতঃ ছয় মাস পূজাদি লাভ করেন। উক্ত ছয় মাস অপর্য্যাপ্ত বরফ পড়াতে মন্দিরগুলি বরফাবৃত অবস্থায় থাকে। ঠিক বদরীনারায়ণেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের দ্বার বন্ধ করার সময় একটি বড় প্রদীপ মন্দিরের ভিতর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং যে দিবস মন্দিরের দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হয়, সেই দিন সেই ছয় মাস পূর্ব্বের প্রজ্জ্বলিত দীপ-জ্যোতিঃ দর্শন করার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। পাণ্ডাগণই মন্দিরের পূজাদি সম্পন্ন করে থাকেন। এখানকার পাণ্ডাগণ অতি সৎলোক, নির্লোভী, শিক্ষিত, সভ্য-ভব্য; যমুনোত্তরীর পাণ্ডাদের ঠিক বিপরীত। আমাদের পাণ্ডার নাম মানদত্ত (কায়েস্থ নয়, ব্রাহ্মণ) তাঁর দুটি ছেলে রুদ্রেশ্বর ও মহেশ্বর। তাঁর ঠিকানা—পোঃ উত্তরকাশী, গ্রাম মুখু মঠ, পটী টকনোর, জিলা টিহরী গাড়োবাল। গঙ্গোত্তরীতে আমরা এ পাণ্ডা-মহারাজের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম, এ জন্য তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। এঁর চাহিদাও বেশী নয়, যে যাহা স্ব-ইচ্ছায় দান করেন, তাতেই তুষ্ট।

উপরোক্ত মন্দিরগুলি ছাড়া ভৈরবজীর মন্দির ও আরও কয়েকটি মন্দির আছে। স্থানটি অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; খোলা বিধায়, মশা, মাছি, পিশু, ইন্দুর প্রভৃতির উপদ্রব নাই, কিন্তু কাক অনেক আছে। তারা বিশেষ কোন অপকার না কর্‌লেও আমাদের বৃন্দাবনের মাতাজীগণের একটি ছোট তেলের বাটী একবার অপহৃত হয়েছিল। পথে আর কোথাও কাক দেখি নাই।

ভাগীরথী গঙ্গা পূর্ব্বদিক হতে পশ্চিমদিকে প্রবাহিতা। জল গভীর না হলেও স্রোত অতি প্রবল। গঙ্গার পরপারে যাবার জন্য ভাগীরথীর উপরে ৩টি সরু কাঠ ফেলে রেখেছে, তার উপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাগীরথী গঙ্গা পার হয়ে, বিকেলে একজন বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে (ইনি আমাদের সঙ্গে গোমুখী গিয়েছিলেন—গিরিধারী বাবাজী) ভাগীরথী গঙ্গার অপর পারে বেড়াতে গেলাম। অনেক ভূর্জ্জপত্র গাছ ও চীরগাছরূপী দেবদারুর গাছে তথা পর্ব্বতের অতুলনীয় শোভায় প্রাণ মন মোহিত হয়ে গেল। মাঝে মাঝে নানাপ্রকার অসংখ্য ফুল ফুটে আছে তার স্বাভাবিক মৃদু-মধুর সৌরভে চারিদিক আমোদিত করে রেখেছে; কাঁটাগাছও যথেষ্ট আছে। এপারে আসার উদ্দেশ্য—গোমুখী যাবার পথের সন্ধান নেওয়া। প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম, পথ কোন দিকেই নাই। চারিদিকে নানাপ্রকার অসংখ্য ছোট-বড়, কাঁটা-গাছ এবং উচ্চ পর্ব্বতমালা।

গঙ্গোত্তরীতে তুলসী-পাতা দ্বারা গঙ্গা-মায়ের অর্চ্চনা হয়ে থাকে। বাংলার তুলসী সেখানে পাওয়া যায় না। সেখানে এক প্রকার বনতুলসী হয়, দেখতে অনেকটা এই তুলসীর মতই বটে, তবে সুগন্ধ বেশী। বদরী-নাথেও এই তুলসী দ্বারাই তাঁর পূজাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এপারে গাছের আড়ালে পর্ব্বতের কোণে একটি ছোট ধর্ম্মশালা। তাতে তিনজন সাধু-মহাত্মা অবস্থান করেন; তন্মধ্যে একজন সাধুকে দর্শন করে খুব আনন্দ হ'ল। তিনি খুব কম কথা বলেন, বোধ হয় মৌনী। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই কেবল হাসেন। উলঙ্গ অবস্থায় কোন জামা-কাপড়াদি ব্যবহার না করেও এমন শীতপ্রধান দেশে তিনি বেশ আনন্দে বিরাজ কচ্ছেন। শীতের জন্য কোন প্রকার কষ্ট হচ্ছে বুঝলাম না, মনে হ'ল যেন তাঁর শরীরজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। ধীর, স্থির ও শান্ত মূর্ত্তি। তিনি ৫ বৎসর যাবৎ গঙ্গোত্তরীতে অবস্থান করছেন। যখন গঙ্গোত্তরীর মন্দিরাদি বরফ পড়ার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন পাণ্ডাদের গ্রামের পার্শ্বেই পর্ব্বতের গুহাতে অবস্থান করেন, আবার উক্ত মন্দিরাদি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এসে উপনীত হন। আহারাদির জন্য কখনও কাহারও নিকট যান না। যদি কেউ কোন জিনিষ তাঁকে খাবার জন্য প্রদান করেন, তিনি তা'হতে সামান্য আহার করেন, নতুবা আহার করেন না; সেদিকে তাঁর কোন খেয়ালই নাই। স্থানীয় লোকদের নিকট জিজ্ঞাসায় জানলাম, তাঁর নাম **স্বামী ভূমাশ্রম**। তিনি সদানন্দময় সিদ্ধ মহাপুরুষ; কোন্ দেশে, কোন্ জাতে তাঁর জন্ম হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করেও তার কোন উত্তর পাই নাই।

আরও একজন মহাপুরুষ গঙ্গোত্তরীর এদিকেই অবস্থান করেন, তাঁর নাম **স্বামী কৃষ্ণাশ্রম**। তিনি কখন যে কোথায় থাকেন, কিছুই ঠিক নাই। তিনিও নাকি এঁর মত সদানন্দময় সিদ্ধ মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁর দর্শন লাভ করা অতীব সৌভাগ্যের কথা। তাঁর দর্শন আমরা পাই নাই; কোথায় আছেন কেউ জানেন না। সন্ধ্যা হওয়ায় আমরা শীঘ্র গঙ্গার এপারে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম।

এখানে কয়েকটি ভাল ভাল ধর্মশালা আছে, সবগুলিই প্রায় বাবা কালীকম্বলীবালার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কেবল একটি মাত্র ধর্ম্মশালা জয়পুরের মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত। হৃষিকেশ ও উত্তরকাশীর মত উপরোক্ত ছত্রশালা হ'তে সাধুদের সকাল বেলা পাকা খাবার ও কাঁচা খাবারও দেওয়া হয় এবং গরীব যাত্রী ও সাধুদের শীতবস্ত্র কম্বলাদি এখানে অবস্থানকালীন কর্জ্জ দেওয়া হয়। আমি আগামী কাল বিপদসঙ্কুল পথে গোমুখী যাব, মনে মনে স্থির করে রেখেছি এবং সেজন্য পাণ্ডার মারফৎ নানা সংবাদাদিও জোগাড় করেছি। পাণ্ডাজী মহারাজ "সোণা" নাম্নীয় একজন পাহাড়ীকে আমার সঙ্গে পথ প্রদর্শকরূপে যাতায়াতের জন্য ১০৲ দশ টাকায় ঠিক করে দিলেন। এ পাহাড়ী কুলিটী অতি ভাল লোক। তাকে খোরাক দিবার চুক্তি ছিল না। কিন্তু তার ব্যবহারে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম যে, পথে তাকে সমুদয় খোরাক দিয়েও পরে বকসিস দিয়াছিলাম। উক্ত সোণা নাম্নীয় কুলিটি প্রতি বৎসরই গঙ্গোত্তরীতে উপস্থিত থাকে। যদি কোন লোক গোমুখী দেখতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা যেন খোঁজ করে এই কুলিটিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হন; বিশেষ উপকৃত হবেন, সে জাতিতে নীচ হলেও তার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ।

আমার গোমুখীর যাবার কথা শুনে আমার দলের সকলেই বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন। এমন কি সকলেই আমার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে আরম্ভ করে দিলেন,—সে ঝগড়া বিবাদ অবশ্য শত্রুতা নয়—মায়ার ফাঁদে বা স্নেহের ডোরে আটকান। আমার মঙ্গল কামনাতে সকলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেও কিন্তু আমি অটল। পাণ্ডাজী মহারাজও অন্যান্য লোকের দ্বারা নানাপ্রকার বিভীষিকা ও বিপদাদির কথা নানাপ্রকার উৎকট ভাষায় আমাকে বললেও আমি স্থির! যেরূপেই হউক যাবো, সংকল্প দৃঢ়! আমাকে যতই বাধা দিচ্ছিল, আমার যাবার জিদ্‌টা যেন ততই প্রবল হচ্ছিল। আমার সংকল্প নষ্ট করার জন্য এবং

নানাপ্রকার বাক্‌বিতণ্ডার জন্য, রাতে কেউ পাক পর্য্যন্ত করলো না—কাজেই আজ রাত মানসিক-আহারেই কাটাতে হলো। সকলেই ভয় দেখালো,—"তুমি গোমুখী যাবার সময় তোমার জিনিষ-পত্র সব সঙ্গে নিয়ে যেও, আমরা কালই এখান হ'তে কেদার-নাথের পথে রওনা হ'ব; সুতরাং তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।" তাতেও আমি রাজি হলাম।

আজ প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিনিদ্রভাবে চিদানন্দজীর সঙ্গে গোমুখী যাওয়ার সম্বন্ধে নানা প্রকার বাক্যালাপ হলো। তাঁর ইচ্ছা—"এবার ফিরে যাওয়া যাক, আর একবার আসা যাবে গোমুখীর জন্য।" অর্থাৎ কোনরূপে আমাকে যেতে না দেওয়া, কিন্তু আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ—যাবোই। তাঁকে সমস্ত রাত তেজস্বিনী ভাষায় নানা কথা বলে বুঝানোর পর, সকালে উঠে তিনিও যাওয়া স্থির করলেন। হরিদাস ভায়া আমার পার্শ্বেই শুয়েছিল, সেও চিদানন্দজীর সহিত বাক্যালাপ শুনে এবং বিশেষতঃ আমার অনুরোধে যাওয়া স্থির করলো। তাঁরা না গেলেও যে আমার কোন ভয় ছিল তা' নয়, তবে তাঁরা আমাকে যেতে বাধা দিচ্ছিলেন বলেই, আমি উল্টো তাঁদেরই উৎসাহ দিচ্ছিলাম, যাতে তাঁরা আপন সংকল্প ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যান। যা হোক, গোমুখী যাওয়া স্থির হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

তরুণ-প্রাণ

—(*)—

যখন বন্যার জোয়ার আসে, তখন কালাকাল, হিতাহিত বিবেচনা করিতে সময় লয় না। আপনার বেগে সকল ভাসাইয়া চলে। কাহারও অশ্রুবর্ষণ বা সমালোচনায় তাহার বেগ দমিত হয় না। আজ তরুণ প্রাণে সেই জোয়ার আসিয়াছে। তরুণ প্রাণ আজ গুমরিয়া গুমরিয়া শুধু নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জনই করে না; আপন শক্তির, সে যতই ক্ষুদ্র হউক, বিন্দুমাত্র স্ফুরণে আজ সে দীপ্তির পরিচয় পাইয়াছে, সে রসের সন্ধান পাইয়া গৃহহারা উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা যে শত বাধায়ও দমিবার নহে, একথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছে। হয়ত বাহিরে পন্থা এক নয়, তবু উদ্দেশ্য সবাই বুঝিতেছে। আজ হোক্, কাল হোক্, একদিন যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

সেণ্ট পল বলিয়াছেন—"আমরা রক্ত-মাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না। আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা পৃথিবীতে অন্ধকারের অধিষ্ঠান; আমাদের সংগ্রাম অক্ষম স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে।" অক্ষমতার পরিহারে যুবশক্তিই বার বার কোমর বাঁধিয়াছে। বেশী বেশী ভাবিয়া-চিন্তিয়া, রহিয়া সহিয়া করা তাহার হইয়া উঠে না। বিশেষতঃ যেটা সে অন্যায় বলিয়া বুঝিবে, তাহার প্রতিবিধানে যৌবনরক্ত আপনি মাতিয়া উঠে। বুঝিয়া দেখিয়া ক্ষমা করিবার ধৈর্য্য সব সময়ে তার হয় না। হয়ত এটা তাহাদের ভুল। কিন্তু যুবকপ্রাণে ভুলের শাস্তি গ্রহণের মত শক্তি ও অবসরের অভাব হয় না। 'তরুণের স্বপ্নে' বলে—'তাহারা অনন্ত পথের যাত্রী বটে, কিন্তু অচেনা পথই তাহারা ভালবাসে—অজানা ভবিষ্যৎই তাহাদের

নিকট অত্যন্ত প্রিয়। তাহারা চায় "the right to make blunders" অর্থাৎ ভুল করিবার অধিকার। তাই তাহাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, তাহারাও অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষীছাড়া। কিন্তু ইহাতেই তাহাদের আনন্দ—এখানেই তাহাদের গর্ব্ব। যৌবন সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষীছাড়া। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় তাহারা ছুটিয়া চলে—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্য্যন্ত অবসর তাহাদের নাই। ভুল করে, ভ্রমে পড়ে, আছাড় খায়—কিন্তু কিছুতেই তাহারা উৎসাহ হারায় না বা পশ্চাৎপদ হয় না। তাহাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ তাহারা অবিরামগতি। অতি বিবেচক প্রাণ অবশ্য এই চটুল গতির পিছনে মহাভয়ের আবিষ্কার করিয়া সতত ঐ অবিরামগতি রোধ করিয়া মঙ্গলের দিকে নিতে চান, কিন্তু যে উন্মাদ গতিতে তাহারা চলিয়াছে, দুর্ব্বল বাহুর সাধ্য কি যে তাহাকে ঠেকাইবে?

জগতের ইতিহাসে যুবশক্তির শত উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় করিয়াই ক্রমশঃ নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব দেশে আসিয়াছে যেখানে লাভ, সেখানেই প্রথমতঃ কিছু না কিছু ক্ষতি অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিছু না দিলে পাওয়াও যায় না। তাই তরুণ প্রাণের শত ভুলভ্রান্তি থাকিলেও সেটুকু বাদ দিয়াও যে উদ্দাম প্রচেষ্টায় সে আত্মাহুতি দেয়, বোধহয় উপর হইতে ভগবানের বিচারে ভুলভ্রান্তি হইতে সেই আত্মাহুতিরই মূল্য বেশী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়—অর্থাৎ তাহারই শেষ জয় ও পুরস্কার লাভ ঘটে।

যেখানে প্রাণ শুধু আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া সমগ্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, বৃদ্ধও সেখানে যুবকের উৎসাহ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া না পড়িয়া পারেন কি? কেননা অহং যত ক্ষুদ্রত্ব ভুলিবে, ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তত তার শক্তিলাভ হইবে। স্বাভাবিক আনন্দময় প্রাণ যুবকের পক্ষে সমষ্টির জন্য ব্যাপ্ত হওয়া তো নিতান্তই স্বাভাবিক।

এই আনন্দময় প্রাণের শক্তিও বহুধা উৎসারিত। খোলা জায়গায় যেমন বৃহৎ বিটপী আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক হইতেই আলো-বাতাস সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইতে চায়, যৌবনের ধর্ম্মও তেমনি চতুর্দ্দিকে প্রসার লাভ করা। জীবনে যদি অন্ততঃ কিছুদুর পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না হয়, তবে সে জীবনে একটা ন্যূনতার দুঃখ থাকিবেই। আর শেষ পর্য্যন্ত তাহা পদে পদে জানাইতে থাকে যে এদিকে তোমার সময় মত দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত উচিত ছিল। এখন অসময়ে তার পূরণ হওয়া কঠিন। এই যে সময় মত তাহাকে বিকাশের সুযোগ দেওয়া, এইটাই পরিণত তরুণের দায়িত্ব ও একান্ত কর্ত্তব্য।

তরুণ প্রাণ মাতিয়া উঠিবেই—ক্ষমাশীল পরিণতের মর্ম্মসিঞ্চিত স্নেহ তাহাকে আপ্যায়িত, মুঞ্জরিত, ক্রমে ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিবার অবকাশ প্রদান করুক।

দুইটী পক্ষ জগতে চিরকাল থাকিবে—এক পক্ষ মাতিবে, আর এক পক্ষ মাতাইবে; উভয় পক্ষে আন্তরিক সম্বন্ধ প্রগাঢ়ভাবে পরস্পরের কাছে সত্য হইয়া উঠিলেই স্বস্তি।

তরুণ প্রাণের উন্মাদনা শক্তির প্রথম প্রকাশ। পরিণামের দিকে তাকাইয়া ইহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই শ্রদ্ধার মর্য্যাদা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিছক তরুণেরই। সে ক্ষমতাও তরুণেরই অধিকৃত নয় কি? শক্তির উন্মাদনায় একদিকে যেমন তাহারা নূতন হইতে নূতনের নেশায় মাতিয়া উঠিবে, অপর দিকে তেমনি ধ্যানকুশল আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজ নিজ বীরচরিত্র গড়িয়া স্নিগ্ধ ভক্তিপূত আত্মনিবেদনে নিজকে অন্তর্ম্মুখী করিবে। ইহাই তরুণ প্রাণের সাধনা। কর্ম্ম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক সুকৌশল যোগস্বরূপ হইবে, ভাব তাহার প্রাণে মধু ঢালিয়া দিয়া সকল

কৃচ্ছ তার মাঝেও হাসিমুখে আত্মদানের প্রেরণা দিবে। সার্থক যৌবনের ইহাই অনুপম আদর্শ—কর্ত্তব্যে সে বজ্রকঠোর, অথচ প্রেমে কুসুম-কোমল—পরার্থে আত্মোৎসারণ তাহার জীবনের অনাবিল প্রকাশ। সে প্রাণময়, বীর্য্যোদ্দীপ্ত, আনন্দরসাপ্লুত। সুখ-দুঃখ তাহাকে টলাইতে পারে না। অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্তির অদম্য বিকাশে সে জীবন পবিত্র শোভাময়। নিখিল তরুণ প্রাণের আবেগের আরতিতে আজ সেই শ্রেয়োবিধাতৃ নিত্য-তরুণেরই বোধনমঙ্গল সাধিত হউক!

গোঁড়ামি

—*—

"লুকিয়ে লুকিয়ে না হয় দু'চারখানা বই-ই পড়ে, এই তো মণির দোষ? আর তো তার কোন দিকে তেমন ঝোঁকও নেই, প্রলোভনও নেই! আচ্ছা, একবার তাকে না হয় ছেড়ে দিয়েই দেখ না?"

"তুমি ছেলে-শিক্ষার কিছুই বোঝ না ধীরেন! আমি এবিষয় নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি, ভেবেছি তারপর সমাধানে এসে পৌঁছেছি। তুমি তার কি বুঝ্‌বে বল তো দেখি? তুমি দ্রষ্টা—উপদেশ দিতে খুব পটু; কিন্তু ছেলের জীবনের ভাল-মন্দ আমার উপর অনেকখানি নির্ভর করে, তাই আমাকে শুধু উপদেশ দিলেই চলবে না, কোন্ উপদেশে কিরূপ ভাল-মন্দ ক্রিয়া করবে, সে সম্বন্ধেও সুনিপুণভাবে বিচার করে চল্‌তে হবে আমাকে। কাজেই তুমি স্বাধীনতা দিতে বললেও আমার পক্ষে সে স্বাধীনতা দেওয়া সহজ নয়। কেননা আমি জানি, অনেক ছেলের জীবন নষ্ট হয়েছে শুধু এই প্রশ্রয় দেওয়ার দোষে। হয়ত অভিভাবক যদি আগ থেকে একটু সাবধান হয়ে চলতেন, তাহলে ছেলের এরূপ শোচনীয় চরিত্রহীনতা তাদের দেখতে হত না! ছেলে শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়—রীতিমত সাইকোলজি জানা প্রয়োজন!"

"সাইকোলজি জানি না বটে, কিন্তু মণিকে আর সব ছেলের সঙ্গে সামিল করাটা আমি কিন্তু দূরদৃষ্টির নিতান্ত অভাব বলেই মনে করি। আমি অনেক-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখেছি—কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য ছেলের চেয়ে মণির ঢের বিশেষত্ব রয়েছে। এই বিশেষত্বের দরুণই তাকে দিয়ে আমার অনেক আশা-ভরসা হয়। আমার মনে হয়, যাদের জীবনে একটা সুদৃঢ় আত্মবৈশিষ্ট্য রয়েছে, বিচিত্র পথের টানে পড়েও তারা আসল আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে আপন পথ বেছে নিতে পারে। কাজেই আর সব ছেলে যে সব বই পড়ে নষ্ট হয়েছে, মণিরও যে সেই দুর্দ্দশা হবে, তার কি মানে আছে? আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—মণি জান্‌তে চায় অনেক কিন্তু তার মাঝে স্বভাবতঃই একটা সংযমশক্তিও রয়েছে। অর্থাৎ সম্মুখে প্রচুর আয়োজন দেখে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে যায় না, যাচাই করার ক্ষমতা তার শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকে। সে পড়ে অনেক, কিন্তু বিচারশক্তি দ্বারা বাজে মালকে বয়-কট করে কেবল সার অংশই সে গ্রহণ করে। আমি যে তাকে একটু স্বাধীনতা দিতে বলি শুধু তার এই আত্ম-বৈশিষ্ট্য দেখে।"

"শুন্‌লাম তো তোমার বক্তৃতা, কিন্তু বলি ধীরেন, ছোটবেলায় যে সংস্কারটা দৃঢ়রূপে চিত্তের মাঝে ছাপ রেখে যায়, শেষে কি তার দাগ মন থেকে মুছে যাওয়া এত সহজ? তুমি কি বল্‌তে চাও—

মন্দের কোন সংস্কারই তার চিত্তে ছাপ রেখে যাবে না? এই বয়সেই কি ছেলেরা এত নির্লিপ্ত-নির্ম্মুক্ত উদার আকাশবৎ হয়ে যেতে পারে, যে খণ্ড খণ্ড মেঘ তার বুকের কাছ দিয়ে খেলে গেলেও তাতে তার কোন আসে যায় না? আমি বলি এই বয়সে ছেলেদের অতিমাত্রায় বিশ্বাস করা—আর তাদের পতনের পথকে সুগম করে দেওয়া একই কথা। এ সময় কড়া নজর রাখতে হয় তাদের উপর, তা না হলে তারা নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বনাশ করে বসে!"

"আমি তো তোমার কথা অস্বীকার কর্‌ছিনে—কিন্তু তুমি কি "ব্যতিক্রম" বলে একটা কথাকে স্বীকার কর না? ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া সব অভিভাবকেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু সে শিক্ষার প্রণালী যে একরকম এবং সব ছেলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য হবে, তার কি মানে? বোধশক্তি, বিচারশক্তির উন্মেষ সবার ভিতর সমকালে এবং সমভাবে হয় না। কাজেই শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীরও ব্যতিক্রম রয়েছে। মণি আর সব ছেলের মত নয় বলেই, অন্যান্য ছেলের সঙ্গে যাচাই করে তার উন্নতির পথকে অবরুদ্ধ করে রাখাটা আমি সঙ্গত মনে করি না। অবরোধ করে রাখাটা অনেকের পক্ষে কল্যাণকর বটে, কিন্তু মণির পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর বলে মনে করি। কেননা সে যে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে—পথের প্রলোভনে তার মন ভুলবার নয়। তার জীবনের লক্ষ্য তার কাছে স্পষ্ট—সে যা পড়ে, যা দেখে তার মাঝেই সেই আদর্শ এবং সেই লক্ষ্যকেই অনুসরণ করে চলে। লোভীকে প্রলোভনের মাঝে রেখে বিশ্বাস নেই, কিন্তু সংযমীর পক্ষে প্রলোভনের মাঝেও কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি যে শুধু মণির গুণ কীর্ত্তন কর্‌ছি তা নয়, ছোট-খাট ব্যাপারেও কি তার উদারতা লক্ষ্য করোনি? এতটুকু ছেলে, অথচ তার সর্ব্বত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখে আমরাও অবাক্ হয়ে যাই কোন কোন সময়। সে দিন কি একটা বই পড়ে এসে মণি বল্‌ছে, 'সমস্তটা বই পড়ে শুধু আমি কয়েকটা লাইন পেলাম শিক্ষণীয়। সে কয়েকটা লাইন কি? না, "Never speak ill of any one, refuse to listen when any one else speaks ill of another, but gently say: Perhaps this is not true, and even if it is, it is kinder not to speak of it." এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, আরও অনেক বই পড়ে সে এমনি ভাবে সমালোচনা করেছে শুনতে পেয়েছি।"

"আর কিছু না ধীরেন, তোমার এ জায়গায়ই সবচেয়ে বড় ভুল যে তুমি মানুষকে অতিমাত্রায় বিশ্বাস কর। মানুষের বাহির ভিতর যদি এক হত তাহা হলে এই পৃথিবী কবেই Kingdom of God হয়ে যেত। কিন্তু তা কি এতই সহজ ভাই? আত্ম-গোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে মানুষের; মানুষ যা নয়, বাইরে নিজকে ঠিক তাই প্রতিপন্ন করতে পারে! কাজেই ছেলেদের কাছে ছেলেমি থাকবেই। প্রথম বয়সেই তাদের এত লাই দিলে শেষে পরিণামফলটা অভিভাবকদেরই ভুগতে হয়। আমি চারিদিক ভেবে-চিন্তেই ছেলের শাসন বিষয়ে একটু কড়াকড় হয়েছি। আমি জানি, ছেলেদের প্রথম জীবনটা যদি কোনমতে সংযম এবং বিধি নিয়মের অনুবর্ত্তনে গঠিত করে তোলা যায়, তাহলে শেষে আর কোন দিকে কোন পতনের আশঙ্কা থাকে না। এই জন্যই ছেলেদের প্রথম বয়সে লেখা-পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু ধ্যান-ধারণাও যাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা আমি অনেককেই বলে থাকি। কেননা চরিত্রের উৎকর্ষ শুধু বই পড়লেই হয় না, বইয়ের মাঝে যে সব নীতি-রচনা আছে, তা জীবনের মাঝে যাতে ফলিয়ে তোলা যায় তার একটা বাস্তব শিক্ষারও প্রয়োজন। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেদের চঞ্চল মনকে ঠাণ্ডা করার উপায়ই হল, কতকগুলি সুসংস্কার অর্জ্জনের সাহায্য করা।

এইজন্য ছেলেদের শিক্ষককে অনেক দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে চলা প্রয়োজন। শিক্ষকের জীবনের আদর্শ—ছেলেদের জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মন তো চঞ্চল আছেই, আর মনে তো কত কিছুই চায়; তা বলে অবিবেচকের মত মনের সব কামনাকেই কি পূরণ করতে হবে? তোমার কথার সঙ্গে তো আমার কোনও বিরোধ নাই দেখছি, তবে আমার বক্তব্য এই যে, অধিকারী বুঝে ব্যবস্থার একটু অদল-বদল হলে কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ এতে যে ছেলের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল তাদের উন্নতির পথে ঢের সাহায্য করা হয়। সাধারণের দরুণ একটা বিধি তো থাক্‌বেই, তার মাঝে আবার ব্যতিক্রমও থাকবে; চোখের সামনে ব্যতিক্রম দেখেও কি ব্যতিক্রম স্বীকার করবে না? এখনও তো অনেক ছেলে আছে যারা মণিরই সম-বয়সী, কিন্তু তাদের ভিতর তো অধ্যয়নস্পৃহা এত প্রবল নয়, তারা ক্লাসের routineমত পড়া শেষ করেই খেলা-ধুলায় মত্ত, কিন্তু মণির এতে তৃপ্তি হয় না। তার জীবনের লক্ষ্য জ্ঞানার্জ্জন, তাই যেখানে সে যে বই দেখে (হয়ত কোনটা বা তেমন বুঝলেই না) তার মাঝেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতে চায়। কত ভাল শান্ত শিষ্ট ছেলেকে বলে-কয়েও পড়ায় বসান যায় না, আর মণি নিজের চেষ্টায় এত বাধা-বিপত্তির মাঝ দিয়েও আপন লক্ষ্যে অচল-অটল। কাজেই তার যে একটা বিশেষত্ব আছে, এ তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। তারপর এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, এই যে আমরা এত বিধি-নিষেধ আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন করি, এর মূল লক্ষ্য কি?"

"না ভাই ধীরেন, তোমাকে আমি কিছুতেই বুঝাতে পারব না। মোট কথা, ছেলেদের প্রশ্রয় আমি কিছুতেই দিতে পারব না, এ নিয়ে তুমি যতই কেন ওকালতী কর না! স্বাধীনতা দেবারও একটা বয়স আছে। কোন-কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। দু চার খানা বই না পড়লেই যদি সে এমন চঞ্চল হয়ে উঠে, তার দরুণ তোমাদের কাছে পর্য্যন্ত নালিশ করে, তা হলে তার কি সংযম হল? যাক, তোমার কাছ থেকে কথাটা জানতে পেরে বেশ ভালই হল। কাল থেকে Librayর চাবিটা আমি নিজ হাতেই নিচ্ছি। একমাত্র পড়ার বই ছাড়া আর কোন বইই যেন পড়্‌তে না পায়। এত অল্প বয়সে—এত সব জানার ঔৎসুক্যটা তো ভাল নয়?

কয়েকটী কথা

—•—

সাধনার প্রথমেই বাক্‌সংযম। বাক্যব্যয়ে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় অন্য কিছুতে তত হয় বলে মনে হয় না। ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ যা কিছু বল ঐ বাক্যনিরোধের সাহায্য ছাড়া কিছুতে সফলকাম হওয়া যায় না। বাক্য ব্যয় দ্বারা নূতন নূতন প্রতিভার স্ফূরণ হতে পারে, কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে বহুমুখী হয়ে পড়ে। যেমন বাক্যব্যয়ে একাগ্রতা নষ্ট হয়, তেমন বহু শ্রবণেও একাগ্রতা নষ্ট হয়। বহু দর্শনও তেমনি স্থৈর্য্যনাশক। বহু দর্শনে, বহু চিন্তায় বা বহু বাক্যব্যয়ে জেগে থাকা যায় চিত্তের চঞ্চলাবস্থা নিয়ে। ওতে আত্মা জাগবার পক্ষে বড় বাধা জন্মায়। জেগে থাকতে হবে—অবিরত আত্ম ধ্যানে

মগ্ন হয়ে, আত্মাকে জাগাবার জন্য। এলোমেলো চিন্তা দ্বারা তা' সম্ভবপর নয়। চিত্তের একাগ্রতা চাই, এক তত্ত্বের অভ্যাস চাই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা, তবে হবে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ, পরে জাগবেন আত্মা।

আমাদের যত ইন্দ্রিয় রয়েছে সবগুলিই সাধারণতঃ বহির্মুখী। এই বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করতে হবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে আপন খুসীমত স্ববশে রেখে দরকার মত খাটিয়ে নেবার শক্তি আয়ত্ত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে না থাকলে সর্ব্বদাই ওরা ছটফট্ করে চিত্তের অশান্তি উৎপাদন করে। এক তত্ত্বের অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত শান্ত হলে তোমার কামনাগুলি আয়ত্ত হবে। বুদ্ধির তেজে, প্রতিভার দীপ্তিতে তোমার সামনে ইষ্ট লাভের পথ আলোকিত হয়ে উঠবে। সেই রাস্তা ধরে তুমি বরাবর আপন লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে উন্নত স্তরে উঠ্‌বার নূতন নূতন সঙ্কেত পাবে। তখন তোমার কল্পনা জল্পনা ও চিন্তা করবার অবসর মোটেই থাকবে না। অফুরন্ত প্রাণের স্ফুরণে তোমাকে কেবল এগিয়ে যেতে বাধ্য করবে। ঐ অবস্থায় তোমার রিপুর উত্তেজনা কিছু মাত্র থাকবে না। আপনা হতে সব রুদ্ধ হয়ে যাবে। ঐ রিপুগুলি তখন তোমাকে পরম বন্ধুর ন্যায় লক্ষ্য পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একদিন হয়ত তারা তোমার শত্রু ছিল, আজ তারা তোমার পরমাত্মীয়।

যেমন চিত্তের স্থৈর্য্য চাই, তেমনি দেহেরও স্থৈর্য্য একান্ত প্রয়োজন। মনের সঙ্গে শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তুমি একাসনে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারবে না। একটু বসলেই পায়ে টন্ টন্, মাজাব্যথা আরম্ভ হবে যখন, মনও মহা চঞ্চল হয়ে উঠবে। তখন কিছুতে ধ্যান জপ করতে রাজি হবে না সে কেবলই সুযোগ খুঁজতে থাকবে, আচ্ছা! এখন না হয় থাক্। শরীরের যে কোন অংশে একটু ব্যথা অনুভব হবে, সেখানেই মন চলে যাবে। আসন দ্বারা দৈহিক স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা সাধিত হয়ে থাকে। আসন অভ্যাসের সময় মন যাতে শরীরের স্থানে স্থানে চলে না যায়, তার জন্য রূপ-ধ্যান দ্বারা মনকে দেহ হতে সরিয়ে রাখতে পারলেই দেহে হয়ত একবার বেদনা হল আবার খানিকক্ষণ ঐভাবে বসে থেকে বেদনাটিকে সহ্য করে নিতে পারলেই একটা সহ্য-শক্তি জন্মিয়ে থাকে, সহজে চিত্ত আর বিচলিত হয় না। আসন অভ্যাসের সময় মন যাতে শরীরের স্থানে স্থানে না আসে তার জন্য রূপের ধ্যান দ্বারা মনকে দেহ হতে সরিয়ে রাখতে পারলেই দেহে হয় ত একবার বেদনা হল, আবার খানিকক্ষণ ঐভাবে বসে থেকে বেদনাটিকে সহ্য করে নিতে পারলেই একটা সহ্য-শক্তি জন্মিয়ে যাবে; সহজে আর চিত্ত বিচলিত হবে না। এই সহ্য-শক্তিই তিতিক্ষা। তিতিক্ষা অর্জ্জনের জন্য আলাদা করে অন্য সাধনার কোনও প্রয়োজন নাই। তিতিক্ষা দ্বারা যাহা পারা যায় না এমন অসাধ্য কর্ম্ম দুনিয়ায় নাই।

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ একই চিন্তাপ্রবাহকে চালিয়ে নেওয়ার নাম ধ্যান। ধ্যান করতে হলেই রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির সাম্যাবস্থার প্রয়োজন। মনে কর, একটা শব্দ শুনলে; তখনই মন সে শব্দের দিকে চলে গেল এবং ব্যাপার জানবার চিন্তা জুড়ে বসল। ঠিক এমনি আরও কত দিকে মন বিচলিত হয়ে পড়তে পারে। এইজন্য চাই ঐগুলির শুদ্ধি, একনিষ্ঠতা। ঠিক তেমনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিরও সংযত ব্যবহার প্রয়োজন। যেমন—গায়ে একটা মাছি বসল বা পোকায় কামড়াল অমনি হাত সেখানে চলে গেল। এতেও চিত্ত চঞ্চল হয়ে পড়ে। আবার প্রাণাদি ব্যাপারেও তেমনি। ধ্যানে চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিও রুদ্ধ হয়ে যাবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে দেহ পাষাণবৎ নিশ্চল হয়ে যাবে। তখন দেহের উপর অত্যাচার অবিচারে কোনও অনুভূতি জাগবে না। মাত্র থাকবে একটা চেতনা, আমিত্ব বোধ, আমি আছি আর এই দেহ

আছে। আমি তা হতে আলাদা। এ অবস্থায় এই ভাব দীর্ঘকাল চললে পর—দেহ রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবহারের অভাবে দেহটা যথাসময়ে নষ্ট হয়েও যেতে পারে, যদি দেহাভিমান ফিরে না আসে।

দৈহিক স্থৈর্য্যের জন্য দেহ-শুদ্ধির প্রয়োজন। খাদ্যের দ্বারাই আমাদের দেহ পোষণ হয়। খাদ্যের গুণানুযায়ী মনেরও তারতম্য হয়। যেমন বেশী ঝাল খেলে রক্ত গরম হয়, মস্তিষ্কও উত্তেজিত হয়ে থাকে, কোনও চিন্তাকে সুস্পষ্ট হতে দেয় না, তেমনি চিন্তার ফলস্বরূপ আমাদের কাজ-কর্ম্মও এলোমেলো হয় প্রায়ই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তেমনি তামস খাদ্যের দ্বারা নিদ্রালস্য প্রভৃতিতে মস্তিষ্ককে একেবারে ক্রিয়া-শূন্য করে ফেলে। তখন কোন কাজ-কর্ম বা ধ্যান ধারণা কিছুই ভাল লাগে না, কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। দেহটি চায় শুধু আরাম, কোথাও একটু কষ্ট বা পরিশ্রম স্বীকার করতে চায় না। তার জন্য প্রয়োজন সাত্ত্বিক আহার, যা দ্বারা শারীরিক অলসতা মনের প্রফুল্লভাব ও মস্তিষ্কের পূর্ণ ক্রিয়াকারিতা সাধিত হয়ে থাকে।

সদাচারের অভাবে সাত্ত্বিক খাদ্যও কার্য্যকারী হয় না। শুধু কলা, আলু পটল আর ঘি-দুধ খেলেই সাত্ত্বিক আহার হয় না। তার সঙ্গে শুচিতার ও নিয়ম-নিষ্ঠারও প্রয়োজন। মনে কর, পাক করতে করতে কুঠার বা কোদাল নিয়ে মাঝে মাঝে কাজ করতে থাকলে, এতে চিত্ত চঞ্চল হওয়ার জন্য হয়ত মশলা কম বা বেশী দিলে না হয় অর্দ্ধসিদ্ধ থেকে গেল; তেমনি খাওয়ার সময়ও খেতে বসে বাজে কথা কত মনে উঠতে লাগল, হয়ত পায়ের দিকে নজর পড়াতে দেখলে একটা জোঁকেই খাচ্ছে, এমনি চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে আহারের পরিমাণ ঠিক থাকে না। অমিত আলু-পটল আর দুধ-ঘি, তবুও পরিমাণের তারতম্যে সুখাদ্য অখাদ্যে পরিণত হয়ে তামস ভাবই বৃদ্ধি করে বেশী। তার জন্য শুদ্ধ আচারের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

এই কালে এই হয় এবং এই করা উচিত এই জানলেই আমাদের স্বভাব তৈরী হয় না। একটা স্বভাব তৈরী করতে হলে অভ্যাসের প্রয়োজন। আচারবান হতে হলে আচার্য্যের সেবার অধিকার থাকা চাই। স্বভাবটা যদি কোনও কারণে একবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তাহাকে বাগ মানান যায় না সহজে। তাই ছেলেবেলার স্বভাবই ফুটে উঠে বৃদ্ধ বয়সে। মাঝখানে মাত্র চাপাচাপি আর ঢাকাঢাকি। এই জন্য আগেকার সদাচার শিক্ষা দেওয়া হত আদর্শ গুরুগৃহে ছেলে পাঠিয়ে। আগেকার গুরু ছিলেন ব্রহ্মর্ষি। তাই তারা ব্রহ্মকে ধারণা করবার মত উপযুক্ত শিক্ষাই ছেলেকে দিতেন। ছেলেকে নিজের ভেবে-চিন্তে কিছু করতে হত না। আগেকার যুগে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যে বড় কঠিন একটা কিছু ছিল, তা কিন্তু মনে হয় না। উপযুক্ত ছেলের ব্রহ্মজ্ঞান সময়ে আপনা হতেই ফুটে যেত উপযুক্ত গুরুর গুরুগিরিতে। ঋষির পুত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শিষ্যও ব্রহ্মজ্ঞ হতে দেখা যায়। শুধু সেবা দ্বারা তা সম্ভব হত।

আজকাল আমরা আর সেবা করে তৃপ্তি লাভ কচ্ছি না। সেটা হয় সেবকের দুর্ভাগ্য না হয় উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব। সেবাদ্বারা প্রাণের আগুন নিবে না বলে সাধনপিপাসা দিন দিন বেড়েই চলছে অতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে. অথচ অক্ষমতার পুটলি একেবারে আঁটসাট। দোষটা অবশ্য সেবকের নয়, আচার্য্যেরও নয়; বুঝি এই বিধির বিধান বা নিয়তি? যদিও আমরা সাধনার অনুপযুক্ত তথাপি জলন্ত চেষ্টা দ্বারা, অধ্যবসায় দ্বারা শুধু আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে, যাদের মাঝে পিপাসা জেগেছে। উপযুক্ত গুরু পেলাম না, আচার্য্য পেলাম না, স্থান কাল পেলাম না এই আপশোষ নিয়ে ঝিমালে লাভ হবে না কিছুই। চাই অনন্ত প্রাণের স্পন্দন, আগুনের হলকা হয়ে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়া। হয় ইষ্টসিদ্ধি, না হয় সব জ্বালার অবসান—জীবন বিসর্জ্জন। চাই রোখ, আত্মবিসর্জ্জন, আর জলন্ত বিশ্বাস।

নিত্য-শিশু

—(*)—

ছেলে খেলায় হেরে কাঁদতে থাকলে মা হাসে। কেননা মা জানে খেলার হার-জিতে লাভ-লোকসানের কিছু নাই। আমরাও যখন সংসারের মান প্রতিপত্তি নিয়ে হারজিতে কাঁদি বা আনন্দে হাসি, তখন জগৎ-জননীও হাসে। কিন্তু খেল্‌তে ২ ছেলের যখন ক্ষিদে পায় তখন মা নিজের আঁচল দিয়ে ছেলের মুখ মুছিয়ে খাবার এনে দেয়। আমরা সংসারের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে যখন সুখ-দুঃখের উপর অনিত্য জ্ঞান এসে, অন্তর সত্যবস্তুর জন্যে বুভুক্ষিত হয়ে কান্না পায়, ত ন জগৎজননী এসে নিজের আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে অমৃতের আস্বাদ দেয়। কিন্তু আমরা অনেক সময় সংসারের সুখ দুঃখ এবং মান প্রতিপত্তির জন্যে ভগবানের ওপর দোষা-রোপ করে বলি—"আহা ভগবান আমায় কিছু দিল না।" ছেলের মা জানে ছেলের খেলার ঘর দুদিনের বই তো নয়—এতে খেলার ঘরটা বেশী মূল্যবান করে কি লাভ। আমাদের যিনি জগৎজননী, তিনি জানেন জগৎটাও একটা মস্তবড় খেলা ঘর।

অনেক সময় ছেলে খেলায় মত্ত থেকে মাকে একেবারেই ভুলে যায়, কিন্তু ছেলে যে ক্ষিদেয় কষ্ট পাবে এই বোধ ছেলের না থাকলেও মায়ের থাকে; সেই জন্যে ক্ষিদের সময় বুঝে মাই ছেলের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। ভগবান আমাদের জীবনে দুঃখ দিয়ে অভাব দিয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সোণা যত খাদে পুড়ানো যায় ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমাদেরও সংসারের দুঃখের খাদে পুড়িয়ে ভগবান আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে থাকেন। সুখ এবং দুঃখ উভয়কে ভগবানের দান বলে গ্রহণ করতে হবে, তবেই আমাদের মধ্যে ভগবৎ ইচ্ছা বিকাশ হতে থাকবে।

ছেলে যেমন খেলা-ঘরের ভাল ভাল খেলনা না পেয়ে মা বাপের ওপর অভিমান করে থাকে, আমরাও সংসারের সুখের মাত্রাটা কম হইলেও ভগবানের ওপর অভিমান করে থাকি। অনেক সময় অনেক লোক সাংসারিক সুখ ভগবানের কাছে খুঁজে না পেয়ে, সে শুদ্ধ শক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ভারত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় হিন্দুর দেব-দেবীর উপর একেবারে রেগে উঠে দেবদেবীর বংশকে নির্ম্মূল করতে চেয়েছিলেন। কেননা কালাপাহাড় বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব এবং মুসলমান নবাবের মেয়েকে বিয়ে করেও তার কুলীনত্ব বজায় রয়েছে বলে অন্তর্য্যামী দেব-দেবী প্রত্যাদেশ দিলেন না। এই জন্য কালাপাহাড় মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে হিন্দুর পাথরের প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দেবদেবীর মাহাত্ম্য নাই তাই সপ্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু কালাপাহাড় ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস হারিয়ে মুসলমান ধর্ম্ম নেওয়ায়, মুসলমানের আল্লা হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতিমাগুনো ভাঙ্‌তে প্রত্যাদেশ দিয়ে-ছিলেন কি না, সেটা কালাপাহাড়ই জানে!

হায়রে কালাপাহাড়! তুমি তোমার ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধি নিয়েই না দেবতার অবমাননা করিতে চাও একখানা পাথর ভেঙ্গে; সমস্ত জগৎটাই যে সে পরম দেবতার একখানি প্রতিমা। একখানা পাথর ভাঙ্গলে বা সমস্ত জগৎটাকে ধ্বংস করলেও যে তাঁর কিছু যায় আসে না। কালাপাহাড! তুমি তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে দেবতার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও, কিন্তু তিনি জগতের ভাল-মন্দ সমস্ত গরল পান করে নীলকণ্ঠ নাম নিয়েছেন। জগতের ভাল-মন্দ, চোর ডাকাত, সাধু-মহন্ত যা কিছু সবই যে সেই পরম দেবতাই বুকে করে রয়েছে।

আমরা চাই ধন, মান, যশ। এসব হল নিজকে গণ্ডীর মধ্যে টেনে বদ্ধ পুকুরে শেওলা ধরার মত। ভগবান হলেন শুদ্ধ বুদ্ধ, পবিত্র এবং জগতের আদিম পিতা। তিনি জানেন ধন-মান-যশ সবই অনিত্য। নিজের অন্তর দিয়ে সবাইর দাবী পূরণ করতে হবে। টাকাতে সে অন্তর খুলে না। টাকা-কড়ি এসব নিয়ে তো নিজের অহংকে বাড়িয়ে কারাগারের সৃষ্টি করা হয়। তোমরা যে আকাশ জুড়ে রয়েছ। তোমাদের আনন্দ দিবার জন্যে যে নিখিল প্রকৃতি প্রস্তুত আছে। ক্ষুদ্রেরই অভাব, যিনি বিরাট, তার কোনো অভাব থাকতে পারে না।

মা-বাপ ছেলের ভালোর জন্য একটু আধটু শাস্তি দিয়ে থাকে। এতে ছেলের যে কষ্ট হয়, তাতে মা-বাপের কষ্ট হলেও, তার মধ্যে যে ছেলের মঙ্গল রয়েছে তার জন্যে মা-বাপ ছেলের দুঃখকে মেনে নিতে বাধ্য। আমাদের দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়েই প্রভূত কল্যাণ ডেকে আনা হয়। তাই প্রবৃত্তি-মার্গে বা কামনার সম্পূর্তির আশায় ভাবনাকে ডেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। ছেলে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলা-মঙ্গল বুঝতে পারে না। তাই মা-বাপ জোর করে ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা করায়, চরিত্রগঠনে নজর দিতে হয়। ভগবানও আমাদের দুঃখ কষ্ট দিয়ে আমাদের কল্যাণ সাধন করছেন। দুঃখ-কষ্টরূপে যে মঙ্গল-মন্ত্রের মঙ্গল-হস্ত চক্রাকারে ঘুরছে, সেটা আমরা ছেলের মতই অজ্ঞ বলে বুঝিনা ভগবৎ বিধানের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে নিজের অহংশক্তিকে বড় মনে করি।

কিন্তু আমরা যতই দূরে সরে যাই না কেন, যতই ভগবানকে মন্দ বলে গাল দিই না কেন, সবই যে তাঁর করুণা। বদ্ধ জীবনকে অতিক্রম করে একদিন নিত্য মুক্ত জীবন লাভ করতেই হবে। তাঁর মহিমার কাছে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে বলি দিতেই হবে। নিজের কাছে আমরা যত শেয়া-নাই হই না কেন, তাঁর কাছে আমরা চিরদিনই তাঁর আঁচলধরা শিশু বই আর কিছুই নই।

আরণ্যক



যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রত্যেকের ভিতরেই ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ রয়েছেন। কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যেকেই মহৎ গুণবান্। যদি শ্রদ্ধা কর, যথার্থ সম্মান রেখে চল, সবাই তোমার কাছে নত হবে না কেন? নত হওয়া তো অপমানের নয়;—নত হওয়ার মূলে রয়েছে তোমার মহত্ত্বে আমার মহত্ত্বে, তোমার ব্রহ্মে আমার ব্রহ্মে কোলাকুলি!

* * *

এমন অনুভবের ক্ষেত্রে বিচরণ কর, যে অনুভবে সবার মন-প্রাণ বাঁধা। আত্ম-কেন্দ্রত্বের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা প্রতিবেশী সংসারে অলক্ষ্যে সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলে। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে পারি না যখন, তখনই তো চুলোচুলি লাগে।

* * *

সত্যস্বরূপের দিকে লক্ষ্য রেখে সংসার কোলা-

হলের মাঝেও আপন মনের নিরালা সৃষ্টি করে নাও। এরি নাম নিষ্কাম-কর্ম্ম।

* * *

ত্যাগই যজ্ঞ। আত্ম-নিবেদনই জীবনের অমৃত। স্বার্থলুব্ধ হলে তার পলে পলে মৃত্যু। অমরত্বের সুবাস ছড়াতে চাও তো ভালবাস—হৃদয় সরল উন্মুক্ত করে রাখ। বিশ্বপতির অঙ্গনে সবার সমান অধিকার। সে অঙ্গন তোমার হৃদয়ে!

* * *

যেখানে প্রেম, সেইখানেই ত্যাগ। যেখানে সংযম, সেইখানেই সৌন্দর্য্য। যেখানে তপস্যা, সেইখানেই সৃষ্টি।

* * *

কামকে বশ না করলে জীবনের কেন্দ্র আয়ত্ত হল না। অটল কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত না হলে আত্মজীবনের নিয়ন্তা হবে কি করে?

* * *

তোমার আত্মা যখন আপন ভাবে অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনি জীবন তোমার অফুরন্ত সার্থক কর্মে সুন্দর সুষম চঞ্চলতায় বিশ্বময় নৃত্য করে বেড়ায়—আনন্দ ছড়ায়। ধ্রুব-অধ্রুব যুগপৎ না হতে পারলে সত্য মিলল না!

* * *

কোন শোনা কথায় আমার তৃপ্তি হবে না,—অগ্নি-অক্ষরে বেদনাময় অনুভূতিতে আমার বুকের মাঝে সত্যের লেখা ফুটে উঠুক—আমার সমস্তখানি মন নিঙড়ে তাকে আমি রসিয়ে তুলি—এই আমার দুরাশা!

* * *

মানুষ মানুষকেই ভালবাসুক—এইটাই তার সব চেয়ে বড় জাগরণ। মানুষের মাঝে মানুষ যদি নিজকে ছড়াতে না পারে, তো ভগবান্-ভগবান্ করে ছট্‌ফটানীতে কেবল তেল-সল্‌তেই পুড়্‌বে মাত্র, সাধন-শক্তি জাগ্‌বে না।

* * *

সব কাজেরই আসল সুর প্রাণের প্রেরণা। যেমন নাকি ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে; তেমনি অনুভব আগে, বিচার পরে।

* * *

যখন কালোয়াতের কালোয়াতীর মত নিজের স্বভাবটী আয়ত্ত হয়ে যাবে, তখন হাত চল্‌বে আপ্‌নি-আপ্‌নি—তখনিই ঠিক গেয়েও সুখ, বাজিয়েও সুখ। এর আগ পর্য্যন্ত যে কত সাধ্য-সাধনা, কত ত্যাগ, কত প্রতীক্ষা, কত আশা-নিরাশার আন্দোলন—এই হট্টগোলের মাঝেই মন জমাতে হবে; আনন্দঘন মায়ামূর্ত্তি গড়ে নিয়ে সানুরাগ কল্পনায় তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; সুখদুঃখাতীত অন্তরারামে অসঙ্গবিহার করতে হবে!—তবে না তুমি সাধক, তবে না তোমার ধৈর্য্য স্থৈর্য্য শম-দম তিতিক্ষার পরীক্ষা! এ আদর্শ ভুলে যাও কেন?

* * *

নিজকে বিশ্লেষণ করতে করতেই অপরেরও তত্ত্ব পাবে। কিন্তু গোড়াতেই যদি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে কেবল পরের কথায় ওঠ-বস, তাহলেও আখেরে হয়ত ঠক্‌বে না, কিন্তু পথের মাঝে অযথা কতকটা সময় আর শক্তি যে নষ্ট হবে, এতে আর ভুল নেই।

* * *

স্বাধিকারবঞ্চিত রেখে কক্ষনো জীবন কোটানো যায় না। যার অস্তিত্ব আছে, তার যদি স্বাতন্ত্র্য না থাক্‌ল, তবে তার থাকা না থাকা সমান হয়ে যাবে যে!

—*—

ভক্ত-সম্মিলনী

[ষোড়শ-বার্ষিক অধিবেশন -১৩৩৭]

আগামী ১১ই, ১২ই, ও ১৩ই পৌষ পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ উক্ত সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্য, ভক্ত এবং আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকগণকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সম্মিলনীকে সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবার জন্য, যাঁহারা সম্মিলনীতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্মিলনীর পূর্ব্ব অধিবেশনাবলীর নিয়মানুযায়ী **৫৲ টাকা হিসাবে আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই** আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে যাঁহাদের টাকা আশ্রমাধ্যক্ষের হস্তগত হইবে না, তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করা সুকঠিন হইবে; এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জন প্রতি ১৲ এক টাকা হিসাবে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে।

সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তাহা উল্লেখ করিবেন এবং পূর্ব্ববৎ নাম তালিকাভুক্ত করাইবেন। ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য অতিরিক্ত খরচ লাগিবে না। কিন্তু তাহাদের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

মনি-অর্ডারের কূপনে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্ট লিখিত থাকা একান্ত দরকার।

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম চট্টগ্রাম-বিভাগের অন্তর্গত কুমিল্লা জেলার আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কুমিল্লা-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে আশ্রমে যাওয়ার জন্য সব সময়ে মোটরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ, চাঁদপুর ও লাকসাম অতিক্রম করিয়া কুমিল্লা ষ্টেশনে আগমন করা যায়। রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের ভক্তগণ নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম অতিক্রম করিয়া, অথবা ভৈরব ও আখাউড়া অতিক্রম করিয়া কুমিল্লা ষ্টেশনে আসিতে পারিবেন।

ভক্তগণ নিজ নিজ বিছানা-পত্র ও আলো সঙ্গে আনিবেন। অন্য কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

টাকাকড়ি ও পত্র পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ

অধ্যক্ষ—পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম

ময়নামতী, কুমিল্লা

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম প্রতিষ্ঠা

(নিম্নলিখিত সংবাদটী অনবধানতাবশতঃ যথাসময়ে প্রকাশ করা হয় নাই)—

গত ১৮ই বৈশাখ শ্রীশ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত প্রাচীন শিবালয় "জল্পেশ" মন্দিরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধরলা নদীর তীরে, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের শাখা রাজসাহী-বিভাগীয় বগুড়াস্থিত আশ্রমের অধীনে একটী জেলা-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে আমাদিগের গুরুভ্রাতা জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত কুমার-গুরুচরণ দেব মহাশয় উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজ খাসমহল হইতে আনুমানিক ৫২ বিঘা আবাদী জমি ও আশ্রম নির্ম্মাণোপযোগী ১৮ বিঘা জমি নিজ ব্যয়ে খরিদ করিয়া মঠে দান করিয়াছেন, এবং সাধারণের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়া আসন-ঘর ও সেবকদের বাসোপযোগী ৫।৬ খানা খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ সশিষ্যে উপস্থিত থাকিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আসন-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব উপলক্ষে তিন দিনে প্রায় দেড় সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুচরণ-আশীর্ব্বাদে দাতার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হউক—ইহাই আমাদিগের কামনা।

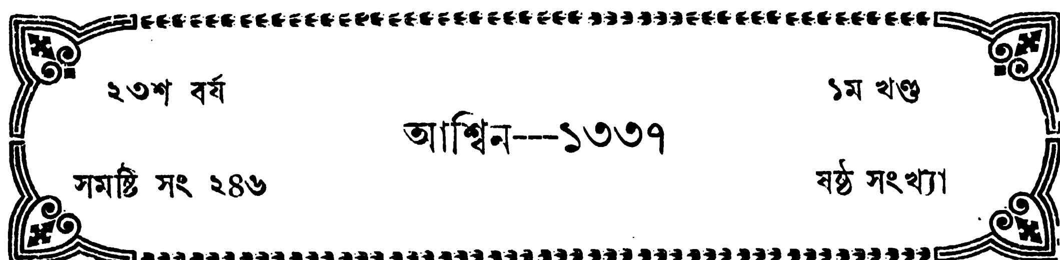
গ্রাহকগণের প্রতি

নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, ভাদ্র সংখ্যার পত্রিকাও আমরা যথাসময়ে প্রকাশিত করিতে পারিলাম না—তদনুপাতে আশ্বিন সংখ্যার বিলম্বও অবশ্যম্ভাবী। সম্ভবতঃ কার্ত্তিকের তৃতীয় সপ্তাহে আশ্বিনের পত্রিকা আপনাদিগের হস্তগত হইতে পারিবে। সুতরাং ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপনাদিগের ন্যায্য অনুযোগ নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য থাকিতেছি।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ— আর্য্যদর্পণ




২৩শ বর্ষ ১ম খণ্ড
আশ্বিন—১৩৩৭
সমষ্টি সং ২৪৬ ষষ্ঠ সংখ্যা

বোধন-প্রশস্তিঃ

—— ✻ ——

[শ্রীশ্রীসপ্তশতী—অর্গলস্তোত্রম্—১-১৪]

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্তু তে।

—অতীতের মোহস্মৃতি দূরে সরাইয়া প্রচণ্ড হৃদয়বেগে আমার ওগো শক্তি-রূপিণি, বিজয়গৌরবে আমাতে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমি আমার অন্তরের অন্তরে বিশ্বপ্লাবী মুক্তিসুধা, তীব্র আবেশে আচ্ছন্ন করিতে চাহিতেছ—ভয় করি না—তোমায় নমস্কার! ওগো আমারই হৃদয়দলিত মূর্ত্ত বাসনা তুমি। তুমিই এই তমিস্রায় তন্দ্রায় জ্যোতিঃরূপা হইয়া শুধু আমার নয়, বিশ্বহৃদয়ে প্রতিভাত হও।

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।

—মঙ্গলময়ী প্রেরণা তুমি—তোমায় নমস্কার। অকুতোভয়া, অজর অমর শক্তিরূপা হৃদি-ধিষ্ঠিতা! দুঃসহ বেদনার অন্তরালে শিবময়ী দ্যোতনা! দুর্গম জীবনপন্থায় সুশান্ত অনুভূতি, ক্ষমায় ধাত্রীতুল্যা! সকলের সকল মঙ্গল চেষ্টা সফল কর তুমি—স্বাহা স্বধা তুমি—তোমায় নমস্কার!

ওঁ মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—নিত্যলীলাময় সহজ জীবনের শাশ্বত আদর্শ দেখাইয়া দৈনন্দিন দ্বন্দ্বসকল মিটাইতেছ। আত্মজীবনের স্বয়ংধাতা হইয়া শ্রেষ্ঠ রূপে, শ্রেষ্ঠ জয়ে, শ্রেষ্ঠ যশে সার্থক হইয়া আমরা তোমায় চাই—দুর্ব্বলপ্রাণ ভিক্ষুকের মত নয়, মদন-মথন শক্তিতে শত্রুদমন সাধন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া! মহাশক্তির বিধানে যাহা শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিত, তাহা চিনাইয়া দাও! জীবনের ধ্রুবতারা তুমি, পথের আলোও তুমি!

ওঁ মহিষাসুরনির্ণাশি বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—মোহমুগ্ধ সন্ধিক্ষণের বজ্রাঘাতপ্রায় অসুরনিয়ন্ত্রণ-বিধান আমার প্রতি বরদা হইয়া প্রীতিভরে অর্পণ করিয়াছ—সৌন্দর্য্যসুধায় মাতাল করিয়াছ, বিজয়-গৌরবে অটল রাখিয়াছ, বিশ্ব ব্যাপিয়া আপনাকে ছড়াইয়াছ—ওগো আমার আত্মশক্তি, জাগ প্রাণে—শেষ অরিকে জয় করি!

ওঁ ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

হৃদয়কে দুর্ব্বল করিও না—ধর্ম্ম-অর্থ কাম-সামঞ্জস্য সহ নির্ভীক মুক্ত জীবনকে বরণ কর! ধূম্র নেত্র অন্ধ হউক—দিব্যনেত্রে চাহিয়া দেখ! নির্ভয় নিঃসংশয় রণজিৎ তুমি—অনন্ত রূপ, জয় ও যশ তোমার করায়ত্ত!

ওঁ রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—রক্তবীজের মত যে কামনাকে পেষণ করিয়া কোন মতেই দমাইতে পার নাই, এক মুণ্ড কাটিয়াছ তো অপর মুণ্ড গজাইয়াছে, নিজ হইতে পৃথক ভাবিয়া পৃথক রাখিয়া ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিন্দু বিন্দুটী পর্য্যন্ত যাহার দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয় দেখিয়া দেখিয়া আকুল হইয়াছ, তাহাকে সমগ্রতঃ গ্রাস কর—করাল বদন ব্যাদান করিয়া, নিঃশেষে তোমার বিশ্বজারক শক্তিতে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেল! তাহার যে শক্তি, তাহার যে উন্মাদনা, আয়ত্ত করিলে তাহা তোমারই শক্তি, তোমারই সাধনার সুধাময় ফলরূপে গৌরবে, দীপ্তিতে, ব্যাপ্তির প্রেরণায় চিরঞ্জীব হইয়া থাকিবে তোমার অনন্ত অনন্ত জীবনে! দুঃখ-বিপদ্-জ্বালাজয়ী ওগো আমার আত্মশক্তি, ঢাল সে মৃত্যু-বিষ আমার কণ্ঠে—মৃত্যুঞ্জয় জীবনকে প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতে একবার অন্তর্মুখ হই।

ওঁ শুম্ভনিশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—ভ্রান্ত অধিকার-গর্ব্বে দাপ্ত যারা, তাদের নিধন জীবনব্রত হে ত্রৈলোক্য-শুভদ নিত্যমুক্ত হৃদয়, তুমি কি জাগিবে না? রূপের মায়ামুক্ত অপরূপ জয়ে অরিমর্দ্দন যশোরাশিতে এ মণ্ডলীর প্রতি হৃদয় উদ্দীপ্ত করিয়া দিবে না?

ওঁ বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—হৃদয়কে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইলে, নব সৌভাগ্যে গড়িয়া তুলিলে—অন্তর্য্যামী আত্মমায়া আমার! এ কোন্ রূপে তুমি পদে পদে আমায় জয়ী করিতেছ? মনে হইতেছে এ আমার শাশ্বত গৌরব, ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলের সকল দর্প আজ পরাঙ্মুখ হইয়া নীরবে আত্মসমপণ করিতেছে!

ওঁ অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—তোমায় চিনিলাম কি? চিন্তা যে হার মানিতে চায়। কোন্ কৌশলে অমঙ্গল অহরহঃ মঙ্গল দ্বারা আবিষ্ট হইতেছে—জানি না! জানি শুধু—দ্বেষ মুছিয়া যাইবে, হৃদয় হৃদয়কে আত্মজ্ঞানে গ্রহণ করিবে, পরাভবের লজ্জা থাকিবে না, সকলই অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিবে। ঐ যে পরম সার্থকতার দ্বার আজ খুলিল! তন্ময় হইয়া ত্বদভিমুখে ধাবিত হইল যে প্রাণ, চরিত্রে তাহার যে রূপ ফুটিল, তাহা অচিন্ত্য—তাহা বরেণ্য শরণ্য! ওগো পূতদীপ্তি শক্তিপ্রীতি, তোমায় মানিলাম, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম!

ওঁ নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—ভক্তিতে আনম্র হৃদয় তোমার দুরিতার্ত্তিপ্রশমন অপর্ণামূর্ত্তির চরণ শরণ করিল; তুমি তাহাকে রূপ দাও, যশ দাও, জয়ী কর। শত্রু মিত্র সে জানে না—জানে শুধু তোমাকেই! তাহার যোগক্ষেম, হে মহাশক্তি, তুমি কি বহন করিবে না?

ওঁ স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি॥
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—প্রার্থনা বিফল হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব প্রাণের আকর্ষণ আজ অপূর্ব্বদৃষ্ট শক্তিতে হৃদয়কে বিদ্যুন্ময় পুলকে আচ্ছন্ন করিল! কিসের দুঃখ? কার ভাবনা অসুন্দর? কে অভিভূত? কে আজ শত্রুর বুকেও নিজকে বিলাইয়া দিতে পারিল না?

ওঁ চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—শক্তিসিদ্ধ হৃদয়ের সদাজাগ্রত প্রচণ্ড অভিপ্রায় চিরকাল যুদ্ধে জয়ী হয়। সঙ্কীর্ণতা থাকে না—সত্যসঙ্কল্প পূর্ণানন্দজীবনে উছলিয়া উঠে! কে তার বাধক, কে তার সাধক—তুচ্ছ সে চিন্তা অবান্তর প্রলাপমাত্র! সে আত্মসাধ্য, আত্মসিদ্ধ, আত্মনিষ্ঠ।

ওঁ দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্ দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—এই নিশ্চিন্ত সুভগ সুন্দর জীবন সকলের হউক। তুচ্ছ সুখের প্রীতির মায়া অপসারিত হইয়া পরম সুখের আস্বাদন চলিতে থাকুক্! সত্য শিব সুন্দর অনুভব অশিবকল্পনাকে মুগ্ধ করুক।

ওঁ বিধেহি কল্যাণং দেবি বিধেহি বিপুলাং প্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—ক্ষুদ্র ইচ্ছার বলি দিলাম, স্বার্থোদ্ধত উগ্রতা নত করিতেছি;—যাহা কল্যাণ, বস্তুতঃ নিখিলহিতকর, তাহারই প্রেরণা দাও। প্রাণ যেখানে জাগিয়াছে, সে মণ্ডলীতে সকলেই কি হৃদয়নিহিত আত্মশক্তিসুধায় মাতোয়ারা নয়? সৌন্দর্য্যের পূজা বীর্য্য ছাড়া কে করিতে পারে? প্রাণ কবে কোথায় হার মানিয়াছিল? আত্মগৌরব সর্ব্বাতিগ, আত্মপ্রীতি সর্ব্বানুগ হউক—বোধনপ্রভাতে আজ সেই সর্ব্বজয়ী আত্মশক্তিরই আবাহন করিতেছি। ওঁ শান্তি

—*—

শারদ-সপ্তাহে

---

(১)

আগমনীর আভাস প্রাণে বেজেছে। কি এক অভূতপূর্ব্ব অনুভবে আজকার দিনটী গেল।······

করুণার আভাস বলি কাকে?—বুকভরা শক্তির আবেগকে! যখন দেখি, একাগ্র মহিমাময় চিন্তায় অন্তর পরিপূর্ণ—কোথাও অবসাদ নাই, কিছুতেই পশ্চাৎপদ নই, বরং দুঃসাধ্য কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রেরণায় শিরায় শিরায় সতেজ প্রাণের আনন্দনৃত্য চলেছে—জীবনের সহজ প্রাপ্তিকে অন্তরের অন্তরে রেখে দেহে-মনে-প্রাণে বরঞ্চ দুর্ভেদ্য কঠিন-বর্ম্ম বাস্তবের আরাধনা কর্‌তেই ইচ্ছা হচ্ছে—তখনি বুঝি, এই তো তাঁর কৃপার আভাস—করুণাময়ীর স্নিগ্ধ সকরুণ মর্ম্মস্পৃক্ আকর্ষণে আমাতে আমার খাঁটী শক্তির জাগরণ!

যতটুকু শক্তি পেয়েছি, ততটুকুকেই যদি তন্মুখী কর্‌তে পারি, তখন তো মহাশক্তির সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। সত্যি সত্যি সাধক যদি হই তো সিদ্ধ সত্য থেকে বঞ্চিত হবার ভয় নেই—এই বিশ্বাস আজ প্রাণে খেল্‌ছে।

করুণাশক্তির আরও প্রমাণ পাই, যখন দেখি—আমি ঠেক্‌ছি না কোথাও, সব তালে তালে চল্‌ছে—যে আসরে নাম্‌ছি, অনায়াসেই বিজয়শ্রী সেখানে করগত হচ্ছে।

তোমার প্রতি স্নেহকরুণ সেই মহাশক্তির হাতে তোমার সবটুকু দিয়ে দাও।

জান না, "তোমার সবটুকু" কাকে বলে?

অভিমান, অহঙ্কার, বদ্‌খেয়ালের সর্‌ফরাজী, অপ্রভু প্রাণের স্বাধিকারমত্ততা আর অনধিকারচর্চ্চা—এই সব নিজকে নিয়ে নিজের সর্দ্দারী ছেড়ে দাও! কেবল আকুল আবেগে ইষ্টমুখী হও, প্রাণে চায় তো ব্যাকুলকণ্ঠে থেকে থেকে তাঁর নামস্মরণে সবল হও, আর অকুতোভয়ে যে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।—তোমার জীবন, অর্থাৎ তোমা হতে পৃথক্ তোমার দৃশ্য তোমার জ্ঞেয় যে তুমি, সে জীবন তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সে তার সহযাত্রীদের সাথের সাথী হয়ে জগৎপ্রয়োজনের বিচিত্র তরঙ্গে যেমন খুসী যেদিকে খুসী ভেসে যাক্। কোথাও বিন্দুমাত্র কেরামতী খাটাতে যেও না। আপ্তশাস্ত্রোক্ত 'নিরাশ' 'নিরীহ' এগুলোকে positive senseএ অনুভব কর।

একেই তো বলে—সবটুকু দিয়ে দেওয়া।

কিন্তু জেনো, এই সবটুকুর মানে হচ্ছে নকল সবটুকু—যতটুকুকে নিজের সারসর্ব্বস্ব বলে এতদিন ভুল বুঝে এসেছ, ততটুকু। এই ভ্রান্ত "সবটুকু" তো তোমার যথার্থ সর্ব্বস্ব নয়। এই ভ্রান্ত আত্মবোধকে উৎসর্গ করে দাও, আসল 'সবটুকু'তে বুক ভরে উঠ্‌বে।

আজ বুঝি করুণাময়ীর আকর্ষণে নিজের অগোচরে কখন নিজকে দিয়ে ফেলেছি—তাই সবদিক এমন অকারণ পুলকে ভরে উঠেছে!

* * *

ভালবাসা দিয়ে সংসার গড়ে তুল্‌তে হবে—তিনি যেমন করে আমায় গড়ে তুল্‌ছেন তেমনি করে। প্রাণে প্রাণে তাঁর শক্তি তাঁর ভাবের ক্রিয়া আজ সুস্পষ্ট অনুভব কর্‌ছি। মুখ ফুটে কোনদিন কেউ বলেছে কি, তাঁর কত সাধ্যসাধনার সঙ্গোপন আত্মদানের অমৃতময় ফল এ সব? মুখে কিছু বলে না, বিনিময়ে কিছু চায় না—এই তো করুণার তাৎপর্য্য!

বুঝি তখন অবুঝ্ ছিলাম। কিন্তু স্মৃতিতে ভাস্ছে তাঁর সেই প্রশান্ত মুখচ্ছবি। সে-মুখ দেখ্লেই মনে হয়, আজকার স্মৃতিতে মনে হয়—কত কথাই অন্তরে অন্তরে অবিরাম তিনি বল্তেন। আত্মহারা অন্তর নিজের অগোচরে সেই সব কথাই ধরে রেখেছিল। অন্তর তাঁকে না বুঝে কখন ভালবেসে ফেলেছিল বলেই আজ বুঝ্বার দিনে দেখ্ছি—সত্যি তাঁর ভালবাসাই আমার অন্তর্জীবন গড়ে তুলেছে! মুখের উপদেশ পাইনি কোনদিন, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উপদেশের মূল উৎসকে অন্তর্জীবনে পেয়েছি। অভাবের নিষ্পেষণে বহির্জীবন আপনি গড়ে উঠ্ছে।

কল্পনায় অতীতের সে সব কথা গাঁথা আছে। অবুঝ্ শিশুর মত কোচড় পুরে কত সে সব ঝরা ফুল কুড়িয়ে রেখেছিলাম;—জান্তাম না, কার মালা গাঁথ্ব, কি কৌশলে গাঁথ্ব। আজ মালা গাঁথ্বার দিন এসেছে। আপনা হতেই বুদ্ধি জোগাচ্ছে, কি কৌশলে কোন্খানে কি সাজাতে পার্লে কেমন মানাবে—আর কাকেই বা পরাতে হবে, তার আগমনীর সুর বাজ্ছে কাণে—আমার হৃৎস্পন্দনের তালে তালে মধুর রিণিঝিণি স্বরে কার সে নূপুরধ্বনি শুন্ছি! কেউ কোন ভুল কর্ছে না জগতে—সব কার্য্যেরই তাৎপর্য্য আছে। জানি না কিছুই, তবু ভুল হয় না কোথাও! ভারী আশ্চর্য্য এই লোকোত্তর আত্মসঞ্চার-সুকৌশল।

সমর্পণের সাধ্যসাধনা ছিল না। উদার বক্ষে অফুরন্ত অধিকার, সেখানে আমার প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ মূল্য ছিল। নিজকেই দিন দিন যেন সব দিক দিয়ে ভালো করে পাচ্ছি। তাঁর প্রভাব তো অভিভূত করেনি, বরঞ্চ সচেতনই করেছে। বিচার কর্লে বুঝি, যত আত্মনিহিত অনুভবে ব্যাপক হচ্ছি, তাঁকে ততই আরো নিবিড় করে পাচ্ছি! তিনিও যেন আমাতেই আত্মসমর্পণ কর্তে চান।

এই কি খাঁটী উদ্বোধন নয়?—আত্মার পরশে আত্মার বোধন! তাঁর আত্মা আত্ম-প্রেরণাতেই আমার আত্মাকে ফুটিয়ে তুল্ছে। সে যে কি কৌশলে, তা সর্ব্বাংশে বোধগম্য নয়। হয়ত তিনিও ইচ্ছা করেই বুঝ্তে বা বোঝাতে চান না। এমনি রহস্যময় সে লীলা!

—x—

(২)

ভাবের প্রমত্ততায় কল্পনার আতিশয্যে অন্ধ আবেগের উচ্ছ্বাস যা, তা আজ স্তব্ধ হয়ে গেল। আজ মনে হচ্ছে—নিজের ব্যক্তিত্ব হারাব না কোথাও, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে জেগে থাক্ব। আত্মার জাগরণেই ইষ্টের বোধন। নতুবা তার সার্থকতা কি?

যা মনে করে রাখি, নিজের খেয়ালে যে বন্ধন কল্পনা করি, বাস্তবে তা মুক্ত হয়ে যায়—যা ভাবি, তা হয় না, হয় কেবল হট্টগোল, হয় শুধু পাগ্লামী, চলে শুধু রহস্যের খেলা। কি অদ্ভুত!

তবে আর বিশ্ব-প্রকৃতি হতে নিজকে পৃথক্ বলে কল্পনা কেন? বিশ্বের প্রাণ তোমারই প্রাণ—সবার যা খুসী, তাতে তুমিও সম্মত। আজ হৃদয়কে আর পৃথক্ হৃদয় বলে ভাব্তে চাই না—এ সেই বিশ্বময়ীর হৃদয়!

যাকে আবাহন কর্ব, সে যে আছে। কোন কামসঙ্কল্পের পরিতৃপ্তি চাই না আজ—কল্পনার এতটুকু বাহুল্যও আজ নিরুদ্ধ হোক্। আমার অগোচরে আমার সমগ্র সত্তা আজ জান্তে থাকুক—সে আছে, চিরতরে আছে; তাই আর আজ আগমনীর গান নূতন করে গাইলাম না—কোন পরিবর্ত্তন নিত্যদৃষ্ট সত্যকে প্রমাণ কর্বার জন্য ছুটে এল না!......ওরে অন্ধ আঁখি, চেয়ে দেখ্ শুধু—যা আছে, তাই আছে,

তাই থাক্‌বে। বাস্তবে-অনুভবে মিশিয়ে যে মহা-কল্পিত বাস্তব—যা ছিল, তাই আছে, তাই থাক্‌বে।……

মুগ্ধ প্রাণ, প্রবুদ্ধ হলে কি? নূতন কিছু পেলে কি? এ প্রশ্ন সবাই করে। কি উত্তর?

উত্তর এই—প্রবুদ্ধ করেছেন বহু পূর্ব্বে, আজ শুধু অনুভবের হৃদয়দ্বারে গিয়ে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্ত নিয়ে দাঁড়ানো—আপন জোরে মায়ের বুকে স্থান করে নেওয়া। সে জোর চিরদিনকার আত্মপ্রবোধনের জোর—একদিনের তরে বিশেষ একটুখানি বোধ-নের কোন প্রয়োজন নাই।

বিশেষের মায়া জীবন থেকে উবে যাচ্ছে। এ কি শক্তির বোধন না শোধন, জাগরণ না নিগরণ, তা জানি না। যে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করি, যাকে বিশ্বাস করে জীবনের ভার দেওয়া চলে, তার উপর আমার বিশিষ্ট অধিকারের দাবী ফলাতে চাই না। আমার বিশেষ আমিকে আজ হারিয়েছি। ফিরে পাবার ঔৎসুক্য এতটুকুও রাখি না।

বাস্তবের কথাই তো ফোটাতে বসি, মায়া এসে হাত চেপে ধরে কেন? লিখ্‌তে বসি সত্যি কথা—যা নাকি আপন খুসীতে বা করুণায় বা প্রেমেও এত-টুকু খর্ব্ব হতে জানে না—যা চিরকাল ধরে বিশ্ব-বিভুর বুকে চিন্তাময় লেখা ফুটিয়ে তুলে তুলে আমাদেরও ব্যষ্টি মনকে ইন্দ্রজাল-চিন্ময় করে রেখেছে চিরকাল, আজও রাখ্‌ছে—সেই অতিবাস্তব সত্যি কথাগুলো জানি না কোন্ অদ্ভুত মায়াবেশে সত্যি না মিথ্যা কী যে হয়ে এই শাদা কাগজগুলোর বুকে কৃষ্ণ রেখায় ফুটে ওঠে—সে মায়াকে প্রতিষ্ঠাও করতে পারি না, আবার উড়িয়েও দেওয়া চলে না! বাস্তবের এ কোন্ অপরূপ রূপ! মা, তোমার ঐ রূপের সঙ্গে আমার এ অনুভবের কোন্ সম্পর্ক? তোমার অমা-য়িক স্পর্শই কি আমার বাস্তব জীবন-মনকে এমন মায়ামগ্ন করে তোলে?

সত্যি কি আমার অজানা হৃদয়খানার মাঝে এই এলোমেলো অনুভূতিগুলোই আছে? এমন কিছু কি নাই, যাকে ধরে-বেঁধে স্থূল বলে প্রমাণ করা যায় বা সবার প্রাণে জলবৎ তরলং সরল সহজ প্রতিভাত করা যায়? কে সত্যি?—ছায়া সত্যি, না কায়া সত্যি? অথবা দুই-ই যার মাঝে আছে, সেই মায়া সত্যি! কিছু বোঝা যায় না—এ হৃদয় কি চিন্তা করে, কার আবেশে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে! এক কথায়, এক একটী জীবন অবলম্বন করে কখন যে কোন্ লীলা সে মায়াময়ী করবে, তা জানি না, কেউ জানে না!

জানি শুধু একটী নিবিড় স্পন্দন—যা ভব-আবর্ত্ত-নের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিন্দুতে বিন্দুতে কেন্দ্রস্বরূপ—যা রহস্য, সর্ব্বতোভাবে অবোধ্য, বুদ্ধির দুশ্চেষ্টায় যা জটিল হয়ে ওঠে, শেষে বুদ্ধি হার মানে—আবার না বুঝে সহজে মেনে চল্‌লেই যে অসঙ্কোচে ধরা দেয়!…

আমার প্রাণের শান্তি আজ আমি ঐখানে পেয়েছি।—জানি তাকে, একটুখানি স্নিগ্ধ দিব্য পরম অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সে—বিশ্ব-জননীর হৃদয়ে যার চিন্ময় দ্যুতি—জগতের সমস্ত মায়ের বুকে যা স্নেহস্তন্য উথ্‌লিয়ে তোলে—যার পরশে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকে, প্রেমিকের বক্ষে বেদনার অশ্রু ঝরে—আমারো বুকে আজ জানি না কার পানে সে ধাওয়া, আকুল আবেগে প্রতি অঙ্গকূপকে তৃষিত করে কার পথ চাওয়া! এইটুকুই জানি শুধু, এর বেশী বল্‌তে পারি না। জান্‌ছি, বুঝ্‌ছি শুধু প্রাণ ভরে—কর্‌তে পারি না কিছুই; কর্‌তে গেলেও যা কর্‌তে যাব, তা হয়ত হবে না!

এই তো আজ বল্‌তে বসেছিলাম, মায়ের পূজার প্রথম দিনে আজকের দিনটী কেমন গেল; কিন্তু যা খুসীতে আপ্‌না হারিয়ে একি আবোলতাবোল কে বকতে লাগল, তার অর্থ সেই জানে, আমি জানাতে চাই না। তবু দুটো বাস্তব কথা বলি?—বলে সমস্ত রস মাটী করে দিই?—

না, দেব না! শুধু জানিয়ে রাখি—এক একটা দিন আমার এমনি অদ্ভুতভাবে যায়, যার ব্যাখ্যা শুধু তিনিই জানেন!

—*—

(৩)

মুগ্ধ জীবনের অন্তিম ঘনিয়েছে—নবযুগের সূত্রপাত—বাসনাব্যসনের অব্যর্থ অঞ্জলি!

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান কর্‌তেই আজ এমন একটী বস্তুর আভাস পেলাম, যা সর্ব্বাংশে শুভোন্মুখী ইঙ্গিতময়। বুঝ্‌লাম, এ তাঁরই ইঙ্গিত, এ কয়দিন প্রাণে যার আবাহন চল্‌ছিল। তেমন করে চাইলে পরে পাওয়া যায়ই যায়! কে যেন কাণে কাণে বলে গেল—"যে পাওয়া সবার ভিতর দিয়ে, সেই পাওয়াই আজকের খাঁটী পাওয়া।" আর সব অগ্রাহ্য—তাই আজ সবার সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছি।

কর্ম্মের ভিতর দিয়েই পাওয়াই সামঞ্জস্যের পাওয়া। আজকার ইঙ্গিত তাই বলে।

কর্ম্ম আর কাকে বলি?—ভাবের বহিঃপ্রকাশই তো কর্ম্ম? তবে আর কর্ম্মকে বাদ দিয়ে বঞ্চিত অন্তরে তাঁর পূজা চলে কই?

বাইরকে ছেড়ে ভিতরে আসতে হবে কেন? বাইরকে নিয়েই ভিতরে যেতে হবে! যা কিছু আছে, সমস্ত শুদ্ধ সমর্পণ।

তাই যদি হয়, কর্ম্মকে ছেড়ে আসতে পার কই! বৃথা বাসনার নিরোধ, বৃথা চিত্তের প্রত্যাহার—বিচারগর্ব্ব ভুলে গিয়ে নিঃশেষে প্রাণ ঢেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়—তাঁর পূজা তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই—শুধু ভাব, ভাব, ভাব কোন পক্ষে আজ অভাব থাকবে না!

হৃদয়ের সকল কান্না নিবে গেল—মধুর হাসিতে স্নিগ্ধ পরিপুষ্ট সুরসাল জীবনখানি ফুটে উঠল! আজ পেয়েছি—কি পেয়েছি জানবার অহঙ্কার নাই। তাই বলি—সর্ব্বস্ব সঁপে দিলাম যে চরণে, সেই চরণের স্পর্শ পেয়েছি, আমি সব পেয়েছি! সে দেশে কি আছে কি নাই তা তো জানি না—স্পর্শে কার কি পেলাম, তাও তো বল্‌তে পারি না! শুধু মধুস্মৃতি সাক্ষ্য দিচ্ছে—তোমায় তুমি দিয়ে ফেলেছিলে, সকল গ্রন্থি টুটে গিয়েছিল। আত্মহারা প্রণয়ক্ষণে বাইরের দেনা-পাওনা থাকে কি?

বিচারের সাধনাকে অগ্রাহ্য করি না। তবে এই জানি, যার সংশয় আছে, সেই বিচার করে দেখবে। যখন সহজে না পাব, বিচার করব বই কি? কিন্তু আজ আর আমার খুঁটিয়ে হিসাব নেবার প্রবৃত্তি নাই—যা হয়েছে, বেশ হচ্ছে! অঞ্জলি দিতে গিয়ে ঐ চরণের মাঝেই যেন সব পেয়ে এসেছি, আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে এসেছি।

অনুষ্ঠানের আড়ম্বরকেও হেলা করি না; কিন্তু প্রাণ থেকে যা এল না, তা কর্‌লাম না। না করেও আজ যেন আর কোন ক্ষতি অনুভব হচ্ছে না। অনুষ্ঠান মানে ভাবের ক্ষতিপূরণ মাত্র যেদিন বোধ হয়, সেদিন আবার কৃত্রিমতা কেন?

ক্ষণিকের উন্মাদ চপলতা নয়, বিশেষ কারণবশে চম্‌কে ওঠা নয়—সহজ স্বাভাবিক থেকেই শুধু শুধুই পূর্ণ হয়ে ওঠা—এর কি কোনই মূল্য নেই? হয়ত বা এই ই জীবনের পরম সত্য!

জানি না মূলে কোন্ বিশিষ্ট বাসনা এই জীবনখানি গড়ে তুলবার কেন্দ্র-কারণ—আজ কোন্ কামনাই বা বলি দেব! অথবা কি কর্‌ব না কর্‌ব কিছু বিচারে প্রয়োজন নাই;—আমি আমাকে যে দিতে গিয়েছিলাম, আরও দিতে থাকবো—জীবন নয়, পুণ্যময় আত্মনিবেদন স্পন্দন শুধু! এই তো আজকার আমার সত্যি কথা। এর বাইরে লোভ কর্‌ব না। এক অজানিত মহারিক্ততার

মুক্তিতে হৃদয় আজ উদ্বেল—অসুন্দর কিছুই দেখ্‌ছি না। নিজের জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই—শুধু দেখব। পাওয়ার মায়া ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

যত্নরচিত বহুমায়ার বন্ধন আজ ছেদন করব, এক অভিনব অভিযানের জন্য প্রস্তুত হব। কত দিক থেকে বিদায়ের বিষাদ ছায়ামূর্ত্তি ধরে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অন্তরবর্ত্তিকার প্রসন্ন আলোকে আপ্যায়িত করে তাদের হাসিমুখে বিদায় দিলাম। যা ছিল, সব যাক, নূতন করে গড়ে তোল। তোমায় ডেকে এনেছি, এতদিনকার জীবনলীলা বিসর্জ্জন দিবার জন্য। তুমি নিজ হাতে আমায় বলি দাও—আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছার বলি হোক—আমাকে তুমি তোমার মত করে গড়ে নাও! বুঝি মায়াবদ্ধ প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল; উঠুক 'মা' বলে—নিস্তার চাই না।

আমিই আমার পশু। এতদিনে যে অসার লীলায় মেতে ছিলাম, তাতে কি সে শিক্ষা হয়নি? একলার শক্তিতে তাকে নির্জিত করতে পার্‌লাম না বলেই আজ তোমার শরণ নিয়েছি। তুমি আপন হাতে আমার শিরশ্ছেদন কর—আমার উষ্ণ হৃদয়-রক্তে খর্পর তোমার পূর্ণ কর—আমায় গ্রাস কর!

বিশ্বমোহিনী সৌম্যাৎসৌম্যতরা প্রতিমারূপে তোমায় চাইনি আমি—স্তব্ধ বিষাদে অবসন্ন শক্তিহীন হয়ে আমি তোমার ঐ রুদ্রশাসন চরণতলে আত্মবলি দিতেই চেয়েছি। আমার জীবনে তারই আজ সন্ধিক্ষণ। এ কি ব্যর্থ হবে?

—*—

(৪)

এই যে বছর বছর "মা—মা" বলে চীৎকার করি, অন্তরের কি যেন আবেশের ক্ষণিক আনন্দস্পন্দনকে সেই মাতৃরূপের অধিষ্ঠানরূপে কল্পনা করি—এর সঙ্গে খাঁটী যোগ আমার কতটুকু? সত্যি কি এই অনুভবই আমার জীবনসর্ব্বস্ব? মা-নামের আরোপ যাতে করি, সত্য যদি হয় তো তা কি নিজেরই মর্ম্ম-নিলীন সত্ত নয়? নিছক আমাকে নিয়েই যদি আমার লীলাখেলা হয়, তবে কল্পিত অপরের আবেশে ধূমায়িত হতে যাব কেন?

কিন্তু এটুকু জানি—যে শক্ত বাঁধন পড়ে গিয়েছে স্থূলের মায়ায়, তার মাঝে থেকে "এই-ই সেই" হয়ে যেতে পারি না—নিজকে পৃথক ভাবতেই হয়। বেশ দেখতে পাচ্ছি—আমিই আমার সবটুকু নই, অপর কারো কাছে কি যেন আমার পাওনা আছে! নিজের অভাব নিজে মিটাতে পারি না বলেই বলি—মা আছেন। সে-ই আমার মা—যার মাঝে এই জীবনের ছোট অহঙ্কার বড় অভিমান সব একাকার হয়ে আছে। তাকেই বলি—মা, মা, ধরা দে, ছোঁওয়া তোর হাত দুখানি আমার বুকে! আর যে সহ্য হয় না! আজ থেকে সেই অভাব মিটাবার সাধনাই সুরু কর্‌লাম।

বার বার দেখে এসেছি—বাইরের জগৎই আমাকে টেনেছে, আমি তো তাদের শুদ্ধ টেনে নিয়ে অন্তরের উপাসনা মন্দিরে গিয়ে ঢুকতে পারিনি। আজ কিন্তু জোর করে গলায় পাথর বেঁধে ডুব দেব—দেখি মন তুমি সমাহিত হও কি না! আজ আবার এক নূতন সংকল্পের কেন্দ্রে চিত্তকে অটল রেখে নব সাধনার আবর্ত্তন সুরু করলাম। গতবারের শিথিল চেষ্টায় যা হয়ে ওঠেনি, এবারকার উগ্র সাধনায় তাকে সিদ্ধ কর্‌ব।

এড়াতে চাই না—জয় কর্‌তে চাই। এত সহজে যে কি করে তা হয়ে যায়, বিস্ময়ের সঙ্গে সে কথা ভাবি; সহজ যদি সহজে ধরা না দেয়, লোভ কর্‌ব কেন? নিজকে নিষ্পেষণ না করে কোন অমৃত আস্বাদ পরের দয়ায় পাওয়া জিনিষের মত আমি চাই না; এমন শক্তি যদি জাগাতে না পারি যাতে বর্ত্তমান

জীবনের প্রাপ্ত উপাদানগুলি দিয়েই যা খুসী তা করা না যায়—তার পরিবর্তে অনন্ত জীবন নরকে পচ্‌তেও রাজী আছি।

আমার জীবনকে উন্নত করব আমি—তুমি শুধু স্পর্শ দেবে। আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে—আমি কি তোমার এমনই আঁচলধরা?

* * *

তাঁর জন্য পাগল হয়ে যাওয়াটাও তো একটা মোহ—প্রকারান্তরে তাঁকে বিব্রত করবারই ফিকির। শারদশুভ্র স্বচ্ছনীল নিরাকাঙ্ক্ষ উন্মুক্ত যে হৃদয়—বাসনারক্তিম ঘোর মূর্ত্তি সে ধারণ করবে কেন? মনের মাঝে ভাল মন্দ কিছুই ছিল না—ছিল সত্য, ছিল সহজ, ছিল জাগ্রত প্রাণ। কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর না করে সহজ দৃষ্টিতেই তাঁর পানে মুখ তুলে চাইলাম। বল্‌লেন—"মনে পড়েছে?" .... কত কি বল্‌তে গিয়ে যেন আর বল্‌তে পার্‌লেন না, রুদ্ধ ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে উদ্‌গত অশ্রুকে শুদ্ধ নিরোধ করে কেমন এক বেদনাভরা উদাস দৃষ্টিতে ভক্তদের পানে চেয়ে রইলেন। কত অলঙ্কারেই না সাজানো হয়েছে, কিন্তু কিছুই যেন গায় লাগেনি; এত ঐশ্বর্য্যের মাঝেও চিরবিরহিণীর মত তপস্বিনীর মত নিরাভরণা আভরণমোহমুক্ত মূর্ত্তিতে তিনি প্রতিভাত হতে লাগ্‌লেন। অলঙ্কার আছে কি নাই, তা মনে পড়েনি; প্রাণে জেগে ছিল শুধু তাঁর ঐ ব্যথাভরা মুখখানি, কাঁদ-কাঁদ চোক দুটী; অন্তরালে না জানি কত ক্ষমা, কত স্নিগ্ধ স্নেহাবেগ প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে ধরা দেব-দেব করেও ধরা দিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, তাঁর রূপ আজ মুগ্ধ করেনি—বিদ্ধ করেছে, স্তব্ধ করেছে।

তুমি আজ কাঁদছ! আমার অন্তরও তারই সাড়া পাচ্ছিল। শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলাম আজই মাত্র প্রার্থনা করে যে, আমার তুমি ধৃতব্রত কর; এবারকার অকাম সংকল্প যেন সমগ্র ব্রতকালের দরুণ অটুট রাখতে পারি। মায়ের লুকানো চোখের জল বলে দিল, তোমাকেও অমনি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে হবে; কত সুখের আবিষ্ট আশা অঙ্কুরেই নির্ম্মূল করে সুদৃঢ় চারিত্র্যে অটল থাকতে হবে; তারই দরুণ জীবন উদ্‌যুক্ত হোক্। এর আগে কক্ষনো কিছু প্রার্থনা করে অঞ্জলি দিইনি সজ্ঞানে, তিনিও কখনো স্পষ্ট কথায় কোন আদেশ করেন নি। আজ আমার সত্যি সেই এক নূতন দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে!

কাঁদবার জন্য তৈরী হয়ে আজ তোমার কাছে নববর্ষের আশিষ্‌স্পর্শ নিতে এসেছিলাম; প্রাণ ভরে তা পেয়েছি। অভিমানকে বুঝিয়ে পড়িয়ে রীতিমত শিখিয়ে নিয়ে কড়া পাহারায় বসতে হবে। নিজের সঙ্কল্প নিজকেই রাখতে হবে; নির্ভরের নাম দিয়ে অমূল্য জীবনটুকুর অপব্যয় আর এক ক্রান্তিও হতে দেওয়া নয়!

* *

অপূর্ব্ব একটা বিশেষত্ব আজ সব দিকেই পাচ্ছি। উপাসনা-মন্দিরে গিয়ে অবধি আরো বেশী করে পেলাম। ছুটে এসেছি আনন্দে সেই খবরই লিখে রাখ্‌তে। দেহ যে খুবই সুস্থ, খুবই ভাল, তা নয়—কিন্তু মনখানি বেশ তাজা আছে;—যেন ঐ সদ্যফোটা শেফালিফুলগুলোর মত মৃদুমন্দ সুগন্ধে ছড়িয়ে পড়্‌ছি, আত্মপ্রচারের দুশ্চেষ্টা নাই।

আজ যেন উপাসনায় আমাকে অন্তর থেকে কে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে বরণ করে নিয়েছিল। গিয়ে অবধি প্রাণে প্রাণে কত কথাই হচ্ছে। দশোদিশে কেবল যেন কার মধুস্মিত দেখ্‌তে পাচ্ছি। মন্দির আজ শোভায় সৌন্দর্য্যে অনির্ব্ব-

চনীয় আবেগমিশ্র ধূপ-সৌরভে প্রাণ মাতিয়ে তুল্ছে। আনন্দের "প্রাচুর্য্য" লক্ষণ আজ সবদিকেই সুপরিস্ফুট। মনে হল, আজ আমার নববর্ষ—এসব শুভ ইঙ্গিত তারই সূচনা। সর্ব্বত্র দেখ্লাম শুধু বর ও অভয়। বিশ্ব আমার নবপ্রস্ফুটিত অনাঘ্রাত হৃদয়কোরকটীকে সাদরে বরণ করে নিল, আজ কেউ আমাকে ভয় কর্‌ল না—সব কয়টী প্রাণের মৌন প্রেম অন্তরে অন্তরে আলিঙ্গন জানাতে লাগ্‌ল।

লৌকিক বিচারে এমন কিছুই নয়, যা পেয়েছি বলে সমারোহ করে দেখাতে পারি; তবু সবই আজ পূর্ণ। স্বকারণ আত্মানন্দস্বরূপ নিখিল শুভেচ্ছার কেন্দ্রকমলে আজ আমি অধিষ্ঠিত আছি।

লিখ্‌বার হুজুগ আমাকে লিখতে বসায়নি—সহজ ইচ্ছায় অনায়াসে এসে লিখতে বসেছি। সত্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখবার দৈন্য যেন না থাকে; আমি শুধু আমারি কথা বলবার প্রয়াসী।

আড়ম্বর ছাড়াও যে পূর্ণতা আস্‌তে পারে, আজকার দিনটী তার প্রমাণ। আমার আধ্যাত্মিক নববর্ষ আজ আপন গৌরবে আপনি মহিমান্বিত হয়ে দাঁড়াল। বিগত জীবনের যত তুচ্ছ ক্ষুদ্রতা সে স্বেচ্ছায় আত্মগত করে নিল। যত কিছু দৈন্য আজ তাঁর মহিমায় ধন্য হল।

*   *   *

পূজার মন্দিরকে সাজিয়ে তোলায় ভার মানুষেরও আছে। নতুবা আসল সৈরিন্ধ্রী তো প্রকৃতি। যখন মানুষে আর প্রকৃতিতে উভয়ে মিলে সাজায়, কেউ কারো মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করে, তখনই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। আজকের সাজসজ্জায় প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রাণের এই নিগূঢ় যোগটুকু প্রস্ফুট দেখে পুলকিত হ'লাম। কেননা আমি যে মানুষ—মানুষ যে প্রকৃতি-মায়ের বরপুত্র!

ইচ্ছা কর্‌লেই মানুষ কুচেষ্টা করতে পারে, প্রকৃতির সূক্ষ্ম সুকুমার সহজ সৌন্দর্য্যপ্রেরণার সঙ্গে উগ্র কৃত্রিমতার ভেজাল দিতে পারে—মানুষের ক্ষমতা আছে, অধিকার আছে; কিন্তু থাক্‌লেই অপব্যবহার কর্‌তে হবে? অকৃত্রিম প্রাণ তো তা বলে না। বরং যে মানব যত পূর্ণ হবে, সে তত প্রকৃতির দরদী হয়ে উঠবে! সহজ মানুষ প্রকৃতির প্রেরণার নির্ব্বিবাদে জীবন সমর্পণ কর্‌তে জানেন বলেই তাঁদের জীবন এমন সদানন্দময়। প্রকৃতির মূলে যে প্রেরণা, মানুষের প্রাণও সেই সহজ প্রেরণায় ফুলের মত ফুটে উঠতে পারে, যদি কৃত্রিমতার মোহে অন্ধ বদ্ধ হয়ে না থাকে সে!

মানুষ দুঃখী হবে কেন? শ্রান্ত হবে কেন? রিক্ত হবে কেন? প্রকৃতির সুরে সুরে বাঁশী পূরে চল্‌তে জানাই যে অনন্ত জীবন। অনন্ত জীবনে কিছুরই অন্ত নাই—সকল শক্তিই অমৃতায়ন প্রাকৃত আপ্যায়নে অফুরন্ত।

উপাসনামন্দিরের অনাড়ম্বর সজ্জায়, গোধূলিলগ্নে সূর্য্যাস্ত-শোভায়, নিখিল প্রকৃতির অনাহত আবেগে আজ সেই সহজ সঙ্গীতই শুন্‌তে পেয়েছি—যার বিচিত্র ছন্দোবিলাস অথচ সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যতান বিশ্বের জড়-অজড় সমস্ত হৃদয়কে তন্ময় করে ধ্বনিত হচ্ছে! কৃত্রিমতার মোহে অন্ধ ছাড়া সবাই আজ সেই অদ্বৈত রসানুভূতিতে ডুবে আছে। এই তো সদাজাগ্রত আত্মস্বরূপ নিখিল জীবনের চিরায়ত্ত আত্মানুধ্যান; এই উপাসনায় সমগ্র মণ্ডলী আজ স্তব্ধ সমাহিত, অন্তরাবেগে প্রতিভান্বিত!

এই সরলতায় ডুবে যাই। এই তো আমার মায়ের কোল। কোন সংশয়, কোন সঙ্কোচ, কোন

কোন অভাব নাই—আজ আমার চিরাধিকারের মায়ের কোলে বসে দেহ-মন-প্রাণ ভরে তাঁর অমৃতস্তন্য পান করছি। মা আমার বিশ্বপ্রকৃতি হয়ে আজ আমায় বুকে ধরেছেন। যে মায়ের পূজা সবাই করে, সেই মায়েরই তো প্রতীক্ এই প্রকৃতি-জননী—আদিমাতা, জীবধাত্রী, শুভাশুভ অদৃষ্ট রহস্যে কৌতুকময়ী সু-বিপুলা। তাঁরই বুকের দুগ্ধে মানুষ হয়ে তাঁরই বুকে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছি—স্নিগ্ধ বক্ষপুটে সন্তর্পণে সম্পুটিত রেখে তিনি সেই অনাদিনিধানের ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন। এঁকে পেলেই আমরা তাঁকে পাব—নৈলে কি পায় কেউ? আমরা চিন্‌তে পারি না—ভ্রমবশে কল্পনায় খুঁজে মরি। তিনি যে সব চেয়ে নিবিড় স্পষ্ট বাস্তব হয়ে ধরা দিযে আছেন।

ডাক্‌তে হয় না, আসন দিতে হয় না, পূজার উপচার খুঁজে মরতে হয় না;—সব চেয়ে সহজ উপাসনা এই আমার প্রকৃতিরূপিণী মায়ের কোলে। বিধিবন্ধনের বাঁধি গৎ যে এর কোন্ বহিরঙ্গে ঠেকে আছে—অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধায় প্রেমে পূর্ণ হৃদয়খানি—তিনি নিয়ম জানেন না, শৃঙ্খলার জন্য ব্যস্ত হন না, শুধু ভালবেসে কাজ করে যান আর তাতেই সবদিক সুন্দর হয়ে সেজে ওঠে, মধুর সুরে বেজে ওঠে!

এই অদ্ভুত রহস্যময় নিমন্ত্রণের সঙ্কেত পাবে বুদ্ধিজীবী মানুষ? যে তার হৃদয়ে, তাকে সে কল্পনায় দূরদূরান্তরে খুঁজে মর্‌ছে। সে যে তার জন্মদিনের সরল শিশু-মনটী হারিয়ে ফেলেছে। সে কোন্ প্রাণে শুন্‌তে পাবে প্রকৃতি মায়ের সে সঙ্গোপন আহ্বান? তিনি যে কেমন করে কোথা দিয়ে কাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত সংস্কারবিমূঢ় মন তা বুঝ্‌বে কি করে?

অবিদ্যার মোহমায়াজাল এই কৃত্রিমতা—প্রকৃতির সহজ প্রেরণার কল্পিত আবর্জ্জনা। এক ফোঁটা শক্তি মানুষের আছে—এই কল্পনার শক্তি। তাই নিয়ে ব্যর্থ অহঙ্কারে সে ফেটে মরে। নিজকে কত কৃত্রিম করে। প্রকৃতির ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে মায়ের নিদেশ লঙ্ঘন করবার স্পর্দ্ধা দেখায়। এই তো অজ্ঞান—জ্ঞানোন্মুখ সাধনার খাদ যত! সদ্যোজাত শিশুটী হয়ে যাও হৃদয়কেন্দ্রে আনন্দে—সেই মহাশক্তির প্রেরণাও পাবে এই কল্পনার মাঝেই; ভ্রান্তির প্ররোচনায় ভুলবে না।

আজ হতে তোর কোলের শিশু হতে চাই প্রাণে প্রাণে। আমি যেন আমাকে গড়ে না তুলি—তুই গড়ে তোল্; আমি শুধু তোর হাতে আমার যা কিছু আছে, এনে জুগিয়ে দেব, তুই তোর যেমন খুসী সাজাবি—আমি অকপটে আমার সর্ব্বস্ব তোকে দিতে থাকব, সরল সুবোধ হয়ে দেখব, কোন দৌরাত্ম্য কর্‌ব না।

এই তো আমার নবজীবন—অধ্যাত্মারামের স্থিতিপ্রবাহ। কিছুই জানি না, কোন্ লীলা তুই কর্‌বি; শুধু জানি, তোরই কোলে বসে আছি, তোরই স্তন্যবৃন্ত মুখে দিয়ে, তোর মুখপানে চেয়ে!

—*—

(৫)

একের দৃষ্টিতে যা বিদায়, অপর দৃষ্টিতে তাই অভিনন্দন, সম্ভাবী আগমন। জগতের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। কেউ আস্‌ছে অভাবে আকুল হৃদয় নিয়ে মায়ের দিকে এগিয়ে, কেউ যাচ্ছে তাঁরই নাম রাখতে তাঁর কোল ছেড়ে দূরে সরে। অভয় হৃদয়, রুদ্র সঙ্কল্প, পরিপূর্ণ ভাব। সবাই যদি চায় তাঁকেই, তুমি চাইবে তোমাকেই। গরজ থাকে চেয়ে নেবেন। যে চায়, তাকেই চাই। অন্যত্র ভ্রূক্ষেপ বৃথা।...

প্রচণ্ড অদ্ভুত উৎকট বীরাচারীর মত হয়ে চল্‌তে আজ ইচ্ছা হচ্ছে। কোন বাধা মানব না, কারু মমতায় টল্‌বো না, কারু সহানুভূতিতে গল্‌বো না ;—নির্ম্মম দুর্দ্দম একেশ্বর হয়ে বিশ্বকে মথিত করে বুকের মাঝে পুরে নেব—যে চায় তাকেও, যে না চায় তাকেও! দ্বিতীয় পক্ষ দুনিয়ায় কিছু থাক্‌বে না—সব স্তিমিত নিষ্প্রভ হয়ে যাবে সেই রুদ্র জ্যোতিঃর প্রখরতায়।

বাইরে বিরহীর বেশ। বেদনাই আজ প্রেরণা, অশ্রু করুণা; নিষ্ঠুর প্রেম—এর কবলে না পড়ে উপায় নাই। জগন্ময় আমারি বিরহ ফুটে উঠ্‌ছে শত বিচিত্র বস্তুরূপে। আমার ভাব হতেই আমারি ব্যথা-হত হৃদয়শোণিত-উপচারে এই দুঃখময় জীবন-সমষ্টির সৃষ্টি স্বহস্তে আমিই করেছিলাম, আমিই বিসৃষ্ট করব।......

কেন এ প্রলাপ? কেন হৃদয় উতলা হয়ে উঠ্‌ল? আমার এ নিষ্ঠুর আত্মকাহিনী আজ কে শুন্‌তে চেয়েছিল? কোনদিন তো খুলে বলিনি, বল্‌বার ইচ্ছাও রাখি না; যে বেদনাকে চিরকাল গোপন রেখেই যাবো ভেবেছিলাম, যাকে জীর্ণ কর্‌বার জন্য শুধু এ জীবনটুকু কেন, দরকার হলে আরো কত জন্মজন্মান্তরের জীবন শুদ্ধ উৎসৃষ্ট করে রেখেছিলাম, সেই বেদনার উত্তাপ ভাষায় ফুটে বেরোয় কেন? আমি তো বল্‌তে চাই না—রুদ্র হয়ে চল্‌বো কি কমনীয় হয়ে থাক্‌বো—সে কথা তো বল্‌বার নয়। আমি চিরকাল তাকে হৃদয়ে রাখ্‌বো—মুখ দেখে বুকের কথা কেউ ঠাহর কর্‌তে পার্‌বে না; আমার সংযমের মূলে এই প্রতিজ্ঞাই ছিল।......

চিরকাল তো জগতে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। ধরা পড়্‌তেই হবে। তখনো তোমার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যথাগুলোকে কি তুমি উদগ্র করে রাখ্‌তে চাও? তোমার সর্ব্বংসহা বৃত্তির আশ্রয় যে উদার-হৃদয় স্নিগ্ধ-ভালবাসা, তাই কি তোমার পরিচয়ের নিশানা হবে না?

—৩৩

কোথা থেকে যে কোথায় ভেসে চলি, জানি না। ক্ষণিকের রুদ্র-প্রকৃতি আবার কার যেন অন্তর্নিলীন আকর্ষণে প্রশান্ত হয়ে আসে। তখন ভাবি, আমি তো দুনিয়ায় একলা নই আমাকে শীতল কর্‌বার যে বস্তু আমাকেই বুকে করে রেখেছে।...বুঝি তাঁরই স্নেহ!

উগ্র হই, নিষ্ঠুর হই অভিমান করে; নতুবা স্বরূপ আমার চিরপ্রশান্ত। প্রেম আমার মর্ম্ম সত্য—হৃদয়ের জ্বালা জীর্ণ করাই তার ব্রত।

সূচনাতেই নানা উৎকট পরীক্ষা। আপন বেগে পার হয়ে চলেছি আমার গন্তব্য দেশে—একচ্ছত্র হৃদয়াধিকারে। অনাদৃত কিছুই থাক্‌বে না চিরদিন। সাধনশক্তির কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে অসাধনের ধনকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করাই চাই। গতানুগতিক সাধনাধারার অন্তরালে থেকেও সাধনশক্তি-বঞ্চিত নয় এবং অসাধনে অর্থাৎ কোন অভিনব সাধনে জীবনের মর্ম্মরহস্য যে আয়ত্ত হতে পারে, সে সম্ভাব্যতার পরিচয় আজ পেলাম—সামান্য আচরণে মহৎ-হৃদয়ের পরিচয় যেমন করে মিলে, তেমনি করে।

ঠিক বুঝ্‌তে পারি না,—কি লিখি, কে লিখে! বল্‌তে গেলে গর্ব্ব করা হয়, ছদ্ম ভাবুকতার সমর্থন করা হয়; কিন্তু না বল্‌বারও তো পথ দেখি না। কি একটা আবেশের আবর্ত্তন যেন এই পূজা-উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে বার বার ঘুরে-ফিরে এই মণ্ডলীতে আসে। নিজকে হারাই না অথচ কিসে যেন জড়িয়ে যাই।

এই কয়দিন বাইরে সবাইকে দেবার ভার নিয়েছিলাম, আজ বিদায়দিনে যেন অন্তরেও কোলাকুলির পিপাসা জেগে উঠল। দীপ্ত মায়ামণ্ডিত নীলাকাশ—দশমীর চাঁদ হাস্‌ছে—তার মাঝে নিজকে ছড়িয়ে দেবার দরুণ মুক্ত-প্রাঙ্গণতলে বেরিয়ে এসে আমার

শিউলি-সভার দক্ষিণে বস্‌লাম; দেখতে পেলাম—বিশ্ব জুড়ে আমারই কোল, বিজয়ার আশীর্ব্বাদী সমীরণ মৃদু-মন্দ সুবাস বয়ে সবার কথা সবার প্রাণে ছুঁইয়ে দিয়ে যাচ্ছে; আমার কোলেই যেন সবার কোলাকুলি চল্‌ছে—আমি আমাকেও পেয়েছি, তাদেরকেও পাচ্ছি।

শারদশুভ্র হৃদয়ে আমার আজ আর অকল্যাণের স্থান নাই। বড় বড় বিষম সমস্যাগুলো যেন মুগ্ধ-হৃদয়ে বশ্যতা স্বীকার কর্‌ল। আমি আমার নিজস্ব আশ্রয় পেয়েছি—চিরকাল যা আমারই ছিল, ভুল ভেঙ্গে তাকে আবার নূতন করে চিরতরে পেলাম যেন!

তবু যে উঁকি দেয় প্রাণে নানা কথা নানা ব্যথা, ওগুলো থাক্; ক্রমশ সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঐ যে চোখের উপর আমার সাম্‌নে দেখছি মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে বিশ্বময়ীর চিন্ময় আবেশ, তার দীপ্ত কিরণ আমারো প্রাণে খেলে গেল, আর কি আঁধার হবার ভয় রাখি? বিশ্বের সকল সফলতা ঐ আবেশে আজ প্রাণ পেল, সক্রিয় হল, অরূপ হতে রূপে নেমে এল—নতুবা নিছক্ ভাবুকতা বলে তাকে অগ্রাহ্য হতে হত যে!

আজ যেন কারু প্রাণে ব্যথা দিতে না হয়। আনন্দে সহ্যশক্তি বেড়ে যায়, আত্মত্যাগের প্রেরণায় প্রাণ প্রাণবন্ত হয়। জানি, আজই কারু মনমত একটা কিছু গড়া শেষ হয়ে যাবে না—তবু আত্মদান অকপট হোক্। যেন মর্ম্ম-সত্যকে প্রবঞ্চিত না করি।

জীবন শক্তির স্ফুরণে জাগ্‌বে—এই কথাই বার বার আজ মনে আস্‌ছে। জানি না এ জোর সত্যিকার কি না। কিন্তু ভাবি—সংশয় কেন? সত্যি করে তোলা যায় না কি? যা জানি না, তাই যদি অদৃষ্ট হয়, তার ভাবনায় লাভ কি? প্রাণের প্রেরণায় যা চাও, তাই ধরে বসে থাক। যেমন করেই হোক্, ধরে বসা চাই-ই চাই।

শুন্‌তে পাই, আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার নামই সাধনা;—তাই নাকি মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব। শক্তি জাগলেই জীবন পূর্ণ হবে; অদৃষ্টের ভরসায় অলসগতি হলে কোন লাভ নাই।

মায়ের বিদায়-দিনে তিনিও বার বার এই আদেশই আমার অন্তরে বাহিরে যেন প্রত্যঙ্গ রোমকূপকে পূরিত করে দৃঢ় প্রেরণায় শোনাচ্ছেন—ভালবাসার অনুযোগ-মাখা সুরে—"দেখ, এবার কিন্তু ব্রত রক্ষা করে চলাই চাই। দিতে কৃপণতা আমি করব না—চাই প্রাণভরে পাবার অধিকার; তোমার শক্তিকে জাগাতে পার্‌লেই তুমি পূর্ণ হবে—এ কথা বিশ্বাস কর কি?"

—*—

(৬)

দুদিন পরে আবেশ টুটে গেল। সব কথা ভুলে গেলাম। ঘটনার বৈচিত্র্যে দৈনন্দিন জীবন পূর্ব্ববৎ সঙ্কুল হয়ে উঠল। শুধু স্মৃতিতে থাক্‌লো—একটা অন্তর্মুখী প্রেরণা, আত্মরতি-সুধাময় স্পন্দন, ভবের ভাবে প্রভাবিত হতে গেলেই একটা বিষম পিছুটান; সর্ব্বদা বুক জুড়ে এক অত্যুজ্জ্বল অভাববোধ!

এমনি করে বছর বছর কে যেন হৃদয়ে হৃদয়ে আবেশের জ্বালা ধরিয়ে যায়। কোথায় যায় জানি না—আর জানি না এ আবেশের চরম কি অথবা চরমে কে!

—*—

শক্তিময়ী

জগৎ জুড়ে শক্তির লীলা চল্‌ছে। উঠতে-বসতে, হাসতে খেলতে সর্ব্বত্রই শক্তির প্রয়োজন। শক্তির প্রভাবে আমরা বেঁচে রয়েছি; আর সমস্ত প্রকার শক্তির যখন অভাব হয়, তখন আমরা মরে যাই। বেঁচে থাকতে গিয়ে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যার শরণ নিতে হচ্ছে, সেই শক্তিকে কিন্তু আমরা স্থূল চোখে দেখতে পাই না। যার অস্তিত্ব পলে পলে অনুভব করছি, তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই শক্তি বলে আখ্যা দিয়া আমরা একটা কিছুর অনুমান করি। অনুমান করি বলছি এইজন্য যে, তার আকৃতি বা পরিমাণ কিছুই আমরা কোনও স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তার অস্তিত্ব কেবল কার্য্যদ্বারা অনুভব করি। এখান থেকে একটা ঢিল ছুঁড়লাম—ওই ওখানে গিয়ে পড়ল। কে নিয়ে গেল, তা দেখতে পাই না, বলি —আমার শক্তি। আবার তাকে বিশেষিত করে বলতে পারি—আমার শারীরিক শক্তি। অবশ্য শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তি থেকে নিরপেক্ষ হয়; আবার মানসিক শক্তিও আধ্যাত্মিক শক্তি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু পরস্পরের যোগ থাকলেও আমরা ব্যক্তিবিশেষের শক্তিকে এমনি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। শক্তি প্রকাশের সময়ে শরীর মন ও আত্মার মধ্যে যেটা বিশেষ আধার হয়ে ওঠে, সেটির নামেই আমরা শক্তিকে বিশেষিত করি। নতুবা সমস্ত শক্তিই সেই আত্মার। সমষ্টি ভাবে বলতে গেলে সেই একমাত্র পরমাত্মার! নানা দর্শন বা ধর্ম্মমতে তাঁকে যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, তেমনি এই শক্তিকেও বিভিন্ন নামে অভিহিত করে; কিন্তু শক্তি সর্ব্বত্রই শক্তি বা Force; অবশ্য Force বলতে কেবল গতিই নয়, সংহতি বা Cohesionও শক্তিরই কার্য্য। হিন্দু-মতে বলতে গেলে যাঁহা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ বিধৃত—তিনিই মহাশক্তি বা জগতের সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ। ঋষি বলছেন "যয়ৈব ধার্য্যতে জগৎ।" অথবা "ব্যাপ্তস্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।"

বুঝতে পারি যে আছে, অথচ তাঁকে ধরতে পারি না, দেখতে পাই না—আমাদের নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারের মাঝে কোথাও একই নিয়মে তিনি যেন নিয়মিত, আবার এক এক সময়ে জগতে আমাদের ধারণাতীত, কল্পনাতীতরূপে তাঁর প্রকাশ দেখছি। তাই বুদ্ধির পরিমাপে যাঁর মাপ হয় না তিনি মায়া, অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টিতে যা কিছুই না আবার সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনিই মহাশক্তি। সেই মহাশক্তি যে কেবল আমাদের বাঁচিয়েই রাখছেন—তা নয়, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনীও। জগৎকে সুস্থ রাখতে হলে কেবল পালন করলেই হয় না, তার অসুস্থ অংশকে বিনাশ করে আবার নূতন সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়। তাই তাঁর পুরাতন সৃষ্টির অশুভ স্থিতিকে লোপ করে আবার নূতন রূপ দিয়ে শ্রীসম্পন্ন করেন। তাহলে বলা যায়, একমাত্র স্থিতিকে সুন্দর রূপে বজায় রাখবার জন্যই তাকে আংশিকভাবে সংহার ও সৃজন করতে হয়। বস্তুতঃ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় এক সময়ে হয় না। কোনও না কোনও অংশে যদিও প্রলয় হয়, অপর অংশে সৃষ্টি ও স্থিতি চলতেই থাকে। মোটের উপর সমগ্র জগৎ সুন্দর রূপেই চলছে। আর এই সুন্দররূপে চলবার—পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকবার কারণই হচ্ছে মহামায়া। তাঁরই পালিনী সৃজনী ও সংহারিণী শক্তিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে ভাগ

করে হিন্দু বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র দেবতার পরিকল্পনা করে। এসমস্ত শক্তিকে এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে সমষ্টি ভাবে তার রূপ দিলেই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়।

কিন্তু আমরা শুধু শক্তি চাই না, শক্তির সঙ্গে মাধুর্য্যও চাই। শক্তি কেবল প্রখরা হয়ে আমাদের মাঝে নেমে আসলে তাকে আমরা ধারণা করতে পারি না। তার সঙ্গে চাই কমনীয়তা নতুবা জগৎটা কেবল শক্তির প্রচণ্ড তাড়নে বিভীষিকা-পূর্ণই হয়ে থাকত। তা না হয়ে সৃষ্টির প্রত্যেকটী অণুপরমাণুতে শক্তির সঙ্গে এক পরম রমণীয়তা এসে জগৎকে সুন্দর করে তুলেছে। তাই হিন্দু ঋষি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডধারিণীকে স্ত্রী মূর্ত্তি বা শক্তির সঙ্গে প্রশান্ত কমনীয় মধুর রূপ দিয়েছেন। তাই তাঁতে রুক্ষ পৌরুষের উৎকট তেজই শুধু নাই, তার সঙ্গে রয়েছে পরম লাবণ্য—চরম আকর্ষণ।

যেখানে শক্তি সেখানেই আকর্ষণ। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে শক্তি, তাই প্রত্যেকটা গ্রহ-উপগ্রহ হতে আরম্ভ করে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে অপর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট। মানুষ আবার তার মাঝে শ্রেষ্ঠ, তাই সে এই আকর্ষণকে আরও নানা ভঙ্গিমায় উপলব্ধি করে। একই শক্তিদ্বারা জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়েও বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন অবস্থায় তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভজনা করে।

তাই যে পরম স্নেহময়ী শক্তি শৈশবে তাকে মাতৃরূপে পালন করে, যৌবনে অন্য রূপের ভিতর দিয়ে তাকে আর এক অমৃত-লোকের সন্ধান দেয়, আবার প্রৌঢ় বার্দ্ধক্যেও সেই মহাশক্তিই জগন্ময় পরম-বাৎসল্যের মধুর রস আস্বাদন করায়। রসের চূড়ামণি পরম রসিক হিন্দু-ঋষি এই মহা তত্ত্বের সন্ধান পেয়েই গৌরী-উমা-শঙ্করী রূপে তাঁকে জগতে প্রচার করেছেন।

হিন্দু যখন যে সত্য পেয়েছে, তাকে সব দিক দিয়ে পরীক্ষা করে সকল রকমে তার স্বাদ গ্রহণ করেছে। তাই ব্যষ্টি সমষ্টির যত প্রকার অবস্থা রয়েছে, সকলের মাঝ দিয়ে যুগে যুগে তাঁরা মহাশক্তির নানা রূপের বিভিন্ন প্রকাশের পরিচয় দিয়েছেন। একই শক্তির এমনি বিভিন্ন অবস্থা বুঝাতে গিয়েই হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনা করে বসেছে। আর তার ফলে এমন কোনও অধিকারী নাই, যে এর কোনও না কোনও stageর সঙ্গে নিজের অবস্থা বা ভাবের মিল না করতে পারে। জগৎ আজ যে কোনও একটী মতবাদ ধরে যতই না কেন তার উচ্চপ্রশংসায় দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করুক, জগতে বিভিন্ন অধিকারী থাকবেই—সকলে কিছুতেই এক গোয়ালে মাথা দিতে পারবে না। যার যেমন শক্তি, তার তেমন অধিকার না হলে বিরাট জনসঙ্ঘের মাঝে বৈচিত্র্যের সৃষ্টিই হোত না। সকলের মুখ কখনও একরকম হয় না। যার যেমন রুচি সে তেমনি ভাবে জীবনের সমস্যা সমাধান করুক। এই ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যের যুগে এ মত কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম বহুপ্রাচীন, তাই তার experimentও এই চরম তথ্যের আবিষ্কার করেছে।

বেদান্ত জগতের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে যেমন অনির্ব্বচনীয় মায়া বা মহাশক্তির সন্ধান দিচ্ছে, সাংখ্য তেমনি মহাপ্রকৃতিকে অব্যক্ত অথচ জগন্ময় তার ক্রিয়ার কথা বলছেন। কিন্তু কোথাও এই পরম শক্তির কোনও বিশিষ্ট রূপ দিয়ে জীবনের রসের সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করার পথ সুগম নয়। তন্ত্র এই দিকে এসে রাস্তা খুলে দিয়েছেন। পূর্ব্বে যা কেবল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্থাৎ স্থূল জগতের কোনও ধার না ধেরে করতে হত, তন্ত্র এসে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সেই স্থূলের মাঝেই তার পন্থা আবিষ্কার করলেন। এক দিক দিয়ে বলতে গেলে এ যেন অন্যান্য দর্শনের তীব্র Protest অথচ উপনিষদের

যুগের সেই গো, ধন, অগ্নি প্রভৃতির আরাধনার সঙ্গে বা পরের যুগের ব্রীহি, অষ্টকপাল প্রভৃতি উপকরণের সঙ্গে অনেকখানি মিল রয়েছে। সাধনের দিক দিয়ে তন্ত্র যেমন স্থূলের চরমে নেমেছে, তেমনি সিদ্ধিরও চরম ধাপে গিয়ে পৌঁছেছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই মূর্ত্তির পরিকল্পনা। জীবনের ব্যষ্টির দিক দিয়ে বা জগতের সমষ্টি দিক দিয়ে যে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়ে সৃষ্টি-প্রবাহ চল্‌ছে, তন্ত্র তার একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছেন দশ মহাবিদ্যার রূপকল্পনা বা তাঁদের স্তবস্তুতির ভিতর দিয়ে। বেদান্তের বা অন্যান্য দর্শনের সৃষ্টি-রহস্য তন্ত্রের দার্শনিক পন্থায় গিয়ে ধরা পড়েছে, তবে অন্যরূপ আকারে। তন্ত্রের কালী, তারা, ভৈরবী ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী বা বগলা যেমন এক দিকে অপর দিকে ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী ও কমলা তেমনি। অর্থাৎ প্রলয়ের তাণ্ডবতা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত, তেমনি প্রলয়ের পর সৃষ্টির উন্মুখীনতা ও স্থিতির মহিমাময় প্রশান্তি ও আনন্দ প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থার নিখুঁত চিত্রণে এই সমস্ত মূর্ত্তির সমাবেশ হয়েছে।*

অনেকে বলেন, তন্ত্র বৌদ্ধ যুগেরই ধ্বংসাবশেষ থেকে এসেছে। আবার অথর্ব্ব বেদেও তন্ত্রের বহু উপাদান দেখা য কিন্তু মূর্ত্তিরূপে আবির্ভাবের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় পাওয়া যায় কেনোপনিষদে। সেখানে সমস্ত দেবতাগণের গর্ব্বিত ভাব মিথ্যা প্রমাণ করতে ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন বহুশোভমানা হৈমবতীর উল্লেখ পাই। দেবী যক্ষরূপে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত দেবতাগণের সম্মুখে দেখা দিলেন। তখন এক একজন করে দেবতা তাঁর কাছে যেতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? তোমার কি শক্তি? দেবতা আপনার নাম ও নামের কারণ অর্থাৎ তাঁর শক্তিমত্তার

* দশ মহাবিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ ১৩৩৪ সালের আশ্বিনের "আর্য্যদর্পণে" দ্রষ্টব্য।

পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন। প্রথমে গেলেন অগ্নি কেননা দেবতাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, তাই দেবতারা তাঁকেই জানতে পাঠালেন। তাঁর পরিচয় ও শক্তির কথা শুনে যক্ষ তাঁকে একটা তৃণ দাহন করতে দিলেন। কিন্তু অগ্নি আপনার সমস্ত শক্তি দিয়েও তৃণটী পোড়াতে পারলেন না। অগত্যা ফিরে দেবতাদের কাছে গেলেন। তাঁরা তখন বায়ুকে পাঠালেন, যক্ষ তাঁর নাম ও শক্তি জেনে নিয়ে তৃণগাছটী নড়াতে বললেন, কিন্তু বায়ুও অসমর্থ হলেন। তারপর তাঁরা ইন্দ্রকে যক্ষ কে, তা জান্‌তে পাঠালেন। কিন্তু যক্ষ সেই অবসরে অন্তর্দ্ধ্যান হয়ে বহুশোভমানা হৈমবতী উমা রূপে আবির্ভূত হলেন। তখন ইন্দ্র তাঁকেই সেই যক্ষ কে, তা জিজ্ঞাসা করাতে, দেবী তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ব্রহ্মেরই শক্তি। তাঁরই প্রভাবে দেবতারা অসুর জয়ে সমর্থ হন, নিজেদের শক্তিতে নয়—ইত্যাদি। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এই তিন দেবতা এই রূপে তাঁর প্রমুখাৎ জ্ঞান লাভ করে শক্তি, গুণ ও মহিমায় অপরাপর দেবতাদের অতিক্রম কর্‌লেন। সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তিরূপে দেবীর আবির্ভাব দেখি এখানেই। কিন্তু এখানেও মাত্র তাঁকে জ্ঞানদাত্রী রূপে, অতি অল্প সময়ের জন্য পাই। তাঁর দেবী রূপে ব্রহ্মেরই মহিমা গান শুনি।

তারপর তাঁর দেবীরূপেরই মাহাত্ম্য শুনি মার্কণ্ডেয় পুরাণে। এখানেই তাঁর সঙ্গে সুষ্ঠু পরিচয়ের সুযোগ আমাদের হয়। আর যে কাহিনী অবলম্বন করে এই দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত, সেই সুরথ রাজার কাহিনীটীও স্বাভাবিক, করুণ ও হৃদয়স্পর্শী। রাজা বেশ সুখে শান্তিতে পুত্রের ন্যায় প্রজাদের পালন করছিলেন, এমন সময়ে কোথা থেকে কোলাবিধ্বংসী যবন রাজগণ এসে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা জুড়ে দিল। যুদ্ধে রাজা হেরে

গিয়ে মাত্র নিজের দেশটুকু নিয়ে রইলেন। কিন্তু সেখানেও আবার শত্রু এসে হানা দিল, তাঁর হস্তী অশ্ব, কোষাগার প্রভৃতি লুটে নিল। রাজা মনের দুঃখে বনে গেলেন। সেখানে একদিন মেধস মুনির আশ্রম দেখলেন। দেখ্‌লেন সেই শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে পরস্পর হিংসাশূন্য বনের জন্তুদের নিয়ে ও শিষ্যগণে পরিবৃত হয়ে মুনিঠাকুর বাস করছেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে সেখানে কয়েকদিন কাটালেন। এমন সময়ে একদিন নিজের দুঃখময় জীবন, হৃতরাজ্য ও পুত্রামাত্য প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা করছেন, এমন অবস্থায় সমাধি নামে এক বৈশ্যকে আশ্রমের কাছে দেখে রাজা তার সঙ্গে আলাপ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কেন সে যেখানে এসেছে, তাকে অমন মনমরা কালোমুখ দেখাচ্ছে কেন। সমাধি বল্‌ল, সে একজন ধনীর বংশধর, বর্ত্তমানে তার পুত্র-কলত্রাদি তার সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করে তাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন এই নির্জ্জন বনে তাদের কথাই মনে হচ্ছে। আর তাদের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠছে। রাজা তাকে সমদুঃখী জেনে বল্‌লেন, সে কি, তারা তোমায় এমন করে তাড়িয়ে দিল, অথচ তাদের জন্য তোমার মন এমন উতলা! বৈশ্য বল্‌ল—সত্যি, আপনি আমার মনের কথাটা ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু কি করি, পোড়ামন যে আমার বাঁধ মানে না! সব বুঝি, কিন্তু করি কি? তখন উভয়ে মিলে মুনির কাছে গিয়ে সব বল্‌লেন—জিজ্ঞাসা করলেন যে, সব জেনে-শুনেও তাদের দুজনের যে অজ্ঞের মত সেই নিষ্ঠুর স্বজনদের জন্য এমন বুকছেঁড়া টান হচ্ছে, এর কারণ কি? তখন মুনি বললেন—দেখ, এই যে তোমরা সব জ্ঞান বলে বল্‌ছ, এই জানা বা জ্ঞান পশু-পক্ষী সকলেরই আছে, সাধারণ মানুষেরও আছে; কিন্তু আসল জ্ঞান কারও নাই। তাই তারাও যেমন মায়া দ্বারা আবদ্ধ, তোমরাও তেমনি। মানুষ কত আশা করে পুত্র-পরিবারকে পালন করে, কিন্তু তারা যে পরিণামে এমনি ব্যবহার করে বসে, তা দেখেও মমতা ছাড়তে পারে না। শেষে মোহগর্ত্তে হাবুডুবু খায়, কেননা মহামায়া যে সবাইকে বেঁধে রেখেছেন।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—সেই মহামায়া কে এবং তিনি কোত্থেকে এলেন আর কিইবা করেন? মুনি তখন কিরূপে অসুরের কাছে হেরে গিয়ে দেবতারা একত্র হয়ে ক্ষুব্ধ তেজ সংহত করলেন ও দেবীর আবির্ভাব ঘট্‌ল, সে সব খুলে বললেন। আরও বললেন, তিনি সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা রয়েছেন, তবুও অসুরনিধনার্থে দেবতাদের আরাধনায় তাঁর বিশেষ আবির্ভাব হয়। তিনি জ্ঞানীদেরও চিত্ত জোর করে আকর্ষণ করে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করে রাখেন। তিনিই আবার প্রসন্ন হয়ে একমাত্র মুক্তিপ্রদাত্রী হন। কাজেই বন্ধন-মুক্তি জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে, এক কথায় জগতে যা কিছু হয়েছে, সব তাঁরই প্রভাবে হচ্ছে, তাঁকে আরাধনা করলেই এই বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া যায়, নতুবা উপায় নাই ইত্যাদি।

আমরা দেবীর আবির্ভাব, তাঁর কার্য্য প্রভৃতি যা কিছু, সমস্ত এইরূপে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিশদ ভাবে পাই। তিনি সর্ব্বত্র, সুতরাং দেবাসুর উভয়ের মাঝেই রয়েছেন, কিন্তু দুই রূপে। দেবতার মাঝে তাঁদের আকর্ষণে বা সাধনায় তাঁদের মত হয়ে অর্থাৎ পরাবিদ্যারূপে আবির্ভূতা হলেন। আর অসুরেরা, যেমন ভাবে শক্তির চর্চ্চা করেছে, যেরকম শিক্ষায় আপনাদের শিক্ষিত করেছে, তদনুযায়ী অবিদ্যা বা মরণ রূপে তাদের মাঝে আবির্ভূতা হলেন। দেবতারা পরম জ্ঞান লাভের পথে চলেছেন, এই পরাবিদ্যার পথে ঐশ্বর্য্য এসে তাদের যখনই গর্ব্বিত করে, অমনি তাদের অধঃপতন হয়; আর তাঁদের উদ্ধারের জন্য তখনই দেবীর আবির্ভাব হয়। উপনিষদেও এই ভাবে

তিনি তাদের মাঝে নেমে এসেছিলেন, আর পুরাণেও তেমনই অবস্থায় তাঁর আবির্ভাব দেখি। সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার—অসত্য কখনও চির আসন লাভ করে না। আজ হোক্ বা কাল হোক্ এক দিন সত্যের জয় হবেই। এই জগৎ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত, অসত্য হতে সত্যের দিকেই তার গতি স্বাভাবিক। তাই মাঝে কিছু দিন অসত্য-অসুর আমাদের মাঝে রাজত্ব করলেও, তার নিধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে জন্য চাই তপস্যা। তপস্যার তেজ সংহত হয়েই অসুরক্ষয়কারিণী দেবীর ভুবনে আবির্ভাব হয়। জীবে জীবে তিনি রয়েছেন আত্মমায়ায় আবরিত হয়ে। সাধারণ জীব তাঁর বা তাঁরই ভিতরে যে তিনি অজ্ঞানে আবৃত, তা বোঝে না।

অজ্ঞাননাশিনী দেবীর দশহস্তে আয়ুধ নিয়েই আস্‌তে হয়। অন্তরের ও বাহিরের শত্রু বিনষ্ট করবার জন্য যে দুর্দ্দম প্রচেষ্টা, সেই তীব্র আকুলতাই শক্তি লাভের উপায়। কিন্তু যেখানে সে শক্তি ভোগেই ব্যয়িত হয়, সেখানে তার প্রতিক্রিয়ারূপ অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সত্যে যে আমাদের চিরন্তন অধিকার; সত্যের পথে চল্‌তে গিয়ে যদি মুসড়িয়ে পড়ি, তবেই আকুলতা দেখে শক্তিময়ী নেমে আসবেন। আর আয়ুধহস্তে সমস্ত বিঘ্ন-অসুর বিনাশ করবেন।

বাঙ্গালী হৃদয়বান্ জাতি। তাই ব্রহ্মের এই মহাশক্তিকে আপন নাড়ীর সঙ্গে জড়িত 'মা' বাণীতে সম্বোধন করে তাঁর পূজার ঘটা করে। নতুবা উপনিষদের যুগে সেই হৈমবতীকে মা বলে এমন ভাবে গ্রহণ করা হয়নি; শুধু ব্রহ্মের শক্তিরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেই উপনিষদেরই এক সংক্ষিপ্ত রূপ তন্ত্র। বাঙ্গালী বেদের যুগ হতে বর্ত্তমান তন্ত্রের সারভূতা শক্তিকে এমন করে জড়িয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীর তো কথাই নাই, ভগবানের সঙ্গে অহরহঃ জড়িত, প্রতি কর্ম্মে ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ ভারতবর্ষেও আর কোনও জাতি দুর্গোৎসবকে এত করে আঁকড়ে ধরে নাই। শরতের দেহমন-পাবন-কারী মৃদু মন্দ পবন বইতে না বইতে, বর্ষার মেঘ-মলিন আকাশ নির্ম্মল হতে না হতে বাঙ্গালীর প্রাণে শক্তিময়ীর সাড়া পড়ে। ঘরে ঘরে মায়ের পূজার আয়োজন চল্‌তে থাকে। বার মাসে তের পার্ব্বণ-কারী বাঙ্গালী, এমন কি কবিকুলপ্রসিদ্ধ বসন্তকেও বুঝি ততটা আমল দেয় না, যতটা দেয় শরতের সুনীল আকাশকে। এ যে তার মায়ের স্মৃতি। মণিহারা ফণীর মত মা যেন তার সারা বছরে আসি-আসি করেও না এসে সব দিকে সুন্দর হয়ে মাঠঘাট শস্যশ্যামলা করে, বাঙ্গালীর প্রাণে তাঁর আগমনীর সুর জাগিয়ে জীবনে নবীন চেতনা দিতে শরতে তাঁর স্নেহের দুলালকে এসে কোলে করেন। কিন্তু আমরা মাত্র তিন দিনের জন্য ঢাক-ঢোল বাজিয়ে—পাড়াপ্রতিবেশীকে আনন্দে মজিয়ে সারা বছর আবার যে তিমিরে সে তিমিরে ডুবে যাই। কিন্তু মায়ের এই আবির্ভাবকে প্রতি নিঃশ্বাসে সার্থক করে তুলবার মত যদি শক্তির সর্ব্ববিধ চর্চ্চা করি তবেই আমরা শক্তিময়ীর সন্তান শক্তিমান হব—তখন কারও কাছে শক্তির জন্য হাত পাততে হবে না।

শক্তি-সাধনা

—(*)—

সকলের এক মন এক প্রাণ চাই—তবে মহাশক্তির উদ্ভব হবে। বিচ্ছিন্ন শক্তির উত্তেজনায় মাকে স্থূলে পাওয়া দূরে থাকুক—এমন কি ভাবরূপেও মায়ের দর্শন মিলে না। তাই মাতৃসাধক জাতির প্রাণে প্রথমেই ঐক্যের ভাব জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। সে ঐক্য পরিবারের মাঝে, একটীর দেশের মাঝে, মুষ্টিমেয়ের মাঝে উদ্ভূত হলেই চলবে না—তার দরুণ চাই সমষ্টির প্রাণে শক্তির অনুরণন; প্রত্যেকের মাঝেই শক্তির তরঙ্গ খেল্‌তে আরম্ভ করুক, তারপর ঐক্যের কথা। প্রথমে শক্তির অর্থাৎ নিজস্ব ইচ্ছার স্ফুরণ হোক্‌। একটা কিছু চাইতে হবে—এবং তা প্রাণ দিয়েই চাইতে হবে। প্রার্থনার মাঝে, আকাঙ্ক্ষার মাঝে একটুও সংশয় বা ভণ্ডামী থাক্‌লে চল্‌বে না। প্রাণের সবটুকু আবেগ নিঃশেষে ঢেলে দিতে হবে ইষ্ট মূর্ত্তির পদ-যুগলে। তারপর দেখা যাবে মনস্কামনা সিদ্ধ হয় কি, না ব্যর্থ মনোরথ নিয়েই ফিরে আস্‌তে হয়। আমরা প্রার্থনা কর্‌তে ভুলে গিয়েছি—যা চাই, তার মাঝে সন্দেহ থাকে, আশঙ্কা থাকে। পদে পদে বিফলতার অস্পষ্ট ছায়াই যেন দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠি! তাই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়—এতে কি আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হবে? বাঞ্ছিত ধন কি এত সহজেই মিল্‌বে?

সংশয়ের চেয়ে বড় শত্রু আর নাই—আমাদের সকল কাজেই বিঘ্ন উৎপন্ন করে এই সংশয়। আমরা সব মিল্‌তে পারি না সংশয়ে, প্রাণের অনুভূতির ভাষা দিতে পারি না—সংশয়ে; পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না—সংশয়ে। এই সংশয়ই আমাদের শত্রু। কাজেই শক্তি-সাধকের প্রথম কাজই হল এই সংশয় নিরশন। চারিদিকের বিফলতায়, নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার দেখেও ভয় পেয়ে সাধনা ত্যাগ কর্‌লে চল্‌বে না। শক্তি-সাধককে এক আসনে বসে থাক্‌তে হবে অচল-অটল হয়ে। হয়ত সারা রাত কেটে যাবে, গভীর নিশীথে কাল্পনিক শত্রু এসে বুকে ছুরী বসাতে চাইবে—চারিদিকে অস্পষ্টতার—বিফলতার দৃশ্যই ফুটে উঠ্‌বে; কিন্তু সাধকের প্রাণের আশা তখনো অন্তরের মণি-কোঠায় মিটি মিটি করে জ্বলতে থাক্‌বে। সেই একটুখানি আশাকে কেন্দ্র করেই সিদ্ধি লাভের সূচনা হবে। ধীরে ধীরে সাধকের মনোবাসনা একটী একটী করে সফল হবে। তখন মা এসে বেচে বর দিয়ে যাবেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভের একমুহূর্ত্ত আগ পর্য্যন্ত, আত্ম সাধনার বিত্তাময় বীর্য্যে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে থাক্‌তে হবে। বাইরে প্রলয় হয়ে গেলেও অন্তরের একাগ্র সাধনার একটুকুও নির্ব্বাণ হবে না!

সংগ্রাম চাই—সংগ্রাম না হলে সিদ্ধি করায়ত্ত হবে কেমন করে? আর সংগ্রাম কর্‌ব না—আমরা যে শক্তিময়ীর বীর্য্যবান্‌ সন্তান! মা যে নিজেই বলেছিলেন—

> "যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
> যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

এ উক্তির রহস্যময় তাৎপর্য্য কয়জনে বোঝে? শক্তির বহির্ম্মুখ উত্তেজনায় কখনো শক্তি সিদ্ধি হয় কি?

শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে আত্মস্বরূপে অনুভব কর্‌তে হবে, তার দরুণ চাই সাধনা—চাই বীর্য্যময় প্রাণের প্রেরণায় উন্মাদ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া!—নির্ম্মম নির্ভীক প্রাণে!—দুনিয়া টলে টলুক—কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব কখনো—এই সঙ্কল্প নিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে হবে।

যাদের প্রাণে কোন সঙ্কল্প নাই, যে জাতির মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ কোন ব্রতের অনুষ্ঠান নাই—সে জাতির আবার আশা কি—ভরসা কি? মনে আছে প্রতাপ সিংহের ব্রতের কথা? ওঃ, কত কষ্টই না সহ্য করে গিয়েছিলেন জীবনে। কোন মতেই কেউ সেই আত্ম বলে বলীয়ান্ পুরুষকে আপন দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারেনি। কেন পারেনি?—তিনি ছিলেন শক্তি-সাধক, তাই!

বাংলার সহজ সরল প্রতাপশালী মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে? মাকে তিনি কি ভাবে পেয়েছিলেন? মায়ের উপর তাঁর কতখানি জোর ছিল? শুনতে পাই—মা নাকি কন্যারূপ ধরে এসে তাঁর ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। দিবে না? শক্তি-সাধকের প্রাণে শক্তিময়ীর শক্তিই যে সঞ্চারিত হয়। কাজেই ভক্তের কাছে ভগবান তো বাঁধা পড়্‌বেনই!

আমরা যুদ্ধ কর্‌ব—কিন্তু সে যুদ্ধ হবে নিজের সঙ্গে। নিজকে শক্তি-ধারণের উপযোগী করে তুল্‌ব। শক্তির আতিশয্যে যেন আমরা অসুর না হই, তার দরুণই সাধনা। অসুররা কি মায়ের কৃপা থেকে বঞ্চিত ছিল? না, তা কখনো নয়। কিন্তু তাদের এই দুর্দ্দশা কেন? না, শক্তিকে জীর্ণ করে নিতে পারল না। যাঁর শক্তিতে তারা শক্তিমন্ত হয়ে উঠেছিল, তাঁকেই তারা অবজ্ঞা কর্‌তে ষড়যন্ত্র করছিল—তাদের দুর্গতি হয়েছিল এর দরুণই। তা না হলে মায়ে-ছেলেতে যুদ্ধ হতে পারে? যুদ্ধ—তার মাঝেও ছিল মায়ের মঙ্গল-প্রেরণা, অসুরদের নানা উপায়ে মা শিক্ষাই দিয়েছিলেন। দুষ্ট ছেলেকে মা একটু শাসন করেনই, তা বলে দেবতাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে পক্ষপাত করে যে মা এসে-ছিলেন যুদ্ধ কর্‌তে, তা নয়। মা শক্তিময়ী বটে, কিন্তু সে শক্তিদ্বারা সকলকে শান্তিতেই রাখ্‌তে চান; কিন্তু দুষ্ট-ছেলের উপদ্রব আরম্ভ হলেই সেই শক্তিরই প্রয়োগ একটু অন্যরকমের হয়। মা কি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন? তাই সেই অন্যায়ের প্রতিকারার্থে যাদের মাঝে ন্যায়োচিত সত্যনিষ্ঠার আভাস দেখা যায়—মা তাদের পক্ষই নেন। তাই দেবতাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে মা এসে তাদের সম্মুখে প্রকট হলেন। আর সেই মা উদ্ভূত হলেন কোথা থেকে? না,—

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

—ইন্দ্রাদি এবং অপর দেবগণের শরীর হতে সুমহৎ তেজ নির্গত হল, সেই তেজ একতা প্রাপ্ত হল; তারপর সর্ব্বদেবশরীরজাত অতুলনীয় তেজ একত্র হয়ে, তা হতে এক তেজঃ-পুঞ্জ নারীর আবির্ভাব হল। সেই নারীই হলেন মহাশক্তি কিংবা জগতের সৃষ্টি-প্রলয়কারিণী ক্রিয়াশক্তি। দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন সেই মহাশক্তি—তবে না তাঁরা বিজয় লাভ করেছিলেন।

কাজেই উদ্দেশ্যসাধনের মহাযজ্ঞে সকলের মনপ্রাণ এক করে তার পর আহুতি দিতে হবে। প্রাণের বিদ্যুন্ময় আবেগ যখন প্রদীপ্ত হোমানলের ন্যায় দাউ করে জ্বলে উঠ্‌বে, তখনই তা থেকে অভীষ্টসিদ্ধি-প্রদায়িনী মহাশক্তি মায়ের আবির্ভাব হবে; কাজেই মায়ের পূজা এত সহজ নয়; ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা কর্‌লেই মা এসে আবির্ভূত হন না। মা চান সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণের সম্মিলিত আবেগ! সেই আবেগের চরম অবস্থায়ই মা রূপ ধরে আবির্ভূত হন।

তারপর মা কি? মা তো আমাদেরই মনের একাগ্র সাধনা থেকে উদ্ভূত মহাশক্তি। সেই মা আমাদের অন্তরে, আবার সমষ্টি মানবের প্রাণে। আমরা সজাগ হলেই কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির জাগরণ। কাজেই মায়ের আবার বোধন কি? মা তো চিরজাগ্রতা; কেননা শক্তির ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে চল্‌ছেই। তবে কিনা আধারের যোগ্যতা এবং ধারণক্ষমতার তারতম্যানুসারেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাজেই ঘুম ভাঙ্গাতে হলে, আমাদেরই ঘুম ভাঙ্গতে হবে; আমরা এখনো নিদ্রিত। নিদ্রিত বল্‌ছি এর দরুণ যে আমরা এখনো সূক্ষ্ম মহাশক্তির আশ্চর্য্য লীলা দেখে ধ্যানসমাহিত হতে পারিনি। মহাশক্তির মূল-উৎসের সন্ধান আমরা এখনো পাইনি। সর্ব্বত্র কেবল বাহিরে বাহিরেই উত্তেজনা!

উপনিষদে আছে, জাতবেদ, মাতরিশ্বা, মঘবন্‌ তাঁরা কেউ মহাশক্তির খবর দিতে পার্‌লেন না। তাঁরা মাত্র বাহিরের উপলক্ষ্য—তাঁদের ভিতর দিয়ে এক মহাশক্তির ক্রিয়া চল্‌ছে। কাজেই বাইরের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেই কিম্বা সাময়িক ভাবে সকলকে উত্তেজিত করে তোলবার চেষ্টা কর্‌লেই সে মহাশক্তির অনুসন্ধান মিল্‌বে না। সকলকে "শান্ত উপাসীত" হতে হবে। তারপর সেই সূক্ষ্ম বিরাট মহাশক্তির প্রচণ্ড লীলা অনুভব হবে।

স্থূলে আমরা বায়ুর অগ্নির প্রচণ্ড শক্তি দেখেই স্তম্ভিত হয়ে যাই; কিন্তু তার মূলেও যে শক্তির ক্রিয়া চলছে, তার সঙ্গে একবার ধ্যানগম্ভীরতার সম্মিলন হলে বিস্ময়ে, পুলকে, ভয়ে কি হবে, তা তো অনুমানই করা যায় না। শক্তি অরূপা কিন্তু সমষ্টি প্রাণের আকুলতায়, প্রয়োজনানুসারে সেই শক্তিরই স্থূলে আবির্ভাব হয় কিম্বা স্থূলে না হলেও ভাবরূপে সকলের প্রাণেই সেই মহাশক্তির এক সুর বাজিয়ে তোলে। তখন সকলের এক চিন্তা এক ধ্যান সহজ হয়ে আসে। মায়ের পূজা হয় তখনই; তা না হলে বিরোধ নিয়ে মায়ের পূজা হওয়া তো দূরের কথা, মায়ের আবির্ভাবই যে হয় না—ঘটে কিম্বা পটে!

যা চাইব, তা আত্যন্তিক হওয়া চাই; অর্থাৎ কোন রফায় কিম্বা কোন প্রলোভনে সে আকাঙ্ক্ষার হোমানল নির্ব্বাপিত হবে না। আর প্রার্থনার মাঝে বিন্দুমাত্র গলদ থাকলেই তা পূর্ণ হবার কোন আশা নাই। কাজেই আগে ভাল করে বুঝে নিতে হবে—আমাদের কি প্রয়োজন, আমরা কি চাই? আশ্চর্য্য কথা—মহাশক্তির কাছে প্রার্থনা করে আবার বিফল-মনোরথ নিয়ে ফিরে আস্‌তে হবে? তাহলে বুঝ্‌তে হবে—সে প্রার্থনা সকলের প্রাণ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা ন

* * *

জোর করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না—প্রাণ থেকে তাগিদ না এলে মানুষ অনিচ্ছায় একটা উত্তেজনায় যোগ দিতে পারে বটে, কিন্তু সেই অনিচ্ছাপূর্ব্বক সম্মতিতে প্রাণে একটা নিদারুণ অবসাদ এনে উপস্থিত করে মাত্র। কাজেই দেশের কাজ, দশের কাজে আধ্যাত্মিকতায় যে কোন ক্ষেত্রেই হোক্‌ না কেন, জোর করে প্রবোধিত করাতে কোন ফল হয় না। যার প্রাণে হয়ত স্বভাবতঃই এক দিকে তেমন ভাবে সাড়া আসছে না, তাকে নীতির উপদেশ দিয়ে প্ররোচিত করে কি লাভ? বরঞ্চ নীরবে প্রার্থনা চলুক; ভিতরে ভিতরে সবার শক্তিসঞ্চার চল্‌তে থাকুক। সবার প্রাণেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলে উঠুক। এই নীরব সাধনাতেই কাজ এগোবে। আর মহাপুরুষদেরও দেখি এই আদর্শ। তাঁরা অন্তরের শক্তির উপরই নির্ভর করেন—Soul

forceএর চেয়ে বড় force আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আর এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা কি না কর্‌ছেন ?

শক্তির উদ্বোধন, শক্তির আবাহন আমাদের হৃদয়ে—বাইরের মণ্ডপে জাঁক্‌জমক্ করে মূর্ত্তি গড়ে পূজা কর্‌লেই শক্তির জাগরণ হয় না। অন্তরে শক্তি জাগাবার দরুণ বাইরের রাজসিক অনুষ্ঠানের আয়োজন না হলে যদি না-ই চলে, তাহলে বুঝ্‌তে হবে সেই শক্তি আত্মিক শক্তি (Soul force) নয় ! প্রয়োজন মিটিয়ে কিম্বা প্রয়োজন-সাধনের অর্দ্ধপথেই হয়ত সেই শক্তির বিনাশসাধন হবে। আর দেখাও যাচ্ছে—দুরভিসন্ধি নিয়ে যে শক্তি আয়ত্ত হয়, তার ক্রিয়া অপরের জীবনে সঞ্চারিত হওয়া দূরে থাকুক, নিজের জীবনকেই অগ্রে ধ্বংস করে !

আমরা শক্তির উপাসক, কিন্তু শক্তির তির্য্যক্ প্রকাশ চাই না। তাই শক্তিকে আয়ত্ত কর্‌বার দরুণও আমরা সাধনা কর্‌তে বলি। শক্তির যেমন এক দিকে প্রচণ্ড রূপ আছে, তেমনি শান্ত রূপও আছে। মহাদেব কম শক্তিধর ছিলেন না—তিনি বিষ খেয়েও হজম করে নিলেন ; জগতের ভাল-মন্দকে এমন নিরপেক্ষ ভাবে আর কেউ গ্রহণ কর্‌তে পারেন নি। তাঁর এই নিষ্প্রতিক্রিয় আত্মসমাহিত ভাব কি আদর্শ নয় ? তিনি মৌন থেকে স্তব্ধ থেকে কি কম কাজ করে গিয়েছেন ?

আমরা বলি—আধারশুদ্ধিই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তা না হলে ধর্ম্মের কর্ম্মের যে কোন দিকের কর্ণধারদেরই আত্মশক্তির অপব্যয় হয় মাত্র। কেননা যোগ্য আধার ব্যতীত শক্তির স্ফূরণ হয় না ; অপরিশুদ্ধ আধারের দোষে শক্তি বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়। কত মহৎ ইচ্ছা এই ভাবে পণ্ড হয়ে যাচ্ছে ! অসংযমী, অতপস্বীর ভিতর দিয়ে শক্তিসঞ্চার হবে কি করে ?

কোন নিমিত্ত কিম্বা আকস্মিক ঘটনা-বৈচিত্র্যকে উপলক্ষ্য করে যে উত্তেজনা কিম্বা শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে অপরকেও এর দরুণ প্ররোচিত যারা করে, তাদের চারিত্রিক বলের ভিত্তি কতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত, তা তাদের নিরর্থক বাগাড়ম্বরেই প্রতিপন্ন হয়। আড়ম্বর না করলেই, কিম্বা সকলের সঙ্গে সম্মতিসূচক হস্তোত্তলন না কর্‌লেই যে কার্য্য-সাধন করা যায় না, তা নয়—জগতে এখনো অনেক নীরব কর্ম্মী রয়েছেন। সকলের সঙ্গে নেমে তাঁরা চীৎকার করেন না বলেই তাদের শক্তিকে অবিশ্বাস কর্‌বার উত্তেজনা কারও কারও থাক্‌লেও জগৎশুদ্ধ সবারই এই ভাব নয় ! শক্তি বিকাশেরও বৈচিত্র্য আছে। এক ছাঁচে বা এক প্রয়োজনে ঢালাই কর্‌তে না পার্‌লেই যে তা নিরর্থক তা নয়। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের মাঝেই কোন কোন বিষয়ে সর্ব্বসম্মতি আছে, আর তার দরুণ সবাই স্বার্থত্যাগ কর্‌তেও প্রস্তুত—কিন্তু সে স্বার্থত্যাগ যার যার ব্যক্তিগত ভূমি থেকেও হতে পারে ; তার দরুণ জোর জুলুম করা কি ন্যায়সঙ্গত ? শক্তি থাক্‌লেই তার অপব্যবহার করে পৌরুষ দেখানোতে কোন লাভ নাই, বরঞ্চ তাতে অহিতই হয়। শক্তি দিয়ে শান্তি আন্‌তে হবে—সামঞ্জস্য আন্‌তে হবে। শক্তিকে আয়ত্ত কিম্বা হজম কর্‌তে না পার্‌লে, পারিপার্শ্বিকের উত্তেজনায় নিজের শক্তিকে ঠিক রাখাও দুষ্কর। এ ভাবে অনেকের শক্তিই পণ্ড হয় ; এর চেয়ে যারা স্বার্থসাধক, মহৎ লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিচার করে তাদের এই আত্মরক্ষার ভাবকে আমরা শ্রদ্ধা করি—তবু হৈ চৈ করে শক্তির বৃথা অপব্যয় কর্‌তে চাই না !

* * *

তারপর মায়ের পূজা—মহাশক্তির পূজা ! তার প্রণালী তো সুরথ এবং বৈশ্যই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ;—

নিরাহারো যতাহারো তন্মনস্কো সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ॥

—বলির দরুণ আবার পশুকে বধ করতে হবে ? নিরাহার, সংযতাহার, তন্মনস্ক এবং সমাহিত হয়ে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে বলি দিতে হবে ; মাকে পেতে হবে নিজেরই তেজঘনীভূত রূপে, মায়ের প্রতিমা স্থাপন করতে হবে হৃদয়ে—আবার নিজের বুক চিরে বলি প্রদান করতে হবে ; কাজেই এই মা বাইরের মা নন—আমাদেরই বুকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের ঘনীভূত মূর্ত্তিমাত্র

কারও সাধনা, কারও তেজ ব্যর্থ হবে না—মহাশক্তিরই এক এক অংশ নির্ম্মাণ হবে তাতে ; এক এক দেবতার তেজ হতে মায়ের দিব্য শরীরের এক এক অংশ সৃজন হয়েছিল ; কাজেই প্রাণবন্ত সাধকের সাধনার বৈচিত্র্য থাকলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই —চাই শুধু প্রাণ, আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ! সৃষ্টি-যজ্ঞে সবারই বিশিষ্ট শক্তি আহুতি দিতে হবে—প্রয়োজনে খাটতে হবে ; তবে না সেই মহাশক্তি মায়ের আবির্ভাব হবে !

সত্য শক্তির অব্যর্থ বীর্য্য : তাতে সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রের সাধকও বীর্য্যশালী সাধক, তাই তার মন্ত্রশক্তিতে স্থূল রূপের সৃষ্টি হয়। প্রাণের সুরে অর্থহীন শব্দেও বিচিত্র ঝঙ্কার উঠে। তান্ত্রিক সাধকের মন্ত্রগুলির এত প্রচণ্ড শক্তি ; না বুঝেও কেউ সেই সিদ্ধমন্ত্র জপ করলে তারও সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। এ সবের মূল কারণ কি—না সাধক প্রাণের চিন্ময় বীর্য্যের প্রভাব ; সেই সাধনশক্তি ব্যর্থ হবার নয় —তাতে সৃষ্টির বীজ উপ্ত !

সাধনায় সিদ্ধ হলে সাধক বুঝতে পারে যে, মা তো বাইরের নয়—এ যে আমারই হৃদয় ছানিয়ে-গড়া রূপের জ্যোতিঃ মাত্র ; কাজেই মাতৃসাধকের প্রাণে তখন অসীম বল আসে—মায়ের উপর তখন তার দাবী খাটে ; "দেখা দিবি কি না মা বল্" —এই বলে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় সাধক ; কেননা সাধকের প্রাণে এই বিশ্বাস প্রবল ভাবেই তখন উৎপন্ন হয় যে, মা ছেলেকে কখনো ফাঁকি দিয়ে আড়ালে থাকতে পারবে না। মাতৃসাধক একজেদী ছেলের দাবী পূরণ না করে কি আর মা তখন থাকতে পারেন ?

যে মায়ের নাড়ীর সঙ্গে আমাদের জীবন মরণের সূত্র জড়িত, তাঁকে পেতে হলে সাধনা চাই ; রামকৃষ্ণদেব নাকি এক একদিন নিদারুণ আকুলতায় প্রাণের অনিবার্য্য ছটফটানিতে, বালিতে মুখ ঘষতেন ; মাকে তিনি পেয়েছিলেন—কিন্তু কত কষ্ট করে তাঁকে পেতে হয়েছিল ; কাজেই শক্তিসাধনা সহজ ব্যাপার নয় ; জীবন-মরণ পণ, তারপর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ; মা নিষ্ঠুরা—দয়া মায়াহীনা, কেননা সহজে মায়ের প্রাণ গলে না ; মা চান, সাধনা করে ছেলের বুকে জোর আসুক, ছেলে ধৈর্য্যশীল বীর্য্যশালী হয়ে উঠুক !

* * *

মায়ের মূর্ত্তি—এ তো ভাবেরই ব্যঞ্জনা মাত্র ; ভাবের আর কতটুকুই বা প্রকাশ হয়, কাজেই রূপের মাঝে ধরা দিয়েও মা অরূপাই থেকে যান—ভাবরূপে, অদৃশ্য শক্তিরূপে ; তারপর চিত্ত-সত্ত্ব নির্ম্মল হয়ে গেলে—এই স্থূল রূপও অন্তর্মুখী হয়ে যায় ; মা তখন মনোময়ী, মনোময়ীরূপে মায়ের তখন অনন্ত-রূপের অন্ত নাই ; মায়ের তখন অনন্ত রূপ। চিত্তের উন্নতির এক এক স্তরে এক একভাবে ভাবরূপী মায়ের সাক্ষাৎ মিলে। আর ভাবরূপেই তো মা বিশ্বময় অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করছেন—সেই মা বিশ্বজননী—বিশ্বই তাঁর সন্তান ; মা তখন বিরাট-রূপে সমষ্টি সন্তানের প্রাণে এক ভাব জাগিয়ে তুলেন ; আর মাকে ভাবরূপে না চিনলে, বুদ্ধির বিভেদে মাকে

নিয়েও কতদিক থেকে অমিলের অসামঞ্জস্যের সূত্রপাত হবে; তা না হলে মাতৃসাধকের মাঝে আবার বিরোধের কোন কারণ থাকতে পারে?

* * *

শক্তিতত্ত্ব বুদ্ধিরও অতীত, তাই প্রচণ্ড শক্তির স্ফুরণে বুদ্ধিও দিশেহারা যায়; বিচার-বিশ্লেষণ করে কে কবে শেষ পেয়েছেন? কে সেই মহাশক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করতে পেরেছে?

চিত্ত বিশারদ হয়ে গেলে যে জ্ঞানের দীপ্তি অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তুলে—পাতঞ্জল দর্শন যাকে "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা" বলে আখ্যা দিয়েছেন—সেই জ্যোতিঃ বা জ্ঞানালোক মহাশক্তিরই বিশুদ্ধ রূপের আভাস নয় কি? যোগকৃচ্ছ্রতাতেও যোগীর চিত্ত সরস থাকে কিসের গুণে? কার প্রসাদে? চিত্ত-সত্ত্ব নির্ম্মল হলে মা তখন মনোময়ী রূপে অনন্ত রূপের বিলাসে নিজকে প্রকাশ করেন; "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" রূপে মা যখন সাধকের অন্তরকে আলো করে বিরাজ করেন—তখন সাধকের প্রাণে কোন ভয় থাকে না; আত্মজ্যোতিঃ দর্শনে সাধক তখন তন্ময় হয়ে থাকেন। যোগীও তো মায়ের দর্শন থেকে বঞ্চিত নয়, অবশ্য সে রূপ স্থূল রূপ নয়—ভাবরূপের ব্যঞ্জনা মাত্র। যারা স্পর্দ্ধা করে শক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল, শক্তিরই প্রভাবে তারা আবার শক্তিকে মানতে বাধ্য হয়েছে; তবে স্বীকারোক্তিটা সহজ ভাবে না করে "অ" অক্ষরটী পূর্ব্বে রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে; যেমন অ-ব্যক্ত, অ-দৃষ্ট, অ-নির্ব্বচনীয়, অ-পূর্ব্ব ইত্যাদি! কাজেই শক্তিকে অস্বীকার করেছেন এমন কেউ নেই—তবে স্বীকারের মাঝে মুখ্য গৌণ এই মাত্র প্রভেদ থাকতে পারে!

* * *

আমরা শক্তির উপাসক—কাজেই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ জাতি; এই জাতির মাঝে মহাশক্তির ক্রিয়া বিশেষভাবে সঞ্চারিত হবেই হবে। যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে, আমরা এখনো ঠিক শক্তি-সাধনার উপযোগী হতে পারিনি; কাজেই নিজকে সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। চিত্তকে সাত্ত্বিক করলে তারপর শক্তিসাধনার অধিকার জন্মে; তা না হলে শক্তির অপব্যয় হয় মাত্র। কাজেই উত্তেজনা পরিত্যাগ করে আমাদের সংযমী হতে হবে, তপস্বী হতে হবে আগে, তারপর আমাদের ভিতর দিয়ে মহাশক্তির ক্রিয়া হবে ঠিক ঠিক, আর তাতে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল কিম্বা সাময়িক উত্তেজনায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দিবার কোন ভয় থাকবে না; অপরিশুদ্ধ আধারে শক্তির ক্রিয়া প্রলয়েরই সূচনা মাত্র!

সার্থক পূজা

—*—

(সত্য ঘটনা)

ভাদ্র মাসে হঠাৎ একদিন শুনি, ডোম-পাড়ার কষ্ঠী নাকি ৪ দিনের জ্বরে মারা গিয়েছে। ওর মৃত্যু-সংবাদে আমাদের প্রাণে খুব আঘাত লাগল। ও আমাদের বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম করেই তার পরিবার প্রতিপালন করত। পরিবারে বিশেষ কেউ নাই, তার স্ত্রী আর একটী মাত্র ছেলে সর্ব্বেশ্বর। আমাদের বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম করে যে পয়সা পেত, এবং আমাদের পরিবারের মেয়েরা তার স্ত্রীকে এবং ছেলেকে মাঝে মাঝে কৃপা-

পরবশ হয়ে যা দিতেন, তাতে তার একরকম সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটত। তার একটা বদ্-অভ্যাস ছিল আফিং খাওয়া, আর এ অভ্যাসটা ডোমদের মাঝে প্রায় অনেকেরই আছে। তাহলেও অন্যান্য ডোমদের মত বষ্ঠি স্বাধিকারপ্রমত্ত ছিল না—নেশা করেও সে বেশ আপ্রাণ খাট্‌তে পারত। ওর এই কর্ম্মব্যপরায়ণতা, এবং নিজের কাজ বলে সব কাজই দরদ নিয়ে করত বলে আমাদের পরিবারের প্রত্যেকে তাকে আদর করত। পূজা-পার্ব্বণে তার একটা বিশেষ পাওনা ছিলই। ওদের সমাজে নিয়ম আছে যে তারা ব্রাহ্মণ-বাড়ী, কিম্বা তাদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর কারও বাড়ীতে খাবে না। কিন্তু বষ্ঠি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে প্রসাদ পেত।

তার কি যে কৃতজ্ঞতা ছিল! একটু কিছু পেলেই যেন তার মন-প্রাণ ভরে উঠত। তার হাসিতেই তার সরলতা প্রকাশ পেত! এমনি করে আমাদের বাড়ীতে সারা-দিন কাজ-কর্ম্ম করে সন্ধ্যা-সময় সে বাড়ীতে যেত। কোন কোন দিন কাজ-কর্ম্ম সেরে আবার আমাদের পরিবারের কর্ত্তাদের সঙ্গে বেশ হাসি আমোদের গল্পও করত। তাদের সামাজিক প্রথা নিয়ে কত যে কথা বল্‌ত, আর আমাদের সবাইকে হাসিয়ে মারত, তার ইয়ত্ত নাই। আজ সে মরে গিয়েছে বটে, কিন্তু বষ্ঠির স্মৃতিস্বরূপ তার নিজ হাতের অনেক চিহ্নই আমাদের বাড়ীতে এখনো রয়েছে। মোট কথা, বষ্ঠির সঙ্গে আমাদের শুধু প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ ছিল না। আমাদের প্রত্যেকের মনের মাঝেই তার চরিত্রের অমায়িকতার ছাপ রেখে গিয়েছে।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে গ্রামের মাঝে সেই ছিল মোড়ল। এত কাজ-কর্ম্ম করেও রাত্রে সে তাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বৈঠক জমাত। সে যে-দিন নাম-ঘরে* না যেত, সে-দিন তাদের নাম গাওয়া মোটেই ভাল হত না। নিজে ভাল হবার, সকলকে ভাল কর্‌বার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল তার মাঝে। তা না হলে সারা দিনের এত পরি-শ্রমের পর আবার গিয়ে সকলকে নিয়ে ধর্ম্ম বিষয়ে একটা আলোচনার বৈঠক জমিয়ে তোলা—এ যার-তার কাজ নয়। তার চরিত্র-গুণে গ্রামের সকলই তাকে মান্‌ত, তার কথাকে কেউ অবহেলা কর্‌ত না!

সে-ও মরেছে, আর গ্রামেরও সেই সমৃদ্ধি নাই। কেবল শুনি দলাদলি আর ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি। ডোমপাড়া মাঝে মাঝে বেড়াতে গেলেই, তার অভাবে যে কি ক্ষতি হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। তার প্রভাব এখনো রয়েছে বটে, কিন্তু কারও একটা ভাল হবার দিকে তেমন ঝোঁক নাই। সবাই হাল-চাষ কর্‌ছে, ডোবায়-খালে মাছ মার্‌ছে আর "কানি" (আফিং) খেয়ে দিব্যি রঙ্গ-রস করে দিন কাটাচ্ছে।

* অসমীয়া ভাষায় উপাসনা সঙ্গীত বা লীলা ও প্রার্থনামূলক কীর্ত্তনাদিকে বলে "নাম"; "নামঘর" অর্থাৎ উপাসনা-মণ্ডপ বা কীর্ত্তন-মন্দির।

কণ্ঠী জাতিতে ডোম ছিল বটে, কিন্তু তার অন্তর বেশ উন্নত ছিল। চাকর হলেও তার চারিত্রিক গুণ, কঠোর কর্ম্ম করার ক্ষমতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতার দিক দিয়ে আমাদের অনেক কিছুই শিখ্‌বার ছিল তার কাছে।

আজ একটা ঘটনা উপলক্ষ্যেই তার সম্বন্ধে এত কথা মনে আস্‌ছে।

অন্যান্য বার ৺পূজার আগেই সে এসে তার ছেলে সর্ব্বেশ্বরের দরুণ আমাদের বাড়ী থেকে একখানা কাপড় আর জামা চেয়ে নিত। আর আমাদের পরিবারের সকলের পূজার কাপড় কিনার সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলের দরুণও একখানা কাপড় কিনা হত। এবার সে পূজার আগেই মারা গিয়েছে, তার স্ত্রীও লজ্জায় আসেনি, কিন্তু নবমীর দিন হয়ত তার ছেলের কান্নায় টিক্‌তে না পেরে সর্ব্বেশ্বরকে নিয়ে এসে তার মা হাজির।

পূজার বাড়ী—সকলেই আনন্দে-আয়োজনে-উদ্যোগে ব্যস্ত, কে আর কার পানে তাকায়? গ্রাম থেকে সারি সারি ছেলে-মেয়ের দল কত যে এসে প্রসাদ পেয়ে পেয়ে যাচ্ছে, তার সংখ্যা নাই। আর আমাদের এই দুর্গাপূজায় সব চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়, কাজেই পূজার তিনটী দিন কাউকে কোন বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয় না।

কণ্ঠীর স্ত্রী তার ৭।৮ বৎসরের ছেলে সর্ব্বেশ্বরকে নিয়ে এক কোণেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে কেউ লক্ষ্য করেনি। সুন্দর ফুটফুটে একটী ছোট্ট ছেলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দাদার কাছে এসে হাজির। কাঁদছে আর বল্‌ছে—"বাবা! আমাকে একখান কাপড় "

এতক্ষণ কণ্ঠীর স্ত্রী দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে আস্তে সে-ও এসে সম্মুখে দাঁড়াল। তাকে দেখেই দাদা চি. . পার্‌লেন যে, এ কণ্ঠীর স্ত্রী। দাদা তো সর্ব্বেশ্বরকে নিয়ে একবারে বাড়ীর ভিতরেই হাজির—গিয়ে বল্‌লেন, "দেখ পূজায় তোমারা এত কাপড় বিতরণ কর্‌লে, কিন্তু আসল যাকে কাপড় দেওয়া উচিত ছিল, তাকেই তোমরা ভুলে গিয়েছ। এই দেখ কণ্ঠীর ছেলে সর্ব্বেশ্বর—তার মা-ও বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে। একখানা কাপড়ের দরুণ সে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। অন্যান্য বার ওর বাপই এসে কাপড় চেয়ে নেয়—এবার তো ভাদ্র মাসেই কণ্ঠির মৃত্যু হয়েছে কিনা, তাই কে তার ছেলের কাপড়ের দরুণ তাগিদা কর্‌তে আস্‌বে? দেখ এসে, তার জলে ভরা ছল-ছল চোখ দুটী!"

আমি কি একটা কাজে বাড়ীর ভিতরে গিয়েছিলাম, গিয়ে কণ্ঠির ছেলের করুণ কোমল মুখখানা দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়্‌লাম। ৭।৮ বৎসরের বাপ-মরা ছেলে। পূজার সময় তার সমবয়সী সকল ছেলেই কাপড় পেয়েছে—কিন্তু তার তো আর বাপ নাই, কাজেই তাকে কাপড় দেবে কে?

দাদা তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক খুলে আমাদেরই ভাগিনা শচীনের দরুণ যে কাপড়-জামা কিনে এনেছিলেন, তা বের করে নিয়ে এলেন। পূজার দু'একদিন পূর্ব্বে শচীনের অসুখ হওয়ায় এবারের পূজায় তারা আসতে পারেনি। আসবে বলেই কাপড় কেনা হয়েছিল!

জামা-কাপড় এনে দাদা যেই নাকি সর্ব্বেশ্বরের হাতে দিলেন, তখন তার আনন্দ দেখে কে? কি যে করবে সে যেন আর দিশে পাচ্ছে না। কাপড় জামা নিয়ে বাইরে গিয়ে সে তার মায়ের কাছে হাজির। মা তাকে তখনই কাপড় পরিয়ে দিলেন। কাপড় পরে এসে আমাদের দেখবার দরুণ সে বাড়ীর ভিতর এসে আবার হাজির। ছেলেমানুষ এই একটুখানি আগে কেঁদে আকুল, আবার এখনি তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমাদের সবাইকে তার কাপড় পরা দেখিয়ে যখন সে আবার প্রতিমার সম্মুখে গিয়ে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকল, তখন যেন মনে হল, সেই নীচ জাতীয় ডোমের ছেলেটিকে কোলে করে নেবার দরুণ মা প্রত্যক্ষ ভাবে হাত বাড়াচ্ছেন।

সেদিন রাত্রে আমার ভাতিজা (অর্থাৎ দাদার ছেলে) হীরেন নাকি স্বপ্ন দেখেছিল, মা এসে বলছেন—"দেখ্, তোদের সপ্তমী এবং অষ্টমী পূজা কিছুই হয়নি; আজই আমার পূজা হয়েছে।" স্বপ্নের মাঝেই হীরেন নাকি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, "কেন মা, সপ্তমী অষ্টমীর দিন তোমার পূজা হয়নি কেন? কোন্ আয়োজনের ত্রুটিতে মা?" প্রত্যুত্তরে মা নাকি তার পানে স্নেহ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন—"দেখ্, তোরা তো ধনীর ছেলে, কত কাপড়-জামাই পরিস্; পূজা-পার্ব্বণের দিনে এই সব দীন-দুঃখীর ছেলেকেই কাপড়-জামা দিতে হয়।" এই কথা শুনেই নাকি হীরেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে সর্ব্বেশ্বর আর তার মাকে অভাব-অভিযোগের সময় এখন যথেষ্ট সাহায্য করা হয় আমাদের পরিবার থেকে। আর বিশেষতঃ দাদা সর্ব্বেশ্বরকে পড়াবেন বলে এক পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিয়েছেন!

অশ্রুপূজা

—(*)—

জগতে কেউ চায় না যে সে অপরের চোখে হীন হোক্—সে দুঃখ পাক্! তবুও কেন হীনতার কাজ করে? শাস্ত্রীয় ভাষায় উত্তর সহজ—সুখ পাওয়ার আশায়। কিন্তু সুখ তো তাতে কেউ পায়নি, বরং 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ' প্রভৃতি উত্তরমীমাংসা হতে আরম্ভ করে পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রেই পুনঃ পুনঃ দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করেছেন। এমন কি শূন্যবাদী বৌদ্ধও সাধন-পন্থার প্রথমেই জোর দিয়েছেন সৎ কর্ম্মের উপর। সকলের মতেই অসৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করতেই হবে। দুঃখময় বলেই অসৎ-কর্ম্মকে বারম্বার এড়িয়ে যেতে বলেছেন—এ বিষয়ে কোনও ধর্ম্মেই মতদ্বৈধ নাই।

কিন্তু মানুষ তা করে কেন? সংস্কার বশে। সংস্কার আসে বাসনা থেকে। বাসনার ইন্ধন বর্ত্তমান না থাক্‌লেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসমূহের কর্ম্ম দ্বারা তার ভিতর একটা যে ছাপ রয়ে গেছে, তার ফলেই তার উদ্ভব। ফুল ছিল আঁচলে, এখন নাই, তবুও গন্ধ সে আঁচলে লেগেই আছে—দুষ্কর্ম্ম এখন করছি না,. কিন্তু সুখের আশায় হয়ত আগে করেছি, তাই তার চিহ্ন বা একটা ছাপ মনের অন্তস্তলে রয়ে গেছে; যখনই বাইরে তার সুযোগ্য অবস্থা বা সুযোগ পাবে, অমনি তা ফুটে বেরুতে চায়। কাজেই বর্ত্তমানে সাধু থাকলেই হল না—পর মুহূর্ত্তেই টলাতে পারে।

মনে হতে পারে, এ তো বড় মুস্কিলের কথা! সব সময়ে কি তবে ভয়ে ভয়েই থাকতে হবে? প্রথম উত্তরে বল্‌তে হয়—হাঁ, ধর্ম্মভয়ই মানুষের আত্মরক্ষার প্রথম অস্ত্র। যখন সমস্ত কারণ খুঁজেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবনতির পক্ষে ধর্ম্মভয়টাকে একটা প্রধান কারণ বলে অনেকের মনে হয়, তখন এটাও মনে রাখা উচিত যে তথাকথিত ধর্ম্মভীরুতাই এখনও এ দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আস্‌ছে ও এ দেশের যে কোনও উন্নতির মূলে এ দেশের ধর্ম্মভাবকে ভিত্তি রাখ্‌তে হবে চিরদিন। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে অপর দেশ উন্নত হতে পারে, কিন্তু ভারতের পক্ষে তা অসম্ভব। হিন্দু যতদিন তার ধর্ম্ম সতেজভাবে মেনে চল্‌তে পেরেছে, ততদিন সে প্রায় হাজার বছরের উপর জগতের উপর প্রভুত্ব করেছে। কাজেই ধর্ম্মভয় তার পক্ষে অস্ত্র স্বরূপ। আর শুধু হিন্দু কেন—মানুষ মাত্রেই ধর্ম্মহীন হলে যথার্থ উন্নত হয় না।

ধর্ম্মভীরু হলেই দুর্ব্বল বলে মনে হয় কেন? ভীরু কথাটা থেকে ভয় বা সঙ্কোচভাব থাকাটাই প্রথম মনে আসে। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় যে, বস্তুত ধর্ম্মের জন্য, অন্ততঃ ধর্ম্মের নামে এ যাবৎ জগতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, মানুষ অতীতে ও বর্ত্তমানে ধর্ম্মের নামে যতটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সাড়া দিয়েছে, এমন ব্যাপক ভাবে আর কিছুতেই দেয়নি। এতেই প্রমাণ হয় যে বাইরে সুযোগ-সুবিধার অভাবে মানুষ যতই ধর্ম্মের বদলে অধর্ম্মের কাজ করুক, একটা শুভ ধর্ম্মবুদ্ধি তার মাঝে অন্তরহ থাকেই। সেটা বাইরের জিনিষ নয়, তায়ই অন্তরের সুপ্ত বস্তু।

কাজেই সংস্কার বশে মানুষ যে কেবল অসৎ-কর্ম্মই করতে পারে, তা নয়—উদ্‌বুদ্ধ করতে পারলে দেখা যে, সৎ সংস্কারও তার মাঝে কিছু কম নাই। কাকে বল্‌ছ অমুক বয়ে গেছে? হয়ত তার অন্তরের দেবতাকে দেখ্‌তে পাও না বলে, তার বাইরের আঁধার ঘুচিয়ে ভিতরের জ্যোতির্ম্ময়কে আবিষ্কার করতে পার

না বলে তোমার চোখই বয়ে গেছে। তাকে উজ্জ্বল করে, সে তীব্র দৃষ্টির সন্নিপাতে X-ray যন্ত্রের মত সমস্ত অস্বচ্ছতা ঘুচিয়ে দিয়ে, শুভ্র স্বচ্ছ স্বরূপকে ফুটিয়ে তোল! অদীন প্রাণের অগ্নিস্পর্শে সবাইকে খাঁটী সোণা কর—দেখবে, হীন দুর্ব্বল বস্তুতঃ কেউ নয়।

ভারতের ধর্ম্ম, বেদান্তের প্রাণ এই অদীন-সত্ত্ব। সে কি মানুষকে দুর্ব্বল করে? না, মহতো-মহীয়ান্, অমিততেজীয়ান্ করে! শক্তির জন্য পরের দ্বারে হাত পাততে সে শিখায়নি, সে শিখিয়েছে শিব হয়ে শক্তিময়ীকে আপন অন্তরে ধারণ করতে! কিন্তু আমরা শব হতে চলেছি আপন ধর্ম্ম বা সত্তাকে ভুলে গিয়ে। কাজেই ধর্ম্মকে দোষ দেব কি করে? যদি ধর্ম্মী চোখ মেলে তো দেখবে, ধর্ম্ম কাউকে ছাড়তে চায় না—ধর্ম্মকে গ্রহণ করে প্রত্যেকে আপন বিনাশের পথ রুদ্ধ করলেই হল।

এই চোখ বুজে থাকার সংস্কার বা ইচ্ছাকে জাগার সংস্কার দিয়েই বিদগ্ধ করতে হবে। সব সংস্কারই রয়েছে যখন, তখন অন্তরের দীপ্তিতে যেটীকে ইচ্ছা উজ্জ্বল করে অপর সংগুলিকে দগ্ধ করায় মানুষের যে চির অধিকার ও প্রভূত শক্তি বর্ত্তমান, তা সে ভুলে যায়। কিসে এ ভুল ভাঙ্গে? মানুষ স্বরূপতঃ যতই শক্তিধর বা মহান্ হোক্, বিরূপতঃ যে সে নিতান্তই দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র; এ ভ্রান্তের ভ্রম ভাঙ্গিয়ে শক্তির উদ্বোধন কিসে হবে?

তাই চাই শক্তির আরাধনা। আমি পাপী, দুর্ব্বল, বলে কাঁদাই সে শক্তির আরাধনা করা নয়। শক্তিময়ীর মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি জাগ্রত করতে হবে আপন বুকের বীর্য্যোৎসাহ দিয়েই। পূজা-পদ্ধতির মূল ভূতশুদ্ধি দ্বারা আগে আপনাকে তাঁর পূজার যোগ্য করে—তাঁর আসনের যোগ্যরূপে হৃদয়কে গঠন করে তবে তাঁর পূজা বা আরাধনা চাই। শুধু কান্নায় তা হয় না। তাই শক্তির পূজায় চাই রুধির—শুধুই অশ্রুনীর নয়। আপন বুকের রক্ত দিয়েই অর্জ্জন করতে হয়; শুধু কাঁদলে শক্তির চর্চ্চা হয় না—কান্নারই চর্চ্চা হয়!

শক্তি অর্জ্জনের প্রতিবন্ধকই অশুভ বা দুষ্কর্ম্ম। এই অশুভরূপী অসুরকে যেমন করেই হোক, পরাজয়ের চেষ্টা চাই ই। তাই অন্তর-দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে সিংহবিক্রমে তাকে আক্রমণ করতেই হবে। আপন প্রচেষ্টার তীব্রতা যেখানে অহরহ চলে, জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হলেও দেবতার কৃপা সেখানে বর্ষিত হবেই। অন্তরের পশুকে বলি বা উপহাররূপে দেবতার পায়ে সমর্পণ করেই এ যুদ্ধে জয়ী হতে হয়। যতই তেজীয়ান্ সাধক হোক্, আপন অশুভ সংস্কার বা ইন্দ্রিয়নিচয়ের হাত হতে আপন জোরের অভিমানে কেহই জয়ী হতে পারে না। যে বুদ্ধিদ্বারা অশুভ-সংস্কারকে শুভ-কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করবে, সেই বুদ্ধিই যে মায়ামুগ্ধ! ভোগের মায়া ছাড়িয়ে উঠে সাধ্য কি সে চোখ বা ইন্দ্রিয়কে অপর দিকে ফিরাবে!

তাই চাই একদিকে আপন বুকের একান্ত সংকল্প, অপর দিকে দেবতার আশীর্ভিক্ষা। শুধু আপন শক্তিতে নির্ভর করে অসুরের পরাজয় ঘটেছিল, আবার শুধু চোখের কান্নাতে আজ আমাদের হৃদয় জড় হতে বসেছে। প্রাণের কান্না কোথায়? প্রাণের কান্না হলে চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে বুকের মাঝে রক্ত হয়ে টগ্‌বগ্ করে ফুটত না কি?

আজ অশ্রুপূজায় প্রাণ-মন মাটী করে শুধু মাটীর পূজাই আমাদের সার হতে বসেছে। বিশ্বময়ীকে চিন্ময়ী করার বদলে মৃণ্ময়ী করতেই বসেছি—শক্তির উদ্দীপনায় প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহের পরিবর্ত্তে আসছে স্বল্পেই হতাশা। আর দুর্ব্বলের নিশ্চেষ্ট কান্নার বিকট কলরোলে দেবতাও বুঝি স্বাভাবিক মূর্ত্তি সংবরণ করে মরণরূপেই কৃপা করছেন! তাই পুনরায় বাঁচার পথে যেতে হলে আর হৃদয়-শূন্য অশ্রুপূজায় চলবে না—এবার চাই বুকের রক্তেরও মায়া ছেড়ে দিয়ে অসুরের সঙ্গে সংগ্রাম।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়!

শক্তি-প্রসঙ্গ

— ※ —

"আমি বোধ হয় ভাই নাস্তিকই হয়ে গিয়েছি। কৈ, এতদিন তো চলে গেল, এর মাঝে তো একদিনও মা নরমুণ্ড গলায় পরিধান করে অসিহস্তে আমার সম্মুখে এসে বর দিতে আবির্ভূত হলেন না! শুনছি আমাদেরই প্রতিবেশী কৈলাসচন্দ্র দের ছেলে কমল নাকি রোজই মায়ের দেখা পায়। মা নাকি এসে তার সঙ্গে কথা বলে, কত বর দিয়ে যান ইত্যাদি। তবে কি ভাই আমার জীবন বৃথা?"

"আচ্ছা প্রবোধ, তুই মহাশক্তি বা মা বলতে কি বুঝিস্ বল্ তো দেখি? তোর সঙ্গে এসে দু'চার দণ্ডের দরুণ মা কথা বলে গেলেন না বা দু'চারটা বর দিয়ে যাননি বলেই কি মহাশক্তির কৃপা থেকে তুই বঞ্চিত? অদ্ভুত তোর মনের সংস্কার! আচ্ছা, কমল তো রোজই মায়ের দেখা পায়, কিন্তু সে কি কর্ছে বা কি হয়ে গিয়েছে এই কৃপালাভ করে বল্ তো দেখি? শক্তিময়ী মায়ের দেখা পেয়ে যদি শক্তির স্ফুরণে জীবন উজ্জ্বল না হয়ে ওঠে, শক্তিলাভ করে যারা শক্তিহীন তাদের প্রবুদ্ধ করে তোলবারই যদি প্রেরণা না জাগে, যারা দুঃখে-দৈন্যে পড়ে হাহাকার কর্ছে, তাদের যদি প্রাণ দিয়ে সেবাই করতে না পারল সে, তা হলে মায়ের কৃপা পেয়েই বা কি হল? কমলের নাকি অহরহ মায়ের দর্শন হয়, কিন্তু এই মা কমলেরই কল্পনাপ্রসূত কাল্পনিক মা বল্লে ঠেকায় কে? মায়ের দেখা পেয়ে তার জীবন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্ছে কি? বিশেষ লক্ষণের মাঝে এই দেখি—তার মাঝে কোন একটা প্রচেষ্টা নাই, উদ্যম নাই, কেমন যেন একটা তৌষ্টিকতার মায়া-মন্ত্রে অহর্নিশি ভুলে আছে! তুই কি এমনি ধরণের মায়ের দর্শন চাস?

"তোর ভাই সবই ঠিক আছে, কেবল মাত্র কতকগুলি কুসংস্কার এসে তোর ঘাড়ে চেপে বসেছে! তুই অন্তরে অন্তরে যে শক্তিকে অনুভব কর্‌ছিস—সেই শক্তি কি কেউ নয়? তুই তো বলিস, আমি যখন অপরের দুঃখ দেখি, তখন আর স্থির থাক্‌তে পারি না, কে যেন আমার ঘাড়ে ধরে অপরের সাহায্যের দরুণ ঠেলে পাঠায়। আর আশ্চর্য্য, তখন যে আমি কোথা থেকে এত বল পাই তাও বুঝি না। এই যে কোথা থেকে বল পাস শক্তি পাস্, এ আর কিছু না—মায়েরই অদৃশ্য কৃপা তোর মাঝে বর্ষিত হতে থাকে! তুই মায়ের এত কৃপা পেয়েও বলিস—কৈ আমি তো মায়ের দেখা পেলেম না? দেখা না দিয়েও যদি আড়াল থেকে তোকে অমন করে শক্তিমন্ত করেন, তুই যদি কর্ত্তব্য সাধনের সময় বুকে অসীম বল অনুভব করিস, তাহলে অল্প সময়ের দরুণ মায়ের দেখা পাওয়া আর না পাওয়াতেই বা কি এল-গেল? তারপর যে শুধু চোখ দিয়ে মায়ের রূপ দর্শন করে,

সে তো হতভাগা, অনেকখানি বঞ্চিত! তুই যে হৃদয়ে শক্তিরূপে মাকে অনুভবের মাঝে পাচ্ছিস্। তুই মাকে অনুভূতিতে পাচ্ছিস—তবু তুই মায়ের কৃপা থেকে বঞ্চিত? তোকে মা যে কত ভালবাসেন, তা তোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখেই আমরা বুঝতে পারি! তোর মাঝে এই অতন্দ্রিত ভাব দেখে আমরাও কত আনন্দ পাই। নিজের দরুণ তোর একটুকু ভাববার সময় থাকে না, কোথায় দুর্ভিক্ষ হল, বন্যা হল, গ্রামে কোন্ দীন-দুঃখী অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে—এ সবের প্রতিবিধান করতে করতেই তোর সময় অতিবাহিত হয়। আমি তোর এই ক্ষমতা দেখে তোর প্রতি মায়ের এই অজস্র কৃপা বর্ষণ দেখে আশ্চর্য্য হই—তোকে রীতিমত ঈর্ষ্যা করি। কৈ, কমলের কথা তো মনে একবারও জাগে না। শুধু কমল কেন—আরও অমন মাতৃসাধক আছে, যারা মায়ের দেখা পেয়ে মানুষকে শুধু কুসংস্কারে দীক্ষিত করে। ওরে, আমি বলি, যে নাকি মায়ের দর্শন পেয়েছে, সে তার আপন ভাইয়ের দুঃখ-দৈন্য দেখে অমন উদাসীন হয়ে বসে থাক্‌তে পারে? মায়ের দেখা পেয়েও যদি অমন দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পায়, কর্ত্তব্য-বোধ বলে একটা মহৎ জিনিষকে উপেক্ষা করে চল্‌বার মত মৌন আত্মম্ভরী স্পর্দ্ধা জাগ্রত হয়ে উঠে—তাহলে সে কিসের দর্শন পেয়েছে মায়ের? আমি তো অমন মায়ের কৃপাকে উপেক্ষা করি। বলিস্ কি—শক্তি-উপাসকের ভিতর এমন ভীরু এবং কাপুরুষভাব্ থাকে?

"তারপর তুই কি মাকে নিছক কাল্পনিক মূর্ত্তিতেই পেতে চাস্? আর এই পাওয়াকেই তুই চরম মনে করিস্? মা কি তোর কাছে কল্পনার পট বিশেষ?—না, মায়ের সঙ্গে তোর মায়ে-ছেলের সহজ সরল প্রাণের সম্বন্ধ! তুই মাকে হঠাৎ মুহূর্ত্তের দরুণ দেখ্‌তে চাস্—না শক্তি রূপে হৃদয়ের মাঝে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি স্পন্দনে অনুভব কর্‌তে চাস্? বল্ তো দেখি, কোন্‌টা শ্রেয়ঃ?

"শক্তি রূপে যাকে তুই পাচ্ছিস্, তার কাছে বরঞ্চ প্রার্থনা কর্‌তে পারিস্ যে, আমায় আরও শক্তি দাও, প্রাণে বল দাও, যাতে দশের দরুণ, দেশের ভাইদের দরুণ আমি জীবন উৎসর্গ কর্‌তে পারি। মহাশক্তির কাছে এর চেয়ে যোগ্য-প্রার্থনা আর কি হতে পারে?

"দেখ্ ভাই প্রবোধ, মায়ের শুধু দর্শন পাওয়াটাই জীবনের চরম সার্থকতা নয়। বল্ তো পাশ্চাত্য জাতি কয়দিন মায়ের দর্শন পেয়েছে অথচ তাদের শক্তির দাপটে আজ সারা পৃথিবী কম্পমান। তারা মায়ের রূপ দর্শন কর্‌তে চায়নি, তারা চেয়েছে মায়ের শক্তিকে! শক্তি আর মা তো আলাদা নয়, মা যে শক্তিময়ী। তাদের কর্ত্তব্য-বোধ, জাতীয়তা, কর্ম্মে নিষ্ঠা, এ সব কি আদর্শ নয়? বল্‌তে কি, ওরাই হচ্ছে মাতৃসাধক শক্তিসাধক, আর আমরা শুধু মায়ের চার হাত, আর জিভ্ বের করা দেখেই, আনন্দে বিস্ময়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ি।

"যে যার সাধক, তার মাঝে তার ইষ্টের শক্তি স্বভাবতঃই সঞ্চারিত হবে। শক্তি উপাসনা করেও যদি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত বসে থাক্‌তে হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে শক্তির সাধক নয়—জড়ের উপাসক মাত্র।

"আমি তো বলি, আমার মা আমারই মা, আমার অন্তর থেকেই সেই মায়ের উদ্বোধন! কাজেই মাকে বাইরে দেখতে পেলাম না বলে কোন আক্ষেপই তো জাগতে পারে না আমার মাঝে। আমি যাকে বুকের মাঝে প্রতিনিয়ত শক্তি-রূপে চেতনারূপে পাচ্ছি, তাকে বাইরে না পেলেই বা কি এল গেল? মায়ের সঙ্গে আমার উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ নয়। মায়ের নাড়ী থেকেই আমার জন্ম, মা শক্তিরূপে আমারই মাঝে বিরাজমানা।

"ভাই, তোর মত নাস্তিক হয়ে যেতে আমি রীতিমত কামনা করি। আমি মায়ের দর্শন চাই না—তোর মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দেশের দরুণ দশের দরুণ আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হতে চাই। আমার মা শুধু ক্ষণিক আবেগে মূর্ত্তিময়ী মা নয়—মা জীবনের সূত্র-পাত থেকে আরম্ভ করে, প্রতি কাজে, প্রতি কর্ম্মে শক্তিরূপে আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিচ্ছেন। মাকে পাই না বলে আমি হাহাকার করি কখন?— যখন মায়ের ইঙ্গিত, মায়ের আদেশের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পেরে শক্তির অপব্যয় করে করে দুর্ব্বল হয়ে যাই, প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম না হই।

"তোর আবার আলাদা বরের কিসের প্রয়োজন রে? বরের অর্থ কি না তুই যা চাইবি, তাই তোর সিদ্ধি হবে! কেন কোন্ কাজটা তোর অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে? করবি বলে তুই যে কাজেই হাত দিন, তারই তো একদিক না করে তুই ফিরে আসিস্ না—তবে আর আলাদা করে তোর বরের কি প্রয়োজন? বরের সার্থকতা হল, সিদ্ধি-লাভে সহায়তা করা। মা যে তোর প্রাণে অফুরন্ত শক্তি ঢেলে দিচ্ছেন, তুই কোন্ কাজে অক্ষম? কি নাই তোর? 'বর দিলাম' বলে মা বাইর থেকে তোকে কিছু বলেন না, কিন্তু তোর সঙ্কল্প সিদ্ধির দরুণ যে মা অহরহঃ ব্যাকুল। তুই যা চাস্, মা এসে শক্তিরূপে তার সিদ্ধি লাভের দরুণ শক্তি ঢেলে দিলে যান। আর কি চাস্ বল্ তো দেখি? মা ছেলের দরুণ এর আর বেশী কি করে?

"এতগুলো কথা বল্‌লাম বটে, কিন্তু তা বলে মায়ের স্থূল রূপকে যে আমি একে-বারে অস্বীকার করি তা নয়। ভাব পেলে অনায়াসে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা তাকে রূপ দেওয়া যায়। মূল উপাদান থেকে স্থূলের উদ্ভব—এ তো যুক্তির কথাই। কিন্তু আমার আদর্শ হল, মূল ভাবের প্রতি। ভাবই মুখ্য, রূপ হচ্ছে গৌণ। আর সেই ভাব জীবন্ত ভাব: মায়ের দেখা পেয়েছি বল্‌লে, প্রাণ রীতিমত শক্তির উদ্বোধনে উদ্দীপিত হয়ে উঠ্‌বে। মাতৃসাধকের পরিচয় তার চরিত্র, তার আচরণ—তাকে মুখে বল্‌তে হয় না যে আমি মায়ের দর্শন পেয়েছি।

তারপর শাস্ত্র থেকেও তোকে বচন উদ্ধৃত করে দেখাতে পারি। শ্রীমদ্ভগবতী-গীতায় পার্ব্বতী বল্‌ছেন—

রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং তব চ স্মৃতং।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যানর্হত্বমাস্থিতং॥

—হে তাত! আমার শক্তিময় রূপই প্রধান বলে জানবে, কারণ শক্তি ছাড়া পুরুষের কোন কার্য্যই সম্পাদনের সামর্থ্য নাই।"

"দেখ্, মা নিজ মুখে কি বল্‌ছেন? মায়ের শক্তিময় রূপই হল প্রধান। শক্তির আবার রূপ কি—না শক্তির বিদ্যুন্ময় দীপ্তিতে তোরই হৃদয়-মন পুলকোল্লাসিত হয়ে উঠ্‌বে, শক্তির রূপ ফুটে উঠ্‌বে; তোরই মাঝে শক্তিময়ী মায়ের শক্তির প্রমাণ হবে তোরই জীবনের শক্তিমন্ত অভিনয়ে। শক্তির রূপ আছে বই কি? শক্তিতে তুই যে কাজ সম্পন্ন কর্‌বি, তার সার্থকতার একটা তৃপ্তি আস্‌বে না তোর মনে? সেই তৃপ্তিই তো মায়ের—শক্তির শান্ত রূপ।

"ক্ষণিক আবেগে যে তোর বলিষ্ঠ অন্তঃকরণ অভিভূত হয় না, এর দরুণ আমি তোকে ভাগ্যবান্ মনে করি। কেননা মায়ের বিরাট্ রূপ দর্শন কর্‌বার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা তোর আছে। মাকে তুই দু'এক মিনিটের দরুণ বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে যাওয়ার মত অবস্থায় পেতে চাস্ না। মাকে তুই শক্তিরূপে পেয়েছিস্, মায়ের মুখের সব চেয়ে সেরা আশীর্ব্বচন তোর মাঝে ক্রিয়া কর্‌ছে। থাক্, মা তোর জীবনের আড়ালে থেকেই তোর জীবনকে সফল করে তুলুন। তোর জীবনের সার্থকতা এবং বিফলতায় অনেকের জীবনের আশা-নৈরাশ্যের সূত্র জড়িত আছে। মা তোকে দেখা দিয়ে ফাঁকি না দিয়ে, অন্তরে শক্তিরূপে চিরকালের দরুণ তোর বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলুন। তুই কাজ কর্—দশের দরুণ, দেশের দরুণ। এই দেখেই আমরা বুঝ্‌ব, তোর মাঝে মহাশক্তির ক্রিয়া চল্‌ছে, কিন্তু মায়ের দেখা পেয়ে ভেল্কীবাজী কর্‌তে শিখিস্ না যেন কখনো! সবচেয়ে ভয় হয়, দুঃখ হয় তাদের দরুণ যারা নাকি মায়ের দর্শন পেয়েও জড়ের মত বসে আছে। তাদের এই জড়ত্ব কি শক্তিময়ীর কৃপা? বেশ, যারা এই কৃপা পেয়েছে থাক্, কিন্তু তোর দরুণ আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে যে, ভগবান যেন তোকে কোন দিন তৌষ্টিকতার ইন্দ্রজালে আবদ্ধ না করেন।

"কথায় কথায় হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ওঃ, তুই তো ভাল করেই সে ঘটনার কথা সব জানিস্? মনে পড়ে সেবারের কমলের ভাবুকতার কথা? এদিকে মাকে এসে মন্দিরে ঢুকে দুর্ব্বৃত্তেরা লুণ্ঠন করে, যা-তা অত্যাচার করে নিয়ে পালাচ্ছে—কত যায়গায় মূর্ত্তিকে ভেঙ্গে-চুরেও ফেলেছিল। আর কমল তখন নির্ব্বিকার উদাসীনের মত বসে বসে ভাব-মুখে বলছে—ওঃ, এতে কি হল, মাকে যে আমি ভাবরূপে পেয়েছি, আমার মা

যে বিশ্বব্যাপ্ত! সেবার তুই যদি মহাশক্তি-রই প্রেরণায় তোর বালকবন্ধুদের নিয়ে এর প্রতিকার না কর্‌তি, বল্ তো তাহলে গ্রামে আরও এরূপ কত অত্যাচার হত! আচ্ছা, কমলের কথাই বলি। মা যদি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলে মন্দিরের মাঝে প্রতিষ্ঠিত যে মায়ের মূর্ত্তি ছিল, তার মাঝে কি মায়ের ব্যাপ্তি ঘটে নি? চোখের সাম্‌নে ভাবের উপর—ভাববিগ্রহের উপর এত অত্যাচার—আর সে দিব্যি বসে বসে ভাব কর্‌ছে?

"তুই কি অমন ভাবুকই হতে চাস্ নাকি? তুই নাহয় নাস্তিকই, কিন্তু সে তো আস্তিকই-ছিল পুরা মাত্রায়, কিন্তু কৈ তার আস্তিক্য-বোধে তো এ অত্যাচারের প্রতিকারের কোন প্রচেষ্টাই জাগেনি! সে যদি সবল হত, শাস্তিময়ীর সন্তান হত, তাহলে কি ভাবুকতার দুর্ব্বল প্রলেপ দিয়ে উপস্থিত ঘটনা থেকে নিজকে অমন করে খালাস করে তৃপ্ত থাক্‌তে পারত? এরূপ আধ্যাত্মিকতা—এ যে বিলকুল মিথ্যারই প্রশ্রয় দেওয়ার নিষ্ক্রিয় প্রচেষ্টা মাত্র।

"তোর শক্তির আর চেষ্টার কথা কি বলব? এই নৈশ বিদ্যালয়, দীন-দুঃখীদের হাসপাতাল, গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা, মুষ্টি-ভিক্ষার প্রচলন, দরিদ্র ছাত্রদের পড়ার সাহায্য করা, আত্মোন্নতি-বিধায়ক যোগ-শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কার এবং তার দরুণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—। একা এক জীবনে শুধু তোরই প্রচেষ্টায় গ্রামের মাঝে এই সদনুষ্ঠানগুলি হয়েছে। শক্তি-ময়ী মা এখনো তোকে দেহে মনে প্রাণে সবল রেখেছেন, তোকে দিয়ে এখনো কত আশা!...আমার বুঝতেই ভুল হয়েছে, তোর ঐ আক্ষেপের কোন মূল্য নাই। মিছে মিছে আমাকে দিয়ে তুই এতগুলো বকালি। আরও বক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—বক্‌ব।

"এই তো আমার সহজ বুদ্ধিতে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছি। তারপর অলৌকিক উপায়ে বিশেষ কোন তিথি-নক্ষত্রে যদি কেউ মায়ের দর্শন পেয়ে শক্তিমান হয়ে থাকে, বেশ তো, সে তাঁর অলৌকিক উপায় লোককে শিখাক্! জাতি সবল হোক—স্বাধীন হোক, এ তো সাধুদেরও অনিচ্ছা নয়। আর সাধু মাত্রেই তো পরের হিতকামী, তাঁদের শক্তি যদি অজ্ঞ মানুষকে সত্যের পথের সন্ধান না দিতে পারে, তাহলে সেই শক্তির মহিমা কিসে?

"তাহলে বলতে হবে মায়ের দর্শন পেলে, সত্যলাভ করলে, মানুষ নির্দ্দয় পাষাণ নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যভ্রষ্ট এক এক করে সব অবস্থাই লাভ করে? তারা অন্যায় দেখেও বাইরে সে অন্যায় সংশোধনের কোন চেষ্টা করবে না, কিম্বা শক্তির ঐশ্বর্য্য দ্বারা যারা অন্যায় করছে তাদের মনের দিক দিয়েও কোন রূপান্তর ঘটাতে পারবে না? তাহলে তাদের কি সংজ্ঞায় ফেলা যায় বল তো দেখি? কথা-গুলো একটু কড়া এবং রুক্ষই বোধ হয় শুনাচ্ছে তোর কাণে—কিন্তু কি করব ভাই, তোকে উপলক্ষ করে যে আমি বহুদিনকার সঞ্চিত আমার সত্যিকার অনুভবগুলো

প্রকাশ করতে পারছি, তোকে আমি উপদেশ দিচ্ছি না, তুই শক্তিধর; কিন্তু তোর কাছে আমারই মনের কথাগুলো প্রকাশ করতে পেরে যেন আমার বুকটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

দেখ্, রামপ্রসাদ নাকি মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন। মা নাকি কন্যারূপ ধরে এসে তার বেড়া বেঁধে দিয়ে যেতেন। কিন্তু সে রামপ্রসাদের কি উদারতা, তাঁর আবেগে-রচিত সঙ্গীতগুলি আজ সর্ব্বত্র অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলের মুখে, এমন কি চাষাদের মুখে পর্য্যন্ত এখন-তখন শুন্‌তে পাওয়া যায়। মাকে তিনি কি ভাবে পেয়েছিলেন, মা তাকে কখন কি ভাবে দেখা দিতেন—সব তাঁর গানেই তিনি খোলা-খুলি ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে রামপ্রসাদী গানের প্রচার। ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত যারা নাকি সব গানটা জানে না তারাও দু-এক পদ বেশ দিব্যি গেয়ে যেতে পারে। রামপ্রসাদ শবসাধনা করেই হোক্ আর যে কোন সরল সহজ উপায় অব-লম্বন করেই হোক্, মায়ের দর্শন পেয়ে তো আর চুপ করে থাক্‌তে পারেন নি; তিনি যা পেয়েছিলেন অকুণ্ঠিতচিত্তে তা দান করে গিয়েছেন।

"মায়ের প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়ার পর থেকে তাঁর প্রাণের ভিতর যেন অজস্র শক্তির বর্ষণ আরম্ভ হয়েছিল। গানের এক একটী পদ যেন শক্তির বীজমন্ত্র। যারা রামপ্রসাদী গান ক্ষণেকের দরুণও গেয়ে থাকে, তারাই সেই শক্তিমন্ত্র সাধকের প্রাণের শক্তির তরঙ্গ হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব না করে থাক্‌তেই পারে না। শক্তি-সাধকের সাধনার অব্যর্থ বীর্য্য শুধু নিজের মাঝেই অবরুদ্ধ থাকে না—আশেপাশে এমন কি দিগ্‌দিগন্তে পর্য্যন্ত সাধকপ্রাণের সত্যিকার অনুভূতির স্পন্দন অপরের জীবনেও ঝঙ্কার তোলে।

"শক্তি-সাধনা করে বুকে বল আস্‌বে। রামপ্রসাদ মাকে কেমন করে হাতের পুতুল বানিয়ে নিয়েছিলেন, তা তাঁর রচিত একটী গানেই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—

দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা!
এমন ছাপান ছাপাইব
মা গো, খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা;
বৎস পাছে গাভী যেমন
তেমনি পাছে পাছে ধাবা!
প্রসাদ বলে, ফাঁকি-জুরি
(মা গো) দিতে পার পেলে হাবা;
আমায় যদি না তরাও, মা,
শিব হবে তোমার বাবা!

—শক্তি-সাধনা কর্‌লে শক্তি পেছনে পেছনে ছুটে আস্‌বেই আস্‌বে। শক্তিকে কেউ নিরোধ করে রাখতে পার্‌বে না তখন। রাম-প্রসাদ শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর মুখ থেকে এমন নির্ভীক্ বজ্রদৃঢ় বাণী বের হয়েছিল। দম্ভ নয়—শক্তি ভিতরে সঞ্চিত হলে মানুষ বুক ঠুকে এমন অনেক কথাই বল্‌তে পারে। শক্তির দরুণ দুর্ব্বলের মত প্রার্থনা করতে হয় না, বৎস পাছে গাভী

যেমন ছুটে আসে তেমনি শক্তিমন্ত সাধকের কাছে শক্তি আপনি উপস্থিত হয়। মায়ের কৃপা নয়—শক্তিমন্ত সাধকের প্রাণের আকর্ষণে শক্তি এমনি করেই ছুটে আসে।

"ভিতরে বল থাকা চাই, আর মাঝ-পথে হাল ছেড়ে না দিলেই হল। দেখ, ভাই প্রবোধ, শক্তিসাধনায় অনেক বিঘ্ন আছে, তার আবার অলৌকিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন? দেখতে পাচ্ছিস্ না, তোর শুভ কার্য্যেও কত বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। মানুষ নিজে বড় হতে না পারলেও, অপরকে বড় হতে দেখলে সহ্য করতে পারে না। এই ঈর্ষা মানুষের মধ্যে যেখানে রয়েছে, সেখানে মানুষই মানুষকে নীচে আকর্ষণ করে নামিয়ে নিয়ে আসে। যারাই বড় হয়েছে, তাদেরই সংগ্রাম শুধু বাইরে নয়, নিজের মাঝেও কত বিরোধী বৃত্তি আছে, যারা নাকি আত্মার প্রতাপ না জেনে, নিজেদের তেজ-বিক্রম চালাতে আরম্ভ করে। উপরে উঠতে হলেই শতদিক থেকে এসে বাধা উপস্থিত হয়। সে বাধায়, সেই বিভীষিকায় ভ্রূক্ষেপ না করে যারা শুধু আত্ম-বীর্য্যের দৃঢ় সঙ্কল্পে উপরে উঠে যেতে পারে, তারাই শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হয়। বাঘ ভাল্লুক এ সমস্ত বিভীষিকারই রূপক বর্ণনা। একটা চল্‌তি কথাও আছে—"বনের বাঘে খায় না, খায় মনের বাঘে।"

তারপর রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভিতর কি অসীম উদারতা ছিল। এক একটা গানেই তিনি মাকে কি ভাবে ভাবতেন তার বেশ সরল আভাস পাওয়া যায়—

মন! তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লে না!
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি মন, তাও জান না?
তুমি মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁরে
করতে চাও রে উপাসনা॥
ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোণা
তুমি, সেই মাকে সাজাতে চাও রে
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত নানা খাদ্য নানা
তুমি কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয়
আলো চাল আর বুটভিজানা॥

এই গানটীতে কোথাও একটু গোঁড়ামির ভাব নাই। স্থূল উপাসক হলেও—ভাবের সঙ্গে কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। প্রত্যেকটী পদ ভাব-রাজ্যের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার আভাস মাত্র। মাকে বিরাটরূপে অনুভবের মাঝে পেলে, তখন তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপাত্মক একটা হাসি আপনি আসে। যে মা জগৎকে খাওয়াচ্ছেন তাকে আবার খাওয়াবে কি, যে মা জগৎকে বৈচিত্র্য দিয়ে সাজাচ্ছেন, তাঁকে আবার সাজাবে কেমন করে? এ তো সাধক প্রাণের সত্যিকার অনুভবের কথাই। মাকে যারা শক্তিরূপে জড় চেতন সবের মাঝে অনুস্যূত দেখতে পেয়েছে, তাদের বিশিষ্ট আধারে পূজার চেতনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। সাধকের এই চরম অবস্থা—তখন সব ভুল হতে থাকে। বিধি-নিয়ম উল্টে

যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এই ভাব-বিহ্বলতায় এক একদিন মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে ভুলে গিয়ে, নিজের মাথায়ই কোন কোনদিন পুষ্প-বিল্বপত্র ঢেলে দিতেন। শেষে আর তিনি নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার কাজে থাক্‌তে পারলেন না—অহরহ যার চেতনা চৈতন্যময়ীর ধ্যানে ডুবে রয়েছে, তার আবার বিশিষ্ট পূজা-অর্চনার কি প্রয়োজন? কাজেই প্রত্যেক সাধকের মাঝেই দেখতে পাই, তাঁরা শক্তিকে আগে নিজের মাঝে অনুভব করে, তারপর সেই শক্তির বিরাট স্পন্দন বিশ্বময় ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

"শক্তিসাধকের আবার গোঁড়ামি কিসে? শক্তিতে মানুষ সব আয়ত্ত করে নিতে পারে!

"ভাবকে রূপ দেওয়াও কম শক্তির কাজ নয়। শুধু ভাবুক যারা, যারা কল্পনার দিক দিয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে, তারা মাত্র কবি- কিন্তু সেই ভাবকে যিনি রূপ দিতে পেরেছেন, তিনি শক্তিশালী সাধক। কল্পনায় অনেক সময় অনেক কিছুই ভেসে আসে, কিন্তু তাকে রূপ দিতে হলে চাই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প এবং বিদ্যুন্ময় বীর্য্য। বীর্য্যের অটল স্থিতিতে ভাব আত্মপ্রকাশ না করে পারেই না। কাজেই will-power থাকা চাই। সত্য-সঙ্কল্প কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। আর যারা দুর্বল, দোনামনায় কেবল এদিক ওদিক দুলছে, তাদের সঙ্কল্পের কোন জোর নাই, তারা নিজেদের দুর্ব্বলতার অবসাদে নিজেরাও ভুগছে অপরকেও ভোগাচ্ছে!

"এই স্থূল রক্ত-মাংসের শরীরটাকে "ব্রাহ্মী তনু"তে রূপান্তরিত করা কি সহজ কথা? কিন্তু বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক কেবল স্পর্দ্ধা নয়, সিদ্ধিলাভের অবর্থ্য-বীর্য্য প্রভাবে, দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন কি করে এই পিণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অনুভব হয়। যা মূলে—তাই স্থূলে, এ একেবারে নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে গিয়েছেন। তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, কত গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্থূল শরীরটাকে স্বেচ্ছামত রূপ দেওয়া, এর প্রত্যেকটী বৃত্তি নিজের আয়ত্তাধীনে রাখা শক্তি-সাধকের কাজই বটে!

"ভাবকে কি আমি অস্বীকার করছি ভাই, কিন্তু ভাবেরও আবার একটা রূপ দেবার প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। যাদের এই উভয় শক্তি আয়ত্ত হয় নাই, আমি বলি তারা ভাবকে সম্পূর্ণ ভাবে এখনো নিজের মাঝে পায়নি। তারা আরও সাধনা করুক—তৌষ্টিক হয়ে কল্পনার রাজ্য থেকে উড়ো উড়ো ভাবের কথা বলে অপরের মনকে যেন নাচিয়ে না তোলে!

"কমলের সিদ্ধিলাভে কয়টা লোকের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে বল্‌তো দেখি? তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্ সাধনা সম্বন্ধে কিছু—অমনি তার জড়সড় ভাব; আর শুধু ভাবের আবছায়ার সব ঢেকে ঢেকে অর্দ্ধস্ফুট ভগ্ন জড়তার বাণী! এরা আবার শক্তিময়ী মায়ের দেখা পেয়েছে বললে, আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠে।

"পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে যে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মা বিবেকানন্দের ভিতর বিশ্ব-প্রেমের আগুণের হল্কা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মহাশক্তিকে, প্রত্যেকের ভিতরের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবার দরুণ উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। আর কি বিবেকানন্দের এক মুহূর্ত্ত বসে থাকবার জো আছে? রাত নাই, দিন নাই, মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের দরুণ তিনি কতদিক দিয়ে, কত উপায়ে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। বিবেকানন্দের জীবনের এই বিরাট অতৃপ্তি দেখেই বুঝা যায়, তিনি বাস্তবিকই মহাশক্তি মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। মা তাঁর প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আগুনে তিনি নিজে দগ্ধ হয়েছেন, তারপর বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাবের আরতিতে যখন তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তখন তাঁর কর্ম্মজীবনের সূচনা। দশজনকে নিয়ে তখনই তিনি কাজের মত কাজ করে যেতে পেরেছেন।

"আমি কিন্তু ভাই, বিবেকানন্দের এই আকুলতা এবং অতৃপ্তিটাকেই বড় মনে করি। তাঁর ভাব ঘনীভূত হয়ে কখনো তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। তা না হলে কি ভাই একা এক জীবনে মানুষ এত কাজ করে যেতে পারে?

তান্ত্রিক সাধক হচ্ছে বীর সাধক, জগতের কোন কিছুতেই তার প্রত্যাখ্যান নাই, সবকে আত্মশক্তি দ্বারা আত্মীকরণ করে নিতে তার ভিতর অসীম স্পর্দ্ধা রয়েছে। স্থূলকে এমন স্পর্দ্ধা সহকারে বরণ করে নিতে বোধ হয় আর কেউ পারেনি। প্রায় সবাই জগৎকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম প্রভৃতিকে ছেড়ে পুরুষ দর্শন —এই ভাবে একদিক ছেড়ে আর একদিকে ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু শক্তিসাধক স্থূলে এবং মূলে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য এনেছেন। সশরীরে স্বর্গে যাবার স্পর্দ্ধা তান্ত্রিক সাধকই রাখে, কেননা তান্ত্রিক সাধক ইচ্ছা করলেই জগতের রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে। এ তো অলৌকিক কিছুই নয়—শক্তির অমোঘ প্রভাব মাত্র। মানুষকে মানুষ রেখেই দেবতা করা, এ একমাত্র তান্ত্রিক সাধকই পারে, কাজেই Carlyleএর ভাষায় তান্ত্রিক সাধকই হচ্ছে spiritually hero—আত্মশক্তি আত্মবিশ্বাস তাদের মাঝে অগাধ, তাই তারা স্থূল রক্ত-মাংসের দেহবিশিষ্ট মানুষকেই দেবত্বে উন্নীত করতে পারে। Hero worship-এর মাঝে modifying element রয়েছে—তাই তাকে hero worship বলা হয়। আর এ তো ঠিক কথাই hero না হলে, অপরের জীবনকে এমন করে উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায়? অপরের জীবনকে একেবারে সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিতে পারে কেউ?

"বাঙ্গালীকে সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ জাতি বলে গাল দেওয়া হয়—কিন্তু ভাবের চরমে যেমন উঠেছে বাঙ্গালী, তেমনি ভাবকে এত দূর স্থূলে নামিয়ে আনাটাও বাঙ্গালীরই কৃতিত্ব। ভিতরে শক্তি থাকলে প্রয়োজনানুসারে মানুষ সব করতে পারে—তার পরিচয় আমরা এখন ভাল করেই পাচ্ছি। অবিশ্বাসে

কত কিছুই ভাবতাম, কিন্তু দিন দিন আত্ম-বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হয়ে দেখি শক্তির অক্ষয় বীর্য্য এখনো আমাদের মাঝে স্তব্ধ হয়ে আছে—প্রবল ইচ্ছার উদ্বোধনে আমরা সবই করতে সক্ষম। মোহ টুটেছে, অবিশ্বাস অপসারিত হয়েছে, এখন বিশ্বাস হয়—শক্তিময়ীর কৃপা থেকে আমরা এখনো বঞ্চিত হইনি। অন্যান্য জাতির সঙ্গে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সগৌরবে আমাদেরও কিছু বলবার আছে।

"নানা কারণে শক্তি নিশ্চল থাকে, কিন্তু চেষ্টা করলে সেই শক্তির পুনর্জাগরণ এবং কর্ম্মে নিয়োগ একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কাজেই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে শক্তিকে মানুষের মাঝেই খুঁজে বের করা।—মানুষকে কথা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, কর্ম্মের আদর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। ভাবকে বস্তুতে পরিণত করবার প্রয়াস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু বস্তুর চেয়ে ভাবের মূল্য অধিক। রূপ সৃষ্টির মূল নিদানই হল ভাব।

"ভিতরে শক্তির দুর্জ্জয় তাপ না থাকলে ইষ্টকে মানুষ এমন ভয়ঙ্কর ভাবে কেউ কল্পনা করতে পারে? শক্তিসাধক মাকে শুধু ভাবে গদগদ হয়ে নিছক্ স্নেহবিগলিত রূপে দর্শন করে তৃপ্ত হয়নি—প্রলয়ঙ্করী করালিনী রূপে ভাববার মত বুকের পাটাও তাদের ছিল। শুধু কল্পনা-রাজ্যে যারা বিহার করে, তাদের বুকে এত বল, এত সাহস কি থাকে? বুকে শক্তি ছিল বলেই শক্তিকে ইচ্ছানুরূপ ভাবে রূপ দেবার ক্ষমতা সাধকের ছিল। আসল কথা হল শক্তি চাই—শক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রতি শিরা-উপশিরায় নৃত্য করে চলবে, তবে না তুমি শক্তিসাধক! তবেই তো বুঝব, মাকে তুমি ভিতরে বাহিরে অন্তরঙ্গ রূপে পেয়েছ!

"অসম্ভব কিছুই নয় ভাই, রূপের কথা বলেছিলি তুই; রূপ দিতে কত সময় লাগে রে? তার আগে ধ্যানতন্ময় হয়ে যাওয়া চাই। শক্তি হারিয়ে যে রূপ দর্শন করা যায়, তা শুধু মনের উত্তেজিত বিকারের ঘনীভূত রূপ। সে রূপের সঙ্গে প্রাণের কোন সম্বন্ধ নাই, তাতে প্রাণ বলিষ্ঠ হয় না। এই রূপের দর্শন পেয়ে জাতি দুর্ব্বল হয়, দিন দিন মরণের পথে তলিয়ে যায়। কাজেই ভাই আর মায়ের রূপ দেখে প্রয়োজন নেই; শক্তি রূপে প্রাণরূপে নিজের বুকের রক্তের তালে তালে মাকে অনুভব কর্।

"শক্তিসাধকের একটা লক্ষণ বলে রাখি তোকে। শক্তিসাধক যারা, তারা বীর্য্যবন্ত, প্রাণবন্ত, উদার; মূর্ত্তিতে পাটে তারাই প্রাণ সঞ্চারণ করে। শক্তির মহিমা তারা প্রত্যক্ষ দেখাতে পারে! হিরণ্যকশিপু যখন একটা স্তম্ভকে দেখিয়ে অবজ্ঞার সহিত প্রহ্লাদকে বলেছিল, এখানেও কি তোর হরি আছে? আর এই বলে যখন গর্ব্বোদ্ধত ভাবে সেই স্তম্ভের মাঝে হিরণ্যকশিপু পদাঘাত করেছিল, তখন সেই নৃসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছিল কোথা থেকে? শক্তি—শক্তি। শক্তি ছাড়া জগতে কিছু নাই। অন্যায় করে জগতে কেউ রেহাই

পাবে না। খাটী বিশ্বাসের উপর কারও অবজ্ঞা কর্‌বার অধিকার নাই। প্রহ্লাদের মাঝে সেই দুর্ল্লভ বিশ্বাস এসেছিল—জগৎময় তিনি হরিকে ব্যপ্ত দেখেছিলেন, কাজেই তাঁর সম্মুখেই ইষ্ট দেবতার অপমান কি করে মহাশক্তির প্রাণে সহ্য হবে? তাই শক্তিই শক্তির প্রতিশোধ নিলে!

"ভাঙ্ খেয়ে, গাঁজা খেয়ে দিবা-রাত্র ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে হবে না, শক্তির কৃপা হলে দেখ্‌তে পাবি, শক্তিরই নিছক্ একটা নেশা আছে। সেই নেশায় যাকে ধরে, সে এমনি করেই দেশের দরুণ, দশের দরুণ অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়। শক্তিতে আত্মসম্মিশ্রণ করে ফেললে তখন দেহটার মাঝেও শক্তির আগুন ধরে যায়—সেই শরীরে শক্তির তেজ, শক্তির বিদ্যুৎ অনবরতই প্রবাহিত হয়। বাহির থেকে শত নির্য্যাতন হোক, শত বন্ধন, আসুক—কে সেই বীর্য্যবন্ত প্রাণকে অবদমিত করে রাখতে পারে?

"শক্তির বহিরঙ্গ রূপের মোহিনী মায়ায় আর আমাদের ভুলে থাকলে চল্‌বে না—এখন চাই শক্তির অন্তরঙ্গ রূপের উপাসনা। সেই শক্তির আন্তর রূপ হচ্ছে—প্রাণ। এই প্রাণের উপাসনারই পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে হবে। এ উপাসনার কারো সঙ্গে কারও মত নিয়ে, সম্প্রদায় নিয়ে বিরোধ হবার আশঙ্কা নাই। শক্তির উপাসনা করে, প্রাণের উপাসনা করেই এক দিন বৈদিক ঋষিরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছিলেন; আমরাও আবার সেই শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষিত হব। শক্তি উপাসনায়—প্রাণের উপাসনায় মহাজাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ হব। এ উপাসনায় মূর্ত্তি নিয়ে ত কোন বিরোধ হবে না! কেননা প্রাণোপাসকের একই আন্তর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির, সেই শক্তির, সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা প্রাণেই। প্রাণ দিয়েই প্রাণের আবাহন, প্রাণের উদ্বোধন!

"প্রাণকেই স্পন্দিত করে তুল্‌তে হবে। একবার সেই প্রাণকে—মহাশক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারলে আর চোখে ঘুম থাক্‌বে না, প্রাণে অবসাদ আস্‌বে না। মহাশক্তির জাগরণ মানে সমষ্টি মানবের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এই প্রাণের পূজায় সাধককেই আত্মসমাহিত হতে হয় আগে, তারপর সেই প্রাণের স্পন্দন প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হতে থাকে। এই তো মহাশক্তির—বারোয়ারী (সার্ব্বভৌম) পূজা। এ পূজাতে সবার সমান অধিকার।

"ভাই প্রবোধ, বলতে বলতে অনেক কথাই বলে ফেললাম! তবু যেন আর বলা ফুরায় না। তুই যে পথ ধরে চলেছিস্—এই হচ্ছে মায়ের কৃপা-বরিষণের পথ। এ পথে যতই অগ্রসর হবি, ততই শক্তিময়ী মায়ের কৃপা অনুভব করতে পারবি। মায়ের বিরাট রূপের দর্শন যার ভাগ্যে ঘট্‌বে—তার আবার সাময়িক স্থূল রূপের দর্শনের দরুণ এত ব্যাকুলতা কেন? বুঝি, মানুষের মাঝে Anthropomorphic instinct রয়েছে, তাই তোর ভিতরও মায়ের স্থূল-রূপ দর্শনের এত ব্যাকু-

লতা। কিন্তু ভাই, এক কথা বলে রাখি—যতখানি রূপ বাহিরে প্রকটিত হবে, তার চেয়ে বেশী কিন্তু অরূপেই থেকে যাবে। কাজেই ভুলে যেন মায়ের অরূপের সন্ধান নিতে থেমে না যাস্।

"মূর্ত্তি গড়ে মায়ের পূজাতে কেবল ভেদেরই সৃষ্টি হয়—কিন্তু মায়ের ভাবরূপ প্রত্যেকের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তখন শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব বলে আর কোন ভেদ থাক্‌বে না। প্রাণোপাসক কে নয়? শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, সাংখ্য কে প্রাণকে অস্বীকার করেছে বল্ তো দেখি। ভাবে ভাবে ঐক্য হলে, যে রূপদর্শনের আকুলতা জেগে উঠে, সেই রূপ বিরাট রূপ, এ রক্ষা-কালীও নয়, দক্ষিণা-কালীও নয়।

"তান্ত্রিকের অসীম সাহস—ভাবকে বস্তুতে নামিয়ে আনতে তান্ত্রিকের মত বীর সাধকেরই প্রয়োজন। তান্ত্রিক সাধক সত্যসঙ্কল্প, তার সঙ্কল্প ব্যর্থ হবার জো নাই। এখন তুই জয়-গান কর্‌বি কার, তান্ত্রিক সাধকের শক্তির, বা প্রকটিত রূপের। আমি বলি, এই রূপ এল কোথা থেকে? কে ভাবকে বস্তুতে রূপান্তরিত কর্‌ল? সাধকের মনের একাগ্র শক্তি নয় কি?

"ভাই তুই যদি রূপ দেখতে চাস্, তোর বেশী সময় লাগবে না, কেন না তোর মাঝে একাগ্র শক্তি আছে। ইচ্ছা করলে এক মুহূর্ত্তে তুই এখন যা আছিস তার সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে যেতে পারিস্। কাজেই মানুষকে রূপের পিপাসায় আকুল না করে, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তোল। তারপর মায়ের তো চিরকালই এক রূপ থাকবে না—শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের নব-নব রূপ দর্শন করতে পারবি। কাজেই রাম-প্রসাদকে যে রূপে দর্শন দিয়েছিলেন, তুই-ও যে সেই রূপেই দর্শন করবি আর তা দর্শন করতে না পারলে তোর জীবনই বৃথা—তা তোকে কে বলল?

"তোর শক্তি আছে, মহাশক্তির কৃপা-দৃষ্টি রয়েছে তোর উপরে। কাজেই তুই যেন ভণ্ডামী দেখে গলে না পড়িস। মানুষকে আত্মবিশ্বাসে, আত্মশক্তিতে, দৃঢ় সঙ্কল্পে, কঠোর অধ্যবসায়ে দৃঢ় বলিষ্ঠ করে তোল্—তাহলেই মহাশক্তির পূজা করা হবে। দুর্ব্বল ভাইদের হাত ধরে টেনে তুল্‌ছিস দেখে মা-ও সন্তুষ্ট হবেন।

শক্তি-সঞ্চার

— * —

অর্জ্জুনের দেহ-মন এলাইয়া পড়িল, রণক্ষেত্র হইতে একরকম পৃষ্ঠভঙ্গ দিবারই উপক্রম করিলেন—কিন্তু কে তাহার এই দুর্ব্বল-সঙ্কল্পকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিলেন? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেই হৃদয়-মথিত মর্ম্মস্পর্শী প্রাণোদ্দীপক বাণী—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

এই মন্ত্র তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিল!

মানুষ সুখে-দুঃখে, সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতি-ঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়ে—আবার জীবন্ত প্রেরণায়

উল্লসিত হইয়া উঠে। অজ্ঞাতে, অদৃশ্যভাবে এমন করিয়াই শক্তির কাজ জগৎ ভরিয়া চলিতেছে!

যাহাদের প্রাণে কোন আশা নাই, তাহাদের আশার আলোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের শরীরে অজস্র বল সঞ্চার করিতেছে—শক্তির কাজ অহরহঃই এমনি করিয়া চলিতেছে। শক্তি কি, কোথা হইতে আসিতেছে, তাহার সন্ধান নিতে গিয়াও মানুষ বারবার বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বিরাট শক্তিকে যাচাই করিতে গিয়া, নিজের ব্যষ্টি শক্তি হার মানে। এমনি করিয়া কত সাধক ধ্যানে স্তব্ধ হইল, শক্তির অনুসন্ধানে প্রাণ দিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই বিরাট শক্তির মহিমার অন্ত কিছুই পাইল না! আজও সেই বৈদিক ঋষির মত সবাই অবাক্ বিস্ময়ে, বলিতেছে, তাই তো—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি?

বাস্তবিকই তো জগতের অণু-পরমাণুকে পর্য্যন্ত যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—সেই শক্তি কি? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন, আর তাহাতে অর্জ্জুনের দেহ মন বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠিল; কিন্তু এই কথোপকথনের ভিতর দিয়া কোন্ শক্তির ক্রিয়া হইল? অর্জ্জুনের প্রাণকে স্পর্শ করিল কিসে? রণস্থল হইতে পলাইতে পারিলে যাহার প্রাণ বাঁচে, সেই আবার সাগ্রহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় কাহার প্রেরণায়, কোন শক্তির অমোঘ বলে? তাহা হইলে সকলের বুদ্ধিকে, মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আরও কেহ আছে? মানুষ কথা বলে, কাজ করে, এমন কি সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস-টুকু পর্য্যন্ত সেই শক্তির সাহায্য নিয়াই ফেলিতে সক্ষম হয়। শক্তি গেল, তো তাহার সব গেল। শক্তিহীনকে সকলেই অবজ্ঞা করে, আবার শক্তি-মান্‌কে জগতের সবাই পূজা করে—শ্রদ্ধা করে।

আসলে শক্তি কি, তাহার তত্ত্ব জানিতে না পারিলেও দৈনন্দিন জীবনে অহরহ শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি আমরা সকলেই। রোগ হইল, ডাক্তার আসিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনার বাণী বলিতেছে, তাহাতেই রোগীর প্রাণে ভরসা হইতেছে; আর এই ভরসা এবং বিশ্বাসের ফলেই ডাক্তারের ঔষধের ও ক্রিয়া হইতেছে। দুই ভাইয়ে মনোমালিন্যের দরুণ কাহারও সঙ্গে কেহ কথা বলে না, হঠাৎ হয়ত একদিন আত্মীয়ের এক মুহূর্ত্তের উপদেশ শুনিয়া তাহাদের মনের কালিমা নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গেল; আবার ভাইয়ে ভাইয়ে সেই সহজ সরল ব্যবহার! পরস্পরের কথায়, কাজে, আদর্শে সকলেই আমরা উদ্বুদ্ধ হই। কাজেই প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই সেই মহাশক্তির ক্রিয়া অনবরত চলিতেছে। ছোট একটী শিশুর মুখ হইতেও সাধারণ একটী কথা শুনিয়া জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে। কাজেই শক্তির কোন একচেটীয়া নিয়ম নাই; শক্তি প্রত্যেকের ভিতর হইতেই কাজ করিতেছে। কোন্ সময় কাহার ভিতর হইতে যে সেই শক্তির অব্যর্থ মহিমা প্রকট হইয়া পড়িবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে "শক্তি পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘায়।" অর্থাৎ শক্তির কাছে কোন নিয়মের বন্ধন নাই, ইচ্ছা করিলে শক্তি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে। তবে দেখিয়া শুনিয়া, অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, শক্তির ক্রিয়া সকলের ভিতরই হয় না;—যাহারা শক্তিসাধনার দরুণ ব্যাকুল, শক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহের দরুণ অহরহ সাধনার নিমগ্ন, শক্তির ক্রিয়া হয় তাহাদের ভিতরই।

আর শক্তির প্রচণ্ড ক্রিয়া মানুষের অজ্ঞাতেই হয়। চিকাগো মণ্ডপে বিবেকানন্দের অমর সম্বোধন—Sisters and Brothers of America"—কি কাজই না করিয়াছিল! এই এক-মুহূর্ত্তের অমর সম্বোধনে সমগ্র আমেরিকা করামলকবৎ তাঁহারই হইয়া গেল। ইহার পর হইতেই বিবেকানন্দের কাজ আপনা হইতেই চলিতে লাগিল। এই সম্বোধনের ভিতর দিয়া মহাশক্তিই কাজ করিয়াছিলেন, তাঁর শক্তির প্রভাবেই সকলে স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল!

কথা আমরা সকলেই বলি, কিন্তু সকলের কথা তো তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না। কেন? ইহার কারণ কি? গান্ধী আসিয়া যদি একটা সামান্য কথাও বলেন, তাহা হইলে লোকে কেন তাঁহার কথাকে বিশ্বাস করিয়া জীবন দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে; আর কাহারও কথায় কেন কর্ণপাতও করে না। ইহার তাৎপর্য্য কি? বিশেষত্ব কি? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে গেলে এই বলা যায় যে সকলে তো আর সাধক নয়। বাস্তবিকই যাহারা সাধক নয়, অপরের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাহাদের এতটুকুও নাই! আমরা সাধারণতঃ যে সব কথা বলি, তাহার মাঝে মিথ্যা, ভণ্ডামী, সন্দেহ এ সবের একটা না একটা থাকেই, অর্থাৎ জোর করিয়া আমরা কোন কথাই বলিতে পারি না, কেননা যদি কেউ প্রমাণ চায়, ভয়ে, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষায় সন্দেহে দুলিতে দুলিতে, কাঁপিতে কাঁপিতেই যাহা বলিবার বলি! দুর্ব্বল ভাব দুর্ব্বল কথার মাঝে আত্মপ্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই লয় পায়, অপরের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার মত স্থায়িত্বই যে নাই তাহার! আমাদের সাধারণের কথার যে কোন মূল্য নাই—ইহাই তাহার কারণ।

শক্তি হঠাৎ বিভূতির মত যাহাদের মাঝে ফুটিয়া উঠে, তাহাদের সেই শক্তির স্থায়িত্ব খুব অল্প সময়ের দরুণই হইয়া থাকে। শক্তিকে যাহারা চির-জীবনের তরে পাইতে চায়, তাহাদিগকে শক্তির দরুণ সাধনা করিতে হয়। এক রাত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া যে শক্তি আয়ত্ত হয়, সেই শক্তি আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেও বেশী সময় লাগে না। শক্তি সাধনা সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক আজগুবি ধারণা আছে। কিন্তু শক্তিধর মহাপুরুষরা নিজের জীবন দ্বারা সেই সব কুসংস্কারকে এখন ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী অমাবস্যা রাত্রে চণ্ডালের মৃত দেহের উপর বসিয়া সাধনা না করিয়াই যে শক্তির ক্রিয়া দেখাইতেছেন, অনেক তান্ত্রিক আজগুবি সাধনা করিয়াও মহাত্মার সেই শক্তির কাছে ঘেঁসিতে পারিবে না। শক্তি সাধনা—দৈনন্দিন জীবনের সাধনা, বিশেষ কোন তিথিনক্ষত্র দেখিয়া সেই সাধনায় বসিতে হয় না! তান্ত্রিকের কি অভাব আছে দেশে, কিন্তু কয়জন তান্ত্রিকের জীবন শক্তির উৎস স্বরূপ? শক্তি উপাসনায় বিশেষ কোন তিথিনক্ষত্র নাই। প্রতিদিনের কাজে-কর্ম্মে সেই সাধনা অনায়াসে চলিতে পারে। যাঁহাদের কথার এত মূল্য—যাঁহাদের জীবনের আদর্শে সহস্র সহস্র প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়—তাঁহারা আজগুবি তান্ত্রিক বা শক্তিসাধক নন। তিল তিল করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াই তাঁহারা এত বড় হইতে পারিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরা যেমন প্রতিদিনের সাধনা দ্বারা জীবনকে উন্নীত করিয়াছেন—তেমনি তাঁহাদের কাছে যাহারা উপদেশপ্রার্থী হইয়া যায়, তাহারাও সেই সাধনার রীতিই শিখিয়া আসে! কেহ কেহ সেই সহজ সাধনার উপদেশ পাইয়া মনে করে—ও, তিনি বুঝি শক্তি-সাধনার গূঢ় রহস্য মোটেই জানেন না, তাই আমাদের প্রতি দিনের কাজ-কর্ম্মের ভিতর দিয়া শক্তির সাধনা করিতে বলিয়াছেন! দৈনন্দিন সাধনায়ই মানুষকে বড় করে, এই কথাটী অন্ততঃ আধ্যাত্মিক সাধনার দিক দিয়া অনেকেরই অবিশ্বাস্য। কেননা তাহারা ভাবে—বিশেষ কোন তিথি-নক্ষত্র ছাড়া এবং অমাবস্যার অন্ধকার রজনী ছাড়া শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইতেই পারে না!

সাময়িক অবসাদকে, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত নয়। জানা কথা, দুর্ব্বলতা মানুষের স্বভাব নয়, দৈন্য-প্রকাশের কোন স্থায়িত্ব নাই। মানুষ—মানুষ! তাহার প্রাণ আছে, চিরপ্রদীপ্ত জ্ঞানালোক আছে, তাহার আবার ভয় কিসের—ভাবনা কিসের?

তবু মানুষের ভুল হয়—ভ্রান্তি হয়, মনে করে আমি বুঝি এই এতটুকু। দেহের জড়ত্ব চেতনাকে গ্রাস করিতে বসে। ভয়ে হয়ত এমনি করিয়াই তাহার বল-বীর্য্যে বিস্মৃতি ঘটে, তখন সিংহের বাচ্চাও শিয়ালের ডাকে কাঁপে। সেই সময় একজন দিশারীর প্রয়োজন যে নাকি কাণের কাছে আসিয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে পারিবে—তত্ত্বমসি—তত্ত্বমসি! কতক্ষণ—লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে মুহূর্ত্ত সময়ও লাগে না। কাজেই আজ যাহারা দুর্ব্বল, অসহায়, তাহাদের যে কোন আশা নাই তাহা নহে—তাহারা অবসাদে, দুর্ব্বলতায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র, শক্তিসাধকের প্রাণের বিদ্যুন্ময় পরশ যদি একবার মাত্র তাহাদের মৃত চেতনায় লাগিতে পারে—তাহা হইলে তাহারাই আবার তাজা প্রাণ নিয়া লাফাইয়া উঠিবে। দেশে আজ সেই ধরণের শক্তিধর মহাপুরুষেরই প্রয়োজন, যাহার বাক্য অব্যর্থ—সঙ্কল্প অব্যর্থ। মরাকে দেখিয়াও যদি তাহার মুখ হইতে এই বাণী বাহির হয় যে, না সে তো জীবিতই, অমনি সেই মরার বিছানা থেকেও মরা লাফাইয়া উঠিবে। প্রাণ দিয়া প্রাণ সঞ্চার করিতে পারাই হইল শক্তিমান্ সাধকের প্রয়োজন। যীশুখ্রীষ্ট নাকি পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, অন্ধকে দেখিয়া যেই বলিয়াছেন "open your eyes"—অমনি বাস্তবিকই অন্ধের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট এমনি করিয়া কত কাণা খোঁড়া, দীন দুঃখী আতুরকে যে ভাল করিয়াছেন, তাঁহার ইয়ত্তা নাই!

রামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ গৃহী-ভক্ত নাগ মহাশয় সম্বন্ধেও এক অদ্ভুত কাহিনী আছে। তিনি নাকি নিজের বাড়ীর আঙিনাতে সকলের সম্মুখে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গঙ্গার চিরপ্রবহমান উৎস হইতে এক ধারা উত্থিত হইয়াছিল। শক্তিসাধকের অব্যর্থ সঙ্কল্পের সহায়তার দরুণ এমন কি দেবতাদের পর্য্যন্ত নাকাল হইতে হইয়াছে। শক্তিসাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির কথা শুনিতে পাই, তিনি নাকি মাকে দিয়ে পাথর পর্য্যন্ত বহাইয়াছিলেন? এইরূপ আরও অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়! অলৌকিকত্বের ভাগ কাটিয়া-ছাঁটিয়া ফেলিলেও, সত্য-সঙ্কল্প সাধকের কামনা যে ব্যর্থ হইবার নয়, ইহা আমরা দৈনন্দিন জীবনের মাঝেও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। যে ছেলে একজেদী—পরিবারের মাঝে অন্যান্যের চেয়ে মা তাহারই মন জুগাইয়া চলেন বেশী করে। কেননা মা জানেন, অন্যান্য ছেলে বুঝ মানিবে—কিন্তু তাহার একজেদী ছেলের জেদ কিছুতেই মানিবার নয়! আর একজেদী ছেলেও জানে, আমি যা চাইব তাহা আদায় করিবই করিব! কাজেই দুরন্ত ছেলেদের দরুণই মা ভাবেন বেশী। শান্ত-শিষ্ট ছেলের দরুণ তো মায়ের ভাবনাই নাই। মাকে ভাবাইয়া তুলে, ব্যাকুল করে এই অশান্ত একজেদী ছেলের দলই। অসুরদের কিন্তু আমি মহাভাগ্যবান্ বলি, তাহারা মাকে ফাঁপড়ে ফেলিয়া, মায়ের কাছ থেকে বীরের মত সন্তানের প্রাপ্য আদায় করিয়া নিয়াছিল। তাহারা অশিষ্ট, অশান্ত, অসুর ছিল বটে, কিন্তু শান্ত-শিষ্ট ভণ্ড ছেলের মত ভাণ করিয়া মায়ের কাজে অন্যায় আচরণ করে নাই কোনদিন। বলিতে কি, মাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া নিয়াছে অসুররাই। শক্তিরূপিণী মায়ার যে কি অখণ্ড প্রতাপ, তা অসুররাই জানে বেশী!

শক্তির কাজ অহরহঃই চলিতেছে, কিন্তু আয়োজনের যথাযোগ্যতায় সেই শক্তিই শক্তিমান্ সাধকের নির্ম্মল চিত্তের ভিতর দিয়া অফুরন্তভাবে কাজ করিতে

থাকে। যাহার ভিতর হইতে শক্তির তরঙ্গ উত্থিত হইয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মাঝে সেই শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহাকেই দেশের লোকে মহাত্মা বলিয়া, নেতা বলিয়া পূজা করে। সমগ্র মানবের আকুল আহ্বানে অমূর্ত্ত-শক্তি শুদ্ধ আধার বাছিয়া রূপ পরিগ্রহ করে। সেই শক্তির লীলা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ তাঁহাদের জীবনে প্রকট হইয়াছিল বলিয়াই, তাঁহাদের আমরা অবতার বলিয়া পূজা করি—শ্রদ্ধা করি। আসলে কিন্তু প্রত্যেকের জীবনই শক্তির অব্যর্থ মহিমায় নিয়ন্ত্রিত। যেই সেই শক্তির একটুকু সন্ধান পাইয়াছে, সেই পাগল হইয়াছে, ধ্যান-তন্ময়তায় ডুবিয়া গিয়াছে!

অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রত্যেকের মাঝেই সবুজ প্রাণের প্রবাহ অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে তবে কিনা চিত্ত চঞ্চল বলিয়া কেহই সেই শান্ত-শীতল প্রবাহকে অনুভব করিতে পারিতেছে না। কাজেই জাতিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইলেই, স্বভাবের শান্ত শীতল প্রবাহে অবগাহন করাইয়া আনিতে হইবেই হইবে। গান্ধী নিজেও ধ্যানে তন্ময় হইয়া এই বাণীই শুনিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, উত্তেজনা দ্বারা, আস্ফালনের দ্বারা কিছু হইবার নয়, আত্মস্থ হইতে পারিলে সব কিছুই ক্রমশঃ আয়ত্ত হইবে। তাই দেখি, তিনি অনুচরদের উত্তেজিত না করিয়া প্রথমেই চরকার সাহায্যে আত্ম ধ্যানে স্তব্ধ হইবার পথই ধরাইলেন। এই নীরব সাধনাই সকলের প্রাণে আস্তে আস্তে সাড়া দিতে আরম্ভ করিল! আজ তো তাহার বিরাট মহিমায় সকলই অনুপ্রাণিত!

কাহারও প্রাণ যখন মরে নাই, তখন আশাও ছাড়িতে নাই! তবে কিনা নিজকেই বিশ্বাসের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে প্রথমে, তাহার পর নিজের সিদ্ধিলাভ হইয়া গেলে দেশের কাজ—দেশের কাজ! প্রত্যেকেরই একটা বিশিষ্ট ধাত আছে, ভারত শান্ত সমাহিত হইয়াই একদিন শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া তাহার কোনদিন তৃপ্তি আসে নাই। কাজেই আমাদের মাঝেও অনবরত শক্তির বর্ষণ হইতে থাকিবে, যদি আমরা শান্ত হইতে পারি, উত্তেজনাহীন হইতে পারি! মহাশক্তির কৃপা হইতে কেহই বঞ্চিত নয়, কাজেই জগতের একটী প্রাণীও দুর্ব্বল নয়। প্রত্যেকের ক্ষমতা আছে, দাবী আছে—দাবীপূরণের শক্তিও আছে। কেহই হীন নয়—দীন নয়। তবে কিনা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের আত্মবিস্মৃতি ঘটে। আবার কেহ যদি জ্বলন্ত-ভাষায় অতীতের গৌরব কাহিনী বর্ণনা করিতে পারে, তাহা হইলে সেই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই দেখি জাতির প্রাণ আশ্চর্য্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসের সময় গুরু শিষ্যকে **"মহাবাক্য"** প্রদান করেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? না মহাবাক্যের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের হৃদয়ে বল সঞ্চার করা। গুরু বলিলেন তত্ত্বমসি, অমনি শিষ্যের সেই অনুভূতি হইয়া গেল। তাহার পর হইতে আর তাহার কোন ভয় নাই, অজর-অমর আত্মার অনুভূতিতে তাহার জড়-দেহও চেতন।

বাক্যের সঙ্গে প্রাণ-শক্তি মিশ্রিত হয় বলিয়াই বাক্যের এত জোর। গুরুশক্তি শিষ্যের মাঝে সঞ্চারিত হয় এবং অব্যর্থভাবে ক্রিয়া করে এই জন্যই। "তত্ত্বমসি", "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" এই সব কথা কে না জানে? কিন্তু গুরুমুখ হইতে সেই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হয়, তখন তাহারই অর্থের দীপ্তিতে প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিতে প্লাবিত হইয়া যায়। কাজেই বাক্যের শক্তি নির্ভর করে—প্রাণের অব্যর্থ বীর্য্যে।

কাহারও কাহারও জীবন সমষ্টির জীবনের উন্নতির দরুণই তৈরী। তাহারা জন্ম হইতেই সেই শক্তি, সেই ক্ষমতা নিয়া অবতরণ করেন। তাহাদের এক মুহূর্ত্তের দরুণ বিশ্রাম নাই, সারা জীবন পরকে উদ্বুদ্ধ করিতে, কর্ম্মে নিয়োগ করিতেই তাহাদের

জীবনের সার্থক হয়। সমাজে, দেশে সর্ব্বত্রই এক একজন কর্ণধার থাকেন. তাঁহারা নিজের বুকের বল দিয়া, দুর্ব্বল-সবল সকলকেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলেন। তাঁহাদের সাধনার বিরাম নাই—সকল সময় দেশকে, দশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার দরুণ অজপা জপ চলিতেছে।

সাধনা করিয়া যে দৃষ্টি খুলে, সাধনা করিয়া যে অনুভূতি লাভ হয়, আসল কাজ হয় তাহা দ্বারাই। সাধকের মন যখন একাগ্র হয়, তখন সে মূল-শক্তির সন্ধান পায়! কাজেই লোকের অবিশ্বাসকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিশ্বাসের অগ্নিময় বীর্য্যে নিজের কাজ সে আপন মনেই করিয়া যায়। দু'দিন পর দেখা যায়, সকলেই তাহার পথ অনুসরণ করিবার দরুণ ব্যাকুল!

শক্তির সন্ধান পাইতে হইলে, শক্তিতে দেহ মন-প্রাণকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে উত্তেজনা-বিহীন সাধনার খুবই প্রয়োজন। উত্তেজনা মাত্রেই অবসাদ আনে—সেই অবসাদে আত্মার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে। কাজেই সর্ব্বদা উজ্জ্বলানুভূতিতে নিজকে চেতন রাখিতে হইলেই চাই নীরব সাধনা। ধ্যান-স্তব্ধ হইয়া থাকেন বলিয়াই শিবের মাঝে প্রলয়ঙ্করী শক্তিও বিরাজমানা। মোট কথা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে হইলে—দম্ভ ছাড়িতে হইবে, কোন উত্তেজনা রাখিতে পারিবে না! দাম্ভিকের কাছে শক্তি থাকে না—কেননা শক্তির চেয়ে দম্ভই বড় হইয়া যায়। নেংটী-পরা, ভাঙ্-ধুতুরাখোর ক্ষ্যাপাকে সতী সাধে এত ভালবাসিয়াছিলেন?

অপরের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশও যাঁহাদের করিতে হয়, তাঁহাদের আত্মবিশ্বাসে অচল-অটল থাকাই হইল প্রধান কাজ। নিজের জীবনের সুখ দুঃখের বোঝা বহন করিয়াই মানুষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এর উপর যাহারা অপরের জীবনের ভারও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তাহারা শক্তিধর পুরুষই বটে! এই সব শক্তিধর পুরুষদের যখন আগমন হয়, তখনই বুঝিতে হইবে দেশের, দশের আবার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে! তাহাদের জীবন সমষ্টির সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র বিশেষ! তাঁহারাই প্রবক্তা—নেতা—উপদেষ্টা—ঋষি!

শক্তি সঞ্চার করিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্যই ঋষিদের আগমন! শুধু কুরুক্ষেত্র কেন, যাহাদের দিয়া কাজ হইবে তাহাদের সাময়িক অবসাদে সান্ত্বনা দিবার দরুণ, বল সঞ্চার করিবার দরুণ শক্তিধর পুরুষরা পাশে পাশেই থাকেন।

যিনি প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন, তিনিই শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। ঋষি টলষ্টয়ও একদিন নিরক্ষর চাষাদের জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিবার দরুণ, অকাতরে তাহার সমখানি প্রাণ বিলাইয়া দিয়াছিলেন! কাজেই নেতা হওয়া—গুরু হওয়া সহজ কথা নয়। প্রাণ দিয়া প্রাণ সঞ্চার করা কি সহজ কথা?

—*—

বৌদ্ধ-যুগে নারীর সাধনা

—(*)—

পুরুষ ত্যাগ করে বৈরাগ্যে, আর নারী ত্যাগ করে ভালবাসায়। কাজেই ত্যাগের ক্ষমতাটা শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া নয়। ইচ্ছা করিলে নারীও অসাধ্য সাধন করিতে পারে। নারীর কমনীয় রূপের অন্তরালে বীর ভাবও রহিয়াছে।

বৌদ্ধ যুগে নারীদের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট। থেরী*দিগের মাঝে কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ়ে কেহ বা বার্দ্ধক্য দশায় যে কঠোরতা করিয়া বুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। অবশ্য এই সাধনায় বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবই ছিল তাহাদের ত্যাগের মূল কারণ। তাহারা বুদ্ধদেবকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত বলিয়াই, বুদ্ধদেব-প্রচারিত সত্যের দরুণও অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিছু মাত্র ইতঃস্তত করিত না। কিন্তু ব্যক্তিত্বের আকর্ষণই থাকুক আর যাহাই থাকুক বৌদ্ধ যুগে

* থেরী—স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা।

নারীদের ভিতর যে অসীম সাহস, তেজ, বল বিক্রম ছিল ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহের কারণ নাই। উপনিষদে যেমন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর কথোপকথন প'ড়িয়া আমরা অবাক্ হই, তেমনি "থেরীগাথা" পড়িলে প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্ব ভারতীয় রমণীগণের কিরূপ জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভা ছিল তাহার বেশ নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-যুগে, ভারত সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহারও বেশ একটা সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। এক একজনের ত্যাগের কাহিনী শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াই না এক একজন সত্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। আত্মনিপীড়নের কি দুরন্ত সাহসই না ছিল এক একজন থেরীর অন্তঃকরণে। থেরীগাথা প'ড়িলে বিস্ময়ে, গৌরবে প্রাণে যেন নূতন বল সঞ্চার হয়। অতীত যুগের কাহিনী পড়িয়া ভাবী আশার সূত্রপাত হয়। মনে হয়, আবার এক দিন সেই যুগ আসিবে, যখন স্ত্রী পুরুষ ভেদ-বিচার উঠিয়া গিয়া সকলেই জ্ঞানপিপাসার দরুণ সত্যলাভের দরুণ এমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগপরায়ণ হইতে পারিবে। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কিম্বা প্রভাবই যদি বড় করিয়া ধরি, তাহা হইলে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব কি অসম্ভব, যাহা দ্বারা দেশের নারী ও পুরুষের প্রাণ এক সঙ্গে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে? অমাবস্যার পর পূর্ণিমা যখন স্বাভাবিকই আসে, তখন এইরূপ আশা করা বোধ হয় আকাশ-কল্পনা নয়। আর দেখাও যাইতেছে, আস্তে আস্তে বুদ্ধি প্রতিভার দিক্ দিয়া নারীদের মাঝে বেশ একটা আশাতীত উন্মেষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এখন চাই শুধু সাধনার শক্তি, কঠোর সংযমের শক্তি। তাহা হইলেই তো অতীত যুগ আর আদর্শে না থাকিয়া বাস্তবেই রূপান্তরিত হইবে।

আমরা থেরীগাথা হইতে এখন দুই-চারিটী থেরীর সত্য লাভের দরুণ কঠোর সাধনার পরিচয় দিতেই চেষ্টা করিব।—

চিত্তা নামক একজন থেরীর গাথা, যথা—

কিঞ্চাপি খোম্‌হি কিসিকা গিলানা বাল্‌হদুব্বলা।
দণ্ডমোলুব্‌ভ গচ্ছামি পব্বতং অভিরূহিয়॥ ২৭
সংঘাটিং নিক্‌খিপিত্বান পত্তকং নিকুজ্জ্‌ যিয়।
সেলে খম্ভেসিং অত্তানং তমোক্‌খন্ধং পদালিয়॥ ২৮

আমি এখন দুর্ব্বলা, আমার যৌবন গিয়াছে, আমি কৃশা হইয়া পড়িয়াছি, তাই আমাকে যষ্টি ধরিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে হইতেছে। তাহা হইলেই বা কি? আমি কি সত্য লাভ করিতে পারিব না?" এই বলিয়া চিত্তা ভিক্ষার ঝুলি, এবং বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্পে ধ্যানে বসিয়া গেলেন। তাহার পর ধ্যানে তাঁহার চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সমস্ত তমঃ বিনাশ-প্রাপ্ত হইল।

ভিতরে সত্য লাভের পিপাসা জাগিয়া উঠিলে মানুষের বলের দরুণ অভাব হয় না। দৃঢ়সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে বল আসে। বয়স হইলে কি হয়, আত্মা তো অজর-অমর; আত্মার বজ্র-নির্ঘোষ বাণীতে সকলের জড়ত্ব, অবসাদ সব বিদূরিত হইয়া যায়। তখন বৃদ্ধাও যুবার ন্যায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। কাজেই বৃদ্ধা হইলে, বয়স অধিক হইলেই যে সত্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। সত্য-লাভের পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর জলন্ত উৎ-সাহেরও আবির্ভাব হয়। তখন অতীতের গ্লানিতে অগ্নিময় সঙ্কল্পকে আর ধামাচাপা দিয়া রাখিতে পারে না।

সীহা (সিংহা) নাম্নী দেবীর উক্তি। ইনি কুমারী অবস্থাতেই থেরী হন।

অযোনিসোমনসিকারা কামরাগেন অদ্দিতা।
অহোসিং উদ্ধতা পুব্বে চিত্তে অবসবত্তিনি॥ ৭৭
পরিযুট্‌ঠিতা কিলেসেহি সুখসঞ্‌ঞানুবত্তিনী।
সমং চিত্তস্‌স নালভিং রাগচিত্তবসানুগা॥৭৮
কিসা পণ্ডু বিবণ্ণা চ সত্ত বস্‌সানি চারি'হং।
নাহং দিবা বা রত্তিং বা সুখং বিন্দিং সুদুক্‌খিতা॥৭৯
ততো রজ্জুং গহেত্বান পাবিসিং বনমন্তরং।
বরং মে ইধ উব্বন্ধং যঞ্চ হীনং পুনাচরে॥৮০
দল্‌হপাসং করিত্বান রুক্‌খসাখায় বন্ধিয়।
পক্‌খিপিং পাসং গীবায়ং অথ চিত্তং বিমুচ্চি মে॥৮১

একদিন চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির হইয়া কুমারী সিংহা সঙ্কল্প করিলেন যে ফাঁসীতে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়া তিনি এক নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিয়া গাছের ডালে রজ্জু দ্বারা এক ফাঁস নির্ম্মাণ করিয়া যেই নাকি সেই ফাঁস

গলায় দিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার চিত্তে মুক্তি বিভাসিত হইয়া উঠিল।

যৌবন বয়সে কাম দ্বারা সকলেই পীড়িত হয় কিন্তু তাহার পীড়নে আত্মোদ্ধারের দরুণ এমন উৎকট প্রচেষ্টা অবলম্বন করেন কয়জন? "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রায় অধিকাংশ থেরীর জীবনেই দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভের জ্বালাতন তাহাদের মাঝে যে কোন সময় হইত না এমন নয়, তাঁহারাও সাধারণ নারীর মতই ছিলেন; কিন্তু অসাধারণত্ব তাঁহাদের এইটুকু ছিল যে, তাঁহারা প্রতিকারের উপায়ও খুঁজিয়া বাহির করিতেন। আত্মশক্তির উপর তাহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, কাজেই উৎকট উপায় অবলম্বন করিয়াই হোক আর যে ভাবেই হোক, ইন্দ্রিয় দমনের উপায় তাঁহারা আবিষ্কার করিয়া নিতে সক্ষম হইতেন। দুইটী গুণই তাঁহাদের স্বাভাবিক ছিল—একটী বিবেক, আর একটি সম্যক্ ব্যায়ামের ফল বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প। কামের উত্তেজনা স্বাভাবিক হইলেও, মানুষ আত্মশক্তি দ্বারা সেই উত্তেজনাকে, উদ্দীপনায় রূপান্তরিত করিতে পারে; এই বিশ্বাস তাঁহাদের মাঝে ছিল। কাজেই এই বিশ্বাসের দরুণ তাঁহারা কেহ বা গলায় ফাঁসি দিতে উদ্যত হইতেন, কেহ বা বুকে ছুরি বসাইতে চাহিতেন; এমনি করিয়া ইন্দ্রিয় দমনের একটা না একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতেনই করিতেন! এমনও দেখা যায়, কাম-রাগে জর্জরিত হইয়াও সত্য উপেক্ষার দরুণ চিত্তে কোন গ্লানিই আসে না তাহাদের! কিন্তু থেরীদের মাঝে এইরূপ ভাব ছিল না।

প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে কিনা সাধক—ইহাই যেন সত্যের শেষ পরীক্ষা। স্বামী রামতীর্থের মাঝেও দেখিতে পাই, এই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। একদিন একটা অঙ্ক মিলাইতে না পারিয়া, বুকে ছুরি বসাইতে উদ্যত হইলেন—অমনি সেই অঙ্কের প্রণালী এবং ফল জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার সম্মুখে আকাশের গায় ভাসিয়া উঠিল! ইহা কিন্তু দৈবের ক্ষমতা নয়—সত্যসঙ্কল্প সাধকের প্রাণের আকুলতারই ফল। এক একটী বিষয়ে এইরূপ ভাবে প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিলে তবে ঠিক ঠিক সেই জিনিষের স্বরূপ জানা যায়! অসম্ভব কিছুই নয়—তবে কিনা প্রাণের সেই তীব্র আবেগ সকলের থাকে না।

বৌদ্ধদের মাঝে "সম্যক্ ব্যায়াম" বলিয়া একটী কথা আছে। সম্যক ব্যায়াম মানে যথার্থ অধ্যবসায়। সম্যক্ ব্যায়ামের যিনি অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহার এই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প—"আমার শরীরের রক্ত মাংস সব শুকাইয়া যাউক, শুধু হাড়-চামড়া আর শিরাগুলি অবশিষ্ট থাকুক; তবু মানুষের শক্তিতে, মানুষের বিক্রমে যাহা পাওয়া যায়, তাহা লাভ না করিয়া আমার এই বীর্য্য এই উৎসাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না।" আত্ম-বিশ্বাসের কি জ্বলন্ত বর্ণনা! এইরূপ সঙ্কল্প প্রায় প্রত্যেক থেরীর মাঝেই ছিল। তাঁহারা কেহই সঙ্কল্প করিয়া, আমরণ পর্য্যন্ত সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। আর ইহার মাঝে যদি সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত তাহা হইলে তো কোন কথাই ছিল না। তাহা না হইলে তাঁহারা ব্রতের ন্যায় এক একটী সঙ্কল্পকে অটুটভাবে সিদ্ধির আগ পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়া যাইতেন।

বুদ্ধদেবের নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও যে থেরীদের মনে কোন সন্দেহ কিংবা সংশয় থাকিত না, এমন নয়। কেহ কেহ সন্দেহে-সংশয়ে দু'চার বার বিহার পরিত্যাগ করিয়াও গিয়াছিলেন, এমনও বর্ণনা পাওয়া যায় থেরীগাথায়। যথা—

চতুক্ খত্তুং পঞ্চক খত্তুং বিহারা উপনিক্খমিং
অলদ্ধা চেতসো সন্তিং চিত্তে অবসবত্তিনি॥ ৪২
যা ভিক্খুনিং উপাগচ্ছিং যা মে সদ্ধায়িকা অহু।
যা মে ধম্মং অদেসেসি খন্ধায়তনধাতুয়ো॥ ৪৩
তস্‌সা ধম্মং সুনিত্বান যথা মং অনুসাসি সা।
সত্তাহং একপল্লঙ্কে নিসীদিং পীতিসুখসমপ্পিতা।
অট্‌ঠমিয়া পাদে পসারেসিং তমোক্খন্ধং পদালিয়॥ ৪৪

—এই থেরীর নাম উত্তমা। ইনি মনের সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া ৪।৫ বার বিহার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। গাথায় নিজেই বলিতেছেন—"আমি ৪।৫ বার বিহার ত্যাগ করিয়া গেলাম, তবু আমার চিত্তে শান্তি আসিল না। তাহার পর এক ভিক্ষুণীর সঙ্গে আমার দেখা হইল; তাঁহারই উপদেশে একাসনে ৭ দিন পর্য্যন্ত ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকার পর অষ্টম দিবসে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ

হইল। প্রাণের সকল জ্বালা শান্তিসলিলে নির্ব্বাপিত হইল। আলোকে চিত্ত ভরিয়া উঠিল—সকল অন্ধকার তমঃ দূরীভূত হইল।

সংশয় আসা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সংশয়কে বিতাড়িত করিবার দরুণ যাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া লাগে, তাহাদের কাছে শেষ পর্য্যন্ত সংশয় টিকিতে পারে না। থেরীদের প্রত্যেকের প্রাণেই আগ্নেয় বীর্য্য ছিল। সাধারণ মানুষের ন্যায় তাহারাও দৈহিক অত্যাচারে আক্রান্ত হইতেন, কিন্তু প্রাণের অমিত বল দ্বারা সকল দুর্বলতাকে ঠেলিয়া তাহারা আপন লক্ষ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন। এই যোদ্ধৃভাবটাই হইল আসল লক্ষ্যের বিষয়। অনেকের জীবনই পণ্ড হয় শুধু এই যোদ্ধৃভাবের অভাবে। একটু প্রাণের ভাব নিয়া সঙ্কল্পে অচল-অটল হইয়া থাকিতে পারিলেই দেখা যায়—প্রতিকূলও অনুকূল হইয়া আসে। বাধা চিরকাল পথকে রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষে ইচ্ছা করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। তবে কি না বজ্রদৃঢ় ইচ্ছা সকলের ভিতর উদ্বুদ্ধ হয় না। বৌদ্ধ যুগের নারীদের যে আর কোন বিশেষত্ব ছিল তাহা নয়—সঙ্কল্পে অচল-অটল থাকাই ছিল, তাহাদের পণ এবং এইটাই হইল প্রধান বিশেষত্ব।

তারপর এই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের দরুণ তাঁহাদের ভিতর বিশ্বাসও খুব প্রবল ছিল। আমরা সাধারণতঃ দুই এক দিন একটু সাধন ভজন করিয়াই যখন সদ্য সদ্য তাহার কোন ফল দেখিতে পাই না, অমনি চিত্তে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে—অধৈর্য্য হইয়া উঠি। কিন্তু থেরীদের এক এক জনের হয়ত ২০।২৫ বৎসর অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি মোটেই কিছু হয় নাই, তবু দেখি আশায় শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে তখনো তাহাদের চিত্ত অচল অটল। শ্যামানাম্নী এক থেরীর উক্তি যথা—

পণ্ণবীসতি বস্সানি যতো পব্বজিতায় মে।
নাভিজানামি চিত্তস্স সমং লদ্ধং কুদাচনং॥ ৩৯
অলদ্ধা চেতসো সান্তিং চিত্তে অবসবত্তিনি।
ততো সংবেগং আপাদিং সরিত্বা জিনসাসনং॥ ৪০
বহূহি দুক্খধম্মেহি অপ্পমাদরতায় মে।
তণ্হক্খয়ো অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্স সাসনং।
অজ্জ মে সত্তমী রত্তি যতো তণ্হা বিসোসিতা॥ ৪১

—"প্রব্রজ্যার পর প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কৈ চিত্তের তো কোন সাম্য হইল না! অর্থাৎ চিত্তের তো চঞ্চলতা দূর হইল না। তাহা হইলে কি আমার সব সাধনা বিফল হইল? চিত্তে শান্তি না পাওয়ার দরুণ উদ্বেগে আমি চঞ্চল—কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠে, যখন জিন-বিধির কথা স্মরণ করি। কেননা বিধি অনুযায়ী চলিলে যে অভীষ্ট-সিদ্ধি না হইয়াই পারে না। এই সব কথা ভাবিয়া যে আমার চিত্ত আরও উতলা হইয়া উঠিল! তাহার পর চিত্তের ব্যাকুলতা নিয়া পূর্ব্বের চেয়ে অধিকতর উৎসাহ নিয়া আবার সাধনায় বসিলাম। তাহার পর বুদ্ধের কৃপায়—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। বুদ্ধদেবের কৃপা লাভ করিয়াছি এই মাত্র ৭ দিন হ'ল।"

বাস্তবিকই কি ধৈর্য্য, কি অটুট বিশ্বাস! এক দিকে সংশয়, আবার অন্যদিকে বুদ্ধশাসনের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়া সেই সংশয়কে নিরসন। বুদ্ধশাসনকে তাঁহারা কত শ্রদ্ধা করিতেন, কতখানি বিশ্বাস করিতেন! এই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস না থাকিলে কি মানুষের সত্য লাভ হয়? মানুষ কেবল বছর গণে যেন সত্যলাভের একটা মেয়াদ রহিয়াছে! ঠিক ঠিক প্রাণের আকুলতা আসিলে, এক মুহূর্ত্তেও সত্য লাভ হইতে পারে; আবার হয়ত যুগ-যুগান্তরও চলিয়া যাইতে পারে। চাই শুধু আকুলতা—আর মরণজয়ী বিশ্বাস। এই বিশ্বাস নিয়া যদি মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও লাভ, তাহারাই যোগভ্রষ্ট হইয়া পরের জন্মে মহৎ-কুলে মহৎ-সঙ্কল্প নিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। সাধনায় কি কখনো ব্যর্থতা আছে? যতটুকু করিলাম, ততটুকুই পুঁজি হইয়া রহিল। কিন্তু মানুষের এই শ্রদ্ধাটুকু, এই বিশ্বাসটুকু থাকে না। কাজেই হা-হুতাশ করিয়া শুধু প্রাণের জ্বালাই বাড়ায়।

অনেকের ধারণা, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বুঝি সাধকের সিদ্ধিলাভের খুব একটা সহজ রাস্তা বাহির হয়। অর্থাৎ যাহারা ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসে তাহাদের নিজেদের আর কিছু করিতে হয় না, তাহাদের হইয়া গুরু কিম্বা আচার্য্যই সারিয়া নেন। কিন্তু বুদ্ধদেবকে যদি ইহার নজীর ধরা যায় (কেননা তাঁহার যে greatest personality ছিল, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন) তাহা হইলে দেখিতে পাই, বুদ্ধ শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া যে সব ভিক্ষু কিম্বা ভিক্ষুণীরা চলিতেন, তাঁহাদের

প্রাণে সত্যলাভের দরুণ একটা তীব্র স্বাধীন চেষ্টা ছিল। প্রত্যেকের মনেই এই স্বাধীন চেষ্টাটা ছিল বলিয়াই তাঁহারা বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া প্রাণের অমিত-বল নিয়া নিজেরাই সাধন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেন। হয়ত বহুদিন সাধনা করিয়াও কিছু হইল না, তখন কোনোমতেই মনকে আর প্রবোধ দিতে না পারিলে, কিম্বা চেষ্টার আর কোন ত্রুটী নাই দেখিয়া তাঁহারা আবার বুদ্ধের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইতেন। তখন বুদ্ধদেব হয়ত কি কারণে এতদিন সাধনা সফল হয় নাই তাহার একটা কারণ বলিয়া দিলেন, অমনি তাঁহারা আবার হৃষ্ট চিত্তে বুদ্ধদেবের উপদেশে উৎফুল্লিত হইয়া সাধনা করিতে লাগিয়া গেলেন। অর্থাৎ পারতপক্ষে স্বীয় চেষ্টায় কোন ত্রুটী রাখিয়া তাঁহারা কখনো বারবার উপদেষ্টাকে উত্যক্ত করিতেন না। গুরুর প্রতিও তাঁহাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ছিল, আর আত্মমর্য্যাদা কিম্বা আত্মশক্তিকেও তাঁহারা প্রাণপণে বিশ্বাস করিতেন। কাজেই তাঁহাদের জীবনে দ্বন্দ্ব থাকিলেও—আর এক দিক দিয়া বেশ একটা সামঞ্জস্যের ভাব ছিল। আত্ম-সমর্পণে আত্মশক্তি উদ্বোধনই দেখিতে পাই তাঁহাদের মাঝে।

আমার মনে হয়, ব্যক্তিত্বের এই ঠিক ঠিক প্রভাব। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব কখনো মানুষকে ফাঁকি দিতে শিখায় না, সত্যলাভের পিপাসাকে আরও বেশী করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে তাহাদের মাঝে। সত্যলাভের পিপাসা জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকের প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হইতে থাকে, কাজেই সত্যলাভের কোন একটা উপায় বলিয়া দিলেই সাধক তখন সবখানি প্রাণশক্তি ঢালিয়া দিয়া নিজেই সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে পথে চলিতে চলিতে দুর্ব্বলের মত পিছুপানে আর তাঁহাদের তাকাইতে হয় না। প্রাণের আবেগ নি। লক্ষ্যে না পৌছা পর্য্যন্ত তাঁহাদের আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবসরই থাকে না!

বাদিকেই আজকাল on behalf কাজ চালাইবার ফিকির: বিশেষতঃ সাধন-ভজনের দিক দিয়া। আর সবদিকে বিচারশক্তি বেশ দেখা যায়, কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার বেলায় মানুষকে যে কি করিয়া এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন অদ্ভুত বিশ্বাসে পাইয়া আত্মচেষ্টা লোপ করিয়া দেয়, তাই এক এক সময় ভাবি। "ঠাকুর! আমার যেন অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহার দরুণ ভগবানের কাছে একটু যত্ন নিয়া বলা কওয়া করিবেন!" কেন আত্মশক্তি নিয়া নিজে সাধনা করিতে পারা যায় না? গুরু মাত্র পথ বলিয়া দিতে পারেন; সেই পথ তাঁহারই অভিজ্ঞতার পথ। কিন্তু পথ চলিতে হইবে সাধককেই। না, এখানেও ফল পাড়িতে গাছে চড়া! আনিয়া একেবারে হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়—তবেই তাহাদের সন্তুষ্টি!

কৃপা বলিয়া একটা কথা আছে বটে, কিন্তু সেই কৃপার অর্থ সবল সাধকের কাছেই আবার অন্য ভাবে প্রতিভাত হয়। সবল সাধকের মুখে শুনিতে পাই, "গুরু কৃপা করিয়াছেন বলিয়াই তো আত্মচেষ্টায় আমি সত্যলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি।" আর দুর্ব্বল সাধক বলে "আমার কি শক্তি আছে, সব গুরুকৃপা ভাই, গুরুকৃপা" অর্থাৎ তিনি বেশ দিব্যি আরামে দিন কাটাইবেন, আর গুরু কৃপা করিয়া মোক্ষফলটি একেবারে তাহার হাতে আনিয়া তুলিয়া দিবেন। ইহা কি কখনো সম্ভব? অথচ এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া মানুষ এই আজগুবী বিশ্বাস নিয়াই দিব্যি নিশ্চিন্তে দিন কাটাইয়া দেয়।

বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাস্তবিকই ছিল। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বে মানুষের স্বীয় সঙ্কল্পকে বজ্রদৃঢ় করিবার দরুণই আরও সাহায্য করিত। তিনি মাত্র পথের কথা বলিয়া দিতেন, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে মানুষের দেহ মন বুদ্ধি চেষ্টাকে বেমালুম ফাঁকি দিয়া কি করিয়া মোক্ষ লাভ করা যায়, এমন কোন সঙ্কেত কাহাকেও শিখাইয়া দেন নাই। তিনি নিজেও বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া এক গাছতলায় ৬ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তেমনি অপরকেও কঠোরতার ভিতর দিয়াই সত্য লাভের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিতেন, উপদেশ দিতেন। তিনি নিজেও কোন সহজ উপায়ে সত্য লাভ করেন নাই, কাজেই অপরকেও একটা short cut রাস্তা বলিয়া দিতে পারিতেন না। মানুষের শক্তিতে মানুষের বিক্রমে যাহা লাভ হয়, তাহাই ছিল তাঁহার কাছে গৌরবের বিষয়। কাজেই অপরকেও তিনি সেই গৌরবেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন।

একজনের জীবনের মহৎ আদর্শে অপরও উদ্বুদ্ধ হয় এবং হওয়াটা স্বাভাবিক। বুদ্ধদেবের

শরণাপন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও বুদ্ধদেবের চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্পে বজ্রদৃঢ় হইয়াছিলেন। বিফলতায়, সময়ের দীর্ঘতায়, তাহাদের আত্মবিশ্বাস কখনো লোপ পাইত না। নারী পুরুষের মাঝে সমভাবে এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ছিল। যেমন ভিক্ষু তেমনই ভিক্ষুণী থেরী। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ভিক্ষু হয়ত অবিশ্বাসে ধৈর্য্যহীন হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষুণীর বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের এবং আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত বাণীতে আবার তাহার প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে!

থেরীগাথায় রমণীদের এই আত্ম-বিশ্বাস এবং বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নারীদের ভিতর এই বলবিক্রম ছিল বলিয়া যে তাঁহারা নারীজনোচিত হৃদয়ের কোমলতা স্নেহ দয়া মায়া অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের বিশেষ বিশেষ গুণ-গুলি হারাইয়াছিলেন, তাহা নহে। একদিকে সত্যলাভের দরুণ তাহাদের প্রাণে অমিত বল ছিল, আবার অন্যদিকে স্নেহ দয়া-মায়া ইত্যাদি গুণেও তাঁহারা বিভূষিত ছিলেন।

বৌদ্ধ যুগের নারীদের সাধনা উল্লেখযোগ্য এবং আদর্শের বিষয়! এখনো তাহাদের সাধক-জীবনের ইতিবৃত্ত পড়িলে, প্রাণ আশায়, আনন্দে, পুলকে, বিস্ময়ে মাতিয়া উঠে।

আরণ্যক



যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

বঞ্চিত রেখে মানুষের হিত করা যায় না। তবে গতানুগতিক বিচারহীন আচারে অভ্যস্ত কলের পুতুল বানানো যায় বটে—তারা দৈবী প্রেরণা পায় না। তাদের দেখে জগৎ মুগ্ধ হবে বাহ্যতঃ, অথচ তাও তারা নিজে জানবে না। আত্মজ্ঞান নইলে মানুষ মানুষ? আত্মজ্ঞান ফোটাতে হলে সব রকম সু-কু অবস্থার ভিতর দিয়ে জীবনকে পাক খাইয়ে তুলতে হয়। ফুলের মত দৈবী প্রণয়স্পর্শে সহজে ফুটে ওঠে কয়টা জীবন?

* * *

ভাব সঞ্চারই একান্ত গুণ—এ গুণ বিনে ভাবুক নির্গুণ। তাবই নৈষ্কর্ম্য বা ব্রহ্ম-কর্ম্ম!

* * *

আচারের সীমা টানিব কতদূর? যতদূর পর্য্যন্ত চিত্তের স্বাভাবিক নির্ম্মল সাত্ত্বিক আনন্দের ব্যাঘাত না জন্মে।

* * *

ঠিক মত চলেছি কি না কে বলে দিবে?
—তোমার হৃদয়।

* * *

পূর্ণানন্দ কিরূপ?

অন্তঃ শূন্যঃ বহিঃ শূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃ পূর্ণঃ বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে॥

* * *

দুঃখ কি? অভাববোধ। তার বিপরীতই বেদান্ত।

* * *

—•—

ওঁ তৎসৎ
আর্য্য-দর্পণ
সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৩শ বর্ষ ২য় খণ্ড
কার্ত্তিক—১৩৩৭
সমষ্টি সং ২৪৭ প্রথম সংখ্যা

পূর্ণ-প্রয়াণ

—*—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওই যে পূর্ণ, এও তো পূর্ণ! পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদঞ্চন! পূর্ণ হইতে পূর্ণের আদান—অবশেষেও সেই অনাদ্যন্ত পূর্ণতা! ভাবময় জ্ঞানময় অনুভূতির মাহেন্দ্রক্ষণে সবই পূর্ণ!

অফুরন্ত মহাশক্তির প্রেরণাই বিশ্বহৃদয়ের মর্ম্মসত্য। স্বপ্রতিষ্ঠ মুহূর্ত্তে কে এই অপরূপ পূর্ণতার লীলা প্রত্যক্ষ না করিতেছে? দ্বিধা-দ্বৈত-সংশয় কতক্ষণ? অজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি যতক্ষণ আবিষ্ট। যে কোন বিষয়ের কেন্দ্রে আত্মস্থ হইয়া

যখনই বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ হইল, তখনই সে পূর্ণময় আত্মস্বরূপে নিখিল চরাচর পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইল। আত্মপ্রাপ্তির পূর্ণময় অনুভবে যখন আত্মহারা হই, তখন জগতের এই অপরূপ রহস্যময় সত্য উপলব্ধি করি।

নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মাভিমানের এই এক জ্বলন্ত সার্থকতা। এক চেতনায় নিখিল বিশ্ব স্পন্দিত হইতেছে, অথচ প্রত্যক্‌চেতনার খণ্ডতা দ্বারা আমরা আবিষ্ট থাকি। জীবহৃদয়ে ইহা বুঝি অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ। ঊর্দ্ধলোকের প্রেরণা আসিয়া এই পিণ্ডীকৃত বুদ্ধির বন্ধন মোচন করে, হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়, সর্ব্বসংশয়ের ছেদ হয় দেখিতে পাই, শুধু দেখিতে নয়, প্রাণে প্রাণে অনুভব করি—নাই, নাই, কোন খণ্ড সংস্কার নাই—ওই যে সম্মুখে নিঃস্তব্ধ মহীরুহটীর মত অমনই আত্মাভিমানবিহীন নিরপেক্ষ জীবন আমার বিশ্বাত্মগত—এক সত্য বিশ্বময়, এক আত্মা সর্ব্বময়। ক্ষুদ্র পিপীলিকাটীর প্রাণের প্রেরণা আর আমার এই ব্যক্তিগত জীবনের আত্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস একই বস্তু। বিশিষ্ট "আমি" বলিয়া কিছুই নাই, আবার এই আমিই সকলের প্রাণে! সুতরাং ওই পূর্ণ হইতে এই যে পূর্ণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

একটা বীজে অনন্ত বৃক্ষের সম্ভাব্যতা বর্ত্তমান। একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর সমগ্র জগতের অগ্নিশক্তি একই জিনিষ। এক দেহ হইতে অপর দেহের সৃষ্টি—মাত্র একটী শক্তিকণিকার সঞ্চারে: ওই কণিকাটীর মধ্যেই সমগ্র জীবননাট্য প্রচ্ছন্ন। এই রক্তমাংসের পিণ্ডদেহে প্রত্যেকটী অণুতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সম্ভাব্যতা রহিয়াছে। ইহা কোন্ রহস্য? ইহাই কি পূর্ণ হইতে পূর্ণের স্থূল উদঞ্চন নয়? সর্ব্বত্রই তো এই পূর্ণতার লীলা! বৃথা জীবের বিচারগর্ব্ব, বৃথা অভিমান, বৃথাই সে ব্যক্তিগত সার্থকতা খুঁজিয়া মরে! আবার দেখি, ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতা হইতেই অনন্ত পূর্ণের অনুভব আসে। পথ বাহিরে নয়, বিচারে নয়—পথ ও লক্ষ্য যুগপৎ অন্তরে এবং অনুভবে। পূর্ণ হও—অর্থাৎ নিরভিমান

তত্ত্বতঃ বিশ্বের সবই পূর্ণ, তবু অপূর্ণতার মোহ—ইহাই জগৎকে নিত্যবিচিত্র করিয়া রাখিয়াছে। গতিস্থিতির সামঞ্জস্যরূপ পূর্ণ, আর যতক্ষণ অসামঞ্জস্য, ততক্ষণই অপূর্ণতা! ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণায়, ব্যক্তিগত চিন্তায় ভূত-ভবিষ্যৎ অন্ধকার—কে জানে কি হইবে, কাহার নিয়তি কোথায়? কিন্তু ইহা ধ্রুব যে, পূর্ণ হইতে উদঞ্চিত জীবন পূর্ণেই পৌঁছাইবে—মাঝে দুদিনের এই ভবের খেলা, সুখের ছলাকলা, দুঃখের ধাপ্পাবাজী! ভাবিয়া যার অন্ত পাই না, সেই কি আমাকে

পূর্ণ করিয়া বিরাজিত নয় ? বুদ্ধির সমস্ত খোঁজাখুঁজির পরও নিরুপায় শিশু-সুলভ বিশ্রামচেষ্টা পূর্ণস্বরূপ আস্বাদনেরই দ্যোতনা দেয়। যাহা পাইয়াছি, তাহাও পূর্ণই বটে—জগতে নিরানন্দের কিছুই রহিল না—তবু চাই যুগপৎ এই পূর্ণ এবং ওই পূর্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিতে। অকারণ অস্বস্তি এবং নিষ্কারণ আনন্দ—উভয়ে মিলিয়া জীবন পূর্ণ। আনন্দও পূর্ণ, বেদনাও পূর্ণ—পূর্ণস্বরূপ আমিই আমার মর্ম্মসত্য।

কি অপরূপ ছেলেমানুষী! পূর্ণের মধ্যেই পূর্ণকে খুঁজিয়া মরি! যেন যাহা আছে বলিয়া জানি, তাহাকেই আবার নয় বলিয়া মনে করি! এই 'সত্যাসত্যে মিথুনীকৃত্য' জগদ্ব্যাপার চলিতেছে। জীবনে কোন দায় নাই, দুশ্চেষ্টা করিবার কিছু নাই—সবই অনাদিসিদ্ধ, তথাপি নিত্যনূতন সাধ্যসাধনার প্রয়াস—বলিহারি, চেষ্টার কি চমৎকার সার্থকতা! কেহ ত জানে না, সে কত অন্ধ, কত অবোধ, কত নিরুপায়, অথচ কি মহাশক্তিধর! পূর্ণ হইতে পূর্ণের অপরূপ আদান দেখিয়া স্তব্ধ হই, ধন্য হই! নিখিলব্যাপী চেতনা আর স্বরচিত কল্পনার বেদনা—দুয়ে ভেদ কোথায় ? এক রহস্য অপর রহস্যকে জড়াইয়া আছে! কল্পনার সত্তায় সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির অনাদিসিদ্ধ প্রেরণা হইতে বিচিত্র ব্যষ্টি-কল্পনার উদ্ভব!

করিবার ভাবিবার বলিবার কিছুই নাই, তবু করিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, বলিতেও হইবে। পূর্ণ হইতে পূর্ণে প্রয়াণ—দুর্নিবার চেতনা, অনিবার্য্য প্রেরণা—যাহা চাই, পূর্ণ প্রাণে চাই! শক্তির পূর্ণতাতে আসে আত্মদানের প্রয়াস, সার্থক মঙ্গলকর্ম্মে ব্যষ্টি জীবনের সমষ্টিমুখী অভিব্যক্তি—সমস্ত কর্ম্মের চরমে আবার জ্ঞানলাভ। কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধহৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ; আবার জ্ঞান ও শক্তির আঁতট পূর্ণতায় জগদ্ধিতের অনিরুদ্ধ আবেগ ও প্রাণপাতী প্রয়াস! পূর্ণ হৃদয় অপূর্ণ বলিয়া কল্পিত দুঃখে অভিভূত হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছে, প্রাণ হইতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে! এক এক মহাজীবন কত শত জীবনে বিচিত্রভাবে সঞ্চারিত হইতেছে। যিনি নিঃশেষে নিজকে বিলাইতেছেন, তথাপি তাঁহার জীবন 'পূর্ণমেব অবশিষ্যতে'! মহাশক্তির এই অফুরন্ত উৎসের নিরোধ নাই, সংশয় নাই—অনন্ত বাধাবিপদ্‌-কল্পনায় খণ্ডিত হইয়াও স্বরূপতঃ জীব শিবময়, নিত্যমুক্ত স্বভাববান্‌! নিজে পূর্ণ হও—অপরকে পূর্ণ করিবার দরুণ উদক্ষিত হও সর্ব্বস্ব লুটিয়া লউক—তথাপি 'পূর্ণমেব অবশিষ্যতে'। কাহারও আত্মলোপের আশঙ্কা নাই, কেননা জগৎ পূর্ণেরই উদঞ্চন মাত্র। জলে-স্থলে,

অনলে-অনিলে, নভোনীলে মর্ম্মদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ—নিত্যপূর্ণ স্বয়ম্পূর্ণ শক্তির বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইতেছে! প্রাণ দিয়া প্রাণের পূজা কর—প্রাণ আহরণ কর।

এই শাদা চোখে যাহা দেখিতেছ, ইহার মাঝেই সব আছে—বিন্দু বিন্দু শক্তির আহরণে প্রত্যেকটী বস্তুকে গড়িয়া তুলিতেছেন প্রকৃতি—তোমার অজ্ঞাতে তুমিও গড়িতেছ; তন্ময় হইয়া সজ্ঞানে ইহা অনুভব কর—তোমার হৃৎ-স্পন্দনের তালে তালে বিশ্বস্পন্দন, তোমার সর্ব্বাঙ্গ-তনুমন ব্যাপিয়া সেই প্রাণ-শক্তির দুর্দ্দম লীলাবিলাস! পূর্ণভাব হইতেই পূর্ণবস্তুর উদঞ্চন—সুতরাং সেও যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিত্যপূর্ণতার সম্ভাব্যতায় দেদীপ্যমান।

এই পূর্ণতার অনুভবই সমগ্র জীবনের উপনিষৎ। ইহা হইতেই ভাবের মন্দাকিনী অমৃতা হইয়া প্রেমের বেদনায় মর্ত্ত্যের বুকে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূর হোক্ সে মর্ত্ত্যতার সংশয়বিকল্পিত ভয়বিকম্পিত আপাতকল্পনা—সত্যজ্ঞানে বিভাসিত হোক্ শাশ্বত প্রাণ, শাশ্বত পূর্ণতা—মায়ার খেলার মোহ মহামুক্তিরূপে নিঃশেষে জ্বলিয়া উঠুক্! চাই পূর্ণতা, চাই দীপ্তি, চাই সর্ব্বোত্তম তৃপ্তি—পূর্ণ হইতে পূর্ণের শক্তিসঞ্চার প্রবাহে যাহা হৃদয়ে হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া শুধু ক্ষণিকের ভুলে জাগিয়া ঘুমাইতেছে! জাগাও, জাগাও সেই সত্য, সেই জ্ঞান, এই প্রেম—সুখসুপ্তির আবেশঘোর টুটিয়া যাউক্!

আমি সত্য, আমার ভাব সত্য আমার কর্ম্ম তাহার বাহন হউক। আমার সত্যসঙ্কল্প চিত্ত, দৃঢ়ব্রত চরিত্র সেই পূর্ণতাকে প্রস্ফুটিত করুক। অন্তরে অন্তরে জানিতে থাক—আমার মাঝেই সব আছে; আমার এই আপাত-অপূর্ণতা মূলতঃ পূর্ণতারই উদঞ্চন, সুতরাং কক্ষনো তাহা ভাব হইতে, অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয় হইতে, বীর্য্যময় বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত বা রিক্ত হইতে পারে না। রিক্ত কিছুই নাই, হতভাগ্য কেহই নাই—শুধু জান, প্রাণে প্রাণে সেই মহাপ্রাণশক্তির তরঙ্গ-হিল্লোলে এই কল্পনায়-বঞ্চিত রিক্ত ক্ষুব্ধ অবিশ্বাসে-অন্ধ ব্যর্থ-বেদনায় মুহ্যমান ক্ষীণপ্রত্যয় হৃদয়কে জ্ঞানে বিশ্বাসে প্রেমে জাগাইয়া তুলিতেছে—পূর্ণ হইতে পূর্ণের এই শাশ্বত স্থিতিপ্রবাহ অফুরন্ত শক্তির প্রেরণায় প্রত্যেককে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে! পূর্ণ—পূর্ণ—সবই পূর্ণ; এই পূর্ণ ওই পূর্ণেরই উদঞ্চন—প্রাণ পূর্ণ করিয়া প্রাণ ঢালিয়া দাও, তবু প্রাণ পূর্ণই থাকিবে! ওঁ শান্তিঃ

—*—

কর্ম্ম-সমাধি

— * —

কর্ম্মফল সকলকেই ভুগিতে হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষদের পর্য্যন্ত প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নাই। জগতের সকলেই কর্ম্মচক্রের অধীন। সুতরাং কর্ম্ম জীবনের অপরিহার্য্য বিষয়। কর্ম্মের কুফলে দুঃখ, কর্ম্মের সুফলে সুখ—ইহা চিরন্তন নিয়তি।

অথচ মোক্ষবাদী ভাবুক বলিতেছেন নৈষ্কর্ম্ম্য ব্যতীত শান্তি নাই। যদি জীবনকে সার্থক করিতে চাও, তবে কর্ম্ম ছাড়—ভাবে ডুবিয়া থাক!

কোন্ পথে যাইব? কর্ম্মকে ছাড়িবার চেষ্টা করিলে সে আরও বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরে! "কর্ম্ম করিব না" বলিলে দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠে। কর্ম্ম না করাটা এমনই অস্বাভাবিক যে, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত "আহারেঽপ্যপ্রবর্ত্তনম্" ঘটে।

বাস্তবিক দেখিতেছি—কর্ম্ম ছাড়া যায় না। "নৈষ্কর্ম্ম্য" বাক্যটীর হয়ত কোন নিগূঢ় অর্থ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের সাধারণের দৃষ্টিতে উহা নিরর্থক শব্দ-সমষ্টি মাত্র ভাবা ছাড়া উপায় নাই। অকালে সে ভাবনার প্রয়োজনও নাই।

কর্ম্ম করিতেই হইবে—সুশৃঙ্খলায় করিতে হইবে। বলিতে পারি, যথার্থ কর্ম্মীর জীবনই শান্তিময়; নিষ্কর্ম্মা জীবনে অশান্তির শেষ নাই।

প্রত্যেক কর্ম্মী নিজের কর্ত্তব্যটুকু দায়িত্বজ্ঞান সহকারে গ্রহণ করুক—সমাজে কোন অশান্তি থাকিবে না। দেশের বা সমাজের অধঃপতনের মূলেই রহিয়াছে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম-কর্ত্তব্যে অবহেলা। ব্যষ্টি খাঁটী হইলে সমষ্টি স্বতঃই খাঁটী হইবে।

প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেরই বুঝদারগণকে এই অভিযোগ করিতে শুনি—"জের কিছুতেই কমিল না, হাঙ্গাম কিছুতেই মিটিল না!" প্রত্যেকেই বিরক্তি প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু কিসে যে বিরক্তি যাইবে, তাহার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমানে বুঝি দোষ আবিষ্কারেরই যুগ পড়িয়াছে, প্রতীকারের নয়।

আমরা গায়ের জোরে ভাবের ঐক্য চাই, অথচ কর্ম্মে খাঁটী নই। সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলেই রহিয়াছে ভাব কর্ম্মের এই অসামঞ্জস্য। আন্তরিক প্রভুত্বের ক্ষমতা যেখানে নাই, বাহির হইতে বিধি-নিষেধের ঠেকা দিয়া সে রাজ্যকে কতদিন সুব্যবস্থায় রাখা যায়? অথচ সুব্যবস্থা যে প্রয়োজন, এই কথা বলিতে সকলেরই মুখে খই ফুটিতে থাকে। কিন্তু নিজের দ্বারা সেই সুব্যবস্থার কতটুকু সাধিত হইতে পারে, তাহা কয়জন চিন্তা করিয়া দেখিতেছি?

প্রায় ক্ষেত্রেই এই ব্যাপার দেখিতে পাই—কাহারো কোন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, সুনির্ব্বাচিত দায়িত্ববোধ নাই; এবং নিজের ওজনও সবাই বুঝি না। আরও বিপদ এই, আত্মাভিমানের উগ্রতায় পরমত-সহিষ্ণুতারও অভাব;—নিজেও বুঝিয়া শুনিয়া চলিব না আবার অপরের কথাও শুনিব না, এই জটিল আবর্ত্তে পড়িয়া সকল সংসার কেবল অবনতির অতলে তলাইতেছে। আবার এমন অখণ্ড প্রভুত্বও কাহারো ভিতর জাগিতেছে না, যে এই সব ধৃষ্টতাকে, অব্যবস্থিতচিত্ততাকে, অনধিকারচর্চ্চী দুর্ব্বিনয়কে সায়েস্তা রাখিতে পারে

আমাদের নাই ভুঁড়ি ঠিক, নাই মুড়ী ঠিক—সামাজিক স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে কি প্রকারে? এক বুদ্ধির অভাব, এদিকে শতবুদ্ধির অত্যাচার। কিসে যে মঙ্গল হইবে, কিসে সমস্যা মিটিবে, উহার মীমাংসা আর হইল না।

কেহ বলেন যে, কর্ম্মের নিয়মই এই। কর্ম্ম মানেই নানা জঞ্জাল, নানা উৎপাত। কর্ম্মক্ষেত্রে শান্তির আশা দুরাশা; অতএব কর্ম্ম ত্যাগ কর—ভাবে ডুব দাও!

মাঝে মাঝে ভাবে ডুব দিয়া মন ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু খুব সম্ভব চিরতর ভাবে ডুবিয়া থাকা যায় না—নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধিটা একটা ফাঁকা বুলি। কর্ম্মই সত্য না ভাব সত্য, কে বলিবে? মেজাজ তো সব সময় এক রকম থাকে না।

যাহারা ভাবের জগতে এমন কোন রহস্যের বা রসের সন্ধান পাইয়াছ, যাহার নিকট কর্ম্মের জগৎ অতি তুচ্ছ, সমস্ত জঞ্জাল উৎপাত সহ্য করিয়াও নিজের ভাবকে ঠিক রাখিতে পার, তাহারা আসলে ভাবের সাধক হইলেও প্রকৃত কার্য্য উদ্ধারও তাহাদের দ্বারা হইবে। ভাবের মহিমাই হইল অভাবকে সহ্য করিতে পারা।

আর যাহারা কর্ম্মকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিয়া এবং দিনের পর দিন কর্ম্মক্ষেত্রের অজস্র বিশৃঙ্খলা আর দুর্নিবার ব্যর্থতার বেদনায় নিষ্পিষ্ট হইয়া ভাবসাধনার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছে, খণ্ডপ্রলয় দেখিয়াই সমগ্র সৃষ্টি রসাতলে গেল গেল বলিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পাইতেছে এবং যাহাও কাজ হইলে হইতে পারিত, তাহা শুদ্ধ মাটি করিতেছে—এ কথা সুস্পষ্ট সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

প্রলয়ের মাঝেও সৃষ্টির আনন্দ যাহাকে জীয়াইয়া রাখিতে পারে, সে-ই ঠিক ভাবলোকের সন্ধান পাইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রের ভাঙ্গা-গড়া থাকিবেই, ভাব তাহাকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিবে এবং নিয়তির যা খুসী তা-ই হইতে দিবে। ভাব টলিয়াও অটল, আর কর্ম্ম দিবা রাত্রি টলমল—কর্ম্ম অশান্তির বৈঠক; কিন্তু শান্তিপ্রিয় ভাবুক সেই বৈঠকখানার অধীশ্বর। কর্ম্মকে ভাব কখনো নিরাশ্রয় করিতে পারে না—কেননা তাহাতে ভাবেরই অগৌরব।

মুখের কথায় কর্ম্ম ছাড়া যায় না। অকাল-নৈষ্কর্ম্ম্যে জীবন সঞ্চিত কর্ম্মের ভারে আরো দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া কেহ যদি ভগবানের নাম লইতে বসে, তাহার নাম লওয়া সার্থক হইবে না। কেননা—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"

ইহাই ভারতের সনাতন বাণী। কর্ম্মকে কে ছাড়িতে পারে? উহা মিথ্যা আড়ম্বর—

"মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি!"

—তুমি কাজ করিতে না চাহিলেও তোমার প্রকৃতি তোমার ঘাড়ে ধরিয়া কাজ করাইয়া লইবে! আপন অন্তর হইতে ডাক না আসা পর্য্যন্ত কাহারও কিছু ত্যাগ করিবার অধিকার নাই। যে প্রকৃতির বিদ্রোহ করে, সে কখনো সুখী নয়। সুখশান্তি জবরদস্তীর জিনিষ নয়—অন্তরের অনাবিল আনন্দ উৎসারণ তাহাদেরই জীবনকে ধন্য করে, কর্ত্তব্যে যাহারা নিঃসংশয় খাঁটী, যাহারা প্রকৃতির সুর বুঝিয়া চলে।

কর্মত্যাগ অনার্য্যজুষ্ট ক্লীবের পথ। তার চেয়ে এই বীরত্বের আত্মসমর্পণ-যোগই কি শ্রেষ্ঠ নয়—যেখানে বলিতে পারি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!

—একটা কিছু করাই চাই, না করিয়া থাকিতে চাই না। জগৎপ্রয়োজনে যখন যে নিয়োগ আসিয়া

পড়িতেছে, তাহাকেই সার্থক করিতেছি! আমার কিছু নাই অথচ আমার সবই আছে—

কর্ত্তব্যং ন মে পার্থাস্তি ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি!

—কিছু পাইবার লোভে কর্ম্ম করি না, কর্ম্মের আনন্দে কর্ম্ম করি!

ভারতের সনাতন ধর্ম্ম এই সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম্মবীর ভাবেরই প্রেরণা দেয়। কর্ম্মকে ছাড়িয়া কেহ যায় নাই, যাইতে পারেও না। এক কর্ম্মের পরিণতিতে অপর কর্ম্মের দীক্ষা—কর্ম্ম থাকেই থাকে, ভাবের বুকে আশ্রয় নিয়া থাকে, ভাবময় হইয়া থাকে। গীতাতেও আছে—

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে!"

কর্ম্মত্যাগ করিতে হইলে সেই কর্ম্মই ছাড়—যাহা তোমার ভাবের বিপরীত। মনে এক মুখে এক রাখিলে চলিবে না। যে যাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বুঝ, তাহাই কর। কর্ম্ম ছাড়িলেই কল্যাণ হয় না, আবার যে কাজ তোমার নয়, তাহা করিতে গেলেও হিতে বিপরীত হয়।

প্রত্যেকে নিজের কর্ম্ম বাছিয়া লও। শক্তি অনুযায়ী ভক্তি দেখাও। স্বধর্ম্মের আচরণে, স্বকর্ম্মের সিদ্ধিতে ভাবের অমৃতফল লাভ কর। কাহারো সহিত কাহারো তুলনা চলে না। প্রত্যেকে নিজে খাঁটী হও—সমাজ শান্তিময় হইবে!

নারীর প্রতি অবিচার

—(*)—

শক্তিতে কুলাইয়া উঠিতে না পারিলে, দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, মনে স্বাভাবিক একটা বিতৃষ্ণা জন্মায়। এই বিতৃষ্ণাকে অবলম্বন করিয়া যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, প্রায়ই তাহা মর্কটবৈরাগ্যে পরিণত হয়, কিম্বা সেই বৈরাগ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার সিদ্ধি লাভ করিলেও মনের মাঝে অজ্ঞাতে একটা ক্ষোভ থাকিয়া যাইই যায়। এই জন্যই এমন কি সিদ্ধিলাভ করিবার পরেও, যাঁহারা নাকি শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক বলিয়াও কথিত, তাহাদের মুখ হইতেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ এমন অনেক অসংলগ্ন কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা শুনিলে অবাক্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দত্তাত্রেয় পরম বৈদান্তিক ছিলেন, তিনি এক গগনোপম নিরাকার পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাহারই মত অদ্বৈতবাদী-কৃত অবধূত-গীতার অষ্টম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলি পাঠ করিলে, তাহার ন্যায় নির্ম্মলান্তঃকরণবিশিষ্ট মহাপুরুষের মুখ হইতেও নারী সম্বন্ধে এরূপ কুৎসিৎ বর্ণনা বর্ণিত হইতে পারে, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না। ইহা বোধ হয় আর কিছু না—পূর্ব্ব সংস্কারেরই প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ, "কেনাপি নির্ম্মিতা নারী বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্। জানামি নরকং নারীং ধ্রুবং জানামি বন্ধনম্।" এইরূপ অনেক শ্লোক দ্বারাই নারীর প্রতি একটা বিদ্বেষ সমুৎপন্ন করিয়া

তুলিবার প্রচেষ্টা। যাহার অন্তঃকরণ নাকি নির্ম্মল গগনের ন্যায় তাহার সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইতে এইরূপ কুৎসিৎ উক্তি বাহির হইতে পারে?

কাজেই তাঁহার ন্যায় সাধু-মহাপুরুষের সাধুত্ব বজায় রাখিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে ইহা সেই পূর্ব্ব সংস্কারেরই প্রতিক্রিয়া, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিবার থাকে না। নারীর প্রতি একটা বিদ্বেষ-বুদ্ধি সৃজনের প্রচেষ্টা আরও এরূপ অনেকের মাঝেই দেখা যায়। কাজেই ইহা কি সবল মনের এবং স্বাস্থ্যবান্ হৃদয়ের পরিচয়? মনে হয়, পুরুষ ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়া পড়াতেই এবং অনেক বিষয়েই স্ত্রীলোকের নিকট অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে, দুর্ব্বলের মত একটা ক্ষোভ এবং আক্রোশ পোষণ করাই হয় তাহাদের সম্বল। এই দুর্ব্বল সংস্কারের প্রতিক্রিয়া আজ পর্য্যন্ত আমাদের মাঝে রহিয়াছে। অনেকের ঘর-সংসার ত্যাগের মূলেই রহিয়াছে দুর্ব্বল জনোচিত ক্ষোভ। অর্থাৎ তাহারা সংসার হইতে পলাতক মাত্র;—না পারিয়া, দায়ে ঠেকিয়া সাধুত্বের পথ ধরিয়াছে। কিন্তু গৃহত্যাগের আদর্শ ধরিলেও আমাদের পূর্ব্ব মুনি-ঋষিদের মাঝে কি এইরূপ কোন একটা দুর্ব্বলতা ছিল? প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির প্রব্রজ্যা অবলম্বন কিরূপ সহজ-সবল ভাবে হইয়াছিল। তিনি তো একটী স্ত্রী নিয়া ঘর করেন নাই, তাঁহার দুইটী স্ত্রী ছিল। যথোচিত ভাবে তিনি ইহধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যখন যথার্থই তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার সময় বুঝিলেন, তখন প্রশান্ত মনে নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে একদিন সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্যন্ বা অরেহহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাহন্তং, করবাণীতি।"

—"মৈত্রেয়ী, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে উর্দ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, অর্থাৎ এই গৃহস্থাশ্রম হইতেও উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব মনস্থ করিয়াছি; অতএব যদি সম্মতি থাকে, তবে এই দ্বিতীয়া ভার্য্যা কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ তোমাদের উভয়কে ধন-সম্পদ্ ভাগ করিয়া দিতে চাই।"

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ম্ ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাহস্তি বিত্তেনেতি।"

—"মৈত্রেয়ী এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, ধনসম্পদ্‌পূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হস্তগত হয়, তাহা হইলে কি তাহা দ্বারা আমি মৃত্যুরহিত হইতে পারিব? প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না; তবে জগতে ভোগোপকরণসম্পন্ন ধনীদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু বিত্ত বা বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।"

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

"এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, যে বিত্ত বা বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আমি অমৃতা হইব না, আমি সেই ধন দ্বারা কি করিব? তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যাহা নিশ্চিত রূপে অমৃতত্বসাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।"

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষসে, এহ্যাস্স্ব, ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥

"মৈত্রেয়ী এই কথা বলিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন—মৈত্রেয়ী, তুমি পূর্ব্বেও আমার প্রিয়া ছিলে, এখনও আমার মনের মত কথাই বলিতেছ, এস, আমার নিকট উপবেশন কর, আমি তোমার অভীষ্ট বিষয় বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি, ব্যাখ্যা কালে তুমি আমার কথা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিতে চেষ্টা কর।"

তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে আত্মাই যে মূল প্রীতির বস্তু, এক একটী উদাহরণ দ্বারা তাহা বেশ সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ীর মাঝে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার মাঝে কোথাও তো নারীর প্রতি বিদ্বেষ সূচক কোন ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। দুই জনেরই কি পরম পবিত্র ভাব—একজন গুরু আর একজন পরম পবিত্র অনুরক্তা শিষ্যা। আত্মোপলব্ধির জন্য উভয়েই ব্যাকুল; কাজেই উভয়ের মাঝে একটা নির্ম্মল পবিত্র প্রেমের বন্ধন। কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিবার মত নীচবৃত্তিই যে নাই তাঁহাদের মাঝে। উভয়েরই প্রাণের আকুলতা হইল আত্মোপলব্ধির দরুণ, কাজেই দুইটী মন একত্র হইয়া সাধনাক্ষেত্রে আরও বল পাইল! কাহারও পথে কেহ কণ্টক ছিল না, কাজেই পরস্পর পরস্পরের সহায় ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যা গ্রহণ বাস্তবিকই আদর্শ বটে। নিজের মনে তো বিন্দুমাত্র ক্ষোভই ছিল না, এমন কি ভার্য্যাদের মনেও কোন ক্ষোভ রাখিয়া পলাতকের মত সংসার হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন নাই। নিজের শুদ্ধ-বলিষ্ঠ অন্তঃকরণ দ্বারা উভয় পত্নীকেই তিনি পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; কাহারও কাছে তিনি অপ্রীতিকর রূপে প্রতিভাত হন নাই। তিনিও পত্নীদের ভালবাসিতেন, আবার পত্নীরাও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। এই পরম পবিত্র ভাব নিয়া সংসার করিয়াছিলেন বলিয়া, সর্ব্বশেষে যখন আত্মার বাণী আসিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাণে প্রব্রজ্যার বাসনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তখন তিনি অল্প দু'চারটী উপদেশ দিয়াই তাঁহার পত্নীদের পরিতুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের কামনাকে ব্যাহত না করিয়া, আত্মবলে তাঁহাদের চিত্তকেও তিনি রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাই মৈত্রেয়ীও ধনের লোভে কিছুতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাইলেন না!

বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানই ছিল প্রধান অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে গৃহপতিরা সপত্নীক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। কোথায়ও তো স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাদের একঘরে করিয়া রাখা হয় নাই। অবশ্য এইখানে কথা উঠিতে পারে যে, সংসার করিবার সময় স্ত্রী বিদ্বেষের তো কোন প্রয়োজনই হয় না—যাহারা বিবেক-বৈরাগ্য নিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের মন হইতে নারীর মূর্ত্তি অপসারিত করিবার দরুণই এই বিতৃষ্ণা। কেননা সাধন ক্ষেত্রে নারীর কল্পনা মনকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয়! আচ্ছা বলি, এই কথাগুলি কি সবল মনের মনের পরিচয়? নারীর প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব না জাগিলে কি ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হইল না, আর এই বৈরাগ্যই কি আদর্শ এবং স্থায়ী বৈরাগ্য? যাহাদের বৈরাগ্যের আগুন প্রাণ হইতে স্বভাবতঃই জ্বলিয়া উঠে নাই, যাহারা কোন নিমিত্তের উপর নির্ভর করিয়া বৈরাগ্যের স্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে চান, তাহাদের বৈরাগ্য কি স্থায়ী এবং কল্যাণ-

প্রদ হয়? যাজ্ঞবল্ক্যও তো প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া তো তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন নাই, তাঁহার ভিতর স্বতঃই বৈরাগ্যের স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল! অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিয়া যদি চিত্তকে সজাগ করিতে হয়, চিত্ত যদি এতই পরাধীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘৃণার বস্তু অপসারিত হইয়া গেলে নিশ্চয়ই তাহাদের ঘুম আসিবে! আত্মশক্তি দ্বারা আত্মাকে যাহারা জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই—অপরের সাহায্যে ক্ষণিক উদ্দীপনায় তাহাদের জীবনের উন্নতি আর কতদূর হইবে?

জগতের সকলই যে মিত্র তাহা নয়, শত্রু ঢের আছে। কেবল বাহিরে কেন, নিজের মাঝেও কি শত্রু নাই! তাহাদের প্রতি আমরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি। কৈ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এরা তো শত্রুতা সাধন করিলেও এদের ত্যাগ করিতে পারি না। সাময়িক বিতৃষ্ণা জন্মিলেও এদের দিয়াই যখন দেখি, আবার স্বর্গীয় অনুভূতিও পাওয়া যায়, তখন তো আর মনের সেই উগ্রতা থাকে না! তখন সমস্ত দোষ চাপাই ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের ওপর! মন যদি ভাল থাকে—তো সবই ভাল থাকে। কাজেই বিকৃতির প্রধান হেতুই হইল মন! স্বর্গকে মনই নরকে পরিণত করে। কাজেই ভাবনা দ্বারা যেখানে এত অহিত সাধন হইতে পারে, সেখানে শুধু বস্তুর উপর গালি বর্ষণ করিয়া কি লাভ? আত্ম-শক্তি লোপ হইলে তখন জগতের সবাই শত্রুবৎ হইয়া যায়। অর্থাৎ নিজের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার না করিয়া প্রতিকারের জন্য কোন উপায় চিন্তা না করিয়া, সমস্ত দোষ চাপাই বাহিরের জগতের উপর। কাজেই তখন বহির্জগতের সঙ্গে Non-co-operation করাটাই হয় বীরত্বের কাজ—কিন্তু এই Non-co-operationএর মূলে যে কতখানি ক্ষোভ এবং দুর্ব্বলতার বীজ গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা যদি কেহ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত সবাই আবার উল্টা ধারণায় মনকে ধিক্কার দিতে বসিয়া পড়িত। ব্যতিক্রম জগতে আছেই এবং থাকিবেও, কিন্তু নিছক আত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, এমন সাধকের সংখ্যা খুবই বিরল।

বৈদিক যুগের প্রব্রজ্যা এবং আজকালকার বৈরাগ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। তখনকার দিনে আত্মানুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক ছিল, কাজেই ছেলে মরিয়া গেল, কিংবা আত্মীয়-স্বজন কোন এক-জনের বিয়োগে মনের মাঝে শোক উপস্থিত হইল এবং সেই শোককে অবলম্বন করিয়া বৈরাগ্য নিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আত্মার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম—এমন আকস্মিক বৈরাগ্য-স্পৃহা কাহারও ছিল না। তাহাদের সকলেরই এই ধারণা থাকিত যে, এই এই অবস্থার পর চিত্তে আপনি নির্ব্বেদ আসিবে এবং তখন আপনা হইতেই চিত্তে বৈরাগ্যের আগুন প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে। কাজেই তাহাদের মাঝে তাড়াহুড়াও ছিল না, আবার শৈথিল্যও ছিল না! বৈরাগ্য ছিল স্বাভাবিক—কাহারও উপর রাগ করিয়া কিংবা বিদ্বেষ-ভাব নিয়া চিত্তে একটা অসহিষ্ণু ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার মত দুর্ব্বল ক্ষীণ প্রবৃত্তি কাহারও মাঝে ছিল না। তাহাদের প্রার্থনা ছিল সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনা, কাজ কর্ম্ম করিবার প্রথা ছিল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া; কাজেই মানুষকে বঞ্চিত করিয়া রাখা, এক-ঘরে করিয়া রাখার ভাবটা খুব কমই ছিল। ঋষির বিরাট্ অন্তঃকরণে হিংসা ছিল না, ক্রোধ ছিল না, শান্ত সমাহিত ভাবে ঋষি তন্ময় হইয়াই থাকিতেন!

ভাবের সঙ্কীর্ণতায় মনও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। উদার ভাবে চিত্তও উদার হয়। ভাব

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে যখন তত্ত্ব হিসাবে নর ও নারীরূপে ভাগ করা হইল—তখনই আরম্ভ হইল দেনা-পাওনার সম্বন্ধ, দখল-অদখল লইয়া কচ্‌কচি! ইহাতে শুধু জৈব প্রেরণাই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কামনার রক্ত আঁখি নিয়া পুরুষ ভোগ-লোলুপতায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই জৈব-প্রেরণাকে যিনি আত্মশক্তিতে নিজের বশীভূত করিতে পারিয়াছেন—তিনিই ঋষি হইতে পারিয়াছেন। তিনি দিব্যি ঘর সংসারও করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী তখন তাহার কাছে ভোগের সামগ্রী না হইয়া, আত্মোপলব্ধিতে ভাব রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ীর কথোপকোথনেই ইহা বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীতেই কথা হইতেছে বটে, কিন্তু দেহের সম্পর্ক মোটেই নাই, তাহরা দুজনেই যেন ভাব রূপে সম্মিলিত, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে যেন ভাবরূপে উপলব্ধি করিতেছে।

পুরুষ সবল ছিল বলিয়াই যে নারীদের উপর এমন অবিচার করিয়াছে তাহা নয়, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই দুর্ব্বল-ভাবনা দ্বারা নারীদের প্রতি এত অবিচার করিয়াছিল! কেবল ভয়—ভয়! বাস্তবিকই কি আমাদের দুর্ব্বল মনের দোষ কিছুই নাই?

একবার এক বৈদান্তিক সাধুর কথা শুনিয়াছিলাম, তিনি নাকি স্ত্রীলোক দর্শন হইবে বলিয়া সর্ব্বদা অধোমুখে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন! বৈদান্তিক নির্ভীকবাদের এতটা প্রয়োজন হয় কি? সর্ব্বত্র যাহাদের ব্রহ্ম দর্শন হয়, তাহাদের কাছে কি স্ত্রীলোকের দেহটাই মাত্র ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য সত্ত্বা বা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইল? তাহা হইলে আর সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইল কি করিয়া? ভেদ দৃষ্টি ভেদ-জ্ঞানই যে তাহা হইলে অপসারিত হইল না। আর স্ত্রী পুরুষ ভেদ ভুলিতে না পারিলে কি স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে অবিকৃত সত্য প্রকাশ করা সম্ভব? বৈদান্তিক নাকি নির্ভীক, উদার—আত্মশক্তি দ্বারা তিনি বস্তুর রূপান্তর সাধনও করিতে পারেন। তাহা হইলে জগতে কি নারীর দেহই একমাত্র রূপান্তরের অতীত? অর্থাৎ তাহার আর কোন যুগে, কোন কালে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না? এই সংসারধর্ম্ম করিয়াই তো মৈত্রেয়ীর প্রাণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল। কাজেই সংসার করিলেই যে সব চুলোর দুয়ারে যায়, তাহারই বা মানে কি?

নারী যদি নিছক প্রলোভনের সামগ্রীই হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিত্তে ক্ষোভজনিত একটা বিতৃষ্ণা জন্মিলেই কি সেই প্রলোভনের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে? নিজের চিত্তকে শুদ্ধ-শান্ত না করিয়া, অপরের সংসর্গের দোষ চরিত্রের দোষ কীর্ত্তন করিয়া মনকে চাঙা করিয়া রাখিতে পারিলেই কি সকল অকল্যাণ হইতে রেহাই পাইতে পারে মানুষ? অবশ্য ইহা খাঁটি কথা যে, সকলেই নির্ম্মল বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়া জন্মগ্রহণ করে না, সকলকেই সাধনা করিয়াই চিত্তের কলুষ দূর করিতে হয়। সাধনা দ্বারা একই মানুষের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর? কাজেই একেবারে স্থুল সাধকও যাহারা তাহারাও দেহকে আগে শোধন করিয়া, ব্রাহ্মীময় তনুতে রূপান্তরিত করিয়া, তাহার পর ভাব করিতে বসিয়াছেন! কাজেই সেই স্থুল সাধনায়ও দেহের আসক্তি বলিয়া কোন নীচ আকর্ষণ থাকিত না। স্থুল দেহটা যেন একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে ভাবে ভাবেই ভাববিনিময় হইত।

গণ্ডগোল যত সবই ভাবকে ভ্রান্ত করিয়া। পুরুষ যখন নারীকে শুধু নারী রূপের গণ্ডী ছাড়িয়া উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইবে, তখন পুরুষের কাছে নারী বিভীষিকা। কেননা নারী তো এক

রক্ত মাংসের দেহ-পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিভীষিকায় পুরুষ যতই বিরক্ত হইয়া উঠিল, ততই দেখি পুরুষের মনে সেই কল্পনার প্রেত আরও বেশী করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল! এমন করিয়া আস্তে আস্তে কত উৎকট উপায়ই না অবলম্বন করিল পুরুষ, তবু দেখি বুত্থান সংস্কারের বশে সেই প্রতিক্রিয়ারই দৌরাত্ম্য।

আজকাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ সত্য বিচারের এক ধূম পড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু অসংগত স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বল বিশ্লেষণের ফলে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে কল্যাণ না হইয়া, অকল্যাণের মাত্রাই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। জৈব প্রেরণাকে বশীভূত না করিয়া, যাহারা স্থূল সম্পর্কের মহিমাকেই জোরগলায় কীর্ত্তন করিয়া থাকে, দুইদিন পরই তাহাদের সেই দুর্ব্বল দাম্ভিকতা একেবারে নস্যাৎ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই! কোন অলৌকিকত্বের সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া প্রত্যেক বস্তুকেই বস্তুর স্বাভাবিক রূপেই পরিদর্শন করা যে কতখানি বিশুদ্ধ চিত্তের অক্ষুণ্ণ মহিমার প্রয়োজন, তাহা আর বলিবার নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই বিচারহীন সহজ সরল সিদ্ধ-ভাবের ভণ্ডামীতে মানুষের বিবেকবুদ্ধি পর্যান্ত লোপ পায়। তখন তাহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে এইরূপ বলিয়াও সাফাই গায় যে—বস্তুর প্রতি বস্তুর আকর্ষণ ইহা তো স্বাভাবিক, কাজেই ইহার দরুণ গ্লানি কিম্বা অনুশোচনা করিয়া বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তোলার কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাহাদের মত অনেকটা এই ধরণের Eat, drink and be merry! এই কথাটা নিশ্চয়ই সিদ্ধের মুখের বাণী নয়, কেননা সিদ্ধ মহাপুরুষের কর্ত্তব্যের দায়িত্বটা আরও একটু বেশী। তাঁহাদের জীবন নীরস নয় বটে, কিন্তু বাজে আমোদ-বিলাসে তাহাদের দুর্লভ সময়কে ব্যয় করিবার মত প্রবৃত্তিই তাহাদের নাই!

বাস্তবিকই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ভুলিতে না পারিলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে অবিকৃত সত্য প্রকাশ করা অসম্ভব। ভেদজ্ঞান লোপ হইলে তবে সত্য প্রকট হন। ইহার পূর্ব্বে চরম সত্য দর্শনের অধিকারই জন্মিতে পারে না। ব্রজরসের ভাব-প্রকটন-লাস্য শিক্ষাদান করিবার দরুণ এই জন্যই মহাপ্রভু মাত্র একটি অধিকারী খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সেই অধিকারী কে? না,—রায় রামানন্দ। তাই স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

> এক রামানন্দের হয় এই অধিকার—
> তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার।

শ্রীল রামরায় ব্রজরসে বিভাবিত হইয়া দেবদাসীদ্বয়কে এই ভাব-প্রকটন-লাস্য শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষা দানের সময় তিনি যে রামানন্দ রায় এবং ইহারা দুইজন যে তরুণবয়স্কা, ইহা তাঁহার জ্ঞানেই থাকিত না। তিনি যে শিক্ষক, ইহারা যে তাঁহার ছাত্রী, এইরূপ জ্ঞানও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি তাহাদের প্রেম-ভক্তির প্রকট মূর্ত্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। কাজেই রামানন্দের মত নিষ্কলুষ চিত্তবিশিষ্ট সাধকের মাঝেও দেখিতে পাই, আরোপভাব দ্বারা তিনি দেহ-সংস্কৃতি করিয়াছিলেন। কাজেই সংযম তো চাইই, তাহার পরও দেহ-জ্ঞান-বিবিক্ত শুদ্ধ ভাবে মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কোন তত্ত্বই আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। রায় রামানন্দ স্থূল রক্ত-মাংসের দেহবিশিষ্ট নারীদেরই শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু ভাবের সংস্কৃতি দ্বারা সেই নারীদ্বয়কেই দেবী রূপে পরিণত দেখিতে জানিতেন। রামানন্দের বিশেষত্ব এইখানেই। জগতে মন্দ আছে এবং

থাকিবে, কিন্তু আত্মশক্তির মহিমায় কাহাকেও অবজ্ঞা না করিয়া, প্রত্যাখ্যান না করিয়া যিনি প্রত্যেককেই আপন ভাবের সঙ্গী করিয়া নিতে পারেন, তিনিই হইলেন সাধক মহাপুরুষ! বৈদিক ঋষিদের ভিতরও এই স্নিগ্ধ পৌরুষত্বটুকু ছিল। নারীর প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কিম্বা কুৎসা রটনা করিয়া তাহাদের চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নাই কোথাও! এক কথায় বলিতে গেলে, সংযমের ফলে, কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহাদের ভিতরের নারীমাংস-লোলুপ দানবটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। কাজেই ইহার পর যখন তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া ঘরকন্না করিয়াছেন, তখন আর কাহারও মাঝে আসক্তির রক্ত-আঁখির উগ্রতা থাকিত না। কি সুন্দর পরম পবিত্র ভাব! ঋষিদের গার্হস্থ্য জীবন-যাপন-প্রণালী কি একটা সুন্দর পরম পবিত্র ভাবে মণ্ডিত! ঘর-সংসার করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিরাসক্ত ভাবে তাহাদের মন প্রাণ সর্ব্বদা জ্ঞানবিহ্বল হইয়া থাকিত আত্মসাধনায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জানিত, তাহাদের মিলন হইয়াছে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দরুণ। কাজেই সংসারের সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করিয়াও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণই তৎপর হইত।

ধ্যানতন্ময়তা দ্বারা যদি নিজের দেহের অভ্যন্তরের এক একটী কেন্দ্র যোগীর নিকট পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইতে সেই যোগী কি ইচ্ছা করিলে নারীর দেহকেও নরকমার্গ রূপে না দেখিয়া আর কোন স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত দেখিতে পারেন না? আর ধ্যানে নিজের মাঝে যে ভাব শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহা যদি অপরের মাঝেও প্রত্যক্ষ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সেই দর্শনের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইল কিরূপে? তাকেই বলি সত্য ভাব, যে ভাব সর্ব্বত্র সমভাবে প্রত্যক্ষের গোচরীভূত হইয়া থাকে। নিজের মাঝে যেমন দৈবী ভাবের সঞ্চার হইতে পারে, তেমনি আত্মবিশ্বাসের দ্বারা অপরের মাঝেও সেই ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলেই বোঝা গেল—ভাব ঠিক খাঁটী ভাবেই পরিণত হইয়াছে।

দেহ ভুলিয়া ভাব নিয়া থাকিতে পারিলেই তো সব আপদ-বালাই ঘুচিয়া যায়। নিজের দেহজ্ঞানই যাহার নাই, তাহার আবার অন্যের দেহজ্ঞান হয় কিরূপে? ভাবে যে তন্ময়, তাহার আবার দেহের খুঁটিনাটি নিয়া বিচারের সময় কোথায়? মূলে আসক্তি বর্জ্জনের উপায়, দেহাতীত হইবার সঙ্কেত না শিখাইয়া, যদি নারীকে কেবল কুৎসিৎ রূপেই বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে কি নীচ আকর্ষণ হইতে স্ত্রী পুরুষকে সংযত করা সম্ভবপর হইবে? "কেনাপি নির্ম্মিতা নারী" ইত্যাদি বাক্যবাণ দিয়া মানুষের জৈব প্রেরণাকে নিরস্ত করিতে পারা যায়? কামনায় যখন মানুষ অন্ধ হইয়া পড়ে, তখন যে সব ভাসিয়া যায়, "কেনাপি নির্ম্মিতা নারী" বলিয়া তো আর কাহারো মন প্রবোধ মানে না। তাহা হইলে মনকে আয়ত্ত করিবার উপায় এই অবৈধ প্রণালী নয়। ইহার চেয়েও সাধুপন্থা রহিয়াছে। মন সেই পন্থাকেই আয়ত্ত করুক!

আগেই বলিয়াছি, ভাবের গণ্ডগোলেই যত ফ্যাসাদ ঘটে। তাহা না হইলে স্ত্রী নিয়া ঘরকন্না করিয়া ঋষিরা নরকে যান নাই। বরঞ্চ দুইটী আত্মার মিলনে তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর শক্তি আরও বেশী সঞ্জাত হইত। স্ত্রী কাছে কাছে আছে বলিয়াই তাহাকে ভোগের উপকরণ রূপে ভাবিতেন না তাঁহারা। তাঁহাদের ভিতর সংযম ছিল, শক্তি ছিল।

দেহে মনে শক্তিহীন হইয়া পড়াতেই কল্পনায় পর্য্যন্ত ভীষণ দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। মনকে দেহের ঊর্দ্ধে তুলিবার ক্ষমতাই নাই আর। কাজেই দেহটার উপর দৃষ্টি পড়িলে, মনটা কেবল দেহটার ভিতর হইতে আর কিছু খুঁজিয়া পায় না, কেবল তাহার দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির উপকরণ দেখে শুধু। কাজেই নারী বিভীষিকা—শেষে অপারগ হইয়া ইহার চেয়েও অধম গালিবর্ষণ!

প্রথম কথাই হইল, বিদ্বেষবুদ্ধি দূর করিতে না পারিলে, জিনিষের ভাল দিকটাও চোখে পড়ে না। সংস্কারের ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। মনকে ছোটবেলা হইতে "নারী নরকের কীট" এই ধারণায় বদ্ধমূল করিয়া তুলিলে শেষে ব্রহ্মদর্শন হইলেও দেখি নারীর দেহ বাদ দিয়া ব্রহ্মদর্শন হয়। এই সব আর কিছু নয়, সংস্কারেরই প্রতিক্রিয়া। মনটাকে এই অদ্ভুত বিদ্বেষভাবপ্রণোদিত করিয়া তুলিতে না পারিলে কি সাধনায় অগ্রসরই হওয়া যায় না? কোথায় সাধনা করিয়া মনের মালিন্য দূর হইবে—না স্বেচ্ছায় সংস্কার অর্জ্জন করিয়া মনের মালিন্যকে আরও পোষণ করিয়া রাখা হয়। নির্ব্বাক্ নারী যুগে যুগে এইরূপে সাহিত্যে লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছে। অথচ বৈদিক যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কিন্তু এইরূপ ছিল না।

"যেহেতু পুরুষ সবল, কাজেই তাহার এই অত্যাচার দোষের নয়" মানুষ এই কথা বলিতে পারে বটে, কিন্তু অব্যক্তা প্রকৃতি গোপনে গোপনে ইহার প্রতিশোধ তুলিবার পথও করিয়া চলিতেছেন। অত্যাচার করিয়া নিজের সম্মান বজায় কেহই করিতে পারে না। পুরুষ যদি নারীর কাছে সকল অবস্থাতেই সম্মানের আশা করে, তাহা হইলে সেও কোন অবস্থাতেই নারীকে তাহার প্রাপ্য সম্মানবর্জ্জিত করিবে না—ইহা তো ন্যায্য যুক্তি এবং ভদ্রতার কথা। তবে জোর করিয়া তাহার প্রাপ্য সম্মানকে অবজ্ঞা করিলে, ইহা পশুত্বের নিদর্শন! তাহা হইলে বোঝা গেল—নারীকে তাহারা এক মাত্র ভোগদখলের সম্পত্তি ছাড়া আর বড় করিয়া ভাবিতেই পারে না।

মানুষ যুগে যুগে উন্নত হইয়াছে—ভাব দ্বারা, চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা। স্থূলকে ছাড়িয়া যাহাদের দৃষ্টি আর এদিক ওদিক কোথায়ও এতটুকু সরিতে পারে না, তাহারা স্থূলের প্রতি চিরকালই অবিচার করিয়া আসিয়াছে। কেননা চোখ মেলিয়া তো তাহার আর কোন সম্বল বা অবলম্বন খুঁজিয়া পায় না। কাজেই যাহা হাতের কাছে পায়, তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিবার দুর্ব্বল আসক্তি তাহাদের কিছুতেই যাইতে চায় না!

জগতে শত্রুর সংখ্যা বাড়ানোতে কোন লাভ নাই, বরঞ্চ একদিন শত্রুই আসিয়া শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়। কাজেই শত্রুকেও মৈত্রীভাবনা দ্বারা নিজের করিয়া লইতে হইবে। হয়ত আজ যাহাদের শত্রু বলিয়া ভাবিতেছি, তাহারা অজ্ঞান থাকিতে পারে, তাহাদের ভিতর চেতনা হয়ত তত প্রখর না-ও পারে, কিন্তু চিরদিনই কি এই ভাবে চলিবে? যেদিন তাহারা ছলনা বুঝিবে, সেই দিন যে এত দিনের সঞ্চিত অত্যাচারের কল্পিত বিভীষিকায়, প্রতিশোধ নিবার স্পর্দ্ধায় উগ্র হইয়া উঠিবে। তখন নিস্তার আছে—পলাইবার কোন ভাবনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? আর এই প্রতিশোধ যে ন্যায্য প্রতিশোধ—কাজেই মানুষ, দেবতা কেহই সাহায্য করিতে আসিবে না!

আস্তে আস্তে আমাদের কু-সংস্কার ঘুচিতেছে বটে, কিন্তু এখনো প্রতিকারের অনেক বাকী। মৈত্রীভাবনা দ্বারা শত্রু জয় করিবার মত ধৈর্য্য এবং সংযম আমাদের এখনো আয়ত্ত হয় নাই। প্রথমে মন হইতে বিদ্বেষ-ভাব দূর করিতে হইবে, তাহার পর মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে—এই একমাত্র উপায়।

এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে—প্রত্যেকেরই একটা নায্য দাবী রহিয়াছে। সেই দাবীকে অস্বীকার করিলে অবশেষে নিজেদেরই নির্য্যাতন ভুগিতে হইবে। মানুষকে একঘরে করিয়া রাখাটা মহৎ চিত্তের কিম্বা ঔদার্য্যের লক্ষণ নয়! অন্ধ-দৃষ্টির মোহ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন—চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। অসংযমীদের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সাহস নিজেরই অকল্যাণ ডাকিয়া আনে—কেননা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া স্থূল পিণ্ডের মোহ তারা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন না। কাজেই স্থূলের মাঝেও তত্ত্ব পাইতে হইলে, রামানন্দের মত সংযমী শুদ্ধ-চিত্তের প্রয়োজন।

প্রত্যাখ্যান করাটা দুর্ব্বলতার পরিচয় বটে, কিন্তু আত্মশক্তি দ্বারা জিনিষের রূপান্তর সাধন করিতে না পারিলে, যাহা তাহা গ্রহণ করাটাও একটা দুর্ব্বলতার পরিচয়। কাজেই 'আমার নয়' বলিয়া যাহাদের অবজ্ঞা করি, আত্ম-শক্তি দ্বারা তাহাদেরও আত্মগত করিয়া নিতে পারিলে নিজেরই গৌরব বৃদ্ধি হয়। তবে কিনা এই গৌরব লাভ করিতে হইলে—কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ইহা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে সংযমীর কাছে, অসংযমীর কণ্ঠরোধ হইয়া যায়—তাহাদের এমনই প্রভাব!

নির্য্যাতনটা নিজের উপরই খাটে, কেননা অন্যের উপর তো আমার ন্যায়তঃ অধিকার নাই। এক সাধকের কথা মনে পড়ে, তাঁহার চক্ষু অশুভ দর্শন করিয়াছিল বলিয়াই তিনি নাকি নিজের চোখকেই উপড়াইয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিলেন। কৈ—তিনি তো বাহিরে শত্রুকে মারিতে কিম্বা কাটিতে উদ্যত হন নাই। তিনি দেখিলেন—ইহার প্রতিকার নিজের মাঝেই রহিয়াছে, কাজেই বহির্জগতের উপর দোষ চাপাইয়া কিম্বা প্রতিশোধ নিয়া পৌরুষ দেখাইবার কোন প্রয়োজনই হয় নাই। কাজেই নিজে ধ্যানে স্তব্ধ হইতে পারিলে পারিপার্শ্বিকের চঞ্চল মনও ক্রমশঃ সেই প্রভাবে নত হইয়া আসিবে। আর প্রভাবই বা বলিতেছি কেন—শান্ত হওয়া স্তব্ধ হওয়া যে মানুষের স্বভাব। মানুষের চঞ্চলতা ব্যাকুলতা এই আত্মদর্শনের দরুণই। কাজেই ভাল হইবার চেষ্টা, ভাল হইবার আকুল ইচ্ছা প্রত্যেকের মাঝেই রহিয়াছে।

—*—

দর্শনের চুটকী

—*—

সাংখ্য শাস্ত্রে দুঃখকে একটা মহাসত্য ধরে তার উপর ভিত্তি করেই দর্শন রচনা হয়েছে। সাংখ্যের মূল কথাই হল দুঃখ নিরোধ। এই দর্শনকে চারিভাগে ভাগ করে চতুর্ব্যূহ করা যায়, যথা—দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ মোচনের উপায় এবং দুঃখমোচন। অর্থাৎ সমস্তই কেবল দুঃখকে নিয়ে। মনে হয়, দুঃখদ্বারা পীড়িত হয়ে সমাজে যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল, তখনই বুঝি সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল। বেদান্ত কিন্তু উল্টো কথা বলেন। মনে হয়, সমাজের সম্পূর্ণ সতেজ অবস্থায়,

বিশেষ সমৃদ্ধির যুগে, ঋষিদের বিশেষ সবল হৃদয়েরই অভিব্যক্তি বেদান্তবাণীতে ফুটে উঠছে। যেমন কর্ম্মকাণ্ডের মাঝে যাগযজ্ঞ দ্বারা ঋষিরা দেবতাকে মর্ত্ত্যে নামিয়ে এনে তবে ছাড়তেন, বেদান্ত যেন সেই সবলতার মূর্ত্তবাণী রূপেই উত্তরকাণ্ডে গাঁথা হয়ে রয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা যে পর পর জীবনের দুইটী অবস্থা বিশেষ, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। একই জীবনে যেমন যৌবনের সতেজ অবস্থায় নানা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হোত, তেমনি তার ফলস্বরূপ পরবর্ত্তী জীবনে যখন প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যের প্রভাবে শরীর ঠিক আগের মতন সবল থাকত না, তখন দেহদ্বারা স্থূলে কোনও বীরকর্ম্ম না ঘটলেও অন্তরে তার বিপুল মন্দ্রে থেকে থেকে অভয়বাণীতে গর্জ্জে উঠ্‌ত—'সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্'! "অহং ব্রহ্মাস্মি!" "সোঽহং" ইত্যাদি।

আবার সংসারের দাব-দগ্ধ-তৃষিত প্রাণ যখন সেই ঋষিদের সন্নিধানে শান্তির আশায় উপস্থিত হত, তখন জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি ঋষির আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হত—"মাভৈ" "তত্ত্বমসি" "আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, সংশ্রিয়ন্তে প্রবিলীয়ন্তে ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই ভীতি-বিহ্বল চকিত প্রাণে ঋষি আপন প্রাণের আনন্দ-শিখা জ্বালিয়ে দিতেন। একটী প্রদীপ হতে অন্য প্রদীপের মত সেই আনন্দ-জ্যোতিঃ বুকে নিয়ে প্রণত শিষ্য আবার গৃহে গিয়ে জীবন্মুক্তের মত সংসার নির্ব্বাহ করত।

সেই যুগের আনন্দস্মৃতিতেও মনে আনন্দ হয়। বেদান্তবাদীর শব্দ-প্রমাণ দ্বারাই বুঝা যায়, কেমন করে যখন একটী প্রাণ দ্বারা আর একটী প্রাণ প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত! গর্ভাধান থেকে সুরু করে দেহান্তেও হোম দ্বারা দেহকে পরিশুদ্ধ করে দেবতার সঙ্গে যেন স্পর্দ্ধাভরেই তাঁরা বলতেন "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনু" এই তনুকেই ব্রহ্মময় করা যায়! এমন জোরের কথা জীবনে পরিস্ফুট করতে পেরেছে এমনি আর একটী জাতি কি আর পৃথিবীতে দেখা গেল? বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে প্রাচীন আর্য্যদিগের অঙ্গের দীর্ঘত্ব ও গৌরত্ব, উৎসাহ ও দীর্ঘজীবন, শারীরিক ও মানসিক নানা সাদৃশ্য থাকলেও এই একটী বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় যে, পশ্চিম যেন তাদের দেশীয় পণ্ডিত Darwin-এর মতে Evolutionএর মধ্যেই ক্রমশঃ পশু হতে মানবত্বের দিকে চলেছে। পূর্ণ মানবত্বে পৌছাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থূল নিয়েই, ভোগ নিয়েই মেতে থাকা অস্বাভাবিক নয়। যতই সে উর্দ্ধলোকের সন্ধান পাবে, ততই তার জড়বাদ, ভোগবাদ কমে আসবে।

আর প্রাচ্য বা ভারত মেনে আসছে Involution ব অবরোহবাদ। ডারুইনের আরোহ-বাদের মত জীবজন্তুর হাড় দ্বারা, নানা প্রকার আকৃতি দ্বারা প্রাচ্যের অবরোহবাদের প্রমাণ হয় না। এর প্রমাণ হয় সেই ব্রহ্মানুভূতির আনন্দঘন বাণী দ্বারা। অন্য কোনও জাতি মানুষের উর্দ্ধ-পরিণতির এতদূর পর্য্যন্ত খবর দিতে পারেনি। কারণ তারা এখনও এই মানবত্বের ভূমি থেকে উঠবে, তবে সেই উর্দ্ধলোকের খবর আনবে। আর ভারতের ঋষি সেই সর্ব্বোচ্চ লোকের অনুভূতি পেয়ে আবার এই জগতের সাধারণের মত দশজন সংসারীর সাথে সংসার করছে, পার্থক্য শুধু এই যে তাঁর সংসার জীবন্মুক্তের সংসার। সেই লোকের আনন্দকণা এ জগতে জাহ্নবীর স্রোতোধারার মত চলে আসছে বলেই এই জগৎ এত আনন্দময়! শুধু কণা পেয়েই এই জগতে যখন এত আনন্দ, তখন যাঁরা সেই পূর্ণ আনন্দের সংশ্রবে গিয়েছেন, তাঁরা অপর সবাইকে কি করে এই তুচ্ছ আনন্দের সামগ্রীতে মজতে দিবেন? তাই তাঁদের এমন প্রাণোন্মদ বাণী—আনন্দসংবাদ বহন করতে তাঁদের এত শাস্ত্র!

বেদান্তের বা উপনিষদের পরে এল সাংখ্যের যুগ। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় আপন সত্তা অনুভব করার মত শক্তি তখন আর মানুষের নাই। নূতন জাতির নব শক্তি আর যেন তখন জীবনে তেমন আনন্দস্রোত বহাতে পারে না। নিখিল প্রকৃতিকে অনির্ব্বচনীয়া মায়া বলে তার আনন্দলীলা সুখ-দুঃখে একই বেদনারূপে প্রতিভাত হয় না। দুঃখের মাঝেও যে বেদান্ত আগে সুখেরই জয় গান করতে বলত, একই আনন্দ বেদনার অপর পিঠ বলে দুঃখকে যেন অনুগ্রহ করেই অর্থাৎ তুচ্ছ করে আত্মগত করে নিত, সাংখ্য এসে সেই সুখের মাঝেও দুঃখেরই ছায়া দেখালেন। জীবনে যাকে সুখ বলে আগে আঁকড়ে ধরা হত, সেই প্রকৃতিরাণীকে বলা হল—ইয়ং হি কলুষাত্মিকা—এ পাপময়ী। জীবনে যত কিছু দুঃখের মূল ওই জড় প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষরূপী আমার আত্মসংমিশ্রণ! এই ত্রিগুণময়ী জড়প্রকৃতি এমন কি মন প্রভৃতি হতে আমার বুদ্ধি অহঙ্কার পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ নিতান্ত হেয়া—সুতরাং ছাড়্ ছাড়্ প্রকৃতিকে ছাড়্! কে বলে ও চৈতন্যময়ী? পুরুষরূপী আমি চৈতন্যময়, আমার সন্নিধিতে অমন বোধ হয়। ওকে না ছাড়্লে উপায় নাই—ইত্যাদি।

এই সংখ্যাকে বলা হল রাজ যোগ শ্রেষ্ঠ যোগ। বেদান্তের সাধনপন্থাকেও জ্ঞানমার্গ বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত যোগ নয়, কারণ বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অদ্বৈত। দুটী বিষয় মেনে তাদের উভয়কে সংযুক্ত করাই যোগ। বেদান্তের ভাব হচ্ছে—এই যোগ আবার কার হবে? যুক্ত বা এক হয়েই যে তিনি। এই একত্ববোধ জন্মালেই "আমি"র নিরসন। তাই বেদান্তের বাণী—"অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহং" ইত্যাদি। আর সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির অনুসরণে তার পরিভাষাগুলিও যেন সর্ব্বহারা, যেমন "কূটস্থ" চৈতন্য ইত্যাদি। কূট বল্তে কর্ম্মকারের নেহাই। কর্ম্মময় জগৎ থেকে বিবিক্ত হয়ে হৃদয়কূটে দহর-কোষে সেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জ্যোতির্ম্ময়কে উপলব্ধি বা দর্শন করাই সাংখ্যের আত্মসাক্ষাৎকার। তদ্ভিন্ন সমস্ত প্রকৃতি—সুতরাং ত্যজ্য।

সাংখ্যকে বাস্তবে ফুটিয়ে তুল্তে পাতঞ্জলের উদ্ভব। এ দর্শনও রাজযোগ বা লয়যোগের অন্তর্গত। মন লয় বা লীন করার কৌশল অবলম্বন করবার যত প্রকার উপায় আছে, সে সমস্তকে লয়যোগ বলা যায়। কিন্তু হঠযোগ হল সব চেয়ে স্থূল উপায় সাধ্য। শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও যে কত ঊর্দ্ধে মনকে নেওয়া যায়, তার চরম নিদর্শন এই হঠযোগ। সাধারণ লোকে যোগ বল্তে এই হঠযোগকেই বুঝে বেশী। কারণ রাজযোগ অনেকটা জ্ঞানযোগেরই সামিল। তাই সাংখ্যকে জ্ঞানযোগ ও পাতঞ্জলকে রাজযোগ বললেও এই হঠ যোগকেই সাধারণে যোগ নামে অভিহিত করে। এক সময়ে এই পন্থার বিশেষ প্রতিপত্তিও বেড়েছিল। কিন্তু শরীর-মন সকলের তেমন যোগ্য নয় বলে এই পন্থার অধিকারী বর্ত্তমান খুবই কম মিলে।

তারপর বৌদ্ধ ও ন্যায়ের প্রভাব এদেশের উপর দিয়ে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তন্ত্রে যেন সর্ব্বশেষ পরিণতি ঘটল। বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি অন্য পথাবলম্বীরও তন্ত্র ভিন্ন শেষ পর্য্যন্ত চলে নাই। ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার উপর দিয়ে সমস্ত ধর্ম্মমতেরই অধিপত্য প্রবল ভাবে চলে গিয়েছে। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব ও শাক্তের প্রাধান্য বেশী হলেও ধর্ম্মমত বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে জগা খিচুড়ী। এমন পন্থা নাই, যা নাকি কিছু না কিছু পরিমাণে বাঙ্গালী গ্রহণ না করেছে।

অন্যান্য দেশে দর্শন যখন স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, তখন স্থূলকে আরও নানা স্থূলেরই সমষ্টি বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। অর্থাৎ জড়বাদ ছাড়িয়ে কেউ উঠেনি। কিন্তু ভারত যখন স্থূল নিয়েও আলোচনা করেছে, তখন একদিকে বাৎস্যায়নের কামসূত্র, ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়, বিশ্বকর্ম্মার মত কত কারুশিল্প অজ্ঞাত নামের চিহ্ন রেখে গেছে, আবার আর এক দিকে এই স্থূল নিয়ে আলোচনা করেও ন্যায় ও তন্ত্রের মত বা হঠ যোগের মত সূক্ষ্ম রাজ্যে প্রবেশের উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু সব করেও বাঙ্গালী কপিলের সাংখ্য বা দুঃখের দর্শনকে ছাড়তে পারেনি। বেদান্ত তার আদর্শ, কিন্তু সাংখ্য বা দুঃখের দর্শন তার বাস্তব জীবনের একমাত্র দরদী। বৈরাগী সেজেই সে বেদান্তকে পাবে। আর বেদান্ত এসেই আবার এ জাতিকে সবদিকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

—*—

কে বলে পাষাণ ?

—*—

যম নিষ্ঠুর নয়, পাষাণ নয়, যমের করুণা আছে, স্নেহ দয়া-মায়া মমতা সবই আছে। তবু আমরা যমকে যম বলে গালি দিতে ছাড়ি না। তা এক দিকে ঠিকই বটে, কেননা বাহির থেকে যমের হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর! যমকে বুঝ্‌তে হলে, অন্তর্নিবিষ্ট গম্ভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতে হয়। ধ্যানেই বুঝা যায়, যমের হৃদয় কত প্রশান্ত কত উদার—মৃত্যুদণ্ড-দাতা কালই নয় যম—মৃত্যু অতিক্রম করে যাবার পথ লোককে বলে দিবার জন্য যম পাগল—যম আকুল। ওগো! তোমরা যমের স্নেহবিগলিত, করুণার্দ্র হৃদয়কে জান্‌তে পারনি বলেই যমকে বল নিষ্ঠুর—পাষাণ—কাল!

যম আকুল হয়ে, তোমাদের পানে চেয়ে আছে!—তোমরা সবাই মৃত্যুকে নিয়তি বলে ধরে নিয়ে বসে আছ, কেউ কোন দিন যমকে মৃত্যু কি—মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারা যায় কিনা—এ নিয়ে তো প্রশ্ন করনি! যম যে বসে আছেন শুধু সেই প্রতীক্ষায়—কবে তোমরা সকলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাবার সঙ্কেত শিখে নিবে তাঁর কাছ থেকে। যম মৃত্যুদণ্ড বিধান করতেই এতকাল ধরে নীরব হয়ে বসে থাকেন নি—তিনি বসে আছেন, তোমাদের অমৃতের পথ দেখাতে—নব জীবনের আলোকময় সত্য দেখাতে! যম বিভীষিকার বস্তু নয়—ভয়ের বস্তু নয়, সাহস করে একবার প্রশ্ন করতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান আবার তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। যম—বাপ্‌ রে, না জানি কি একটা দৈত্য—অন্ধকারে তার গতায়াত! কিন্তু মানুষ জানে না যমের মৃত্যুময় বাইরটাই ভীষণ, কিন্তু অন্তর তার অমৃত-জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ; যমই সন্ধিস্থল। যমকে—মৃত্যুকে অতিক্রম করে যেতে পারলেই, অমৃতের পথের অনুসন্ধান পেলে আর কি! তখন যম যে তোমার বন্ধু, যমই যে সর্ব্বগ্রন্থি মুক্তিদাতা!

ভয় করে তোমরা কেউ প্রশ্ন করছ না—তা বলে কি তা হল যমের নিষ্ঠুরতা? যম তোমা-

দের কাছে মৃত্যুর তত্ত্ব বলে দিবার দরুণ ব্যাকুল—কিন্তু মৃত্যুকে জান্‌বার দরুণ আকুল পিপাসা তোমাদের কয় জনের আছে বল তো দেখি? "Death is an inevitable doom of all creatures"—এই একটী মাত্র কথার যাদুমন্ত্রে তোমরা সবাই ভুলে আছ! কিন্তু মৃত্যুও তো একটা riddle—রহস্য! সেই রহস্যের সন্ধান কি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হৃদয়ে আবিষ্কৃত হতে পারে না! মৃত্যুকে কি সকলেই ভয় করে? এমন কেউ কি নাই যিনি মৃত্যুর রাজা—মৃত্যুকে অতিক্রম করে বসে আছেন?

মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়, কিন্তু কাল্পনিক বিভীষিকাতেই আমাদের বেশী করে আচ্ছন্ন করে রাখে। It clouds everything with its shadow! ভয়ে আমাদের চেতনা লোপ করে দেয়, যমের কাল্পনিক নিষ্ঠুর মূর্ত্তি এসে যেন আমাদের বুকে চেপে বসে। আর তখনই Maeterlinckএর ভাষায় বল্‌তে গেলে—"And therefore, when the impending hour strikes to which we dared not raise our eyes, everything fails us at the same time." তখন একবার সাহসের উপর ভর করে যদি অপলক দৃষ্টিতে চেতনা নিয়ে মৃত্যুর দিকে তাকাতে পারতাম, তাহলেই বোধ হয় মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কৃত হয়ে যেত। তখনই বুঝ্‌তে পার্‌তাম, মানুষকে সংস্কারই কত দুর্ব্বল করে রেখেছে—সংস্কারকে প্রাণের বল দিয়ে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌লেই সব স্বচ্ছ—সব গ্রন্থি মুক্ত। কারও বন্ধন নাই, ভয় নাই, বিভীষিকা নাই—সবাই অমৃতস্য পুত্রাঃ!

একদিন নচিকেতা এই বাণীই সকলকে শুনিয়েছিলেন। তিনি এসে মৃত্যু-রহস্য মর্ত্ত্যবাসীদের জানিয়ে দিলেন। মৃত্যু যে বিভীষিকার কিছু নয়—এই ছিল তাঁর বিশেষ বাণী! আজও তিনি অমর হয়ে আছেন—শুধু এই বাণী বহন করে আনার দরুণই। অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন দুর্ব্বল শঙ্কায় যেখানে সবাই কাঁপছিল, তিনি এসে তাদের কাণে মুক্তির মন্ত্র দিলেন! তিনি এসে বল্‌লেন—"মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর কি করে অতিক্রম করা যায়, কোন্ পথে অতিক্রম করা যায়, তার সন্ধান বলে দিতে পারেন—পরম কৃপালু, মানুষের বন্ধু—দরদী যম।—এই তোমরা যাকে যম বলে, পাষাণ বলে অবজ্ঞা কর, ভয় কর। আমি জেনেছি, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে এসেছি—যম নিষ্ঠুর নয়।"

বাস্তবিকই যম যে নিষ্ঠুর নয়—পাষাণ নয়, তা নচিকেতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন তিনি, তাতেই বেশ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সত্যানুসন্ধিৎসু সাধকের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে যম পালিয়েছিলেন। তাই নচিকেতাকে তিন দিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়েছিল। মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছেও নচিকেতা তাঁর বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প থেকে একটুও বিচ্যুত হন নি। তিন রাত্রি অনশনে কাটিয়ে দিলেন, তারপর যম আর দেখা না দিয়ে যান কোথা? আহা, তখন যে যমের কি সুন্দর ব্যবহার—নিজের ত্রুটী স্বীকারের কি অমায়িক বিনয়াবনত ভঙ্গী! যম যে মানুষের সঙ্গে এমন সরল ব্যবহার কর্‌তে পারে, তা কি আমাদের কল্পনা ছিল? যম এসে তখন কি বলেছিলেন?—

> তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে—
> হনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
> নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেঽস্তু,
> তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ॥

—হে ব্রহ্মন্! তুমি অতিথি, সুতরাং আমার নমস্য (পূজার্হ); তুমি আমার গৃহে ত্রি-রাত্র অনশনে কাটিয়েছ, তোমায় আমি নমস্কার জানাচ্ছি, আমার মঙ্গল হউক। তুমি যে আমার গৃহে এতদূর কষ্ট স্বীকার নির্ব্বাক শান্ত হয়ে

করেছ, তার দরুণ আমি তোমাকে বর দিতে চাই। প্রত্যেক রাত্রির দরুণ তুমি আমার নিকট এক একটা বর প্রার্থনা কর ;

অতিথির প্রতি যমেরও কি শ্রদ্ধা, কি বিনয়! আমরা তো জানি, যম—নিষ্ঠুর—পাষাণ; কিন্তু পাষাণের মাঝে এমন বিনয় থাকৃতে পারে? পাষাণ মানুষকে এমন ভাবে আপ্যায়ন করে? আমরা যমের সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে রেখেছি, এখনো পোষণ করে আস্‌ছি, কিন্তু আসলে যম—"যম" নয়।

যারা যমকে ভয় করে, তাদের কাছেই যম শাসক, কিন্তু যমের এতে বড় প্রাণে লাগে। কল্পনা করে যাকে আমরা বিভীষিকার বস্তু বলে নিজকে তার কাছ থেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখি, তার বুকে যে কি মমতা কি বেদনা, তা আর কে বুঝ্‌বে! ভয় করেই যমের রাজত্বের কাল আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি, এতে কি যমের কম দুঃখ? যম তো আসলে চান, মানুষকে মৃত্যু অতিক্রম করার সঙ্কেতই বলে দিতে। যম মানুষের বন্ধু, সত্যের পথপ্রদর্শক। যাকে আমরা ভয় করে অবজ্ঞা করে চলি, তার প্রাণে কি দুঃখ নাই? আমরা মনে করি, এই যে মানুষের মৃত্যুর বিধান করছেন যম, এতেই বুঝি তার খুব আনন্দ, কিন্তু আসলে তো তা নয়, যম কি জন্য, কি আশায় বসে আছে, তা তো কেউ একবার অনুসন্ধান করে দেখি না। কোন্ এক অতীত যুগে ঋষি-পুত্র নচিকেতা যমকে সেই মৃত্যু রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে যম যা বলেছিলেন, তাতেই বোঝা যায়, যমের আসল উদ্দেশ্য কি—যম কি জন্য যমরাজ!

যখন আমাদের মৃত্যু আসন্ন, তখন বিভীষিকায়, নৈরাশ্যে আমাদের চোখের পলক নিমীলিত হয়ে আসে। কেবল ভয়—ভয়, না জানি যম কোন্ যমদূতকে পাঠিয়েছে আমায় নিতে! এই কল্পনা করে করে, নিজেরাই যমদূত সৃষ্টি করি। তাতে কেউ মর্‌বার সময় দেখে, তাকে এসে যেন একটা ভল্লুক-মুখো জানোয়ার টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা দেখে বিকটাকৃতি একটা অদ্ভুত জানোয়ার এসে তার বুকে চেপে বস্‌ছে। ওঃ মৃত্যু কি ভীষণ, কি ভয়ানক—যাতনাপ্রদ! আর যমরাজ বসে বসে আমাদের এই যাতনা দেখেই যেন খুব আনন্দ পাচ্ছেন, আমরা এই মনে করে যমরাজের উপর কত গাল, কত ভ্রান্ত অভিশাপই না বর্ষণ করি! কিন্তু বাস্তবিকই কি যম তাই? নচিকেতার সঙ্গে যমের যে কথোপকথন হয়েছিল, তাতে কি যমের এই নিষ্ঠুর মূর্ত্তিই আমাদের স্মৃতির মাঝে জেগে উঠে? নচিকেতার কাহিনীটী পড়্‌লে তো যমকে শ্রদ্ধা কর্‌তে, ভক্তি কর্‌তেই ইচ্ছা হয়।

জগতে কেউ কারও শাসক নয়, মৃত্যুদণ্ডদাতা কাল বলে কেউ নাই। বরঞ্চ প্রত্যেকে প্রত্যেককে উন্নত-স্তরে প্রেরণ করবার দরুণই ব্যাকুল। কারও পথ কেউ রুদ্ধ করে থাকৃতে চায় না—আর এ প্রকৃতির বিধান নয়। ভয় করেই আমরা শাসক শাসিতের সম্বন্ধ সৃষ্টি করি। তা না হলে যে যেখানেই যে পদ নিয়ে থাকুক না কেন, মানুষকে নির্য্যাতন কর্‌বার অভিপ্রায়ে কেউ পদবী অধিকার করেনি।—তা, এই জগৎ নিয়েই বল, আর দৈবী লোক নিয়েই বল। পরস্পর আদান-প্রদানই চল্‌ছে, ভাব বিনিময়ই চল্‌ছে। কেউ কারও কাছে যম বলে, শাসক বলে প্রীতিহীন সম্মান পেতে চায় না! পরস্পর পরস্পরের বন্ধু রূপেই আমরা ব্যবহার পেতে ইচ্ছা করি। যম যদি যমের পদবীতেই আসীন হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি এই অভিপ্রায়ে বসেননি যে আমি কেবল মানু-

যকে মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করব ; বরঞ্চ মৃত্যুকে অতিক্রম করার পথ বলে দিবার দরুণই তিনি মর্ত্ত্যবাসীর প্রতি উন্মুখ হয়ে আছেন। তাঁর পদবীর গৌরব যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে এইখানে যে, তিনি নেতা—কি করে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে মানুষ, এই বলে দিবার দরুণই তাঁর যমরাজের সিংহাসনে অধিষ্ঠান! তাঁর গৌরবের পরম সার্থকতা আছে। তিনি উদ্ধত নন, নিষ্ঠুর নন, সত্যের পথে তাঁর সঙ্গে প্রত্যেকেরই একবার সাক্ষাৎ হয়। যারা উত্তম অধিকারী, যারা চেতনা নিয়ে মৃত্যুলোককেও অতিক্রম করে যেতে পারবে, তাদের তিনি মৃত্যুর পরপারে অর্থাৎ অমৃতের লোকে পাঠিয়ে দেন ; আর যারা তার কাছে এসেও কাল্পনিক বিভীষিকায় অচেতন হয়ে থাকে, তাদের মুক্তির পথ বলে দিয়ে হঠাৎ আচমকা আরও বিভীষিকা বাড়িয়ে তুলতে চান না। এইখানেই তোমরা যমকে নিষ্ঠুর বলতে পার। কিন্তু বলি, এই নিষ্ঠুরতায় তো কোন দুরভিসন্ধি নাই। ইচ্ছা করে যে কাল্পনিক বিভীষিকায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, তার অভিশাপ যে তার ব্যর্থ কল্পনার অভিশাপ, যমের কি দোষ তাতে? তা যদি হত, তবে যম নচিকেতাকে অমৃতের পথের সন্ধান কখনো বলে দিতেন না। তবে এই যে নচিকেতাকেও একটুকু পরীক্ষা করেছিলেন, তা শুধু খাঁটী প্রাণের পরিচয় পাওয়ার অভিপ্রায়ে। তা তো আমরা প্রত্যেককেই প্রত্যেকে অমন করে থাকি।* যারা যে ধনের অধিকারী নয়, তাদের সে ধন বিলিয়ে তো কোন ফল নাই—আর এরকম উদারতা দেখিয়েই বা কি লাভ? Maeterlinck আর এক জায়গায় মৃত্যু সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কয়টী কথা বলেছেন—"It were a salutary thing for each of us to work out his idea of death in the light of his days and the strength of his intelligence and stand by it. He would say to death:—

"I know not who you are, or I would be your master, but in days when my eyes saw clearer than today, I learnt what you were not, that is enough to prevent you from becoming mine."

কি সুন্দর কথা! তাহলে আমাদের চেতনাকে উজ্জ্বল রাখাই হল প্রকৃত লক্ষ্য। মৃত্যুর সময় আমাদের চেতনা লোপ পেয়ে যায়। আসলে মৃত্যু যা নয়, তারই কল্পিত বিভীষিকায় আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ি। কাজেই মৃত্যু তখন আমাদের কাছে কালস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মৃত্যুর সময়েও ঊর্দ্ধপ্রতিষ্ঠ চেতনায় জাগ্রত থাকতে পারলে, মৃত্যু আর বিভীষিকার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। মৃত্যু একটা অবস্থা মাত্র—stage শুধু। দ্রষ্টা হয়ে মৃত্যুকে দেখতে পারলে বড় আনন্দ পাওয়া যায়। তখন মরাটাও একটা আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ; কেননা মৃত্যুর রাজত্ব পার হয়ে যেতে পারলেই আসে চিরশাশ্বত নিত্যানন্দময় অমৃতের রাজ্য। সেই রাজ্যে একবার প্রবেশ করতে পারলে আর তো পতন নাই। চেতনার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তখন আনন্দ সম্মিলন! মানুষ যে স্বেচ্ছায় মরতে চায় এই জন্যই (অবশ্য) অপমৃত্যুর কথা বলছি না), কেননা মরাটা যে বড় আরামের ; একে কোন মতে অতিক্রম করে যেতে পারলেই যে অমৃতের রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়!

সবই সংস্কারের বন্ধন ; উজ্জ্বল চেতনা নিয়ে সকল সংস্কারের বন্ধনকেই কাটিয়ে উঠা যায়। কাজেই শক্তি থাকতে, সামর্থ্য থাকতে সাধনা

করতে হবে শুধু চেতনাকে চিরপ্রদীপ্ত রাখার দরুণ। যেন মরার সময় ঢলে না পড়ি; চক্ষু দুটী মুদে না আসে। এই হলেই আর কোন ভয় নাই, বিভীষিকা নাই। মানুষ তখন সুখে মরতে পারে। মরণকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতেও তার প্রাণে কোন কুণ্ঠাবোধ হয় না।

মৃত্যু যে কি নয় অর্থাৎ মৃত্যু যাই হউক বিভীষিকার বস্তু যে নয়, এই কথাটাই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনের মাঝে গেঁথে রাখতে হবে; এতে চিত্তে যে সংস্কারের দাগ পড়ে থাকে তাতে মৃত্যুকালে যদি চিত্ত সাময়িক অবসন্নও হয়ে পড়ে, তাহলেও কোন চিন্তার কারণ থাকবে না, কেননা সুসংস্কার দ্বারা কুসংস্কার জয় করা যাবে। কাজেই মৃত্যুকে জয় করবার সাধনা আর কিছুই নয়—শুধু চেতনাকে উজ্জ্বল রাখা—গুড়াকেশ হয়ে যাওয়া। (গুড়াকা = নিদ্রা; ঈশ = প্রভু, বিজয়ী; গুড়াকেশন নিদ্রাজয়ী।)

স্বপ্ন-জাগ্রৎ-সুষুপ্ত, এই তিন অবস্থার ভিতরই চেতনার দীপ্তি সমান থাকবে! মৃত্যু জয় কি—না ঘুম জয়। ঘুমের সময় যদি চেতনাকে উজ্জ্বল রাখা যায়, তাহলে ঘুমের অবস্থাও চেতন-দ্রষ্টার কাছে দৃশ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় শুধু। মৃত্যু-বিভীষিকার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে চেতনাকে কি করে উজ্জ্বল রাখা যায়, এই সাধনায় লেগে গেলেই মুক্তির পথ আপনি আবিষ্কৃত হয়। চেতন মানুষ তার সবল ইচ্ছা দ্বারা চেতনাকে ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এ তো অসম্ভব কিছুই নয়! কাজেই মানুষের পক্ষে মৃত্যু জয় করাটা, অর্থাৎ মৃত্যু-বিভীষিকা তাড়ানোটা একটা অসাধ্য কাজ নয়। তবে কিনা, এর দরুণ একটা সদা-জাগ্রত সাধনপ্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। একটা সংস্কারকে, অপর একটা সংস্কার দ্বারা পরাজিত করতে হলেও, কম সময় এবং কম সাধ্য-সাধনা লাগে না। আর মৃত্যু সম্বন্ধে কুসংস্কার তো বহুদিন হতেই প্রচলিত, কাজেই এর দরুণ সাধ্যসাধনা একটু দীর্ঘ কালই করা প্রয়োজন।

বাস্তবিক ভয়েই শাসন চলছে, জগতের সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ হচ্ছে। ভয় গেল তো ভেদ ঘুচে গেল—তখন সব অদ্বৈত, সব শিবময়! ভয় করবার কিছু নাই শাসনে; অথচ প্রত্যেকের প্রাণেই ভয়, না জানি আজ কি হবে! ভগবান্ তাই বোধ হয় জীবের প্রাণে ভয় দিয়ে রেখেছেন, তা না হলে যমের post বা যে কোন দেবতার postই থাকতে পারে না যে!

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

—যিনি সবকেই আত্মস্বরূপ বলে ভাবতে পারেন, যিনি একত্বদর্শী, তাঁর আবার মোহ কিসের, ভয় কিসের এবং শোকই বা কিসের? মৃত্যু—তা-ও তো ভয়ের কোন কিছু নয়! ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে সব ব্রহ্ম, কাজেই জীবে শিবে তখন গলাগলি, প্রেম-প্রীতির ভাববিনিময়!

কঠোপনিষদে যম এক জায়গায় নচিকেতাকে উপদেশ দিচ্ছেন:—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ভয়ই সকলকে অভিভূত করে রেখেছে। ভয়েই জগতের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হচ্ছে। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যম সবাই ভয়ে ভয়েই যথানিয়মে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করে চলছে! কিন্তু মানুষ চেতন, ভাগ্যবান্ জীব, ভয়কে অপসারিত করে এই মানুষই একদিন বলতে পারে—"অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—আমার চেয়ে ছোট কেউ নাই, বড়ও কেউ নাই, সব ব্রহ্মময়! ব্রহ্মজ্ঞ! তখন অদ্বৈতানন্দের অনুভবেই সে মাতোয়ারা! তখন কাজ চললেও—ভয় থাকে না বিভীষিকা থাকে না কোথাও! যম নিজেই জানে যে তাকে ভয়ে ভয়ে যমগিরি করতে হচ্ছে, কিন্তু

এতে তো যমের তৃপ্তি নাই, আনন্দ নাই। যম নিজেও চায় মুক্তি—আবার যমের বিভীষিকায় যারা ভীত-সশঙ্কিত, তাদেরও দিতে চায় মুক্তি। ভয়ে ভয়েই ভগ্নাগী করে যমের দিন চল্‌ছিল, কিন্তু একটী মাত্র প্রাণের লোক নচিকেতাকে পেয়ে যম সব গোমর ফাঁক করে দিলেন! তাঁর এই পদবীর যে কোন মূল্য নাই, মানুষই যে নিরর্থক ভয় করে তার দুঃখ বাড়াচ্ছে—এই কথাই তিনি নচিকেতাকে খোলাখুলি ভাবে বলে দিলেন! মানুষ চেতন হয়েও তাকে কেন ভয় করে, এই কথাই তিনি দিবারাত্র ভাব্‌ছেন বসে বসে! মৃত্যুদণ্ডবিধানের চেয়েও তাঁর মাথায় আরও একটী গুরুতর চিন্তা অহরহঃ খেল্‌ছে। তাই তিনি নীরব, অবাক্ বিস্ময়ে অহরহঃ চিন্তামগ্ন। মানুষ না বুঝে, অন্য কিছু ভেবে তার দুঃখকে, বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

মৃত্যুকালে যম এসে হাজির হন এই কথা-টীই কাণে কাণে বলে যেতে যে, "দেখ মর্ত্ত্যবাসী, আমি তোমাদের মৃত্যুদণ্ডদাতা কাল নই; এই দুশ্চিন্তা থেকে তোমাদের মুক্তি দেবার দরুণই আমি নীরব হয়ে পথের মাঝখানে বসে আছি। আমি তোমাদের ওপারে নিয়ে যাবার সেতু মাত্র—আমাকে তোমরা ভয় করো না!" কিন্তু মানুষকে তখন কাল-হিষ্টিরিয়ায় পেয়ে বসে, মানুষের কাণ বন্ধ হয়ে যায় তখন। কে আর যমের কথা শুনে, যমের পানে তাকায়? যম—ও-যে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য!

মানুষের বেদনার চেয়ে, যমের বেদনা আরও বেশী। যম চান, সবকে বুকে করে ঐ পারে (অর্থাৎ অমৃতের রাজ্যে) নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে, তাহলেই যে তাঁর মুক্তি! মানুষ ভয় করে যত পিছিয়ে থাকবে, ততই যে তার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। তিনি মনে মনে কাঁদছেন এই জন্যই। কিন্তু দুর্ব্বল সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাঁর কথা শুন্‌ছে কৈ?

প্রাণের মত প্রিয় একটী সাধক নচিকেতাকে পেয়ে তিনি মর্ত্ত্যবাসীর চেতনার দরুণ সব কথা খুলে বলে দিয়েছিলেন। নচিকেতা এসে মর্ত্ত্যবাসীদেরও সেই বাণী শুনিয়েছিলেন, কিন্তু সংস্কারে আবিলচিত্ত মানুষের এতেও উদ্বোধন হল না। এখনো মানুষ বিশ্বাস কর্‌ছে না যে, মৃত্যুকে অতিক্রম করা যেতে পারে। মৃত্যু বিভীষিকার বস্তু নয়—মৃত্যু এপার ওপারের দ্বন্দ্বের সেতু! যে দিন নিঃশেষে মানুষের মোহ ঘুচে যাবে—সেদিন যমের যে কি আনন্দ হবে, তা ভাষায় আর ব্যক্ত করার নয়। মানুষ মুক্তি দিলেই যমের মুক্তি! মানুষই যমের নিয়ন্তা!

আবার যম একদিক দিয়ে মানুষের গুরু। যমের কাছে উপস্থিত হলেই আমরা ওপারের দীক্ষা পাই। নচিকেতাকেও যম প্রথম দীক্ষিত করেন। একটু সাহস নিয়ে বরাবর মৃত্যুর অধিপতি যমের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারলেই হল, আর কি চিন্তা—তখন মৃত্যুরহস্যবক্তা যম মানুষকে সব বলে দেন!

মৃত্যু মানুষের পক্ষে পরিত্রাণ—যন্ত্রণাদায়ক নয়। মৃত্যু হলে পর, যে লোকে মানুষের গতি হয়, সে লোক অমৃতের লোক, তবে কিনা চেতনা নিয়ে মরা চাই। এই চেতনার উদ্বোধনের দরুণই এসে যম শিয়রে বসে থাকেন। জীব যেন ভয় না পায়—তার দরুণই নির্ভীক্ মন্ত্র শুনাতে আসেন যম। কিন্তু মানুষ কল্পনাকে আর কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না!

যমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই বলেই বলি নিষ্ঠুর—তা না হলে যমের সঙ্গে আমাদের গুরু-শিষ্যের অমায়িক সম্বন্ধ, তার দরুণ প্রার্থনা করা উচিত—"তন্মামবতু, তদ্‌বক্তারম্ অবতু!"—ব্রহ্ম আমাদের রক্ষা করুন; কেননা, অন্তিম সময়ে পরিত্রাণের উপায় বলে দিতে পারেন একমাত্র যম; তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েই আমাদের মুক্তি হয়; তিনি মুক্তিপথের দিশারী।

অধিকারীভেদে উচ্চনীচ পদবীর সৃষ্টি নির্য্যাতনের দরুণ নয়, বরঞ্চ যারা একটু দুর্ব্বল তাদের সাহায্য করার দরুণ। যম আমাদের কত বড় বন্ধু—আর কারও ক্ষমতা নাই যে আমাদের অমন করে অমৃতের পথে নিয়ে যেতে পারে; তবে কিনা তাঁর কৃপার সঙ্গে আমাদের চেতনার সংযোগ হওয়া চাই; অর্থাৎ আমরা অচৈতন্য হয়ে না পড়্লেই দেখ্তে পাব, কি করে যম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের দিব্য-ধামে নিয়ে চল্‌ছেন; বাঃ তখন মৃত্যু কি সহজ হয়ে দাঁড়াবে; তাকে অতিক্রম করা কত সহজ হয়ে পড়্বে।

ওগো! তোমরা যমের হৃদয় জান না—তোমরা ভয় করে তার প্রাণে যে আঘাত দিয়েছ দিতেছ, তার দরুণ তিনি যে কত দুঃখী, তা মুখ ফুটে বল্‌বার নয়! মানুষ চেতন জীব তোমরা—তোমরা আর নিষ্ঠুরতা করো না তার উপর; তাকে সহজ ভেবে পরিত্রাণ দাও—তোমরা নিজেরাও পরিত্রাণ পাও! শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ সৃষ্টি কর্‌লে যমের অপমান হয়, তার প্রাণে বড্ড লাগে! আর তাকে যাতনা দিও না—মানুষ যমকে বলে পাষাণ, দয়া-মায়া হীন, কিন্তু মানুষের মত নিষ্ঠুর প্রাণী তো আর আমি দেখি না! যমেরও করুণা আছে, প্রাণ আছে—কিন্তু মানুষ অন্ধ সংস্কারে অচৈতন্য হয়ে সব হারিয়েছে!

কামনা-জয়

—(*)—

কামনার শেষ কোথায়? যতই পাই, ততই নিত্য নূতন অভাব দেখা দেয়। পাঁচ টাকায়ও দিন চলেছে, আবার পাঁচ শ টাকা-য়ও অভাব মিটে না, এমন অবস্থার ভূরি ভূরি নিদর্শন মিলে। তবু মানুষ বিরক্ত হয় না, যত তার চাই, তত সে পায়, অর্থাৎ যা না হলে জীবন চলে না, তার অভাব তার ঘটে না; কিন্তু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ঝোঁক বেড়ে উঠে, সেই ঝোঁক সামলানো আর হয়ে উঠে না। ঔষধের চেয়ে অনুপান, মৃত্যুর চেয়ে তার পূর্ব্বযন্ত্রণা যেমন মানুষকে বেশী হয়রান্ করে, তেমনি মোটে না পাওয়ার চেয়ে পাওয়াই তাকে লেলিহান করে বেশী। মানুষ পরকে দেবার বেলায়, সে যাতে লুব্ধ না হয় সেদিকে বেশ সজাগ দৃষ্টি রাখে, কিন্তু তার আপন অন্তরে যে ব্যর্থতার আঘাতে দিবা-নিশি প্রলুব্ধ কামনার আর্ত্তনাদ উত্থিত হচ্ছে, সেদিকে তার দৃষ্টি সচেতন নয়। ব্যথা যে সইতে পারে না, সেই অপরকে ব্যথা দেয় বেশী। পরস্পরের কামনার সঙ্ঘাতে একে অপরকে আঘাত দেয় বলেই জগতে বিধাতার অনন্ত সৃষ্ট ভোগ্য থাকতেও শেয়াল-কুকুরের মত হানাহানির অন্ত নাই। যতদিন অন্তরে দেবপ্রভাব বিস্তার না হয়, ততদিন মানুষ পশুর মত এমনি কাম্ড়াকাম্ড়ি করেই মরে। উপদেষ্টাও তখন তাদের চোখে প্রলুব্ধ!

কামনার জীয়ন-কাঠিতে নিতান্ত নিরীহও মহা বলবান্ বলে আপনাকে জাহির করে।

এমন কি মরণকেও সে তখন বরণ করতে ভয় পায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই মরণে, কামনার এই জীয়ন-কাঠিতে অমরার অমৃতের সন্ধান দেয় না—সে দেয় বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকের কৌশলে ঔষধ প্রভাবে যেন মৃতদেহের ক্ষণিক নড়ে ওঠার মত আশু চাঞ্চল্য। তাতে বাহির হতে জীবনের লক্ষণ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু আনন্দ-বোধ-রূপ জীবনের রসায়ন সেখানে মিলে না। তেমন চাঞ্চল্য, দ্রুত গতায়াত বা নড়্বার শক্তি জড় বাষ্পীয় যানের বোধহয় সব চেয়ে বেশী। তাকে যদি জীবন্তের লক্ষণ ধরা যায়, তবে কামনার আঘাতে চঞ্চল এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জীবন্তই বটে, নতুবা জীব হলেই, সে যথার্থ জীবনপ্রাপ্ত কি? জড়েরই এক ধাপ উঁচুতে সে পৌঁছেছে মাত্র। আমরাও তাই। ব্রহ্মানন্দে সদাজাগ্রৎ সত্যদ্রষ্টার জীবনই প্রকৃত জীবন। কারণ সকলের মাঝে অনুস্যূত আনন্দ-প্রচেষ্টায় তাঁর জীবন চৈতন্যময়।

কামনার নিবৃত্তিই এই আনন্দ-জীবনের নিদান। এ নিবৃত্তি পরিপূরণ দ্বারা ঘটে না। কামনার পূরণে কামনা বেড়েই চলে। লোকে বলে 'খেতে খেতে লোভ, কাঁদতে কাঁদতে শোক' ক্রমশঃ বেড়েই চলে। ফলে তার আরাম না হয়ে ব্যারামই জন্মায়। কিন্তু যদি বিচার করে করে খাওয়া যায়, আর অসারতা বুঝে কাঁদা যায়, তবেই তা কমে গিয়ে আরাম হয়। রক্তবীজের রক্ত মাটী পেলেই আবার কত বীজ জন্মে। কামনার পূরণও তেমনি নিত্য নূতন কামনার জন্মদাতা। ফলপ্রসূ হতে না দিয়ে গোড়াতেই ধ্বংস করা তার উচ্ছেদের উপায়। বাড়িয়ে তুলে শেষে সেই 'বিষবৃক্ষোহপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।' আর এখানে শুধু অসাম্প্রতই বা বলি কেন, জীবনান্তকও বটে। জীবের জীবন বা জন্মের কারণ যেমন কামনা, মরণও তারই ফল। কামনার বশে এই জন্ম-মৃত্যুর গতায়াতকে সাধারণ লোকে জীবন বললেও তত্ত্বদর্শী দার্শনিক এ জীবনকে মরণেরই সামিল বল্বেন। জীবন-যোনি-প্রযত্নের ফলে যদি তা দ্বারা অমৃতত্বই লাভ না হল, তাহলে মানুষের অন্তরাত্মা একদিন এ কথা বল্তে বাধ্য হবেই যে—'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্য্যাম্!'

কিন্তু এই অমর না হওয়ার দুঃখ মানুষের সহজে আসে না। জীবনে কত দুঃখেই সে অহরহঃ জ্বলেপুড়ে মরছে, কিন্তু দুঃখ হতে সে সত্যি কি বাঁচতে চায়? কেননা, তা হলে তার মাঝে এই অমৃতের অনুসন্ধান জেগে উঠ্ত। সে চায় মৃতের ক্ষণিক নড়াচড়ার সুখ। তাকেই সে আনন্দ বলে। সে আনন্দকে চির স্থির কর্তে যা প্রয়োজন, তার বীজ তার স্বীয় অন্তরেই রয়েছে। সে বীজকে মহীরুহে পরিণত করার একান্ত ইচ্ছা নাই বলেই অযত্নে তা রসহীন—উপ্ত হয়েও গুপ্ত থাকে। কেউ হয়ত বলবেন, 'প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই ভগবান্ পাওয়ার বা অমর হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু তাঁকে না পেলে, না দেখলে সে ইচ্ছা আর প্রবল হবে কি করে? দেখলে তবে তো আকর্ষণ বাড়বে?' এ

একেবারে ছেলেমানুষের কথা। কারণ, যে ইচ্ছা রয়েছে, সে তো বীজাকারে আছেই; তাকে ফলিয়ে তুল্‌লে তবেই ভগবানের দেখা পায়। যাকে যে ভালবাসে, বা প্রাণপণে চায়, তাকে না পেয়েই পেতে চায়। তার কথা অপরের কাছে শুনে আরও বেশী আকুল হয় মাত্র। অন্ততঃ কামনার বেলায় কিন্তু এমনি হয়। মজা এই যে, ভগবান্ পাওয়ার নাম হলেই সাধারণ মানুষের মনে কেবল উল্টা যুক্তি খেল্‌তে থাকে। আপনার হৃদয় দিয়ে না বুঝে যুক্তি দিয়ে যেখানে বুঝবার প্রচেষ্টা, হৃদয়ের উপর বিচারের খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে খাড়া না থাক্‌লে সেখানে প্রায়ই ভণ্ডামি ও আত্ম-প্রবঞ্চনা ঢুকে পড়ে। প্রাণের জ্বলুনি প্রাণে রেখে বাইরে ভগবৎকামী সাধু-সন্ন্যাসীর নিন্দায় মুখর হলেই গুপ্ত-প্রেমিক হওয়া যায় না। কামনার ব্যর্থতায় যখন নিজের সমস্ত সতেজ প্রচেষ্টা দুর্ব্বল ও নগণ্য হয়ে পড়ে, মাথা গুঁজবার মত এ জগতে একটু স্নেহের প্রকৃত ঠাঁই না মিলে, তখনই ভগবচ্চরণে শরণ নেওয়ার ইচ্ছা হয়। কামনার ঘায়ে ঘায়ে মরিয়া হয়ে উঠ্‌লেই তবে অমর হওয়ার তৃষ্ণা প্রাণে জাগে। এই হচ্ছে গীতোক্ত আর্ত্ত বা সাধারণ মানুষের শেষ ধর্ম্ম। এই আর্ত্ত বা আপদ্ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের শতকরা নিরনব্বই জনের পক্ষে খাটছে। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বা বিচার-পূর্ব্বক কামনার নিরসন প্রচেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। অথচ শতকরা পৌণে পাঁচিশ গণ্ডার পক্ষে কিন্তু এই কর্ম্মযোগের বিধান করেই সংসারাশ্রমের প্রবর্ত্তন হয়েছে। কামনা না করেও যে কেমন করে কর্ম্ম করা যায়, তা বুঝাতে গিয়ে গীতার মত গ্রন্থ বেরিয়েছে।

একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কামনাই যদি না থাক্‌ল, তবে কর্ম্মই বা কি? জীবনই বা কি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছি শুধু এক এক সময়ে এক একটী কামনার নিগূঢ় বন্ধনে। সে বন্ধনেই যদি টুট্‌ল, তবে আর কর্ম্ম কিসের? কিসের ঘর-বাড়ী? কেমন করে চলে এই জগৎ-সংসার? প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্য দার্শনিক-দেরও আমাদের দেশের দর্শন পড়ে এই প্রশ্ন এসেছিল যে যদি আমি বা egoই না থাক্‌ল, তবে আর কি হল? egoর perception বাদ দিলে সে শুধু Emerson's Brahmaই হয়ে পড়ে। অতএব, এই সমস্ত দার্শনিকদের মতানুযায়ী ভারতের নিরাকার ব্রহ্মবাদ মিথ্যা বলা যাক্! ego বা অহংএর বোধ নিয়ে যে গোড়াতেই গোলমাল. বেদান্তের অহং যে রামকৃষ্ণ-দেবের "বড় আমি" এবং তার অনুভূতি যে অনেকেরই হয় না, সেদিকে খেয়াল নাই।

কামনা ত্যাগের বেলায়ও তেমনি। কামনা বল্‌তে ক্ষুদ্র আমির স্বার্থ বুদ্ধি। বেদের যুগে কামনাকে আঁকড়ে ধরেই দেবতাকে স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনা হত—এমনি ছিল সে কামনার জোর! সেখানে সে কামনা আর কামনা নাই, অটুট সংকল্পে পরিণত হয়েছে। কি

করে তা সম্ভব হয়েছিল? সেখানে ক্ষুদ্র আমির প্রার্থনা ছিল না। বেদের মন্ত্রের প্রার্থনায় কোথাও **"আমি"** নাই—সর্ব্বত্র **"আমরা"**। এই ব্যাপ্তিবোধেই সেখানে বহুর শক্তি বা মহান্ এক শক্তির উদ্ভব হত—যাতে দেবতাকেও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এই ধরাধামে ঋষিদের মনোমত হয়ে আসতে হত।

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অমন সংকল্পে যেমন দুর্ব্বলের মত পড়ে পড়ে কান্নাই সম্বল ছিল না, তেমনি অনন্ত কামনার বৃশ্চিক দংশনে জ্বলেপুড়েও কোনও দেবতাকে ডাকা হত না। ইচ্ছা যেখানে সংকল্পে পরিণত, কামনার অনন্ত দংশন সেখানে আসতেই পারে না। যে বুদ্ধি থেকে দেবতাকে সংকল্প দ্বারা মূর্ত্তি নিয়ে মর্ত্ত্যে আসতে বাধ্য করত, সেই যুগে সেই অগ্র্যা বুদ্ধি দ্বারাই আবার নিরাকার অদ্বয় ব্রহ্মেরও ভাবনা হত। কাজেই বহু কামনা দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত হত না। তাঁরা বহুর তরে করতেন এক কামনা বা দৃঢ়সংকল্প, আর আমরা করি একের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অনন্ত দুর্ব্বল কামনা।

এই অনন্ত কামনার হাত থেকে বাঁচতে হলে বেদান্তের ভাষায় বহুত্বে ব্যাপ্ত হতে হবে বা ভক্তের ভাষায় বৃহত্ত্ব বা শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তবে আর নিষ্কাম বন্ধনের অভাব হবে না—সংসারও চল্‌বে, অথচ তাতে জ্বালা থাক্‌বে না গীতার কর্ম্মযোগ, উপনিষদের "জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" শত বৎসর বেঁচে থাকবার ইচ্ছা প্রবল রেখেও জীবন নিরানন্দের বোঝায় ভার হবে না। ঋষির জীবন আদর্শ কর্ম্ম-জীবন।

গীতা-উপনিষদের উপদেশ না বুঝ্‌লে এই সমস্ত ঋষিদের বা বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষদের জীবনধারার মূলে যে মনোবৃত্তি ছিল, তারই অনুসরণ কর্‌তে হয়। বহুর জন্য, দেবতার জন্য যে কামনা, তাতে বন্ধন নাই। তুলসীদাস বল্‌তেন "যাঁহা রাম, তাঁহা নহি কাম।" এই রাম বা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকেই আত্মস্বরূপ জানলে সেই হয় আপ্তকাম বা বিনিবৃত্তকাম। এবং তাই কামনা জয়ের একমাত্র উপায়।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

২৩ জ্যৈষ্ঠ ৬ জুন সোমবার—খুব ভোরে উঠেই বড়মাকে বল্‌লাম, "কাল রাত্রে খেতে দাও নাই, সকালে চাট্টে ভাত খেতে দাও তো ভাল, নতুবা ১০টার সময় অনাহারেই গোমুখী রওনা হব।" খাবার জিনিষপত্র কিনে সঙ্গে নেওয়ার জন্য দেরী হবে বলে ১০টার সময় বের হ'ব স্থির করলাম। মন উচাটন—যাবো যাবো ভাব, তখন আবার পাক করে খাওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব, যদিও আমি পাক করতে সর্ব্বদাই উৎসুক থাকতাম। পাহাড়ী কুলী "সোণা"কে ডেকে এনে দোকানদারের নিকট হতে সঙ্গের খাবার জিনিষপত্র কিন্‌তে লাগলাম। এর মধ্যে বড় মা ও সারদা ভায়া এসে উপস্থিত। আমাকে একা পাঠাতে বড় মার প্রাণে খুব কষ্ট হয়েছে, তাই তিনিও যেতে প্রস্তুত হয়েছেন। আমি চিদানন্দদা, হরিদাস ভায়া ও বড় মা এই চার জন—সারদা ভায়াও অগত্যা আমাদের ছেড়ে থাকতে অসুবিধা মনে করে যাবে স্থির করলো। বিহারীদা ও ছোট মা অসুখের জন্য যেতে পারলেন না। সুতরাং আমাদের কয়জনের পাঁচ দিনের আহারের উপযুক্ত জিনিষপত্র কিনতে লাগলাম। মণিরাম কুলীটিও আমাদের এমনই অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে বেচারীও আমাদের সঙ্গ ছেড়ে থাকতে নারাজ, কাজেই সেও যাবে স্থির হলো; অন্য দিকে পাগলীমা ও তার পিসিমা (সরোজিনী মা) এবং বৃন্দাবনের অন্য একজন মাতাজী যাবে স্থির হলো; পাগলীমার দলের একজন এবং বৃন্দাবনের দলের অন্য ৪ চার জন, ছোট মা ও বিহারী দার সঙ্গে এখানে থাক্‌বেন, যত দিন পর্য্যন্ত আমরা না ফিরি। ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের দল হতে ৯ জন, ও সোণা কুলি মোটে ১০ জন যাওয়া স্থির করলাম। এ ছাড়া আমাদের সঙ্গীয় সেই ভজনানন্দ বৈষ্ণব সাধু গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ এবং আরও তিনজন বাঙ্গালী সাধু বেশধারী গৃহস্থ (এদের সঙ্গে পূর্ব্ব হতেই কলিকাতায় আমার জানা শুনা ছিল); এঁরা জামা-কাপড় সব গেরুয়া রং করে বেশ সাধু সেজেছিল। মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরের ৩৪।৩৫ বয়স্ক একজন উদাসী বৈষ্ণব সাধু, রামানুজপন্থী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ২৪।২৫ বয়স্ক হিন্দুস্থানী সাধু সীতারাম বাবাজী, (ইনি অল্প বয়স্ক, সদা আনন্দযুক্ত, ভজনশীল, বিশেষ কষ্ট-সহিষ্ণু, ও খুব অমায়িক লোক, সঙ্গে কাঠ কাটার জন্য একটী কুঠার, জল পানের জন্য একটী লাউয়ের তুমরী, একখানা অতি ছোট ও পাতলা গরম কম্বল, ও লেংটী ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত্র বা অন্য কোন জিনিষ পর্য্যন্ত নাই; এমন কি খাবার জিনিষাদি পর্য্যন্তও নয়। তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত করে থাক্‌তেন, আমরা তাঁকে খাবার দিতাম)—এ ছাড়া আরও তিনজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব উদাসী সাধু রওনা হলাম। আমাদের দল ভিন্ন আরও যে নয়জন সাধু যোগ দিবেন, তা আমরা জানতাম না। আমরা যখন গঙ্গোত্তরী হতে উচ্চ জয়ধ্বনি করে বের হই, তখন এঁরা তাড়াতাড়ি এসে, ভাগীরথীর অপর পারে আমাদের সাথী হলেন। আমাদের যাবার খবর কাল রাষ্ট্র হলে, আরও অনেক লোক আমাদের সাথী হত। আমরা ফিরে আসার পর অনেক

লোক খুব দুঃখ কচ্ছিল। কেউ কেউ তো মনে করেছিল আমরা 'অগস্ত্য-যাত্রাই' করেছি—বোধ হয় আর ফিরবে না। অবস্থাও অনেকটা সেইরূপই বটে !

দোকান হতে আটা দশ সের ৪৲ টাকার, আলু ৵৮ সের ১৲ টাকা, মোটা চাউল ৵৩৸ সের ১৷৹ টাকা, গুড় ৵৬॥ সের ১৲ টাকা, লবণ ৵॥ সের ৵১০ আনা, কেরোসিন তৈল ১ শিশি আধ পোয়া ৵০ আনা, দিয়াশালাই ৪টা ৵১০ আনা, ঘী ৵। পোয়া ॥৵১০ আনা, ছোলা ভাজা ৵৸ পোয়া ॥০ আনা, উরুদ ডাল খোসা ৵১ সের ।৵১০ আনা—মোট ৯॥০ সাড়ে নয় টাকার খাবার জিনিষ কিনে নিলাম। এ ছাড়া কয়েক রকম ঔষধ, চা, চিনি, নিলাম। সুজী, মোমবাতী, মকরধ্বজ, মধু, লংকা, জিরা, মরিচ, ছুঁচসুতা, আচার, পাকের বাসন, শীতের সমুদয় বস্ত্রাদি, গামছা, কাপড়, জুতা, মোজা ইত্যাদি যা হয় পথে দরকার হতে পারে, সমুদয় জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে, বেলা ১২টার সময় "জয় গঙ্গা মাঈ-কী জয়," "জয় গোমুখী মাঈ-কী জয়" ধ্বনি করে বের হয়ে পড়লাম।

গঙ্গা মাতার মন্দিরে প্রণাম করে, গত কালের সেই কাঠের পুল দিয়ে ভাগীরথী গঙ্গা পার হয়ে তীর দিয়ে পূর্ব্ব দিকে রওনা হলাম। আমাদের যাবার সময় গঙ্গোত্তরীর প্রায় সমস্ত লোক এসে আমাদের উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখতে লাগলো। বৃদ্ধ পাণ্ডাটীও অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ছল ছল নয়নে কাতর হৃদয়ে বিদায় নিলেন।

আমরা এখন ১৯ জন যাত্রী গোমুখীর বরফাবৃত অনন্ত প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে এসেও পাণ্ডা মহারাজ পুনঃ পুনঃ বাধা দিচ্ছিলেন—"এ পথে যাবেন না, যত লোক এ দুর্গম পথে রওনা হয়, তার অর্দ্ধেক লোকও ফিরে না, সুতরাং আপনারা এ পথে যাবেন না,—বিশেষতঃ স্ত্রীলোক তো এ বন্ধুর পথে যায়ই নাই—এঁদের নিয়ে যাবেন না।" আমরাও যথাসাধ্য বড় মায়েদের থাকার জন্য অনুরোধ করলেও কিন্তু এঁরা আমাদের স্নেহপাশ ছিন্ন করে এখানে থাকতে রাজি হন নাই। আমরা সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে, কিয়দ্দূর চলবার পরেই কাঁটা বন-জঙ্গল পেলাম—পথ নাই।

ভাগীরথী গঙ্গা বাঁ হাতে রেখে, কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে এলোমেলো ভাবে আধ মাইল অতিক্রম করার পর, বড় পাথরের ভিতর একটী সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল। সে পাথরটা এত বড় যে ডিঙ্গিয়ে যাবার উপায় নাই—যেন দোতালা একখানা বড় বাড়ীর মত উঁচু। তার নীচুতে মাটী খুঁড়ে খুঁড়ে একটী সুড়ঙ্গ তৈরী করা রয়েছে; বসে বসে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে বহুকষ্টে পার হতে হয়। একটী বড় পাথর পর্ব্বতের শিখর হতে বিচ্যুত হয়ে, অন্য দুইটী বড় পাথরের মাঝখানে পড়ায়, পথটি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সামান্য মাটী খুঁড়ে নেওয়াতেই বেশ সুড়ঙ্গ হয়েছে। সেখানে বন্য হিংস্র-জন্তু থাকা খুবই সম্ভবপর হলেও দিয়াবাতী জেলে জেলে একে একে সকলেই সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে দাঁড়ালাম। আমাদের মণিরামের পিঠে বোঝা ছিল, অবশ্য বোঝাটি খুব হাল্কা—শুধু আমাদের কাপড়, জামা, কম্বলাদি ও পাকের বাসন পত্র। চাল, ডাল, আটা, আলু প্রভৃতি ভারি জিনিষ সোণা কুলীর কাছে ছিল। সেই সামান্য জিনিষ নিয়েই মণিরামের সুড়ঙ্গ পার হওয়া খুব কষ্ট হয়েছিল, আমরা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে তাকে জিনিষপত্র সহ টেনে তুলে নিলাম। সে বেচারী তো এই কষ্টটুকু দেখেই পথের অবস্থা বুঝে বেঁকে বসলো—যাবে না। তাকে অনেক বুঝিয়ে আবার রাজি করলাম। খুব বিপদসঙ্কুল পথ। বেচারা রাজি হওয়ার পর পুনরায় জয়ধ্বনি দিয়ে রওনা হলাম। এই সুড়ঙ্গের কাছেই ভাগীরথী গঙ্গার কিনারায় দুটী যোগগুম্ফা আছে, তাতে কয়েকজন সাধু বিরাজ কচ্ছেন।

বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে নানা প্রকার পার্বত্য ফুল গাছের পাশ দিয়ে, কখনও বা ফুল গাছের নীচু দিয়ে, কখনও বা জঙ্গলগুলি দুই হাতে ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে (যেরূপ অনেক ছবি বায়স্কোপের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়) আমরা আধ মাইল যাবার পর, একটি ভীষণ কঠিন রাস্তার সামনে পড়ে আমাদের মাথা ঘুরে গেল।

গঙ্গোত্তরী হতে গোমুখী যাবার মোটেই কোন পথ নাই, এমন কি এ পথে কোথাও ঘর-বাড়ী, চটী, গ্রাম, মন্দিরাদি কিছুই নাই! শুধু গঙ্গার উৎপত্তিস্থান গোমুখী দেখবার জন্যই এত কষ্টের অভিযান। আমরা সর্ব্বদা ভাগিরথী গঙ্গা বাঁ হাতে রেখে বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত, ঝরণা, বরফ প্রভৃতির উপর দিয়ে কোনরূপে অতি কষ্টে চলেছি।

এখানে এসে দেখলাম, প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে পর্ব্বতের শিখর ভেঙ্গে পড়েছে। পর্ব্বতটী খুব উঁচু হলেও ঢালু ভাবে শুধু ঝুরঝুরে বালুতে আবৃত। আমাদের সেই ধসা পর্ব্বতের ঢালু ঝুরঝুরে বালুরাশির উপর দিয়ে যেতে হবে,—সেও কম জায়গা নয়, প্রায় সিকি মাইলেরও উপর।

পাহাড়ীয়া সোণা কুলীটি অতি হুঁসিয়ার। সে নিজে একা সেই ঢালু বালুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে আমাদের পার করে নিয়ে গেল। অতি সাবধানের সহিত ধীরে ধীরে বাঁ হাতে লাঠী ভর রেখে, ডান হাতে ঝুরঝুরে ঢালু বালুর পাহাড় হাত দিয়ে ধরে ধরে অতি সন্তর্পণে সে পথটি অতিক্রম করলাম। সেই ধসের মধ্যে পা দিলে ঝুরঝুরে বালুযুক্ত ছোট কাঁকর-পাথরগুলি নীচের দিকে চলে যায়। সে সময় বিশেষ সাবধান না হলে, সেই ঝুরঝুরে বালু ও পাথরের সঙ্গে গড়িয়ে ভাগিরথী গঙ্গার সুতলগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার!

আমরা উপরোক্ত বিপদ-সঙ্কুল জায়গাটা পার হয়ে খানিকক্ষণ চলবার পর, আবার নূতন যে স্থানে পৌছলাম, সে স্থানটি এর চেয়েও ভীষণ বিপদসঙ্কুল লক্ষ্য করে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু পথে বের হয়ে এতদূর এসে আবার ফিরে যাব, এ ভাবটি মনে উদিত হয়ে বড়ই ঘৃণা হ'ল—পথে নেমে একি কাপুরুষের লক্ষণ? ঠাকুরের দয়ায় প্রাণে বল এল, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল পথটি কি করে অতিক্রম করবো চিন্তা করতে লাগলাম। এরূপ কঠিন বিপদসঙ্কুল পথ, এ পথে আর পাই নাই, এইটিই সব চেয়ে কঠিন। নীচে, বোধ হয় দুই তিন হাজার ফুট নীচে ভাগিরথী গঙ্গা আপন মনে বয়ে যাচ্ছেন, পিছনে সেই ধসা পর্ব্বতের বালুরাশি, দক্ষিণে অত্যুচ্চ অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা বুক ঠুকে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে অতি প্রকাণ্ড একটি পাথর (তেমন একটি পাথরের ভিতর একটি দ্বিতল ভাল বাড়ী তৈরী হতে পারে) ভাগীরথী গঙ্গার জলরাশি হ'তে উঠে, পথটি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে, আমাদের দিকে চেয়ে যেন অবজ্ঞার হাসি হাসছে।

নীচে নেমে ভাগিরথী গঙ্গার জলের ভিতর দিয়ে যাবার উপায় নাই। নামার সময়ই যদি সেই ঝুরঝুরে বালুসমেত গঙ্গার গর্ভে পড়ে যাই, তা'হলে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া গঙ্গার জলও অতি প্রচণ্ড বেগবতী, সুতরাং বহু কষ্টে সেখান নামলেও সে পথ দিয়ে অতিক্রম করার কোন উপায় নাই। দক্ষিণ দিকের সেই ধসা ঢালু উচ্চ পর্ব্বতের শিখরারোহণ করা অসম্ভব; সে পথে এক পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বালুরাশি নীচে ধসে যাওয়ায় মনে হয় যেন কেউ ধাক্কা মেরে তিন পা নীচে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। সেরূপ অবস্থায় অত বড় উচ্চ পর্ব্বতশিখর কি করে লঙ্ঘন করবো? যদি অমনি ধসা বা ঝুরঝুরে বালু না হত, তা হলে ঐ উচ্চ পর্বত অতিক্রম করতে পিছ-পা হতাম না। ধীরে ধীরে সামনের বড় পাথরটীর পাশে যেয়ে দেখতে পেলাম, পাথরটি সেখানে এমন শক্ত হয়ে বসে আছেন, তার উপর শত মত্ত

হস্তী উঠে নাচ্‌লেও যেন তিনি নড়বেন না, এমনি তাঁর ভাবখানা।

আমরা যেখানে পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে স্থান হতে ১৮।২০ হাত ঝুরঝুরে বালুরাশি ভেদ করে উপরে উঠতে পার্‌লে একটী বড় চীর গাছের মূল শিকড় পাওয়া যায়। পাহাড় ধসে যাওয়ায় সেই চীর গাছটীর মূলের অর্দ্ধাংশ বাহিরে বের হয়ে ঝুল্‌ছে। সেই চীর গাছের মূল শিকড় ধরে ধরে ধীরে ধীরে ১৮।২০ হাত উঠ্‌লে চীর গাছের গোড়াতে পৌছান যায় এবং সেখান হতে সেই বড় পাথরটির মস্তক উল্লঙ্ঘন করা বিশেষ কষ্টকর নয়। কিন্তু সেই স্থানগুলি কি করে অতিক্রম করবো? পুরুষরা এই স্থানটী অতিক্রম কর্‌তে গাছের মূল শিকড় ধরে বেয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে, কিন্তু মায়েদের কি করে পার করে নিয়ে যাব?

অনেক চিন্তার পর সোণাকুলী আমার লাঠি নিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হয়ে ঝুরঝুরে বালুরাশি ভেদ করে মূল শিকড় ধরে বেয়ে উপরে উঠে গেল— বোঝাটি তো তার পিঠে আছেই। পরে তার পিঠের বোঝাটী সেখানে রেখে আবার নেমে এল। পাহাড়ীরা এমন ভাবে বোঝা পিঠে বা মাথায় বহন করে, যাতে তাদের দুটি হাতই সর্ব্বদা খোলা থাকে, অথচ বোঝাটি পিঠে বা মাথায় লটকান থাকে। তার উদ্দেশ্য ছিল পথটি পরীক্ষা করা। পরে তিন হাত দূরে দূরে আমরা এক একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে মায়েদের ধরে ধরে পার করে দেবার পর আমরা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে পার হলাম। সেই সামান্য এক ফার্লংএর কম জায়গা পার হতে আমাদের প্রায় দু'ঘণ্টার উপর লেগে গেল।

পাঠক মহোদয়গণ আমাদের পথের এ ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বেন কিনা-জানি না, আমি একে সম্যকরূপে বর্ণন করতে অক্ষম। যদিও আমি এক নিঃশ্বাসেই আপনাদের জানিয়ে দিলাম, কিন্তু ঐ সামান্য স্থানটী পার হতে দু'ঘণ্টার উপর লেগেছিল! শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে স্থানটি পার হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তখন কিন্তু একবারও মনে হয় নাই, ফির্‌বার সময় কি করবো! তখন শুধু সঙ্কল্প ছিল, কি করে জায়গাটি অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়? আমাদের সঙ্গীয় হিন্দুস্থানী সাধুগণ পথের ভীষণতা দেখে পালাবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু পালাতে চাইলেই বা পার্‌বেন কেন? পিছনে তো ভীষণ বিপদসঙ্কুল ঝুরঝুরে বালুর ঢালু পাহাড়। সুতরাং আমরাও তাদেরও ঐ ভাবে হাতে ধরে ধরে পার করে নিলাম। আমার এবং হরিদাসভায়ার কিন্তু ঐ রূপ বিপদ দেখেই আনন্দ হচ্ছিল, আমরা দু'জনেই অনবরত হাস্‌ছিলাম। বাস্তবিক পক্ষেই এরূপ বিপদের স্থান সাহসিকতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়া খুবই কঠিন এবং কষ্টজনক হলেও যদি সেই স্থান নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করা যায়, তাহলে কার না হাসি পায় এবং কে না প্রাণ ভরে ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা জানায়?

সেখান হতে ক্রমশঃ চড়াই-উৎরাই করে, কখনো বা ধসা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে, কখনও বা বন জঙ্গল কাঁটা গাছের ভিতর দিয়ে কখনও বা ভূর্জপত্র গাছের নীচু দিয়ে, কখনও বা প্রকৃতির সুমনোরম দেবদাওয়ার বাগিচার ও চীর গাছের নীচু দিয়ে কখনও বা নানাপ্রকার সদ্যপ্রস্ফুটিত সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুল গাছের ভিতর দিয়ে, এঁকে-বেঁকে চল্‌তে চল্‌তে বেলা ৫টার সময় এমন একটী সুন্দর ভূর্জপত্রবৃক্ষদ্বারা বেষ্টিত স্থলে পৌছিলাম, যার সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে, সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করবার জন্য স্থির করে একটী ঝরণার পাশে স্থান

নির্দেশ করে বসে গেলাম। পাশ দিয়েই এঁকেবেঁকে কয়েকটী সুশীতল ঝরণা পর্ব্বতশিখরস্থ অচল বরফ হতে জন্ম নিয়ে কুল কুল স্বরে তাঁরই মহিমা গান করতে করতে আকুল আবেগে ভাগীরথী মায়ের কোলে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে চলেছে। এরপর ক্রমেই আমরা বৃক্ষলতাহীন উন্মুক্ত বরফের প্রান্তরে পৌছব। সে সব উন্মুক্ত প্রান্তরে রাত্রি যাপন করা কষ্টকর হবে বলে এই স্থানেই থাকা স্থির করলাম।

আমাদের চারিদিকে বরফাবৃত উচ্চ পর্ব্বতের শ্বেত শৃঙ্গগুলি দেখে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ছিল—প্রকৃতির সে মোহন দৃশ্য দেখে পথের সব কষ্ট ভুলে গেলাম। যায়গাটী পাহাড়ের কোলে অবস্থিত হলেও, অত্যন্ত ঠাণ্ডা। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে অসংখ্য সরু মোটা শুক্‌নো ভূর্জপত্র কাঠ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে আছে। পাহাড়ীরা ও সোণা কুলী অনেক শুকনো কাঠ জোগাড় করে. আগুন জেলে দিল। তার সঙ্গে চকমকি ছিল। চক্‌মকি দ্বারা ধুনি জ্বালিয়ে দিয়ে সে পয়সা উপার্জ্জনের জন্য ভূর্জপত্রের বাকল খুলতে লাগিল। আমরা কলিকাতায় ভূর্জ্জপত্র দেখে থাকলেও গতকালে জীবনের সর্ব্বপ্রথম সে গাছ দেখবার সৌভাগ্য লাভ করলেও. কি করে তার ত্বক্ খুলতে হয়, তা আজ সর্ব্বপ্রথম দেখ্‌তে পেলাম সে অনেকগুলি ভূর্জ্জপত্র যোগাড় করে বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিল, ফিরবার সময় নিয়ে যাবে।

ভূর্জ্জপত্র

ভূর্জ্জপত্র নাম শুনলে অনেকে মনে করেন এ গুলি বোধ হয় ভূর্জ্জপত্র গাছের পাতা, কিন্তু বাস্তবে তা নয়—এ গুলি ভূর্জ্জপত্র গাছের ত্বক্। গাছের মাঝখানে বা যে কোন মোটা জায়গায় চাকু দ্বারা সীধা দাগ করে নিয়ে কলাগাছের মত বাকল খুলে নিতে হয়। পরে সেগুলি এক একটি করিয়া খুলে নিলেই অতি সুন্দর ভূর্জ্জপত্র হয়ে যায়। ভূর্জ্জপত্রগুলি এত পাতলা যে মনে হয় যেন খুব পাতলা ফুলিস্কেপ কাগজ কিন্তু এই ভূর্জ্জপত্র দ্বারাই পূর্ব্বকালে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সমুদয় শাস্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হত এবং বর্ত্তমানেও অনেক স্থানে হয়ে থাকে। তা ছাড়া পাহাড়ীরা এগুলি ঘরের চাল ছাইতে ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য কলা বা শাল পাতার পরিবর্ত্তে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

সোণাকুলি পরে তাওয়ার মত একখানা গোল পাথর বের করে রুটী করে নিল। সে আরও অনেক বার ভূর্জ্জপত্রের জন্য এবং গোমুখীর যাত্রী নিয়ে এদিকে এসেছে, তাই এ জায়গাটি তার পূর্ব্বেরই জানা ছিল এবং তাওয়া সদৃশ পাথরটি তার রুটী করার জন্য সযত্নে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। এখান হতে জিনিষ চুরী হবার ভয় নাই। সন্ধ্যেবেলা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আলুর তরকারী দিয়ে রুটী খেলাম। সঙ্গে হারিকেন আনি নাই, কাজেই রাত্রি খাওয়া অসুবিধা হবে বলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে খাওয়া শেষ করে নিলাম।

এখানে কিন্তু জল খাওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার ; জল এমন বিশ্রী ঠাণ্ডা যে, মুখে দিলেই মুখ অসাড় হয়ে যায় : তবুও পিপাসা শান্তির জন্য গরমাগরম চা পানের মত অতি ঠাণ্ডা জল সামান্য পরিমাণ পান করা গেল।

আজ আমরা মাত্র ৭ মাইল পথ অতিক্রম করেছি। রাত্রিবেলা মোটেই ঘুম হয় নাই। অতগুলি ধুনি জ্বালা সত্ত্বেও নীচুতে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগতে লাগলো। ধুনি চেতিয়ে জায়গা গরম করে ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গে আধ ঘণ্টার মধ্যেই বজরী* পড়ে

* শিশিরবিন্দুর মত অনবরত বরফ পড়াকে "বজরী পাত" বলে।

ধুনি নিবে যেত। তখন উঠে আবার ধুনি চেতিয়ে দিতাম। বজরী পড়ে ধুনি ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন শীত লাগতো যে, ঘুম আপনা-আপনিই ভেঙ্গে যেত। তখন প্রাণের দায়ে উঠে পুনরায় ধুনি চেতিয়ে দিতাম। এই ভাবে সমস্ত রাত্রের মধ্যে কতবার যে ধুনি চেতিয়েছিলাম, বল্‌তে পারবো না। তবে চারিদিকেই অতগুলি ধুনি থাকার জন্য তত ভীষণ শীতেও বিশেষ কষ্ট হয় নাই।—অবশ্য ঘুম হয় নাই। সর্বদা আগুন থাক্‌লে নাকি হিংস্র-জন্তুও আসে না।

(ক্রমশঃ)

সত্যের সাধনা

—(*)—

সব সময় অন্তরের সঙ্গে যোগ রেখে চল্‌তে হবে। তা না হলে পথভ্রষ্ট হয়ে, বিপদে পড়বার বড়ই আশঙ্কা। আমরা সবাই সব রকমের কাজ করে থাকি। কিন্তু কতকগুলো দৈনন্দিন কাজের কোনো মীমাংসা পাওয়া চলে না। অথচ খাটার বিরাম নাই। যে খাটার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, মনের কোনো সোয়াস্তি নাই, সে খাটায় তো কোনো লাভ হল না। ভারবাহী পশুর মতই সংসারটাকে মাথায় করে খেটে মরা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। জীবনে যা করব, সমস্তেরই সুমীমাংসা থাকবে এবং নিরূপিত আদর্শ থাকবে ; কেননা মানুষের জীবনটাই তো দায়িত্বপূর্ণ।

জগতে কাউকে তো স্বাধীন বল্‌তে পারি না ; জগতে সবাইকে একটা না একটার পিছনে ছুটতে হচ্ছে। অথচ সবারই একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে আমি বড় হব, সুখী হব। কিন্তু সুখী আর বড় হতে যেয়েই কারো এক তিল বিশ্রামের অবসর নাই। যে মিথ্যা অভিমানকে ছাড়তে পারেনি, তার আবার বিশ্রাম কোথায় ? আমরা যে মিথ্যা অভিমানের বড়াই করতে যাচ্ছি, এই অনন্ত কোটী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কোন্‌খানটায় তার স্থান ? আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিমানের কতটুকুই বা শক্তিমত্ত ? জগতের একটা বালুকণাতে যে কাজ করে থাকে, আমাদের ব্যষ্টির অভিমান বা জীবনের দ্বারাও জগতের বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের ঐটুকুই কাজ হয়ে থাকে। ঐ এক কথাই জাতি, সমাজ, দেশ হিসাবেও প্রয়োগ করা চলে। ব্যষ্টিবদ্ধ আমাদের একটা জীবনের জন্ম মৃত্যুতে জগতের গায়ে একটা আঁচড়ও লেগেছে বলে মনে হয় না, কিন্তু সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের দিক হতে দেখলে এই ক্ষুদ্র অভিমান বা জীবনগুলোরও কিছু কিছু মূল্য আছে। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের একটা বালুকণাকেও বাদ দিলে ব্রহ্মাণ্ড অঙ্গচ্যুত হয়ে পড়ে। তাই আমরা যা কর্‌ছি, এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছি, এতে সমষ্টি জগতের বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যোগ রয়েছে। অথচ আমরা অজ্ঞান বা ব্যষ্টি অভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখরূপে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ কর্‌ছি। আমাদের সমষ্টি হিসাবেই জীবন পূর্ণ। কিন্তু আমরা অজ্ঞানবশতঃ ব্যক্তিত্বের অভিমান নিয়ে সমস্ত কাজ করে থাকি বলেই জীবনে দুঃখ পেয়ে থাকি।

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনেও আনন্দ পেয়ে থাকি

সমষ্টিকে নিয়েই। সমাহিত সমষ্টি শক্তি থেকেই চাকার মত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টির অভিমানগুলো ঘুরছে ফিরছে, এবং কর্ম্মে লিপ্ত হচ্ছে। কর্ম্মে যখন সংহত সমষ্টি শক্তি থেকে ব্যষ্টির অভিমানরূপে সরে দাঁড়াল, তখন সে সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সে কর্ম্মের পরে বিশ্রাম চায়। কিন্তু যার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তার বিশ্রামের মধ্যেও বিশ্রাম নাই। সে যে মিথ্যা অভিমানে বিশ্রাম চাচ্ছে, সে বিশ্রামের মধ্যেও তার মানসিক ক্রিয়া হতে থাকবে। আমাদের জড় দেহটা পরিচালনা হচ্ছে মানসিক শক্তির দ্বারায়। মানসিক শক্তি থেকেই সমস্ত শরীরে ব্যাটারী অর্থাৎ তাড়িত শক্তির প্রবাহ চলেছে, এতেই আমাদের অচল জড় শক্তি সচল হচ্ছে। কিন্তু আমরা যাকে বিশ্রাম বলে কর্ম্মের শেষে বিশ্রাম করি, এতেও তো আমাদের বিশ্রামের অভিমান বা মানসিক শক্তির ক্রিয়া হতে থাকে। আমাদের শরীরের মূল বা, তারই যদি বিশ্রাম নাই, তাহলে বিশ্রাম হল কার? মিথ্যা সংস্কাররূপী বিশ্রামকে অবলম্বন করে জড় দেহটা সবল হয়ে উঠে না কি ?

যে মনের দ্বার এই অচল জড় দেহটা সচল হচ্ছে, তারই যদি বিশ্রাম নাই, মানসিক শক্তিকে যদি বাজে চিন্তা থেকে রেহাই দেওয়া না গেল, তাহলে সে বিশ্রাম বিশ্রামের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু বিশ্রাম না করেও উপায় নাই। সেই জন্যে আমরা কর্ম্মের শেষে ক্লান্ত দেহটাকে ঘুমের মধ্যে দিয়ে একটুখানি সতেজ অনুভব করি। কিন্তু আমাদের মানসিক শক্তির এতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে বলে মনে হয় না। কেননা, আমাদের মধ্যে কর্ম্ম-সংস্কার থাকতে মানসিক শক্তির বিশ্রাম হতে পারে না। আমরা বাইরে অনুভব না করলেও, কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে আমাদের ঘুমের মধ্যেও মনের মাঝে কর্ম্ম-সংস্কারের ক্রিয়া হতে থাকে। আমরা যদি খাঁটী বিশ্রাম চাই, তাহলে কর্ম্ম-সংস্কার হতে আমাদের মনকে মুক্তি দিতে হবে, তবেই আমাদের জীবন নবরসে পুষ্টি লাভ করবে।

আমাদের মনটা যদি সতেজ এবং সবল থাকে, তাহলে শরীরের দুর্ব্বলতাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মূলেই আমাদের মানসিক শক্তি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এবং সমষ্টি সংহত শক্তির জ্যোতিঃ এসে না পড়াতে মানসিক শক্তি দুর্ব্বল হয়ে শরীরটাকেও দুর্ব্বল করে ফেলে। এই জন্য আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা স্থূলভাবাপন্ন বলে বিশ্রামের মধ্যে মানসিক-শক্তিতে বিশ্রামের ক্রিয়া হতে থাকে। এই জন্য জীবনে আমাদের বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত হতে হয়, এবং শেষে মরণের কোলে ঢলে পড়তে হয়

সব কাজ করেও নিজকে নির্লিপ্ত এবং স্বাধীন রাখবার মত একটী শক্তি থাকা চাই। এ সংস্কার যার যত বেশী, সে ততই উত্তরোত্তর আনন্দে নিজকে নিমজ্জিত জানবে। দেহ-যন্ত্রগুলোও ঠিকভাবে পরিচালনা করা চলে, শ্বাস-প্রশ্বাসকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। কেননা সব চেয়ে কর্ম্মসংস্কার বড়। এ সংস্কার হতেই দৃষ্টি প্রসারিত হবে। দেহের গ্লানি অগ্লানিতে তোমাকে আর বাধ্য হয়ে ছুটে বেড়াতে হবে না। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস সুনিয়ন্ত্রিত হলে দেহ নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন মনের মধ্যে এলোমেলো এবং অমীমাংসিত ভাব আসতে পারে না। আমাদের দৃষ্টিশক্তি অন্তর্মুখী হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রসারিত হবে বা সত্য সঙ্কল্প আমাদের সম্মুখে ভেসে উঠবে এবং সেই সত্য সঙ্কল্পের দ্বারায় প্রচোদিত হয়ে আমাদের জীবন অমৃতের পথে চলবে।

আমাদের দেশে যোগীরা ইচ্ছামত দেহটীকে হাল্কা-ভারী করতে পারে; এবং ইচ্ছামত জগতের কোনো বিশেষ কাজের দরুণ অনেক দিন দেহটীকে

বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এর কারণ তাঁরা কেন সাধনার দ্বারা মানসিক শক্তিকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তাধীন করে নিয়েছেন। তাই তাঁরা মানসিক শক্তির ক্রিয়া রোধ করে দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

তাই বলি, আমাদের জীবনে সুখ-শান্তি পেতে হলে মানসিক শক্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনতে হবে। আমাদের মানসিক শক্তির ওপর ক্ষমতা জন্মিলে অপরকেও শক্তি সঞ্চার দ্বারা সৎপথে পরিচালনা করা চলে। এই জন্য আমাদের জীবনকে সত্য সাধনায় নিয়োজিত করা চাই। আমাদের জীবনে দৈনন্দিন যা কিছু হয়ে থাকে, সব যেন অন্তর্মুখী হয়। এতেই মনে জোর আসে; তা না হলে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হলে শরীর শিগ্‌গির এলিয়ে পড়ে, মন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। কেননা সেখানে যে মনের পরতে পরতে দুর্ব্বলতার ছোঁয়াছ লেগে রয়েছে।

মায়ের বুকে যে স্তন্য দুধ রয়েছে, সে স্তন পান করেই ছেলের দেহকে পুষ্ট করে। আমাদের দুর্বল মনকে সত্যাভিমুখী করে সত্যের তেজে তেজীয়ান্ করতে হবে। তবেই আমাদের জীবনে অফুরন্ত শক্তির উদ্ভব হবে। সর্ব্বদাই আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করে সত্যের দিব্য অনুভূতিতে মনকে পূর্ণ রাখতে হবে। এতে বাইরের কর্ম্মে বড় বিশেষ অসামঞ্জস্য আসতে পারে না।

মানসিক শক্তিকে সত্যের জ্যোতিঃতে প্রসারিত রাখতে অভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয়গুলোও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে। মানুষের জীবনে ইন্দ্রিয় দোষ থাকাটাও মস্ত বড় অপরাধ বলতে হবে বৈ কি? আমরা রসনাতৃপ্তিকর জিনিষ খেয়ে আমাদের রসনা বিকৃত করে ফেলেছি, কিম্বা কু-অভ্যাসের বশে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিয়ে ফেলেছি, এতে আমাদের অনেক সময় মনের মধ্যে উচ্চ ভাবের স্থান হয় না।

ধৈর্য্য সহকারে নিজের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে, সত্যের অনুভূতিতে মনের ব্যাপকতায় চিত্ত ক্রমশঃ প্রশান্ত হয়ে আসবে। মন তখন অন্তরে আত্মসমাহিত হয়ে থাকাতে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কমে আসবে। একবার যদি আত্মরতির রস আস্বাদন করা যায়, তাহলে আর ভুলেও মন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে পা বাড়াতে চাইবে না। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যজনিত চিত্তে যে বিক্ষোভ হয়, তা একমাত্র সত্যের সাধনা ছাড়া নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব। সত্যের সাধনায় মন প্রশান্ত হয়ে এলে একটী বিরাট শক্তির সত্তায় আমাদের ক্ষুদ্র সত্ত ডুবে যায়। তখন এই মন বিভু হয়ে যায়; সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভের মধ্যে যে সত্য সঙ্কল্প জেগেছিল, সে সঙ্কল্প ছাড়া ক্ষুদ্র সঙ্কল্প আমার মধ্যে স্থান পায় না। সে সঙ্কল্পে শান্তি আছে, সুখ আছে, জীবনের হাহাকার নাই। এখন আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, চিত্তপ্রশান্তিই একমাত্র সুখ। সমস্ত অবস্থার মাঝে এই ভাবটাই বজায় রাখতে হবে। হাতে পায়ে কাজ চলুক—অন্তরে চলুক সত্যের সাধনা—আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার অন্তরের দিকে ফিরে তাকাও—ব্যস্ আর কিছুই প্রয়োজন নাই!

বৈদিক যুগের প্রাণ উপাসনা বা শক্তি উপাসনা

—*—

প্রাণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, দেবতারা প্রাণ উপাসনা দ্বারাই অসুরদের পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণের উপাসনা যিনি করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ এই দুই-ই হইতে পারেন। অতএব প্রাণের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরই অনাদি-কাল হইতে যে দেবাসুরে সংগ্রাম চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই বেশ সুন্দর এক আখ্যায়িকারূপে বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকার আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রকাশার্থক 'দিব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন দেব অর্থ—শাস্ত্রজ্ঞানোজ্জ্বল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ; আর অসুর অর্থ—দেবতার বিপরীত—অর্থাৎ তমোময় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ। এই সাত্ত্বিক এবং তমোবৃত্তির মাঝে অনাদি-কাল হইতেই লড়াই চলিয়া আসিয়াছে। তবে কিনা এই তমোবৃত্তিকে অর্থাৎ অসুরকে, সাত্ত্বিকবৃত্তি অর্থাৎ দেবতা কি করিয়া অভিভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই এই আখ্যায়িকায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দেবতা এবং অসুরদের মাঝে সংগ্রাম হইয়াছিল কি উদ্দেশ্যে?—না, পরস্পর পরস্পরের বিষয় অপহরণের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত দেবতারাই জয়ী হইয়াছিলেন।

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুঃ অনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১১॥১

প্রাজাপত্য অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকারী পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন দেবতা ও অসুর—এই উভয় সম্প্রদায় যাহা লইয়া পরস্পর পরস্পরকে অভিভবার্থ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে দেবগণ "ইহা দ্বারাই ইহাদিগকে (অসুরদিগকে) অভিভূত করিব" এই মনে করিয়া উদ্গাতার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ; পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ১২॥২

অনন্তর দেবগণ, নাসিক্য অর্থাৎ নাসিকাস্থিত চেতনবান্ ঘ্রাণাখ্য প্রাণকে উদ্গাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ তাহাকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। নাসিক্য-প্রাণ পাপবিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি দুর্গন্ধি উভয়ই আঘ্রাণ করিয়া থাকে। নাসিক্য-প্রাণ কি করিয়া পাপবিদ্ধ হইয়াছিল, ভাষ্যকার তাহা বেশ সুন্দর বুঝাইয়াছিলেন—"অর্থাৎ সেই নাসিক্য-প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) উত্তম গন্ধ গ্রহণ করে বলিয়া অভিমানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার বিবেকজ্ঞানও পরাভূত হইয়াছিল—এই দোষেই তিনি পাপবিদ্ধ হইলেন। "অসুরগণ পাপ বিদ্ধ করিয়াছিল" এই বাক্যের তাৎপর্য্য ইহাই।

দেবতারা জয়ী হইতে না পারিয়া তাহারপর বাগ্-দেবতাকে উদ্গাতৃকার্য্যের জন্য উপাসনা করিলেন।

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তাং হাসুরা পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতঞ্চ, পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ॥ ১৩॥৩

কিন্তু অসুরগণ তাহাকেও সুভাষিতাভিমান দ্বারা (অর্থাৎ আমি বেশ উত্তম বাক্য প্রয়োগ করিতে

পারি এই অভিমানের দরুণ) পাপে বিদ্ধ করিল। সেই জন্যই বাগিন্দ্রিয় সত্য মিথ্যা উভয়ই বলিয়া থাকে —কেননা উহা পাপ দ্বারা আক্রান্ত।

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি —দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ ; পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥১৪॥৪

অনন্তর দেবগণ চক্ষুকে উদ্গীথ নির্ব্বাচন করিলেন, কিন্তু অসুরগণ তাহাকেও পাপ বিদ্ধ করিল, সেই জন্যই চক্ষু দ্বারা লোকে প্রিয়, অপ্রিয় উভয়ই দর্শন করিয়া থাকে—যেহেতু চক্ষুঃ পাপবিদ্ধ।

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি—শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ ; পাপ্মনা হি এতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ১৫॥৫

অনন্তর দেবগণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে উদ্গাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ তাহাকেও পাপ বিদ্ধ করিয়াছিল। সেই হেতু কর্ণ দ্বারা লোকে শ্রবণীয়, অশ্রবণীয় উভয় প্রকার শব্দই শ্রবণ করিয়া থাকে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও পাপ দ্বারা বিদ্ধ।

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে—সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ ; পাপ্মা হি এতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ১৬॥৬

অনন্তর দেবগণ মনকে উদ্গীথকর্ত্তৃরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অসুরগণ তাহাকেও পাপ বিদ্ধ করিয়াছিল। সেই জন্যই লোকে মন দ্বারা ভাল-মন্দ উভয়ই চিন্তা করে। মনও পাপ-বিদ্ধ।

অথ হ য এবায়ং প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তং হাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত ॥ ১৭॥৭

অতঃপর সর্ব্বশেষে মুখ্য প্রাণকেই (অর্থাৎ যে প্রাণ সর্বন্তর=সকল ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি বিধান করে) দেবতারা উদ্গীথকার্য্যের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন। লোষ্ট্র বা ধূলিরাশি যেমন অধর্ষণীয় পাষাণখণ্ডে বিধ্বস্ত হয়, তেমনি অসুরগণও প্রাণের কাছে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ প্রাণকে তাহারা পাপবিদ্ধ করিতে পারে নাই।

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসতে এবং হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে, যশ্চৈনমভিদাসতি ; স এষোঽশ্মাখণঃ ॥ ১৮॥৮

অধর্ষণীয় পাষাণে যেমন সব চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, প্রাণোপাসকের প্রতি যে কেহই পাপাচরণ করে, আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সে নিজেই বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, কেননা প্রাণবিৎ ব্যক্তি আখণ—অর্থাৎ পাষাণের ন্যায় বজ্রদৃঢ় হইয়াছেন। তাঁহাকে কেহই অভিভব করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণোপাসক পাষাণের ন্যায় দৃঢ়।

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষঃ, তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। ১৯॥৯

—মানুষ এই মুখ্য প্রাণ দ্বারা ভাল বা মন্দ কোন কোন গন্ধই অনুভব করে না। যেহেতু প্রাণ অপহতপাপ্মা অর্থাৎ অভিমানাদি শূন্য। সেই প্রাণ দ্বারা মানুষ যাহা ভোজন করে, যাহা পান করে, তাহা দ্বারা অপরাপর প্রাণসমূহও (অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি করণবর্গ।) পরিপুষ্ট হয়। অতএব মুখ্যপ্রাণ বিশুদ্ধ।

অভিমানেই মানুষকে পাপে লিপ্ত করে। আর মানুষ নিরভিমানী হইতে পারে একমাত্র প্রাণোপাসনায়। কেননা প্রাণের প্রলোভন নাই—অভিমান নাই, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত প্রাণ আত্মম্ভরী নয় অর্থাৎ নিজের কল্যাণ লাভেই আসক্ত নয়, প্রাণ সর্ব্বম্ভর, সকলকে পরিপোষণ করে—অতএব প্রাণ বিশুদ্ধ এবং অনভিভাব্য।

প্রাণবিৎ প্রাণাত্মভূত হওয়ায় অধর্ষণীয়। তাহাকে বাহিরের জগতের কোন শত্রু তো বিধ্বস্ত করিতে পারেই না—এমন কি নিজের অভ্যন্তরস্থিত কোন ইন্দ্রিয়ও পাপ-বিদ্ধ করিতে পারে না। প্রাণবিৎকে যে হিংসা করে, আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সে নিজেই বিধ্বস্ত হয়। অতএব ভিতর এবং বাহিরের অসুরদের পরাজিত করিতে হইলেই প্রাণোপাসনার প্রয়োজন।

প্রাণোপাসনাই জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ।

নব-দৃষ্টি

—*—

জীবন-বেলায় জ্বলছে কত
মিটি মিটি সাঁঝের বাতি,
দরিয়াতে হায় কাটছে আমার
একাই বসে আঁধার রাতি।

এই জীবনের তটের কাছে
আসছে যাদের মোহন হাসি—
একটু হেসে বারে বারে
বলছে তোমায় ভালোই বাসি!

ফিরিয়ে তরী তাদের দিকে
যখনি চাই আশার জ্যোতিঃ,
যায় মিলিয়ে কোথায় যে হায়
খদ্যোতিকার চটুল গতি!

চোখ বুজে তাই আপন বুকে
খুঁজতে বসি জ্যোতির লেখা—
আঁধার মাঝে ফুটল ক্রমে
সূক্ষ্ম হেথা আলোর রেখা।

কর্‌ল উজল আকাশ ভুবন
আলোয় আলোয় যায় যে ছেয়ে—
তাকিয়ে দেখি সবাই সেথা
নিতুই আমার আনন চেয়ে।

দরদী

—*—

মুখ ফুটে না বল্‌লেও, মানুষ অজস্র সুখ-দুঃখ-বেদনার আঘাত নীরবে সহ্য করে চলে। কেউ জড় নয়—প্রাণহীন নয়। বরঞ্চ যাদের চুপ করে থাক্‌তে দেখিস্‌, তাদের সমস্যা আরও জটিল—এক এক সময় তাদের ভিতর কি যে তোলাপাড়া চলে, বলবার নয়! সে প্রায়ই জিতেনের কথা বল্‌ত। ছেলেটা ভারী দুষ্টু, পেটের দরুণ চুরী কর্‌তে পর্য্যন্ত একটুকু ইতঃস্ততঃ করে না, বাজে গল্পে-আমোদে দিন কাটায়—ইত্যাদি।...

কিন্তু জিতেনের সম্বন্ধে আমার মনে আবার উল্টো ধারণা। কেননা জিতেনের অন্তরের ইতিহাসের একটু-আধটু আভাস আমি আমার জ্যেঠতুত ভাইএর কাছ থেকে মাঝে মাঝে পাই। আমার জ্যেঠতুত ভাই মুনীন্দ্র আর জিতেন এক ক্লাশেই পড়ে। ওরা দুজনে আবার বন্ধু। পরস্পর পরস্পরের কাছে মনের কথা খুলে বলে। মুনীন্দ্রের কাছ থেকেই জিতেনের সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জান্‌তে পারি।

বাইর থেকে জিতেনকে একটা কুষ্মাণ্ড, দুর্ম্মুখের মত দেখালেও, তার এই নিষ্ঠুরতার আবরণের মাঝে একটী সতৃষ্ণ সচকিত কোমল প্রাণ রয়েছে। অন্যান্যের মত সে তার প্রাণের পরিচয়টা বাইরে যখন-তখন দেখাতে পারে না। এই জন্যই তার ভাগ্যে 'দুর্ম্মুখ' গালটা একরকম প্রাপ্য বস্তু রূপেই দাঁড়িয়েছে। এমন কি ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত—শচী, টুনি, ফণী ওরাও যখন-তখন বলে উঠে—"ঐ দেখ, দুর্ম্মুখ চল্‌ছে!"

যাই হোক্‌, এ সমস্তের দরুণ জিতেন কখনও উত্তেজিত বা ক্ষুব্ধ হয় না।

সেদিনকার একটা ঘটনাই উল্লেখ কর্‌ছি। রাত্রে আমরা সবাই খেতে বসেছি (সেদিন আবার একটু বিশেষ আয়োজন ছিল), হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি, মুনীন্দ্রের থালা এমনি পড়ে আছে কিন্তু মুনীন্দ্র আসেনি। কি হয়েছে মুনীন্দ্রের, কি হয়েছে—এই বলে সবাই ব্যস্ত হয়ে গিয়ে দেখে, মুনীন্দ্র পড়ার ঘরে তার পড়ার টেবিলের উপর আলোটাকে 'ডীম্‌' করে রেখে, নাকে-মুখে কাপড় দিয়ে শুয়ে আছে! কত ডাকাডাকি—কোন উত্তর নাই। শেষে সবাই বিরক্ত হয়ে এবং আমার উপর ভরসা করে ফিরে চলে এল।

মুনীন্দ্রের আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যার সমাধান আমি ছাড়া আর কেউ কর্‌তে পারে না। আমি মুনীন্দ্রের মনটা অনেকখানি জানি; কোন্‌ সময় কি কারণে তার মন এমন হয়ে যায়, তা আমার জানা। তার উপর সে আমার কাছে সব কথাই খুলে বলে। কাজেই আমি যে দিন বাড়ীতে থাকি, আর মুনীন্দ্রের কোন রাগ-রঙ্গ হয়, তাহলে বাড়ীর কেউ বড় একটা চিন্তা-ভাবনাই করে না;

কেননা সবাই জানে, ভূপেন্ যখন বাড়ীতে আছে তখন মুনীন্দ্রের এই রাগ-রঙ্গ ভাঙ্গতেও বেশী সময় লাগবে না!

যাক্, আমি তো তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে মুনীন্দ্রের পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির। আমার গলা-খেঁকার, এবং চটীর শব্দ শুনেই মুনীন্দ্র বুঝ্লে যে এই ভূপেনদা আস্ছে—এবার আর রক্ষা নাই। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে, আমাকে দেখেই একটী বেদনা-মিশ্রিত হাসি হেসে ফেল্লে! আমি সেখানে গিয়েই সব ব্যাপার বুঝে ফেললাম, তাই প্রথমেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ বুঝি জিতেনের সঙ্গে কিছু হয়েছে মুনীন্দ্র? আমার কথা শুনে তার বন্ধুর স্মৃতি মনের মাঝে আরও দ্বিগুণ বেগে জলন্ত হয়ে ফুটে উঠ্ল। নিমেষের মাঝে আবার দেখি, মুনীন্দ্রের চোখ ছল্ ছল্ করছে। বুঝে নিলাম, সে বল্তে চাচ্ছে এবং বলবেও কি হয়েছে, কিন্তু প্রাণের সহানুভূতিসম্পন্ন আবেগ এসে বারবার তার কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে! আমি অম্নি কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম ওর চৌকীর এক পাশে। কতক-ক্ষণ পর, আবেগ কিছুটা প্রশমিত হয়ে এলে মুনীন্দ্র তার বন্ধু জিতেনের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক সপ্তাহ অনাহারের সঙ্কল্পের কথা বল্লে। আজ যে খাওয়ার সময় খেতে যায়নি মুনীন্দ্র —এই তার একমাত্র কারণ!

আস্তে আস্তে আমি মুনিন্দ্রের কাছ থেকে জিতেনের সব খবর নিলাম। মুনীন্দ্র বললে, সেদিন নাকি জিতেন জিহ্বাকে আর সামাল দিতে না পেরে ঠাকুরভোগের দরুণ কড়াতে যে দুধ ছিল, তার মাঝ থেকে সরটুকু তুলে উদরসাৎ করেছে। এর দরুণ তাকে অজস্র গালি এবং অপমানের কথা শুন্তে হচ্ছে। এ সব কথায় তার প্রাণে বড্ড লেগেছে, তাই সে স্বেচ্ছায় এই প্রায়শ্চিত্ত নিয়েছে। মুনীন্দ্র তার বন্ধু কিনা তাই বন্ধুর প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনে তারও মনটা খুব বিচলিত হয়ে উঠেছে।

মুনীন্দ্র বললে, দেখুন ভূপেনদা, আমি আমার বন্ধুর এ সব দোষের কথা জানি; এ সব জানা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—কেন জানেন? তার মাঝে আর একটা ভাল দিকও রয়েছে বলে! সে দোষ করে বটে, কিন্তু তার সংশোধনের দরুণও প্রাণপণ চেষ্টা করে। কাজেই প্রায়শ্চিত্ত তার একটা না একটা লেগেই আছে। আর এ সব ক্ষেত্রে তাকে বাধা দিতে গেলে সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। বলে কি—আমাকে ভাল হতে দিতেও তোমাদের আপত্তি? আমার এত অধঃপতন দেখেও তোমাদের চোখে জল আসে না? বরঞ্চ আমার প্রায়শ্চিত্তে তোমাদের সাহায্য করা প্রয়োজন।

এই সে-দিনের ব্যাপারটা নিয়েই আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে কি, ভাই! কি যে করব ভেবে পাই না, এক এক সময় মনে হয় জিব্‌টা টুকরো টুক্রো করে কেটে ফেলে দিই—আমার এই জিহ্বার দরুণই তো এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। বুঝি

না, ভগবানের কি অদ্ভুত কৃপা না লীলা, অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলো দমন করে রাখ্‌তে হলেই কি একটা প্রবৃত্তিকে এত বাড়িয়ে দিতে হয়? লোভকে সামাল দিতে না পেরে আমি অমন কত কাণ্ডই যে করে ফেলি, তার সংখ্যা নাই—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একটা অনুশোচনার জ্বলুনিতে যেন শরীরটা জ্বলে-পুড়ে যায়। প্রায়শ্চিত্ত করি আমি সাধে—এতে আমার আত্ম সংশোধন হয়!

বুঝ্‌লাম, আজ বলে-কয়ে মুনীন্দ্রকে কিছুতেই খাওয়াতে পারব না—আমিও কিছু-ক্ষণ আলাপ করে তারপর শুতে চলে এলাম!

ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওদের বন্ধুত্বের পবিত্র-বন্ধনের কথাই কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। বাস্তবিক মানুষ মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌লে, তার রূপান্তর না হয়েই পারে না। মুনীন্দ্রের এই অকৃত্রিম ভাল-বাসাকে আমি কত যে মহৎ বলে মনে করি। জিতেনের নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন হবে--তখন তার বন্ধুর সহানুভূতির কথা স্মরণ করেই তো জিতেন মুনীন্দ্রের কাছে একেবারে বাঁধা পড়ে যাবে।

দোষ তো কত জনেই করে, দিবারাত্র আমরাও তো কত অন্যায় করে থাকি, কিন্তু সেই অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে করে তার দরুণ স্বেচ্ছায় কঠোর প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করে কয় জন?

বাড়ীর অভিভাবকরা জিতেনকে দুই চোখে দেখতে পারে না—কেননা সে লোভী, তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, জিতেনের চেয়ে তার অভি-ভাবকরা বেশী কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ও অন্ধ। মানুষের একটা মাত্র দোষ দেখে যারা মানু-ষকে এত ঘৃণা করে, এত অবজ্ঞা করে, তারা কি মানুষ? জিতেনের এই নীরব প্রায়শ্চিত্তের খবর তার অভিভাবকরা কয়জনে রাখেন?

তারপর জিতেন যদি তার দোষ সংশোধন করতে নিশ্চেষ্ট থাকৃত, তাহলেও এক কথা হত—সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কিসে ভাল হতে পারে? এ জায়গায়ও কি তার পূর্ব্ব-কৃত অপরাধকে স্মরণ করেই তার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকৃতে হবে?

বাস্তবিকই তোরা মানুষকে একটা জড়-পিণ্ড বলেই মনে করিস্—হরিশ! মানুষের যে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক—এক স্বভাব যে চিরকালই থাকে না, তা বিশ্বাস করতে যেন তোদের বিবেকে বাধে!

—*—

উৎসবে

—*—

উৎসবে আমাদের বড় উল্লাস—মানে ভোজনা-য়োজনে! এ উৎসবের সার্থকতা কি, অনেকেই প্রশ্ন করে—সঠিক উত্তর দিতে পারি না।

একটা সার্থকতা আছে বটে!—কর্ম্মের জাতিভেদ উৎসবের দিন থাকে কই!

অন্য দিন যার যার কাজে প্রত্যেকে নিমগ্ন, কারো ডালে কেহ কাঠি দিতে যায় না; কিন্তু উৎসবের দিন কর্ম্মের জগন্নাথক্ষেত্র—সেদিন সবাই সবার সহ-কারী, সবাই সব, কেউ বড় কেউ ছোট নয়। সুন্দর একটী উদার ভাবের ব্যাপ্তি সেদিন প্রত্যেকের প্রাণে। এই প্রাণের ঔদার্য্যে ভাবের মহামিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠাতেই উৎসবের সার্থকতা—যদি তা বুঝিতে পারে বা প্রাণে জাগে।

কিন্তু যারা কিছু বুঝিতে পারে না, অন্তর যাহা-দের অন্ধকার, শুধু খাওয়া আর ঘুম লইয়াই দিনটা কাটাইয়া দেয়, তাহারা বলিতে পারে যে উৎসবের সার্থকতা কিছুই নাই। সুখের বিষয়, তাহারা কিছু বলে না—বলিয়া লাভই বা কি? বেশ তো, উৎ-সবের নামে দুদিন মজা লুটিলাম, ক্ষতি কি?

কর্ম্মের জাতিভেদ ব্যাপারটা একটু খুলিয়া বলি।—

কারো জন্য কেহ খড়-কুটাটুকু পর্য্যন্ত এখান হইতে ওখানে সরাইয়া সাহায্য করিবে না—যার যার নির্দ্দিষ্ট কাজ লইয়া দিন কাটাইবে, অপরের দিকে ভ্রমেও ফিরিয়া তাকাইবে না—তাকাইলে জাত্ যাইবে! আমার পাকের পালা, সুতরাং বাটনা বাটিব কেন? অমুকটা তো আমার করিবার কথা নয়, করিব কেন? থাক্ না সব ভাসিয়া—আমার ডিউটীর বাহিরে আমি অন্ধ; বরং পারি তো ফাঁকি দিয়া যদি নিজের কাজটীও পরের উপর বরাত্ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টায় থাকি! অর্থাৎ আমার জাত্‌টী পুরাপুরি রাখিব, কিন্তু পরের জাত্‌টী মারিতে বিন্দুমাত্র কসুর করিব না—কাজ মাটী হয় হউক তবু অপরের সাহায্য করিব না—

ইত্যাকার ভাবগুলিই কর্ম্মের জাতিভেদ। গুণ-কর্ম্মবিভাগ অনুযায়ী এক এক জাতের কাজ এক এক জনের হাতে থাকিবে অবশ্য, তাহা স্বীকার করি—নতুবা সমাজ টিকে না; কিন্তু গোঁড়ামী থাকিবে কেন? স্বার্থপরতা বা পরমতাসহিষ্ণুতার ভাব আসিবে কেন?

উৎসবের দিন এই স্বার্থপরতার ভাবটুকু আমা-দের মধ্য হইতে সরিয়া যায়—তাহা ভোজনানন্দকেই হউক আর ভজনানন্দকেই হউক, যে কোন আনন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া—ইহাই লাভ।

ঠিক এই জন্যই আমাদের মাঝে মাঝে উৎসবাদির ঘনঘটার প্রয়োজন পড়ে। ভাবের সরসতা নিত্য-কৃত্যের প্রখরতায় যখন তখন ঘন ঘন শুকাইয়া উঠিতে দেখি, সবাই তখন উৎসবকে প্রাণে প্রাণে চায়।

কথা হইল এই যে, এইটুকু বুঝিয়া করা চাই। শুধু অবুঝ্ প্রাণে খাওয়া-পরার ব্যসনে মাতিয়া থাকাই যদি উৎসব না হয়, তবে তেমন উৎসব রোজই একটা করিয়া হউক না কেন, কে তাহা না চায়?

শুধু ভাবের সরসতার অভাবেই সংঘ দুর্ব্বল হয়। উৎসব যদি মাঝে মাঝে সে ক্ষেত্রে আসিয়া উপলক্ষ্য সহায়ে চরম-লক্ষ্যকেও স্মরণ করাইয়া দিয়া যায় তো মন্দ কি? তবে কিনা, বিনা-উপলক্ষ্যেই লক্ষ্যকে

উজ্জ্বলরূপে চিত্তে জাগ্রত রাখিবার ক্ষমতাই সাধকের পক্ষে পৌরুষের এবং গৌরবের কথা! উৎসবের যে জাগরণ, বাহির হইতে বিচার করিয়া দেখিলে উহা প্রকৃতির দিক হইতে একটা সাময়িক ধাক্কা মাত্র; পৌরুষের তাহাতে বাহাদুরী কি? ঠেলিয়া তুলিলে তো সবাই উঠে; ভিতর হইতে ঠেলা জাগানোটাই না পৌরুষ!

উৎসব সম্বন্ধে এই সার্থকতার কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে। তা ছাড়া উৎসব পরীক্ষাও বটে! গুণাতীতে প্রতিষ্ঠ হইতে না পারিলে উৎসবের অবশ্যম্ভাবী বিপুল রজঃবিক্ষোভকে স্বচ্ছন্দে জীর্ণ করা যায় না। উৎসবে যদি ভাব টলিয়া গেল তো সবই বৃথা!

উৎসব হইল ঊর্দ্ধদিকে প্রয়াণ।—আমাদের অন্তর-বাহির সব সেদিন ঊর্দ্ধমুখী হইবে। এই লোকের সমস্ত দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়াও সেদিন ঐ লোকের অধিকারী হইলাম—ঊর্দ্ধে অধঃ সর্ব্বত্র জীবন সমব্যাপ্ত হইল। সেদিন ছোট বড়র মান-অভিমান বাছ-বিচার থাকিবে না—মহতো মহীয়ান্ অথচ অণোরণীয়ান্ উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হইব—ইহাই উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

কর্ম্মের সংসারকে বাদ দিয়া বা বয়কট করিয়া আপন ভাবলোকে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া থাকিবার অকালোচিত আবেগ সাধকজীবনের একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্ত ধারণা। যখন সে অনুভূতি আসিবে, তখন যা খুসী করিও—কিন্তু তেমন ভাব কয়জনের জাগে? অনেক ক্ষেত্রেই এই বয়কট্ করার বুদ্ধি একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। এই বিবিক্তসেবিত্ব বনাম একদেশদর্শিত্ব জীবনে কদাচ প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু প্রবর্ত্ত জীবনের আদর্শ উহা কখনই হইতে পারে না।

প্রবর্ত্ত জীবনের আদর্শ হইবে সর্ব্বসমন্বয়ী। কর্ম্মক্ষেত্রের ভাবক্ষেত্রের সমস্ত বিভাগকে সমান উজ্জ্বল আনন্দে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেদিন যেমনি ভোজনানন্দে, তেমনি ভজনানন্দে—এই অদীনসত্ত্ব উদার সুসমঞ্জস সমন্বয়ী ভাবের অনুভবকেই আমরা উৎসবের প্রাণ বলি!

যার ভিতর সে উৎসব প্রত্যহ বিনা উপকরণেই হইতেছে, তার আরো উন্নততর আদর্শ। কিন্তু আমাদের পক্ষে এইটুকু হওয়া চাই যে, বাহিরের নিমিত্ত যেন আমাদের অন্তরের খাঁটা উদ্দেশ্যকে জাগাইয়া তোলে—উৎসবে যেন আমাদের প্রাণ জাগে, ভাব জগতে কর্ম্মজগতে পরস্পর মিলিত হইতে পারি—মিলনানন্দই যেন উৎসবের উদ্দেশ্য হয়।

—*—

আরণ্যক

—*—

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিতা

লোকহিত-অভিমান পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হে সন্ন্যাসী, তোমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন কি? তুমি তো কিছুই চাও না!

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবনং।
কালমেব প্রতীক্ষেঽহং নিদেশং ভৃতকং যথা॥

—এই হচ্ছে জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

* * *

সম্যক্ সিদ্ধ ও পরিপূর্ণ মানব কে?—শ্রীকৃষ্ণ।

* * *

জীবনের আদর্শ কি?—আমি কে, তা পূর্ণরূপে অনুভব।

* * *

ভেদ জন্মে কখন? যখন বিকৃতিই একমাত্র প্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হয়। আসল ঢাকা পড়ে।

* * *

আত্মদান করতে হবে বলেই যে কারু স্বাতন্ত্র্য পর্য্যুদস্ত হবে, এমন কোন কথা নাই। সবার সম্বন্ধে সবাই নিরপেক্ষ নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও এমন এক মহাশক্তির প্রভাব সকলকে মধুর আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ করে রাখবে, যেখানে স্বাধীনতা অধীনতা নিয়ে বিচার-বিতর্কের বালাই না থাকে। সবাই স্বাধীন অথচ কেউ বানচাল নয়, এমনিতর সুসমঞ্জস ভাব কোন্ ক্ষেত্রে সম্ভব? যে ক্ষেত্রে Organisation-power এর অন্তর্মুখীনতা আছে, সেই রাজত্বে!

* * *

যখন হীন হয়ে থাকি, কাজের দোষেই থাকি; যারাই বড় হয়েছে, কাজ তাদের একনিষ্ঠ জীবন-ব্রত ছিল। কাজকে ভাবের বিরোধী যারা মনে করে, তাদের সঙ্গে তর্ক করিতে চাই না। মুখে যে যাই বলুক, কাজের বশ সকলেই। যাঁরাই বড় তাঁরাই সমন্বয়ী; কাউকে বাড়িয়ে কাউকে খুঁড়িয়ে কেউ কখনো মহৎপদ পায়নি।

* * *

আমার চিত্ত যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়, তখন কাজের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেই আমার প্রাণ জুড়োয়।

* * *

ভাব করব বল্লেই ভাব করা যায় না—অলস ভীরু দুশ্চেষ্টা আর ভাবের ঘরে চুরীই বাড়ে। আর কাজের মাঝে তলিয়ে থাকলে ভাব আপনি এসে বরণ করে; কিন্তু সে কাজ প্রাণের দায়ে নয়, প্রেমের দায়ে।

* * *

—*—

[মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম]

দানপ্রাপ্তি

—*—

(আশ্রম-সেবকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণ হইতে সংগৃহীত)

(১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩৭ সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত)

(ভাগলপুর—বিহার)

শ্রীযুক্ত—মিঃ ডি, এন্ সিংহ ১০৲, এক্‌জিঃ ইঞ্জিঃ এস্, কে, রায় ৫৲, এস্, ডি, ও, এ, কে, ৫৲, বনেলি রাজ ৫৲, জমিদার তারক নাথ ঘোষ ৪৲, কুমার অমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৪৲, গঙ্গারাম শর্ম্মা ৪৲, গোবিন্দ রাম মতিলাল ৪৲।

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—মহাবীর শর্ম্মা, গণপৎ রায় দেবী প্রসাদ, জমিদার নরেশ মোহন ঠাকুর, কুঞ্জ লাল, উকিল দেবতাচরণ মুখার্জ্জি, সব্‌জজ রমেশচন্দ্র মিত্র, ইঞ্জিনিয়ার নন্দকেও লিয়ার, জমিদার ঠাকুরদাস গুপ্ত, জেইলার উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, হেড্‌মাষ্টার খগেন্দ্রকুমার চাটার্জ্জি, মাস্থদন ব্রাদার্স।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—ডিপুটী মাঃ শিবনন্দন প্রসাদ, মুন্‌সেফ্ ভুবন মোহন লাহিড়ী, ম্যানেজার অনন্ত প্রসাদ, ডিপুটী মাঃ, দামোদর মিত্র, মুন্‌সেফ্ কমলা প্রসাদ, রায় বাহাদুর শুকরাজ রায়, হেড্ মাষ্টার স্থরেন্দ্র নাথ বস্থ, শিক্ষক শ্রীশরৎ চন্দ্র বানার্জ্জি, কবিরাজ শ্রুতিনাথ মিত্র, কবিরাজ বিজয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার মুরলীধর সাধু, ডাক্তার কে দাস গুপ্ত, ডাক্তার অমূল্যচরণ ঘোষ, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ডাক্তার ভুবনেশ্বর মুখার্জ্জি, ডাক্তার স্থকুমার মিত্র, ডাক্তার ভোলানাথ মুখার্জ্জি, ডাক্তার ক্ষীরোদকুমার মিত্র, জেইলার স্থকুমার বানার্জ্জি, জেইল ডাক্তার যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, উকিল ভোলানাথ সেন, উকিল স্থধাংশুভূষণ রায়, উকিল ধীরেন্দ্র নাথ সেন, উকিল উদয়নারায়ণ, উকিল ললিত মোহন ঘোষ, উকিল মুক্তেশ্বরী প্রসাদ, উকিল আশুতোষ দে, উকিল বিনাশকুমার মিত্র, উকিল সতীশচন্দ্র রায়, প্রফেসর গিরিজাভূষণ মিত্র, প্রফেসর নীলমণি আচার্য্য, প্রফেঃ তারকনাথ বস্থ, প্রফেঃ বীরচন্দ্র সিনা, প্রফেঃ যোগেশচন্দ্র সেন মজুমদার, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মন্মথনাথ দে, বসন্ত কুমার মুখার্জ্জি, বি সরকার, চারুচন্দ্র গুহ, কেদার নাথ গুহ, মধুসূদন দাস, অনুকূলচন্দ্র চাটার্জ্জি, বিনয়কুমার মজুমদার, মতিলাল, নগেন্দ্রনাথ চটার্জ্জি, মদনমোহন প্রসাদ, প্রবোধচন্দ্র বানার্জ্জি, মাধবচরণ, ভুজেন্দ্রমোহন সরকার, বিভাষচরণ পাল, অরুণ চন্দ্র চাটার্জ্জি, নারায়ণ দাস, কেদার নাথ সিংহ, গোবর্দ্ধন, যতীন্দ্রমোহন সরকার, কালীপদ বাক্‌চি, সারদাপ্রসাদ মিশ্র, ধীরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, এস্, সি বানার্জ্জি, মথুরাপ্রসাদ, বি-এম্ বর্ম্মা, নারায়ণদাস মুখার্জ্জি, কৃষ্ণভাবিনী দেবী, স্থনীতিবালা দেবী, ষ্টেট্ হেরম্ব-ভবন, ঘোঘা ষ্টেশন ষ্টাফ্; খুচরা সংগৃহীত—৩৬৲।

(পাটনা—বিহার)

শ্রীযুক্ত ভগবৎপ্রসাদ জোসোয়াল ৫৲, শ্রীযুক্তা স্থমিত্রা দেবী ৩৲।

দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—রায়বাহাদুর স্থরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র গুহ, প্রফেসর কামিনীকুমার গুহ, প্রফেসর রমেশচন্দ্র রায়, মনোরঞ্জন ঘোষ, চুণীলাল রায়, জিতেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ডাক্তার স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিমলাচরণ সেন, ডাক্তার টি, এন, বানার্জ্জি, উকিল বিশ্বেশ্বর দে, অক্ষয়কুমার সেন।

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—প্রফেসর পান্নালাল, প্রফেসর তারাপদ ভট্টাচার্য্য, প্রফেসর দয়াল. প্রফেসর বিশ্বম্ভর দয়াল, প্রফেসর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রফেসর হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, প্রফেসর বাণীভূষণ গাঙ্গুলী, প্রফেসর রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, প্রফেসর রামজি দাসগুপ্ত, প্রফেসর নলিনীকুমার বসু, প্রফেসর বিমানবিহারী মজুমদার, প্রফেসর চারুচন্দ্র সিনা, প্রফেসর ললিতকুমার ঘোষ, প্রফেসর নারায়ণমোহন দে, প্রফেসর নওলকিশোর প্রসাদ, প্রফেসর প্রফেসর জ্ঞানচাঁদ, প্রফেসর চন্দ্রভূষণ রায়, প্রফেসর যমুনাপ্রসাদ, প্রফেসর গুপ্তেশ্বর নাথ, উকিল রামলাল সিনা, উকিল পীতাম্বর মিশ্র. উকিল মিহিরকুমার মুখার্জ্জি, উকিল বিভূতিভূষণ ঘোষ, উকিল নরেন্দ্রনাথ রায়, উকিল নির্ম্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত, উকিল প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, উকিল নলিনাক্ষ ঘোষ, উকিল অচলেন্দ্রনাথ দাস, ডাক্তার সুধীররঞ্জন সেন শর্ম্মা, ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন, ডাক্তার পরেশনাথ চাটার্জ্জি, ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার গোপালচন্দ্র দাস, ডাক্তার এ, কে, গুহ, জেইল ডাক্তার যদুনাথ কর, হেল্থ অফিসার সুশীলকুমার মল্লিক, ডেপুটী বেণীমাধব প্রসাদ, নলিনীরঞ্জন সিনা, জ্যোতিষচন্দ্র মল্লিক, অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্যামাচরণ দে, দেবেশচন্দ্র বিশ্বাস, পি, সেন গুপ্ত, প্রিয়নাথ বসু, হীরালাল দাস, কালীপদ সরকার, প্রমথ বানার্জি, শরচ্চন্দ্র সেন দেব শর্ম্মা, সুরথকুমার বর্ম্মণ, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধাকান্ত দত্ত, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুবোধচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ ঘোষ, কালীচরণ কর্ম্মকার, বিনয়ভূষণ চাটার্জি, পঞ্চানন মুখার্জি, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, রাজেশ্বর সরকার, সুশীলচন্দ্র বানার্জ্জি, ইন্দুভূষণ দত্ত, দুর্গাচরণ দাস, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাখনলাল মল্লিক, গণেশচন্দ্র ঘোষ, কালীদাস সিনা, জহরলাল, হৃদয়রঞ্জন সিনা, জ্যোতিষচন্দ্র বানার্জ্জি, বিনয়েন্দ্র দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, অবিনাশচন্দ্র দে, শ্রীহরি চক্রবর্ত্তী, বসন্তকুমার গুপ্ত, এন, সি, রায়, দেবীপ্রসাদ মুখার্জ্জি, অমূল্যচরণ শূর, গোপালচন্দ্র চাটার্জ্জি, রজনীমোহন ঘোষ. মন্মথনাথ সরকার, বিহারীজি মিশ্র, সাধু মিশ্র, বিল্ববমঙ্গল সাহা, নগেন্দ্রনাথ সেন, অজিতচন্দ্র গাঙ্গুলী, নন্দলাল বসু, সন্তোষকুমার নাথ. ললিতকুমার বসু, এককড়ি মিত্র; খুচরা সংগৃহীত ১৬৲।

(আড়া)

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর হরিহর প্রসাদ সিনা,—৫৲ শ্রীযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার তারাপদ মৈত্র—২৲; শ্রীযুক্ত সিভিল সার্জ্জন তারকনাথ মিত্র—২৲।

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—ডাক্তার এ, সি, মিত্র; উকিল মণীন্দ্রনাথ বানার্জ্জি; উকিল কিশোরীমোহন নাগ, জে সি, মণ্ডল, কমলকুমার বাকচি, হেমেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি হরিচরণ বানার্জ্জি, বি, এন্, চৌধুরী; খুচরা সংগৃহীত—৩৲।

(দানাপুর)

শ্রীযুক্ত এস্. সি, বানার্জ্জি—১৲; শ্রীযুক্ত জি, এন্ চাটার্জ্জি—১৲।

(এলাহাবাদ)

শ্রীযুক্ত এইচ্, পি, ঘোষ ২৲।

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম সংবাদ—শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ অগ্রহায়ণের মধ্যে অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন।

—*—

সমালোচনা

পশুপালন—৫ম বছৰ, ১৮৫২ শক, ১ম ২য় সংখ্যা; সম্পাদক আৰু প্ৰকাশক শ্ৰীকনকচন্দ্ৰ শৰ্ম্মা, জি-বি-ভি-চি, এম্-আৰ্-এ-এচ্ (লণ্ডন); প্ৰাপ্তিস্থান—পোঃ বিহাবাৰী, আসাম; বছেৰেকীয়া বৰঙ্গনি ২৲, প্ৰতি সংখ্যা ৵০।

বহুদিনৰপৰা এখেতৰ লগত ভাববিনিময় কৰি আহিছোঁ। এখেতৰ মুখত ওলোৱা কথাবিলাক আন্তৰিক ভাল পাওঁ। "পশুপালন" অকল পশুপালনৰ দিহা কৰিয়েই হাত সাবটি থকা নাই, দেশৰ আৰু সমাজৰ আন আন বিষয়তো কৰ্ত্তব্য নিৰ্দ্ধাৰণৰ নিমিত্তে আহো পুৰুষাৰ্থ কৰিছে। শিক্ষাবিহীন মানৱ জীৱন পশু জীবন; "পশুপালন" জাতীয়তা আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ অন্তৰ্তম চানেকী ডাঙ্গি ধৰি সমগ্ৰ দেশব্যাপী এই অশিক্ষা কুশিক্ষাৰ প্ৰতিবিধান কৰিব লাগিছে। "পশু পালন"ৰ শিশু পালন, সমাজ-সেৱা, আত্মজীবন-গঠনমূলক প্ৰৱন্ধবিলাক আমাক নথৈ সন্তোষ দিয়ে। গোটেই অসমত এনে উদাৰ জাতীয়-মতাবলম্বী আলোচনী কাকত নাই বুলিলেও বঢ়াই কোৱা নহব। "পশুপালন" পঢ়ি ভাৰতগতপ্ৰাণ কোনো এজন আত্মত্যাগী কৰ্ম্মীৰ এই সুভাষিত আষাৰ সদাই আমাৰ মনত আছে—

"Under present circumstances in India, the magazine is often a kind of peripatetic school, college, and university, all in one. It has a marvellous degree of influence. It carries ideas on the one hand, and offers a means of self expression on the other, and it was an instinctive perception of this educational value that made us so eager about the fate of various papers conducted by our brethren. The same number of a periodical will sometimes combine the lofticst trasendental abstractions on one page with comparatively faltering secular speculations on the next, and in this affords an exact index to the popular mind of the Transition."

"পশুপালন"ত ব্যষ্টি-সমষ্টি উভয়মুখী প্ৰতিভাৰ বিকাশ দেখিছোঁ—নিজৰ কৰ্ত্তব্যপথ দেখুৱাৰ জৰিয়তে জাগতিক কৰ্ত্তব্যসংস্থা-সমাধানৰো সম্যক্ আলোচনা কৰা এই পত্ৰিকাখনিৰ বিশেষত্ব। এ সময়ত আমি ইয়াৰ প্ৰকাশ আৰু মুদ্ৰণ-সৌভাগ্যও লাভ কৰিছিলোঁ। আন্তৰিক সহানুভূতি আৰু হেপাহেৰে এই আবাল্যপৰিচিত সহযাত্ৰীটীৰ নিত্য-নব প্ৰতিভাস্ফুৰণ আৰু দীৰ্ঘজীৱন কামনা কৰোঁ।

—*—

—*—

ভক্ত-সম্মিলনী

[ষোড়শ-বার্ষিক অধিবেশন—১৩৩৭]

আগামী ১১ই, ১২ই, ও ১৩ই পৌষ পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ উক্ত সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্য, ভক্ত এবং আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকগণকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সম্মিলনীকে সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবার জন্য, যাঁহারা সম্মিলনীতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্মিলনীর পূর্ব্ব অধিবেশনাবলীর নিয়মানুযায়ী **৫৲ টাকা হিসাবে আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই** আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে যাঁহাদের টাকা আশ্রমাধ্যক্ষের হস্তগত হইবে না, তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করা সুকঠিন হইবে; এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জন প্রতি ১৲ এক টাকা হিসাবে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে।

সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে তাহা উল্লেখ করিবেন এবং পূর্ব্ববৎ নাম তালিকাভুক্ত করাইবেন। ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য অতিরিক্ত খরচ লাগিবে না। কিন্তু তাহাদের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

মনি-অর্ডারের কূপনে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্ট লিখিত থাকা একান্ত দরকার।

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম চট্টগ্রাম-বিভাগের অন্তর্গত কুমিল্লা জেলার আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কুমিল্লা-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে আশ্রমে যাওয়ার জন্য সব সময়ে মোটরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ, চাঁদপুর ও লাকসাম অতিক্রম করিয়া কুমিল্লা ষ্টেশনে আগমন করা যায়। রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের ভক্তগণ নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম অতিক্রম করিয়া, অথবা ভৈরব ও আখাউড়া অতিক্রম করিয়া কুমিল্লা ষ্টেশনে আসিতে পারিবেন।

ভক্তগণ নিজ নিজ বিছানা-পত্র ও আলো সঙ্গে আনিবেন। অন্য কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

টাকাকড়ি ও পত্র পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ

অধ্যক্ষ—পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম

ময়নামতী, কুমিল্লা



২৩শ বর্ষ — ২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ—১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৪৮ — দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্ষাত্রোপাসনা

—*—

ক্ষত্রং, প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্, প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্, ত্রায়তে হেনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ, প্র ক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥

বৃহদারণ্যক ৫৷৫৷১৩॥

প্রাণোপাসকই ক্ষত্রিয়। ঋষিরা সেই ক্ষত্র-প্রাণকে উপাসনা করিতেন বলিয়াই ক্ষত্রিয়। কাজেই ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, যাঁহারা প্রাণোপাসক—প্রসিদ্ধ প্রাণের উপাসনাই যাঁহাদের জীবনের মূল লক্ষ্য—তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, প্রাণোপাসক—শক্তি-উপাসক!

ক্ষত্রিয় বলিতেই বুঝি শক্তিধর, কেমনা ক্ষত্রিয় শক্তির উপাসনা করিয়াই—প্রাণের উপাসনা করিয়াই ক্ষত্রিয় হইতে পারিয়াছে! প্রাণই ক্ষত্রিয়—প্রাণের

উপাসনা করিয়াই ক্ষাত্র-শক্তিতে জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে! ঋষিরা প্রাণের উপাসনা করিয়াই ক্ষত্র-ঋষি অর্থাৎ ঋষিশ্রেষ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন। অতএব ক্ষাত্র শক্তির—ক্ষাত্র প্রাণেরই উপাসনা কর।

সংগ্রাম-জয়ী বীরই ক্ষত্রিয়। সেই বীর অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র বিজয়ী। তাঁহার কোথায়ও পরাজয় নাই—বশ্যতা স্বীকার নাই! ক্ষাত্রিয়ের কাছে সকল শত্রুর পরাজয়। ক্ষত্রিয়—অধর্ষণীয়; ক্ষাত্র-শক্তির কাছে সমস্ত শক্তিরই পরাভব! কাজেই জাতিকে ক্ষত্র-প্রাণের উপাসনাই করিতে হইবে। জগতের রাজা কে? ক্ষত্রিয়—প্রাণোপাসক!

সাবধান! ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কেহই সংগ্রাম করিতে যাইও না। তাহা হইলে কি দশা প্রাপ্ত হইবে জানিতে চাও? লোষ্ট্র বা ধূলিরাশি যেমন অভেদ্য পাষাণ-খণ্ডে যাইয়া বিধ্বস্ত হয়, তেমনি ক্ষাত্র-শক্তির সংঘর্ষে সকলেরই অভিমান চূরমার হইয়া যাইবে! ক্ষত্রিয়—প্রাণোপাসক, পাষাণের ন্যায় দৃঢ়। তাঁহার অবিচলিত বীর্য্যে জগৎ কম্পমান্!

তোমাদের আজ এই শোচনীয় পরিণাম কেন বলিতে পার? সব আছে তোমাদের—কিন্তু প্রাণ নাই বলিয়া। এক প্রাণ নাই বলিয়াই সব নিষ্প্রভ। তোমারা জীবনের আসল সাধনাকেই ভুলিয়া গিয়াছ! তোমরা আর ক্ষত্রিয় নও—প্রাণোপাসক নও। জীবনের zest কি জান?—ঐ—ঐ ক্ষত্র প্রাণ! হাঁ, ঐ প্রাণ-শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া অদীন প্রাণে প্রাণবন্ত হইয়া যাহারা সত্যকে realise করে,—তাহাদেরই হয় vital realisation!

প্রাণ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলি, শুনিবে? আমাদের দেশের ধারণা, শক্তি উপাসনা আধুনিক! উপনিষদে এক হৈমবতী উমা ছাড়া আর কোথায়ও শক্তির উল্লেখ পাইবে না। কিন্তু দেখিবে—উপনিষদে প্রাণতত্ত্বের ছড়াছড়ি। এই প্রাণই মহাশক্তি। শক্তির উপাসনা ছাড়া কোনো জাতি কোনো fieldএ বড় হইতে পারে নাই। অতএব প্রাণের উপাসনা করিয়া আবার তোমরা ক্ষত্রিয় হও; রাজা হও! প্রাণোপাসক ক্ষত্রিয়—রাজাধিরাজ!

উপনিষদের চিন্তাধারা মানবজাতির আদি bolshevism, তাহার মাঝে শক্তির কথা নাই—ইহা অসম্ভব। শক্তিতত্ত্বের দুইটী aspect দেখানো হইয়াছে উপনিষদে—একটী তাহার passive রূপ, তাহার মাধুর্য্য—সেইখানে ঋষি আনন্দের কথা বলিতেছেন; আর একটী তাহার active রূপ, তাহার ঐশ্বর্য্য—সেইখানে ঋষি—প্রাণের কথা, ক্ষত্র প্রাণের কথাই বলিয়াছেন।

শক্তির কথা নাই বটে, কিন্তু সমস্ত উপনিষদ ও বেদ জুড়িয়া ঐ প্রাণ ও আনন্দের ছড়াছড়ি। একমাত্র প্রাণই অপরের মাঝে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইতে পারে ;—আনন্দও তাই। সুতরাং realisation ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন্ত হইবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাকি তাহাতে সঞ্চরণ ক্ষমতা না জন্মিবে। প্রাণ এই উত্তাপ, এই radiating power। প্রাণবস্তু উপলব্ধিই অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির প্রকাশ—That is vital realisation. বিপুল প্রাণে স্পন্দিত হও—মৃত্যুর সমুদ্রে প্রাণের সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা কর—Throb with life, with energy, with vitality !

এই উপনিষদের প্রাণ-তত্ত্বের development তন্ত্রে—আর আনন্দতত্ত্বের development বৈষ্ণব ধর্ম্মে। বাঙ্গালী জাত-তান্ত্রিক, জাত-বৈষ্ণব! অতএব বাঙ্গালীই পরিপূর্ণ প্রাণের সাধক ছিল। আজও বাঙ্গালীর প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ ভারতবর্ষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। তবুও সেই বাঙ্গালী আজ দুর্ব্বল—প্রাণ-হীন ; শুধু মাধুর্য্যের উপাসনাতেই এলাইয়া পড়িয়াছে। শক্তির মাধুর্য্যরূপের চরম পরিণতি হইয়া গিয়াছে বাঙ্গালীর জীবনে। তার প্রমাণ মহাপ্রভুর জীবন। আবার চাই ক্ষাত্রসাধনা—প্রাণের সাধনা—শক্তির সাধনা! ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সমন্বয় হইলে তবে না পূর্ণ জীবন। এই পূর্ণ-জীবনের আশায় আবার ক্ষাত্র-প্রাণের উপাসনায় তোমরা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠ। মহাপ্রাণে আন্দোলিত হও—অশ্মাখন হও !

প্রাণময় হইয়া যাও—অসীম তরঙ্গে, অনন্ত বীর্য্যে, অনন্ত মাধুর্য্যে জগতের বুকে হিল্লোলিত হইয়া উঠ। আবার জাতির মাঝে ক্ষাত্রোপাসনায় প্রবর্ত্তন কর ! ক্ষত্রিয় ঋষির আবার জন্ম হউক। এই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া তোমরা প্রাণত্যাগ কর, দেখিবে প্রাণের অজস্র শক্তি নিয়া আবার জাতির মাঝে শক্তিধর মানবরূপে তোমাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে।

ক্ষাত্রোপাসনায় সিদ্ধ-সাধকের আবার ভয় কিসের ? তাহাকেই যে সমস্ত জগৎ ভয় করে ! যাহারা প্রাণের এই ক্ষত্রত্ব জানে, তাহারা যে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। তাহাদের বিনাশ নাই। বিশ্বাসের বিদ্যুন্ময় বীর্য্যে আবার তাহাদের নবজন্ম লাভ হইবে ! তোমাদের নবজন্ম হউক—তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া আবার ফিরিয়া আস। দুর্ব্বল হইয়া বাঁচিয়া থাকাতে কোন লাভ নাই ! শক্তি-উপাসকের পক্ষে জাতির কলঙ্ক রটনা করিয়া মরা—অপমৃত্যুরই সমান।

সমস্ত জগতের আদর্শ হইল ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়কে—প্রাণোপাসককে সকলেই ভয় করে। ক্ষত্রিয়ের অখণ্ড প্রতাপ। তাহাকে ধ্বংস করিতে যাইয়া, আক্রমণ করিতে যাইয়া, সকলই বিধ্বস্ত হয়। এই দেহকে ক্ষয় বা হিংসা হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে কে?—এই প্রাণ! কাজেই প্রাণই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

সংগ্রাম জয় করিতে চাও—ক্ষাত্র-শক্তির উদ্বোধন কর, অর্থাৎ অথর্ব্য প্রাণকে জাগাইয়া তোল। প্রাণই অক্ষত-বীর্য্যের উপাদান। এই প্রাণকে আয়ত্ত কর—দেখিবে, সমস্ত জগৎ তোমার করায়ত্ত! কাজেই বিজয়লাভের মূলই হইল ক্ষত্র-প্রাণের উপাসনা! সেই উপাসনায় সিদ্ধ হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়—কেননা কাহারও প্রাণ মরে নাই, তবে সাধনার অভাবে সেই প্রাণ-শক্তি স্তিমিত হইয়া আছে। একবার প্রাণকে জাগাইয়া তোল, দেখিবে তুমিও বিক্রম কেশরী, তোমার মাঝেও কোথা হইতে অজস্র শক্তির মত্ততা আসিয়াছে। তখন তোমার কাছে অগ্রসর হওয়ার সাহসই যে কাহারো থাকিবে না।

কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল না, কিন্তু জাতির মেরুদণ্ডে যে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে বিদূরিত করিতেই হইবে। তাহা না হইলে দুর্ব্বল বীর্য্য হইতে দুর্ব্বলেরই কেবল জন্ম হইবে! ঋষিজীবন বলিতে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের দুই-এর সমাবেশ হওয়া চাই। কাজেই কেবল শক্তির বিকাশই চাই না—তোমরা শক্তিধর হও, আবার উপনিষদের যুগের ঋষিদের মত শান্ত-সমাহিতও হও!

তোমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ—কাজেই মাধুর্য্যের সাধনাকে আপাততঃ মুলতুবীই রাখিতে হইবে। আগে শক্তি সঞ্চয় কর, তাহার পর উপভোগ করিও। এখন উপভোগের সময় নয়—প্রাণ দিবার সময়। আস্বাদনের জীবন পরে আপনি ফিরিয়া আসিবে। ক্ষত্রিয় হও, সমন্বয় তখন আপনিই হইয়া যাইবে!

সমগ্র জাতিকে আজ ক্ষাত্র-মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হইবে। সেই মন্ত্র কি—"না আমরা পাষাণ, অধর্ষণীয়। আমাদের ক্ষয় নাই—প্রাণই আমাদের পরিপোষক।" আগে নিজে উদ্বুদ্ধ হও—তাহার পর অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। সমগ্র জাতিটা ক্ষত্রিয় হইয়া যাউক, দেখিবে তখন অপ্রাপ্য কিম্বা দুঃসাধ্য কিছু থাকে কি না!

তান্ত্রিক হও—ক্ষত্রিয় হও, ইহাতেই একদিন মুক্তি করায়ত্ত হইবে। মাধুর্য্যের সাধনার সময় এখনো আসে নাই। আগে জাতিকে দুর্ব্বলতা হইতে বাঁচাইয়া তোল! প্রাণপ্রতিষ্ঠা হউক! প্রত্যেকের ভিতরই বলিষ্ঠ প্রাণের উদ্বোধন

হউক! কেহ যেন দুর্ব্বল না থাকে—শক্তির তরঙ্গ যেন প্রত্যেকের বুকেই অদম্য আবেগ জাগাইয়া তোলে!

প্রাণোপাসনা করিয়াই জাতি ক্ষত্রিয় হয়—শক্তিধর হয়। সেই প্রাণোপাসনার অচলনেই আমাদের এই দুর্গতি। এখন যে আমরা শক্তির উপাসনা করি—তাহাতে শক্তির মাধুরী-রূপেরই পূজা। ইহাতে সেই সুরথ রাজার মত বুকের রক্ত তোলপাড় হইয়া উঠে কই? আত্মদানের ক্ষমতা জাগে কই? কাজেই বুঝিতে হইবে, মূল ছাড়িয়া আমরা স্থূলে মত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আবার আমাদের মূলেই পৌঁছিতে হইবে!

সেই মূল কি?—না, মুখ্য প্রাণ! ক্ষত্রিয় সেই ক্ষত্র-প্রাণকেই লাভ করে। সেই ক্ষাত্র প্রাণকেই আবার বলা হইয়াছে অত্রং। অত্র কি? না, "ন ত্রায়তেঽন্যেন কেনচিদিত্যত্রম্।" আত্মরক্ষার জন্য আর কাহারো অপেক্ষা করে না, তাহার নাম—অত্র। প্রাণই সেই অত্র—ক্ষত্র, কাজেই প্রাণোপাসকেরও আর কোন অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। ক্ষত্রিয় নির্ভীক—বীর সাধক!

বাহুতে শক্তি আসিবে, প্রাণে বল আসিবে এই ক্ষাত্রোপাসনায়। সাধককে বলের দরুণ দুর্ব্বলের মত অপরের মুখ পানে চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

ঋষিদের মাঝেই দুই বিভাগ—এক ক্ষত্রিয়, আর এক ব্রাহ্মণ। শক্তির অমিত বীর্য্যে ক্ষত্রিয়-ঋষিরা এক একটী আগুনের হল্‌কা। আবার সেই শক্তিকে হজম করিয়াই উপনিষদের শান্তি-উপাসক ঋষি! তাঁহাদের শক্তি ছিল, কিন্তু সেই শক্তিকে হজম করিয়া তাঁহারা আনন্দে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন! আনন্দ করিতে হইলেও শক্তি চাই! কাজেই ক্ষত্র-প্রাণের উপাসনাই হইল মূল! তোমরা আগে ক্ষত্রিয় হও—তাহার পর আনন্দের দিন আপনি আসিবে!

চরথ—চরথ!

—(*)—

অতৃপ্তি আছে বলিয়াই মানুষ বড় হইতে পারিয়াছে। এই অতৃপ্তিই মানুষকে উর্দ্ধপথে পরিচালিত করিতেছে। কাজেই জীবনের মাঝে যদি কোন সময় অতৃপ্তি আসে, তাহা হইলে বুঝিবে এই তোমার সুদিন আসিয়াছে, তৌষ্টিকতার মোহ তোমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এবার তোমার ক্রমোন্নতির পালা।

সবারই তৃপ্তি হয়, হয় না শুধু মানুষের। বাস্তবিকই তাহার আভাবও যে কি বিরাট, তাহা কল্পনাতীত! এত পায়, তবু মানুষের তৃপ্তি আসে

না। তাহার ভিতরে যেন অভাবের জ্বালা লাগিয়াই আছে। কি মহৎ সঙ্কল্পের প্রেরণায়ই না মানুষ অমন অতৃপ্ত চিরকাল!

এই অভাব কিসের—কেন মানুষ অল্পে তৃপ্ত হইতে পারিল না. "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখম্ অস্তি"—এই বাণী মানুষের প্রাণ হইতে কেন বাহির হইল? এই অতৃপ্তির মূল নিদান কি?

অভাব-বোধ বিরাট আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অহরহ আমরা কেবল সেই অনুসন্ধানেই ব্যস্ত—কি করিয়া সেই বিরাটত্বের সন্ধান পাই। কত কিছু পাইতেছি, কত কিছু ভোগ করিতেছি, কিন্তু ভোগ করিয়া, হাতের মুঠোর সব পাইয়াও অন্তরের সেই অভাব মিটিল না!

ভোগ আর ত্যাগ এই অভিনয় চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মানুষ মনে করে, ইহাতেই বুঝি তাহার আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণ হইবে—তাই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে; কিন্তু দুদিনের পর যখন তাতেও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না, তখনই ভোগের বস্তুও বিতৃষ্ণার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিকই কি সুন্দর অভিনয়! মানুষ যে কি চায়, কেন এই অনির্ব্বাণ আকুলতা, প্রতি কাজে প্রতি চিন্তায় কাহাকে যে সে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা বোধ হয় মানুষের হৃদয় ছাড়া আর কাহারও বলিবার বা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।

মানুষ কোন দিন এই কথা বলিতে পারিল না যে—"আর আমার কোন কিছু লাগে না।" "আরো" "আরো" এই হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রাণের বাণী। মানুষ যাহা মনে প্রাণে চাহিতেছে তাহা যেন অসীম অনন্ত, তাই মানুষের চাওয়ার পাওয়ার আজও ইতি হইল না! একটা অভাব মিটিবার সঙ্গে সঙ্গেই শত শত অভাবের সৃষ্টি হয়, আবার সে পাগল হয়, সচেষ্ট হয়। এই ভাবে স্থিতি আর এই গতি মানুষের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ এত পায়, পাইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই! জানার, পাওয়ার কোন কিছুরই শেষ নাই। মানুষ মিথ্যা অভিমান করিয়া বলে, আমি সব জানিয়াছি; আর আমার কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই। এই যদি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে তৌষ্টিকতা পাইয়া বসিয়াছে; তাই পথের মাঝেই সে বিশ্রামাগার তৈরী করিতে চায়।

জগতে নিজকে আস্বাদন করিবার বিচিত্র পথ রচিয়াছে। এক পথই চরম নয়। অনাদি কাল হইতে যে নব নব সৃষ্টির লীলা চলিয়া আসিয়াছে, ইহার কারণও তাহাই। অর্থাৎ দ্রষ্টা নিজকে আস্বাদন করিবার বিচিত্র উপায় অবলম্বন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মাঝে বিচিত্র অনুভূতির অতৃপ্ত ইঙ্গিত আসিয়া সাড়া দেয়। তিনি আপন মনে তখন বলিতে থাকেন, না, ইহাতেও তো হইল না, আবার নূতন সৃষ্টি চাই। এই ভাবে ভাঙ্গা-গড়ায় এক বিচিত্র লীলা অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে।

বিচিত্র উপায়ই রহিয়াছে—প্রকাশের অবধি নাই। এক এক ধরণের প্রকাশে, এক এক রকম অনুভূতি—তাই অনুভূতিরও বৈচিত্র্য আছে। মানুষ যে তৃপ্ত হইতে পারিল না, তাহার কারণ মানুষের মাঝে "অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়" এই কামনার বীজ উপ্ত! মানুষ চায় নিজকেই বৈচিত্র্যের মাঝে অনুভব করিতে—পাইতে!

আত্মা বাস করেন অবশ্য এই ক্ষুদ্র দেহটীতেই—কিন্তু তাহার ব্যাপ্তি, বিরাট্ মহিমজ্ঞান এই ক্ষুদ্র দেহের মাঝে অবরুদ্ধ নয়। দেহের সংস্কার ভুলিয়া মানুষ নিজকে অনন্তের মাঝেও ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারে। বিরাট্ অনুভবের উজ্জ্বল স্মৃতি মানুষের মনে আছে বলিয়াই—এই দেহকে অতিক্রম করিয়া আবার শেষে বিরাট্ অনুভবে নিজকে সঁপিয়া

দিবার দরুণ মানুষের এত আকুলতা। মানুষ যে এতটুকু নয়, তাহার জীবনের ব্যাপ্তির যে শেষ নাই। সাধে কি মানুষের এত আকুলতা, এত আকুলি-বিকুলি ?

চিত্ত স্থির হইলে বৈচিত্র্যের আভাস আরও উজ্জ্বল হইয়াই ফুটিয়া উঠে। কাজেই মানুষ যখন শান্ত হয়, স্তব্ধ হয়, তখন তাহার বুকে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেরই সাড়া পড়িয়া যায়। তখন তাহার দেখারও বিরাম নাই, অনুভবেরও বিরাম নাই—কেবল উৎসব হইতে উৎসবে প্রয়াণ !

স্থির চিত্তে উত্তেজনা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় বটে, কিন্তু নব নব উদ্দীপনায় বিদ্যুৎ চমকাইয়া বুকের মাঝে উজ্জ্বলানুভূতির রেখা ফুটাইয়া তোলে। কাজেই যতই উচ্চাবস্থা লাভ হউক না কেন, কোথায়ও শেষ নাই। কেবল নূতন নূতন অনুভূতি, নূতন নূতন জগতের অব্যক্ত রহস্যের সন্ধানই মিলিতে থাকে !

যে বলে আর কিছু জানিবার নাই, তাহার ইচ্ছাই বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে—যা কিছু জানিতে পারিয়াছে, তাহারই ক্লান্তিতে তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। কাজেই তাহার পক্ষে একটুখানি ঘুমই—তৌষ্টিকতাই অতীব প্রিয় ! ক্লান্ত বলিয়াই তাহার মুখ হইতে অমন কথা বাহির হইয়াছে। ক্লান্তি অপনোদন হইলে তখন আবার সেই বলিবে, কৈ এখনো তো কিছু পাওয়া হয় নাই—অনন্ত জগতে প্রাপ্যও অনন্ত। কে বলে, ইহার কোথায়ও শেষ আছে ?

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেহই কোথাও বসিয়া নাই, সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়াই অনন্ত যাত্রী সেই অনন্তের উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়া চলিয়াছে। চলাতেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য এবং এই চলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিত্বের নব নব প্রকাশ। আমরা যখন মনে করি, এই আমাদের ভ্রমণ শেষ, অমনি আমাদের চিরমুক্ত জীবনের আস্বাদনও শেষ। না চলিলে জীবন এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়া ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। একটা চলতি কথা আছে যে রমতা সাধু, আর বহতি নদী, দুই-ই পবিত্র থাকে। ইহার কারণ কি না তাহারা বলে—অবিরাম তাহাদের গতি। কোথাও তাহাদের মায়া নাই, চলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মুক্তির আস্বাদন !

চলিতে হইবে উদ্দীপনা নিয়া, সমাহিত হইয়া। কাজেই গতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভবেরও ঐক্য হইয়া যাইবে। মায়া বলিতে সবই বুঝিতে হইবে। সম্প্রদায়ের মায়া কি মায়া নয় ? নিজকে চিহ্নিত করিলেই বিরাট মহিমাকে খর্ব্ব করা হয়। নির্ম্মল গগনোপম হইয়া অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত পবিত্র আত্মসত্য-অনুভব নিয়া বিচরণ করিতে হইবে। "চরথ—চরথ" এই হইতেছে ভিক্ষুদের প্রতি উপদেশ। কিন্তু এই বিচরণের মাঝে আত্ম কেন্দ্রেও অটল থাকিতে হইবে। কাজেই বুদ্ধদেব আবার এই কথাটীই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন "অপ্‌পমাদেন বিহর"—বিচরণ কর, কিন্তু অপ্রমত্ত হইয়া বিচরণ করিতে হইবে ! চলার মাঝেই প্রাণ, চলার মাঝেই আবেগ, কাজেই "চরথ—চরথ !" মানুষ অপবিত্র কখন ? যখন কেবল মাত্র তাহারই সঞ্চিত ধন নিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় ; যোগাযোগের সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেই মরণ আর কি ! আর মানুষ যে এক মুহূর্ত্তের দরুণও বাঁচিতে পারে না যোগাযোগের সূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ; শ্বাসকে প্রথম গ্রহণ করিয়া আবার শ্বাসকে অনন্ত প্রাণ দ্বারা শোধিত করিয়া না নিলে কি মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইত ? বিচ্ছিন্ন হইয়া, যোগাযোগ ছাড়িয়া যে মানুষ বাঁচিতেই অক্ষম !

"চরৎ" বলিতে শুধু পদব্রজে বিচরণকেই বুঝায় না—দেহ-মন প্রাণ সবকেই বিচরণ করিতে দিতে হইবে; মন যদি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মন আর ব্রহ্মানুভবের মহিমায় প্রদীপ্ত হইবে না কখনো। কাজেই মন অপবিত্র হইয়া যাইবে—অবিশুদ্ধ হইয়া যাইবে! মনের মাঝে যত ময়লা জমে, তাহা শোধন হইয়া যায় ব্রহ্মানুভূতির যোগাযোগ দ্বারা; কাজেই মন যদি অচল হইল, ব্রহ্মানুভূতির আকুলতায় যদি ব্যাকুল হইয়া না উঠিল, তাহা হইলে তো মনের মাঝে কেবল ময়লা—পাপই জমিতে থাকিবে; কাজেই "চরৎ" বলিতে—সকল সংস্কার রহিত হইয়া বিচরণকেই বুঝায়।

অবাধ-মুক্তি ঘোষণা করিয়া দিতে হইবে; কাহারও বন্ধন নাই—এই কথা সকলকেই শুনাইতে হইবে। বন্ধন নাই কেন বলিতেছি? তাহার কারণ সকলেরই গতি আছে—প্রাণ আছে! এই গতির মাঝেই শোধনের মন্ত্র গুপ্ত; গতিতে কাহারও ময়লা জমাট বাঁধিয়া থাকিতে পারে না; যে চলে, সেই পবিত্র; যে চলে না, সে-ই জড়!

চল্‌তি স্রোতে কোন ময়লা আটক হইয়া থাকিতে পারে না। যাহার জীবন আছে, তাহার কোন ভয় নাই। জীবনের স্রোত সব ধুইয়া মুছিয়া সাদা করিয়া দিয়া যাইবে! আর কিছু না. চাই শুধু চলার স্রোত, চলার আবেগ!

কেন্দ্র পাইলেই মানুষ মনে করে, সেখানেই বুঝি সব শেষ, আর বুঝি চলিতে হইবে না। কিন্তু কেন্দ্র পাইলে জীবনের গতি যে আরও অজস্র পথে প্রকাশিত হইতে চায়! যাহার লক্ষ্য স্থির, তাহার মাঝেই যে বৈচিত্র্যের আস্বাদনের দরুণ আরও গভীর ব্যাকুলতা!

সিদ্ধ জীবন বলিতে, সমাপ্তসাধন জীবনকেই মানুষ লক্ষ্য করে। কিন্তু সিদ্ধ জীবনের আসল তাৎপর্য্য তাহা নয়! সাধনার বিরাম নাই। সিদ্ধের সাধনা অজপা—জপের ন্যায়, অবিরাম তাহা চলিতেছে! তবে এইটুকু বিশেষত্ব তাঁহাদের আছে যে, তাঁহরা শান্ত সমাহিত হইয়াই আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেছেন, কেননা তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই কেন্দ্রকে আয়ত্ত করিয়া নিয়াছেন বলিয়াই, গতির মাঝেও তাঁহাদের চঞ্চলতা নাই—উগ্রতা নাই। শান্তস্রোতা প্রবাহিনীর ন্যায়, তাঁহাদের সাধনার অবিচ্ছিন্ন ধারা নীরবে বহিয়াই চলিয়াছে!

সিদ্ধের নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া মনে করিও না, তাঁহারা এখন সাধনা হইতে মুক্ত! সিদ্ধের প্রাণে একটা নিশ্চিত আশা আছে, সাধকের প্রাণ এখনো সেই নিশ্চিত আশা পায় নাই। কাজেই সিদ্ধের আর সাধকের ব্যাকুলতায় অনেকটা প্রভেদ আছে। কাহারও বিরাম নাই। একজন পথ পাইয়াছে—তাই নিশ্চিত মনে পথে চলিয়াছে; আর একজন এখনো পথ পায় নাই, তাই অসম্ভব রকমের আকুলতা নিয়াই তাহার দিবা-রাত্র কাটিয়া যাইতেছে। সবই চলিতেছে, তবে কেহ পথের সন্ধান পাইয়াছে, কেহ পায় নাই। যে পায় নাই, তাহারও এই ব্যাকুলতা ব্যর্থ নয়—পথের সন্ধান পাওয়ার দরুণই এই ব্যাকুলতা!

পথের মাঝেও আবার অন্য পথ—কাজেই পথে চলিতে চলিতেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভেরও আশা রহিয়াছে। একেবারে অন্ধ না হইলে. পথের বৈচিত্র্যকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। জীবনকে বিকাশ হইতে দাও, কে জানে কোথায় তোমারই এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিবার দরুণ আকুল চেষ্টা করিতেছে! কাহাকেও নিরস্ত করিতে নাই; সব চলুক—চলার মাঝে যাহার যে পথ সে তাহা আপনি বাছিয়া লইবে।

চেতন-অচেতন সবাই আবেগে দুলিতেছে, কে বসিয়া আছে বল তো দেখি! কবীর সাহেব এই গতির লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

জঁহে চেত অচেত খংভ দোউ
মন রচো হৈ হিং ডোর।
তহঁ ঝুলৈঁ জীব জহান
জহঁ কতহুঁ নহি থির ঠৌর॥
ঔর চন্দ সুর দোউ ঝুলে
নাহী পাবৈ অংত।
চৌরাসী লচ্ছহু জিব ঝুলৈঁ
ঝুলৈঁ রবি শশি ধায়॥
কোটিন কল্প যুগ বীতিয়া
আনে ন কবহুঁ হায়॥
ধরণী আকাসহু দোউ ঝুলৈ
ঝুলৈঁ পবনহুঁ নীর।
ধরি দেহ হরি আপহু ঝুলৈঁ
জো লখহী দাস কবীর॥

—চেতন অচেতন দুই-ই স্তম্ভ, আর তাহার মাঝে মন রচনা করিয়াছে হিন্দোল, সেই দোলনায় জীব ও জগৎ দুই-ই দুলিতেছে, কিছুতেই সেই দোল থামিতেছে না।

চন্দ্র, সূর্য্য, চৌরাশী লক্ষ জীব সেই হিন্দোলে অবিরাম দুলিতেছে, এমন করিয়া কত যুগই না চলিয়া গেল, তবু তাহার বিরাম নাই। ধরণী আকাশ পবন নীর সবই দুলিতেছে, কাহারও বিশ্রাম নাই!

এই তো লীলা—এই তো আনন্দ! আমরা যখন চলি, আমাদের অন্তরাত্মা তখন আমাদের মাঝে হিল্লোলিত হইয়া উঠেন। চলার মাঝেই তাহার হিন্দোলার উৎসব! কাজেই চল—চল—চরৈবেতি—চরৈবেতি!

মানুষের অতৃপ্তি আর কোন কিছুরই দরুণ নয়—কেবল চলিতে পারিতেছি না স্বেচ্ছামত এই দুঃখ। চলিতে দাও—দেখিবে আনন্দ উপচিয়া পড়িতেছে! চলার সঙ্গে সঙ্গেই তাজা প্রাণের ঢেউ খেলিতে থাকে বুকের মাঝে; তখন চলিয়াও কি আরাম—কি আনন্দ!

—৪৫

যাহারা থামিতে চায়, থামিতে বলে তাহাদের প্রাণশক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। খবরদার, তাহাদের কথা যেন কখনো কাণে তুলিও না; কোথায়ও চলায় শেষ নাই—কেবল নব—নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া চলিতেই হইবে।

উপনিষদের বাণী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে এই বৈচিত্র্যকেই আস্বাদন করিতে। ব্রহ্ম এক জায়গায় স্থাবর হইয়া বসিয়া থাকেন নাই—জীবে জীবে জড়ে-চেতনে তাঁহার অনাদি অনন্ত বিকাশ! ঋষি এই বৈচিত্র্যকে দেখিয়াই আশ্চর্য্য—স্তম্ভিত!

experience শুধু বৈষয়িক ব্যাপার নিয়াই নয়—religious experience বলিয়াও একটা কথা আছে, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও অনুভবের বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি এক জায়গায় বসিয়া থাকিলেই হয় না, কিম্বা একটী মতের সঙ্কীর্ণ আবহাওয়ার নিজকে পরিপোষিত করিলেই চলে না। চাই সকলের মাঝে সকলকে বুঝিবার অত্যন্ত ব্যাকুলতা। কাহাকেও বাদ দিয়া কেহ নাই। আমাদের জীবন পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হইয়াই পরিপূর্ণ। কাজেই শুধু একটী জীবনের অনুভবই, পূর্ণ জীবনের অনুভব নয়। জীবন ভরিয়া বুঝিবার পাইবার শেষ নাই। বৈচিত্র্যের, বিকাশের সীমা নাই, অনন্ত সম্ভাব্যতা প্রত্যেকের মাঝে!

কবির, দার্শনিকের ব্যাকুলতা এই জন্যই। কবি বিকাশের মহিমা দেখিয়াই স্তব্ধ, দার্শনিক নিজের অনন্তব্যাপ্তি দেখিয়াই সমাহিত! কবি সেই স্রষ্টার মহিমা সৃষ্টির মাঝে দেখিয়া অপরূপ বিস্ময়ে বিগলিত হইয়া যান, আর তাঁর সেই অনুভূতিই ছন্দোবন্ধে কবিতাকারে ফুটিয়া উঠে। দার্শনিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়া নিজকে বুঝিতে আরম্ভ করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্যার আর সমাধান মিলে না, কেবল নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেই থাকে। দার্শনিকের বুদ্ধি শেষে হার মানে—তখন দার্শনিকের মুখ হইতেই বাহির হয়, না,

জানার অন্ত নাই, পাওয়ার অন্ত নাই। কত কিছু মানুষের অজানা, এই এতটুকু জানিয়াই মানুষ গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া উঠে।

অন্ত পাইবার আশাতেই মানুষ যাত্রা সুরু করে, কিন্তু অনন্ত পথের শেষ নাই, সীমা নাই। ইহা যেন নদীর স্রোতের মত অবিরাম চলিয়াছে। কেহ হয়ত তীরে বসিয়া সামান্য জল পান করিয়াই তৃপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু নদীর স্রোত অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছেই! মানুষ এতটুকু জানে, নিজের ক্ষুদ্র আধার ইহাতেই পূর্ণ হইয়া যায়, তখন আনন্দাতিশয্যে বলিয়া উঠে—"বেদাহমেতং" আমি জানিয়াছি। কিন্তু এই জানাও যে সম্যক্ জানা নয়—ইহা শুধু ব্যষ্টি জীবনেরই আনন্দের অভিব্যক্তি। কে জানে ইহার চেয়েও বড় আনন্দ যে নাই?

আনন্দাতিশয্যে, অনুভবের অজস্র বিকাশে মানুষ দিশেহারা হইয়া যায়! এই অবস্থাতেই কোন কোন মানুষ মূক হইয়া যায়—স্তব্ধ হইয়া যায়। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ"—কেননা বলিয়া তো শেষ করা যায় না, অনভিব্যক্তির বেদনা আরও বাড়িয়াই যায় তাহাতে! "একাংশেন স্থিতো জগৎ" —আর তিন অংশই তো অব্যক্ত। মানুষ স্থূলের এই বহিঃপ্রকাশের মহিমাতেই স্তব্ধ মুগ্ধ, আর ঊর্দ্ধ জীবনের সঙ্গে পরিচয় হইলে তো কথাই ছিল না। অনন্ত প্রাণের স্রোত এই নিম্ন চেতনার একটু ঊর্দ্ধেই প্রবাহিত। সেই প্রবাহের শেষ নাই। ধ্যানে চিত্তকে সমাহিত করিয়া একবার যদি মনকে সেই প্রবাহে সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়, তখন সাধকের ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্বানুভূতি হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে ক্ষণে ক্ষণে ভাব হইত, তাহার কারণ কি, না সেই অনন্তপ্রবাহিত প্রাণের সঙ্গে তিনি নিজকে এক করিয়া দিতেন। সেই ঊর্দ্ধ স্রোতে মনকে ডুবাইয়া দিলে তখন আর এই জগতের জ্ঞান থাকে না।

প্রাণই রাধা—সেই প্রাণের সঙ্গে মিলনকেই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দানুভূতির প্রকাশ। মহাপ্রভুও প্রাণকেই বুঝিতে আসিয়াছিলেন—সেই প্রাণের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া মাত্রই তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লোপ হইয়া যাইত, সর্ব্বাঙ্গে তাহার প্রাণের অনুভূতির দিব্য-প্রকাশ হইত!

মানুষের এত আকুলতা, এত ব্যগ্রতা কিসের দরুণ? না প্রাণকে পাইতে, সেই প্রাণই হইল —zest! মানুষ যখন প্রাণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখনই তাহার পরম সুখ। আনন্দ উপচিয়া পড়ে, তবু আনন্দের শেষ হয় না।

সাধনার শেষ নাই, আনন্দ পাইতেও সাধনার প্রয়োজন, আবার আনন্দকে ধারণা করিয়া রাখিবার দরুণও সাধনা প্রয়োজন! প্রাণের স্পন্দনের যেমন বিরাম নাই, তেমনি কূলে পৌঁছিয়াও সাধনার বিরাম নাই—তখন আবার নূতন পথে যাত্রা সুরু হয়।

উপনিষদ্ কি বলিয়াছে—"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তত্‌ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।" তিনি সকলের অন্তরে আছেন, আবার তিনি সকলের বাহিরেও আছেন। কাজেই ব্যষ্টি জীবনের অনুভবই পূর্ণানুভূতি নয়! তিনি মহান্—আবার সুন্দরও। কাজেই ব্যষ্টি-সমষ্টির অনুভবকে জড়াইয়া তবে তাহার বিরাটত্বের অনুভূতি ঠিক খাটি হয়।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়িয়া যায় কেন? না পূর্ণানুভবের ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক তখন দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পান যে, যাহা জানা হইল, তাহা তো খণ্ড, অসমাপ্ত; আরও যে জানিবার পাইবার বস্তু রহিয়াই গেল। কাজেই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই না-পাওয়ার বিরহ আসিয়া চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তোলে।

মানুষের এই আকুলতাই খাঁটী, বিরহ-বেদনাই চিরস্থায়ী। মানুষ চিরকাল এই অভাববোধ নিয়াই ব্যাকুল হইয়া কেবল চলিতেই থাকিবে। এই বেদনাই আনন্দের—উপভোগের বস্তু। মহাপ্রভু এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন উঃ ভিতরে কি একটা বিরাট বেদনা নিয়াই না তিনি আসিয়াছিলেন! জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি মননে অভীষ্ট দেবতাকে পাইয়াও, এতটুকু সময়ের দরুণও তাঁহার বিরহের অবসান হইল না! এই আকুলতা, এই বেদনা প্রত্যেক জীবের মাঝেই রহিয়াছে—কিন্তু জীব ঘুমে অচেতন। মহাপ্রভু অনবচ্ছিন্ন চেতনা লইয়া জীবকে সেই অন্তর্ম্মুখী জীবনের সঙ্গেই পরিচয় করাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। এত পাইয়াও যে মানুষের পাওয়ার শেষ হয় না, তবু যে তিনি অব্যক্ত—অপ্রাপ্যই থাকিয়া যান, মহাপ্রভু জীবকে তাহাই দেখাইয়া দেখাইয়া গেলেন!

আত্মকেন্দ্রে দৃষ্টি রাখিয়া এই যে অতিষ্ঠ ব্যাকুলতা ইহাই প্রত্যেক জীবের আদর্শ। মহাপ্রভু প্রাণের সেই বৈচিত্র্যকেই জীবনে ফুটাইয়া তুলিলেন। সারাটা জীবনই তাহার আকুলতার উত্তাপে টগবগ করিয়া ফুটিয়াছে। তিনি সেই জ্বালাতেই দগ্ধ হইয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রাণে এই অফুরন্ত ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। মানুষের তৌষ্টি-কতার মোহকে অপসারিত করিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। এত পাইয়াও মানুষ কি করিয়া নিরভিমানী থাকিতে পারে, তিনি তাহাই দেখাইতে আসিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর জীবনই সাধক জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। কি অফুরন্ত ব্যাকুলতা, নিশিদিন কি তীব্র আবেগের জ্বালা! বাস্তবিক এমন করিয়া আকুলতা না আসিলে কি ভগবানের কৃপা বর্ষণ হইতে পারে? তীব্র আবেগ চাই—এবং সেই আবেগ সমস্ত জীবন ভরিয়াই চলিবে। যুগযুগান্তরের সাধনাতেও সেই বিরহ—সেই আকুলতার অবসান হইবে না!

যাহারা মনে করে, সাধনার শেষ আছে, তাহারা ফলের লোভেই বেশী আকৃষ্ট, তাহারা প্রলুব্ধ হইয়া একদিক দিয়া অন্ধ হইয়া পড়ে। দৃষ্টি তাহাদের সঙ্কুচিত হইয়া আসে—জীবনের ক্রমোন্নতির পথ তাহারা দেখিতে পায় না। মনে করে, এই বুঝি শেষ, আর বুঝি কিছুই জানিবার নাই!

কিন্তু এত ধারণা তো মোহ! কোন মতে একবার এই মোহকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেই, তাহার পর আসে অনন্ত গতির পথ। সেই পথের শেষ নাই, যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, পথের সীমা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। দূর হইতে, সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় অসীমকেও সীমার মাঝেই দেখিতে পাইয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। আসলে কিন্তু ব্যাপার তাহা নয়।

কেহ কেহ মনে করে, বেদনার সমাপ্তিই বুঝি মুক্তির অবস্থা। কিন্তু আসলে সেই মুক্তির কোন অর্থই নাই—তাহা তৌষ্টিকতা—মোহ। মানুষ দুর্ব্বল বলিয়াই ফাঁকির পথ খুঁজে। তাহা না হইলে জীবনভরা যে দ্বন্দ্বই চলিবে—তাঁহাকে ঝলকে ঝলকে পাইব আবার হারাইব, এই তো লীলা। এই লীলার কোন দিন অবসান হইবে না!

উপনিষদের এই কথাগুলি হেঁয়ালীর কথা নয়। "যে বলে জানিয়াছি, সে কিছুই জানে নাই, আর যে বলে কিছুই জানি নাই, সে-ই প্রকৃত জানিয়াছে।" মানুষের যখন অহঙ্কার হয়, আত্মাভিমান জাগ্রত হইয়া উঠে, তখনই মানুষ অল্প জানিয়াও বহ্বাড়ম্বর আরম্ভ করিয়া দেয়! নিজের ধারণাশক্তি নাই বলিয়াই মনে করে আর বুঝি জানিবার কিছু নাই!

মহাপ্রভুর জীবনের এত কান্না শুধু নিজের নয়—মোহান্ধ জীবের অভিমান দেখিয়াই তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়াছিল। কিছুই জানিতে পারে নাই, তবু মানুষের এত গর্ব্ব? বাস্তবিকই ইহারা কৃপারই পাত্র—কেননা কিছুই তো ওরা

জানে না! জীবনের প্রতি দিনের অভিনয়ে সীমাহীন ব্যাকুলতা দ্বারা তিনি জীবের মোহই ঘুচাইয়া দিয়া গেলেন।

সিদ্ধ বলিতে আমাদের মস্ত বড় একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে। আমরা বুঝি সিদ্ধের বুঝি সাধন-জীবনের ইতি হইল, আর তাহার কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই। কিন্তু আসলে ব্যাপার তাহা নয়। সিদ্ধ মহাপুরুষ একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া নিয়াছেন, সেই স্থির লক্ষ্যের সাধনায় প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিত আশায় পথ পানে চলিয়াছেন! তাহারও সাধনার শেষ নাই—ইতি নাই!

অতৃপ্তি কোন কালেই ঘুচিবে না। বড় হইলে, উন্নত হইলে সেই অতৃপ্তি আরও বাড়িয়া উঠিবে। স্থূল হইতে দৃষ্টি যখন ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সুখ-দুঃখ-বেদনা আসিয়া বুকে বাজিতে থাকে। এই বেদনাকে এই দুঃখকে বহন করিয়া চলিতে পারার নামই মুক্তি। মুক্ত জীবন পলাতকের জীবন নয়। তাঁহারা সকলের সুখ দুঃখ, ব্যথাতে জড়িত! প্রথমে মানুষের মনে যে মুক্তির ধারণা থাকে, শেষে সেই ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়।

যাহাদের বুকে অতৃপ্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারা ধন্য। তাহাদের বিজয় যাত্রা সুরু হইল। এতদিন তো জীবন-যাত্রা সুরুই হয় নাই। ঘুম ভাঙ্গিলে, মোহ অপসারিত হইয়া গেলে মানুষের বুকে অতৃপ্তির আগুন না জ্বলিয়া কি পারে? বুকের এই অতৃপ্তির আগুন নিয়াই মানুষ কেবলই চলিতে থাকে। এই চলায় শেষ নাই, কোথায় কবে ইহার অবসান হইবে, ইহা কেহই বলিতে পারে না!

জীবন আরম্ভ হইল সেই দিন হইতেই, যে দিন হইতে তামসিকতা জড়ত্ব সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! কাজেই সংগ্রাম শেষ হইলেই সাধন-জীবনের ইতি হইল না। পাতঞ্জল দর্শনে "স্থিতি-প্রবাহ" বলিয়া একটা কথা আছে। জীবনের প্রথমে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম সুরু হয়, তাহার অবসানে এই স্থিতি-প্রবাহেরই সূচনা। কাজেই বিরাম নাই কোথায়ও—কেবল গতি—সম্মুখে অগ্রসর হইবার অফুরন্ত ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা প্রত্যেকের মাঝেই রহিয়াছে, কি একটা নিদারুণ মোহের চাপে, সব সুপ্ত—নিদ্রিত! একবার আত্মা জাগিয়া উঠিলেই—আর কোন ভয় নাই—মোহ নাই, সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, তাহাকে পাড়ি দিবার দরুণই অনন্ত পথের যাত্রীর যাত্রা সুরু!

যাহার আকুলতা জাগিয়াছে, তাহার সুদিন আসিয়াছে। ঘুম ছাড়িতে হইবে, আত্মপ্রবুদ্ধ হইতে হইবে। কাহারও কথায় চুপ মারিয়া বসিয়া না থাকিয়া, যাহাতে আত্মজাগরণ হয়, তাহারই চেষ্টা কর! জীবনের বিরাম নাই, সাধনারও বিরাম নাই, পথে পথে সিদ্ধি-অসিদ্ধির মেলা, তাহার দিকে কে ভ্রূক্ষেপ করে?

শেষ কথা—"অপ্ প্রমাদেন বিহর।" কোথায়ও ক্ষান্ত হইও না—জীবনকে মলিন করিও না।

অবিক্ষোভ

—(*)—

সংসার চিরদিনই বিক্ষোভময়। এ সমুদ্রে তরঙ্গ বিক্ষোভ চিরদিন আছে বলেই তাকে মথিত করে যারা তার বুক বেয়ে হেসে-খেলে বুক ফুলিয়ে চলে যায়, তাদের আমরা মহা সম্ভ্রমে বিজয়ী বীরের আখ্যায় ভূষিত করি; মস্তক নত করে তাঁদের অদ্ভুত শক্তিমত্তার কাহিনী শ্রবণ করি, আর দুর্ব্বল হৃদয়ের পরতে পরতে শ্রদ্ধা-ভক্তির বান ডেকে যায়।

কিন্তু একবার এ কথা মনে আসে না যে এই শ্রদ্ধা-ভক্তির যোগ্য তো আমরাও হতে পারি—যেটুকু মহিমা দ্বারা আমাদের বিচারে মহাপুরুষের সংজ্ঞা ঘটে, মহাপুরুষ বল্‌তে যদি তাই বুঝায়, তবে তা তো মানুষের অনধিগম্য নয়। মানুষ যা করেছে, সেই মানুষ আবার তা করতে পারবেই—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস প্রাণে জাগ্রত রেখে যদি অহরহ আদর্শের দিকে প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে, তবে জগতে কোন্ কর্ম্ম কার অসাধ্য থাকে? কিন্তু নিজকে তেমন ভাবে যথার্থ মানুষ বলে অন্তরে যথার্থ শ্রদ্ধা করাই অনেকের হয় না। ঝগড়া বিবাদ বা ভোগেচ্ছার সময় আপনাকে ষোল আনা বড় বলে মনে হলেও মহান্ কার্য্য সাধনের কালে শ্রদ্ধারূপ মহাশক্তির আস্তিক্যবুদ্ধি আপনার মাঝে খুঁজে পায় না। কেবলি সংশয়—একি আমা দ্বারা সম্ভব? একি কখনও হয়!

অথচ, কুকার্য্যের বেলা প্রবৃত্তির এমনি টান যে বিচার করবার তর্‌টুকুও যেন সয় না। কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হলেই হল। এমনি টান কি সৎকর্ম্মে আসতে পারে না? উত্তর হয়ত হবে—আসে না যে, কি করব? যদি আবার প্রশ্ন হয়, কেন আসে না, বিচার করে দেখেছ? অধিকাংশ স্থলেই শোনা যাবে—আসে না, তা কে জানে? ইত্যাদি। অর্থাৎ কতটুকু দূর গিয়েই যেন বিচার ভাল লাগল না।

এই খানেই আমাদের মরণ। আপনার মাঝে যা কিছু আস্‌ছে, অমনি তাতে গা এলিয়ে দিচ্ছি, তা কি সুখে কিম্বা দুঃখে। বিচারের খড়্গ খাড়া থাক্‌লে এই এলিয়ে পড়া ভাবটা হয়ত বহু পরে আসত এবং সে কেবল হতাশার মাঝেই ডুবিয়ে রাখ্‌ত না; বরং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধতন শক্তির শরণাপন্ন হয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সেখানে সমর্পণ করে সমস্ত বোঝা নামিয়ে দেবার আনন্দে আবার নিশ্চিন্ত মনে কাজে দ্বিগুণ অগ্রসর করত। কর্ম্ম সমর্পণের অমৃতরসে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠ্‌ত।

বিচারের পরে, সংগ্রামের পরে যে সমর্পণের মধুময় বিশ্রাম, তাতে যে প্রশান্তি, কিছুমাত্র চেষ্টা না করে গোড়া থেকেই সমর্পণের মাঝে সে প্রশান্তি কোথায়? আবার জীবনে কেবল দুঃখের পর দুঃখের ঢেউ আস্‌ছে, আর তাই অতিক্রম করে আমি চলছি—এমনি চলার মাঝে যেখানে আপনাকে আর বুঝি চালাতে পারলাম না বলে যে আকুল আবেগ, সারা জীবন সুখে চলে হঠাৎ দুঃখে পড়লে তেমন আবেগ আসবে কি করে? শেষের আবেগে কাতরতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে তো অক্ষমতা বা প্রচেষ্টাহীনের আবেগ। তার আপন জীবনে অমন আঘাত আরও বহু প্রয়োজন, যেন এই ভেবে বিধাতার দানস্বরূপ আরও আঘাতই আসে। কিন্তু যে সারা জীবন সয়ে সয়ে ডেকে ডেকে চলে এসেছে, তার এই শেষের ডাকে যে ভগবান্ নিজে না এসে পারেন না।

পাতঞ্জলে রয়েছে "তীব্রসংবেগানাম্ আসন্নঃ।" সমাধি বা তাঁর কাছে আগে যাওয়ার অধিকার কার বেশী হবে ? পতঞ্জলি উত্তর দিচ্ছেন, যাঁর সংবেগ তীব্রতম সেই। রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, "সবাই খেতে পায় বটে, কেউ আটটায়, কেউ দুটোয়। তীব্র সংবেগ, একান্ত টান যার যত বেশী, সেই যায় তত আগে। কাজ কর্‌ছি সবাই, বিক্ষোভও আস্‌ছে সবার মাঝেই, কিন্তু তবু সবাইর তা থেকে ত্রাণ পেতে একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে না, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। সুখ চায়, আনন্দ চায় বটে, কিন্তু তা পাওয়ার উপায় অবলম্বন করতে চায় না ! আর যারা চায়, তারাও 'বনত্ বনত্ বনি যাই'র দল। এই এখনি চাই বলে কাজে লেগে পড়বার মত অটুট উৎসাহ নাই।

কেন এমন হয়, আর কি করেই বা তীব্র উৎসাহ আনা যায় ? একজন বৈদেশিকের কোন কিছুতে failure আর আমাদের failureএর মাঝে রাত-দিন তফাৎ দেখা যায়। তাদের ব্যর্থতা ক্রমেই যেন প্রচেষ্টার বেগ আরও বাড়িয়ে দেয়। সার্থক না হওয়া পর্য্যন্ত চেষ্টা করতে করতে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার তেজ তাদের বুকে রয়েছে। তাতে লোকলজ্জা না হয়ে ব্যর্থতাই যেন লজ্জা পেয়ে সার্থকতায় পরিবর্ত্তিত হয়। আর আমরা দুবার না পেরে তিনবার যদিও চেষ্টা করি, সার্থক না হলেই বলে উঠি—যাঃ কেবল সময় নষ্ট ! বিধাতা শুধুই কাউকে বড় অধিকার দেন না।

কিন্তু তবু বলি, কোনও পাশ্চাত্য জাতির মাঝে এই যে তেজ, এ-ও সত্যিকার তেজ নয় —অন্ততঃ আমাদের পক্ষে সব সময়ে সুসহ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সৎ কার্য্যের আদর্শ বা বচন শোনাতে গিয়া ছেলেদিগকে যতই শ্বেতাঙ্গের জীবন ও বাণী শোনানো হউক, আমাদের মাঝে থেকে আমাদের মত মানুষ হয়ে আমাদের দেশের মহাত্মারা যা বলে গিয়েছেন, যেমন করে চলে তাঁরা অভীষ্ট লাভ করেছেন, আমাদের প্রাণেও সেইগুলিই ক্রিয়া করে বেশী। কোনও দেশেই সেই জাতির উন্নতির পক্ষে পর-দেশীর জীবন ততখানি আদর্শ বা ধর্‌বার যোগ্য হয় না, যতখানি তার স্বদেশ হতে মিলে। খুঁজ্‌লে আমাদের দেশেও এমন তেজের বাণী ও আদর্শ জীবনের অভাব হয় না। বিক্ষোভে টলে পড়া, কার্য্যে নিরুৎসাহ, এ সবকেই আমাদের দেশে গীতাকার তামসিকতার লক্ষণ বলে গিয়েছেন। কারও কিছু দেখে সাময়িক ভাবে ভাল লাগল বলে আগা গোড়া চিন্তা না করে যে কাজে হাত দেওয়া হয়, তাকে তামসিক কাজ বলে।

> অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
> মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥

আপনার সামর্থ্য নাই, সে বিবেচনা না করে অপরের সফলতা দেখে কাজে লাগলেই হয় না। সেটাও তামসিক ; আবার,—

> অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
> বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ১৮।২৮

কাজেই বিষণ্ণ হয়ে থাক্‌লেও হবে না। তমোর পরে রজোর উত্তেজনা আনা উচিত ও আসা স্বাভাবিক বটে। তাই শ্বেতাঙ্গের দীপ্তি দেখে মন আকৃষ্ট হয় বটে। কিন্তু রজোর পরে সত্ত্বের দিকে যদি লক্ষ্য না দেওয়া হয়, তবে তার ফলে আস্‌বে আবার শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ। দীপ্তি চাই, আলো বা রোশনাই চাই, কিন্তু ঘর-জ্বালানো রোশনাই নয়। তার পরিণামে থাকে সর্ব্বনাশের বিষাদ-কালি বা ছাই। চাই স্বর্গীয় জ্যোতির দীপ্তি, যাতে দেহ মন উদ্ভাসিত হয়ে নিত্য নব নব লোক দর্শন হয়। তাতে "অযথাবৎ

প্রজ্ঞানাতি" রাজসী বুদ্ধির আবরণ থাকে না। বা "কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ক্রিয়তে বহুলায়াসং" অবস্থাও ঘটে না।

রজো ও সত্ত্ব দুয়েই জাগরণ আছে, কিন্তু প্রথমটায় আসে উত্তেজনা, তার ফল তমো বা পুনরায় অভিভূত হওয়া; আর শেষটীতে হয়, উদ্দীপনা বা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ জগতের আনন্দ লাভ। প্রথমটায় অহঙ্কার বা দাম্ভিকতার ফল হর্ষ-শোক আর দ্বিতীয়টীতে অহংএর নিরসনের ফলে সর্ব্বজ্ঞান বা সর্ব্বমুক্তি। অহঙ্কার নাই বলে যে সত্ত্বে উৎসাহ নাই, তা নয় কিন্তু, বরং—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

আপনাকে অকর্ত্তা ভাব্‌লে, ফল ও কামনাহীন হলে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে নির্ব্বিকার থাকতে পার্‌লে, সেই সাত্ত্বিক কর্ত্তার হৃদয়ে ধৈর্য্য, উৎসাহ প্রভৃতি আনন্দ আরও বেশী হওয়ার কথা। কেননা, কোনও বিক্ষোভ দ্বারা সে হৃদয় গণ্ডীবদ্ধ হয়ে নাই। কাজেই তার পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই আনন্দই তখন জীবনের উপজীব্য হয়। কিছু উপজীব্য তো জীবনের চাই!

তাহলে দেখা গেল, বিক্ষোভ আসে তামসিকতা থেকে। তমোর পরেই রজো। ঘুমের পরই জাগরণ। যদি স্বাভাবিকভাবে জাগায় বিলম্ব হয়, তবেই ধাক্কা বা সেই বিক্ষোভের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিক্ষোভ যে জাগার জন্যই, মুষ্‌ড়ে পড়ে আবার ঘুমোবার জন্য নয়, এ কথাটাই ভুল হয়ে যায়। ধাক্কা খেয়ে, রজোর পরে সাত্ত্বিকতার ভাণ বা জেগে ঘুমুতে গিয়ে আবার যে মহানিদ্রার তমোতে ডুবে যাই, এ কথা খেয়াল থাকে না। জীবনে জাগ্‌বার ঘটনা বহু ঘটে. মন তাতে সাময়িক সাড়াও দেয়, কিন্তু সে ওই রজোর সাড়া—দুদণ্ডের লাফালাফি। কিন্তু সত্যকে যদি জীবনের একান্ত কাম্য বলে মনে হয়, তবে বিক্ষোভেও হৃদয়ের সাম্য অর্থাৎ সাত্ত্বিকতার আশ্রয় নিতেই হবে। জীবনের রসায়ন যদি পরম বস্তু বা পরমাত্মা হন, তবেই সর্ব্বাবস্থায় ভ্রূক্ষেপশূন্য থাকা চলে। আমার বুকে যখন "সে" আছে, তখন মহাবিক্ষোভেই বা ভয় কি, দুঃখ-বিষাদ কোথায়, আর স্বয়ং সেই সুখময় হৃদয়ে বিরাজ করলে অন্য কোন্ সুখেই বা মাতিয়ে তুলবে? কিসের বিক্ষোভ, কিসের কি—তখন যে "সকলি ভুলিব কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।"

গৃহস্থের বৈঠক

—*—

বৈঠক কথাটা আজকাল বড় শুনতেই পাই না, কেননা এখন আর বড় বৈঠক বসেই না। ছোট বেলায় দেখ্‌তাম পাড়া-প্রতিবেশীর অনেক লোক এসে ঠাকুরদাদার সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে সুন্দর এক মজ্‌লিস্ জমিয়ে তুলত। সেখানে যে কত বিচিত্র রকমের কথা বার্ত্তা হত, তার ইয়ত্তা নাই। যার মনে যা আস্‌ত, তাই তারা মনের আনন্দে প্রাণ খুলে বল্‌ত। ঠাকুরদাদা বসে বসে সব শুনতেন আর জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করতেন। সে সব দিনের কথা মনে হলে, পাড়া-পড়শীর সেই অমায়িক,

সরল-উদার ভাবের কথা মনে হলে আজ মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ খেলে যায়। কি সুন্দর—খাওয়া-পরার অভাব ছিল না, মোটা ভাত, মোটা কাপড় সবাই পর্‌তে পার্‌ত। বাড়ীতে দুই-চারিটী করে গাইও থাকৃত, বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটত। মোট কথা পেটের দরুণ অমন নাকাল হতে হ'ত না তাদের। "পেটে খেলে পিঠে সয়" একটা কথা আছে। অন্ন-ব্রহ্ম তাদের প্রচুর ছিল, কাজেই নিশ্চিন্তে তারা নানা বিষয়ে বেশ আনন্দের সহিত চিন্তা-ভাবনা কর্‌ত।

আনন্দে থাক্‌লে মানুষ খামাকা অনেক কাজের সৃষ্টি করে। এই বৈঠকটা বাধ্যবাধকতার কোন কিছু নয়—আপন খেয়ালখুসীতেই তারা এই মজ্‌লিস্ জমিয়ে তুল্‌ত। এই বৈঠকে নানা রকম কথা-বার্ত্তাই হত। এক এক দিন তাদের উদার উন্মুক্ত হাসির কল্লোলে আমরা বাড়ীর ভিতর হতে বাহির হয়ে আস্‌তাম যে তারা কি হল্লা করছে বসে বসে দেখতে। বাইরে এসে তাদের অফুরন্ত আনন্দ দেখে আমাদেরও যেন প্রাণ নেচে উঠ্‌ত। কি সুন্দরই না ছিল তখনকার দিন। পাড়া-প্রতিবেশী পরস্পর মিলিত হয়ে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখে-দুঃখে সমভাগী হয়ে এমন সুন্দর ভাবে তারা দিন কাটাত যে আজ তা প্রত্যক্ষ দেখতে না পেলেও, স্মৃতির আনন্দেও এক এক সময় বিভোর হয়ে যাই! ভাবি আবার কবে আমাদের সে সুদিন আস্‌বে?

তারপর সেই বৈঠকে যে কেবল নিরর্থক আমোদ-আহ্লাদই হত তা নয়। রামায়ণ, মহাভারত গীতা, পুরাণ সব ভাল ভাল বই থেকে ঠাকুরদাদা তাদের এক এক উপাখ্যান বল্‌তেন, আর তারা সবাই অবাক্ হয়ে শুন্‌ত। মনে পড়ে কৈবর্ত্ত মঙ্গলার কথা। সে যে অমন সুন্দর সুন্দর গল্প বল্‌তে পার্‌ত—পুরাণ, ভাগবত থেকে যে, শুনে তখন আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌তাম, "আরে মঙ্গলাদা, তুমি কখন এত পুরাণ, ভাগবত পড়লে।" উত্তরে সে বল্‌ত, "না আমি পুরাণ, ভাগবত কোন দিন পড়িনি, এ তোমাদেরই ঠাকুরদাদার কৃপা। উনার মুখ থেকে শুনে শুনেই যা কিছু শিখেছি।" এমনি করে, বৈঠকে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব আরও কত কি আলোচনার বিষয় ছিল। কোন একটী ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না যে আজ শুধু এই আলোচনা হবে। যে দিন যে প্রসঙ্গ উঠ্‌ত, সবাই সেদিন তা নিয়েই মজে যেত। ঠাকুরদাদার অসীম শক্তি ছিল, তিনি পণ্ডিত, সমাজপতি, বড় গৃহস্থ—কাজেই কোন দিকেই তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির ত্রুটী ছিল না। তিনি গম্ভীরও হতে পার্‌তেন, আবার সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে আনন্দও করতে পার্‌তেন। এক-সঙ্গে ভয় ভালবাসা কাকে বলে, তা ঠাকুরদাদার চরিত্রেই কেবল দেখেছি। উনাকে সকলে ভয়ও কর্‌ত, আবার প্রাণ দিয়ে ভালও বাসত। কি সুন্দর ভাববিনিময়ের ব্যবস্থাই না ছিল তখন! এই বৈঠকের ফলে, আমাদের গ্রামের ছোট লোকদের মাঝে বড় বড় গৃহস্থরা প্রায়ই বেশ ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান রাখত। অথচ তারা লিখা-পড়া কিছুই জান্‌ত না। কেবল শ্রুতিবচনই ছিল তাদের উপলক্ষ্য। ঠাকুরদাদা যা বল্‌তেন, তা তারা আপন-মনে শুনে যেত। এক একদিন আনন্দের চোটে বৈঠকখানা ঘর যেন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম, আর এক একদিন সব চুপ হয়ে থাকৃত, সে দিনই এই সব ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হত। ঠাকুরদাদার মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে সবাই মনোযোগের সহিত সেই ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ শুন্‌ত। এখন আমার মনে হয়, ভাগবত, পুরাণের কথা ওরা যত জানে, আমরা পড়া-শুনা করেও বোধ হয় ততটা জানি না। শোনা কথায় যে কেমন সুন্দর কাজ করে, তা ওদের দেখেই বুঝি!

* * *

আজ ছান্দোগ্যোপনিষৎ পড়্‌তে পড়্‌তেই এই কথাগুলি মনে এল। এক জায়গায় ঠিক ঐ রকম বৈঠকের কথা আছে দেখ্‌তে পেলাম। প্রাচীন কালে ঋষিদের মাঝেও এই বৈঠকের কথা ছিল। তারা পরস্পর মিলে-মিশে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব এ সব সম্বন্ধে অবাধে পরস্পরের অভিজ্ঞতা পরস্পরকে জানাত। তাদের মাঝেও বেশ সুন্দর একটা মিলা-মিশা ছিল। কারও কোন গর্ব ছিল না, যে যতটুকু জান্‌ত, প্রাণ খুলে তা সবাইকে বল্‌ত। বাড়িয়ে বলা তাদের অভ্যাস ছিল না। তাই নিজে না জানলে বিনীত হয়ে তাঁরা স্বীকার কর্‌তেন যে, "না এর চেয়ে আর আমি বেশী কিছু জানি না, তবে অমুক ঋষির কথা শুনেছি তিনি নাকি এর চেয়েও বেশী কিছু জানেন।" তার পর হয়ত দুজনেই মিলে সেই ঋষির কাছে নিজেদের সমস্যা নিয়ে গিয়ে হাজির। শান্ত সমাহিত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি তখন সবারই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতেন! এই ভাবে তাদের মাঝে বেশ একটা মিলা মিশা ছিল।

আমাদের ধারণা যে, আত্ম-তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব এ সবের আলোচনার অধিকার বুঝি বিবেকী সন্ন্যাসীদের এক চেটীয়া। কিন্তু ঋষিযুগে তা ছিল। না। অবশ্য এ কথা ঠিক, বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন নিরাসক্ত বড় বড় গৃহীরাই এই সব তত্ত্ব নিয়া আলোচনা কর্‌তেন। গৃহস্থদের মাঝেও তখন বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন। বড় বড় রাজা বড় বড় গৃহস্থেরা এক একজন ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। জনক রাজার কথা শুন্‌তে পাই, তিনি নাকি রাজত্ব করেও ঋষি। কাজেই আত্ম-তত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব জান্‌বার অধিকার গৃহস্থদের মাঝেও ছিল। বরঞ্চ তখন গৃহস্থদের মাঝেই বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা থাকৃতেন। তাদের কাছে দেশ-দেশান্তর হতে সত্য-পিপাসুরা আস্‌ত জ্ঞান-পিপাসা মিটাতে। কাজেই গৃহস্থেরা সব দিকেই সম্পত্তিপন্ন ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের একাদশ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি ;—

"প্রাচীনশাল উপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ—কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি।

•

খুব বড় বড় গৃহস্থদের তখন বলা হত মহাশাল; তারা শুধু মহাগৃহস্থই ছিলেন না, মহাশ্রোত্রিয়ও ছিলেন; মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সদাচার ও বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্ন উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষীপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিনন্দন ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষসুত জন, এবং অশ্বতরাশ্বিপুত্র বুড়িল, ইহাঁরা সকলেই মহাশাল (বড় গৃহস্থ) ও মহাশ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নসম্পন্ন) ছিলেন; ইহাঁরা সকলে একত্রে সম্মিলিত হয়ে বিচার করেছিলেন যে আত্মা কি? এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বা কি? অর্থাৎ তাঁহারা আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপণে ব্রতী হয়েছিলেন!"

আত্ম-তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল বিষয়, কাজেই কে এ বিষয় সম্বন্ধে ভাল জানেন, তারই আলোচনা প্রথমে হল। তার পর ঋষিরা ঠিক করলেন, যে বর্ত্তমান সময়ে আরুণির পুত্র উদ্দালকই আমাদের অভিপ্রেত এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন, অতএব তাঁর নিকটই আমাদের এই প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া উচিত; এই সঙ্কল্প করে সব গৃহস্থ ঋষিই সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ঋষি উদ্দালকের সমক্ষে এসে উপস্থিত।

কি আশ্চর্য্য, উদ্দালক তাঁদের দেখেই সবার মনের উদ্দেশ্য বুঝে ফেল্‌লেন। তিনি মনে মনে

জান্‌লেন, যে এঁরা তো আমার বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধেই প্রশ্ন করবে; আমি তো এই প্রশ্নের উত্তর সম্যক দিতে পারব না, কাজেই যোগ্য উপদেষ্টার কথাই বলে দেওয়া আমার পক্ষে কর্ত্তব্য।

তখন তিনি সরল প্রাণে তাদের বল্‌লেন, "হে মহাশয়গণ! বর্ত্তমান সময়ে এই অশ্বপতি নামক কেকয়নন্দন আপনাদের জিজ্ঞাস্য বৈশ্বানরসংজ্ঞক আত্মাকে জানেন।" ঋষিরাও এই উত্তরে বেশ বিনীত হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উক্ত ঋষির নিকট এসে হাজির। সেই ঋষি ক্রমান্বয়ে এক একজন মহাশালকে তাদের উপাসনার প্রণালীর কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর সেই বৈশ্বানর আত্মাকে অখণ্ড ভাবে উপাসনা করবার উপদেশ প্রত্যেককেই দিলেন। রাজর্ষি সমাগত মহাগৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে বল্‌লেন—"তোমরা নিশ্চয়ই এই অপৃথক্ আত্মাকে পৃথক্ বলিয়াই জান—অর্থাৎ খণ্ড ভাবে। সেই বিরাট্ বৈশ্বানর আত্মাকে খণ্ড ভাবে জান বলেই, তোমরা শুধু ব্যষ্টি আধারে অন্ন মাত্রকেই ভোগ করিতেছ, কিন্তু যিনি তাঁকে অখণ্ড ভাবে জানেন, তিনি সমস্ত লোকে সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন।" আত্মাকে বিরাট্ ভাবে জানার দরুণই উপদেশ দিলেন সবাইকে।

তার পর সেই রাজর্ষি প্রত্যেককে তৃপ্ত সন্তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। মহাশালগণ হৃষ্ট অন্তঃকরণে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

কাজেই গৃহস্থের মাঝেও সে যুগে কেমন আত্মানুসন্ধিৎসু ভাব ছিল, তা দেখা গেল। তার পর তাঁরা সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেই—তদুপরি এই আত্মার অনুসন্ধান ব্যাপারে তৎপর হ'তেন। কাজেই তাঁরা সংসারকে অবহেলা করেননি! এক একজন মহা মহা গৃহস্থ ছিল!

এখন আমরা প্রায়ই বলে থাকি, "মশাই! এত বড় সংসার, ছেলে-পেলে নিয়ে ঘর করা কি যে কঠিন ব্যাপার, তার উপর আধ্যাত্মিক চর্চ্চা করার সময় কোথা? বাস্তবিকই সংসার করা কঠিন বটে, কিন্তু সংসারকে সুষ্ঠু ভাবে চালানোর ক্ষমতা থাকলে, সংসার করেও আধ্যাত্মিক চর্চ্চার (অর্থাৎ যা না হলে প্রাণ তৃপ্ত হয় না) ঢের সময় মিলে। উপরোক্ত শ্লোকে দেখেছি, যে এক একজন মহাশাল এবং মহাশ্রোত্রিয় ঋষি ছিলেন, তাঁরা ঘর-সংসার করেও এই আধ্যাত্মিক চর্চ্চার বেশ সময় পেতেন। কাজেই সময় পাই না—এই কথাটা নিতান্ত ছেঁদো অজুহাত! এর চেয়ে বল্‌লেই হয়, ওদিকে মনই যায় না—মন এত আসক্ত!

মহাগৃহস্থ হলেও ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির খোঁজ তাঁরা সর্ব্বদাই রাখতেন! প্রয়োজন হলে নিজে যে সমস্যার সমাধান করে উঠতে না পারতেন, তা নিয়ে ঋষির কাছে উপস্থাপিত করতেন। ঋষি তার একটা সুমীমাংসা করে দিতেন। এইভাবে গৃহস্থ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির মাঝে বেশ একটা আদান-প্রদানের ভাব ছিল। কাজেই গার্হস্থ্যজীবন তখনকার যুগে আদর্শ জীবন ছিল।

"কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি"—এই সব আলোচনা শুধু সন্ন্যাসীদেরই যেন একচেটিয়া। কাজেই গৃহস্থরা মজে থাকবে শুধু সংসার নিয়া। কিন্তু বৈদিক যুগে তো এর উল্টো আদর্শই দেখতে পাই! বড় বড় গৃহস্থরা একত্র হয়ে এই সব তত্ত্ব নিয়াই বেশ আলোচনা করছে! তারপর এ নিয়া তারা বড় বড় ঋষির কাছে গিয়ে পর্য্যন্ত হাজির!

ছেলে-পিলে নিয়ে সংসার করলেই যদি সকল কর্ত্তব্যের অবসান হয়ে যায়, তা হলে তো বেশ মঙ্গলের কথাই! দিন দিন আমাদের উন্নতিই হচ্ছে বলতে হবে। কিন্তু এই উন্নতির পরিণাম আজকাল

যা দেখছি, তাতে যে ভয় হয়, আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠে! নিজকে না জেনে, উত্তেজনায়, মত্ততায় মানুষগুলি যে কেবল হাবুডুবুই খাচ্ছে!

গৃহস্থদের অধঃপতনের সূচনা আরম্ভ হল কখন থেকে, যখন থেকে নাকি তারা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি কিম্বা সন্ন্যাসীদের সংযোগ হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আত্মম্ভরিতায় কেবলই বিষয়োন্মত্ত হয়ে উঠ্‌ল! তা না হলে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির আদেশ উপদেশ নিয়া যে গৃহস্থই সংসার চালিয়েছে, তার সংসারই দিন দিন কেবল উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয়েছে। ঋষির সঙ্গে যোগাযোগের দরুণ গৃহস্থদের মাঝেও সকল কর্ত্তব্যের সেরা কর্ত্তব্য যে "আত্মাকে জানা" তা বেশ বর্ত্তমান ছিল। সংসার করেও এই জন্যই তাদের মন এক মহান্ আদর্শের দরুণ অজ্ঞাতে ক্রমশঃ গঠিত হয়ে উঠত। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকেই এ স্থলে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি সংসার যখন করেছেন পুরোপুরি ভাবেই সংসার করেছেন—আবার এই যাজ্ঞবল্ক্যই যখন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করছেন, তখন সকলে অবাক হয়ে রইল তাঁর এই কাণ্ড দেখে। কাজেই সংসার করলেই আর সব চুলোর দুয়ারে যাবে, এই কথার কি কোন অর্থ আছে?

আমাদেরও এখন মাঝে মাঝে মজলিস্ বসে, কিন্তু সে মজলিসে—"আত্মা কি, ব্রহ্ম কি" এ সব কথায় তো কোন প্রসঙ্গই উঠে না। রুচিই যে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছে। কাজেই বৈঠকের মাঝে জীবন গঠনোপযোগী তেমন কোন বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের কথাই উঠে না। গৃহস্থরা আছে, ঘর-সংসারের আসক্তি নিয়ে মজে, আত্মা কি ব্রহ্ম কি, এ সব খোঁজ-খবরের যে কোন প্রয়োজনই হয় না! এখন কত দিকে কত research বা হচ্ছে, কিন্তু বৈদিক যুগের মত আত্মা কি, ব্রহ্ম কি এই সম্বন্ধে সাধনায় সঙ্গে সংযোগ রেখে কয়জন research করছেন? researchএর ধারাই উল্টে গেছে!

আজ কাল অনেকের মুখেই শুনি, যাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সংসারে থাকা যায়, তার দরুণই উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। কাজেই কৃষি নিয়ে, বাণিজ্য নিয়ে আরও কত শিল্প নিয়ে research চলছে। কিন্তু এই researchএর ফলে সংসারে তো সুখ-শান্তি এল না। দিন দিন যে কেবল হাহাকার বেড়েই চলছে। বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অন্তরের আসল অভাব তো মিটবার নয়। materially আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে যাতে মানুষের মনে-প্রাণে শান্তি আসে, সে বিষয় নিয়ে কয়জন research করছে? এ সম্বন্ধে research করবে কারা? না সন্ন্যাসীরা! গৃহস্থদের যেন এর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই! অথচ বলতে গেলে গৃহস্থদেরই কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সংসার করা সহজ কথা নয়। কঠোর দায়িত্ব রয়েছে এর মাঝে।

গৃহস্থদের এবং ঋষিদের পরস্পরের আদেশ উপদেশের ইঙ্গিত নিয়ে তবে সংসার চলত সুষ্ঠুভাবে। এখন তো সেই মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়ই বা কোথায়, তথায় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিই বা কোথায়! সংসার করা না ছিনিমিনি খেলা।

তারপর সন্ন্যাসের মাঝেও কত গলদ দেখতে পাই, অবশ্য আজকাল এর অনেকটা উন্নতি হচ্ছে। আগে আত্ম সম্বন্ধে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে research করার ভার ছিল নিরেট অজ্ঞ-মূর্খ নামে-মাত্র ভেকধারী সন্ন্যাসীদের ওপর। কাজেই এত সব সন্ন্যাসী থেকেও গার্হস্থ্যজীবন উন্নত হয়ে উঠল না। আর উন্নতি হবেই বা কি করে, অজ্ঞতা নিয়ে কেউ কি কোন দিকে উন্নতি সাধন করতে পারে? আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই দিক দিয়ে বেশ আলোচনা করছেন! কিন্তু তবুও প্রয়োজনানুযায়ী "আত্মা কি, ব্রহ্ম কি"—এ নিয়ে ঠিক research হচ্ছে না!

পূর্ব্বে রাজারা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের খরচপত্র, এমন কি ব্রহ্মানুসন্ধানে কিম্বা আত্মানুসন্ধানে ঋষি যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে চলেও যেতেন, তাহলেও সেই ঋষি পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। কেননা রাজারা জান্‌তেন, যে ঋষি ফিরে এলে সমাজের দেশের, সকলেরই কল্যাণ হবে তাতে। রাজারা এই দিক দিয়ে আত্মানুসন্ধিৎসু ঋষিদের বেশ নিশ্চিন্ত নির্ম্মুক্ত রাখতেন। কতজন ঋষি এই research এর দরুণ অকাতরে প্রাণও দিয়েছেন! গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীতে এই যোগাযোগ ছিল বলেই গার্হস্থ্যাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম উভয়ই ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হত!

আমাদের মাঝে সবই আছে, কিছুই লোপ পায়নি—আবার এ নিয়ে চর্চ্চা আরম্ভ করলে সেই ঋষিযুগ ফিরে আসা অসম্ভব ব্যাপার নয়। তখন বড় বড় গৃহস্থরাও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারবে।

দর্শনের বাস্তবতা

—*—

যোগ, যাগ, জপ, তপস্যা প্রভৃতি যত কিছু সাধনোপায়, সমস্তের লক্ষ্য একমাত্র মন স্থির করা। ভগবান্, আত্মা, বা ব্রহ্মলাভ, এ সমস্ত হল পরের কথা। আমি চাই কিসে শান্তি পাইব, দুঃখ না থাকুক্, যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাই। তাহা আমি কিছুতেই পাই না, পাবার আশায় জীবনে কত কিছু করিলাম, সামান্য আনন্দের লোভে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে কত ছুটাছুটী করিলাম, কিন্তু সব ভ্রান্তি, সব মায়া। কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? কোথায় আনন্দ? একটা আছে, হয়ত আর একটা নাই, এইটুকু পাই, কিন্তু আবার সেইটুকু হারাই; এমনি ধরণের অপূর্ণতার ক্ষুধা আর কিছুতে মিটে না বলিয়াই ভগবানের নাম করি। কারণ মহাজনবাণীতে শুনা আছে যে, ঐ ভগবান্, আত্মা বা ব্রহ্ম ইত্যাদির একটা কিছু পাইলে নাকি চিত্তের অস্থিরতা আর থাকে না; আনন্দ পাওয়া যায়, আর সেই আনন্দ নাকি সদা-বর্ত্তমান রাখা যায়। সংসারের দুঃখ-আবর্ত্তে যখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া একটু শান্তির আশায় ছট্‌ফট্ করি, তখন যদি সদাবিদ্যমান মহানন্দের কণাটুকুরও অধিকারী হইতে পারি, তবেই আমার সব হইল, আমি কৃত-কার্য্য।

জীবনে শান্তি চাই, সুখ চাই, আনন্দ চাই, তাই পাপ কর্ম্মেও আমার বিরতি নাই; কেননা, পাপের ফলে পরে যাহা ঘটিবার ঘটিবে, এখন তো আমার অভীষ্টদায়ক হইবে! তবে যদি এমন কিছু থাকে, যাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই মঙ্গলময়, আনন্দ বা সুখদায়ক, তবে অবশ্য তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। পাপের প্রারম্ভেও কম দুঃখ বরণ করিতে হয় না; তাহার পর মাঝখানে কিছু সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু পরে আবার যেই-সেই; অথবা পূর্ব্বের চেয়েও কোটীগুণ যন্ত্রণা। কিন্তু পুণ্যের বেলায় ঠিক বিপরীত হইতে দেখা যায়। প্রথমে যদিও সামান্য দুঃখকর, কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের প্রশংসায় অর্থাৎ দশ জনের সানন্দ উৎসাহে সেটুকু ভোলা যায়। তবে মাঝখানে যখন পুণ্যবানের চিত্তের দৃঢ়তার পরীক্ষা চলে, তখন অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে। যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্রাদির যত কিছু দুঃখের কারণ, তাহা এমনি সময়েই ঘটিয়াছিল। তাহার পর যখন সেই অবস্থা কাটিয়া যায়, তখন আবার সেই সুখ বা আনন্দ। বরং পূর্ব্বের চেয়ে তখন আরও কোটীগুণ আনন্দ বেশী হয়

সাধারণ সংসারের তাপ সহ্য করিতে জীবনে মাঝে

মাঝে যে দুই-চারিটী সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহারই কত প্রভাব, জীবনময় যদি সৎ-কর্ম্মই কেবল অনুষ্ঠিত হয়, তবে না জানি তাতে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ হয়। আবার যারা সে সুখও তুচ্ছ করিয়া কিম্বা সংসারের জালা যন্ত্রণাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সে সমস্ত আপন বুকে চাপিয়া লইয়া শুধু কেবল ভগবানকে, আত্মা বা ব্রহ্মকে পাইবার জন্যই সমস্ত জীবন মন সমর্পণ করে, তাহাদের না জানি কত সুখ! শুধু ভগবান্‌কে ভজনার চিহ্ন-স্বরূপ ভগবান বস্ত্র পরিধানে নিজের ও দশজনের চিত্তে যে সম্ভ্রম উপস্থিত হয়, চিহ্নের যিনি মূল, অর্থাৎ যাঁর চিহ্ন, তাঁহাকে মন দিলে সে সুখ বোধ হয় ধারণা ও বর্ণনার অতীত হয়। যাহা হউক সুখই আমার কাম্য, আমি চাই অনুত্তম সুখ। আমি অর্থার্থী ভক্ত, শ্রেষ্ঠ নই। দেখা যাউক, শাস্ত্রে এই অনুত্তম সুখের উপায় কি বলে।

মহর্ষি কপিলের সাংখ্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় না, আত্মানাত্ম-বিবেকের বুদ্ধি সকলের মস্তিষ্কে আসে না। কিন্তু আরও অনেকখানি সরল ও জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া পতঞ্জলি মুনি যখন সেই শাস্ত্রকেই বাস্তব দেহ ও মনের কতগুলি কস্‌রতে পরিণত করিলেন, তখন সাধারণ লোক খুবই ঝুঁকিয়া পড়িল। কেননা তখন হাতে কলমে করিবার অনেক স্থূল বিষয় পাওয়া গেল। উভয়ের মূল এক হইলেও পতঞ্জলির প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। অনুত্তম সুখের কথা বলিতে কপিলের মত পতঞ্জলিও সেই অবিদ্যা নাশই বা বিবেকজ্ঞানই শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিলেও প্রথমে বলিলেন, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥" সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখ লাভ হয়। একমাত্র যম নিয়ম দ্বারাই কতদূর ঊর্দ্ধে উঠা যায়, পাতঞ্জলে তাহার এমনি চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। ইহার পরে যোগের অন্যান্য ছয়টী অঙ্গও রহিয়াই গিয়াছে। প্রত্যেকটী অঙ্গ, যোগের প্রত্যেকটী সূত্রের প্রত্যেকটি শব্দ আবার এমনি স্থিরপ্রত্যয়জনক যে মনে হয়, ঋষি যেন তাঁহার তেজপূর্ণবাণী দ্বারা শাস্ত্রকে সাধকের বাস্তব জীবনে খাটাইয়া পরখ করিয়া লইতে বলিতেছেন। যাহারা প্রথম দেখে, তাহারা ভাবে, এমন আজগুবি কথা অর্থাৎ 'এই করিলে এই এই হইবেই' এমন নিশ্চয়তাজ্ঞাপক দৃঢ় বাণী বা প্রত্যয় কোথা হইতে পাওয়া গেল? শুধু কেবল চিন্তারাজ্য নিয়া যদি কথা হইত, তবে হয়ত অসম্ভব হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু যেখানে বলিতেছেন যে, 'তুমি এই করিয়া দেখ, হয় কি না হয়। হিংসা জয় করিয়া দেখ, বৈরত্যাগ হয় কিনা, সন্তুষ্টচিত্ত হও, বাহ্য বিষয়-সুখ হইতে বহু শ্রেষ্ঠ, অনুত্তম অর্থাৎ যাহার চেয়ে আর উত্তম নাই, এমন সুখ পাও কিনা দেখ,' তখন সে সব না করিয়া দেখিয়া, তখনই চিন্তা করিয়া অবিশ্বাস করি কি করিয়া?

অর্থার্থী বা সুখ-প্রত্যাশীর পক্ষে এমনি বাস্তব ফল দেখাইয়া দেওয়া শাস্ত্রেরই প্রয়োজন; সব সময়ে কেবল অন্তর্জ্জগৎ লইয়াই যদি কারবার হয়, তাহার যাহা ফল, তাহা যদি বহির্জীবনেও প্রমাণিত না হয়, তবে বাস্তববাদীদের কাছে তাহা চিরদিন সংশয়াত্মকই থাকিবে; পশু পক্ষী, বাঘ-ভল্লুক প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী স্বাভাবিক হিংস্র হইলেও যদি হিংসাশূন্যের কাছে আসিয়া তাহাদের বৈরভাব ত্যাগ করে, তবে বুঝিব শাস্ত্র যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নয়; আমার হাতের কাছে যে প্রমাণ পরীক্ষার সুযোগ আছে, তাহা যদি পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবেই তাহা মানিব এবং তখন তাহার মধ্যে আমার অনুভূত ব্যাপারের উল্লেখ দেখিলেও অসম্ভব বলিয়া মনে করিব না; তখনই আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা যে শাস্ত্রের বাণী মানিয়া পালন করিলেই পাওয়া যাইবে, এই কথার উপর বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস আসিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী করিবে; নতুবা শাস্ত্র কিছুই নয়—বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র; তাহা হইতে বরং পদে পদে

শাস্ত্রের দোহাই বা ভয়ের নিষেধ মানিয়া চিত্তকে দুর্ব্বল না করিয়া যে কোনও উপায়ে পান-ভোজনাদি প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয় তর্পণ দ্বারা এই জগতের সুখটাই পুরাপুরি ভোগ করিয়া লওয়া ভাল। পাশ্চাত্য জগৎ তাহা করিয়া কোন দিক দিয়া ঠকিতেছে? আর প্রাচ্য চোখ বুজিয়া স্বর্গের স্বপ্নের গভীর নিদ্রায় জাতীয় জীবনে কোন্ উন্নতির পথটায় অগ্রসর হইতেছে?

এই খানেই ভুল বুঝা হয়; প্রাচ্যের দর্শন তাহাকে জড় করিয়া তুলে নাই। বরং পাশ্চাত্যের দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের এইটুকু প্রভেদ যে প্রতীচ্য দর্শন শুধু চিন্তা জগৎ লইয়া; বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই; কাজেই প্রতীচ্য দর্শন নিয়া গভীর গবেষণাই সেখানে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা ও দার্শনিক নাম কিনিবার পক্ষে চরম ও পরম; ধর্ম্ম সেখানে জীবনের সঙ্গে জড়িত নহে বলিয়াই যেন ধর্ম্মজীবন বা religious life বলিয়া জীবনের একটা পৃথক অংশকে ধরা হয়; আর আমাদের দর্শনের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, তাহা কাব্যের মত জীবনে দৈনন্দিন ব্যাপারেও চিন্তা, কার্য্য, চালচলন প্রভৃতির মাঝ দিয়া গোটা মানুষটাকেই প্রভাবান্বিত করিয়া তুলে; ধর্ম্ম বলিতে এখানে যাহা ধারণ করিয়া আছে, তাহাই বুঝায়; তাই "ধর্ম্মজীবন" কথাটা আমাদের দেশের নহে, এটা আমরা ইংরাজী হইতে অনুবাদ বা অনুকরণ করিয়াছি; অর্থাৎ এখন আমাদের জীবনেও ধর্ম্মজীবন বলিয়া খানিকটা অংশ পৃথক দেখাই; নতুবা ধর্ম্ম ও দর্শন আমাদের দেশে শুধু পুঁথিগতই নয়, তাহা বিশেষ করিয়া জীবনগত; যে যে ধর্ম্ম বা দর্শনের মতাবলম্বী, তাহার দৈনন্দিন জীবনেও সেই ধর্ম্ম প্রতি কার্য্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

আমাদের দেশে বৈদান্তিক আর বেদান্তের পণ্ডিত বলিতে কিম্বা তান্ত্রিক ও তন্ত্রে পণ্ডিত, বৈষ্ণব আর বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিতে ঢের পার্থক্য বুঝিয়া থাকি; অর্থাৎ ধর্ম্মমত শুধু যিনি বুদ্ধিদ্বারা ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই ধর্ম্মে বা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে কেহ তাহার মর্ম্মজ্ঞ বলিবে না; আসল মর্ম্মজ্ঞ প্রকৃত রসবেত্তা শুধুই তিনিই হইবেন, যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া সেই ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের ভাবকে স্বীয় জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া পরম ও চরম বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন; আর যাহারা শুধু সেই শাস্ত্র দ্বারা বুদ্ধির তৃপ্তি ঘটাইয়াছেন, তাহারা কেবল পণ্ডিত পদবাচ্য হন, কিন্তু মূল উৎস জীবনে খুলে না; অথচ ভারতের দর্শন জীবনের ধাঁধা ঘুচাইয়া প্রকৃত পথ প্রদর্শনের জন্যই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল; ধর্ম্ম এখানে কাহারও মত নয়, জীবনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরম তথ্য চরম-সত্য; তাহাকে বাস্তব জীবনেই ফুটাইতে হইবে, শুধু কেবল পুঁথিগত বিদ্যারূপে চিরদিন অজানিতের অজ্ঞেয়তা প্রচার করিলেই চলবে না; ভারতের দর্শন যখন পুঁথিগত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, জীবনের রসায়ন না হইয়া জড়ত্ব সঞ্চারক হইয়াছে তখনই; বেদান্তের বা উপনিষদের বাণী শুধু কেবল চক্ষু উল্টাইয়া এ জগৎকে বাদ দিয়া পর জগতের জন্য নয়; "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—পর জগতে বাঁচিয়া থাকা নয়—এই জগতেই কর্ম্মঠ হইয়া শত বৎসর বাঁচিতে বলেন।

পাতঞ্জলের বাণীও শুধু কেবল মোক্ষ সাধনেই প্রযুজ্য, সামাজিক জীবনে অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হওয়ার জীবনেও প্রযুজ্য নয়, তাহা কোথায় বলা হইয়াছে? প্রশ্ন হইতে পারে, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ"—সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়—সে ত এই জীবনে তৌষ্টিকের সান্ত্বনা, ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথ রোধ করিয়া, বাহিরের জীবনে যতটুকু আছি তাহাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া, কেবল চোখ বুজিয়া ভিতর লইয়া সন্তুষ্ট থাকা, তাহাতে সংসারের উন্নতি হয় কোথায়? সংসারটা কি শাস্ত্রপথের বহির্ভূত?

এইখানেই বলিতে হয় যে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দেশের পরাধীন বা দুর্ব্বল অবস্থায় রচিত হয় নাই। দেশের যখন উন্নতির পরাকাষ্ঠা, সর্ব্বদিকে সমৃদ্ধি, তখনই এই সমস্ত বাণী আসিয়াছে বা খাটিয়াছে বেশী। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" যোগ কেবল কর্ম্মবিজ্ঞানের সুন্দর কৌশল মাত্র। তাহা এই জীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের বিদ্যুৎপ্রেরণা। সন্তুষ্ট মনের পূর্ণ তেজ লইয়াই এমন ভাবে এই জীবনে কর্ম্মসম্পাদন করিতে হইবে, যেন পরজীবনে তাহাতে আরও উন্নতি হয়। "মরণের পর অনন্ত স্বর্গ অনন্ত নরক, শুধু এই জীবনের গোণা দিন কয়টাই নিশ্চিত ভোগের দিন—সুতরাং, যত পার ভোগ করিয়া লও তাহাতে ফলাফল বিচার করিলে ঠকিবে" এমনি ভাবের রাক্ষুসে ভোগের বিষময় পারণাম হইতে বাঁচাইয়া সুষ্ঠু ভোগের অনন্ত সুখের বাণীই শাস্ত্র প্রচার করিতেছে।

কিন্তু সমস্ত সুখের, সমস্ত ভোগের কৌশলই হইতেছে চিত্ত সমাধান। অজানা ভাবে শত সুন্দর বস্তু দেখিলেও মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় বলিয়া দেখার আনন্দ বা ভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তাহাতে ভোগের বা আনন্দের আকাঙ্ক্ষা কি কমে? তাই একনিষ্ঠ ভাবে ভোগ করিতে হইলে চাই সেই ভোগ্যের সঙ্গে একান্ত যোগ। সেই যোগ কি? "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুতে নিরুদ্ধ চিত্ত হইতে হইবে। কিন্তু মজা এই যে, পরের সূত্রেই বলিতেছেন "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্।" তখন দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ চৈতন্যময় হইয়া নিজ স্বরূপে অবস্থান করিবেন। সে কিরূপ? ভোগ্য বা এই জগৎরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মত তাহার একীভূত থাকার অবস্থা হয় না—বিবেকজ্ঞান বা "আমি" এই বস্তু, আর প্রকৃতি বা ভোগ্য বস্তু, এইরূপ পার্থক্য জ্ঞান বজায় থাকিয়া, আসক্তিলীন না হইয়া অনাসক্ত বা জীবন্মুক্তের মত এই সংসার ভোগ হয়। কিন্তু তার আগে চাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। ভোগের কামনার বৃশ্চিক দংশনে ছুটাছুটী করিয়া ভোগ হয় না। অচল শিখরে আসন করিয়া তাহারই মত চিত্ত অটল রাখিয়া ধ্যাননিরত হইয়াই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী এই জগৎরূপা মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিতে হয়। যত যোগযাগ, জপতপ সমস্ত এই চিত্তসমাধানের জন্য, ভগবানের জন্য নয়। কেননা, জগৎরূপী ভগবান এমনি একান্ত মনে আপনি আসন গ্রহণ করেন। নতুবা এ সমস্ত দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মাত্র নিরুদ্ধ চিত্তেই ভক্তি, জ্ঞান, শক্তি সমস্তের আবাস। তাহা দ্বারাই সুখ-শান্তি সব ক্রমশঃ আসিয়া হাজির হয়।

চরিত্রবল

—(*)—

চারিত্রিক বল, আর সাময়িক কোন কারণোপলক্ষ্যে সাহস-বল প্রদর্শন উভয়ে রাত-দিন পার্থক্য; একটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে দৈনন্দিন সাধনার উপর, আর অন্যটী সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে বাহিরের ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিকের উপর। কাজেই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সাময়িকভাবে উত্তেজিত, বলদৃপ্ত হইয়া উঠিলে চরিত্রের ঠিক খাঁটী পরিচয় পাওয়া যায় না। আফ্রিকার উপকূলে যখন "বার্কেনহেড" নামক রণতরী জলমগ্ন হয়, আর এই অশুভ সংবাদ যখন ইংলণ্ডে গিয়া পৌছে, তখন "ওয়েলিংটনের

ডিউক" সৈন্তদের প্রশংসা করিতে গিয়া বারংবার তাহাদের সুশৃঙ্খলা এবং অবিচলিতভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্তদের সাহসকে ততখানি প্রশংসা করেন নাই, অতখানি সৈন্তদের কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একবার নয় শুধু, অনেকবার তিনি কেবল এই কথাই বলিয়াছিলেন, সাহস-প্রদর্শন ইহা তেমন কিছু নয় ঘটনা বিপর্য্যয়ে সকলেই এইরূপ সাহস দেখাইতে পারে; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তব্যে অচল-অটল থাকাই হইল আসল বীরত্ব এবং সাহস।

স্বীয় কর্ত্তব্যে অচল-অটল থাকিতে হইলেই চাই চারিত্রিক বল। আর এই চারিত্রিক বল উপার্জ্জন করিতে হইলেই চাই নিয়মিতভাবে প্রতিদিন একটু একটু সাধনা করিয়া অগ্রসর হওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যষ্টির চারিত্রিক বলের প্রভাবে সাময়িক ভাবে পারিপার্শ্বিকের মাঝে বেশ একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, কিন্তু সেই ভাব যে বেশী দিন স্থায়ী হয় না, ইহার প্রধান কারণই হইল সর্ব্ব-সাধারণের চারিত্রিক বলের পশ্চাৎবর্ত্তিতা বা অভাব। অধিকাংশ মানুষই সাধনার নাম শুনিলে ভয় পায়, তাহারা নিজেরা কিছুই করিবে না, কেবল অপরের জীবনের প্রভাবে তাহাদের মাঝে যতটুকু রূপান্তর আসে।

ভাবের দিক দিয়া সমস্ত জগতকে মাতাইয়া তোলা সহজ, কিন্তু তাহাতে কতটুকু কাজ হয় তাহা যদি বিচার করিয়া দেখিতে চাই, তাহা হইলে ব্যষ্টির, প্রত্যেকের জীবনের চরিত্রের উত্থান-পতনের ইতিহাস ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখা অগ্রেই প্রয়োজন। ভাবুক মানুষের মাঝে ভাব প্রচার হইতে বেশী সময় লাগে না, কিন্তু সেই ভাবকে হজম করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বীয় কর্ত্তব্যে অচল-অটল থাকাই হইল দুরূহ ব্যাপার। জাতীয় উন্নতির ইতিহাস খুঁজিলেই দেখিতে পাওয়া যায় কেবল মাত্র ভাব দ্বারা কোন জাতির উত্থান হয় নাই. বাস্তব-জগতে ভাবের যতখানি প্রয়োজন, তেমনি আবার কর্ম্ম-পটুতা, কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের দরুণ দৃঢ় সঙ্কল্পেরও তাহার চেয়ে বেশী প্রয়োজন।

সম্মিলিত সাধনায় শক্তি-সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যষ্টি জীবনের গলদ অনেক দিক দিয়া পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। কেননা সকলের সঙ্গে মিলে, সকলের প্রভাবে যে ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা পরস্মৈপদী ভাব। আড়ম্বর কমিয়া গেলেই সে ভাবের আর কোন অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার চেয়ে যে যেমন অধিকারী, তাহাকে ঠিক সেইখান হইতেই সাধনার প্রণালী ধরাইয়া দিলে উন্নতি হওয়ার আশা বেশী। মহৎ-জীবনের প্রভাবে, সাধারণের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে মাত্র, কিন্তু অবিচলিতভাবে এক আদর্শে, এক সাধনায় নিজকে নিবিষ্ট করিয়া রাখা—ইহাতে নিজেরই মনের-প্রাণের বল, এবং নিষ্ঠা চাই। সাধনার একটা ধারা মাত্র অপরে বলিয়া দিতে পারে—কিন্তু নিজকেই সাধনা করিতে হইবে। কিন্তু এমন অনেক সাধক-ভক্ত রহিয়াছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন—"আমাদের আর সাধনা কিসের আমাদের হইয়া স্বয়ং প্রভুই সাধনা করিতেছেন।" এই ধরণের দুর্ব্বল কুসংস্কার আছে বলিয়াই, জাতীয়-জীবনের মেরুদণ্ড এখনো পুষ্ট-বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না! দুর্ব্বল ভাবে দেহ-মন প্রাণ-মেরুদণ্ড সবকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে!

বৃহৎ পরিবারের মাঝে যদি মুষ্টিমেয় লোক উপার্জ্জন-শীল হয়, তাহাতে যেমন সেই পরিবারের অভাব-অভিযোগ মিটে না, তেমনি ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, যে কোন দিক দিয়াই হোক, প্রত্যেকেই যদি উপার্জ্জনশীল না হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন উন্নতি হয় না। ব্যষ্টি-সাধনার মূল্য এইখানেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ভারতে, মহৎ-প্রভাবের দিক দিয়া কোন নানতা নাই.দৃশ্য. অদৃশ্যভাবে কত মহাপুরুষ হিমালয়ে

এবং অন্যান্য স্থানে বসিয়া জগতের হিত কামনা করিতেছেন, কাজেই আমাদের উপর কল্যাণাশীষ নিয়তঃই বর্ষিত হইতেছে ; কিন্তু এক এক সময় ভাবি, এত কল্যাণাশীষ যাইতেছে কোথায় ? বরঞ্চ দেখিতে পাই, যাহারা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য-সাধনে নিজেরাই ব্রতী হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মুখমণ্ডল সাফল্যের দীপ্তিতে সর্ব্বদাই উজ্জ্বল। তাহারা ভাবে কর্ম্মে, সকল দিক দিয়াই সজীব, উৎফুল্ল এবং দক্ষ !

জীবনের প্রথমেই একটা লক্ষ্যকে স্থির করিয়া, তদনুকূলে জীবনকে গঠন করিয়া তুলিতে পারিলেই সাফল্য লাভ হয়। লক্ষ্যেরও বৈচিত্র্য থাকিতে পারে—কিন্তু যে যে-লক্ষ্যই ধরুক না কেন, তাহাকে তাহার দরুণ জীবন-পাত করিয়া যাইতে হইবে। ব্যষ্টি-জীবনে এই নিষ্ঠার সূত্রপাত হইলে, সমষ্টি জীবন গঠিত হইয়া উঠিবেই উঠিবে। আর সমষ্টি তো একটা নাম মাত্র, আসলে ব্যষ্টির সম্মিলনেই তো সমষ্টি। জীবনে বৈচিত্র্য থাকিবেই, কিন্তু প্রত্যেক মানবেরই একটী বিশেষ লক্ষ্য রহিয়াছে। আর এই বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়াই, বিভিন্ন গুণ থাকা সত্ত্বেও এক একজন এক এক বিষয়ে বিশেষ গুণী ! কাজেই মনের বল এবং শারীরিক শক্তি থাকিতে থাকিতেই জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা মনের মাঝে অঙ্কিত করিয়া নিতে হয়, তাহার পর বাকী জীবন সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির দরুণ উৎসর্গ করা।

দৈনন্দিন সাধনার প্রতি আমাদের লক্ষ্যটা খুবই কম, কাজেই ভগবানের অহৈতুক কৃপা যখন বর্ষিত হইতে থাকে, তখন আমরাই আবার অক্ষমের মত বলিতে থাকি—"খুব হইয়াছে, খুব হইয়াছে, আর যে তোমার কৃপা সহ্য করিতে পারিতেছি না।" কাজেই আধার-অবিশুদ্ধির দরুণ আমাদেরই শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় ঘটে। আমাদের চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভগবান অফুরন্তভাবে তাঁহার কৃপা বিলাইয়া দেন। কিন্তু সেই কৃপাকে রক্ষা করার মত বিশুদ্ধ আধার কোথায় ?

আমরা কোন জিনিষকেই সমগ্রভাবে দেখিতে পারি না। সিদ্ধ-জীবনের সিদ্ধির প্রতিই আমাদের লোভ, অথচ এই সিদ্ধি লাভ করিতে কত সাধনা, কত শ্রম, কত যত্ন যে করিতে হইয়াছে সাধককে, সেদিকে আমাদের মোটেই দৃষ্টি যায় না। সাধনার অবিচ্ছিন্ন ধারা হইতে সিদ্ধিকে বিবিক্ত করিয়া দেখি বলিয়াই, নিত্য-নৈমিত্তিক সাধনার প্রতি আমাদের অচল নিষ্ঠা থাকে না। আমরা মনে করি—"সহসা একদা আপনা হইতেই" বুঝি সিদ্ধি লাভ হইয়া যাইবে !

তিল তিল সাধনা করিয়াই সিদ্ধি লাভ ঘটে। জগতে কোন ব্যাপারই অলৌকিক নয়—সবই স্বাভাবিক। অলৌকিকত্বের পথ মানুষই আবিষ্কার করে। মানুষই বলে, ভগবান্‌কে এক রাত্রের সাধনায় পাওয়া যেতে পারে। জানি না—সে পাওয়ায় কি লাভ, কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।

কোন কিছুই আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে নাই—সকলেরই মূল একটা ভিত্তি রহিয়াছে। আজ যাহারা বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের এই বড় হওয়ার পিছনে উত্থান-পতনের অনেক ইতিহাসই রহিয়াছে ! কাজেই হঠাৎ সিদ্ধির কোন অর্থ নাই ! অথচ মানুষ বুদ্ধি-বিচারসম্পন্ন হইয়াও এই কথাটীকেই বেশী বিশ্বাস করে !

চারিত্রিক বল অর্জ্জন করিতে হইলেই, বিন্দু বিন্দু করিয়া বীর্য্য সঞ্চয় করিতে হয়। নিয়মিত সাধনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হয়। গীতার কথা বলিতে গেলে—"তাহাদের যুক্ত আহার-বিহার, এবং যুক্ত চেষ্টা সম্পন্ন হওয়া চাই !" সাধনার নৈরন্তর্য্যই জাতীয় উন্নতির মূল নিদান। ব্যষ্টি-জীবনের উন্নতির মূলেও এই অবিচ্ছিন্ন সাধনা !

দুটী কথা

—(*)—

আশার বিদ্যুন্ময় প্রেরণায় পুলকিত হয়ে যে কল্প-প্রতিমার পায় প্রাণ-মন সমর্পণ করেছিলাম, কালের কুটিলগতিতে হয়ত আজ তাহার অনেকখানিই মলিন হয়ে পড়েছে, নবীন উদ্যমের ঔজ্জ্বল্য হয়ত ঠিক ততটা এখন আর নাই, তাই বলে কি আমার সমস্ত ভরসা অতলে তলিয়ে যাবে? যে কল্পলতাকে প্রাণের মমতা নিঙড়িয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি, আমার নির্দ্ধারিত সময়ে সে আজ আমাকে তার সুপক্ক ফল উপহার দিল না বলে তাকে অমনি নির্ম্মূল করতে হবে? কে বলে—আশার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নাই? আশার কুহকের অবসর না দিয়ে যদি তাকে বজ্রদৃঢ় সংকল্পে পরিণত করা যায়, তবে সাধ্য কি যে শূন্য প্রান্তরে অট্টালিকা না হবে? এই আমি মানুষ, মানুষই অসাধ্য সাধন করেছে, করছে ও চিরদিন করতে থাকবে। শক্তির এই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে বুঝি সে দেবতাকেও ঈর্ষান্বিত করে তোলে, তাই দেবতাও দেবত্ব ছেড়ে সাধনায় কল্পবৃক্ষসম এই মানবজীবনের জন্য চির কাঙাল। কেননা, তার ঐ স্বর্গসুখ বা ইন্দ্রত্ব বরুণত্ব তো তাকে চিরমুক্ত বিচিত্র ভোগের জীবন দান করে না!

তাই বলছিলাম, আমি মানুষ, মানুষের অসাধ্য, আমার অপ্রাপ্য কিছু থাকতে পারে না। এ কি আমার দম্ভ বলছ? বেশ তাই হোক, যে দম্ভে আমাকে আনন্দ দেয়, পরকে পীড়িত না করে নিত্য-নূতন উন্নতির সোপানে তুলে দেয়, সে যদি আমার দম্ভও হয়, তবু নিরাশার গ্লানির চেয়ে আশার এই উন্মাদনা, চিত্তের এই দীপ্তি দেবতার পায়ে গিয়ে অকল্যাণ ডেকে আনবে না! যেখানে অকল্যাণের বদলে আশু কল্যাণ, মুহূর্ত্তমধ্যে চিত্তের দুঃস্থভাব কেটে অনাবিল আনন্দ এসে প্রাণ-মনকে সমাহিত করে, দেবতার প্রতিষ্ঠা সেইখানেই। হৃদয়ের অপূর্ব্ব বল বা শক্তির যাতে উদ্বোধন হয়, তা যদি বর্ত্তমানে আমাকে নিতান্ত নিরীহ না করে অশান্তই করে তোলে, শক্তির প্রথম স্ফুরণে একটু পদস্খলনই ঘটে যায়, আমি বলি, নিরাশার বা নিশ্চেষ্টতার মোহগ্লানি হতে সে শতগুণে শ্রেয়। তোমার গীতোপনিষৎ কোন্ শাস্ত্রে তোমাকে হতাশ হতে, নিরানন্দের প্রতীক্ হতে বলেছে? শান্ত হতে বলেছে? সে কি শক্তিহীন মৃতের শান্তভাব? শক্তি-ময় জীবন ভিন্ন শান্তি কোথায়? অভাবের প্রবল তাড়নায় পীড়িত দুর্ব্বল প্রাণের শান্তি আবার কি করে সম্ভব হয়? চাই না অমন অন্তরে দীনতার প্রশ্রয় দিতে! অদীন প্রাণে বাহিরে বিনয় এসে চরিত্রকে মাধুর্য্যে অপরের চিত্তাকর্ষক করে তুলুক। শক্তির বিচিত্র ভাবের সমাবেশে সমস্ত প্রাণ আকর্ষণ করে সবল হতে শিক্ষা দিক্—দুর্ব্বলের কান্না ঘুচে যাক।

ওই শোন—তোমার শাস্ত্রে কি বল্‌ছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্ব্বল সেই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। যার প্রাণে উন্মাদনা নাই, শক্তির বিচিত্র লীলা স্ফুরিত না হয়, সে আবার শান্ত হবে কি? শান্তিময় আত্মার দর্শন পাবে কি? সে তো মৃতের পর্য্যায়ে থেকে মাঝে মাঝে কামনার আগুনে ঝল্‌সে গিয়ে ভূতের মত চীৎকার করে উঠ্‌ছে। তার সে কান্নায় যিনি ভূতনাথ, তিনি আরও হাসছেন মাত্র—কৃপা হবে কি করে? চাই আপন শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন—শক্তির চর্চ্চায় শক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি। শুধু শুধু বসে বসে নিশ্চেষ্ট হয়ে কান্নায় কোনও দিন কারও প্রাণ গলানো যায় কি? আত্মম্ভরিতা মহাপাপ বলে কি আত্মবোধনেও পাপ? কে বলেছে তোমাকে অবসন্ন হতে? শাস্ত্র তো

জলদগম্ভীর স্বরে "নাত্মানমবসাদয়েৎ" বলে তোমাকেই তোমার উদ্ধারকর্ত্তা বলেছেন ; তবে আর কার আশায়, কার দুর্ব্যবহারে কেঁদে মরছ ? যে নিজকে তুল্‌তে পারে না, সে অপরে এসে তাকে তুলবে— এমন অপরের ভরসা করে কোন্ মুখে ?

কিছু নয়—কিছু নাই এ জগতে তোমার, যদি তুমি নিজে না দাঁড়াতে পার। নিজে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, তখন দেখবে, পুত্রকলত্র বন্ধুবর্গ সবাই তোমার পরম সুহৃদ্—সবাই তোমার তখন মহা ভরসাপ্রদায়ক! সাবধান, আসল ভরসা তোমার তুমি। জগতে কারও কাছে তোমার কিছু চাইবার নাই। শুধু কেবল দিবার পালা। দিতে দিতে যেটুকু পাও— সেটুকু শুধু উপরি-পাওনা, আশার ধন নয় কখনো। হতাশ্বাস হচ্ছ ? আশ্বাস দিবে কে ? কে তোমার হৃদয়খানি আবিষ্কার করেছে যে সেখানে গিয়ে তোমার জন্য সমস্ত আঁধার চুঁড়ে মাণিক্যের আবিষ্কার করবে ? এতখানি বিশ্বাস বা ভরসার দাবী করবার পাত্র এ জগতে কে আছে ? কেউ নয়। যাকে আছে বলে ভাবছ, সে তুমি আছ বলেই এখনও আছে মনে হয়। তোমার সত্তাতেই সত্তাবান্ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তুমি মরে যাও, বিষাদের অনন্ত আঁধারে ডুবতে যাও— কেউ আসবে না, বা পারবে না তোমাকে বাঁচাতে। তোমার প্রাণে প্রাণবন্ত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়। এই মহাসত্যে বিশ্বাস কর—ভয় হয় ? কেউ নাই বলে দুঃখ হয় ? কৈ—তুমি থাকলে তো সবাই আছে! আর তুমি তো চিরকাল আছই—থাকবেও—ছিলেও। তবে আর অভাব কোথায় ? তুমি থাকলে আর দুঃখ কোথায় ? শক্তির অভাববোধ ত তখন থাকতে পারে না—কারণ শক্তিধরই যে তুমি!

হাঁ, একথা প্রাণে প্রতিক্ষণে প্রবলভাবে জাগ্রত রাখতে হবে যে, শক্তির ভাণ্ডার তোমারই অন্তরে ; প্রমাণ চাও ? সে তো সব সময়েই পাচ্ছ! কৈ, যখন তোমার শক্তির হ্রাস হয়, তখন বাইরে থেকে তো শক্তির সাড়া পাও না ; আবার যখন বাহিরে বিন্দুমাত্র উদ্বোধক পাও, তখন দুর্জ্জয় সিংহবিক্রমে তোমারই অন্তর জাগে ; তোমারই ইঙ্গিতে তখন ওই তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিশ্ববিজয়ের স্পর্দ্ধায় এগিয়ে যায়! তোমার এই তনুমন মগ্ন শুধু তোমারি কাজে ; শুধু তোমারি আনন্দের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকৃতির এই লীলামাধুরী। এই অপরূপ মাধুর্য্যলীলার স্বাদটুকু যাতে পূর্ণভাবে ভোগ করতে পার, তাই আগে দুঃখের তীব্র পরীক্ষা। ঐ কালোর পরেই নাকি আলো খোলে ভাল। জীবনের দুঃখ, ভয়, বিষাদ—ওগুলিকে যারা যত গভীরভাবে, ব্যাপক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সুখের, আনন্দের বা শক্তির আনন্দ-উৎস তাদের হৃদয়কেই প্লাবিত করে বেশী। জ্যোৎস্নার সেই প্লাবনেই—পরম জ্যোতিঃ-তেই চিত্ত সমাহিত হয়। সমাধি আনন্দের—দুঃখের নয়।

আমি আছি, তাই এই জগৎ আছে। পুরুষ নির্ব্বিকার, তবু তার অস্তিত্বেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। এই প্রকৃতি কি ? এক কথায় চেতনাচেতন নিখিল জগতের যা কিছু তোমার মনে হচ্ছে, তাই প্রকৃতি। আর আমি বা পুরুষ স্বরূপতঃ কি ? সাংখ্যের ভাষায় বল্‌তে হয়—"তদ্বিপরীতস্তথা পুরুষঃ।" আমি কি, পুরুষ কি, এর উত্তরে যতই নিঃসঙ্গ, অব্যয় প্রভৃতি পুরুষের বিশেষণ লাগাও, কিছুতেই তা বোধগম্য হয় না—কারণ তোমার মন-বুদ্ধি অহঙ্কারাদিও যে প্রকৃতি! কাজেই তাদের মাঝে থেকে তদ্বিপরীতকে বুঝবে কি করে ? তাই আগে তোমাকে অর্থাৎ তোমার এই ব্যক্ত রূপের চরিত্রকে, জীবনকে সমগ্র জগৎকে বোঝ। এই জগন্ময়ী প্রকৃতিকে আগে বোঝ। তারপরে জেন, যিনি সেই প্রকৃতি হতে বিভিন্ন, তিনিই পুরুষ বা সকলের "আমি।" তোমার শাস্ত্রে বল্‌বে—

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥

কার্য্য (শরীর) ও কারণের (সুখ-দুঃখের সাধন বা করণ স্বরূপ ইন্দ্রিয় নিচয়ের) মূল হল প্রকৃতি ; আর সুখদুঃখের যে ভোগ হয়, তার কারণ হল পুরুষ। যদি বল, কি রকম? প্রকৃতির যদি কর্তৃত্বই না থাকল, সে যদি অচেতন রূপেই তোমার সাংখ্যে উক্ত হল, আর পুরুষও যদি নির্ব্বিকার, তবে তোমার এ কথা মানি কি করে? তবে শোন।—

অয়ং ভাবঃ—যদ্যপাচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপাবিকারণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি ; তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বং, তচ্চ চেতনস্যাপি চেতনা-দৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি—যথা বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং, বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে।—শ্রীধর স্বামী

—যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বয়ংকর্তৃত্ব সম্ভব নয়, তেমনি অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব যদিও সম্ভব হয় না, তবু কর্তৃত্ব বল্‌তে ক্রিয়ানির্ব্বাহ, এবং তাহা চেতনের চৈতন্য আছে বলেই অদৃষ্টবশে ওরূপ হয়ে থাকে ; যেমন অগ্নির শিখা উপরে ওঠে, বায়ুর গতি বাঁকা বা নিম্নদিকে, অথবা বাছুরের অদৃষ্টবশে সে কাছে গেলেই মায়ের স্তন্যক্ষরণ (বা আকুলতা) আসে, তেমনি পুরুষের কাছে প্রকৃতি থাকাতে (তাদের সংযোগ থেকে) প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। ভোক্তৃত্ব বল্‌তে সুখদুঃখের জ্ঞান। তাহাও প্রকৃতির সন্নিধানে পুরুষ থাকাতেই সেই জ্ঞানরূপ চেতনের ধর্ম্ম হতে পুরুষকে সুখদুঃখের ভোক্তা বলা হয়।

মোট কথা, পুরুষরূপে আমি আছি বলেই প্রকৃতিরূপা জগৎ চলছে—এই হল শাস্ত্রেরও অভিমত, অনুভূতিরও মূল কথা। পুরুষ প্রকৃতির পরিচয় ও কার্য্য নিয়ে শাস্ত্রে মারামারির অন্ত নাই, কিন্তু মনন-শীলের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনেই তা বুঝবার পক্ষে কত প্রমাণ ঘটে। কিন্তু শুধু বুদ্ধিতে বুঝলেই হবে না। চলতে ফিরতে শাস্ত্রের বাণী যেন পথপ্রদর্শক হয়। শাস্ত্র কোথাও হীন দুর্ব্বল হতে বলে নাই, কর্ম্মফল ত্যাগ বা সমর্পণের কথা বলতে গিয়ে নিরুৎসাহ হতে বলেনি। বরং "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত" হবার উপায়ই বাৎলে দিয়েছে। প্রারব্ধ ভ্রান্তির বশে হয়ত আশার গাছে ফুল ফোটে না—ব্যর্থতার মাঝ দিয়েই জীবনে চলতে হচ্ছে এতদিন, কিন্তু তাতেই কি সব পণ্ড হয়ে হয়ে গেল, ফলিয়ে তুলে দেখাতে না পারলেই কি সমস্ত বিফল? এই হতাশার দোলায় মন দুলছে বলেই যে ভগবান্ নিজ মুখে তোমার কর্ণে গীতামৃত ঢেলে দিচ্ছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

তবে আর তোমার নিরাশ প্রাণে হাত-পা গুটিয়ে অকর্ম্মে মন যাবে কেন? "তোর আশার লতা পড়বে ছিঁড়ে হয়ত রে ফল ফল্‌বে না—তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

বুদ্ধি ও হৃদয়

—*—

বুদ্ধি দিয়ে জেনেও যে আমাদের পরিতুষ্টি আসে না, তার কারণই হল যে বুদ্ধির চেয়েও বড় আরও কোন authority রয়েছে। আমরা সব দিক্ দিয়ে অর্থাৎ যুক্তিবিচারের দিক দিয়ে সুপক্ক হয়েও, অন্তরের অভাব মিটাতে পারি না। এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যা নাকি যুক্তি বিচারের মাপ-কাঠিতে কিছুতেই ধরা পড়ে না। কাজেই তখন ব্যাকুল হয়ে উঠি!

কোন যুক্তি নাই, বিচার নাই অথচ আমাদের প্রাণের সঙ্গে সে কথা মিলে যায়, এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখ্‌তে পাই। এই জন্যই অনেক সময় দেখি,

হয়ত যুক্তি-বিচার করে যে সমস্যার সমাধান কিছুতেই পাইনি, একটী লোকের সামান্য একটী কথায় সে সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গিয়েছে। তখন অবাক্ হয়ে ভাবি, তাই তো, এ হল কি করে! আমাদের প্রাণ কিন্তু চায় এই direct অনুভূতি অর্থাৎ তার মাঝে কোন medium থাক্‌বে না। যুক্তি-বিচার দিয়ে যা বুঝি, তা ঠিক্ directly বুঝা নয়। সহজে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না বলেই, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, নানা তর্ক যুক্তি-উদাহরণ দিয়ে বুঝ্‌তে হচ্ছে। অথচ এই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝার নামই পাণ্ডিত্য! এই পাণ্ডিত্যে তো মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে না।

দূর থেকে অনুমান করে, যুক্তি দিয়ে কারও চরিত্র বোঝা যায় না; এই জন্যই psychologistদের অনেক সময় মারাত্মক ভুলও হয়ে যায়। অপরের চরিত্র বুঝ্‌তে হলেই চাই নিজের মাঝে ধ্যানস্তব্ধতায় ডুবে যাওয়া। তখন আর বাইর থেকে কিছু হাৎড়াতে হয় না—সব প্রশ্নেরই সেই এক আত্মকেন্দ্র হতে উত্তর আসে। বুঝ্‌তে হলে চাই—অবাধ মিলামেশা, দূর থেকে নয়, একেবারে কাছে ঘেঁসে, প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হয়ে।

মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়ে যে জানা, সেই জানাই হল আসল জানা। আর সেই জানা কোন ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ নয়। একেই আজকাল সহজাববোধ বা অন্তশ্চৈতন্য বলা হয়। Thomas Carlyeও এ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কয়টী কথা বলেছেন। "It is thought, the genuine thought of deep, rude, earnest minds, fairly opened to the things about them, a face-to-face and heart-to-heart inspection of the things—the first characteristic of all good thought in all times." হৃদয় দিয়ে এবং সাক্ষাৎ মুখামুখি হয়ে আমরা যা জানি, তাতে আমাদের তৃপ্তি হয়, আর স্বরূপতঃ জানা ব্যাপারটাও তাই। তার মাঝে কোন ব্যবধান থাকে না—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় সব একাকার—এরই নাম heart to heart জানা। জানা মানেই হওয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা জানতে গিয়ে—"তৎভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।" রাধা-ভাবসমন্বিত হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীর-সমুদ্রে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাজেই জানা মানেই হল তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে যাওয়া। ব্যবধান থাক্‌বে না তার মাঝে।

বুদ্ধি দিয়ে যা জানি তা খণ্ডিত, তাই সম্পূর্ণভাবে জান্‌তে হলে বুদ্ধির প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির মরণ হলেই—আত্মার জ্যোতিঃ এসে দেহ মন-প্রাণ সবকে পূর্ণ করে উদ্ভাসিত করে তুলে। তন্ময় হয়ে যেতে না পার্‌লে ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় না। আমরা সাধারণতঃ যা জানি এবং যে-জ্ঞান লাভ করি—সে হচ্ছে আমাদেরই বুদ্ধির পরিমাপে। কাজেই নিজের অর্জিত ধনে ঠিক ঠিক তৃপ্তি আসে না! বিরাট্-পুরুষের মহান্ ইচ্ছাকে বাধা দিয়ে আমরা কিছুতেই সেই দুর্ল্লভ-শক্তির অধিকারী হতে পারি না!

আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে যে চোখ ছাড়া বুঝি দেখা যায় না, কাণ ছাড়া বুঝি শুনা যায় না, কিন্তু কোন কোন সময় দেখি ইন্দ্রিয়েরও বিপর্য্যয় হয়ে যায়। তখন বিশ্বাস হয়—সব দ্বারাই সব সম্ভব! বুদ্ধি দিয়ে আমরা জগৎটাকে একটা নিয়মের মাঝে বেঁধে ফেলেছি—কিন্তু নিয়মাতীত যে নিয়মের মাঝেই বিরাজমান! বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে পেরে উঠে না। বিচার কর্‌তে কর্‌তে বুদ্ধিও শেষে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে। এটা দুর্ব্বলতা নয়—তার সীমা এবং শক্তি শেষ হয়ে যায় বলেই অমন হয়!

বুদ্ধির মাঝে শুচিবাই জিনিষটা রয়েছে—অনেক সময় দরদহীন হয়ে তার তীক্ষ্ণ-বিচার-শলাকা অন্যায়-ভাবে ইষ্ট জিনিষকে প্রত্যাখ্যান করে। হাজার হলেও

বুদ্ধি একটু না একটু আলগোছা ভাবেই থাক্‌তে চায়. সে কারও সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যেতে চায় না। কাজেই বুদ্ধির কাছে কোন বিষয়েই যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে না! অর্থাৎ অখণ্ডভাবে কোন কিছু জানার এক্তিয়ার বুদ্ধির নাই। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয় জিনিষটা থাকে, তাহলেই বিচারের মাঝেও একটা সার্থকতা আসে। কিন্তু হৃদয়হীন বিচারে অপরকেও আহত করে—বিদ্ধ করে, আর নিজের প্রাণেও শান্তি এনে দিতে পারে না।

"অনুভূতি" বলে একটা কথা আছে, একে দিয়েই বেশ বুঝা যায়। যার সম্বন্ধে অনুভূতি হয়, তাকে যেন আমরা মন-প্রাণে মিশিয়ে একীভূত করে জান্‌তে পারি। সে জানা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জানা—কাজেই বিশেষ করে বলা যেতে পারে না যে, আমি এর সাহায্যে জান্‌তে পেরেছি। দৈবাৎ আমাদের এই উচ্চাবস্থা লাভ হয়!

কারও সম্বন্ধে স্বরূপতঃ জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌তে হলেই, তার ধ্যানে চিত্তকে লয় করে দিতে হয়! এরূপ ধ্যানস্তব্ধতায় নিলীন হয়ে যেতে পার্‌লে, বুকের মাঝে এক অব্যক্ত স্পন্দন চল্‌তে থাকে, সেই স্পন্দনের মাঝেই অপরের প্রাণের কথার ইঙ্গিত থাকে। কাজেই চোখ মেলে নিরীক্ষণ করার চেয়ে—চোখ বুজে ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতে পার্‌লেই স্বরূপজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের এক জায়গায় আশ্চর্য্য মিল রয়েছে, আর সেই মিলের কোন হেতু নাই—কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর! কাজেই প্রাণ খুলে সেই মিলন-কেন্দ্রে মনকে নিবিষ্ট কর্‌তে পার্‌লেই সব রহস্য ধরা পড়ে যায়। নিঃসংশয় হয়ে, সহজ সরল ধ্যানে মনকে ডুবিয়ে দিতে পার্‌লেই, যে কোন বিষয়েরই তত্ত্ব স্বতঃই প্রাণে স্ফুরিত হয়ে ওঠে!

নিজের মাঝেই অতল-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কিছু জান্‌তে হলেই যে মুনি-ঋষিরা পুথি-পত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি না করে, ধ্যানের মাঝে নিজকে তন্ময় করে দিতেন, এর কারণও তাই। প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ রয়েছে, কাজেই হৃদয়বানের প্রাণে অপরের হৃদয়েরও সাড়া আসে!

আমরা তত্ত্ব জান্‌তে গিয়ে পুথি-পত্র নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করি, কিন্তু তাতে একটা ওপরভাসা জ্ঞান হয় মাত্র। জানার পথ এ নয়—জানতে হলেই ধ্যানে নিমগ্ন হতে হবে—মৌন হতে হবে। হৃদয়ের সংযোগ-সূত্রটা ধর্‌তে পার্‌লে নূতন নূতন সাহিত্যের, বিজ্ঞানের সৃষ্টি হওয়াটা একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কাজেই বুদ্ধির চেয়েও বড় জিনিষ হল মানুষের হৃদয়। সে হৃদয়ের মাঝে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা জান্‌তে হলেই ধ্যানী হওয়া চাই।

তর্কবুদ্ধি

—*—

"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া—মতি (বা প্রকৃত অনুভব) তর্কবুদ্ধির অগম্য। অনুকূল তর্কে বুদ্ধি বিশদ হৌক্, বুদ্ধির বৈশারদ্যে মতির স্ফুরণ হইবে, তখন ঠিক তাৎপর্য্য ধরিতে পারিবে।"

এ বুদ্ধি কোন্ বুদ্ধি? "ইহকাল বিনে কিছু নাই—অন্তরলোক, ঊর্দ্ধলোক, পর-লোক বা দেবতাদি সমস্ত কবির কল্পনার মত অসম্ভব", অর্থাৎ অসম্ভব বল্‌লে এই স্থূল জগতের নিরেট বস্তু বিনে যেন আর কিছুই নয়। আর দেবতা বা ঊর্দ্ধলোক বল্‌তে অমনি নিরেট কিছু না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না এমন ধরণের বুদ্ধি।

প্রথম শুনতে মনে হয়, খুবই বুঝি তেজীয়ান্

সাধক—নতুবা কি অমন প্রত্যক্ষ দর্শনের দাবী করে! কিন্তু মজা এই যে, যদি বলা হয়—বেশ তুমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে না ডেকে দেখ না, কিন্তু যদি আমাকে বিশ্বাস করেই অর্থাৎ তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার শক্তি আমার আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে থাক, তবে আমি উত্তর দিতে রাজী আছি; তোমার যাতে সত্যিকার আস্তিক্য বুদ্ধি হয়, তেমন ভাবে শাস্ত্রীয় বা মহা জনানুমোদিত পন্থায় তোমার নাস্তিক্য যুক্তি অসাড় করে দেব; কিন্তু বল, তার পরে থেকেই তুমি ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে হলেও করবে! এতটুকু জোর তোমার আছে তো?" অমনি মন ফিরে যাবে!

ভগবান, পরকাল ইত্যাদি তর্কের বস্তু নয়—সমস্ত হৃদয় দিয়ে 'সে যে প্রাণের প্রাণ' এই ভেবেই প্রাণপণে ডাকতে হবে আগে, দেখা পাবে তার পরে।

"কেশব নয় তোর বাপের কেনা,
কাণে ধরে টেনে আনা—
সে যে শক্ত ষোল আনা, সোজায় ধরা দেবে না।
যেমন তেমন করে তাঁরে পাওয়া হবে না॥"

তুমি এমন কোন্ ব্যক্তিটা এলে যে তোমার কাছে সাধুগিরি ফলিয়ে ভগবান্ আছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে—নইলে তোমার কাছে সাধু নাম থাকবে না! বেশ তো, প্রকৃত সৎ ব্যক্তি সাধু নামের কাঙ্গাল নয়। তোমার যাই খুসী তাই তাঁকে ভেবো, তাই তাঁকে ডেকো। তোমার-আমার ন্যায় তুচ্ছাতিতুচ্ছের অমন ভাবনায় বা আহ্বানে তাঁদের কিছু যায় আসে না। তবে হাঁ, যদি বিবেকানন্দের মত 'তিনি আছেন, তাঁকে দেখা যায়, ইচ্ছা করলে দেখিয়ে দেওয়া যায়—স্থূলের চেয়েও অত্যধিক সুস্পষ্ট' একথা শুনে বিদ্যা-বুদ্ধি, মানসম্ভ্রমের গৌরব, আত্মীয়-স্বজনের প্রাণময় ভালবাসা, অর্থের প্রাণান্তিক মোহ, এসব ধূলির মত ঝেড়ে ফেলে ছেড়ে চলে আসতে পার, যদি আপন মন-বুদ্ধিকেও অসৎ জেনে সবশুদ্ধ সঁপে দিয়ে 'দেওয়ানা' সাজতে পার, পাগলা ভোলার মতই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ীকে ত্যাগ করে শ্মশানবাসী ভস্মমাখা পাগল সাজতে পার, তবে এখনও তেমন সৎগুরুর অভাব নাই। জহুরা হও—রত্ন চিনলে অভাব নাই।

*

কিন্তু তা হয় না। তর্কের খাতিরেই তর্ক হচ্ছে। সেও আসল তর্ক বলে তর্কশাস্ত্রে যাকে বলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর আকুল প্রাণের একান্ত এষণা, তা নয়। এই ধরণের তর্কে বাদ খুব কমই—জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি, নিগ্রহের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। তর্কে যুক্ত হবে বুভুৎসু হয়ে; কিন্তু এসব তর্ক হচ্ছে পরপক্ষ খণ্ডন—নিজ পক্ষ খণ্ডন, বা অনেক স্থলে নিজ পক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার কিছুই নাই, শুধুই কেবল পরপক্ষ খণ্ডন করা। এতে স্থূল বুদ্ধির শাণ দেওয়া বা স্থূলবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বাহবা পাওয়া হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত যিনি তত্ত্ববুভুৎসু, আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের ইচ্ছা নিয়ে যিনি প্রাণপণে ঘুরেও সে গহন বনে ঢুকবার পথ না পেয়ে হয়রাণ হয়েছেন, তাঁর প্রাণ এতে মজবে তো নাই-ই, বরং আরও উত্তরোত্তর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে আর প্রকৃত যিনি আধ্যাত্মিক পথে প্রবিষ্ট হয়ে অন্ততঃ কিছুদূরও অগ্রসর হয়েছেন, তিনি এ সমস্ত কুতর্ক-কারীদের সন্নিহিত হলেই যত শীঘ্র পারেন সেখান হতে সরে যেতে ইচ্ছা করেন। একমাত্র যিনি অমন কুতর্ককারীর সঙ্গে প্রারব্ধকর্ম্মবৈগুণ্যে সংশ্লিষ্ট আছেন, তিনিই হয়ত আপনার শক্তি বুঝে প্রাণের টানে দয়া করে অমন কুতার্কিককে পথে জোর করে টেনে আনেন। কিন্তু সবাইর জন্য সব নয়।

আবার এমন অধিকারীও আছে যে, সত্যই তারা ইচ্ছা করে কুতর্ক করে না, কিন্তু তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের বুদ্ধিই এমনি জটিল পথে যায় যে, সেই বুদ্ধি-প্রসূত সমস্ত বাক্যই কুতর্ক বলে মনে হয়। অনেক সজ্জন ব্যক্তিও হয়ত তাদের তর্কজালে বিরক্ত হয়ে চলে যান, অথচ তাতে সেই অনিচ্ছাবশতঃ তর্ককারীর প্রাণে আঘাতই লাগে। কিন্তু এমন অবস্থার অধিকারীরা কখনও দুর্বিনীত বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণসূচক ভাষা প্রয়োগ করে না। যথার্থ পরচিত্তানুধাবনকারী সজ্জনেরা এই ধরণের হতভাগ্য অধিকারীদিগকে বরং কৃপাই করেন। মোটের উপর কথা হল এই যে, তর্কের মাঝে যতই না কেন উচ্চাঙ্গের কথা প্রশ্নকারীর মুখ দিয়ে বের হোক্, যদি সে সমস্তের মাঝে তার বিন্দুমাত্র অহমিকার ভাব প্রকাশ না পায়, তাহলে সেখানে সেই কথা-শ্রোতার মাঝে অশ্রদ্ধার কিছু ঘটে না। কু-তর্কপ্রসূতা জটিল বুদ্ধিকেও সেখানে যাতে সরল পথে নিয়ে আস্‌তে পারেন, উপদেষ্টা আপন হৃদয় দিয়ে শ্রোতার মর্ম্ম বুঝে সেই চেষ্টাই করেন। অবশ্য এ তাঁর কৃপারই পরিচায়ক; কিন্তু অপর পক্ষও সে কৃপা মাথা পেতে নিতেই তার হৃদয়ের জঞ্জাল দূর করতে চায়—তর্ক করে।

তর্কের মাঝেও যেখানে হৃদয়ের ধর্ম্ম শ্রদ্ধা নিহিত না থাকে, সেখানে পরস্পর পরস্পরের উপর বিদ্বিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আবার তর্কের মাঝে উপর-ভাসা রকমের শ্রদ্ধা বা ভদ্রতা থাক্‌লেও সেখানে তর্ক বা বিপরীত ভাবে কোনও প্রশ্ন করা চলে না। কারণ ভয় হয় যে, পাছে অমন প্রশ্নে তাঁকে অপ্রস্তুত বা মনঃক্ষুণ্ণ করা হয়! যদি হৃদয়ে হৃদয়ে এমন যোগ থাকে যে যেখানে মতের মিল না হলেও মনের মিল না হবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, তবেই প্রাণ খুলে সেখানে সকল কথাই মুখে বলা যায়। কিন্তু তবু বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী যথেষ্ট শ্রদ্ধাব্যঞ্জক বা ভাষার ও হৃদয়ের গুরুত্ব না থাক্‌লে সেখানেও অভীষ্ট ফল পাওয়া দুষ্কর। আমার একান্ত আপন জন বলেও আমার অমার্জ্জিত রুচির, চপলভাবের অসংলগ্ন ভাষায় যা-ইচ্ছে-তাই জিজ্ঞাসা করার অধিকার বা বিধান নাই। কারণ যিনি উত্তর দিবেন, তিনি আমার যেমন আপন জন, তেমনি শাস্ত্র ও সাধুজনানুগত পন্থায় চল্‌তেও এমনি অভ্যস্ত যে, আমার অনুরোধেই উনি সে পথ ত্যাগ করতে পারেন না; কেননা তবে আমারও যে শ্রদ্ধা তাঁর উপর আর থাকতে চাইবে না। কাজেই উভয়পক্ষেই যথাযথভাবে প্রশ্ন মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে—"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।" কেহ জিজ্ঞাসা না করলেও যেমন বলবে না—আবার অন্যায়ভাবে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—এমন অনেকদিন হয়েছে, মহাপুরুষের কাছে প্রাণের আবেগে কত কিছু বলে গিয়েছি, তার উত্তরে তাঁর গাম্ভীর্য্য ভেদ ক'রে একটু করুণ চাউনি পর্য্যন্ত পাইনি, উত্তর তো দূরের কথা। অথচ আবার এমন সময়ও গিয়েছে, 'ক' বল্‌তেই 'কৃষ্ণ' বুঝে নেওয়ার মত আমার প্রাণের কথা তিনি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে নিজেই আবার তার সমাধানে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছেন। সেই জলদ্-গম্ভীর স্বরলহরীর প্রত্যেকটী শব্দ যেন হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আর অন্তরের উদ্বেল ভাবসমূহকে আরও তোলপাড় করে সব শুদ্ধ তাঁর পায়ে নিয়ে শান্ত করে দিয়েছে;—যত কথা, যত প্রশ্ন, আমার অস্ফুট ভাষায় অব্যক্ত থেকে হৃদয়ে গুমরিয়ে মরছিল, সব যেন সেই মহাত্মার ভাবের সংস্পর্শে জল হয়ে গ'লে বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছে। আর এক এক সময়ে কিনা তাঁর স্নেহভরা তিরস্কারদৃষ্টিটুকুও সহজে পাইনি!

কেন এমন হয়েছিল? বুঝ্‌তে হবে, আমার প্রশ্নের মাঝেই কোথাও এমন কিছু প্রকাশ পেয়ে-

ছিল, যার উত্তর দিলে অন্যায়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হত। তখন পর্ব্বতপ্রমাণ অভিমানের চাপে পড়ে কিছু না বুঝলেও অমন ভাবে উপেক্ষিত হয়ে পরে বুঝতে পেরেছি—কেন উত্তর পাইনি বা কোথাও আমার গলদ ছিল। অমন মৌন উপেক্ষা দ্বারা তিরস্কৃত হয়েই না তখন আত্মানুসন্ধানে রত হয়েছিলাম! কাজেই প্রশ্নের উত্তরে শুধু মুখের জবাবই সব সময়ে উত্তর বলে গণ্য নয়। মুখের জবাবের চেয়েও শক্তিশালী এমন জবাব রয়েছে যে, নীরব হয়েও তা বজ্রকঠোর নিঃস্বনে অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলে। এমন ভাবে এক মহাবীর্য্যবান্ সাধক এক সময়ে মহাতান্ত্রিক মহাপুরুষ মহাত্মা বামাক্ষেপার কাছে সাধন বিষয়ে আপন জটিল বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত বাক্য বিন্যাসে যখন আপন মত ব্যক্ত করেছিলেন, তখন অমন বালকের মত তাঁর সদা প্রফুল্ল মুখখানাও গম্ভীর হয়ে উঠল। অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তুলে বজ্র-নির্ঘোষে তিনি বলে উঠলেন—"আগে আমি যা বলি, তা কর, তার পরেও যদি মনে কিছু উঠে, তখন বলো।" সত্যই মহাপুরুষের সেই গম্ভীর বাক্যই আপ্তশ্রুতি হয়ে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করল। অমন বীর সাধকের অন্তরও সেই মহাবাণীতে প্রকম্পিত হয়ে আর দ্বিতীয় উত্তর না দিয়ে তৎক্ষণাৎ তদুক্ত সাধনায় নিরত হল এবং সাধনান্তে "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" বাক্যের প্রত্যক্ষানুভবে জীবন ধন্য করতে সক্ষম হল।

চাই এমনি জীবন দিয়ে সাধনা, শুধু মুখের কথা নয়। যা কিছু মনে এলেই অবিচারে বলে ফেলাই সরলতা নয়। বিচারের পরে আপন বুদ্ধির দৌড়েও মীমাংসায় উপনীত হতে না পারলে সেই অক্ষমতা প্রকাশই সরলতা;—তাও যেখানে-সেখানে, যেমন-তেমনভাবে যার-তার কাছে নয়। Everything has its own value—প্রত্যেক বস্তুরই নিজস্ব একটা মূল্য বা গৌরব আছে। সেই গৌরব রক্ষা করে, বিষয়ের গুরুত্বানুসারে যোগ্য পাত্রে, যোগ্যকালে যোগ্যস্থানে জিজ্ঞাসা চাই। সব চেয়ে যোগ্য চাই হৃদয়খানি। বুদ্ধির মারপ্যাচ দেখিয়ে পাণ্ডিত্যের গৌরব লাভ হলেও হৃদয় তাতে ভরে না। প্রাণভরা হাহাকার গোপন করে সাধু-সন্ন্যাসীরা মহাজনদিগের কাছে পাণ্ডিত্য জাহিরে ঠকতে হয় নিজকেই। তাঁরা যা দিতে চেয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে নিয়ে তাকে শুধু অভিমানটাই সম্বল করে থাকবার সুযোগ দিয়ে যান। যে বুদ্ধি তাকে এমনিভাবে প্রবঞ্চিত করে, বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষায় তা 'অসতী বুদ্ধি'। সতী স্ত্রীর মত সে স্বামীর মঙ্গল সাধন না করে স্বামীর বিনাশের পথই মুক্ত করতে চায় বেশী। অবিদ্যার প্রধান দূতীই অসতী বুদ্ধি। ঘরের ভিতর শত্রু পাঠিয়েই, সেই দুষ্টা সরস্বতীকে দিয়েই তিনি জীব-কুল ধ্বংস করেন। এই দুষ্টাবুদ্ধিই তর্কবুদ্ধির প্রসূতি;—সুতরাং হেয়া পরিত্যজ্যা।

কথা হচ্ছে, শাস্ত্রে যাকে অনুকূল তর্ক বলা হয়েছে, সেই তর্কের প্রতিষেধ উক্ত উপনিষদ্বাক্যের প্রতিপাদ্য নয়। প্রতিপাদ্য এই যে, তর্কই চরম নয়—চাই হৃদয়ের একাগ্র জিজ্ঞাসা ও সরলতা, অমর্ম্মপীনতা। তর্কবুদ্ধির সঙ্গে স্বানুভূতির মিলন ঘটাতে পারলেই শাস্ত্রজিজ্ঞাসা সার্থক হয়—এবং জ্ঞাতব্য তত্ত্বের প্রকৃত রসবোধ হয়। যাঁরা মতিমান্ অর্থাৎ সমজদার, তারা তর্কে কিছু আয়ত্ত করতে চান না—প্রয়োজন মত তর্কের আশ্রয় নিলেও তাঁদের মতিচ্ছন্ন ঘটে না। তর্কবুদ্ধির যথাযথ নিয়ন্ত্রণেই "সা মতিরাপনেয়া, ন তু তর্কেন"—এই হল তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রের রহস্য

—(*)—

রসিকের কাছেই রসবস্তু ধরা পড়ে, অরসিকের কাছে নয়। তাই রসিক কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—"অরসিকেষু কবিত্ব-নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ।"—"ভগবান, আর যাই কর, অরসিকের নিকট কবিত্বরস নিবেন, এটী যেন আমার কপালে লিখিও না।" প্রাণের অতলস্পর্শ যে বাণী মুখ দিয়া একবার বাহির হইল, তাহা আমারই একান্ত প্রাণের বস্তু, কিম্বা অপরের অন্তরকেও তাহা মাতাইয়া তোলে, মানুষ সব সময়ে তাহা পরীক্ষা করিতেই যায় না; একান্তভাবে সে বিশ্বাস করে যে, এই বাণী যখন আমার কাছে এমন নিগূঢ় ভাবের উদ্বোধক হইয়াছে, তখন আমার যাহারা সহৃদয়ী, সে সব মানুষও আমারই মত, এই কথা দ্বারা তাহারা এমনই ভাব গ্রহণ করিবে। এই স্থির বিশ্বাস হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল করিয়া সে নিজের উপলব্ধ বা প্রাপ্ত ভাবটা অপরের কাছে প্রকাশ করে। তখন তার এমন বিচারের কথা মনে উঠে না, যার কাছে আমার এই ভাবটি ব্যক্ত করিতে যাইতেছি, সে সত্যই আমারই মত হইয়া, আমারই চক্ষু দিয়া এইটা দেখিবে কি না। ভাবের আতিশয্যে বাহিরকে সে এমনই আত্মগত করিয়া লয়। এ কি তাহার সঙ্কোচ, না বিকাশ?

বাহিরকে অন্তরস্থ ভাবে ভাবিত দেখাতে, পরকে আপন অন্তর দিয়া বিচার করাতে, অনেক সময়ে বাহিরের জগতে ঠকিতে হইলেও, সাময়িক ভাবে মন ক্ষুব্ধ হইলেও, অন্তর্জ্জগতে সেই সরল ও উদারচেতাই যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা অপর সকলেই স্বীকার করিবে; এমন কি সেই সরল বিশ্বাসীকে বোকা বানাইয়া যে প্রতারক আজ নিজের বুদ্ধির গৌরবে মনে মনে আত্মগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিলেন, তিনিও এক সময়ে তাহার নিজের এই অতিবুদ্ধির দরুণ গলায় দড়ি দেখিয়া অনুতপ্ত না হইয়া পারিবেন না। তবে হয়ত সে দুদিন পরে হইতে পারে। আশু জিতিয়া যাওয়াটাই যখন লক্ষ্য হয়, তখন পশ্চাতের পরাজয়ের বড় ক্ষতিটাও তত লক্ষ্য হয় না। কারণ, সে ক্ষতির আঘাত এখনই প্রাণে বাজে না, পরন্তু বর্ত্তমানের বোঝাটা নিতান্তই পীড়াদায়ক। অগ্রের ও পশ্চাতের সমস্ত অবস্থা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না—ইহাতেই দৈনিক জীবনের অহরহঃ যে ঘটনা-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার সে বেগের কাছে মানুষের গর্ব্ব যে কত ক্ষুদ্র, তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। তথাপি মানুষ আপন আবেগে আপন প্রাণের একান্ত অনুভূত সত্যটী অপরকে শুনাইতে ব্যগ্র হয়—ভবিষ্যৎ স্মৃতির ভাণ্ডারে তাহাকে অনড় করিতে চায়। কে কি বলিবে, কে বুঝিবে, হাসিয়া উড়াইবে কিনা, তাহার বিচার সে তখন করে না—জানাইবার, দিবার উন্মাদনায় সে পাগল হয়।

ভারতের গৌরবের বিশেষ বস্তু উপনিষদসমূহ যেন এমনি প্রত্যক্ষানুভূত পরম সত্যের এক একটী অভিনব বিকাশ। ঋষির তপোনিষ্ঠ জীবনে যে সত্যটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, শিষ্য প্রশ্ন নিরসনাবসরে বা শুধুই আপন অব্যক্ত ভাবকে জগতের হিতের জন্য ব্যক্ত করার প্রচেষ্টায় এই বাণীসমূহের উদ্ভব। ইহাদিগকে মন্ত্রও বলা হয়, কারণ, শুধু গল্প শোনার মত এইগুলি শ্রুতিগোচর করিলেই ইহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা যায় না। বিশেষ করিয়া মনন করিতে পারিলে তবেই তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সংসারের নিত্যলভ্য সংশয়জ্বালা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাই ইহাদের নাম মন্ত্র। 'মননাৎ ত্রায়তে।' বেদান্তের, উপনিষদের, সাংখ্যের বিশেষত্বই এই যে "মননাদেব ত্রায়তে।" মনন করিতে পারিলেই ত্রাণ পাওয়া যায়—বিশেষ করিয়া যাগ-যজ্ঞ,

ব্রত-তর্পণ প্রভৃতি ধনাদি-শক্তিবহুল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই কর্ম্মযোগ হইতে ইহাদিগকে বিশেষ আখ্যা দেওয়া হয় "জ্ঞানযোগ।" কর্ম্ম বা ভক্তিতে যে জ্ঞান না হয়, এমন নয়, তবে তাহাদের সাধন, কর্ম্ম বা ভক্তিমূলক ; আর এই জ্ঞান যোগের সাধনও জ্ঞান মূলক।

উপনিষদ্ সর্ব্ববাদীর পক্ষেই প্রযুজ্য হইলেও বিশেষ করিয়া ইহা জ্ঞান-বাদীদেরই একান্ত প্রাণের জিনিষ। সাধনায় প্রাণ নিঙারিয়া যে সমস্ত সত্যের সাক্ষাৎকার হয়, উপনিষদে যেন শিশুর মত সরল ভাষায় তাহা ব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু শিশুর উচ্চারিত স্পষ্টাস্পষ্ট-মিশ্রিত বাক্যসমূহের মাঝ হইতে তাহার মাতা যেমন অর্থ নিষ্কাসন করিয়া মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, তেমনি উপনিষদের বাণীও সাধনতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া তাহার প্রকৃত রস উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরের কাছে তাহা দুরূহ বা নিরর্থক বাক্য-বিন্যাস-রূপে মনে হওয়া বিচিত্র নহে তাই বেদের মন্ত্র 'চাষার গান' আখ্যাও পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এখানেই অরসিকে কবিত্ব নিবেদন হইয়াছে। বাল্য-কালে গানের পদ গাহিয়া যাওয়ার পর গায়কের মুখে সেই সুরের কালোয়াতী শুনিয়া অনেক বালকই উপ-হাস করিয়া তাহার বিকৃত অনুকরণ করে। কারণ তাহাদের কাছে সেই অঙ্গভঙ্গী সহকারে সুরভাঁজা সত্যই নিরর্থক মনে হয়। অথচ প্রকৃত গানের রস-বেত্তা বা যাহাদের সুরের বিশেষত্ব বোধ রহিয়াছে, তাঁহারা গায়কের মুখে সুরভাঁজা বা সুরভঞ্জন অর্থাৎ অন্য সুর হইতে তাহার পার্থক্য বিভাগের ওস্তাদী দেখিয়া সে কেরামতের তারিফ না করিয়া থাকিয়া পারেন না।

উপনিষদের মন্ত্রসমূহ প্রথম দৃষ্টে অসাধকের কাছে এমনি অর্থহীন বা রসহীন মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন একস্থানে আছে—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"

—তিনি অজড় ও জড়, নিকটে ও দূরে, অন্তরে, সকলের বাহিরেও ইত্যাদি। অর্থাৎ বিপরীত গুণ-সমূহ, যাহা একটী অন্যটীর বর্ত্তমানে থাকিতে পারে না, সেই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং রহস্যময় হওয়াই স্বাভাবিক। ঠিক এই ধরণের একটী শ্লোক গীতা-তেও আছে, যথা—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

—তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরও, বাহিরও ; স্থাবর তিনি, জঙ্গমও তিনি। সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয় ; তিনি দূরে আবার কাছেও। আপাত-দৃষ্টিতে একটা গুণের বিরুদ্ধ ঠিক অপর একটী গুণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার মাঝে সমস্তের সমাবেশ হইয়াছে ; সুতরাং, এক কথায় যদি বলা যায় যে, তিনিই সব, তবেই তো মিটিয়া যায়—অমন পৃথক পৃথক বিশেষণ দেওয়া কেন ? আর যে কোনও বিরুদ্ধ বিশেষণ দিলেই কি হয় ?

শ্রীধর স্বামী সাধকসুলভ সমন্বয়-দৃষ্টি লইয়া এখানে ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা, ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ, তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলা-দীনাং জল-তরঙ্গানামন্তর্ব্বহির্জ্জলমিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং যদ্ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যাত্মা। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি স্পষ্ট-জ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবি-দুষাং যোজন লক্ষণান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতং। তথাচ মন্ত্রঃ 'তদেজতি নৈজতি' ইত্যাদি। এজতি চলতি, নৈজতি ন চলতি, তৎ উ অন্তিকে ইতি ছেদঃ।"—অর্থাৎ তিনি স্থাবর জঙ্গমা-ত্মক সমস্ত কার্য্যের অন্তর ও বাহির। কি রকম ? যেমন

সুবর্ণ। সুবর্ণনির্ম্মিত যে অলঙ্কারই তৈরী হউক, তাহার অন্তর বাহির উভয়ই স্বর্ণময়। জলের ঢেউএর ভিতর ও বাহির যেমন জলময়ই হয়, তেমনি। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত কার্য্য ও তাঁহার কারণ তিনিই। রূপাদি শূন্য বলিয়া সূক্ষ্ম সুতরাং সকলের জ্ঞানের যোগ্য নন। কাজেই যাহারা আত্মবিদ্যায় পারদর্শী নহে, তাহাদের কাছে অর্থাৎ অজ্ঞানীদের কাছে যেন বহু যোজন দূরস্থ, কেননা তাহারা যে প্রকৃতির অধীন। কিন্তু আত্ম তত্ত্বজ্ঞের কাছে তিনি প্রতি জীবের মাঝে সুতরাং তাহার নিজের মাঝেও আছেন বলিয়া নিতান্ত নিকটের বস্তু ইত্যাদি।

ঋষির ধ্যানস্থ হৃদয়ে যে রূপ ফুটিয়া উঠে, সাধারণ মানুষের ভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে কিরূপ দেখায়, তাহাই ব্যক্ত করিতে গিয়া আসল স্বরূপ ও বিকৃত মনে তাঁহার যে রূপ, এই দুইটীর সংমিশ্রণে উপনিষদের বক্তব্য আমাদের হৃদয় দিয়া বুঝিতে রহস্যময় বোধ হয়। ঋষি তাঁর উপলব্ধ সত্যকে অতি-প্রাঞ্জলভাবে বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সে ভূমি হইতে সে বাণীর মর্ম্ম ধরিতে পারিতেছি না -- অসাধক হৃদয়ে শুধু কেবল বুদ্ধির কেরামতী দ্বারা আর কতদূর বুঝা যায়? সে বুঝা পণ্ডিতের বুঝা, তাহাতে কতদূর গিয়া বুদ্ধির হার মানিতে হয়, নতুবা অসম্ভব এমন একটা কিছু মানিতে হয়, যাহাতে শাস্ত্রের মর্য্যাদা না রাখিয়া তাহাকে উন্মত্তের প্রলাপ, চাষার গান, বা এমনি ধরণের একটা কিছু বলিয়া সংজ্ঞা দিতে হয়। কারণ, যাহা বর্ত্তমানে কেহ বুঝিতে বা ধরিতে পারে না, তাহাকে শুধু অজ্ঞাত মহিমাময় বলিয়া আর শ্রদ্ধা দেখাইতে মন সরিবে কেন! কিন্তু বুঝিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন, এই কথা মনে আসে না।

সাংখ্যকারিকার টীকা করিতে যাইয়া ষড়্দর্শন-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যে প্রথমেই নমস্কার-শ্লোকটী উপনিষদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ নুমস্তান্॥

এই শ্লোকটীও বিদেশীর হাতে পড়িয়া সাদায় লালে কালোয় একটী ছাগলের সঙ্গে অন্য ছাগলের সঙ্গম বর্ণনারূপ কুৎসিৎ বা অশ্লীল বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাই কবির ভাষায় উপনিষদ্-কারকেও বলিতে হয়, 'অরাসকে কবিত্বনিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ।' উপনিষদের বাণী, গীতার ভাব বা শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে শুধু ভাষার শব্দগত অর্থের মার-প্যাঁচ লইয়া কি কি হইবে, যদি তাহা হৃদয়ের সঙ্গে জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে নিতান্ত বন্ধুর মত উদ্বুদ্ধ না করিল? আমাদের দেশের শাস্ত্র শুধু বিদ্যার কারিগরী নয়—জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ার অপূর্ব্ব নির্দ্দেশ। সে নির্দ্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালন করিলে তবেই সে পথে আলোকোদ্ভাসিত মনে হয়; নতুবা দূর হইতে অন্ধকার দুর্গম কুজ্ঝটিকা হইয়া চিরকাল গহন, অগম, অজ্ঞেয় প্রভৃতি নেতিমূলক অর্থাৎ 'কিছু নাই' এই সংশয় ও অবিশ্বাসেই মন আজীবন দুলিতে থাকে। তেজস্কর বিশ্বাস বা দৃঢ় অবিশ্বাসও সেখানে স্থান পায় না।

শান্ত শাসন

—*—

"অন্যায় করেও যে মানুষ বলে, 'বেশ করেছি, ভাল করেছি, তাতে কি হয়েছে, আরও করব।'—এ কথাগুলো যে কিন্তু দোষ করে, তার প্রাণের ঠিক্ ঠিক্ কথা নয়। অন্যায় করে তার মনেও দ্বন্দ্ব লেগে যায় বলেই, রাগে অভিমানে ঠিক তার মনের উল্টো কথাটাই বের হয়ে পড়ে। এ সময় যারা বাস্তবিকই হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের চুপ করে, নীরব হয়ে সব শুনে যেতে হয়। একটু ক্ষণ পরেই যে নাকি দোষী সে-ও তার আপন দোষ ক্ষালনের চেষ্টায় সচেষ্ট হয়ে উঠে। অন্যায় করে, দোষ করে, কেউ নীরব হয়ে থাক্‌তে পারে না। আত্মা সদা জাগ্রত—সতর্ক প্রহরী, তার কাছ থেকে কারও অব্যাহতি নাই. কাজেই যে অন্যায় করে, তার প্রতিকার তুমি-আমি না কর্‌লেও নিজের দোষ প্রতিকারের চেষ্টায় নিজেই প্রাণে প্রাণে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে। আমরা প্রায়ই ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ি, কাজেই দোষীর প্রতি সুবিচার না হয়ে, অনেক স্থলেই আমাদের দ্বারা অন্যায় বিচার হয়ে থাকে।

"এই একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই তোকে দেখাচ্ছি। সেদিন রমেশ বাবু তার ছেলেকে কি মারটাই না মার্‌লে? এটা কি ঠিক উচিত হয়েছে? এমন করেই তো আমরা ছেলেগুলোকে গাধা বানিয়ে তুলি। তা না হলে ছেলের মন বুঝে চলতে পার্‌লে কি অমন ক্রোধান্ধ হয়ে শক্তির নিছক অপব্যয় করবার প্রয়োজন হয়? ছেলেকে সংযম শিক্ষা দিতে গিয়ে, অনেক সময় আমরাই উল্টো অসংযমী হয়ে পড়ি। আসলে ছেলের মনের দিকে না চেয়ে, তার উক্তিটাকেই বড় করে ধরে ধরে নিয়ে অন্যায় ভাবে প্রতিশোধ তুল্‌বার চেষ্টায় উদ্ধত হয়ে উঠি! এতে ছেলের কি শিক্ষা হয় বল্ তো দেখি?"

আমার কথা শুনে সতীশ বল্‌লে কি, "পরেশ-দা! তুমি দেখ্‌ছি, দরদী, দয়ার অবতার বিশেষ। ছেলেগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের কাছ থেকে সুখ্যাতি এবং ভালবাসা আদায় করে নাও বটে; কিন্তু এতে যে তুমি ওদের কি সর্ব্বনাশ কর, তা বল্‌বার নয়। অন্যায় করবে তো আবার এত বাড়াবাড়ি কেন? যাকে যা বল্‌তে না পার্‌বে তাকে তাই বলা! আমি তো বলি রমেশ বাবু খুব ভাল করেন। ছেলের হিত কর্‌তে হলে, তোমার মতন অত দয়াপ্রবণ হলে চলে না। বাপকে একটু নিষ্ঠুরই হতে হয়!"

"তাহলে দেখ্‌ছি পরেশ তুই-ও রমেশ বাবুর দলেরই লোক। তুই আমার আসল বক্তব্যটা ধৈর্য্য ধরে শুন্‌বিই না—শুন্‌তে চেষ্টাই করবি না?"

আমার এই কথা শুনে, পরেশ বল্‌লে, "তা কেন হবে? বেশ তো বল না তোমার

কি বল্‌বার আছে! যদিও তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল না হয়, তাহলে কি তোমার বক্তব্যটা শুন্‌তেও কোন দোষ আছে? তারপর মতের বদল হওয়াটাও তো অসম্ভব নয়। হয়ত আমারই বুঝ্‌বার ভুল থাক্‌তে পারে। আলোচনার ফলে সেটা যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে হয়ত উল্টে আমারও মত বদ্‌লে যেতে পারে!"

"আচ্ছা বেশ. তাহলে বলি শোন্! এই যে তুই প্রথমেই বল্‌লি, 'অন্যায় কর্‌বে তো এত বাড়াবাড়ি কেন?' এ জায়গাতেই তোদের বুঝ্‌বার ভুল। এই বাড়াবাড়িটা আসলে কিন্তু বাড়াবাড়ি নয়! ছেলের হৃদয়ে প্রবেশ করে দেখ্‌তে পার্‌লে দেখতি যে এটা তার নিজের অন্যায়ের প্রতিই নিজের ক্ষোভ প্রকাশ। আসলে সে নিজের দোষ বুঝতে পেরে লজ্জিত—কিন্তু তোরা ঘাঁটাঘাঁটি করে এক সমস্যার মাঝে আর এক সমস্যা এনে দাঁড় করিস! এতটুকুন ছেলে বল্ তো কি করে সামাল দেয়? আমি বলি, তোরা ওদের উত্যক্ত করে তুলিস্ বলেই অমন উত্তর বের হয়ে আসে ওদের মুখ থেকে! আসলে ওরা নিজেদের দোষই সংশোধন করতে চায়, কিন্তু তোরাই ওদের বিক্ষিপ্ত করে তুলিস্!

"প্রত্যেকের নিজের দোষ নিজেই সারিয়ে নেবার একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা এবং যত্ন রয়েছে। দোষ করে মনে মনে, গোপনে মানুষ সংশোধন-চেষ্টাতেই নিরত থাকে, কিন্তু তোরা অবিশ্বাসী—মানুষকে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারিস্ না। কাজেই বাইরের মৌখিক অন্যায়-স্বীকারটাই তোদের কাছে বড় জিনিষ। মাথা হেঁট কোন ছেলে অনায়াসে করতে পারেও। কিন্তু অভিমানী ছেলে, আত্ম-সম্মানী ছেলে, নিজকে অপরের কাছে হেয় করতে যাবে কেন? সে কারও কাছে হীন হতে চায় না, তাই অন্যায় করেও নিজেই তার প্রতিকারের চেষ্টায় যত্নবান্ হয়ে ওঠে! কিন্তু না, এ জায়গাতেই তোদের বিষম ঠেক্‌বে—তাকে জোর করে অন্যায় স্বীকার করাবি মার্‌বি-ধর্‌বি, তবে তোদের পৌরুষত্বের অভিনয় শেষ হবে! মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয় বলেই—আমার প্রাণে এ সব জায়গায় লাগে, তাই দু'চার কথা না বলে পারি না।

"আত্ম-সম্মানবোধ জাগার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ছেলেদের অশিষ্ট আচরণকে যে বাধা দিতে হয়, এ কথা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু যাদের আত্মসম্মানবোধ জেগে গিয়েছে, তাদের উপর শাসনপ্রণালীটা একটু ভেবে-চিন্তে প্রয়োগ করতে হয়। রমেশ বাবুর ছেলের কথা আমি বেশ জানি—সে ভয়ানক আত্ম-সম্মান জ্ঞানী। তার উপর অন্যায্য দাবী করলে সে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠে!

"তোরা বল্‌বি, কেন, এতটুকুন ছেলের এত রাগ কেন? কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাই এই রাগের ইন্ধন তোরাই জুগিয়ে দিস্। তোরা চিন্তাশীল অভিভাবক, তোদেরই ধৈর্য্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ছেলের চেয়ে তোরাই বেশী অধৈর্য্য হয়ে উঠিস্; আর শুধু অধৈর্য্য হওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই অধৈর্য্যের ফলও

প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিস্। বল্ তো এই কি শিক্ষা দেবার রীতি?

"আর কিছু না, তোদের আমি এই বলি যে, তোরা কোন বিষয়েই তলিয়ে দেখিস্ না। উপরের উত্তেজনা দেখেই তোরাও উত্তেজিত হয়ে উঠিস্! ছেলে কেন রাগ করে, তার কারণ কি—এ নিয়ে বিচার করবার সুমতি তোদের কোন সময়ই হয় না। ছেলের হিত যারা করতে চায়, তাদের অমন দরদহীন, উদাসীন হলে চলে না! অনেক সময় ছেলের মনের দিকে তাকিয়ে—নিজের ঔদ্ধত্যকে দাবিয়ে রাখতে হয়! তারপর সব ছেলে তো সমান নয়! কেউ কেউ মুখের একটুখানি কথা খস্তে না খস্তেই সচেতন হয়ে যায়!

এ ছাড়াও অভিভাবকদের আর একটা বড় গুণ থাকা চাই। তা কি জানিস?—"প্রভাব"! এই প্রভাব জিনিষটা অত্যন্ত হিতকর এবং কার্য্যকরী! কিছু না বলেও শুধু প্রভাব দ্বারা সবকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সাংখ্য-শাস্ত্রে একটা কথা আছে যে পুরুষের কর্ত্তৃত্বের প্রভাবেই না কি প্রকৃতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে চলে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়· কিন্তু প্রকৃতির সাধ্য নাই যে কাজে বিশৃঙ্খল ঘটায়। পুরুষের মৌন প্রভাবই এই নিয়ন্ত্রণ-শক্তির মূল! কাজেই মানুষ শক্তিশালী কোন্ জায়গায় এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে! জগৎ-স্রষ্টার এই বিরাট জগৎ কি সুন্দর সুশৃঙ্খলায় চলছে—বল তো দেখি? তিনি তো এসে কাউকে নির্য্যাতন করছেন না। সবাই স্বাধীন-ভাবে, যার যার খুসীমতেই চলছে, অথচ শুদ্ধ-মাত্র প্রভাব দ্বারাই সকলেরই উচ্ছৃঙ্খলতা দমিত! সবাই স্বাধীন বটে, কিন্তু কেউ ব্যভিচার করতে পারছে না! আমি এই প্রভাবের কথাই অভিভাবকদের বিশেষ করে বলি! যারা বাস্তবিকই ছেলের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাদের মাঝে এই "প্রভাব" শক্তিটা থাকা খুবই প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রভাব থাক্-লেই যে ছেলের প্রতি স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতা সব চলে যাবে অমন নয়! বরঞ্চ খাঁটী ছেলে এইরূপ প্রভাব-সম্পন্ন পিতাকেই অধিক ভালবাসে! আমি জানি, রমেশ তার পিতাকে ঠিক ঠিক ভালবাসে না—শ্রদ্ধা করে না। এর কারণ কি? তোরা বলবি, ছেলেটা জন্ম থেকেই উদ্ধত, বাপ-জ্যেঠা, কিন্তু আমি যে স্পষ্ট এর উল্টো কারণ দেখতে পাচ্ছি।

"থাক্, আজ আমার আর সময় নাই, তুই আমার কথাগুলি একটু ভেবে দেখিস্। এখন আমার কলেজ যাবার সময় হয়ে গিয়েছে।"

ভাবুক ও বীর

—*—

উষার বোধনে শান্ত লগনে
কে বলে শোভার শেষ—
দ্বিপ্রহরের দীপ্ত গগনে
নাহি কি মাধুরী লেশ ?

কুসুম-কোমল পেলব হৃদয়
নহে শুধু মধুময় ;
বীরের কণ্ঠে ধ্বনিত যে গান
অতুলন সেও হয়।

বীর্য্যবানের সহজ জীবন
যেথা হয় অনায়াস,
ব্যাপ্ত-সুবাস ভাবের কমল
ফুটে যেথা বার মাস ॥

সংগ্রাম-ময় জীবনের পথে
আগে চাই রণজয় ;—
লীলার আবেশে ভাবের বিলাস,
সে কি কভু আগে হয় ?

ভাবে ঢলে পড়ি, কাজে ভুল করি—
এ নহে সহজ ধারা ;
জগতের কাজে নিজ-সুখ ত্যজে—
কে বা সে ভাবুক ছাড়া ?

—*—

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন, মঙ্গলবার—সকালে চা ও হালুয়া দ্বারা প্রাতঃর্ভোজন সমাপ্ত করে, বেশ রোদ উঠলে পর রওনা হলাম। আজকের পথ ভাল নয়। সামান্য সামান্য চড়াই উৎরাই করতে করতে চল্‌তে লাগলাম। পথ মোটেই নাই। অসংখ্য বড় বড় পাথর বিক্ষিপ্তভাবে, এলোমেলোরূপে ইতস্ততঃ পড়ে আছে। সেই সব বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে বানরের মত লাফাতে লাফাতে পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। পার্ব্বত্য লাঠির উপকারিতা এ পথে বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করছি। একটি পাথর হতে অন্য একটি পাথরে বানরের মত লাফিয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ সাবধান না হলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাথরে লাফিয়ে না পড়তে পারলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। লাফাবার সময় বেশ করে সামনের পাথরটি লক্ষ্য করে, লাঠি দিয়ে পরীক্ষা করে, লাফ দিতে হয়। গতকাল ও আজ পথ চল্‌তে চল্‌তে কত বার যে আছাড় পড়েছি, তার সংখ্যা নাই। প্রত্যেকেই সেইভাবে ২।৪।১০টী আছাড় খেয়েছেন। অন্য

সকলেরই রক্তপাত হলেও আমার কিন্তু রক্তপাত হয় নাই। আমরা গতকালের রাত্রিবাসের স্থান ত্যাগ করার পর, খুবই খারাপ পথ দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ভাগিরথীর পাড়ে পাড়ে উক্ত পথগুলি (পথ মানে পূর্ব্বকরূপ বিপদ সঙ্কুল পথ) অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত ভাল পথে চল্‌তে লাগলাম। ক্রমে দেব দাওয়ার ও চীরগাছ শূন্য হ'তে লাগলো এবং তৎ পরিবর্ত্তে অশোক ফুলের গাছ, বনফুলের গাছ, ভূর্জ্জ পত্রের গাছ পেতে লাগলাম। সেইগুলিও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে শুধু ছোট ছোট ৫-৬ হাত উচ্চ ভূর্জ্জপত্রের গাছের নীচু দিয়ে চলতে লাগলাম। স্বল্প দূরে চারি-দিকেই শুধু উন্মুক্ত পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হতে লাগ্‌লো।

এইভাবে ক্রমশঃ কিছুদূর চলবার পর, গোমুখী হ'তে প্রত্যাগত একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা পরশু গঙ্গোত্তরী হ'তে গোমুখী রওনা হয়ে, গতকাল বেলা ১০॥টার সময় গোমুখীতে পৌছেন, আজ গঙ্গোত্তরীতে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে ৪ জন যাত্রী, একজন পাণ্ডা ও একজন পাহাড়ী লোক—মোট ছয় জন। তাঁরা চেষ্টা করছেন, যাতে আজই গঙ্গোত্তরীতে পৌছতে পারেন। তাঁদের দেখে আমাদের খুব আনন্দ হল এবং উৎসাহ বাড়লো। তাঁরাও আমাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু মায়েদের দেখে তাঁরা অবাক্ হয়ে গেলেন এবং সামনের পথের দুর্গমতার কথা আমাদের বলে ভয় দেখাতে লাগ্‌লেন।

এ বৎসর এর পূর্ব্বে আর একদলে মাত্র তিন জন সাধু গোমুখী দর্শনে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া এ বৎ-সর আর কোন যাত্রী যান নাই। তাঁরা পথের যে দুর্গমতার কথা আমাদের বলেছিলেন, তাতে গোমুখী যাওয়ার আশা করাটাও যেন খুব অন্যায় বলে মনে হয়েছিল। সে দলে একজন বাঙ্গালী সাধুও আছেন। "জয় গঙ্গা-মাঈকী জয়" বলে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আরও ছ'মাইল পথ অতিক্রম করে বেলা ১০॥টার সময় আহারের বন্দোবস্তে লেগে গেলাম। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে, ভূর্জ্জপত্রের গাছের নীচে, প্রবল জোরে বাতাসের জন্য পাক করতে বিশেষ কষ্ট হল। আলুর ঝোল ও ফেনওয়ালা অর্দ্ধসিদ্ধ দুর্গা-পূজার নৈবিদ্দির মত ভাত* সামান্য পরিমাণ খেয়ে, সেই স্থানেই আমাদের সঙ্গীয় সমুদয় জিনিষাদি রেখে, শুধু স্নান করার জন্য গামছা, কাপড়, কম্বলাদি গরম কাপড় সব সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম।

আজ সকালে আসার সময় এই সব বরফাবৃত প্রদেশে পর্ব্বতের উপরে কস্তুরী হরিণের দল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেখ্‌তে পেয়েছি ; কস্তুরী হরিণ বরফাবৃত (Glaciers) প্রদেশ ভিন্ন বা বিশেষ ঠাণ্ডা স্থান ভিন্ন বাস করে না। এদিকে অপর্য্যাপ্ত হরিণ থাকলেও বিনা আদেশে অর্থাৎ টিহরী গবর্ণমেণ্টের আদেশ ছাড়া হরিণ মারা নিষিদ্ধ। এ সব স্থান টিহরী গবর্ণমেণ্টের অধীন। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে ছাগলের মলের মত স্তূপাকৃতি অনেকগুলি মল জমা হবার কারণ পাহাড়ী কুলীটিকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বললে,--এগুলি কস্তুরী হরিণের মল। একটী কস্তুরী হরিণ যে স্থানে মল ত্যাগ করে, সে দলের সবগুলি হরিণই সেই একই স্থানে মল ত্যাগ করে থাকে। জানোয়ারের মধ্যে এরূপ প্রথা আশ্চর্য্য বটে! কস্তুরী হরিণ ছাড়া অনেক ভল্লুক, ও ব্যাঘ্র এ স্থানে আছে। দাঁড়কাক পাতিকাকও অনেক দেখ্‌তে পেলাম। এ স্থানে দাঁড়কাক ও পাতিকাক থাকার কারণ বুঝি নাই। অন্য কোন জানোয়ার পশু-পক্ষী প্রভৃতি দেখি নাই। পথে শ্বেত পাথরের পাহাড়, চুণের পাহাড়, চক মাটীর পাহাড়, অভ্রের পাহাড় আছে. এগুলি পেছনে ফেলে এসেছি।

* বরফাবৃত প্রদেশের সব জায়গাতেই চাল, ডাল, ভাল সিদ্ধ হয় না। আমরা শুধু এখানে নয়, বদরী নারায়ণেও পাক করে দেখেছি, চাল, ডাল ভাল সিদ্ধ হয় না। বোধ হয় অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য।

চিরবরফাবৃত ধবল পর্ব্বতমালার উপর সূর্য্য-কিরণ পতিত হওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন, কোন এক যাদুকরের রাজ্যে প্রবেশ করেছি।

অতি সাবধানের সহিত ধীরে ধীরে চলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের অশোক বৃক্ষ ও ভূর্জ্জপত্র গাছ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হতে লাগলো। এখন চারিদিকে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী শুধু বরফের পর্ব্বতমালা। তাতে সূর্য্য কিরণ পতিত হয়ে এক একটি পর্ব্বতেই যেন অসংখ্য সূর্য্য উদিত হয়ে, তার কিরণমালা দ্বারা আগন্তুকের নয়ন-মন-প্রাণের তৃপ্তি সাধন করছে। সে আনন্দ উপভোগের বিষয়—লিখে প্রকাশ করায় সামর্থ্য নাই। আজ এই বরফের দেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুর সেই অনন্ত বিরাট মূর্ত্তির গানটি স্থানমাহাত্ম্যে আপনা আপনিই বের হয়ে পড়লো :—

লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ, নীল গগন গর্ভে;
তীব্র বেগ ভীম মূর্ত্তি, ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটী কোটী তীক্ষ্ণ উগ্র অনলপিণ্ড তারা;
দৃপ্তনাদে ঝলকে ঝলকে উগরে অনল ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য যাহার, প্রকটে শক্তিবিন্দু;
নমি সে সর্ব্বশক্তিমান, চিরকারণসিন্ধু!

বাস্তবিক পক্ষে এমন মধুময়, এমন চির সৌন্দর্য্যময়, এমন চির পবিত্র স্থানে কার না হৃদয় ভগবানের অপার মহিমায় মুগ্ধ নত হয়ে না পড়ে?

* * *

আমাদের আর দেরী করবার সময় নাই, আমরা আবার চলতে লাগলাম। এমন সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ হিমালয়ের ভিতর আর কোথাও দেখি নাই। শুনেছি, কৈলাসের পথে নাকি এমন মধুময় এমন পবিত্রময়, এমন আনন্দময় ও এমন সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ আছে, যার দর্শনে ভোগী চিত্ত ভয়-ভীত হয়ে শ্রীশ্রীভগবানের রাতুল চরণে আকুল আগ্রহে শরণ নেয় এবং যোগী ভগবানের অপার মহিমা সন্দর্শন করে ভাবের হিল্লোলে আনন্দভরে তাঁর মহিমা গান করে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে ধন্য হয়।

* * *

আমরা আজ সকালে বের হবার সময় গোমুখীর তিনটী বড় পর্ব্বতের বরফাবৃত উচ্চ শৃঙ্গের দৃশ্য দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম তারই পাদমূলে ভাগীরথী গঙ্গা অবতীর্ণা—সেখানেই গোমুখী। বাস্তবিক পক্ষেও তাই বটে! তখন মনে করেছিলাম, এ তো অতি নিকটে—দুই তিন মাইল মাত্র দূর হবে। কিন্তু সকালে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করার পর, আহারাদি করে আবার ৫ মাইলের উপর চলবার পর আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছি। বেলা ১২টার সময় রওনা হয়ে, এই ৫ মাইল পথ আসতে ৪টা বেজে গেল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে একটি গাঢ় **নীলবর্ণের হ্রদ** দেখে আনন্দে অধীর হয়ে গেলাম। হ্রদটী প্রায় ১০০ গজ লম্বা ও প্রায় ৫০।৬০ গজ চওড়া হবে। এমন সুন্দর গাঢ় নীলবর্ণ জল আমরা জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। জাহ্নবীর জল নীলবর্ণ বটে, কিন্তু এর তুলনায় সে রং অনেক হাল্কা। কিন্তু সেই গাঢ় নীলবর্ণ জল হাতে তুলে নিলে একদম স্ফটিক সদৃশ সাদা—জলও সেখানে বেশ গভীর।

উক্ত স্থান হ'তে আরও আধ মাইল চলবার পর আমাদের পথ রোধ হ'ল। আর চলবার কোন উপায় নাই। অতি উচ্চ পর্ব্বতে তিন দিক ঘেরা, সবই বরফাবৃত। তারই দুই দিকের পর্ব্বত অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণের পর্ব্বতের মধ্য অর্থাৎ পূর্ব্বের পাহাড় হতে ভাগীরথী গঙ্গা বের হয়ে সাগর সন্তানের উদ্ধারের জন্য আকুল আগ্রহে সশব্দে ছুটে চলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ভাগীরথী গঙ্গার উপর দুইটি উপত্যকা অনন্ত বরফরাশিতে আবৃত। মনে হ'ল যেন, কলিকাতার মনুমেণ্টের মত দুই তিনটী মনুমেণ্ট সেই ভাগীরথী গঙ্গার ধারার উপর স্থাপন করলে যত উচ্চ হবে, তত পুরুভাবে ভাগীরথী গঙ্গার ধারার উপর বরফ জমে আছে। এত বিপুল সঞ্চিত বরফরাশির ভিতর হতে, কেমন করে ভাগীরথীর ধারা প্রবল বেগে আলু-থালু বেশে আকুল আগ্রহে বের হচ্ছে? চিন্তার বিষয় বটে!

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সে স্থানটী বরফ-সংলগ্ন ধারা হ'তে ১০০ একশ গজের বেশী হবে না। শীতকালে এসব জায়গাতেও বরফ জমে যায়, আবার গরমের দিনে গলে। আজকাল বরফ গলে যাচ্ছে। শুধু যে সেই স্থানের বরফ গলে যাচ্ছে তাও নয়. পূর্ব-বঙ্গে বড় বড় নদীর ধারে বর্ষাকালে যখন নদীর প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়, তখন যেমন বড় বড় জমিন বা স্থল জলের প্রবল স্রোতের সশব্দে ভেঙ্গে নদীতে পড়ে, যাকে নদীর পাড় ভাঙ্গা বলে, এ বরফগুলিও সেইরূপ চাপ ধরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটি চাপ সশব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। তার এক একটি চাপ খুব বড় চিদানন্দজী মহারাজ সেই বরফের অতি নিকটে যেয়ে পৌঁছেছিলেন। যখন বরফ ফাটিতে আরম্ভ হয়েছে দেখতে পেয়েছি, তখনই তাঁকে ডেকে আমাদের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অতি বড় প্রকাণ্ড বরফের চাপ সশব্দে ভেঙ্গে ভাগীরথীর জলে পড়ে গেল। সে কি ভীষণ শব্দ! সে চাপের নীচে পড়লে মুহূর্ত্তে পঞ্চত্ব! এই ভাবে বরফের চাপ ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পড়তে পড়তে ভাগীরথীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থান গোমুখী পর্য্যন্ত মুক্ত হয়ে যায়। যারা ভাদ্র মাসে গোমুখী যান, তাঁরা পূর্ব্বদিকের পর্বত পর্য্যন্ত যেতে পারেন। সে সময় কিন্তু এমনই শোভা সেখানেও থাকে। আমি কলিকাতা "ইণ্ডিয়া সার্ভে অফিস" হতে ম্যাপ এনে দেখেছি, তাতে এই সকল স্থানকে চিরতুষারাবৃত দেশ (Glaciers) বলে অঙ্কিত আছে। লোকে গোমুখী সম্বন্ধে যেরূপ নানা প্রকার অতিরঞ্জিত কল্পনায় পুস্তকের কলেবর ভর্ত্তি করে রেখেছে, আমরা সেরূপ গরুর মুখের আকৃতি কিছুই দেখতে পাই নাই বা স্থানীয় কাহারও কাছে শুনি নাই। তবে এ কথা সত্য যে, যারা কেদার-বদরী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা এ স্থানের মধুরতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন কিনা জানি না। মোটের উপর আমরা যত কষ্ট করেই এখানে আসি নাই কেন, স্থানটির সৌন্দর্য্যে আমরা মোহিত হয়েছি—প্রকৃতির বিচিত্রতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের সকল কষ্ট সার্থক হয়েছে।

আমরা অবাক্ হয়ে চারিদিকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখতে লাগলাম। দেরী করবার আর সময় নাই। আমাদের শীঘ্রই ফিরতে হবে, কারণ এরূপ উন্মুক্ত প্রান্তরে চিরতুষারাবৃত প্রদেশে কোথায় থাকব? বিশেষতঃ এখানে আগুন জ্বালার কাঠেরও অভাব। কাঠ থাক্‌লেও হয়তো এখানে থাক্‌বার চেষ্টা করতাম। এখানে অত্যধিক শীত। এ স্থানটি প্রায় ১৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। সামনের পর্বত-গুলি ২২০০০ ফুট উচ্চ। এই পর্বতগুলিই স্বর্গারোহণ পর্বতমালার অপর পিঠ! স্বর্গারোহণ-পর্বতমালা সম্বন্ধে বিস্তারিত "কেদারনাথে" আলোচনা করবো।

এ স্থানের শীত অত্যন্ত বেশী, তবুও আমরা হিন্দু! আমাদের এমন সংস্কার যে, এ হেন পবিত্রতম স্থানে এসে, ভাগীরথীর সুপবিত্র নীরে স্নান না কর্‌লে, পাপ-তাপ সংস্কার ধৌত না হ'লে বিশ্বপিতা শ্রীশ্রীভগবানের দর্শন পাওয়া অসম্ভব মনে হওয়ায়, অবিলম্বে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌লাম। চিদানন্দদাদা সর্বপ্রথমে সমস্ত জামা কাপড় ত্যাগ করে. লেঙ্গটী মাত্র অবলম্বনে, ভাগীরথীর চিরপবিত্র নীরে একটি ডুব দিয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর দেখা-দেখি আমরাও সকলে ডুব দিয়ে উঠেই, আগুন পোয়াতে লাগলাম।

আমাদের সঙ্গী পাহাড়ীয়া সোণা কুলীটি আসার সময় কতকগুলি শুকনো কাঠ জোগাড় করে নিয়ে এসেছিল। তখন বুঝি নাই, কেন বেচারী টুক্‌রো টুক্‌রো শুকনো কাঠ জোগাড় করছে। আমাদেরও বললে হয়তো আমরা কিছু কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করে নিয়ে আসতাম। এ-জলে লোক এক মিনিট থাকলেই কোলাপ্স্ হয়ে যাবে—এমন ভীষণ ঠাণ্ডা! স্নান করার পর হাত-পাগুলি সেকে নিয়ে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলাম। মণিরাম কখনও স্নান না করলেও কিন্তু আজ পাপ উদ্ধারের মোহ ত্যাগ করতে না পেরে, সেও স্নান করে নিল।

আমরা সেখানে পূর্ণ এক ঘণ্টা ছিলাম। ভাগীরথীর গঙ্গার জল অত্যধিক ঘোলা ও ততোধিক ঠাণ্ডার জন্য পান করতে পারলাম না—কিন্তু অঞ্জলি পরিমিত জল সকলেই পান করে নিয়েছিলাম—জলপিপাসাও খুব হয়েছিল।

বুঝ্‌তে পারি নাই, এমন উচ্চ স্থানেও এমন চির-বরফাবৃত প্রদেশেও ভাগীরথীর জল এত ঘোলা কেন? আমরা যমুনোত্তরীর মন্দির হ'তে যমুনা নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্তও গিয়েছিলাম, সেখানে তার জল অতি নির্ম্মল স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ এবং ময়লা-মাটী কাটানুসর্জ্জিত। কিন্তু এ স্থানটি তা হতে অনেক উচ্চে অবস্থিত হলেও এর জল এত ঘোলা হবার কারণ বুঝতে পারি নাই। অথচ সামনেই বরফের পর্ব্বত-শ্রেণী।

আমরা সে স্থানে জিনিসপত্র রেখে সেই নীল সরোবরের ধারে এসে, তার জল স্পর্শ করে মাথার দিলাম এবং আকণ্ঠ জল পান করে ফিরতে লাগলাম। তখন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের কিরণমালা বরফ-রাশির উপর পতিত হওয়ায় চারিদিক এক অনুপম লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। আবার উত্তর-দিকে আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে প্রবল জোরে বাতাস বইতে লাগলো এবং মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনিতে শীঘ্রই বিপদের সূচনা জানিয়ে দিল। আমরা অত্যন্ত জোরের সহিত দ্বিপ্রহরের স্থানে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লাম। সেখানে এলে অনেক শুকনো কাঠ পাব, সুতরাং বৃষ্টি হলেও আগুনে সেঁকে শরীরটা কোনরূপে রক্ষা করতে পারবো বলে বিশেষ জোরে চল্‌তে লাগলাম কিন্তু দেখ্‌তে দেখতে প্রবল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জোরে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব যেন সময় বুঝে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন—চারিদিক ঘোর অন্ধকারাবৃত হয়ে গেল। কোন দিকেই কিছুই দেখা যায় না। আজ শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথি হলেও চাঁদের আলো কোথায়? সে যেন একটি প্রলয়ের সূচনায় সকলেই ভীত হ'য়ে উঠ্‌লাম। হরিদাস-ভায়ার সঙ্গে সামান্য রকমের টর্চ্চ লাইট ছিল, তার সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সন্তর্পণে ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বহুকষ্টে রাত্রি ৮৷৷টার সময় আমাদের দ্বিপ্রহরের স্থানে এসে পৌছলাম।

আমাদের সঙ্গে সোণ-কুলী না থাক্‌লে এ স্থানটী খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে বেচারী আমাদের কষ্টে ম্রিয়মাণ হয়ে আপন জীবনের মায়া পরিত্যাগ করতঃ সেই ঝড়বৃষ্টি গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই নানা জায়গায় খুঁজে খুঁজে অনেক শুক্‌নো কাঠ যোগাড় করে বড় বড় তিনটী ধুনী জ্বালিয়ে দিল। আজও তার চকমকি-পাথর দ্বারাই সে ধুনী জ্বালিয়ে দিল। আমাদের সঙ্গে ৪টী দিয়াবাতি নিয়েছিলাম এবং সেগুলি অতি সন্তর্পণে কাপড় জড়িয়ে পৃথক পৃথক স্থানে রেখেছিলাম। দুই আনা দিয়ে ৪ আউন্স কেরোসিন তৈলও আগুন জ্বালাবার উদ্দেশ্যে নিয়ে এলেও সেগুলি কাজে লাগে নাই, কুলিটা না থাক্‌লে নিশ্চয়ই কাজে লাগতো। আধ-কস্তু ভিজে কাঠ না ধরলে তো কেরোসিন তৈলের নিশ্চয়ই আবশ্যক হত।

সেখানে ধুনীর পাশে বসে বসে সর্ব্বাঙ্গ কম্বলাবৃত করে আগুন তাপতে লাগলাম। অন্যদিকে মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। কোন ঘর, বাড়ী, চটী, গুম্ফা প্রভৃতি কিছুই নাই, যার ভিতরে বা আড়ালে বসে একটু রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তখন সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে ভগবানের নাম জপ ধ্যানে মগ্ন। জানিনা বিপদে পড়লে কেন ভগবানের নাম আপনা হতেই অনবরত প্রাণে জাগে। আমরা সকলে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নাম ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। তিনি এরূপ বিপদে রক্ষা না করলে আর কে করবে?

গত বৎসর ঠিক এই মাসেই, এমনি দিনেই আমি আশ্রমের প্রচারে বর্ম্মার আকিয়াব জেলার মংডু নামীয় একটী ছোট সাব ডিভিসনের সহরে ছিলাম। স্থানটী ছোট হলেও ও-অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং বেশ ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা বটে। অনেক বাঙ্গালী সেখানে দোকান দিচ্ছেন ও ব্যবসা করছেন। সেখানের হাসপাতালের ডাক্তার বাবুও বাঙ্গালী, আমি তাঁর বাঙ্গলাতে আছি। পোষ্টমাষ্টারও বাঙ্গালী, সেদিন ২২শে জ্যৈষ্ঠ, সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকার হয়ে বেলা ৪টা হতে প্রবল জোরে বৃষ্টিপাত হতে আরম্ভ হল এবং পূর্ব্বদিকের ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড় হতে প্রবল জোরে হাওয়া বইতে লাগলো—সে হাওয়া নয় প্রবল ঝড়! এবং সেই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলার মত বড় বড় আগুনের ডেলা ছুটতে লাগলো। বর্ম্মা দেশে সকলেই কাঠের ঘরে বাস করে, পাকা বিল্ডিং নাই বললেই হয়। সে ঝড়বৃষ্টি এমন প্রবল আকার ধারণ করলো যে, আমরা জীবনের আশা পরিত্যাগ করে, সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এইরূপ ভীষণ প্রবল ঝড়বৃষ্টি বেলা ৪টা হতে ৯টা পর্য্যন্ত হয়ে বন্ধ হওয়ার পর, আমরা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকরূপে লোকের উপকারার্থ বের হয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবুটীর বাংলাটি সব চেয়ে সুদৃঢ়রূপে তৈরী, তা সত্ত্বেও তার একপাশ ঝড়ে উড়ে গেছে। বাহিরে বের হয়ে দেখি, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হলেও আলোকমালায় চারিদিক উদ্ভাসিত, কিন্তু আলোক কোথাও দেখতে পেলাম না। পোষ্টাফিস্, হাসপাতাল, কাছারী, ষ্টেশন, বাজার, বস্তি, রেলওয়ে ব্রিজ প্রভৃতি প্রভৃতি প্রায় শতকরা ৯০টী ঘর পড়ে গেছে। অনেক গরু, বাছুর, মহিষ, লোকজন, সাপ, ছাগী, ভেড়া প্রভৃতি তার চাপায় পড়ে মরে গেছে, কেউ বা চাপা পড়ে জীবন্মৃত অবস্থায় অস্ফুটস্বরে মুহুর্ম্মুহুঃ রোরুদ্যমান। সে এক মহাব্যাপার! হাসপাতালে কয়েকজন রোগী ছিল, তারাও সব চাপা পড়েছিল, অনেক কষ্টে টেনে টেনে তাদের বের করার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হতে "জল" "জল" শব্দ শুনে আমরা চম্‌কে গেলাম। মংডু হতে ৩।৪ মাইল দূরেই বঙ্গোপসাগর। মংডুর পার্শ্ববর্ত্তী নদীটি দ্বারাই ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ পৃথক হয়েছে। মংডুর উত্তরে মাইল খানিক দূরেই সে নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনা, পূর্ব্বে ৩।৪ মাইল দূরেই প্রকাণ্ড পাহাড়, পশ্চিমে ৩।৪ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগর দক্ষিণে ১০।১১ মাইল পর্য্যাপ্ত লোকের বসতি আছে বটে, তারপরই বঙ্গোপসাগর "জল" "জল" শব্দ শুনার সঙ্গে সঙ্গে "পালাও—পালাও" রব উঠ্‌তে লাগলো। আমি ডাক্তার বাবুর ইচ্ছানুসারে, তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, নিয়ে পোষ্টমাষ্টার বাবু ও তাঁদের পরিবারদি সহ ছুটে ছুটে বাজারের ভিতর যেয়ে, একটি ভাল দোতালা হিন্দুস্থানীর দোকান ঘরে ঢুকে পড়্‌লাম। তখন পূর্ব্বদিক হতে বাতাস বইছিল, ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকের বাতাস প্রবলাকার ধারণ করলেও, সেই বাতাসকে অগ্রাহ্য করে পশ্চিম দিক হতে সমুদ্রের জল ৮।১০ হাত উঁচু হয়ে দুই তিন মিনিটের সমুদয় স্থান ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে ক্ষতি শত বৎসরেও পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ। জল নেমে গেল বটে, কিন্তু ঝড় ও বৃষ্টি পুনরায় পশ্চিম দিক হতে প্রবল জোরে আরম্ভ হয়ে সমস্ত রাত চললো। প্রথম বারের পূর্ব্বদিকের ঝড়ে, যে সব ঘর-দোর, গাছ-পালা পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, এবার পশ্চিম দিকের ঝড়ে সেগুলি সমস্তই পড়ে গেল। ভোরের বেলা ঝড় বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর, যে দৃশ্য দেখেছিলাম, সেরূপ দৃশ্য দেখা যেন আর কাহারও ভাগ্যে না ঘটে, সতত শ্রীশ্রীমঙ্গলময়ের চরণে এই প্রার্থনা করি।

"জল এলো," "জল এলো" শব্দ শুনে যারা ঘর হতে বের হয়ে পালাচ্ছিল, তারা জলের স্রোতে

ভেসে যেয়ে, কেউ রেলের সঙ্গে, কেউ পাহাড়ের সঙ্গে, কেউ গাছের সঙ্গে প্রভৃতি নানা জায়গায় নানা প্রকারে ধাক্কা খেয়ে, মরে পড়ে আছে। কত লোক যে এ ভাবে মরে পড়ে আছে, তার সংখ্যা নাই। ঘর, বাড়ী, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, লোকজন নাই বললেই হয়। শতকরা প্রায় ৮০টী লোক এই খণ্ড প্রলয়ে অনন্তশয্যা লাভ করেছে। কোন পরিবারের হয় তো বিশজন লোকের মধ্যে একজন জীবিত আছে। যেদিকে চাওয়া যায়, কেবল কান্নার রোল এবং যুদ্ধাবসানের পর যুদ্ধস্থলের অবস্থা যেমন হয়, তেমনই ভাবে ঘর-দোর নাই, সব উড়ে চলে গেছে। বড় বড় গাছপালারও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। খাবার-দাবার জিনিষপত্র ও জলের প্রবল স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে? সে কি ভীষণ দৃশ্য! চারিদিকের মুক্ত প্রান্তর মহাশ্মশানের চেয়েও ভীষণ বিভীষিকা উৎপন্ন করে সর্ব্বদা প্রাণে একটি মহাভয়ের সঞ্চার করে দিচ্ছে। সে দৃশ্য দেখে প্রাণ স্তম্ভিত, শরীর রোমাঞ্চিত, সর্ব্বদাই একটি মহাশোকের গভীর উচ্ছ্বাসে, আকাশ, বাতাস, জল সবই যেন সময়ানুরূপ ভীষণ ভীতিপ্রদ ভাব ধারণ করে আরও বিপদের সম্ভাবনা জানিয়ে দিচ্ছে। খাবার জলের কূপাদি সবই সমুদ্রের লোণা জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। পশু, পক্ষী, সাপ, কাক মাছ প্রভৃতি সকল প্রকার জীবই মৃতাবস্থায় চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে আছে। তখন কে কার খোঁজ করে? এমন একটী লোকও তখন দেখি নাই, যিনি কোন না কোন রূপে আঘাত পান নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণায় সেরূপ বিপদেও আমার পায় একটি কাঁটাও ফুটে নাই; কিন্তু সেরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই, ভাষায় তার সম্যক্ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের ২২ তারিখ না হলেও ২৩ তারিখে গোমুখীর পথে বিপদগ্রস্ত হয়ে মুহুর্মুহুঃ মংভুর গত বৎসরের কথা স্মরণ হতে লাগলো। বিপদ হলেও কোন উপায় নাই, কোথায় যাব? সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে, তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে, তাঁহারই নাম জপে মগ্ন হলাম। গঙ্গোত্তরী ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, ঘর-বাড়ীর আশ্রয় পাওয়া যাবে না, সুতরাং নীরবে সহ্য করতেই হবে। ক্রমশঃ আরও প্রায় দুই ঘণ্টা ঐরূপ বৃষ্টিতে ভেজার পর ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্রের রজত কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত হওয়ায় যেন মনে হল প্রকৃতি হাসছে। চারিদিকের পর্ব্বতমালায় অর্দ্ধচন্দ্র প্রতিফলিত হয়ে, কি যে সুন্দর শোভা ধারণ করে আবার আমাদের আনন্দে মগ্ন করে দিল, কেমন করে সে সুন্দর মনোরম শোভার বর্ণনা করবো?

আমি একবার সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্গোপসাগর যখন শান্ত ছিল, তখন আকিয়াব হতে চাটগাঁ আসছিলাম—সেদিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রজত কিরণে চারিদিকে আনন্দের লহর ছুটে বেড়াচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের ছোট ছোট উর্ম্মিমালার উপর পূর্ণচন্দ্র প্রতিফলিত হয়ে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, অসংখ্য অসংখ্য পূর্ণচন্দ্রের খেলায়, মনে এক অজানা আকাঙ্ক্ষা আপনা আপনিই উৎপন্ন হয়ে প্রাণে আনন্দের লহর ছুটছিল। যাঁরা সমুদ্র যাত্রা করেছেন, তারা হয় তো সমুদ্রের শান্ত অবস্থায় পূর্ণিমা নিশীথে আমার বর্ণিত বিষয় উপলব্ধি করতে থাকবেন। সেবার জলে যেরূপ চাঁদের খেলা দেখেছিলাম, আজ পর্ব্বতশিখরস্থ বরফের উর্ম্মিমালায় সেইরূপ অনন্ত চাঁদের শোভায় মোহিত হয়ে গেলাম। জীবের মঙ্গলের জন্য সদা-উদ্‌ব্যস্ত প্রকৃতির এমন বিরাট্ মূর্ত্তি অনন্ত ভাব, কার প্রাণ না মুগ্ধ করে? ক্ষণপূর্ব্বেই আমাদের মৃত্যুর কোলে সঁপে দিয়ে, আবার কোলে টেনে নিয়ে আনন্দে মগ্ন করলো। এই ভাবে বিভোর হয়েই না বঙ্গের উদীয়মান কবি তাঁর অনন্ত মূর্ত্তির গান রচনা করে আকুল কণ্ঠে গাইতেন;—

আমি চাহি না ও রূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মূরতি নয় ;
কোন কুম্ভকারে গড়ে দিবে তারে—
ইঙ্গিত মাত্র যার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ?

কোটী কোটী নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
(যার) মুখের লাবণ্য পেয়েছে একবিন্দু,
নয়ন-কোণে যার, কোটি সবিতার
পূর্ণ আবির্ভাব নিরন্তর রয় ॥

শ্রীপদনখরে, এক আকাশের নয়,
সহস্র গগনের নক্ষত্রনিচয়।
প্রতি রোমকূপে কোটি জগৎ জ্বলে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয়।

নিখিল জগতের সমগ্র চপলা,
স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল প্রশান্ত অচলা,
মোহধ্বান্তনাশী, মায়ের মধুর হাসি,
অসীম স্নেহ দয়া ক্ষমামৃতময় ॥

সংখ্যাতীত পদে ফেরেন দ্বার দ্বার
সংখ্যাতীত করে বিতরেণ উদ্ধার।
জীবের দুঃখে কাঁদি, যত্নে দেন মা বাঁধি
আশীর্ব্বাদের রক্ষা কবচ বরাভয় ॥

বাস্তবিক পক্ষেই তাঁর আশীর্ব্বচনের রক্ষা-কবচ বরাভয় না পেলে, আজ এমন দিনে আমাদের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল। তাই সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে তাঁর অমিয় মধুর করুণাস্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে মনে করে আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লাম :—

জীবের দুঃখে কাঁদি, যত্নে দেন মা বাঁধি
আশীর্ব্বাদের রক্ষা কবচ বরাভয় ॥

আমরা গোমুখী হতে ফিরবার সময়পথে নূতন একদল উদাসী বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা ৪ চার জন একত্রে গোমুখী দর্শনে যাত্রা করছেন। যে স্থানে সমুদয় গাছ শেষ হয়েছে, তাঁরা সেই স্থানে একটী শুকনো গাছের গুঁড়িতে আগুন জালিয়ে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে দুই জনের সঙ্গে যমুনোত্তরীর পথে পূর্ব্বেই আমার আলাপ হয়েছিল। আমরা গঙ্গোত্তরী হতে বের হবার পর তাঁরা সংবাদ পাওয়ায় আমাদের সঙ্গে আস্‌তে পারেন নাই। পথে আমাদের ধর্‌বার জন্য আজ তাঁরা উৎকণ্ঠিত ভাবে রওনা হয়েছিলেন ; কিন্তু দুরতিক্রম্য পথ হওয়ায় তাঁরা সঙ্কল্পানুযায়ী কাজ করতে পারেন নাই।

আজ দ্বিপ্রহরে আধাসিদ্ধ কাঁচা চাউল সামান্য পরিমাণ আহার করেছি, তার উপর অত মাইল পথ অতিক্রম করেছি ; সুতরাং ক্ষুধা-দেবী পূর্ণোদ্যমে পেটের ভিতর গোলযোগ আরম্ভ করে দিয়েছেন ; সমস্ত রাত বসে বসে আগুন তাপতে হবে, এমতাবস্থায় চুপ করে আগুন তাপার সঙ্গে সঙ্গে পাক করে না খাওয়াটাই বোকামী ; সুতরাং চাল ডাল বের করে খোসা শুদ্ধ বিউলি ডালের খিচুড়ী পাক করে আলুভাজা দ্বারা তার আহুতি দিয়ে সমস্ত রাতই ধুনীর পাশে বসে বসে আফিম্‌-খোরের মত ঝিমুতে ঝিমুতে কাটিয়ে দিলাম।

গঙ্গোত্তরী হতে গোমুখী ১৮ মাইল পথ। গত কাল আমরা ৭ মাইল এসেছিলাম। সেখান হতে গোমুখী আজ ১১ মাইল গিয়েছি এবং গোমুখী হতে ৫ মাইল ফিরে এসে এখানে আছি। সুতরাং আজ ১৬ মাইল দুরতিক্রম্য পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করা হল।

আমাদের সঙ্গে মহীশূরের রাজ্যের বাঙ্গালোরের একজন ৩৪।৩৫ বয়স্ক বৈষ্ণব সাধু যোগদান করেছিলেন, পাঠকদের মনে আছে বোধ হয়। তিনি কারো সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বল্‌তেন না। আজ দ্বিপ্রহরে যখন আমরা পাক করছিলাম, সেই সময় তিনি যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হলেন বুঝ্‌তে পারি নাই। অনেক খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাই নাই—পরেও আর কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই।

এ পথে চলবার সময় সমুদয় জিনিষই আমাদের সঙ্গে ছিল, কেবল মাত্র একটি **তাঁবুর অভাব** ছিল। আমাদের সঙ্গে একটি তাঁবু থাকলে আজ অত কষ্ট হত না বোধ হয়। সুতরাং এরূপ পথে যাবার সময় সকলেরই একটি তাঁবু সঙ্গে রাখা বিশেষ দরকার।

এই স্থানটি কত ঠাণ্ডা, পাঠকগণ অনুমান করতে পারবেন না বলেই একটী সত্য ঘটনা জানাচ্ছি। আজ দুপুরে বেলা প্রায় ১২টার সময় প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে হরিদাস-ভায়া খাওয়ার পর, ভাগিরথী গঙ্গাতে তাওয়া মেজে ভাগিরথী গঙ্গা হতে প্রায় শত হস্ত পথ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতে-স্থিত তাওয়ার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ থাকলেও এবং সামান্য একটু পথ আসতেই যদি নদীর জল জমে বরফ হয়ে যায়, তা হলে সে স্থান কত ঠাণ্ডা—বিবেচ্য বটে!

(ক্রমশঃ)

বিস্মৃতি

—*—

কার তরে আজ কান্না ওঠে
হৃদয় বিদারি—
একলা বসে নিঝুম হয়ে
তাই যে বিচারি।

পেয়েছিলাম যার ইসারা
আপন পাসরি,
বুকের মাঝে শুনছি না আর
তাঁর সে বাঁশরী!

কে ছিল এই গোপন হৃদে
একলা বিহারী—
খুঁজে না পাই ত্রিভুবনে
আপনা বিথারি!

কোথায় তুমি—আজকে এস
ওগো দিশারী!
দেখাও তুমি, কোথায় সে পথ—
ও হাত পসারি।

আশ্রম সংবাদ—শ্রীশ্রীঠাকুর [illegible]।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৩শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

পৌষ—১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৪৯ | তৃতীয় সংখ্যা

মা গৃধঃ

—*—

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—ঈশ—১]

ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—মা গৃধঃ কস্যচিদ্ ধনম্॥

—এই বিশ্বজগৎ যে চৈতন্যসত্তার প্রভাবে জঙ্গম, প্রতিমুহূর্ত্তে পরিণামশীল যাঁহার প্রাণময় প্রেরণায়, তিনিই ঈশ্বর—তিনি তোমাতে, আমাতে, সর্ব্বজগতে—যা কিছু সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া সে মহাপ্রভাব—আপন অন্তরে আত্মকেন্দ্রে ইহা অনুভব কর!

কে কার নিয়ন্তা? সমস্তই এক মহাশক্তির উচ্ছ্বাস! কোথাও ভেদ নাই, অনধিকার নাই। এ জগতে আঁকড়িয়া ধরিবার কি আছে?—কে মুক্ত, কে

বদ্ধ? একই বিদ্যুন্ময় প্রেরণায় সমস্ত সচল, সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া সেই বিদ্যুতের অধিষ্ঠাতা মহাপ্রাণময় ঈশ্বর, আর সেই বিদ্যুতের কেন্দ্র তোমারও এই ব্যষ্টি প্রাণ—এক সত্তা, একই স্পন্দন!

সুতরাং ভ্রান্ত আসক্তিতে মজিয়া স্বরূপবিচ্যুত হইয়া অল্প প্রাণে ভোগ করিও না—ত্যাগের আনন্দে যে মহিমাময় প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, সেই স্তরে মহাপ্রাণকে অধিষ্ঠিত রাখিয়া অবিকম্পিত উদারপ্রাণে ভোগ কর! ভোগে দোষ কে বলিল? অনধিকার চর্চ্চা না করিলেই হইল! যদি কাহাকেও অনাত্মীয় জানিয়া থাক, তাহাতে লিপ্ত হইও না! যাহা তোমার নয়, তাহাতে আসক্তিই পাপ। যত-টুকুকে আত্মগত করিয়া লইতে পারিবে, ততটুকুকেই অসঙ্কোচে ভোগ করিবে।

পরের কথায় ভুলিও না, পরের মোহে আবিষ্ট হইও না, পরের উপর নির্ভর করিও না, অপরের হাজার ভাল দেখিয়াও প্রলুব্ধ হইও না, শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাইও না!—যাহা অনাত্ম, যাহা অনিষ্ট, তাহাই অগ্রাহ্য; আর যাহাকে আপন বলিয়া জানিয়াছ, সর্ব্বপ্রাণ মন দিয়া চাহিতেছ এবং পাইতেছ, সেই বিদ্যুন্ময় আত্মাধিকারকে প্রশস্ত করিয়া সমগ্র জগৎকে গ্রাস কর!

তবু জান, কল্পনারই সাধনা এ—আসলে বিশ্বজগতের ঈশ্বর তুমিই তো ছিলে, তুমিই আছ এবং তুমিই থাকিবে। তোমার সিদ্ধ অনুভব—তুমি ঈশ্বর; আর তোমার সাধক অনুভব—তুমি ত্যাগসহ যুক্তভোগপরায়ণ, তুমি পরধনলুব্ধ নও, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত, বিমৎসর, আত্মতৃপ্ত। এই দুইটী ধারায় জীবনপ্রবাহ—মূলতঃ একই সত্য!

কখনো পরমার্থ-ব্যবহার, কখনো ব্যবহারিক ব্যবহার—উভয়তঃই সত্য অটুট রাখিব; কোথাও পশ্চাৎপদ নহি—এই ভাবের প্রতিষ্ঠা চাই! আমাতে যখন আমি আছি, তখন আমি সর্ব্বেশ্বর, জগদীশ্বর; যখন কর্ম্মে নামিব, তখন ত্যাগে প্রতিষ্ঠ, ভোগে সংযত, স্বাধিকারে অপ্রমত্ত! ত্যাগ-ভোগের সামঞ্জস্যময় জীবনই ঔপনিষদ প্রাণসত্তায় প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হইতেছে। কর্ম্মে কালের প্রভাব মানি, কিন্তু ভাবে আমরা কালাতীত—সেই ঔপনিষদ আত্মপ্রতিষ্ঠাকে এই মুহূর্ত্তে এই জীবনে নামাইয়া আনিতে পারি। সমস্ত প্রাণ দিয়া যে চায়, সে এখনই তাহাকে পাইতে পারে। সে দুঃসহ তেজ কই, অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা কই? বিশ্বাস যখন অটুট নয়, কোন শক্তিতে সে সত্য ধারণা করিবে? অকুণ্ঠিত আত্মপ্রত্যয়—আমার জীবনের আমিই ঈশ্বর—প্রাণে প্রাণে এই অনুভব যে চিরন্তন! কে বলে, ইহা অভিমানের উচ্ছ্বাস? আমরা জানি, ইহাই আত্ম-

সত্যের আত্মশক্তির অনুভবকেন্দ্র, ভাবময় ভাগবত জীবনের শাশ্বত স্থিতিপ্রবাহ! আকাঙ্ক্ষৎকর সংশয়ে ভয়ে ক্ষুদ্রপ্রাণ ভুল করিয়া এ সত্যকে হারায়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ; সবই যে আপন ঈশিত্বে 'বাস্য' বা আচ্ছাদনীয়, প্রভাব-সম্ভাব্য! আমার জগতের আমি ঈশ্বর—এই অনুভবে অকম্পিত থাকিয়া ইচ্ছাশক্তির চর্চ্চা কর, চালনা কর—যাহা চাহিবে, তাহাই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে। তোমার মাঝে যাহা প্রাণ পাইল, অপরত্র প্রাণ ফুটাইতে তাহার কতক্ষণ?

ঈশিত্বের প্রেরণা লইয়া বিন্দু বিন্দু প্রাণ বিশ্বময় ওতপ্রোত—তোমার ইচ্ছাতে তোমার প্রাণে প্রাণে আপন খুসীতেও সেই প্রাণেরই বিলাস! প্রত্যেকেই নিজের প্রভু হইতে চাহিতেছে। এ জগতে প্রত্যেকরই দাবী রহিয়াছে. আপন অধিকারে প্রত্যেকেই সম্রাট হইতে চাহিতেছে।

এই স্বাভাবিক প্রেরণাকে কে অস্বীকার করিবে? কেহই ইহাকে নিরুদ্ধ করিতে পারে না। যে করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। যে পরকে অধিকার-বঞ্চিত করিতে চায়, সে নিজের অধিকার হারায়; যে পরের ধনে লোভ করে, তাহার নিজস্ব তাহাকে ছাড়িয়া যায়।

প্রত্যেককে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার সুযোগ দাও. পারিলে প্রাণ দিয়া, ভাব দিয়া, চিন্তা দিয়া, ব্যবহার দিয়া সাহায্য কর। পরের অধিকারে কণ্টক হইও না।

আর কিছু না পার, নিরপেক্ষ থাক—নিজের অধিকারে তুষ্ট থাক—প্রাণে প্রাণে তোমার আত্মারাধন চলিতে থাকুক; একদিন এমন হইবে, আপনা হইতেই উ সিত তোমার শক্তিপ্রবাহ তোমার মণ্ডলীতে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করিবে। ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই—প্রাণে প্রাণে মিশুক্ না! ইহাই তো প্রকৃত কর্ম্ম বা ব্রহ্মকর্ম্ম। এই ভাবের সেবাতেই জগৎ আপন হয়।

ঐশী ভাব আপনাকে ছড়াইয়া দিতে চায়, আর জৈব ভাব গৃধ্রের মত লোলুপ চিত্তে একই স্বার্থকেন্দ্রে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবার ব্যর্থ প্রয়াসে ঘুরিয়া-ফিরিয়া মরে! ঐশী ভাবের অনুপ্রেরণায় জগৎ আপন হয়, আর চিত্তে সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণে পদতলস্থ নিরীহ দূর্ব্বাঙ্কুরটীও বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

সমস্যার আবর্ত্তে পড়িতে চাও কেন? মীমাংসার পথে আস। একমাত্র ঈশিত্বের প্রেরণানুপ্রাণিত ভাবের সাধনাতেই সম্ভব। ভাব শুদ্ধ হইলে কর্ম্ম আপনি পবিত্র ও সুন্দর হইয়া আসিবে।

যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সে জানে সেবা কাকে বলে। শিশুর দেহে-মনে-প্রাণে মায়ের দেহ-মন-প্রাণ যেমন করিয়া তিলে তিলে নিজকে বিলাইয়া দেয়, সে তেমনি ! জীবনে কে না অনুভব করিয়াছে এই আশ্চর্য্য প্রাণসঞ্চারের রহস্যময় লীলা ? এমনি করিয়া সমগ্র জগতের প্রাণে প্রাণে মিশা যায়। প্রত্যেকের প্রাণেই সেই ঐশী প্রেরণা স্বতঃসিদ্ধ।

সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকৃতিসম্মত স্বাধিকার বিস্তারের পথ যে আগলাইয়া বসিয়াছে, সে অন্ধকারের পথিক—সে আলোর সন্ধানী নয়, অমৃতের পুত্র নয় ! সে দয়নীয়, সে পথভ্রান্ত ! তাহাকে বুকে টানিয়া আন !

ভ্রম ঘুচাও—তন্ন তন্ন করিয়া নিজ জীবনের তাৎপর্য্য খুঁজিয়া লও ! কিসে তোমার সার্থকতা—কেন তুমি কি চাও—কাহার কাছেই বা চাও—কতটুকু চাও—কিসে প্রাণে প্রাণে শান্তি পাও ! আত্মানুধ্যানই সাধনার মূল তত্ত্ব। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রত্যেকেই এই সাধনাই করিতেছে—আমি এ জগতের কতটুকু !

ঈশিত্বের সাধনা স্বাভাবিক—Lordship সকলেই চায়। স্বাধীনতায় প্রাণ কত খুসী ! বন্ধনে থাকিয়াও মুক্ত—নিরাশ্রয় হইয়াও নিত্যতৃপ্ত—নির্যোগক্ষেম হইয়াও আত্মবান্ ! এই রহস্যময় প্রাণশক্তির প্রেরণা কোথা হইতে আসিতেছে—প্রতি প্রাণকে কেন্দ্র করিয়া লীলায়িত হইতেছে। এই যে জগৎকে আপন করিবার প্রেরণা, ইহার সমষ্টিই তিনি, প্রত্যেকের হৃদয়ে যাঁর ঐশী প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানী আত্মজ্ঞানে জগৎ আয়ত্ত জানে, ভক্ত আপন জ্ঞানে এই বিশ্বময় ভগবান্‌কে ভালবাসে ; প্রেমিক দেখে, বাঃ—সকল পথে যে একই সামঞ্জস্য !

সামঞ্জস্যের **উদ্দেশ্য** হইতেছে—

"**ঈশা বাস্য**মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ !"

সামঞ্জস্যের **উপায়** হইতেছে—

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—**মা গৃধঃ** কস্যচিদ্ ধনম্ !"

ওঁ শান্তিঃ

স্বাধীন চেষ্টা

—(*)—

না বুঝিয়া, যাচাই না করিয়া কত যে সত্য-অসত্যের বোঝা বহন করিয়া মরিতেছে মানুষ, তাহার ইয়ত্তা নাই। সত্য কথা বলিতে যাও, তাহাতে গোময় ফাঁক হইয়া যাইবে ভাবিয়া, অন্ধ সংস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া, মানুষ বলিয়া উঠিবে—"তুমি দেখিতেছি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি মুনি ঋষি আপ্ত বাক্যেরও দোষ ধরিতে চাও!" কাজেই সত্য কথাটা বলাও এক বিষম ব্যাপার, কেননা তাহা হইলে লোকের মন রক্ষা হয় না, দুর্ব্বল ধর্ম্মেরও সংরক্ষণ হয় না! তুমি ভাল, যদি তর্ক না কর, তুমি ভাল যদি তুমি সব কথাতেই সায় দিয়া যাও! সংস্কারকে আঘাত দিয়া যাহারা সত্য কথা বলিতে যায়, তাহাদের সেই দিন হইতেই বিপদ আরম্ভ হইল আর কি? কেননা দশজন তাহার বিরোধী! কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে,—"ও কাহারও কথা মানে না—সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে পারে না...ইত্যাদি।" অর্থাৎ তাহার সংস্কারটা ভাল নয়, সকলের কু-সংস্কারের সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেই সেইটাই আবার হইত সর্ব্বানুমোদিত সু-সংস্কার! কিন্তু যাহারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাহাদের প্রাণে ভয় জিনিষটা খুবই কম। এই জন্যই সাধারণের বুদ্ধির, সাহসের অগম্য বস্তুকেও অনায়াসে তাহারা করায়ত্ত করিয়া ফেলে। মানুষ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া, স্তব্ধ হইয়া ভাবে, তাইতো, আশ্চর্য্য লাগিতেছে যে, ইহা কি কখনো সম্ভব? কি করিয়া সে ইহাতে কৃতকার্য্য হইল? আমরা তো স্বপ্নেও ইহা ভাবি নাই!

যুগে যুগে সত্যানুসন্ধিৎসু সাধক এমন করিয়াই অপরের কু-সংস্কারের স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন যে ইহা হইতেও আরও গভীরতর সত্য রহিয়াছে! সেই সত্যের দরুণ কাহাকেও সাফাই গাহিতে হয় না। সত্য "স্বে মহিম্নি" বিরাজমান! মানুষের তখন সাময়িক ঘুম ভাঙ্গে—হয়ত সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের বাণীকে অনুসরণ করিয়া তাহারা কিছুদিন চলে—আবার দেখি সেই কু-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অপরের মুখে ঝাল খাইয়া নিছক্ শুধু নীতির বচন আওড়ান আরম্ভ হয়।

জড়তার রাক্ষসটা বিশাল প্রকাণ্ড, মানুষের চেতনার তুলনায় ইহার তুলনায় ইহার বিশালত্ব অপরিমেয়! এই জড়ত্ব (inertia) মানুষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। নূতন কোন কিছু শুনিতে পাইলেও অজগর সর্পের মত শরীর আড়ামোড়া দিয়া মানুষ বলিতে থাকে,—"না, না, বেশ তো আছি, আবার নূতন উপদ্রব কেন?" এইভাবে অন্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়াও মানুষ অনায়াসে ঘুমাইয়া থাকিতে পারে! কাজেই এই জড়তাকে ভাঙ্গিতে হইলে অসীম শক্তির প্রয়োজন! যাঁহারা গতানুগতিক ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম আসিয়া একটা নূতন কথা বা নূতন বাণী প্রচার করেন, তাঁহাদের প্রথম প্রথম খুবই বেগ পাইতে হয়, কিন্তু সত্যের অসীম শক্তিতে তাঁহারা মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অনায়াসে সহ্য করিয়া আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতে পারেন!

সত্য কথাই তাঁহারা বলিতে আসেন, কিন্তু সেই সত্যকে গ্রহণ করিবার মত লোক না থাকায় সেই সত্যই অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহাতে কি সত্যসাধকের প্রাণ বিন্দুমাত্র দমিত হয়? তাঁহারা কি নূতন করিয়া যুগোপযোগী একটা পেটেন্ট্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন? না, কখনই নয়! তাঁহারা প্রাণে প্রাণে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার দরুণ

ফাঁসি, জেল, লোকের টিট্‌কারী, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সবই সহ্য করিয়া যাইতে প্রস্তুত। গ্যালিলিও সত্য প্রচার করিয়াই একদিন ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? গ্যালিলিওর নাম চির-স্মরণীয় অমর হইয়া রহিয়াছে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত সাধক অধৃষ্য, তাঁহার ভয় নাই, লোকমতের অপেক্ষা নাই, idealisticএর মত সকলকে আত্মস্বরূপ বা ভাবিয়াই তাঁহার প্রাণের সত্য সহজ ভাবে সকলের মাঝে তিনি প্রচার করিয়া যান। আজ না হোক্, দুইদিন পর মানুষ তাহার বাণীর মর্ম্ম অবগত হইয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ অবাক্ হইয়া যায়ই যায়। প্রত্যক্ষই এই ব্যাপার আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে। কত মহাপুরুষের লুপ্ত গৌরব এমন করিয়াই আজ পর্য্যন্তও উজ্জ্বল হইয়া আছে। মানুষ মানুষকে সহজে চিনে না!

অনুভূতির কোন সংজ্ঞা নাই, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, হাঁ, তাহা মানি বটে, কেননা উচ্চাঙ্গের অনুভূতিগুলি প্রায়ই বিশ্লেষণ করিয়া মানুষকে বুঝানো যায় না, কিন্তু অনেক সময় আমরা জড়ত্বকেই অনুভূতির প্রাপ্য আসন দিই! একেবারে চরম তামসিকতা, আর একেবারে নির্গুণ সাত্ত্বিকতার মাঝে নাকি পার্থক্য ধরা খুবই কঠিন। জড়ত্বেও মানুষকে জড় করে রাখে, আবার আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চাবস্থা লাভ করিলেও নাকি কাহারও কাহারও জড়ত্বের অবস্থা আসে! কাজেই এই দুই অবস্থার মাঝে কোন্‌টী সাঁচ্চা এবং কোন্‌টী মেকী তাহা ধরিবার কি কোন উপায়ই নাই? যদি না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে কি জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে কোন প্রভেদ নাই—সব একাকার?

ধর্ম্ম কখনো মানুষকে নিজ্জীব করিয়া রাখে না, অভিভূত করিয়া রাখে না, ধর্ম্ম অর্জ্জনের দরুণ প্রত্যেকের স্বাধীন চেষ্টা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই যদি স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতার বেলাতেও স্বাধীনতার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে! কেবল পরের অনুভূতি, পরের অভিজ্ঞতা মুখে মুখে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইলে, নিজের জীবনের কোন উন্নতি হয় না! তারপর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি যদি সাময়িক উদ্দীপনা মাত্রই হইয়া থাকে, দৈনন্দিন জীবনে তাহা হইতে কোন শক্তি, কোন বল কিম্বা প্রেরণা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে কি ফল? অনাচারীর জীবনেও মাঝে মাঝে সত্যের জ্যোতিঃ সাময়িক ভাবে চমক দিয়া যায়, তাহার মূল্য কতটুকু? ধর্ম্ম চরিত্রকে গঠন করে, আর এই চরিত্র এক দিনের সাধনায় গঠিত হইয়া উঠে না, তাহার দরুণ প্রতিদিন সাধনার প্রয়োজন। আর সেই সাধনা একজনের হইয়া অন্য জনে করিলে চলে না! কৃপাবাদের অর্থ আমরা অনেকেই এইরূপই বুঝিয়া থাকি!

সংস্কারমুক্ত জীবনের আস্বাদন পাইতে আসিয়াও আবার সংস্কারের জালেই আবদ্ধ হইয়া পড়ি আমরা। আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির কোন মূল্য নাই। ঋষি-বালক নচিকেতার হৃদয়েও শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এই শ্রদ্ধার জোরে নচিকেতা যে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়! এক কথায় বলিতে গেলে নচিকেতার হৃদয়ে যখন শ্রদ্ধার আবেশ হইল, তখন তাহার আত্ম-চেষ্টা, আত্ম-বিশ্বাস পূর্ব্বের চেয়ে আরও অধিকতররূপে উৎপন্ন হইল। কাজেই শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিলেই যে এক জায়গায় জড়ের মত বসিয়া সব পাওয়া যায়, তাহা নহে।

আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেই যেন মানুষ বেশী ভালবাসে। কাজ কি বিচার—বিশ্লেষণের, এমনিই তো বেশ সুন্দরভাবে দিনগুলি কাটিতেছ! দিনগুলি বেশ সুন্দর ভাবেই কাটে বটে, কিন্তু ভিতরের খবর নিয়া দেখিলে, আত্ম-প্রবঞ্চনার যে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, তাহা কিছুতেই উপেক্ষার বিষয় নয়। একমাত্র

কৃপা ছাড়া যদি তরিবার আর কোন উপায়ই না থাকে, তাহা হইলে ভগবান যে কেন এত বিচিত্র পথের সৃষ্টি করিলেন, মানুষের ভিতর ইহার স্বাধীন বীজ বপন করিয়া দিলেন, তাহার তো কোন অর্থ বুঝি না। আত্ম-চেষ্টার উপরও পরিপূর্ণ সার্থকতা এবং সৌন্দর্য্য বিধানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং গুণ হয়ত কোন অদৃশ্য দেবতার হস্তে থাকিতে পারে, (অর্থাৎ যাকে আমরা দৈব বলিয়া থাকি), কিন্তু সে দেবতার কৃপা কখন বর্ষণ হয়, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

আত্ম-গোপন করিয়া, দুর্ব্বলতার রোগকে প্রশ্রয় দিয়া, মানুষ বেশী দিন বড়াই করিয়া চলিতে পারে না। দুই দিন পর সব ফাঁকা হইয়া যায়, বুকের বল হ্রাস হইয়া যাওয়ায়, বুক ঠুকিয়া তখন সত্য-প্রচারের ক্ষমতা থাকে না। কেবল ভয়, লোকের মন রক্ষার দরুণ সশঙ্কিত ভাব, অর্থাৎ লোককে অন্যায় উপায়ে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতে না পারিলে যেন শেষে সত্য প্রচারের ব্যাঘাত ঘটিবে। সাধনা-বিহীন সত্যের গৌরব বেশী দিন থাকে না। সম্প্রদায় টিকিয়া থাকিতে পারে বটে, কিম্বা লৌকিক লোকেরও কোন অভাব না হইতে পারে, কিন্তু খাটী সত্য-লাভের সাধক না থাকিলে পরিণাম যে কি দাঁড়ায়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, সকলেই নিজ চোখেই তাহা দেখিতে পায়।

অতীত নিয়া গৌরব করিবার বিষয় আমাদের অনেক থাকিতে পারে, কিম্বা আছেও, কিন্তু বর্ত্তমানের অযোগ্যতাকে অতীতের গৌরব দিয়া ঢাকিবার উপায় নাই। অতীতকে মানুষ দেখে না, কাজেই বিনা বিচারে অনেক সময় তাহাকে মানিয়া লয়, কিন্তু বর্ত্তমানকে সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, কাজেই তাহার বিচার মুলতুবি করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন হয় না।

গৌরব বোধের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মহা-প্রাণদের প্রেরণায়, বল-বীর্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠা চাই, তবে না বুঝি গৌরব-বোধের কোন একটা সার্থকতা আছে। তাহা না হইলে, নিজের পরিচয় নিজে দিতে সমর্থ না হইয়া অতীতকে আনিয়া নজীর-স্বরূপ দাঁড় করিবার কি প্রয়োজন? আর তাহাতে কি নিজেদেরো দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় না?

জীবনের উন্নতি অবনতি দেখিয়াই বিচার করিতে হইবে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সকলেরই বাস্তব-জীবনে একটা পরীক্ষা রহিয়াছে। কোন কিছুই বিবিক্ত নয় —isolated নয়! জীবনে প্রত্যেকেরই অনিবার্য্য প্রকাশের পথ রহিয়াছে। ধার্ম্মিকের মোটমোটি একটা বাহ্যিক লক্ষণও রহিয়াছে—তাহার সবখানি জীবনই কেবল রহস্যাবৃত নয়!

সাধনার মৌলিক রহস্য বুঝিতে হইলে, নিজকেই বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া সাধনায় বসিতে হইবে। অপরের অভিজ্ঞতা, অপরের অনুভবের কথা জানিয়া আমারই বুকের বল বাড়িবে, তাহাতে আমার পথে আমি নির্ভীক ভাবে চলিতে পারিব।

আমার ভালবাসা

—*—

আমাকে আমি যতখানি ভালবাসি, আমার দেবতাকেও যেন আমি ঠিক ততখানি তেমনি করে ভালবাসি। তোমরা শুনে হয়ত বলবে তাতে চলবে না, তার চেয়েও বেশী করে তাঁকে ভালবাস্‌তে হবে। এই যে তোমাদের সুযুক্তির কথা, আমার কাছে কিন্তু এ মোটেই সুযুক্তিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। চটে উঠো না ভাই, কেন তোমাদের অযৌক্তিক বল্‌ব? আমার বিচারে যা এ সম্বন্ধে বলে, তা তোমাদের বল্‌ছি, আগে শোন, পরে যদি ভুল বুঝে থাকি তো সংশোধন করে দিও।

প্রথমেই দেখ্‌ছি, এ জগতে সব চেয়ে যদি কিছুকে বা কাউকে ভালবাসি, তবে সে একমাত্র আমাকে—সঙ্গে সঙ্গে আমার বল্‌তে যত কিছু পাই, শুধু সেইগুলিকে। দেখ, আমাকে আমি এত ভালবাসি যে, সব সময়ে তা মনেও থাকে না। তোমরা শুনে হয়ত হাসবে, কেননা ভালবাসার থিওরিতে তোমরা এই কথাই বল যে, যার চিন্তা সব সময়ে তোমার প্রাণে জাগে, সেই একমাত্র তোমার ভালবাসার পাত্র। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তার কথা মনে হওয়া চাই, তবেই হবে তোমার প্রকৃত ভালবাসা, এবং তা থেকেই সেই ভালবাসার পাত্রও তোমার একান্তভাবে মিলে গিয়ে তোমার প্রেম সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

বেশ কথাটা মন্দও নয়, মিথ্যাও নয়। কিন্তু তোমাদের কথা বা যুক্তি দিয়েই আমার বক্তব্যকে আমি প্রতিষ্ঠা করব। আচ্ছা, যার কথা শয়নে, স্বপনে, জাগরণেও মনের মধ্যে ভাসাতে বা জাগাতে হবে, সে তাহলে এর আগে নিশ্চয়ই ডুবে ছিল, ঘুমিয়ে ছিল, নইলে আর তাকে ভাসাবে বা জাগাবে কি করে? অবশ্য 'সে' বল্‌তে এখানে তার স্মৃতিই বোঝাচ্ছে। তার স্মৃতিই বা অস্তিত্বের অনুভবই আমার মাঝে পূর্ব্বে তত সচেতন ছিল না, তাই সে ঘুমন্ত স্মৃতি বা ডুবে গিয়ে অস্তিত্বশূন্যরূপে বোধ হওয়াভাবটা এখন থেকে বিশেষ করে মনকে আঘাত করবে, তবেই আমাকে বুঝ্‌তে হবে যে, হাঁ, তাকে ভালবাসা হচ্ছে।

অবশ্য শুনতে হাসি পাচ্ছে যে, এমনি করে ভালবাসাকে বিশ্লেষণ করে কেউ ভালবাস্‌তে যায় না। বরং তোমাদের ভাষায় বল্‌তে গেলে, রূপের লহরী, গুণের মাধুরী বা ধনের বহর দেখে অথবা এমনি ধরণের যে কোনও একটা কারণে অজানিত নূতন এক ভাব একজনের কথা অহরহঃ চিন্তা করাই ভালবাসা। আর একটু খুলে বল্‌লে, তাঁকে যেমন করে হোক একান্ত আমার বলে, বা আত্মগত ভাবে পাওয়াটাই ভালবাসার লক্ষ্য। মোটের উপর আমার ভাষায়, যদি তাকে কিছুতেই ভুল্‌তে না পারি, আমার দেহ মন প্রাণ একান্তভাবে তার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যায়, তন্ময় হয়ে পড়ে, তবেই সেই হয় সত্যিকার ভালবাসা। তাতে জাতি, কুল, মান, প্রভৃতি কোনও বিশেষত্বই ভালবাসার মাঝে সংশয় স্বরূপ হয়ে মিলনের বাধা সৃষ্টি করতে পারে না—অর্থাৎ বাধা সৃষ্টি করেও শেষ পর্য্যন্ত বাধিত রাখ্‌তে পারে না।

তাহলেই একান্ত ও অত্যন্তভাবে যাতে বিরহের দুঃখ দূর ক'রে, 'নিতান্ত তাকে নইলে নয়', এমনি ভাবই হল ভালবাসার প্রাণ। তারপর বাইরের তুচ্ছ বস্তু প্রভৃতির আদান-প্রদান হল ভালবাসার দেহ বা বাইরের রূপ। এই বাইরের রূপ দেখে যারা ভালবাসার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে, তাদের সেই মাপকাঠী সব সময় ঠিক হয় না; অথবা যথার্থ ভালবাসা যে কি, তারা তার স্বাদ পায়নি, কাজেই প্রমাণ যে ঠিক কোন্‌টা দিয়ে করতে হয়, তা তারা ধরতেও পারে না!

তবে প্রাণ থাকলেই যেমন তার আশ্রয়স্বরূপ একটা দেহও থাকে, তেমনি প্রকৃত ভালবাসা যেখানে হয়, বাইরে তার প্রকাশ নানারূপে হয়েই থাকে। কিন্তু শুধু বাইরে থেকে দেখেই, মাত্র দেহ দেখেই ভিতরকার যে অমূর্ত্ত প্রাণ রয়েছে, তার পরিচয় সম্যকরূপে সবার কাছে সব সময়ে প্রকাশিত নাও হতে পারে। এমনও দেখা যে, যেমন অত্যন্ত তীব্র ও পূর্ণবেগে একটা জিনিষ ঘুরতে থাকলে তাকে অনেক সময়ে স্থির বলে মনে হয়, পৃথিবী অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ঘুরতে থাকলেও যেমন সাধারণ দৃষ্টিতে তাকে স্থির বলেই মনে হয়, তেমনি এ জগতের বহু ব্যাপারেই আমাদের দৃষ্টি ও অনুমান ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

আমি বলি, এই দেহটাকে ভালবাসা বা আমাকে আমার যে ভালবাসা, তাও ঠিক এমনি ধরণের। ভালবাসার প্রথম স্তর যেমন "সে আছে, আমাকে মুগ্ধ করেই সে আছে, কিন্তু আমার হয়ে নাই" এমনি একটা অনাত্ম ভাবের দরুণ তাকে আত্মগত করতে প্রাণের একান্ত আকুলতা আসে, আর একটু উপরে উঠলে, দু'এক স্তর এগিয়ে গেলে, শেষে এই অভাববোধই থাকে না। তখন হয় ভাব বা অস্তিত্ব বোধের সুসমঞ্জস একটা অনাবিল আনন্দ। সে যে আমার নয়, আমি বা সে যে একজন আর একজনের কাছ থেকে দূরে রয়েছি—সুতরাং না দেখা, বা না পাওয়ার জ্বালা, তা আর তখন থাকে না। তখন শুধু সে আছে, এই ভাব বা অস্তিত্ববোধই পরম আনন্দ, জীবনের পরম মঙ্গলের নিদান হয়। শুধু সে আছে, সব রকমে ভাল আছে, এইরূপ যে তার প্রকৃষ্ট অস্তিত্ব, তাতেই জীবন সার্থক বোধ হয়। কোনও দুঃখ সে আনন্দকে ব্যাহত করতে পারে না।

তারপর আসে স্বভাব বা স্ব-গত ভাব। তখন আর ভালবাসার পাত্রকে নিজ হতে পৃথক ভাবে বাইরে কল্পনা করে অভাববোধ আসে না। যাঁকে চাই অন্তরে তাকে উপলব্ধি ক'রে অথবা চিন্তার একনিষ্ঠতার দরুণ আপন অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে শুধু কেবল ইষ্টরূপ চিন্তা ক'রে ক'রে একেবারে তদ্গত বা তন্ময় হয়ে যায়। তখন নিজকেই তৎস্বরূপ অর্থাৎ সেই ইষ্টস্বরূপ মনে হয়। রাধিকা প্রভৃতি গোপিগণের এইরূপে প্রত্যেকের নিজকেই কৃষ্ণস্বরূপ বলে মনে হয়েছিল। জীবন্মুক্তদের এই ভাব গভীর ও দৃঢ় হয় বলেই এই জগতের স্থূল দেহ ধারণ করেও তাঁরা অপ্রাপ্তির বৃশ্চিকদংশন অনুভব করেন না, বরং প্রাপ্তির আনন্দে এই জগতের প্রত্যেকটী বস্তুও সেই পরমানন্দের সংস্পর্শে মহাভাবোদ্দীপক বলে গ্রহণ করেন। তখন জড়-মেঘ বা তমাল বৃক্ষও কৃষ্ণরূপ স্মরণ করিয়ে দেয়—তাতেই সমাধি আনে। অপ্রাপ্তাবস্থায় পাওয়ার জন্য নিতান্ত ব্যাকুলতা, আর পাওয়ার পরের প্রাপ্তিজনিত একান্ত আনন্দের আকুলতা, এই দুইয়ের মাঝে রাত দিন তফাৎ। তারপর সেই প্রাপ্তির পর যখন ক্রমশঃ প্রাপ্তির ভাব গাঢ় হয়, তখন সে মানুষ আবার সহজ ভাবে সাধারণ মানুষের মত অবস্থান করে। পাওয়ার পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরেই যত আন্দোলন। কিন্তু যতই সে পাওয়া পুরাতন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মানুষ ক্রমশঃ স্থির হয়ে আসে—"পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে।"

আমাকে আমার ভালবাসাও এমনি সব চেয়ে পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত। দেহ ও আত্মার সগুণ ও নির্গুণের যে একান্ত মিলন, তাও অত্যন্ত নিবিড় বলেই সব সময়ে তা মনের কাছে ধরা পড়ে না। দেহ ও দেহীর এই যে একান্ত ভালবাসা, এতেই জগৎ চলছে। ভালবাসা অন্ধ, অর্থাৎ সে বিচার জানে না। তা যদি জানত, ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞান ফুটত, তবে আর এই জগৎ-ব্যাপার মানুষের দুঃখের কারণ হত না। কাকে বা কোন বস্তুকে ভালবাসা পরিণামে সুখের কারণ বা দুঃখের কারণ, তা আমরা ধরতে পারি

না। অন্ধ একটা টানের বশে আমরা একদিকে ছুটতে থাকি, যতদিন পর্য্যন্ত তাতে বাধা না পাই, যতক্ষণ দুঃখের আঘাতে মোহ-নিদ্রা না টুটে, ততকাল ছুটতেই থাকি। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা আমাদের পিছনে থেকে, প্রতি পদে পদে চোখ রাখ্‌ছেন, সেই একান্ত ভালবাসার, আমাদের নিতান্ত আপনার পরম প্রেমময়ের বুঝি এই অন্ধের মত বিপথে ছোটা বড়ই প্রাণে বাজে, তাই দুঃখের আঘাতে আমাদের সেই ছুটবার পথে বারম্বার আঘাত দিতে থাকেন। যদি সেই আঘাতে এক বার চোখ মেলে, একবারের জন্যও কি করছি, এর পরিণাম কি এবং কোথায়, এমনি সত্যিকার বিচার এসে প্রকৃত জ্ঞান ফুটে, তবেই এই দেহ হতে দেহীকে আমরা পৃথক জেনে, প্রকৃত দেহীকেই ভালবাস্‌তে শিখতে পারি। আমি বলতে যে দেহী, তাকেই যে একমাত্র ভালবাসার প্রয়োজন, এ দেহ যে তাঁহা হতে পৃথক, এ জ্ঞান বহু ভাগ্যে ঘটে।—তাই বলছিলাম, এই দেহকে যতখানি ভালবাসি, ঠিক ততখানি যেন দেবতাকে ভালবাসি। তাহলেই দেবতা তুষ্ট হয়ে আমার বাঞ্ছিত দান করবেন।

মানুষ জানে বা শোনে কিংবা বোঝে অনেক কথাই, কিন্তু সে সব উপরভাসা রকমের। যদি প্রকৃত ভাবে জানাশোনা বা বুঝা হয়, তবে বিচার না এসে পারে না। এত কথা জেনে-শুনে, দেখে-বুঝেও যে বিচার আসে না, এটাই আশ্চর্য্য! তাই যুধিষ্ঠিরকে যখন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ জগতে আশ্চর্য্য কি? তখন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য জিনিষের নাম না করে একটী মাত্র মহদাশ্চর্য্যের বিষয় এই বল্‌লেন যে, প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মানুষ মরছে, তবুও যারা বেঁচে থাকে, তারা চায়,—যেন তারা না মরে। তারাও যে মরবে, এ কথা প্রকৃত ভাবে তারা চিন্তা করে না। সাময়িক ভাবে সে চিন্তা এসে শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় হলেও তাতে প্রকৃত কাজ হয় না! হয়ত বলবে, কাজ নাই অমন মরণ-চিন্তায়; মরণ, মরণ করতে করতে দেশটাই মরতে বসেছে, তাই আমরা চাই বাঁচতে, বাঁচবার আশা, তারই জল্পনা-কল্পনা নিয়েই থাকতে চাই! কিন্তু ভুলে গেলে কেন—আমি যে আমাকেই সব চেয়ে ভালবাসি বেশী। কাজেই সেই আমার যাতে মরণ না হয়, তাই চাই। এই যে বাঁচার নাম তোমরা করছ, ও তো শুধু নামেই বাঁচা, আসলে যে তিল তিল করে মরতেই চলেছ। আর এক জনকে মরতে দেখে যে শ্মশান-বৈরাগ্য আসে, তাতে প্রকৃত বাঁচবার পন্থা মনে জাগে না। শুধু কেবল সাময়িক ভাবে একটা ঔদাস্যই আসে। তাকে কি বৈরাগ্য বলা যায়? বৈরাগ্য এসেছিল বুদ্ধদেবের। জরা-মৃত্যু-ব্যাধি দেখে আমাদেরও হয়ত কখনো কখনো সামান্য বৈরাগ্য অন্ততঃ একটা সাময়িক বিরক্তির ভাবও আসে, কিন্তু তাতে কি ক'রে যে এগুলির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, কি ক'রে এগুলির একান্ত ও আত্যন্তিক ভাবের নিবৃত্তি হয়, সে চিন্তা আসে কি? সে উপায় আবিষ্কারের জন্য বৈরাগ্য এসে কি সব ছাড়বার যোগ্য করে?

বুদ্ধদেবের এসব দেখে এই কথাই মনে হয়েছিল যে, কি করে এগুলির হাত থেকে বাঁচা যায়? লোকে বলে, ভগবান্ আছেন, তিনিই এগুলির কর্ত্তা। বুদ্ধদেব তা শুনে অমনি আমাদের মত-ভগবানের পাঠশালার নিতান্ত ভাল ছেলেটীর মত ভক্ত সেজে তাঁর অপার মহিমার গুণগান করতে সুরু করলেন না। তিনি রীতিমত জীবন দিয়ে ভগবানের সঙ্গে challenge করে বললেন যে, যদি ভগবান বলে কেউ থাকে, তবে তিনি দয়াবান নন যদি বা তাঁর দয়া থাকে, তবে তাঁর শক্তি নাই, নতুবা

তিনি জগৎ থেকে এগুলি দূর করে দেন না কেন? তিনি জগতের দুঃখের নিদান খুঁজতে সমস্ত সুখোপকরণ ত্যাগ করলেন। মানুষের এ জগতে সুখের উপকরণ বলে যা কিছু থাকতে পারে, কোনটারই অভাব ছিল না। ধন ও ভোগের দিকে রাজৈশ্বর্য্য ভোগের যোগ্য নবীন প্রাণ, যৌবনের সুঠাম দেহ, সুন্দরী মনোজ্ঞ স্ত্রী, ততোধিক বন্ধনের কারণ আত্মজ পুত্রমুখ—সবই তিনি আপন অন্তরের আগুনের কাছে নিষ্প্রভ দেখে ছেড়ে চললেন। সম্মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তির ধার না ধেরে, স্নেহমমতার বন্ধনে অন্তরকে তৃপ্তি দিতে না পেরে তিনি উধাও হলেন। একেই বলে প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের আছেই বা কি? আর ছাড়ছিই বা কি? অর্জ্জনের প্রভূত শক্তি বুকে নিয়ে, জগতে যা কিছু প্রলোভনীয় সব আয়ত্ত করে, তারপর যদি সব খোলামকুচির মত ত্যাগ করতে পারি, তবেই না ত্যাগ? বলতে পার যে ছেঁড়া কাথার উপর ভিখারীর টান, আর রাজ্যের উপর রাজার টান, উভয়ই সমান; কিন্তু সে টান মোড় ফিরালে যদি ভিখারী রাজা হওয়ার ও রাজা ভিখারী সাজবার মত শক্তি আপন বুকে রাখে, তবেই সেখানে ভিখারীর টান রাজার রাজ্যের উপরকার টানের চেয়ে কম নয়, এ কথা বলা যায়। অর্থাৎ ভগবান বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে যাদের টান থাকবে, তারা এ দিকে রাজা বা ভিখারী থাক্, তাতে কিছু যায় আসে না, তাদের কার মনের বল বেশী, তার বিচারও তাদের সে ত্যাগ দিয়ে হয় না; তা হয় তার পরের বা পূর্ব্বের অবস্থায় চিত্তে কার কত জোর বেশী প্রকটিত হয় তাই দিয়ে। নতুবা, ছেড়া কাঁথায় মন উঠছে না, তার চেয়ে বেশী জোটবার মুরদও নাই, তাই 'তিনি পান না বলে খান না' ধরণের সন্ন্যাসী আজকাল হিন্দুস্থানে নেহাৎ কম নয়। বাঙ্গালা দেশে সন্ন্যাসীর হিড়িক ততটা এগিয়ে না গেলেও বৈরাগী-বৈষ্ণবীর দল সে স্থান পূরণ করছে। অবশ্য প্রকৃত সন্ন্যাসী বা বৈরাগী যে কোথাও একেবারেই নাই এমন কথা বলছি না, কিন্তু প্রায় অধিকাংশই এমনি ধরণের হয়েই যে দেশটাকে ভিখারীর দেশে পরিণত করছে, তাতে ভুল নাই। পন্থার দোষ নাই, কিন্তু পথিক সাজবার মত উচ্চ মনোবৃত্তির অভাব যতদিন না টুটবে, ততদিন কিছুতেই এ সব যাবে না। মোটের উপর প্রথমেই ত্যাগী সাজার কথা নয়। প্রথম চাই, কি জন্য ত্যাগ করব—তার বুঝ-বিচার; উদ্দেশ্য আগে মহান্ হোক্. তা সাধন করতে আগে দেহ মন প্রাণ উৎকৃষ্ট হোক, সকল দিকে ঘুরে ফিরে নিজের বলতে যা কিছু সব সে জন্য ত্যাগ করবার মত মন আগে গঠিত হোক. সুখস্পৃহা সে উদ্দেশ্যের কাছে বিষজ্বালার মত হোক, তবেই প্রকৃত বৈরাগ্য আসবে, ত্যাগের যোগ্য সময় ও মন তৈরী হবে।

কিন্তু ত্যাগ বল বৈরাগ্য বল, সব কিন্তু "আমার" জন্য; বুদ্ধদেবের যে ঐ বৈরাগ্য, তাও সকলকে নিয়ে তার বিরাট "আমি" জরা-ব্যাধি-মৃত্যু মুক্তির জন্যই! বিশ্ব-সংসার সমস্ত আমারই সঙ্গে জড়িত! লোকে সাধু-সন্ন্যাসী বা মোক্ষকামী ত্যাগীদের অনেক সময়ে বড় স্বার্থপর বলে থাকে! সে কথা ঠিকই—তার "বড় স্বার্থ"ই চান! জগতে সাধারণ আমরা ছোট স্বার্থ. অর্থাৎ নিজকে শুধু এই সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত মনে করে তার জন্যই মারামারি করে মরি আর তাঁরা চান. এসব ছেড়ে বড় স্বার্থ! কিন্তু সে বড় এমনি বড় যে আমাদের মত এই সব অনেক ছোট ছোট স্বার্থেভরা আকুল প্রাণ সেই বড় স্বার্থের মাঝে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েই প্রকৃত বাঁচবার উপায় করে নেয়! বুদ্ধদেব এমনি এক বড় স্বার্থপর ছিলেন বলেই জগতের একতৃতীয়াংশ লোক তাঁরই ভাবে ভাবিত হয়ে জীবনে বৃহত্তের সন্ধান পাচ্ছে! যিনি সর্ব্ববৃহৎ হিন্দুর সেই ব্রহ্ম যেমন বৈদিক যুগে বা উপনিষদের যুগেই সাধারণের বিষয় ছিলেন. বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মাঝ দিয়েই

আজ তিনি বেশীভাগ লোকের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছেন! হিন্দুর বেদান্তের একবাদ ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ নামে বিভিন্ন হলেও সাধকের নিকট চরমে সেই একই তত্ত্বে (বিভিন্ন পরিভাষায়) নিয়ে পৌঁছায়। তাই বৈদান্তিকচূড়ামণি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধও বলে থাকে। সত্যই শঙ্করের প্রচারিত বেদান্তের ব্রহ্মবাদ উপনিষদের যুগেই সমাজের নানা স্তরে বিভিন্ন পন্থায় ও বিভিন্নরূপে প্রবিষ্ট হয়ে সমাজকে এক বিশিষ্ট রূপ দান করেছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের প্রচারের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তা বিশেষ কোনও culture-এর প্রবর্ত্তন করে নাই। হাজার বছর ধরে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবাদ বিশেষ এক শ্রেণীর মুমুক্ষুদেরই পথ প্রদর্শন করে এসেছে। যে আমিত্বের বিরাটত্ব ব্রহ্মে গিয়ে পর্য্যবসিত, তা শুধু ভাবেই একসময়ে অনুভূত হয়, কিন্তু সমাজের নানা স্তরে প্রত্যেকের জন্য যেমন বুদ্ধদেব বিশেষ এক উদার ও নৈতিক পন্থার প্রবর্ত্তন করেছেন, শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তে তা নাই। বেদান্ত শুধু উচ্চাধিকারীর, বিশেষ চিন্তাশীল, বিশেষ প্রজ্ঞাবানের জন্যই। সাধারণ প্রত্যেকের পক্ষে সে জন্য নিজকে তৈরী করবার বিশেষ করে কোনও পথ বাংলে দেননি—তার ভার দিয়েছেন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করে চিত্তশুদ্ধির উপর। সমস্ত জগৎ ভরেই এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কোনও না কোনও রকমে পালিত হলেও ভারতের রীতি থেকে তা বহু পৃথক। তাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নীতি সর্ব্বত্র গৃহীত হলেও গৃহীত হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধ রীতি ভারত ছাড়িয়েও ব্যাপ্ত হয়েছে।

হিন্দুই বল, আর বৌদ্ধই বল, হৃদয়ের ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কেহ ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করে নাই। তাই হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে যেমন হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বৌদ্ধ শূন্যবাদী হয়ে মূর্ত্তি পূজার পক্ষপাতী না হলেও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তিও রূপ গ্রহণ করে পূজা পাচ্ছে। গুরুবাদের একটা মহাসত্যও এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাস্তিক ও আস্তিক যে কোনও ধর্ম্মের যে কোনও মতাবলম্বী হোক্ না কেন, একমাত্র গুরুবাদ সকলকে এক মহাসঙ্ঘে পরিণত করতে পারে। আমি আছি, আমার চেয়ে বড় কেহ রয়েছেন, যাঁর কাছ থেকে আমি জীবনের রহস্যভেদ করবার উপায় জানতে পারি—তিনিই হলেন গুরু, বড় বা শ্রেষ্ঠ। এই গুরু বাস্তবতঃ বিভিন্ন নরাকারে এলেও হিন্দুর ভাষায় সেই একই পরব্রহ্মই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন অধিকারীর কাছে তার ইষ্টসিদ্ধির উপায় জানাতে নিজে এসে ধরা দেন। কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী বা শূন্যবাদী সকলেই গুরু স্বীকার করেন। এবং একমাত্র তাঁকেই 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন চ সেবয়া' তুষ্ট করে আপনার মাঝে তাঁর ভাব সংক্রামিত করে নিতে হয়। দীক্ষা বা শক্তিসঞ্চার প্রকৃতপক্ষে ইহাই। আমাকে আমার পূর্ণ করে তুলবার পক্ষে অন্য এক বিরাট শক্তির স্থূলতঃও সাহায্য প্রয়োজন—তিনিই গুরু। তাঁর সঙ্গেও হৃদয়ধর্ম্ম নিয়ে চলেই ভাব আকর্ষণ করা সহজ হয়। আমি যে ভাবে নিজকে ভাবিত করতে চাই, তিনি সেই ভাবের মূর্ত্ত প্রতীক। কাজেই তাঁর সঙ্গে যতই হৃদয়ের সংমিলন হবে, ততই তাঁর সেই ভাব ও আদর্শ আমার মাঝে সঞ্চারিত হবে। মহাপুরুষদের মূর্ত্তি বা ফটো পূজার মূলেও এই ভাবই নিহিত। বৌদ্ধদের বুদ্ধমূর্ত্তি পূজার মধ্যেও এই মহান ভাব ও সত্য নিহিত। মূল সত্য সর্ব্বত্রই বিভিন্ন আকারে ক্রমশঃ গৃহীত হয়।

হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার অন্য যতই তত্ত্ব থাক, অজস্র দেবতার সঙ্গে অজস্র রকম অধিকারীর সম্বন্ধ থাকায় হৃদয়ের ধর্ম্ম তাঁদের সঙ্গে যোগ হয়ে মানুষকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করছে। তত্ত্ব-বিচার সকলের মগজে প্রবেশ করে না, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যা পূরণ করবার

ক্ষমতা সবার নাই। সাধারণ মানুষ বিপদে বা সমস্যায় পড়ে ঊর্দ্ধলোকবাসী দেবতার সাহায্য ভিক্ষা সব দেশেই চিরকাল করে এসেছে। দেবতার সঙ্গে আপন আপন মনের নানা ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে ক্রমশঃ মানুষকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন করে, উন্নতির পথে নিয়ে যায়। প্রথম যে দেবতার কাছে শুধু অপরের ক্ষতি করতে হলেও নিরাপদে ফিরবার প্রার্থনা জাগে, যতই সে দেবতার সঙ্গে প্রকৃত হৃদয়ের যোগ হতে থাকে, ততই নীচ কামনার প্রার্থনা চলে গিয়ে যে উচ্চভাব প্রাণে জাগে। একই দেবতার কাছে বিভিন্ন অধিকারী বিভিন্ন ভাব দিয়ে পূজা দিচ্ছে; কিন্তু চরমে যদি সেই দেবতার বাস্তবিক করুণা লাভ হয়, তবে সেই দেবতার ভাবই অর্থান্তরিত হয়ে পূজকের প্রাণ জাগায়। একই কালী দেবীকে ভজনা করে দস্যুতা করে যার প্রাণে সংহার করতে চলছে, সেও যে সেই একই মায়ের সন্তান, সে কথা বা বিচার তখন মনেও জাগে না। কেননা আত্মপ্রাণ ও আত্মস্বার্থে জগৎ ভুল হয়ে যায়। কিন্তু তবু যেমন তেমন করে তাঁকে ভজন পূজন করেই পরিণামে তাঁর পরমতত্ত্ব, নির্গুণ ভাবে পর্য্যন্ত পৌঁছা যায়।

কাজেই, যেমন করেই হোক, দেবতার সঙ্গে, ঊর্দ্ধজগতের সঙ্গে জীবনের যথার্থ উন্নতিচিন্তার সঙ্গে যদি সামান্য যোগও থাকে, তবে সেই স্ফুলিঙ্গ থেকেই সমস্ত দুষ্কৃতিরাশি ভস্মীভূত হতে পারে। আমার সঙ্গে, আমার পরিবার গ্রাম সমাজ, দেশ বা যতদূর কল্পনা যায় সর্ব্বত্র সকলে সব দিকে উন্নত হোক—এমনি ধরণের মহান্ প্রেরণা সবার আসে না। সকলের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে সবার অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব অনুভব করা সবাই বুঝে না। কিন্তু আত্মোদর পূরণ, আপনার মঙ্গল কামনা সকলের স্বভাব ধর্ম্ম। সাধারণ মানুষ ও ইতর কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিও আপনার অনিষ্টাশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই সাধারণ স্তরের জীবের ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া-মমতা সব নিজকে নিয়েই। যাঁরা ঊর্দ্ধে উঠে যান, তাঁরাও সকলকে আপনার মাঝেই অনুভব করে সেই আমিত্বকেই বিস্তৃত করেন। আমার মঙ্গল হউক, আগে এই চাই, সেই জন্যই যত দেবদেবী পূজা জপ-তপ ইত্যাদি। তবে সেই "আমি" টা মাত্র বিভিন্ন প্রাণীর কাছে বিচিত্র রূপে অনুভূত হয়, কিন্তু আমি আছে প্রত্যেকেরই। আর সবচেয়ে ভালবাসে তাকেই বেশী। "কৃষ্ণপ্রেম তরে ইচ্ছা তারে বলি প্রেম" বটে, কিন্তু সেই কৃষ্ণকেও আমি দেখি, এমনি ভাবের দ্রষ্টৃত্বের মাঝে সেই আমিই বৃহৎ রূপে বেঁচে থাকে। কাজেই আমির যখন ক্ষয় নাই, তখন আমার দেবতাকে সেই আমারই মত নিঃসঙ্কোচে সমস্তটুকু প্রাণ ঢেলে ভালবাসা চাই। দেবতা তাহলেই তাঁর প্রকৃত রূপের দর্শন দিয়ে আমার আমিত্বস্বরূপ কি, তা জানিয়ে দেবেন।

বিষাদ-যোগ

—•—

প্রত্যেকেরই সাধন-জীবন আরম্ভ হয়—বিষাদ-যোগ হইতে। সত্যের সম্মুখীন হইতে গিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া যায়, গা কাঁপে, হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়ে—আর আমরা বিজ্ঞের মত কেবল বুলি আওড়াইতে থাকি। তখন পার্থসারথি আসিয়া ঝাঁকুনী দিয়া বলেন—উঠ—জাগ! প্রজ্ঞাবাদ নয়, চাই কর্ম্ম—বীরের কর্ম্ম, ত্যাগীর কর্ম্ম. পরন্তপের বীর্য্য।

আমাদের যত গলদ সব ফাঁস হইয়া যায়—কর্ম্ম পরীক্ষায়। অর্থাৎ কর্ম্মের মাঝে চিত্তকে স্থির এবং অবিচলিত রাখিয়া, সদাসন্তুষ্টমানস হইয়া কর্ম্ম করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। আমরা কর্ম্মকে ভয় করি—কেননা কর্ম্ম মুক্তির বিরোধী। কিন্তু কে জানে, যে মুক্তির দরুণ আমরা লালায়িত, তার বাহিক আড়ম্বর ছাড়া আর কোন অর্থই নাই। আড়ম্বর বলিতেছি এইজন্য, তাহা ক্ষণস্থায়ী, অবিশুদ্ধ চিত্তে মুক্তির পিপাসা জাগিয়া উঠিলে অনেক সময় ভয়ের কারণ হয়—তাহাতে পতন যাইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। কাজেই একটুও ফাঁকি না দিয়া, কর্ত্তব্যে অবহেলা না করিয়া সময়োচিত বৈরাগ্য শ্রদ্ধার্হ—কিন্তু অসময়ে, অবিশুদ্ধ আধারের অতি ব্যাকুলতায় যে সাময়িক বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস করিলে নিজের জীবনই পণ্ড হয়। এইজন্যই জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়; কর্ম্ম ছাড়িতে নাই! অনেকের বৈরাগ্যের মূল কারণ—কর্ম্মে বিতৃষ্ণা; তারপর গুরু নির্দ্দেশিত কর্ম্মের প্রতি যাহাদের আস্থা হয় না, তাহাদের মাঝে যে নিশ্চয়ই গলদ রহিয়াছে তাহার তো কোন ভুলই নাই। সমর্পিত জীবনের মাঝে যখন কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব দেখিতে পাই, তখনই মনে একটা সন্দেহ জাগে; কেননা তাহারা ইষ্টের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়!

আমরা অনেক সময় নিজেদের এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকেই ধর্ম্ম-ভাব বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া বসি! এই নির্গুণ তামসিক অবস্থার মাঝে সাধকের—বিবেকবুদ্ধি সব লোপ পাইয়া বসে; তখন সে শক্তিধর হইয়াও—নিতান্ত শক্তি-হীনের মতই নিজকে প্রতিপন্ন করিয়া বসে; গুরু শিষ্যের এই সাময়িক বিষাদ ভাব দেখিয়া হাসেন মাত্র; কেননা এর পরের মুহূর্ত্তেই যে শিষ্যের জীবনে উৎসাহের উদ্যমের উৎস খুলিয়া যাইবে—তখন কোথায় থাকিবে বিষাদ, কোথায় তুচ্ছ ধর্ম্মভয়—প্রাণ যে শক্তির মত্ততায় উল্লসিত হইয়া উঠিবে! সাধক তখন সমর্পিত জীবনের ঠিক ঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে! তখনই ইষ্টের ইচ্ছার অনুকূলে জীবন গঠিত হইয়া উঠে!

কিন্তু মানুষ তো তাহার সংশয় রহিয়াছে, ভয় রহিয়াছে, দুর্ব্বলতা রহিয়াছে; আবার অন্যদিকে মৃত্যুৎসাহসমন্বিত নির্ভীক ভাবও রহিয়াছে। কাজেই অবসাদের মেঘাচ্ছন্নতায় যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে, তখন দুর্ব্বল সাধক মনে করে, এখন সব ছাড়িয়া দিয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেই বুঝি মুক্তির পথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; কিন্তু ইহা বিষম ভুল ধারণা। আপ্রাণ লড়াই করিয়া শেষ মুহূর্ত্তে হাল ছাড়িয়া দিলে কোন ফল হয় না। বরঞ্চ যতখানি উজাইয়া আসা যায়, আবার ততখানি পিছনেই গিয়া পড়িতে হয়। এই নিদারুণ সঙ্কটে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেওয়ার খুবই প্রয়োজন। নির্দ্দেশে চলিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। দুই দিন পর মনের উত্তেজনা বা অবসাদ আপনি চলিয়া যায়।

সব জায়গায় পথ পরিষ্কার থাকে না। আলো সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় না, অন্ধকারের ভিতর দিয়া দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াও জীবনের কতক অংশ কাটাইতে হয়, শেষে সব ঠিক হইয়া আসে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়িয়া যাহারা নিরুৎসাহ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, তাহাদের আর উত্থানের কোন আশা থাকে না! ক্রমশঃ তাহারা তলাইয়াই যাইতে থাকে! এই সময় একজন কাণ্ডারী পাইলে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকে না!

কিন্তু যে-সে মানুষ নয়, যিনি আমার মজ্জাগত সংস্কারকে ভাল করিয়া জানেন বুঝেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই দিক দিয়া ভাল করিয়াই জানিতেন, কাজেই বৈরাগ্যের বুলি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই! যাহার জীবনের মূল-মন্ত্র হইল কর্ম্ম—যুদ্ধ, সে কি কখনো মুখে বলিলেই এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারে? অর্জ্জুনের বৈরাগ্য যদি খাঁটীই হইত, তাহা হইলে কখনই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে—পর মুহূর্ত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেন না তিনি! আসলে অর্জ্জুন নিজের জীবন সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন—অথচ গুরুতেও তখন তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস আসে নাই! কাজেই সংশয়ে পড়িয়া কর্ম্ম হইতে মুক্তি নেওয়ার ফিকিরই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

ফাঁকি দিয়া কেহই কিছু পায় না, বরঞ্চ তাহাকে ক্ষতিপূরণের দরুণ দ্বিগুণ সাধনা করিতে হয়; আমরা অহরহঃ আমাদের আশেপাশে এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি! নিজের সম্বন্ধে নিজে কিছু জানিতে না পারিলে, কিম্বা গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে—সাধক মাত্রেরই অর্জ্জুনের মত এই বিষাদ-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; শেষে দিশেহারা হইয়া আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!

এই জন্যই প্রথমতঃ আবেগকে হজম করিয়া নিতে শিখিতে হয়। আমরা অনেক সময় নিরর্থক লাফাইয়া উঠি—কিন্তু তাহার পরেই আত্মনির্ভরের সেই নির্ভীক ভাব আর দেখা যায় না। কাজেই উচ্ছ্বাস আবেগ সবকে সহ্য করিয়া—দমন করিয়া তাহার পর স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হয়—আমার জীবনের মূল-মন্ত্র কি? আমি কি চাই—আমার মাঝে কি সংস্কার রহিয়াছে? হয়ত আমি যা এখন চাহিতেছি, তাহা আমার সংস্কারের অনুকূল নাও হইতে পারে, কাজেই দুই দিন পর হয়ত তাহাতে আর কোন উৎসাহ উদ্যম প্রচেষ্টা কিছুই থাকিবে না। ভাল করিয়া তলাইয়া না দেখিয়া হঠাৎ আবিষ্টের মত অন্ধ হইয়া এক পথ ধরিয়া বসিলেই জীবন সার্থক হয় না। বরঞ্চ এইবার উত্তেজনার পথে অনেকের জীবনই পণ্ড হইয়াছে।

মোট কথা, আগাগোড়া নিজকে বাজাইয়া লইতে হইবে। কাহারও মুখের কথায় ধম্ কানিতে নয়, বুকে হাত দিয়া বুঝিতে হইবে আমার প্রাণ কি চায়—কিসের দরুণ অমন অবিরাম স্পন্দন চলিতেছে! জীবনের প্রথম শক্তির বিকাশের সময়, আমরা প্রায়ই লক্ষ্য ভুলিয়া, নিবিড়তম সত্যের সন্ধান না নিয়া কেবল ওপরভাসা ভাবের বন্যায় ভাসিয়া চলি। কাজেই জীবনে সোয়াস্তি পাই না—শান্তি পাই না। নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইতে পারাটা তো গৌরবের কথা, মাথা যদি কাহারো কাছে অবনত করিতে না হয়, সে তো পরম ভাগ্যের কথা; কিন্তু যাহারা নিজের সম্বন্ধে অন্ধ তাহাদের আত্মবিশ্বাসকে অপরের শক্তির প্রভাবেই উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে হয়। এই পথকেই বলে সমর্পণের পথ। ইহা অত্যন্ত জটিল—অথচ খুব সোজা!

বিষাদ কিম্বা সমস্যা উপস্থিত হইলেই—বুঝিতে হইবে সুদিন আসিতেছে, কেননা বিষাদ ভাব কিম্বা সমস্যা চিরস্থায়ী নহে। ইহার পর আশার আলোকে জীবনের আনাচ-কানাচ সবই ভরিয়া উঠে। গুরু শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারেন, কাজেই সাময়িক বিষাদের অন্তরালেও যে শিষ্যের মাঝে একটা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্ম-প্রেরণা বা সেবার ভাব রহিয়াছে, তাহা গুরু প্রথমেই বুঝিতে পারেন। কাজেই একেবারে নিছক বৈরাগ্যের বুলিতে অনেক সদ্‌গুরুই সায় দেন না। কর্ম্মের সঙ্গে কিছু না কিছু সংযোগ রাখিতেই হয়। কর্ম্মের মাঝে গুণের ক্রিয়া চলিতে থাকে, নির্গুণ হইয়া বসিয়া থাকিলে জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা হইবে কেমন করিয়া! বিচিত্র কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াও শান্ত সমাহিত হইয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিতে পারেন যিনি, তিনিই প্রকৃত সাধক—ত্যাগী—বীর। কর্ম্মক্ষেত্রে বিজয় লাভ—অতীব যশের কথা—গৌরবের কথা; এই জন্যই সাধকের প্রতি উপদেশ হইল—হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ।

বিবিক্ত সাধনার যে কোন প্রয়োজন নাই, তাহা নহে—কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তাহার চিতটা বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—বেদান্তের নির্ভীক বাদ, ব্রহ্ম—আর তাহার বিপরীত হইল সাংখ্যের কৈবল্যবাদ কূটস্থ চৈতন্য! প্রাণশক্তি লোপ হইয়া গেলেই বুঝিতে হইবে—ভাবে ঘূণ ধরিয়াছে। সেই ভাবের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন! আর গুরুর প্রয়োজন হয় এইখানেই। আত্মবিশ্বাসের বজ্র-নির্ঘোষ বাণীতে তাহারাই ভক্ত-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই বাণী—গুরুর বাণী!

ব্রহ্ম-জ্ঞান একদিনেই হয় না, তাহার দরুণ জীবন ভরিয়া সাধনা করিতে হয়। সমর্পিত জীবনে গুরু নির্দ্দেশিত কর্ম্মের প্রতি সন্দেহ জাগাটাই অনুচিত। যাহাদের শুদ্ধ চিত্ত, তাহাদের আর অপরের নিকট হইতে আদেশ উপদেশ গ্রহণ করিতে হয় না, স্বভাবতঃই আত্মার দীপ্তিতে তাহাদের হৃদয় চিরোজ্জ্বল। কাজেই যাহারা আশ্রিত-সেবক, তাহারা সাধক মাত্র, সিদ্ধির পথে এখনো তাহাদের অধিকার হয় নাই। কর্ম্মের নির্দ্দেশ চিত্ত-শুদ্ধির কারণই!

দুর্ব্বল অনেক সময় নিজের দুর্ব্বলতার সাফাই গাহিতেগিয়াই ধর্ম্মের বুলি মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া আসে। ইহাতে নিজের আন্তরিক ইচ্ছাকে দলন করা হয়। অর্থাৎ প্রাণ চায় একটা, আর কার্য্যতঃ করিতেছি অন্যটা; দিশেহারা হইয়া গেলে—জীবনের ভার অপরের হাতেই ন্যস্ত করিয়া দিতে হয়। অবশ্য উপযুক্ত চালকের হাতে না পড়িলে সমর্পিত জীবনেরও কোন মহিমা ফুটিয়া উঠে না। কাজেই আত্ম-বিকাশও চাই, আবার উপযুক্ত গুরুও চাই, দুই-এর সমন্বয় হইলেই জীবন পূর্ণ!

বেশ থাকা

—*—

বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ ভাই? বললাম ভাল আছি, বা বেশ আছি। বলেই অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও জিজ্ঞাসা করতে হয়, ভাই, তুমি কেমন আছ? বিশেষ রকমের অমঙ্গল কিছু না ঘটলে 'ভাল আছি, বা একরকম আছি,' এমনি ধরণের উত্তর আসে। পথের দেখা, এর চেয়ে আর বিশেষ উত্তর কিই বা দেওয়া যায় বা আশা করা যায়? কাজেই এটা হল সাধারণ উত্তর, এই ধরণের সাধারণ উত্তর আমাদের দৈনিক জীবনে বহু দিতে হয়, ও দিতে দিতে সেগুলি একেবারে আমাদের অভ্যস্ত বা মুখস্থ হয়ে পড়েছে —এখন আর এগুলি বলতে মুখে বাঁধে না, প্রাণে গিয়ে কোনও সাড়াই দেয় না। অথচ, যদি তলিয়ে দেখি তবে হয়ত দেখতে পাই এই 'বেশ আছি'র মানে বারো আনাই হয়ত বেশ নাই—হয়ত নিজের বা পরিবারস্থ কারও কোন অমঙ্গল ব্যাপার নিয়ে মনটা খুনচেই। কিন্তু রাস্তার বন্ধুর কাছে সে কথা বলে লাভ নেই—তাই ওই বলেই সেরে আসতে হয়। এমন কি, বাইরের বন্ধুর কাছে যেমন অন্তরখানিকে আড়াল করেই চলে আসি, ঘরেও হয়ত বহু লোকের মন রাখতে গিয়ে অনেকের কাছেই আমার আপন অন্তরখানি আড়ালেই থাকে। প্রাণ খুলে জীবনের সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে একটুখানি জিরুবার জায়গা খুব কমই মিলে। সবাই শুধু ছুটতে দেখেই খুসী, তাদের আপন স্বার্থের শত-বন্ধনে আবদ্ধ থেকে তারা আমার দিকে সে দৃষ্টিতে তাকাবে কি, তারা দেখছে তাদের কাজ কতটুকু এগুলো!

জগতে সবাই এমনি আমায় দিয়ে তাদের যার যতটুকু কাজ হবে, সে ততটুকু দৃষ্টি দিয়ে আমায় অভিনন্দিত করছে—সে আমার তৃপ্তির জন্য নয়, মূলে তাদের তৃপ্তি তার পিছনে রয়েছে বলেই। কিন্তু তবু বলি, ওইটুকুও বড় বেশ লাগে। যেমন করেই হোক দশের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছি বলেই না আজ দশ-দশে একুশ জনের কাছ থেকে আমার ডাক আসে। আমি যেমন তাদের একজন, তাদের প্রত্যেকের এই আমরা ছাড়া আরও কত দশ জনের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। এমনি করেই আমাদের এই ছোট ছোট জীবনগুলি নিয়ে এক-একটি বৃহৎ পরিবার বা প্রাণের সম্বন্ধ না হোক, অন্ততঃ বাহিরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তারা আমার মনের পরিচয় হয়ত জানে না, আমিও হয়ত কারও মনের নাগাল কোন দিন পেলাম না, তবু মনের মানুষ খুঁজতে গিয়ে আমরা বাইরে যে অতগুলি মানুষের সঙ্গে পরিচয় করি, তাই বা মন্দ কি? মানুষ হয়ে মানুষকে যদি প্রাণে প্রাণে না পাই, অন্ততঃ বাইরে পাই, তবু ভাবি—যাক্ আমি তো নেহাৎ একা নই। তাই সুদূরের পথ চলতে হলেও, সঙ্গী নাই জেনেও, ক্ষণিকের তৃপ্তির আশায় পথিক-বন্ধুর সঙ্গে পথেই আলাপ জমিয়ে নেই। জগতের বিচিত্র রকমের অজস্র প্রাণ-সাগরে অন্ততঃ একটু-ক্ষণের জন্য একটা প্রাণের স্পর্শ পেয়েও এ প্রাণ তৃপ্তি পেতে চায়। তাই দুঃখ পেয়েও বলে—"বেশ আছি, ভাল আছি, ভাই তুমি কেমন আছ!" অর্থাৎ আমি যেমনই থাকি, বেশ আছি ভেবে, আগে বল, তুমি কেমন আছ—আমারই মতন হয়ে কি?

অগণিত লোকের মাঝে একে বন্ধু বলছি এই জন্য যে, এই অগণিত লোকের মাঝে ক'জন আমাকে কেমন আছি জিজ্ঞাসা করে? চাণক্যের

শ্লোক আওড়িয়ে আজ বান্ধবের এলাকায় হয়ত কাউকেই ফেলতে পারব না, তবু এদের এই একটুখানি আলাপকে ধরেই বন্ধু-নামের মাঝে অনেককে জড়িয়ে ফেলি। জানি যে হয়ত এদের মনের মাঝে আমার প্রাণকে ডুবুরী করে নামিয়ে দিয়ে এমন কোনও রত্ন পাব না, যাতে আমাকে চিরজীবনের তৃপ্তি দিতে পারে—আমি আমার সবটুকু দিয়ে তাহলে তাকেই নিয়ে থাকতাম। কিন্তু এমনটী হওয়া দুর্লভ বলে যেমন শাস্ত্রে বলে গিয়েছে, তার চেয়েও, সেই আপ্তশ্রুতির বড় প্রমাণ হতেও নিজের জীবনের নির্ম্মম অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে—দুর্লভ এ জগতে বন্ধুর মিলন।

যখন খুঁজে দেখি, সত্যি আমি তাদের কাছে চাই কি? তখন হয়ত এমন কোনও দুষ্প্রাপ্য বস্তুর চিত্র মনে ওঠে না, যার জন্য আমি বন্ধুর প্রত্যাশী। আমি চাই শুধু তার প্রাণ। সে প্রাণের কাছে এ জগতের সব তুচ্ছ, সমস্তই তলিয়ে দিয়ে শুধু আমাদের দুটী প্রাণকে উচ্চ করে রাখতে চাই—যেন সব নিরাশা সমস্ত নিরানন্দ সেই মিলনের পূর্ণানন্দের কাছে গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়, একের প্রাণ দিয়ে অপরের প্রাণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, সেই আনন্দের অনুভূতিতে জগৎ প্লাবিত দেখি। সত্যি, যখন মনে হয় যে, এই ক্ষুদ্র মানুষটীর মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য লুকানো আছে, তখন সেই মানুষের প্রাণের অগাধ সমুদ্রে ডুবুরী হয়ে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা কার না হয়? মানুষের মাঝে অনন্ত মধু যদি না থাকবে, সে যদি অমরার আনন্দই দিতে না পারে, তবে মানুষের জন্য মানুষ এত করে মরে কেন? মানুষ যে আমার সর্ব্বত্র অধিকার করেছে!

দর্শন বল, কাব্য বল, সব এই মানুষের মনেরই একই রস বিভিন্ন ছাঁচের পাত্রে ঢালা হয়েছে। যে যাতে বেশ থাকে, মানুষ তাই বেছে বেছে বার করে তাই নিয়ে রয়েছে। জগতের বিচিত্র কাব্যে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন ভাবে রস গ্রহণ করেছে এই মানুষের প্রাণ। কে বলে দেবতারা সুখে আছে? সুখের একঘেয়ে চির উপকরণে তাদের সুখবোধই বুঝি puzzled হয়ে যায়। বৈচিত্র্যের নূতনত্ব না থাকায় মন যদি paralized হয়ে পড়ে, তবে কে চায় অমন সুখ? মানুষের মাঝে যাতে সে অবস্থা না ঘটে, তাই বুঝি দুঃখের আঘাত দিয়ে নিত্য-নূতন চেতনায় এই জগৎকে ভগবান আমাদের কাছে মেলে ধরেন। মানুষ মানুষ বলেই সে বৈচিত্র্যের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারে। দেবতা হলে তার এই বৈচিত্র্য উপভোগ হত না। কিন্তু তবু মানুষ বড় কাঙ্গাল। কাঙ্গাল হয়ে আছে বলে সে এত পেয়েও আরও চাইছে। তার প্রাণ যে অফুরন্ত রত্নের ভাণ্ডার, সে কথা তার আজন্মের সংস্কার। সেই সংস্কারের বশে শূন্যরূপে প্রতিভাত আপন হৃদয়কে সে যতই ব্যাপক ভাবে, ততই তা বিস্তার লাভ করে। এই হৃদয়ের ছোট্ট অধিকারী যে এমনি বামনরূপে ত্রিলোক অধিকার করবে—তা বুঝি তার প্রাণে অহরহ জাগে, তাই যত পায়, তত সে চায়। সে চায় যে কি, হয়ত ঠিক জানে না, কিন্তু এইটুকু বোঝে যে, যা পেয়েছি, তাতে পেট ভরবে না; এখন যে ভরছে, দুদণ্ড পরে আবার তা খালি হয়ে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক করবে—তাই সে শুধু চায়, চায়, আরও চায়।

এই চাইবার প্রবৃত্তি অফুরন্ত বলেই মানুষ পায়, পেয়ে বড় হয়—বিশ্বব্যাপক হয়। তাই এই চাওয়া বা দুঃখবোধ বরং ভাল, কিন্তু তুষ্ট হয়ে 'বেশ আছির' ভাব যদি তাকে পেয়ে বসে, তবে সেই তৌষ্টিকতাই হবে তার পক্ষে মারাত্মক। সুখের বেশ-থাকার সঙ্গে চিত্তও যদি বেশ থাকার অলস আরামকেই আঁকড়ে ধরে, তবেই তার অধঃপতন সুরু হয়। মনুষ্যত্ব যত দিন থাকবে রজোর প্রবল তাড়নে তাকে স্থির থাকতে

দিতে চাইবে না। তবু যদি 'বেশ আছি' বলে একটা অবস্থাকে নিয়ে সে থাকতে চায়, তবেই "গুরুবরণকমেব তমঃ—মহা আবরক তমোগুণই" তাকে ঠেলে নিয়ে মৃত্যুর দীর্ঘ বিশ্রামে বেশ রাখবে। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় এই বেশ থাকার ও দুঃখে থাকার কারণ বলছেন, তমোগুণ ও রজোগুণ। দেবতারা সত্ত্বগুণের অধিকারী অর্থাৎ বিশেষ সাত্ত্বিক, মানুষ সাধারণতঃ রজোগুণপ্রবল আর ইতর প্রাণীরা স্বাভাবিক তমোগুণাশ্রিত। রজোগুণের ধর্ম্মই এক অবস্থায় স্থির না থেকে চঞ্চল হওয়া। এ চাঞ্চল্য তাকে সুখাভিভূত অবস্থা থেকে দুঃখবোধ জন্মিয়ে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তাই দুঃখটাও কাম্য। অথবা কাম্য হোক্ বা না হোক্, তুমি চাও বা না চাও, সে আসবেই। নিখিল প্রকৃতির উর্দ্ধপরিণাম বশতঃ তোমাকে শুধু বর্ত্তমানের আঁধার নিয়ে থাকতে দিবে না—আরামের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে, দুঃখের চাবুকে সজাগ হতেই হবে। এমনি ভাবে জেগে যখন প্রকৃত সুখ কি তা বুঝে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবে, তখন সেই পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সত্ত্বগুণ স্বাভাবিক আসবে। কিন্তু প্রথমেই সত্ত্বগুণের নিস্তরঙ্গ অবস্থার ভাণ করতে গেলে মহা তমোই এসে সকল আবৃত করবে। সেই মুগ্ধাবস্থায় সত্ত্ব ও তমোর প্রভেদ আর জানবে না।

এই তিনগুণের লক্ষণ সাংখ্যের কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলছেন—

> সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টং উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
> গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥১৩॥

সত্ত্বগুণ ইষ্টের প্রকাশক, লঘু; রজোগুণ চঞ্চল ও প্রবর্ত্তক; তমোগুণ মহাআবরক; প্রদীপ যেমন বস্তুকে প্রকাশ করে তেমনি এই গুণত্রয়ও মিলিত ভাবে স্বকার্য্য নিষ্পন্ন করে। এই কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদাচার্য্য বলেন—"যখন সত্ত্ব উৎকট হয়, তখন সমস্ত অঙ্গ লঘু হয়, বুদ্ধির প্রকাশ হয়, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা জন্মে। রজোগুণ উদ্যোতক। যেমন একটা ষাঁড় আর একটা ষাঁড় দেখে তার দিকে তাকিয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ হয়, তেমনি রজোগুণ চিত্তকে চঞ্চল করে। আর তমো মহাবরক। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন সমস্ত দেহখানি ভারী হয়, ইন্দ্রিয়গুলি আবৃত হয়ে গিয়ে নিজ নিজ কার্য্য ভালরূপে করতে পারে না। এমনি একটা আর একটার বিপরীত হলেও, প্রদীপের আগুন যেমন তেল ও সল্‌তাকে পুড়ে ফেলে বা সল্‌তাকে তেল ভিজিয়ে দেয়, এমনি বিপরীত ধরণের হলেও তেল, সল্‌তে ও আগুন মিলে প্রদীপ হয়ে অন্ধকারে বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি এই তিনগুণ তাহাদের বিষয়কে সম্পাদন করে।" তাহলেই দেখি, কোনও গুণই প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিতান্ত অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় নয়। শুধু সত্ত্ব বা রজো ও তমোর একটা থাকলেই চলে না; একটা প্রবল, আর দুইটা নিস্তেজ থেকে আমাদের প্রত্যেককে এক এক সময়ে এক এক কাজ করায়। আমাদের লক্ষ্য হবে সত্ত্বগুণাধিক্য, কিন্তু তাই বলে আর দুটা গুণ না থাকলেও আবার জীবন চলবে না। তাই চলার পথে রজোগুণই হবে জীবনের সঙ্গী। সে উর্দ্ধ্বদিকে চালিয়ে নেবে—তাতে দুঃখ আসে তো কি করা? পুরুষকার ছেড়ে বেশ আছি বলে দৈবের উপর নির্ভর করে থাকা হবে না কিছুতেই, তাতে যা হয় হোক।

এই জগতের তুষ্টির মত আধ্যাত্মিক রাজ্যেও মানুষের অনেক সময়ে সামনেই তুষ্টি এসে পড়ে। এই তুষ্টিকে নয় রকমে ভাগ করে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলছেন—

> আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
> বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ। ৫০

প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য এই চার রকম অন্তরতুষ্টি এবং বাহ্য বিষয় থেকে পাঁচরকম নিবৃত্তি

মোট এই নয় প্রকার অধ্যাত্মিক তুষ্টি। শাস্ত্র পড়ে প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য কি, তা জেনেই তুষ্ট, আসল জ্ঞান হয়নি; এই হল এক রকম তুষ্টি, এর নাম প্রকৃতি। উপাদান নামক তুষ্টি, যেমন সন্ন্যাস নিয়ে দণ্ডকমণ্ডলুধারণ করলেই মোক্ষ মিলবে—কাজেই এখন আর কিছু দরকার নাই। 'কাল' বলে একরূপ তুষ্টি আছে, যেমন, একদিন না একদিন মুক্তি তো সবার হবেই; কাজেই কালের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাও। আবার আর এক রকমের তুষ্টি আছে, তাকে বলে ভাগ্য; ভাগ্যে থাকে তো মুক্তি এমনি আসবে। এই হল চার রকমের তুষ্টি। আর বাহ্যিক শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ থেকে বিরত হওয়া অর্থাৎ এই পঞ্চ বিষয়ের বৈরাগ্য। এই পঞ্চ বিষয়ে বৈরাগ্য হয়েছে সুতরাং মোক্ষ আর বেশী দূরে নয়; এমনি পঞ্চ বিষয় বৈরাগ্য থেকে প্রত্যেকটীর জন্য এক প্রকার, সুতরাং পাঁচ প্রকার বিষয় বৈরাগ্য। এই পঞ্চ বিষয় বৈরাগ্য প্রায়ই পাঁচটী কারণে হয়। যথা—(১) ভোগের বস্তু অর্জ্জন করা বড় কষ্ট, সুতরাং থাক্। (২) যদিবা অর্জ্জিত হল, রাখা বা তার ব্যয় আর এক কষ্ট। (৩) চেষ্টা করেও পেলাম না, পেয়েও ভোগের শক্তি নাই, সুতরাং বৈরাগ্য হল। (৪) অনেক কষ্ট পেয়েছি ও ভোগও করছি বটে, কিন্তু এ জন্য এর পিছনে কত প্রাণী যে কত রকমে কষ্ট পেয়েছে বা হত হয়েছে, তা ভেবে বৈরাগ্য হল। শোনা যায় রাজা অশোকের কলিঙ্গ জয়ের পর এমনি বৈরাগ্য হয়েছিল। মোট এই পাঁচ কারণে পাঁচ বিষয় বৈরাগ্য-জনিত তুষ্টি ও আগের চার, মোট এই নয় রকম তুষ্টি।

এই সব তুষ্টিই সিদ্ধির পক্ষে অঙ্কুশ স্বরূপ। বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হলেই যে সব হয়ে গেল, আর কিছু করার দরকার নাই, এমনি যে 'বেশ আছি'র ভাব, এ-ও যে মারাত্মক। তা হলেই বলতে হয়, জগতে কেহই 'বেশ' থাকে না। যতদিন কারও মধ্যে মন বলে জিনিষ থাকবে ততদিনই তার কার্য্য 'সঙ্কল্প' থাকবেই এবং ছুটাছুটী বা দুঃখও তার নিত্যসহচর থাকবে। একমাত্র বেশ-থাকার কৌশল হচ্ছে মনকে পরমার্থে লয় করা। মনের নাশ হলেই তবে বেশ থাকা বা সুখে থাকা সম্ভব। শুনে হয়ত বলবে, মনই যদি না থাকল, তবে আর সুখ ভোগ করব কি দিয়ে? কিন্তু মন থাকলেও সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি সে মনের পিছনে থাকবেই। জগতে ভোগের তুলনায় ছোট বড় অনেকেই হয়, কিন্তু মনবিশিষ্ট মানুষ থেকে সেই ভোগদ্বারা চির দিন সুখের কামনা বাতুলতা মাত্র। এই মনকে লয় বা নিবিষ্ট করে থাকতে পারাই সুখ, তাও এই মানুষেরই আয়ত্তাধীন। পশুর মত মানুষও আপন মনকে পশুর সমান করে সাময়িক পাশবিক সুখ পেলেও পরক্ষণেই তার শতগুণ দুঃখ এসে মনকে আগুনে পুড়ে ঝলসে দেবে। কিন্তু যদি মন লয় হয়ে যায়, তবে সুখ বা দুঃখের বহু উর্দ্ধে সেই ধ্যেয় বস্তুতে মন তদাকার-কারিত হয়ে এক শান্ত আনন্দের স্নিগ্ধ প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বিষয় সুখ বা এ জগতের সাফল্য সে আনন্দের কোটী অংশের এক অংশও নয়। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি"—শ্রুতি। কাজেই এ জগতের বেশ থাকাই বেশ নয়—আমি বেশ আছি শুনে যদি তোমার যথার্থ বেশ থাকার ইচ্ছা হয়—তাই বলা বেশ আছি—আশা করি, তুমিও বেশ অতঃপর যথার্থ বেশ থাকার চেষ্টা করবে।

যোগ

যোগের দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। জীবনে যত উন্নতিই হোক, যে পর্য্যন্ত এক আধটা বিভূতি না দেখা গেল, সে পর্য্যন্ত সে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কিছুই পায়নি বলে উপেক্ষিত হবে। পক্ষান্তরে যদি শোনা যায়, অমুক তিনহাত উঁচুতে উঠে যায়, ঔষধ দিয়ে ধন্বন্তরির মত রোগ আরোগ্য করে বা গর্ভস্থ সন্তান ছেলে কি মেয়ে হবে, ইত্যাদি ভবিষ্যৎ বলে দেয়—অমনি আর তাকে পায় কে? সে নিজে অন্তরে তৃপ্তি পাক্ বা না পাক্, তার কথায় কাক-তালিয়ের মত বা যে কোনও সদসৎ উপায়ে একটু স্বার্থ সিদ্ধির সংশ্রব থাকিলেই সমস্ত বিচার ভুলে দলে দলে লোক গিয়ে তাকে জ্যান্ত ভগবান্ বানিয়ে বস্‌বে। তাও যদি সে ভগবানের কাছে যোগের যা লক্ষ্য তার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়, তবু ভাল। কিন্তু প্রশ্ন হবে শতকরা নিরনব্বইটী ক্ষুদ্রস্বার্থ কিসে সিদ্ধ হয় তাই নিয়ে। এই দিয়েই দেশের বারোআনা লোকের মন কতটুকু উচ্চ-চিন্তাপরায়ণ তা টের পাওয়া যায়।

সে ব্যক্তি বা জাতি যত দুর্ব্বল হয়, আত্মশক্তি বা পুরুষকারের উপর তাদেরই তত বেশী সন্দেহ আসে। ভোগকামনায় দুর্ব্বল মন, আগেই ফলটি জান্‌বার জন্য ব্যাকুল হয় বেশী; তার তুলনায় ফলের দিকে ভ্রূক্ষেপশূন্যতা, আপন কর্ম্মে প্রচণ্ড বিশ্বাস, এদের স্বাভাবিক কম। তাই কোনও মতে আগে ফলটা শুনে শুভ বুঝতে পারলে, তবে এরা কাজে হাত দিবে ভাবে।

কিন্তু একথা বোঝেনা যে, শুভ-অশুভের বিক্ষোভ থেকে এরা যদি আত্মরক্ষা করতেই পারত, যদি 'লাভালাভে সমোভূত্বা' এরা জীবন চালাতেই পারত, তবে ভবিষ্যৎ-প্রত্যক্ষ-শক্তি এদের স্থির মনে যে স্বাভাবিকই ভাস্‌ত। আর সেই শক্তি থাক্‌লে ভবিষ্যৎ জানবার প্রয়োজনও তো মনে আস্‌তে পারে না, কেন না, তখন ভালমন্দ যাই আসুক, সত্যকে সহজে নেওয়া—অবিক্ষুব্ধ চিত্তে বরণ করা যে তখন স্বভাবগত হবে। কিন্তু তাতে যদি অপারগই হয়, তবে ভবিষ্যতের শুভাশুভের পরিচয়েও তো আগে থেকেই মন চঞ্চল হয়ে উঠবে।

কাজেই ভবিষ্যত জানা, সাধারণ দুর্ব্বলের পক্ষে সব সময়ে শুভকর হয় না। তাই বোধ হয় অজ্ঞান বা মায়ায় এদের জ্ঞান আবৃত থাকায়—ভবিষ্যৎ জান্‌তে না দিয়ে, প্রকৃতি এমনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেই, সাধারণ জীবকে আনন্দে রাখেন। নতুবা চঞ্চলতার আন্দোলনে জীব অতিষ্ঠ হয়ে উঠত যে!

বরং দুঃখের আঘাতে, অশুভের আশঙ্কায় মানুষ ভয়ে স্থিরভাবে থাক্‌তে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাবী সুখের সন্ধান পেলে সে আনন্দ-শিহরণে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই

প্রবল উচ্ছ্বাসেই কিন্তু পারের দিকে ভাঙ্গন ধরে; আনন্দের উচ্ছ্বাসের আড়াল দিয়ে কোন্ ফাঁকে যে ভাবী দুঃখের রেখা জীবন-তটে ফাটলের টান টেনে যায়, সেই আঁকা পথ দিয়েই ক্রমশঃ এসে যে দুঃখবন্যার জল ঢোকে, তা ভোলা মানুষ বুঝতেও পারে না।

যদি খাঁটি সাধু হন, তবে তিনি এই সব নানা কারণে শ্রীভগবান্ যা নাকি দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছেন, তাকে জোর করে মানুষের সামনে ধরে, সাধারণের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত তিনি করেন না। তবে বিশেষ ব্যাপারে যে ব্যতিক্রম হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমগুলি ধরেই ভবিষ্যৎ বলবার জন্য যদি দলে দলে লোক গিয়ে হাজির হয়, আর সাধু তা বলে দিয়ে মহা-ঐশ্বর্য্যে কালাতিপাত করেন, তবে বুঝতে হবে, দু'পক্ষেই ফাঁকি বা ঘূণ ধরেছে, সুতরাং শীঘ্রই পতন অনিবার্য্য।

ভ্রান্ত মানুষকে দু'চারটে বিভূতি দেখিয়ে আরও ভুলিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ; কেননা, তারা যে অমন ভাবে ভোলাটাই চায়। ভুলিয়ে নেওয়াই নাকি বিশ্বাসের কারণ। যদি তাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের আসল কথাগুলি বলা যায়—যেমন কামনা ছাড়, সৎকর্ম্ম কর কিন্তু তারও ফল চেওনা ইত্যাদি, যা নাকি উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করে গিয়েছেন, সাধু যদি তার কথা বলে, তবে তা হবে সবার কাছে চর্ব্বিত চর্ব্বণ। নিজের জীবনে সে সব ফুটিয়ে তুলবার কথা উঠ্‌লে উত্তর হবে—"অসম্ভব।" কিন্তু যদি বলা যায়, এমনি করে অমাবশ্যার নিশীথে রক্ত-বসনে অমুক জায়গায় অমুক ব্যক্তিকে স্মরণ করলে তার এই হবে, অমনি প্রচার হবে—হ্যাঁ, সাধু কিছু পেয়েছে বটে, সাধনায় বসে তার এ-হয় তা-হয় ইত্যাদি। আর যারা আধ্যাত্মিক পথে মাত্র প্রবেশের চেষ্টা করছে, তাদের মাঝে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হবে যেন তারাও অমনি হতে পারে। বিভূতিই যদি না ফুট্‌ল, তবে আর সাধনা কি?

বিভূতি প্রকাশে সাধকের বা জন-সাধারণের ক্ষতি হয় বলেই পুনঃ পুনঃ তা নিষেধ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ-গণের জীবনে দু'চারটী অমন প্রকাশ হয়ে পড়্‌লেও গোপন রাখবার জন্য তাঁরা কত রকম চেষ্টা করেন, কিন্তু শিষ্য বা ভক্তের দল লোকের মাঝে গুরুকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য সে গুলি প্রকাশ করে আপন গুরুকে যে ছোট করে ফেল্‌তে চান তা অনেকে বুঝেন না। মহাপুরুষদের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে তাঁদের সাধন-জীবনের সংগ্রামই আধ্যা-ত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্টুদের পক্ষে বেশী আদ-রণীয় এ কথা তাঁদের জীবনী-লেখকেরাও প্রায়ই ভুলে থাকেন।

বিভূতি তাঁর আছে, বা অমুকের ছিল, একথা সত্য-পিপাসুর জানায় কি প্রয়োজন? আমার নাই, এবং আমি বিভূতি চাই-ও না। আমি চাই সত্য বস্তু যা পেলে প্রাণের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়, হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সেই মহাবস্তু।

কাজেই বিভূতি অমুকের আছে কিনা তা দিয়ে কি হবে? তা খুঁজবে সাধারণ লোক যারা অবুঝ অথচ চিরদিন অবুঝই থাকতে চায়। এদের ভুলাতে বহু সাধু-বেশ-ধারী বর্ত্তমান আছেন।

জনসাধারণের মাঝে এই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অবুঝদিগের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অনেকে যোগ বা তন্ত্রের নিম্নস্তরের সাধনায় আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে আত্মাবনতিই তাদের পরিণতি হয়, আত্মোন্নতি আর শেষ পর্য্যন্ত ঘটে না।

যোগের মাঝে হঠযোগ দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সহজে ঘটে অথচ তাতে শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তা সত্ত্বেও দেশের বার আনি লোক সেই দিকেই লালায়িত, কিন্তু রাজযোগ বা শ্রেষ্ঠ যোগ যাতে দেহ-মনের কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নাই, তাতে লোকের মন মজেনা। মানুষ চায় অলৌকিক সুতরাং; বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নানা বিজ্ঞানের যোগে যদি ভোজবাজী দেখানো যায়, তবে বোধ হয় সব চেয়ে বড় সাধু হওয়া যায়। যাহারা তাই চান, তাদের বিজ্ঞান জানা থাকলে বিশেষ সুবিধা হবে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের ধার ধারতে হবেনা—শুধু কয়টী বচন শিখলেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ পর্য্যন্ত সে সাধুগিরি টিকেনা।

নিজের জীবনকে যারা যাচাতে শিখেছে, তাদের কাছে বিচারপূর্ণ রাজযোগই প্রিয় হয়। কিন্তু রাজযোগে প্রত্যক্ষানুভবের পক্ষে এমন অনেক সহায়ক ও স্থূল প্রক্রিয়া আছে, যা হঠযোগেরও অঙ্গ—যেমন, যম, নিয়ম, আসন ইত্যাদি। তাই বলে সকলকেই যে জোর করে প্রাণ-নিরোধের জন্য নাক টিপতেই হবে—তা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ই তার পক্ষে নাই, এমন ধারণা ভুল। প্রত্যেক মানুষের মাঝেই আধ্যাত্মিক পথের নানা অধিকারের বিশিষ্ট বীজ রয়েছে। সেই নিহিত বীজটী যাতে ক্রমশঃ মহীরুহে পরিণত হয়ে ফলপ্রসূ হয়, সেই দিকেই মন দিতে হবে। সবার মাঝেই যে যোগের বীজ রয়েছে তা সত্য। অর্থাৎ সেই পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের সঙ্গে সবারই যোগ নির্দ্ধারিত। কিন্তু একমাত্র হঠযোগই যোগ নয়। ভক্তিযোগও প্রধান যোগ। তবে সকলের প্রাণে ভক্তি স্বাভাবিক আসেনা। তাই জ্ঞানযোগেরও প্রয়োজন। কিন্তু এই ভারতে কোনও আধ্যাত্মিক পথেরই অসদ্ভাব নাই। বিদেশীর কাছে গাল খেলেও বিশিষ্ট অধিকারীর পক্ষে বিশিষ্ট পন্থা নির্ণয় করতে গিয়েই ভারতে আজ বহু ধর্ম্মের বহু মতের, বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি দেখা যায়। যার যেটা সবদিক দিয়ে যোগ্য হয়, সে পথ বেছে নাও। যদি নিজে না পার, ভারতে কোনও কালেই, প্রকৃত পিপাসুর পক্ষে সদ্গুরুর অভাব হয় নাই, আজও নাই—খুঁজে নাও তাঁকে—তার কাছে হতে পথ ধরে নাও। কিন্তু 'দেখা দেখি শেখা নাচ' অন্য সব ব্যাপারে যদিও বা চলে, আধ্যাত্মিক জীবনে কিন্তু তা মারাত্মক হবেই। কাজেই সাধু ও সাধু-ভক্তের শুধু যোগের নামে মেতে উঠলে চলবে না। ইষ্ট কি রিষ্টযোগ, তা আপন মনে গভীর ভাবে তলিয়ে বুঝে, প্রাণের আসল দৈন্য কিসে মিটে, তাই দেখতে হবে—শুধু চমক লাগলেই হবেনা।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে ধুলি চেনিয়ে যাত্রা করবার পূর্ব্বে হাত পা গুলি ভালরূপ ভাবে সেঁকে নিলাম। আমরা গোমুখীমার প্রসাদ স্বরূপ সেখান হতে অনেকগুলি বালি এনে একটি বাটীতে রেখেছিলাম। সকালে দেখি সেগুলি জমে শক্ত হয়ে গেছে। শেষে বাটী শুদ্ধ গরম করে সে গুলি ছাড়ান গেল। রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পাহাড়ীয়া কুলীটিকে না দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। উদ্বিগ্নচিত্তে তার খোঁজ করতে লাগলাম। বেলা ৮ টার সময় দেখি বেচারা হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরছে, অনুসন্ধানে জানলাম, কাল গোমুখী হতে আসার সময় তার টাকার থলেটি পথে পড়ে গেছিল, সেই টাকার খোঁজে সকালে আবার গোমুখীর পথে রওনা হয়েছিল। সৌভাগ্য অল্পদূর যাবার পরই টাকাশুদ্ধ থলেটি পেয়েছে. তাই হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরছে।

আমরা বেলা ৮টার সময় রওনা হয়ে পূর্ব্বোক্ত পথে চলে, গত পরশু দিন যাবার সময় যেস্থানে রাত কাটিয়ে ছিলাম সেইস্থানে ১২ টার সময় পৌছে খোসাশুদ্ধ উরুদের ডাল ও আলুকা শাক দিয়ে গরমাগরম ফেন সংযুক্ত অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত গলাধঃকরণ করলাম। যাবার দিন আমরা ভূর্জ্জপত্রে আহার করেছিলাম আজও সেই ভূর্জ্জপত্রেই আহার করলাম। পাহাড়ীয়া কুলীটি অনেক ভূর্জ্জপত্র ছাড়ায়ে আমাদের দিল, আমরা সেগুলি কলিকাতা পর্য্যন্ত এনেছিলাম।

আহারের পরই রওনা হলাম, উদ্দেশ্য যে-ভাবেই হউক আজ গঙ্গোত্তরী পৌছান চাই। গত পরশু দিনের সেই ভীষণ দুরতিক্রম্য পথ-গুলি ধীরে ধীরে অতি সাবধানের সহিত পূর্ব্বোক্ত ভাবে অতিক্রম করে রাত্রি ৮ টার সময় "জয় মহারাজ কি জয়" ধ্বনি করে গঙ্গোত্তরীতে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। বৃদ্ধ পাণ্ডাটি আনন্দে সকলের গলা জড়িয়ে ধরে কত আদর করতে লাগলো। অত্যধিক আনন্দাবেগে তাঁর কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কাল সন্ধ্যে-বেলায় ভীষণ বারিপাতের জন্য তাঁরা মনে করেছিলেন আমরা বোধ হয় একটি প্রাণীও ফিরবো না। আমাদের দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল! পরশু দিন যে জায়গাটি আমরা গাছের শিকড় বেয়ে পার হয়েছিলাম আজ আসার সময় সেই জায়গাটিতে নামবার কালে বিশেষ কষ্ট হয়ে-ছিল। উপর হতে একজন লোক হাত ধরে নামিয়ে দিচ্ছিল, অন্য লোক একহাতে গাছের শিকড় ধরে অন্য হাতে সে লোকের পা ধরে ধীরে ধীরে আবার নীচের লোকের হাতে ছেড়ে দিচ্ছিল। নীচের লোক আবার ধীরে ধীরে তাকে তার নীচের লোকের নিকট নামিয়ে দিচ্ছিল। আমরা এমন ভাবে সেই ভীষণ জায়গাটি অতিক্রম করলাম। আমাদের সঙ্গীয় সীতারাম বাবাজী আজ খুব আনন্দের সহিত এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাদের কাজে সহায়তা করলেও কিন্তু গিরিধারী বাবাজী মহারাজ বিশেষ ত্যাগী বলে পরিচিত হলেও পথের ভীষণতা দেখে ভীত চকিত কণ্ঠে শুষ্কমুখে বলে উঠেছিলেন, "চাচা আপনা বাঁচা! বাবা! এ পথে কি আসতে আছে? এ পথে স্বামী স্ত্রীতে, পুত্র কন্যায়, ভাই ভগ্নিতে আত্মীয় স্বজনে বন্ধু বান্ধবে এমন কি গুরু শিষ্যে সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়। অন্যের উপকার কি করবো? আপন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

মানুষ যখন স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে নিতান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে নিজেকে অতি সংকীর্ণ করে তুলে, তখন তিনি নিজেই সেই সংকীর্ণতার দরুণ অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করে অন্তে হা-হুতাশ করে চক্ষের জলে গণ্ড ভাসায়ে থাকেন। ভগবান ভাবগ্রাহী! এ ক্ষেত্রেও তাঁর ভাবগ্রাহীতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়ে আপনা আপনি শির নত হয়ে গেল; উক্ত গিরিধারী বাবাজী মহারাজ সংসার ত্যাগ করেও কিন্তু প্রাণের মায়া যেরূপ সংকীর্ণতার তথা স্বার্থের পরাকাষ্ঠা দেখালেন তিনি গঙ্গোত্তরীতে পৌছে তদ্রূপ অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করলেন। গঙ্গোত্তরীতে পৌছার দিনই হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গিয়ে কুচকী (বাগী) ফুলে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় ৩।৪ দিন কাটায়ে ছিলেন! দিনের মধ্যে তিন চার বার তার কুচকীতে আইওডিন লাগায়ে দিয়েছি এবং সাধ্যানুসারে তার সেবাও করেছি, পরে সাথীদের জন্য বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে আমরা রওনা হই; তিনি সুস্থ হবার পর, পরে আমাদের সঙ্গে এসে আবার যোগ দিয়েছিলেন; যারা বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু, যাদের প্রাণের মায়া মমতা নাই, যারা শীত গ্রীষ্ম, ঝড় বৃষ্টিতে অনবরত ভিজলেও কোনরূপ অসুস্থ হয়ে না পড়েন, তারা ভিন্ন যেন আর কেহ এ বন্ধুর পথে মৃত্যু হাতে নিয়ে যাত্রা না করেন; দ্বিতীয়তঃ সাথীগুলি উক্ত বাবাজী মহারাজের মত না হয়, সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রেখে যেন এ পথে যাত্রা করেন—বিশেষতঃ এ গোমুখীর পথে!

* * *

গঙ্গোত্তরী হতে এ বন্ধুর পথটুকু মাত্র ১৮ মাইল হলেও আমাদের বাংলার কত মাইলের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় বল্‌তে পারবো না। যাতায়াতে এ ৩৬ মাইল দুরতিক্রম্য পথ আমরা মাত্র ২॥ দিনেই শেষ করেছিলাম, কাহারও কাহারও চার দিন লাগে। বৈশাখ মাসে বা আশ্বিন মাসে এ স্থানে যাওয়া সুবিধাজনক হলেও, কিন্তু, তখন আরও বিশেষ বিপজ্জনক। কারণ বৈশাখ মাসে ভাগীরথী গঙ্গার উপর অটল অচলরূপে বরফ জমে থাকে, আমাদের মত গাছ চড়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় না, কেবল মাত্র ক্রমোচ্চ ভাবে ভাগীরথী গঙ্গার উপরিস্থিত বরফরাশির উপর দিয়ে অনবরত চলতে হবে। আমরা দুদিন রাত্রে যে জায়গায় আস্তানা গেড়েছিলাম, সে সব জায়গাও তখন বরফাবৃত থাকে বলে, থাকারও বিশেষ অসুবিধা হয়। কাজেই বরফের উপরই তাঁবু খাটিয়ে কায়ক্লেশে দিনরাত কাটাতে হবে। এ ছাড়া বরফে চলবার সময় বিশেষ সাবধান হয়ে চলতে হয়। এ দিকে যেমন পা হড়কে পরে যেয়ে মৃত্যু হতে পারে, অন্যদিকে আবার তেমনই নীচের বরফ গলতে আরম্ভ হলে, যদি কোন স্থানের বরফ গলে যেয়ে, উপরে মাত্র চাদরের পাতের মত পাতলা আবরণের উপর পা পরে যায়, তাহলে সেই স্থানটী ভেঙ্গে যেয়ে, বরফের নীচস্থ ভাগীরথী গঙ্গায় পতিত হয়ে, এ নশ্বর জীবনটীর মায়া হতে মুক্ত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আবার আশ্বিন মাসে বরফ না থাকলেও এবং শীত কম হলেও আমাদের মতই দুরতিক্রম্য পথগুলি অতিক্রম করতে হবে এবং আর একটী নূতন বিপদের হাতে পড়ে হয়ত পঞ্চত্বও প্রাপ্ত হতে পারে। কারণ সে সময় আবার নূতন বরফ পড়তে আরম্ভ হয়—দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘের সাথে সাথে বজ্রপাত হয়ে দুই এক ফুট বরফ জমে যায়। সে বরফ তখন শক্ত না হয়ে কাদার মত থাকে। কাজেই সেই কাদাপানা বরফের নীচেও অনন্ত সমাধি লাভ করাও আশ্চর্য্য নয়। নানাদিক বিবেচনা করে দেখলে বুঝা যায়, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই চার মাসই বরফাবৃত প্রদেশে যাবার একমাত্র প্রশস্ত সময়। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ভ্রমণ-কারীগণও বরফাবৃত প্রদেশে উক্ত চারিমাসের মধ্যে যাওয়াই প্রশস্ত সময় বলে নির্দ্দেশ করে গেছেন।

২৩ জৈষ্ঠ ৯ জুন বৃহস্পতিবার— ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় আমরা হিমালয়ে অজানিত অযাচিত ভাবে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করেছি এবং অনেক কঠিন ও দুরতিক্রম্য তীর্থও শাস্ত্রানুযায়ী শুভদিনে শুভক্ষণে দর্শন করতে সমর্থ হয়ে আজ জীবনকে ধন্য মনে কর্‌তেছি। তিনি যে সর্ব্বদা লোকলোচনের অন্তরালে বসেও কেমন করে আমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের সহিত তিলে তিলে পলে পলে অনুক্ষণ প্রেমাকর্ষণে আপনার করে নিতেছেন, একটু স্থির হয়ে সুচিন্তা দ্বারা বিচার করলেই, অনায়াসে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় এবং আপনা হতেই ভক্তিতে শির নত হয়ে পরে। কেমন করে যে তিনি আপনার করে নিতেছেন, কার সাধ্য তাঁর অনুকম্পা বুঝ্‌তে পারে, যদি না তিনি দয়া করে আমাদের তা বুঝায়ে দিতেন। আজ তাঁরই কৃপাকর্ষণে আমরা অজানিত ভাবে জগজ্জননী ত্রিভুবনতারিণী শ্রীশ্রীভাগীরথী গঙ্গা মাতার উৎপত্তি দিনে, তাঁর উৎপত্তিস্থানে কেমন করে যে উপস্থিত রহিলাম, বুঝতে পারি না। শুধু উৎপত্তি দিনেই যে আমরা ভাগীরথীর তীরে এসেছি, তাহাও তো নয়! যে স্থানে বসে ভারতের, ভাগীরথীর সর্ব্বপ্রধান সাধক, যাঁর সাধনপ্রভাবে পতিতপাবনী মা সর্ব্বপ্রথম জগতে অবতীর্ণ হয়ে পাপী-তাপী, রোগী-ভোগী, ধনী নির্ধনী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মানবকে মুক্তিদান করেছিলেন। পুণ্যাত্মা ভগীরথের সাধনার স্থান এই গঙ্গোত্তরীতে, সেই শুভদিনে উপস্থিত আছি। ধন্য গুরুদেব! তুমিই ধন্য! তোমার কৃপাতেই আজ আমাদের এ হেন মহাসুযোগ, এ পুণ্যতম তীর্থে, আমাদের নির্ব্বাণমুক্তি দেবার জন্যই যেন এনে উপস্থিত করেছ! তোমার কৃপাতে আজ আমরাও ধন্য!

কালও জানতাম না, আজ দশহরা শ্রীশ্রীগঙ্গামাতার পূজা। দশহরা গঙ্গা পূজার সময় কলিকতায়, শুধু কলিকাতায় কেন সমুদয় ভারতবর্ষে ভাগীরথী গঙ্গামাতার পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। এবং এই দিনেই ত্রিভুবনতারিণী, পতিতপাবনী দয়াময়ী ভাগীরথী মা সর্ব্বপ্রথমে ভুতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে, প্রত্যেক হিন্দুই অতি আগ্রহের সহিত ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা সম্পন্ন করে থাকেন। আজ আমরা সেই শুভদিনে ভাগীরথী উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত থেকে তাঁহারই স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কচ্ছি। এবং সমাগত অসংখ্য ভক্তবৃন্দের আনন্দের স্রোতে গা ভাসায়ে দিয়ে কি এক মধুময় অফুরন্ত আনন্দের ধারায় স্নান কাচ্ছ। আজই এস্থান হতে অনেকের ফির্‌বার বিশেষ ইচ্ছা থাকলেও আমরা কয়েকজন না যাওয়ায় আমাদের সঙ্গের কেহই যান নাই! আজ বিশেষ সমারোহের সহিত অসংখ্য পার্ব্বত্য নরনারী সমভিব্যাহারে পরমস্নেহময়ী মা শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী যেন নিজেরই সুপবিত্র জলে স্নান করে এসে, নানা প্রকার পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করে সমাগত ভক্তমণ্ডলকে পাপ তাপ হতে মুক্ত করে আনন্দের নীরে ভাসায়ে দিলেন।

ভাগীরথী গঙ্গার ভুতলে আগমন সম্বন্ধে আমার বাঙ্গালী ভ্রাতাগণ বোধ হয় প্রায় প্রত্যেকেই অবগত থাকলেও তাদের পুনঃস্মরণার্থে সংক্ষেপে বিবরণটী জানাচ্ছি। মহর্ষি কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত নিজের পিতৃকুলের উদ্ধারার্থে সাগরাত্মজ মহাতপস্বী মহারাজ ভগীরথ হিমাচলের নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করতঃ ষট্‌ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করার পর ভগবান শিব তাঁর কঠোর তপস্যায় বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দান কর্‌লে প্রেমময় প্রার্থনা কর্‌লেন :—

ভাগিরথি গঙ্গার উৎপত্তির কারণ

পিতরোমে মহাভাগ কপিলাগ্নি সমীরিতাঃ।
তে গচ্ছন্ত স্বর্গগতিং প্রসাদেন তব প্রভো॥

গঙ্গাখ্যং পরমং ব্রহ্ম বর্ত্ততে শিখরে তব।
তম্মে দেহি পিতৃনাং হি সমুদ্ধারায় ভোঃ প্রভো॥
বিনির্দ্দগ্ধাস্তু গচ্ছেয়ুঃ পিতরো গতিমুত্তমাম্।
অন্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ॥
দৃষ্ট্বা লোকান্ হি গচ্ছন্তু পুনরাবৃত্তি দুর্লভান্।
পীত্বামৃতময়ং বারি মুক্তিমৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়ুঃ॥

হে মহাভাগ! আমার পিতৃপুরুষগণ মহর্ষি কপিলের কোপাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেছেন। হে প্রভো! আপনার কৃপায় তাঁদের স্বর্গপ্রাপ্ত হোক। আপনার শিরোদেশে ব্রহ্মরূপিনী গঙ্গা বিরাজিত আছেন। আমার পিতৃগণের উদ্ধার মানসে আপনি তাঁকে প্রদান করুন। তাঁর কৃপায়, আমার ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হবেন এবং কলিযোগে মানব নানাপ্রকারে পুণ্যহীন হলে তাঁর দর্শন মাত্রেই তাদের এমন উত্তম গতি লাভ হবে যাতে তাদের আর পুনর্জ্জন্ম হওয়া কঠিন। এই অমৃতরূপী গঙ্গাজল পান করতঃ মানব ইহলোকে ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ অন্তে মুক্তি লাভ করবে।

মহাপুণ্যবান মহারাজা ভগীরথ নিজের পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য এবং জগতের পাপী তাপী জনগণের চির মঙ্গলের জন্য জগদ্গুরু শিবের শ্রীচরণে এইরূপ প্রার্থনা করলে ভগবান শিব, সর্ব্বপ্রাণীগণের কল্যাণকামী বর প্রার্থনা করায় সন্তুষ্ট হয়ে উত্তর করলেন:—

ইদং পরমং রাজন্ বরমেতদ্ধি যাচিতম্।
তদ্দদামি তবেদানীং সর্ব্বপাপ ভয়াপহম্॥

হে রাজন্! তুমি এমন পরমোত্তম বর প্রার্থনা করেছ, যা দ্বারা সমস্ত ভয় এবং সমস্ত পাপনাশকারিণী ভাগীরথী গঙ্গাজল আমি তোমাকে দিতেছি।

ধারাং ত্রৈলোক্যপাপঘ্নীং গৃহাণ পিতৃমুক্তয়ে।
যস্যা দর্শন মাত্রেণ সর্ব্বে যান্তি শুভাং গতিম্॥

এই ধারা ত্রিলোকের পাপী-তাপী-গণের পাপ বিনাশ করতে সমর্থ। তুমি সেই গঙ্গাজলের ধারাকে পিতৃপুরুষগণের মুক্তির জন্য গ্রহণ কর। এই ধারা দর্শন মাত্রেই সকলেরই উত্তম গতি লাভ হবে। তিনি আরও বলতে লাগলেন—জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথম এই ধারাকে নিজের কমণ্ডুলে ধারণ করেছিলেন, পরে সেই ধারাকেই আমার শিরোদেশে ধারণ দেখে সপ্তর্ষিসকল কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। এই গঙ্গার ধারা নন্দনের নিকট স্নমেরু পর্ব্বতের উপর এসে প্রাপ্ত হই এবং সেখান হতে এই গঙ্গার ধারা চারিভাগে বিভক্ত হয়ে চারি নাম অর্থাৎ সীতা, অলকানন্দা, চক্ষুষ্মতী ও ভদ্রা নাম ধারণ করতঃ চতুর্দ্দেশে প্রবাহিত হতে থাকেন। যথা—

শৈবধারা স্বর্গগিরারাগতা নন্দনান্তিকে।
ততশ্চতুর্দ্ধা সংজাতা চতুর্দ্দিক্ষু প্রগামিনী॥
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রেতি নামভিঃ।
অলকায়াং সমায়তা যা ধারা শিরসাধৃতা॥

এইরূপে ভাগীরথী গঙ্গার নানাপ্রকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতঃ ভগবান শিব নিজের জটা হতে গঙ্গার ধারাকে ভগীরথের করে অর্পণ করেন। ভগীরথ এই গঙ্গোত্তরীতে যে শিলাখণ্ডের উপর আসন করতঃ ভগবান শিবের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, অদ্যাবধি সেই ভগীরথ শিলা বর্ত্তমান থেকে, তীর্থযাত্রীদের মনে তাঁর কঠোর তপস্যার কথা স্মরণ করায়ে, ভক্তির উচ্ছ্বাসে কোন্ এক অজানা রাজ্যে ভাসায়ে নিয়ে যায়। প্রত্যেক যাত্রীরই এই ভগীরথ শীলা দর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং উক্ত ভগীরথ শীলার সাধ্যানুসারে পূজাদি অর্পণ করতঃ পতিতপাবনী ত্রিভুবন তারিণী ভাগীরথী মাতার শ্রীচরণে প্রার্থনা করা উচিত—

গঙ্গে তুম্হারী ধারা অচরজ দিখা রহী হৈ।
চরণোঁ সে হী নিকল কর বিষ্ণুকে আরহী হৈ॥
পাপী অধর্ম্মী জিতনে হৈঁ সংসারমেঁ মাতা,
উন সবকো পার গঙ্গে তুহী লগা রহী হৈ॥
উদ্ধার পাপিয়োঁকা করনে কো তুহী আঈ।
তেরা হী যশ ত্রিলোকী সব ভাঁতি গারহী হৈ॥
তেরা হী বেগ মারা সব শিরনে শিরনে ধারা।
শিবকে জটা মেঁ মাতা তুহী সমা রহী হৈ॥

পূর্ব্বে ভাগীরথী গঙ্গার চারিনাম বর্ণন করেছি। কিন্তু যখন শিবের জটা হতে ভাগীরথী গঙ্গা শ্রীমুখ পর্ব্বতে সর্ব্বপ্রথম পতিত হল, তখন সে স্থান হতে তিনটী ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যে ধারাটী মহারাজ ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আগমন করেন সেই ধারার নামই ভাগীরথী গঙ্গা। যথা—

সাপি গঙ্গা ত্রিধা জাতা নামতঃ শৃনু পার্ব্বতি।
জ্যেষ্ঠা ধারা রথস্থানুরাজ্ঞো ভাগীরথী মাতা॥

হে পার্ব্বতি! উক্ত গঙ্গা তিন ভাগে বিভক্ত হয়, বড় যে ধারাটী রাজার রথের পিছে পিছে চলেছিল, তারই নাম ভাগীরথী। আরও আছে—

নেমিমার্গেন গঙ্গাপি নাম্না ভাগীরথী মতা॥

শ্রীমুখ পর্ব্বতের উত্তরদিকে অলকাপুরীতে যে ধারাটী প্রবাহিত হয়, তার নাম অলকানন্দা। যথা—

শ্রীমুখস্যোত্তরে পার্শ্বে গতা সা মুক্তিদায়িনী।
অলকেভ্যো মহেশাগ্নলকনন্দা পুনঃ স্মৃতা॥

যে ধারাটি বদরী বনে, যে স্থানে সুমেরু পর্ব্বতের উপর ব্রহ্মা আদি দেবগণ শ্রীশ্রীভগবান্ নারায়ণের চরণকমল ভজন করেন, সেই স্থানে প্রবাহিত হয় এবং বদরীনারায়ণধামের পার্শ্বদেশ ধৌত করে। যে অলকানন্দা গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, এ ধারাটি উপরোক্ত বর্ণিত গঙ্গারই একটী ধারা, সুতরাং অলকানন্দও ভাগীরথী গঙ্গারই একটী অংশ। এটী আমার মনগড়া কথা নহে। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে :--

বদরী বিপিনে সা ব নারায়ণপদাম্বুজে।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মেরুশৃঙ্গং সমাশ্রিতাঃ॥

ভাগীরথী গঙ্গার তৃতীয় ধারাটী কুরুবর্ষে প্রবাহিত হয়। বদরীনারায়ণের উপর নানা গ্রাম তার উপর ব্যাস গুফা; এই গুফাতে বসেই ব্যাসদেব চতুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র সমূহ লিপিবদ্ধ করে, জগতের মহা উপকার করেছিলেন। সেই ব্যাস গুফা হতে "কিং পুরুষবর্ষ" আরম্ভ হয়েছে। ভাগিরথী গঙ্গার তৃতীয় ধারাটি এই কিং পুরুষবর্ষে "কুমুদ্বতী" নামে প্রবাহিতা।

তৃতীয়া কুরুবর্ষে তু নাম্না কুমুদ্বতী মতা।

যারা এ সব বিষয় বিশেষরূপে জানতে চান, তারা স্কন্দপুরাণখানি ভালরূপ আলোচনা করবেন।

* * *

পাশ্চাত্য শিক্ষিত কোন কোন লোক নানাপ্রকার তর্ক জাল বিস্তার করতঃ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঘোর কলিকালে পাপী তাপী জনগণের পাপ-তাপ মোচন করতঃ মুক্তি দানে অসমর্থ হয়ে ভাগীরথী গঙ্গা মর্ত্তালোক হতে অন্তর্ধান না হলেও, তিনি পাপী তাপী জীবগণের মুক্তিদানে অসমর্থ হ'য়ে, জড়া-গ্রস্তের মত নির্জ্জীব ভাবে অবস্থান করবেন। তাদের এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তি কেবল বিরাট তর্কজালের জন্যই যেন প্রযুক্ত হয় বলে মনে হয়। কেননা শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, যে পর্য্যন্ত ভারতখণ্ড বর্ত্তমান থাকবে সে পর্য্যন্ত ভাগীরথী গঙ্গা ভূ-ভারতে বিদ্যমান থেকে ঘোর কলিগ্রস্ত পাপী তাপী মনুষ্যের মুক্তি দানে সতত উন্মুক্ত থাকবেন যথা :—

গঙ্গা স্থিতি নির্ণয়

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং
সচতা পরুষ্ণ্যা। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া
চার্জ্জকীয়ে শৃনু হ্যা সুষোময়া
--ঋগ্বেদ, অষ্টম অধ্যায়।

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি
পরুষ্ণি স্তোমমাসেবধ্বমাসিক্ন্যা চ সহ
মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া চার্জ্জকীয়ে আ শৃনু
হি সুষোময়া চেতি।

—অথর্ব্ববেদ ৯ পাঃ ৩ খণ্ড ৫ নিঃ।

মহারাজ ভগীরথী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ভগবান শিবের কৃপায় ভাগীরথী গঙ্গার দর্শন লাভ করতঃ কৃতকৃত্য হয়ে বদ্ধকরপুটে ভারতখণ্ড স্থিতি পর্য্যন্ত কলিজীবগণের মুক্তির জন্য অবস্থান করতে প্রার্থনা করায় ভাগীরথী গঙ্গা উত্তর করেছিলেন :—

ভগীরথ মহাভাগ এবমেব ভবিষ্যতি।
যাবচ্চন্দ্র গ্রহেশাত্যাঃ স্থাস্যন্তাং বরমণ্ডলে ॥
তাবৎ কীর্ত্তির্মহারাজ ভবিতা তে ত্রিলোককে ॥

নারদীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৩৮ অধ্যায়ে উক্ত আছে, ঘোর কলিকালে সর্ব্বতীর্থ পাপী তাপী পুরুষদের পাপ দূর করতে অসমর্থ হলেও, মহা-পরাক্রমশালিনী ভাগীরথী গঙ্গা সমস্ত তীর্থের পরা-ক্রম ধারণ করে কলি জীবগণের মুক্তি দানে সর্ব্বদা তৎপর থাক্‌বেন। যথা :—

কলৌহি সর্ব্বতীর্থানি স্বং স্বং বীর্য্যং সভাবতঃ।
গঙ্গায়া প্রতিমুঞ্চন্তি সাতু দেবী ন কুত্রচিৎ ॥

স্কন্দ পুরাণের কেদারখণ্ডের ৩৫ অধ্যায়ে উক্ত আছে, মহারাজা ভগীরথ বল্‌তেছেন, অতি ঘোর কলিযুগে পুরুষ পুণ্যরহিত হলে গঙ্গার দর্শন মাত্রেই তারা উত্তম লোক প্রাপ্ত হবে এবং গঙ্গার জল পান করলে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করতঃ অন্তে মুক্তি লাভ কর্‌বে। যথা—

অন্যে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দৃষ্ট্বা লোকান্ হি গচ্ছন্তি পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভান্ ॥
পীত্বামৃতময়ং বারি মুক্তিমৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়ুঃ ॥

এইরূপে নানা প্রকার শাস্ত্রোক্ত বচনাদিতে প্রমাণ পাওয়া যায়, ঘোর কলিকালে একমাত্র ভাগী-রথী গঙ্গাই জীবগণের মুক্তিদানে সমর্থা এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতখণ্ড বিদ্যমান থাক্‌বে, ততদিন পর্য্যন্ত ভাগীরথী গঙ্গা ভারতে বিদ্যমান থেকে জীবগণের মুক্তিদান কর্‌বেন।

* * *

এখানে আজ বিশেষ সমারোহের সহিত ভাগীরথী গঙ্গামাতার পূজার্চ্চনা দর্শন কর্‌লাম। এই উপলক্ষ্যে আজ বড়মার প্রদত্ত অরহরকা ডাল, আটার ফুলকো লুচী, আলুর দম তথা লাড্ডুর দ্বারা সঙ্গীয় সকলেই পরম তৃপ্তি সহকারে উদর দেবতার পূজা করলাম। এখানে জিনিষাদির দামও যমুনোত্তরা হতে অনেক কম। ভাল আটা টাকায় আড়াই সের, চিনি আড়াই পোয়া, অরহর ডাল সোয়া সের হতে আড়াই সের পর্য্যন্ত, ছোলা ভাজা দেড় সের, দুধ দুই সের, তথা লাড্ডু আধ সের। লাড্ডু পেরাদির জন্য এখানে একটী ময়রার দোকানও আছে। তাকে পূর্ব্বে অর্ডার দিলে সে অনেক জিনিষ তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু আজ আমাদের পাচক হরিদাস ভায়া। হায়! ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক যে হরিদাস ভায়ার সঙ্গে আমরা কত আনন্দে উত্তরাখণ্ডের কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করে, কত আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, ভাগীরথী, যমুনা, অলকানন্দা, মন্দাকিনী প্রভৃতি নদীর একটানা অনাহত নাদের সঙ্গে আমা-দের রাগিনী মিশ্রিত করতঃ নানা প্রকার গানে আপনাকে হারায়ে ফেলতাম, যে হরিদাস ভায়ার অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে হলে জীবনখানা কোন এক অজানা রাজ্যের সন্ধানে ছুটে যেতে চায়, যার অকপট সরল মূর্ত্তির অকৃত্রিম ঠাকুর সেবা দেখে আমাদের প্রাণে হিংসার উৎপত্তি হতো, যে হরিদাস ভায়া আজীবন কাল ব্রহ্মচারী থেকে কঠোর সাধনার সহিত নিজের জীবনের উন্নতি করতঃ শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী মহামন্ত্র "জয়গুরু" ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারণ করতঃ সর্ব্বত্র একতার সৃষ্টি কর্‌ত, যার মত একনিষ্ঠ সেবক এ দুর্দ্দিনে আর একটীও মিল্‌বে কিনা সন্দেহ, আমার সেই একনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা পরমতীর্থরূপ ৺ কাশীধামে ১৩৩৬ সনের ২৬শে বৈশাখ বসন্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমাদের ছেড়ে ব্রহ্মময়ীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাবার জন্য অনন্তধামের যাত্রী হয়েছে। আজ আমি কাশীধামে আমার হিমালয় ভ্রমণের এই অংশ লিখতে বসে ভায়ার কথা মনে হওয়ায়, কত যে কষ্ট অনুভব করতেছি, কেমন করে পাঠকদের তা বুঝাব।

* * *

এখানে অত্যধিক শীতের জন্য বাবা কালী কম্বলীরালার ছত্রশালা হতে আগন্তুক প্রত্যেক লোককে সকালে বিকেলে দুগ্ধশূন্য চা সের ভর দিয়ে অতিথি সৎকার করে থাকেন। এ ছাড়া সদাব্রতের সঙ্গেও চা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমরা এখানে একটী সদাব্রত পেলাম। শীতের জন্য ধর্ম্মশালার প্রত্যেকটী ঘরই এমন ভাবে তৈরী যাতে ঘরের মধ্যেই আগুন জেলে শীতের প্রকোপ হতে রক্ষা পেতে পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে বাবা কম্বলীরালার ধর্ম্মশালা ছাড়াও জয়পুরের মহারাণীর একটী ধর্ম্মশালা আছে।

আমরা দ্বিপ্রহরে ভূরি ভোজনের পর ভাগীরথী গঙ্গার দক্ষিণপাড় দিয়ে পশ্চিম দিকে বেড়াতে গেলাম। অসংখ্য চীর ও দেবদাওয়ার গাছের সুশীতল ছায়ার নীচু দিয়ে যাওয়া বড়ই আনন্দদায়ক; আবার গাছগুলি, নারিকেল, তাল, খেজুর গাছের মত সরল ভাবে অভ্রভেদ করার জন্য যেন ক্রমশঃ উপর দিকে বর্দ্ধিত হয়ে পথিকের কুতূহল বাড়ায়ে থাকে। ভাগীরথী গঙ্গার পার হতে অল্প দূর যাবার পরই দেখা যায়, অন্য একটী বড় ঝরণা এসে ভাগীরথী গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করেছে। এ ঝরণার জল খুব পরিষ্কার এবং তত ঠাণ্ডা নয়। যারা ভাগীরথী গঙ্গার জল অত্যধিক ঘোলা বিধায় বা ততোধিক ঠাণ্ডার জন্য পান করতে নারাজ, তারা এখান হতে পানের জন্য জল নিতে পারেন। আমরা কিন্তু ভাগীরথীর জলই পান করছি। সঙ্গে কিছু ফিট্‌কিরি থাকলে বিশেষ সুবিধা হয়। একদিকে যেমন তা দিয়ে জল পরিষ্কার করা যায়, অন্যদিকে কিন্তু এটি বিছে কাটার বেশ ভাল ঔষধ। বিচ্ছু কাট্‌লে অল্প একটু জলে ফিট্‌কিরি ঘষে, সেই জল বিপরীত কর্ণে অর্থাৎ বাম অঙ্গে হলে দক্ষিণ কর্ণে ও চক্ষুতে সেই ঘষা ফিট্‌কিরি দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পীড়িত স্থানে সেই ফিট্‌কিরি ঘষা জলের পটী দিলে অতি সত্বরেই জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হবে। জলে লবণ ফেলে সেই জল উপরোক্ত ভাবে ব্যবহার করলেও বিশেষ উপকার হয়। আরও দুই রকম ঔষধ পাঠকদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি।

পূর্ব্বোক্ত ঝরণা হতে পশ্চিম দিকে দেবদাওয়ার ও চীর গাছের নীচু দিয়ে খানিক দূর যাবার পর একটী মনোরম কুণ্ড পেলাম। নাম গৌরীকুণ্ড। কুণ্ডটী যেমন মনোরম, স্থানটীও তেমনই আনন্দবৰ্দ্ধক। এই কুণ্ডটী দেখাবার জন্য পাণ্ডা মহারাজ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ভাগীরথী গঙ্গা গঙ্গোত্তরী হতে দুটী পর্ব্বতের সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে এসে সশব্দে নীচে পতিত হচ্ছেন। যে স্থানটীতে ভাগীরথীর জল পড়ছে সেই স্থানে একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ কি করে, কে যে প্রতিষ্ঠা করেছিল কল্পনায়ও আনা যায় না। প্রথমতঃ সে স্থানে জলের বেগ এত বেশী, একহাত জলের মধ্যে ভীষণ শক্তিশালী হাতীও দাঁড়ায়ে থাক্‌তে পারবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ প্রায় একশত গজ উপর হতে সেখানে সশব্দে তথা সবেগে ভাগীরথীর জল পতিত হচ্ছে। সে স্রোতাবেগে দাঁড়ান দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এমন ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল স্থানে কি করে, কে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, চিন্তার বিষয় বটে! পাণ্ডা মহারাজ বল্লেন, "ভগবান্ শিব এখানে বিরাজিত থেকে ভাগীরথী গঙ্গার ত্রিলোক উদ্ধারিণী ধারা আপন মস্তকে ধারণ করে আছেন।" তবে কি এই সেই স্থান, যে স্থানে দাঁড়ায়ে ভগবান্ শিব আকাশ হতে গঙ্গা অবতরণ কালে, গঙ্গার ভারে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায়, সেই জন্য নিজের মস্তকে সে পবিত্র ধারা ধারণ করেছিলেন? কে এর মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করবে!

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বিরাজিত রামেশ্বর শিবের মস্তকে ভাগীরথীর চিরপবিত্র গঙ্গাজল ঢাল্‌বার জন্য গঙ্গোত্তরী হতে প্রায় প্রত্যেক যাত্রীই গঙ্গাজল নিয়ে

থাকেন। কিন্তু এই গৌরীকুণ্ডস্থ শিবের মস্তকে জল পতিত হবার পর আর সে জল সেতুবন্ধ রামেশ্বর শিবের মস্তকে ঢালার নিয়ম নাই। তাই সকলেই এই শিবের উপরিস্থিত গঙ্গোত্তরীর ভাগীরথীর জল নিয়ে থাকেন। এই স্থানটি প্রকৃতির অতি সুন্দর রম্যনিকেতন হলেও, প্রায় অধিকাংশ যাত্রীই এ স্থানটি দেখ্‌তে আসেন না। কিছু ভালরূপ পাবার আশা না থাকলে পাণ্ডাগণও এ স্থানের কথা বলেন না—বল্‌লেই তো সঙ্গে নিয়ে যেয়ে দেখাতে হবে।

এখানে কোন ঘটী কিনিতে পাওয়া যায় না, যদিও বা দু একটি পাওয়া যায় তাহাও চতুর্গুণ পঞ্চগুণ দামে বিক্রি হয়ে থাকে। সুতরাং যাদের গঙ্গাজল আনার ইচ্ছা, তারা নীচু হতে পাহাড়ে আসার সময়ই ভাল ঘটী, যাতে মুখ বন্ধ করে জল আনা যায়, সেইরূপ ঘটী সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এখানে শুধু ঝালাই হতে পারে, সেও চার্জ্জ অত্যধিক। এক একটি ঘটীর মুখ ঝালাই করতে ।৵০ কি ॥০ আনা চার্জ্জ লাগে। আমার কাছে একটি ফাউন্টেন কালীর খালী দোয়াত ছিল, আমি তাতেই খানিকটা গঙ্গা জল এনে কলিকাতার বন্ধু-বান্ধবদের বিলায়ে দিয়েছিলাম।

ভাগীরথীর জল অতি অদ্ভূত শক্তি সম্পন্ন। যারা অন্ধ বিশ্বাসী তারা তো ভাগীরথীর জলে স্নান করবা মাত্র সমস্ত পাপ তাপ হতে মুক্তি লাভ করে অন্তিমে শ্রীশ্রীভগবানের চির শান্তিপ্রদ পরমপদে লীন হবার আশায় স্নান করে আপন আপন মুক্তির পথ মুক্ত কর্‌তেছেন। আর যারা অন্ধ বিশ্বাসী না হয়ে সর্ব্বদা তার *এনালাইজ করতে তৎপর তারাও বোধ হয় এই সুপবিত্র জলের গুণে মুগ্ধ হয়ে জগৎ পিতার পদে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দান না করে, থাক্‌তে পারবেন না। গঙ্গোত্তরীর ভাগীরথীর গঙ্গা জল এমন অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন যে, যার ভিতর কলেরা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির কীট ফেলে দিলেও সে কীট ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে না পেরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়ে জগতে এর মহিমা বিঘোষিত করে থাকে। এ ছাড়া গঙ্গোত্তরীর জলের এমন একটি কি শক্তি আছে, যার প্রভাবে ভুবন দগ্ধকারী সূর্য্যদেবের রশ্মিও এ স্থানের পবিত্র জল তিন বৎসরে শুষ্ক করতে অক্ষম। শুনিয়াছি মানস সরোবরের জল নাকি সূর্য্য তেজে ৫ বৎসরেও শুষ্ক হয় না। সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখ্‌বার সুযোগ সুবিধা হয় নাই। বোধ হয় ঐ সব কারণেই আমাদের ত্রিকালজ্ঞ পূর্ব্ব পুরুষগণ ভাগীরথীর গঙ্গা জলের অত মহিমা শত মুখে বিঘোষিত করে কোটি কোটি নরনারীর প্রাণে ভক্তিবারি সিঞ্চন করে গিয়েছেন।

এ পথে কোথাও কবুতর দেখি নাই।

—টিহরিতে নানা প্রকার পক্ষীর কলরব শুনিলেও পায়রার শব্দ শুনতে পাইনি। কিন্তু উপরোক্ত গৌরীকুণ্ডে দুইটি (মাত্র) হৃষ্ট পুষ্ট পায়রা দেখতে পেয়ে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এইরূপ স্থানে পায়রা থাকার কারণ কি? অথচ হিমালয়ের এ দিকের কোথাও তো পায়রা দেখতে পাওয়া যায় না।—তাও আবার দুটী মাত্র। শাস্ত্রেও এখানে পায়রা থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পাণ্ডাদের মুখে প্রবাদ, এই দুটী পায়রা নাকি বহুকাল যাবত এই স্থানে বাস করে আস্‌তেছে। সকলের ভাগ্যে এখানে পারাবত দর্শন ঘটে না, শুনতে পাই চিরবরফাবৃত অমর নাথ তীর্থের গুফাতেও নাকি দুটী পারাবত আছে এবং যে সব যাত্রী উক্ত তীর্থে গমন করে উক্ত পারাবত দুটী দেখতে না পান, তারা নিজকে অত্যন্ত হতভাগ্য মনে করে থাকেন এবং তাদের উক্ত তীর্থ যাত্রার ফলও নাকি হয় না।

কোন্ সজ্জন এই পারাবত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে সংশয় অপনোদন করিবে?

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত প্রকৃতির মনোরম কাননে বসে, আপনহারা হয়ে ভাগীরথী গঙ্গার শব্দায়মান জল প্রপাতের মধুর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সন্ধ্যা আগত দেখে অনিচ্ছায়ও আমাদের ধর্ম্মশালার দিকে ফিরতে হল। আসার সময় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালাতে সিদ্ধ-মহাপুরুষ ভূমাশ্রম স্বামীকে দর্শন করে, তাঁর পাদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক ভাগীরথী গঙ্গার এ পাড়ে আমাদের এ কয়দিনের আপন ডেরাতে ফিরে এলাম। যারা এ মধুরতম পুণ্যভূমিতে আস্‌বেন, তারা প্রকৃতির ঐ সুমনোরম স্থান এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদ্বয়কে দেখতে ভুলবেন না। অন্য মহাপুরুষ কৃষ্ণাশ্রমজীকে আমাদের দর্শনের সুযোগ সুবিধা হয় নাই—তখন তিনি সেখানে ছিলেন না, কোথায় আছেন, তারও কোন সন্ধান পেলাম না। এখানে কবে ফিরবেন, তারও কোন স্থিরতা নাই।

সন্ধ্যেবেলা ভাগীরথী গঙ্গামাতার আরতি দর্শন করলাম। আরতির অন্তে পাণ্ডাগণ সমস্বরে একটী স্তব পাঠ করে মায়ের স্তুতি করতে লাগলেন। স্তবের পর জয়ধ্বনি হলে সকলে মিলে পাণ্ডা মহাপুরুষকে ৫৲ টাকা দক্ষিণা দিয়ে সুফলাদি লওয়া গেল।

একটী বিষয় সকলেরই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। যতই শীতপ্রধান দেশে যাওয়া যাবে অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য ততই হাত পা ফাটতে থাকে। শেষে এমন অস্বাভাবিক ভাবে ফেটে যায় যে, বড় বড় ঘা হয়ে ক্রমে রক্তস্রাব হতে থাকে। কিন্তু আমরা অত্যধিক শীত প্রধান স্থানে গেলেও আমাদের হাত পা মোটেই ফাটে নাই। তার একমাত্র কারণ আমরা স্নান করবার সময় সরিষার তেল সর্ব্বাঙ্গে ভালরূপ মালিশ করে স্নান করতাম এবং যাতে হাত পায় ময়লা জমতে না পারে, তজ্জন্য মাঝে মাঝে সাবানও ব্যবহার করতাম। অতিরিক্ত সরিষার তৈল মাখবার জন্য এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আমাদের হাত পা প্রভৃতি কিছুই ফাটে নাই। কোন কষ্টও পাই নাই। তা ছাড়া স্নানের অভাবে হাত পা বা সর্ব্বাঙ্গে ময়লা জমে চাম উকুন হয়ে তার কামড়ানিতে ঘা না হয়ে যায়, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। শরীরে যাতে চাম উকুন না জন্মিতে পারে, সেই জন্য মাঝে মাঝে ২।৩ দিন পর পর ভাল সাবান দ্বারা শরীর পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। চাম উকুন এবং পিশুর হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য Sulpher soap বা Carbalick soap ব্যবহার করা উচিত। আমরা ঐরূপ ভীষণ ঠাণ্ডা প্রদেশে গেলেও নিত্য ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে কখনও ভুল নাই এবং মাঝে মাঝে সাবানাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার করতেও কসুর করি নাই। নিত্য স্নানের জন্য এবং ঐরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আমাদের বিশেষ কোন অসুখ, কোন প্রকার ঘা, চাম উকুনের কষ্ট বা পিশুর কাটার জন্য কষ্ট পেতে হয় নাই। যারা এপথে আস্‌বেন তারা যেন আমার উপরোক্ত কথাগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন—যদি তাদের সুস্থ থাকার ইচ্ছা থাকে। অবশ্য তীর্থের পথে তৈল মর্দ্দন, সাবান মাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" ইহাও শাস্ত্রেরই আদেশ। যাহাতে শরীরটী সুস্থ রেখে নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ ও সবল অন্তঃকরণে তীর্থ যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। এসব বন্ধুর পথে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে, আপনার বন্ধু বান্ধবগণ প্রায় সকলেই "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" মহান্ বাক্যের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করতে ভুলবেন না। এমন কি একবারও মুখ তুলে ফিরে চাইবে না, পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে। এ সম্বন্ধে আমি নিজে বিশেষ ভুক্তভোগী সময় মত সে সব বিপদাপদের ঘটনা পাঠকদের উপহার দিব। (ক্রমশঃ)

সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি

—*—

সাংখ্যের theoryটা একদিকে খুবই ভাল, কেননা পুরুষ লিপ্ত হয়ে থাকতে চাইলে না; প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে তাঁর আত্ম-স্বরূপ কি তা পুরুষ বুঝ্‌তে চাইল। সাংখ্য বিবিক্ত আমিকে (আত্মাকে) নিষ্কাষণ করে নিলেন বটে, কিন্তু এই আত্মা বড় ভীতু। প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্ম্মিলনে তার বড্ড আপত্তি। তার ভিতরে জোর নাই—নিষ্কাসিত "কেবল আত্মা" হলেও প্রকৃতির সংমিশ্রণে তার আত্ম-বিলোপ ঘট্‌বে,এই ভয়ে সর্ব্বদা তিনি জড়-সর। সাংখ্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ঘেটে ঘেটে নির্ব্বিকার আত্মাকে বা পুরুষকে বের কর্‌লেন বটে, কিন্তু বাস্তবিকই যে পুরুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক এর কোন proof দিলেন না।

মাখন কখনো জলের সঙ্গে মিশে যায় না, তেমনি সাংখ্যবাদী বিশ্লেষণ করে যে ঝুনো আত্মাকে বের কর্‌লেন, তার তো প্রকৃতির সঙ্গে থেকেও কোন বিকার না হওয়ারই কথা। কেননা পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। প্রকৃতির সঙ্গে থেকেও যদি সাংখ্যের পুরুষ নির্ব্বিকার বলে নিজকে প্রমাণ করতে পারতেন, তাহলেই সাংখ্যের theoryকে এদিক দিয়ে bold theory বলা যেত। কিন্তু সাংখ্যের যে "কেবল পুরুষ" তাঁর এক জায়গায় একটু দুর্ব্বলতা রয়ে গিয়ে

প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবার ভয় যে পুরুষের মাঝে আছে—সে পুরুষ তো প্রকৃতির সঙ্গে প্রকারান্তরে লিপ্তই। কেননা মন থেকে তো তার সেই দুর্ব্বল চিন্তা অপসারিত হচ্ছে না। প্রকৃতির চিন্তা থেকে তো পুরুষ মুক্ত হতে পারল না। ভয়ে ভয়েই অহরহঃ প্রকৃতির চিন্তা করছে পুরুষ, অন্ততঃ সংস্কার হিসাবেও "কেবল পুরুষের" মনে একটা দাগ থেকে যাচ্ছে। তিনি যে প্রকৃতি থেকে আলাদা একথা ভাবতে গিয়েই প্রকৃতির কথা মনে এসে পড়্‌ছে। কাজেই বিবিক্ত হলেও সাংখ্যের কেবল পুরুষের মনে একটা ভীতি থেকে গিয়েছে।

আরোহ এবং অবরোহ দিয়ে কথাটাকে আরও সহজভাবে বুঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ সাংখ্য আরোহের processটা বেশ ভাল করে আয়ত্ত করে নিলেন—(অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ব্যূহ-ভেদ করলেন) কিন্তু কি করে অবরোহন করতে হয় সেদিকে সাংখ্যবাদী মন দেয়নি। কাজেই সাংখ্যের আত্মা কেবল হয়ে সরে উঁচুতে বসে থাকলেও প্রকৃতির প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে ভীষণ একটা আতঙ্ক রয়েছে। যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ব্যূহভেদ করে ওপরে উঠে গেলেন, সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে যদি আবার আত্মার বিদ্যুন্ময় প্রভাব দ্বারা দীপ্তিবন্ত করে তুলতে পারতেন, তাহলেই সাংখ্যের আত্মা perfect হত। কিন্তু ওপরে উঠে গিয়ে নীচের ধাপগুলির কথা তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। যাদের অবলম্বন করে তিনি ওপরে উঠে গেলেন, তাদের প্রতি তিনি নির্দ্দয় হয়ে আর কোন সম্বন্ধই রাখতে চাইলেন না। কিন্তু এই কি পূর্ণতার খাঁটী লক্ষণ? অবরোহের পথে নেমে এলেই সাংখ্যের পুরুষ বা আত্মা দেখতে পেতেন তাঁর আত্মশক্তি কত প্রবল। জড় তখন তারই দীপ্তিতে তারই প্রভাবে চেতন এবং উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। সাংখ্যের পুরুষের তখন নিরভিমান গুরুত্ব আপনি ফুটে উঠত। তিনি সকলের গুরু হতে পার্‌তেন—সমদর্শী হতে পারতেন। যে প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করে, যার প্রতি নিদারুণ

একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে তিনি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন, সেই প্রকৃতিই যে তাঁর একান্ত অনুকূল এ কথা উপলব্ধি করে, প্রত্যক্ষ করে মনের বিভীষিকা লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু "কেবল আত্মার" মন থেকে তো এই কুসংস্কার ঘুচল না, তাঁর ভিতর সংস্কার থেকেই গেল—প্রকৃতি প্রতিকূল।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার উগ্রতা, আত্ম সমর্পণের স্নিগ্ধ মাধুরীতে অভিষিক্ত না হলে ঠিক ঠিক পূর্ণতা আসে না; কাজেই সাংখ্যের কৈবল্য theory টা একদিক দিয়ে imperfect, এই দুর্ব্বল বিবেক জ্ঞান নিয়ে পুরুষ "কেবল" হয়ে, জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই চোখ বুঝে রইলেন, কিন্তু লীলা উপভোগ আর তার ভাগ্যে ঘটে উঠল না। জীব-ন্মুক্তির আস্বাদন করতে তিনি আর পেরে উঠলেন না, আর কোন কিছুর দরুণ নয় শুধু ভয়ে, শুচি বায়ুর দরুণ, কি জানি আবার প্রকৃতির সম্মোহনে মোহিত হয়ে যেতে হয়। পুরুষের পৌরুষত্ব জিনিষ টার পরিচয় কি এই?

শুদ্ধ ভালবাসায়ও প্রকৃতির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়—এটা সহজ পন্থা। প্রকৃতি বরঞ্চ এভাবে বেশী করে প্রাণখুলে দেয় পুরুষের কাছে; এটা ঠিক, যেখানেই হিংসা রয়েছে, জোর রয়েছে—সেখানেই হাজার হলেও কৃত্রিমতা থাকবেই থাকবে। সাংখ্যবাদী প্রকৃতিকে তত্ত্ব হিসাবেই জানলেন শুধু—কিন্তু প্রকৃতির বুকে যে কি বেদনা, সে যে কত বেদনা নিয়ে জড় হয়ে আছে একথা তো পুরুষ জান্তে পারল না। কিন্তু ভালবাসায় আমরা যাকে জড় প্রকৃতি বলি, তারও বুকের বেদনা এসে সহানুভূতিসম্পন্ন পুরুষের বুকে বাজতে থাকে। পুরুষ কি তখন আর প্রকৃতিকে জড় বলে উপেক্ষা করতে পারে? প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই যে তখন পরস্পরের সুখে দুঃখে, ব্যথায়-বেদনায় সমভাগী হয়। এর নামই তো প্রকৃতি পুরুষের অপূর্ব্ব মিলন। কি করে যে মিলন ঘটল তা অব্যক্ত

ভালবাসার অসীম শক্তি রয়েছে। ভালবাসা দ্বারা অপরের প্রাণেও শক্তি সঞ্চার করা যায়, আবার অপরের প্রাণের অব্যক্ত বেদনাও হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি জন্মে। সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিকে ভালবাসেননি বলেই—অসার হয়ে, নিস্পন্দিত হয়ে কৈবল্যাবস্থা লাভ করেছেন। সেই কৈবল্যের মাঝে বেদান্তের "আমির" মত বিরাট ঐশ্বর্য্য বা নির্ভীকতা নাই। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আর সাংখ্যের কৈবল্যবাদে রাত-দিন পার্থক্য। একজন সর্ব্বত্র আত্ম দর্শন করে সকলকেই ভালবেসে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, আর একজন আত্ম-ব্যাপ্তির অভাবে সর্ব্বত্রই কেবল ভয়ে ভয়ে কাঁপছেন। তিনি তাকেই কৈবল্যরূপে জানেন—আর কাউকে নয়। জড় বলব কাকে? পুরুষকে না প্রকৃতিকে। প্রকৃতির সুখে-দুঃখে যাঁর ও হৃৎস্পন্দন হয় না তিনি আবার পুরুষ? তিনি আবার চেতন? বলতে গেলে পুরুষই জড়—প্রকৃতি চেতনময়ী। পুরুষের নির্ম্মম অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য প্রকৃতি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিক্ষুব্ধ ভাবে বুক পেতে সহ্য করেছে। যে প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করে পুরুষ সাধনায় বড় হয়েছিলেন, অলক্ষ্যে সেই প্রকৃতিই যে তাঁর সাধন পথের সহায়তা করেছে—এর খবর কি পুরুষ জানে? প্রকৃতি তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিল পুরুষকে, একি কখনো সম্ভবপর হত, যদি প্রকৃতি চেতনময়ী না হতেন। নিজের প্রতি যাঁর একটুকুও আসক্তি নাই, দরদ নাই তিনি যে আত্ম-সমর্পণের মাধুর্য্যে কতদূর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন তা কি আর বর্ণনা করে বুঝানো যেতে পারে? আত্ম সমর্পণ করেই প্রকৃতি নিজকে বুঝবার অনন্ত সুযোগ পেল।

প্রকৃতি মুক্ত—কেননা দেহ থেকেও তার দেহ-বোধ নাই। যে অনায়াস সাধনায় প্রকৃতি স্বভাবতঃ সিদ্ধ, সে পথ কি পুরুষের অনুকরণীয় হতে পারে না? যে শক্তির বলে প্রকৃতি জগতের এত অবজ্ঞা-অত্যাচারকে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হৃদয়ে সহ্য করতে পারছেন, সেই অহেতুকী দৈবী শক্তি কি এতই অবজ্ঞার বস্তু? হৃদয় জয় করার মাধুর্য্যের কি কোন তাৎপর্য্যই নাই?

গীতার ভাষায় বলতে গেলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই অনাদি, তাদের উভয়েরই লীলা অপার-অনন্ত। কেউ কারও চেয়ে হীন নয়। পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে উভয়ের মাহাত্ম্যেতেই শুদ্ধ বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। কেউ জড় নয়, উভয়েরই প্রাণের স্পন্দন রীতিমত চল্‌ছে। প্রকৃতি পুরুষ কেহই কারও তত্ত্বের সীমা নির্দ্দেশ করতে পার্‌ছে না, দুজনই দুজনার প্রতি অবাক্‌ বিস্ময়ে মুগ্ধ। যে যাকে বুঝ্‌তে যায় তারই সমাধি এসে পড়ে। লীলা এবং শক্তি কারও কম নয়।

* * *

দুঃখ আর আনন্দ এই হল দুই মূল তত্ত্ব—আর এই দুইটী তত্ত্বকে অবলম্বন করেই সাংখ্য এবং বেদান্তের সৃষ্টি। সাংখ্য দুঃখবাদী, আর বেদান্ত আনন্দবাদী। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় মানুষের স্বাভাবিক আনন্দ যখন ক্রমশঃ স্তিমিত হতে লাগ্‌ল, তখনই মানুষের মনে জগৎটা দুঃখ-ময় বলে প্রতিভাত হতে লাগ্‌ল। কেননা বহির্জগৎ তো আমাদের মনের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই জড়িত। স্বাভাবিক আনন্দ থেকে বিচ্যুতিই সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তির কারণ বলে মনে হয়। তাই সাংখ্যকারিকায় প্রথম সূত্রেই আছে—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা।" কিন্তু বেদান্ত বলেছেন এর উল্টো কথা অর্থাৎ মানুষ যখন স্বাভাবিক আনন্দে থাকে তখনই তার ভিতর ব্রহ্ম ফুটে ওঠে। বৈদান্তিক বল্‌ছেন—আনন্দই ব্রহ্ম!

সাংখ্যমতের যখন উদ্ভব হল, তখন বোধ হয় দেশে খাওয়া-পড়ার দিকে ততটা স্বচ্ছলতা ছিল না, কাজেই মুখ শুকিয়ে থাকারই আর দুঃখের বাণীই বের হবার কথা। তবে কিনা সাংখ্যবাদী দুঃখে পড়েও একেবারে মুহ্যমান্‌ হয়ে যান্‌নি—দুঃখত্রয়ের কি করে বিনাশ হয় তারও চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কি করে আনন্দ পাওয়া যায়, ইহাই তারও লক্ষ্য। বৈদিক যুগে আনন্দটাই স্বভাব ছিল, কাজেই স্বল্প দুঃখে, দুঃখের দর্শন সৃষ্টি করে মনের আক্ষেপ ব্যক্ত কর্‌বার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু দুঃখটাই যখন মানুষের প্রবল হল, তখনই এই দুঃখের দর্শন বা সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি!

বৈদিক যুগে আনন্দ ছিল বলেই প্রকৃতির সঙ্গে বোঝা পড়া করবার (অর্থাৎ প্রকৃতি আমা থেকে আলাদা, আমি পুরুষ সুতরাং প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত) ততটা প্রয়োজন হয়নি। প্রত্যেকেই আনন্দে ছিল বলে, কাউকে পথের কণ্টক বলে মনে কারও দুরভিসন্ধি জাগেনি। এক কথায় বৈদিক যুগের ভাবটা ছিল এই—কেউ কারও শত্রু নয়, পর নয়। কাজেই পরস্পরের সম্বন্ধে চিত্তের অবনতি না হয়ে উন্নতিই হবে এই ছিল সবার ধারণা।

সাংখ্য সেই সবল ধারণা হজম কর্‌তে পার্‌ল না। তার বাক্যে চিন্তায় দুর্ব্বলতাই প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল। আপন অধিকার পাকা কর্‌বার দরুণ, প্রকৃতি থেকে তাকে বিবিক্ত করে নিতে হল, অর্থাৎ ছাঁকা "কেবল পুরুষ" হলেন তিনি।

সবল পোষণ করে, দুর্ব্বল ধ্বংস করে, একথা একেবারে নিছক্‌ সত্যিকার কথা। সাংখ্য প্রকৃতি থেকে নিজকে বিবিক্ত করে দুর্ব্বলই হয়ে পড়্‌লেন—কেননা প্রকৃতির হাতেই যে পুষ্টির উপাদান। তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করবার পর যখন পুরুষ বুঝ্‌লেন যে আমি এই, তখন তার মনে আর কোন সন্দেহ বা ভয় থাক্‌বার কথাই নয়! কিন্তু বিশ্লেষণের

ফলে তিনি আর উদারতা নিয়ে, জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করে, বাহিরের জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য কর্‌তে পার্‌লেন না। তিনি "কেবল" হয়েই থেকে গেলেন। তবে আধুনিক সাংখ্যকার—যেমন, বিজ্ঞানভিক্ষু আদি, তারা পুরুষকে জীবন্মুক্তি অবস্থায় আবার নামিয়ে এনেছেন। পুরুষের সংযমের পর আবার যে স্বাভাবিকই লীলা ফুটে ওঠে, তা বেশ সুন্দর দেখিয়েছেন। পুরুষের এই অবরোহের ফলে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বেরও আবার আপ্যায়ন হল। পুরুষ তখন আপন মহিমায় এবং ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লেন!

মানুষের জীবন যখন পূর্ণ হয়ে উঠে—তখন সব দিকেই পূর্ণতার ব্যাপ্তি ঘটে। কারও কোন দিকে অভাব বা হাহাকার থাকে না। তত্ত্ব জান্‌বার দরুণ সংযমের খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরও যদি চিত্ত সরস হয়েই না উঠ্‌ল, পুরুষের মাঝে একটা উদার দৃষ্টি না এল, সকলেরই যে একদিকে না একদিকে সার্থকতা আছে, প্রয়োজন আছে, একথা পুরুষ বুঝতে না পেল, তাহলে ধরে নিতে হবে—যে কোন কারণেই হোক্ পুরুষের চিত্ত সংস্কার-দুষ্ট।

পূর্ণ জীবন সংযমে—আনন্দে সর্ব্বত্রই পূর্ণ, কোন দিকে তার ন্যূনতা নাই। কিন্তু সাংখ্যের "কেবল পুরুষ" সংযমের পথটাই খুব ভাল করে আয়ত্ত করে নিয়েছেন, লীলার পথে ভয়ের দরুণ তিনি অগ্রসর হননি!

—*—

হৃদয়-মাণিক

—(*)—

কোথায় যাবি পাগলা ওরে,
প্রাণের জিনিষ খুঁজতে—
প্রাণের জিনিষ প্রাণেই পাবি,
পার্‌লে তারে বুঝতে।

দিল্ দরিয়ায় ডুব্ দিয়ে দেখ,
জান্‌লে মাণিক তুল্‌তে—
সেথাই পাবি, নইলে ঢেউয়ে
থাক্‌বি শুধুই দুলতে।

দেবতা যে রয় মন্দিরে তোর,
পার্‌লে সে দ্বার খুলতে—
ভর্‌বে রে প্রাণ, নইলে মিছেই
ঘুরবি রে পথ ভুলতে।

—*—

সাধন-সংগ্রাম

—•—

সংবেগ যাহাদের তীব্র, তাহাদের শীঘ্র সমাধিলাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদের একটী সূত্র আছে—"তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ।" যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, তীব্র সংবেগ উৎপন্ন না হইলে ইষ্ট-সিদ্ধি লাভ হয় না। চিত্তের এই তীব্র সংবেগ যে চিরকালই স্থায়ী থাকে তাহা নহে, তবে তাহার প্রধান কাজই হইল মানুষ যাহা চায়, তাহা অতিশয় দ্রুত লাভ করাইয়া দেওয়া! অনেক সময় শৈথিল্য বশতঃ চিত্তের সংস্কারজালে আবদ্ধ হইয়া আমরা জীবনের উন্নতির পথে অনেক দূর পিছাইয়া পড়ি, দৈব-দুর্যোগবশতঃ হয়ত জীবনের আর উন্নতিই হয় না, কাজেই জীবনের প্রথমে, যখন শরীরে মনে যথেষ্ট বল থাকে, তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প পূরণের দরুণ উঠিয়া-পরিয়া লাগিতে হয়। তীব্র সংবেগ দ্বারা সকল রকম জড়ত্বের আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠা যায়, তারপর দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে জীবন আপনি সহজ সরল হইয়া আসে। তখন বিনা লড়াইয়েই জীবনের স্রোত উর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই দৈবী প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাইতে হইলেই, আসুরী-প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাস্ত করিতে হয়। এই জন্যেই প্রত্যেক সাধকেরই প্রথমে একটা বিষম সংগ্রামের অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়! জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যাহাদের মনের বল থাকে না, তীব্র সংবেগ থাকে না, তাহারা আসুরী প্রকৃতির কবলে পড়িয়াই জীবনটাকে বিসর্জ্জন দেয়, আর যাহারা চিত্তের বল দ্বারা এই সময় উর্দ্ধদিকে উঠিয়া যাইতে পারে, তাহাদের জীবনই ধন্য হয়। সংবেগের অভাবহেতু, অনেক সাধকেরই এইখানে আসিয়াই আবার পতন সুরু হয়! কাজেই সাধক মাত্রেরই অতন্দ্রিত ভাবে সর্ব্বদা সজাগ সচেষ্ট থাকিয়া জীবনের এই সঙ্কট কালকে অতিক্রম করিয়া যাইবার দরুণ প্রস্তুত থাকিতে হয়। তারপর আসুরী প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া যাইতে পারিলে, জীবনের উর্দ্ধ-পরিণামকে আর কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না! অসুরের, রাক্ষসের অত্যাচারেরও একটা নির্দ্দিষ্ট কাল রহিয়াছে। মানুষ যখন ঘুমে অবশ হইয়া থাকে, তখনই সেই দুষ্ট নিশাচররা মানুষের উপর আক্রোশ ঢালিতে আসে। কাজেই সংযমী হইয়া যদি, সেই নির্দ্দিষ্ট কালকে অতিক্রম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন ভয় আশঙ্কা থাকে না!

সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য মানুষের চিরকাল থাকে না, আর চিরকাল সংগ্রাম করিবার কোন প্রয়োজনও হয় না! আত্ম-চেষ্টা দেখিলে দৈবী প্রকৃতিও সাহায্যের দরুণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানুষ তখন অবাক্ হইয়া যায় প্রকৃতির সেই শুভ আকর্ষণ দেখিয়া!

কিন্তু সেই দৈবী প্রকৃতির সন্ধান পাইতে হইলেই প্রথমাবস্থায় মানুষকে দিবা-রাত্র সজাগ সচেষ্ট থাকিয়া নিম্ন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া যাইতে হয়।

চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতির ধ্যানে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে, তখন আর নিম্ন প্রকৃতির প্রভাব এতটুকুও থাকে না। তখন বিনা বিদ্বেষেই, বিনা সংগ্রামেই জীবন উর্দ্ধপ্রবাহে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু চিত্তের এই সাম্যভাব, প্রসন্নভাব প্রথমেই আসে না, একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র না পাওয়া পর্য্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির প্রতি একটা ভীষণ বিদ্বেষের ভাব থাকে, অর্থাৎ কি করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায়। তারপর সেই সঙ্কটাবস্থা পার হইয়া গেলে, তখন আর বিদ্বেষ ভাব মনে স্থানই পায় না। তখন

দেখা যায়, নিম্ন প্রকৃতিই মানুষকে উর্দ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে ! শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থাটা যে কি, তাহার মাধুর্য্য মানুষ বেশী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তখনই, যখন নিম্ন প্রকৃতির কথা মনের মাঝে পলকের দরুণ ভাসিয়া উঠে।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সময় কাটাইয়া দিলে, আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না। আত্ম-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে নিদারুণ ব্যাকুলতা জন্মিবে—সেই ব্যাকুলতা কাহারও কাহারও জীবনে চিরসঙ্গীই থাকিয়া যায়, আবার কাহারও জীবনে আনন্দে রূপান্তরিত হইয়া বেশ একটা শান্ত সমাহিত ভাব আনিয়া দেয় ! কিন্তু যাহারাই আসুরী প্রকৃতির হাত হইতে নিস্তার পাইবার দরুণ সচেষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রাণেই অফুরন্ত জ্বালা না আসিয়া পারে নাই ! সেই জ্বালার অবসান হইয়াছে কখন ? যখন সাধক সেই দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় পাইয়াছে ! কিন্তু সেই শান্তিপ্রদ আশ্রয় স্থলকে পাইতেই মানুষের এত সাধ্য-সাধনা করিতে হয়। এই খাঁটী স্বাভাবিক অবস্থা পাইতে মানুষকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়াই যাইতে হইয়াছে !

যাহাদের প্রাণে নিদারুণ জ্বালা আসিয়াছে, তাহাদের জীবন যে ধন্য। এই জীবনে তাহাদের মনোষ্কাম সিদ্ধ না হইলেও, যোগ-ভ্রষ্টের যে পতন নাই। পূর্ব্বসংস্কারের প্রতিক্রিয়াতেই তাহাদের আবার নূতন করিয়া সাধন-জীবন সুরু হইবে। কাজেই সাধনাগ্নির জ্বালা বুকে করিয়া মরিয়া যাওয়া-টাও সার্থক। মানুষ কত কিছুর দরুণই উন্মাদ হয়, কিন্তু নিছক্ প্রাণের জ্বালায়, আত্মসাক্ষাৎকারের দরুণ কয়জনের উন্মাদনা আসে।

যাহাদের সেই জ্বালা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে অন্তরে প্রশান্তি আসিয়াছে তাহারা তো আরও ধন্য, আরও সৌভাগ্যবান্। কেবল বাহিরের দিক নিয়া বিচার করিলে চলে না, মানুষের আকুলতা-রও শেষ রহিয়াছে—চিরকাল মানুষ অপূর্ণতা নিয়াই, হাহাকার করিয়াই মরিবে না, বুক-ফাটা কান্নারও সার্থকতা আছে ! একদিন প্রত্যেকেরই অপূর্ণ হৃদয় পূর্ণানন্দের আতিশয্যে উপচিয়া পড়িবে। কাজেই তীব্র সংবেগ যে আমরণ থাকিতেই হইবে, তাহারও কোন মানে নাই। চিত্তকে জোর করিয়া কতদিন পর্য্যন্ত সজাগ রাখিতে হয়, তাহার পর সে আপন গরজেই সজাগ সচেষ্ট হইয়া থাকিতে ভাল-বাসে। তখন বাহিরের আড়ম্বরটা কিছু কমিয়া আসে। অন্তরের আনন্দের একটানা প্রবাহে চিত্ত তখন মস্‌গুল হইয়া যায়।

বৈরাগ্যেরও দুইটী দিক আছে। ভিতরের ভাবের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত, প্রথমতঃ বাহিরটাকে নিয়াই বেশী নাড়াচাড়া করিবার প্রবৃত্তি থাকে, সেই সময় শরীরের উপর অনর্থক একটা বিতৃষ্ণা আসে, যেন উহার উপর যত নির্য্যাতন হইবে, ততই আনন্দের মাত্রা বাড়িবে। কিন্তু ক্রমশঃ যখন অন্তর্ম্মুখী ভাবের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে সাধক, তখন তাহার বৈরাগ্যের আগুন ভিতরেই বেশী করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, বাহিরের আড়ম্বরটা স্বাভা-বিকই কমিয়া আসে ! এই জন্যই বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থায়, অনেকের মাঝেই একটা বেখাপ্পা উগ্রতা থাকে। কিন্তু এই ভাবটা অত্যধিক দিন স্থায়ী হয় না।

মানুষের ভিতর সর্ব্বদা একটী উর্দ্ধমুখী ভাব রহিয়াছে। কিন্তু নানা জঞ্জালের মধ্যে পড়িয়া মানুষ আর সেই প্রেরণা অনুভব করিতে পারে না, যখন পারে, তখন আর তুচ্ছ বিষয়ে কিছুতেই মজিয়া থাকিতে পারে না। তখন একটা অসামঞ্জ-স্যের সূত্রপাত না হইয়া পারেই না। কিন্তু অভ্যাসের দরুণ, সাধনার দরুণ লক্ষ্য যখন আর কিছুতেই অস্পষ্ট কিম্বা চোখের আড়াল হইতে পারে না, তখন বাহিরের সঙ্গেও আর কোন বিরোধ থাকে না। কিন্তু সাধকাবস্থায় এই সামঞ্জস্য আসে না।

আমরা সাধারণতঃ চিত্তের একমাত্র গতির কথাই বেশ ভাল করিয়া জানি—অর্থাৎ নিম্নগতি, কিন্তু চিত্তের ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নাই। ইহার প্রধান কারণই হইল আমরা সকলেই জীবনের উন্নতি চাই না—প্রকৃতির অধঃস্রোতে গা ভাসাইয়া চলাতেই আমাদের তৃপ্তি-লাভ হয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক যাহারা একবার সেই উর্দ্ধমুখী প্রেরণা অনুভব করিয়াছে, তাহারা সেই অমৃতানন্দের দরুণ ব্যাকুল না হইয়া পারেই না।

প্রত্যেকের জীবনেই নিম্নস্রোতের একটু উর্দ্ধ দিয়াই সেই দৈবী প্রকৃতির প্রবাহ চলিয়াছে। আমরা মধ্যের এই তামসিক অবস্থাকে কাটাইয়া উঠিতে পারি না বলেই, নিরাশ মনে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু আসলে চিত্তের একটু তীব্র সংবেগ থাকিলেই এই অন্ধকারময় পথকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায়। কিছুদুর অতিক্রম করিয়া গেলে স্বাভাবিক স্রোতের সঙ্গে আপনি মিলন ঘটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে নিজের একটু চেষ্টা উদ্যম থাকা চাই। আর সাধকের সাধনার প্রয়োজন হয় এইখানেই!

মানুষ অবিশ্বাসী হইয়া উঠে, নাস্তিক হইয়া যায়, ইহারও একটা মহান্ তাৎপর্য্য আছে। মানুষের প্রাণ তখন প্রত্যক্ষানুভবের দরুণ একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পরের উপদেশে আর প্রাণ প্রবোধ মানে না। প্রাণের এই আত্যন্তিক ব্যাকুলতার দরুণ ভিতর হইতে আপনি ইষ্ট সিদ্ধির পথ আবিষ্কৃত হইয়া যায়। কাজেই মানুষের ভিতর যখন অতৃপ্তি আসে, তখন মানুষের জীবন সার্থকতার দিকেই উন্মুখী হয়।

নিজের পথ নিজকেই যাহাদের আবিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, তাহাদের একটু বেগ পাইতে হয়। পরীক্ষার দরুণ বিচিত্র পথেই ব্যাকুল হইয়া ছুটিতে হয় তাহাদের—এই ছুটাছুটি দেখিয়া অনেকেই মনে করে এই বুঝি তাহাদের জীবন পণ্ড হইতে চলিল। কিন্তু বাস্তবিকই যাহাদের প্রাণ একটা কিছু চায়, তাহাদের চাওয়া অদম্য এবং অসামঞ্জস্যজনক হইলেও কিছুতেই ব্যর্থ হয় না। ব্যাকুলতা তো সকলের প্রাণে জাগে না। আমার অভাব আছে এই অনুভব কয়জন করে এবং তাহার পূরণের দরুণ কয়জন সচেষ্ট হয়?

প্রকৃতির হাতেই মানুষকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয় বটে; কিন্তু সেই প্রকৃতি আসুরী প্রকৃতি নয়। যাহাকে আশ্রয় করিলে জীবন উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয় সাধক মাত্রেরই সেই প্রকৃতির সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। নিম্ন প্রকৃতির কাছে আত্ম-সমর্পণ করিলে জীবন অধঃস্রোতে পড়িয়া পণ্ডই হইয়া যাইবে। যাহার হাতে নিজকে সঁপিয়া দিলে জীবন উন্নত হইবে তাহার কাছে আত্ম সমর্পণে কোন ক্ষতি নাই! কিন্তু অনুকূল বস্তুকে পাইতে হইলেই অনেকখানি প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিয়া যাইতে হয়। সেই সংগ্রাম করিবার সাহস বল বীর্য্য সকলের থাকে না, সেইজন্যই সকলে খাঁটী মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করিবার সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারে না।

সংগ্রাম করিয়া মানুষ যে অবস্থা পায়, যে সুখ অনুভব করে, তাহা হইতেও উন্নত অবস্থা মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে। তাহা আর কিছু নয়—সাম্যভাব বা প্রশান্তি। মানুষ সেই গুপ্ত জীবনের পরিচয় পাইয়া তখন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যায়। মানুষ চেষ্টা করিয়া যতখানি অগ্রসর না হয়, অনুকূল প্রকৃতি মানুষের বিনা চেষ্টাতেও তাহার চেয়ে বেশী অগ্রসর করাইয়া দেয় মানুষকে। তখন মানুষের গর্ব্ব আপনি খর্ব্ব হইয়া যায়। কিন্তু সংগ্রামের ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইলে

সেই অনুকূল প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ভগবান সচেষ্ট সাধকের প্রতিই প্রসন্ন হন।

বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বাড়াবাড়ি থাকেই! কিন্তু ক্রমশঃ সাম্যাবস্থা লাভ হয়—কেননা অনুকূল প্রকৃতির সাহায্য প্রথমেই পাওয়া যায় না। সকলকেই প্রথমতঃ একটা নৈরাশ্যে পড়িতে হয়—কি জানি কি আছে কপালে, এই অনিশ্চিত আশঙ্কা লইয়াই সাধককে অকূল সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। সাধকের প্রাণে এই সাহসটুকু থাকিলেই হইল—তারপর ভগবানই বা অনুকূল প্রকৃতিই সকল দিকে সুবন্দোবস্ত করিয়া সাধক-জীবনকে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়। মানুষের সাধ্যে যতখানি শক্তি আছে, তাহার যথোচিত ব্যবহার হইলে—দৈবী-শক্তি আপনি আসিয়া হাজির হয়! মানুষ তাহার আপন শক্তিকে খাটাইলে, বিরাট্-শক্তি তাহার সাহায্যের দরুণ না আসিয়া পারে না। আসুরী প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা না থাকিলে, দৈবী-প্রকৃতিও সাহায্য করিতে আসে না। আর দৈবী-প্রকৃতির সন্ধান না পাইলে জীবন উন্নতও হয় না।

—*—

উপদেশ

—*—

তোমরা মানুষ হও, আত্মবলে বলীয়ান্ হও—এই আমার আশীর্ব্বাদ! কিন্তু মানুষ হওয়া আর আত্মবল লাভ করা একদিনের সাধনা নয়, জীবনভরে নিষ্ঠার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে হয় তার দরুণ। তারপর মানুষ, মানুষ বলে গর্ব্ব করবার অধিকারী হয়! বিশেষতঃ যারা আত্ম-সমর্পণ করে, আত্ম-মুক্তির সন্ধান পেতে চায়, তাদের জীবনে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস এই দুইটী অমূল্য সম্পদ, সিদ্ধির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়! জীয়ন্তে মরা হওয়া, অপরের শুভ ইচ্ছার নির্দ্দেশে চলা, চেতন মানুষের পক্ষেই সম্ভব, আবার মানুষ চেতন বলেই এই পথে মানুষের সম্মুখে নানা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়! সব বাধা-বিঘ্নকে আত্ম-বিশ্বাস দ্বারা পরাজয় করতে পারলে—তবে সেই সিদ্ধির ঐশ্বর্য্য জীবনে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠে। তাই আমি তোমাদের বলি, যারা আত্ম-সমর্পণ-মন্ত্রে দীক্ষা নিতে চাও—তাদের বুকের পাটা খুব শক্ত হওয়া চাই! সামান্য কারণে টলে পড়লে জীবন ব্যর্থ হবে!

যারা আজন্ম সিদ্ধ তাদের কথা বল্‌ছি না, কিন্তু তোমরা, যারা নাকি মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়া জীবনকে উন্নত করতে চাও, তারা নিশ্চয়ই সিদ্ধ নও। অর্থাৎ তোমরা সাধু হবে বলেই—সাধু বলে, মহৎজন বলে যার ওপর তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে, তাঁর শরণাপন্ন হয়েছ! কাজেই সাধুত্ব অর্জ্জনেরও সাধনা করতে হবে তোমাদের! তোমাদের শুভ ইচ্ছা, মহৎ সঙ্কল্প যাতে জীবনে সিদ্ধ হয় তার দরুণ তোমরা সাধনাবলম্বনে আপ্রাণ চেষ্টা করবে! সেই সাধনার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধাই তোমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে আলোক প্রদান করবে—তোমরা ক্রমশঃ অন্ধকার থেকে জ্যোতিঃর রাজ্যে প্রবেশ করবে। কাজেই গোড়াতেই বলে রাখছি, অর্দ্ধপথে এসে তোমাদের মাঝে যাদের সন্দেহ

সংশয় জেগেছে—হয় তারা সংশয় নিরসন করে দ্বিগুণ বল অর্জ্জন করে আবার উল্লাসে-উদ্যমে এগিয়ে চল; আর তা না হলে এই পথ ছেড়ে দিয়ে যাতে জীবনের উন্নতি হয়, তা অবলম্বন কর! আমি কারও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী নই। আমি বৈচিত্র্যকে স্বীকার করি—আর বৈচিত্র্য সর্ব্বত্রই রয়েছে, কাজেই সাধন জগতেও থাক্‌বে তা আর আশ্চর্য্য কি? কি কর্ম্ম জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে, সকলেরই এক পথে যাত্রা শুভ হয় না! সিদ্ধি লাভের অজস্র পথ রয়েছে। গীতাতেও তোমরা দেখেছ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কত পথ, সাংখ্য যোগ, ভক্তি কত কিছুরই উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশ শুনে, এবং তাঁর নিজের সংস্কারানুযায়ী পথই অর্জ্জুন বেছে নিলেন শেষ পর্য্যন্ত। কাজেই আমার উপদেশের সঙ্গে যাদের আন্তরিক ইচ্ছার সমন্বয় না হচ্ছে তাদের অনর্থক হৃদয় দৌর্ব্বল্য নিয়ে "দেখি কি হয়"—এই বলে পড়ে থাকাতে কি লাভ? আমি ব্যামিশ্র বাক্য দ্বারা, গোলমেলে কথা দিয়ে, কারও স্বাধীন ইচ্ছাকে আবৃত কিম্বা আচ্ছন্ন কর্‌তে চাই না। আমার আদর্শের সঙ্গে, ইচ্ছার সঙ্গে কারও যদি আন্তরিক যোগ থাকে, তারাই আমার কাজ নিয়ে পড়ে থাক· তা না হলে ভণ্ডামী করে পাপ সঞ্চয় করে জীবনকে ভার-গ্রস্ত করাতে কি লাভ?

তবে একথা বল্‌তে পারি—যে পথই ধর না কেন, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস এই দুইটী দৈবী-সম্পদ থাকা চাই-ই। তা না হলে বুকে বল পাবে কেমন করে? কার্য্যক্ষমতা উৎপন্ন হবে কোথা থেকে? বিশ্বাসানুপ্রাণিত হতে না পারলে, সব অন্ধকার, সব কেবল নৈরাশ্যময় বলেই মনে হবে। বিশ্বাসই হচ্ছে মানুষের উজ্জ্বল দৈবী চক্ষু! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্য-চক্ষু প্রদান করেছিলেন—তার মানে কি, না বুক ভরা বিশ্বাসে অর্জ্জুন শক্তিবন্ত হয়ে উঠেছিল! বিশ্বাসের জোরেই অর্জ্জুন এক জীবনে এত কার্য্য সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার ভিতর যখন অটল বিশ্বাস এল, তখন তিনি আপন পথ বেশ পরিষ্কাররূপেই দেখ্‌তে পেলেন। কাজেই আসল কথা হল—জীবনে অচল-অটল বিশ্বাস অর্জ্জন করা!

এখনো তোমাদের জড়ত্ব এবং চিত্তের মালিন্য অপসারিত হয়নি—কর্ম্ম করার কথা বলেছি সেই দরুণ! আস্তে আস্তে তোমরা শুদ্ধচিত্ত হয়ে অনাবিল আনন্দের অধিকারী হবে এই তো আমার অভিলাষ। কিন্তু জান, মানুষের ভিতর অনেক সুপ্ত বাসনা কামনা রয়েছে! আজ একটু সাত্ত্বিকভাব এল, কিন্তু কালই দেখবে কোথা থেকে তোমার ভিতর দুরন্ত কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। কাজেই খুব সাবধান হয়ে, তিল তিল করে নিজকে, নিজের অব্যক্ত সংস্কারকে যাচাই করে নিতে হয়! আবর্জ্জনা একদিনে পুড়ে ছাই হবে না—রোজ রোজ তাতে আগুন লাগাতে হবে। তারপর চিত্ত বি-রজঃ হবে, আর শুদ্ধচিত্ত হলেই দেখবে ভগবানের কৃপা আপনি তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে!

কাজ ছাড়া, আবোল-তাবোল না ভেবে যদি আত্ম সমাহিত হয়ে থাক্‌তে পার ভাল কথা। কিন্তু যারা কাজ কর্‌ছ, তারা মনে করো না যে আমার কাজ কর্‌ছ—সে জন্য আমার কাছে তোমাদের দাবী আছে! কাজ করে করে তোমা-দের মনের ময়লা কাট্‌ছে—অর্থাৎ পুঞ্জীভূত সংস্কা-রের ক্ষয় হচ্ছে। তাতে তোমাদেরই হিত হচ্ছে।

আমার ওপর যাদের বিশ্বাস নাই, আমার কাজ করে তারা আনন্দের অধিকারী হবে কেমন করে? কাজেই এখানে যারা আনন্দ পাচ্ছ না বলে অভি-যোগ কর্‌ছ, তাদের প্রথমেই নিজের মনের সঙ্গে বেশ বোঝা-পড়া করে দেখ্‌তে বলি যে আমার প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট আছে কিনা? মানু-

ষের মন জিনিষটা এক জায়গায় স্থির থাকে না। কাজেই সাময়িক বিরুদ্ধ ভাব আসাটা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু মনের গতি যদি, যে-লক্ষ্য ধরে চলেছ তার উল্টো পথেই অবিরাম প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে জীবনের লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্তন করা উচিত। হয়ত, বুঝ্‌তে না পেরেই এসে এই পথ ধরেছিলে!

আমি বারবার তোমাদের এই কথাই বলে যাই! স্বাধীন ইচ্ছাকে পদ-দলিত করে চল্‌তে কাউকেই আমি বলি না। ব্যক্তিগত সাধনার ওপর, কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু যাদের মন-বুদ্ধি এখনো আড়ষ্ট হয়ে আছে, চিত্ত শুদ্ধি হয়নি, তারা বৃথা আস্ফালন না করে, নির্দ্দেশে চলে শক্তি-লাভ কর। তারপর শক্তিলাভ করে শক্তিকে হজম করাও চাই। শক্তিতেই মানুষ বিনম্র হয়, সাধু হয়, আবার শক্তিতেই মানুষ উদ্ধত হয়, উচ্ছৃঙ্খলও হয়, কাজেই শক্তির বিকাশকেও সংযত-ভাবে যাচাই করে নিতে হবে। তোমরা মানুষ হও, তাহলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হবে।

কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়ে অসময়ে তোমাদের মাঝে সাময়িক ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়—চিত্তের মালিন্য হেতু তোমরা সেই অবসাদজনক অবস্থাকেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলে ধরে নাও! মানুষের পরীক্ষা এই কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝেই হয়—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, সে সবের পরীক্ষা কর্ম্মক্ষেত্রে না পড়্‌লে কিছুতেই হয় না! আর যারা পারিপার্শ্বিকের মাঝে থেকেই নিজকে গঠিত করে তুল্‌তে না পারল, তারা একলা হয়েই আর কি কর্‌বে! দশজনের মাঝেই দোষ-গুণ সব ধরা পড়ে, আর তাতে সংশোধনেরও একটা চেষ্টা স্বাভাবিকই জাগে। তোমাদের আমি কর্ম্ম নির্দ্দেশ করে দিয়েছি, দশজনকে একত্র করেছি এই উদ্দেশ্যেই। তোমরা পরস্পরের সাহায্যে উন্নত হও—চিত্তকে উদার কর!

যেখানেই যাও, বিশ্বাস হারা হয়ো না, তাহলে বুকে বল পাবে না! স্বাধীন ভাবে একটা কিছু গড়ে তুল্‌তে হলে, তার উত্থান-পতনের লাভ ক্ষতিতে চিত্তকে আরও আঘাত করে বেশী! বিশ্বাসের অগ্নিময় বীর্য্য না থাক্‌লে, বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তোমাদের মাঝে যারা একটু স্বাধীন প্রকৃতির, তাদের আমি বিশেষ করে বলি—দুর্ল্লভ বিশ্বাস অর্জ্জন কর! বিশ্বাসের আত্ম-দানের উপরই বিজয় পতাকার ভিত্তি! জগতে একটা কিছু কর্‌বার সঙ্কল্প যাদের ভিতর আছে, তারা গোড়া থেকেই নিজের পাথে বিশ্বাসের অগ্নিময় বীর্য্য সঞ্চয় কর!

উদাসীন ভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়াতে বোধ হয় অনেকই সুখ মনে কর। কিন্তু মানুষ যারা তারা সুখ অন্বেষণের চেয়ে, কঠোর কর্ত্তব্য-সম্পাদনের আনন্দকেই অধিক বরণীয় মনে করে। আমি মনে করি দায়িত্ব নেবার একমাত্র অধীকারীই হচ্ছে—আত্ম বিশ্বাসে যারা বলীয়ান্ তারাই—যারা আদর্শের দরুণ জীবনকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে পারে। বিশ্বাসহীন, শ্রদ্ধাহীন কোন দিন আদর্শস্থানীয় হতে পারে না!

তোমরা যদি বিশ্বাসে দৃঢ় হও, তাহলেই তোমাদের দিয়ে মহান্ কার্য্য সম্পাদন হবে! আমি তোমাদের জীবনের মূল্য অধিক মনে করি—কেননা তোমরা স্বেচ্ছায় মহান্ এক সঙ্কল্প সিদ্ধির দরুণ আত্ম বিসর্জ্জন করেছ! সবাই না হোক অন্ততঃ তোমাদের মাঝে পাঁচটী যদি আমরণ আদর্শের উজ্জ্বলানুভূতির দীপ্তি না ভুলে যাও, তাহলেই দেখবে জগতে মহান্ কার্য্য কি করে সম্পন্ন হয়! মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধির দরুণ যারা আত্ম-ত্যাগ কর্‌বার সৌভাগ্য লাভ করে, তারা ধন্য!

গড়বার উপাদানই হল বিশ্বাস, কাজেই বিশ্বাস-হীনদের নিয়ে গঠন কার্য্যের আশা করা তো বৃথা! তোমরা আত্ম প্রবঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও প্রবঞ্চিত করো না যেন! বিশ্বাসীর অভাব নাই, অবিশ্বাসী হয়ে কেবল স্থান অধিকার করে বসে থাকার চেয়ে, নিজের জীবনের উন্নতি যাতে হয়, সেই পথ অন্বেষণ কর। আমি সেই জন্যই প্রথমে কেউ এলে বলি, বেশ এসেছ; থাক, মনের সঙ্গে বেশ বুঝে দেখ, এখানের ভাব, এখানের আদর্শের সঙ্গে তোমার কোথায়ও অসামঞ্জস্য কিম্বা অমিল হবে কিনা। ভেবে দেখবার স্বাধীনতা আমি প্রত্যেককেই দিয়েছি।

আমার স্বার্থ-সিদ্ধির দরুণ তোমাদের কর্ম্মে নিয়োজিত করিনি, তোমাদের চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হবে তাতে, তার জন্যই তোমাদের কর্ম্ম-পথ দেখিয়ে দিয়েছি। কর্ম্মের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তোমরা উন্নত হবে—দৃঢ়চিত্ত হবে! আর এখানের কর্ম্ম কাউকে আবদ্ধ করে রাখবে না, কেননা এ কর্ম্মের মাঝে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই—তোমরা সব শ্রীগুরুর নামে সমর্পণ করে দিয়েছ। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে তোমরা নিষ্কাম কর্ম্ম করছ! জীবনের উন্নতি যদি এতেও না হয়, তাহলে আর কিসে হবে? এর চেয়ে আর কোন সহজ পন্থা আছে? আমার কথা অবিচারে পালন করতে আমি কাউকে বলি না—তোমরা মনে-প্রাণে সব বুঝে দেখ। আমার আদর্শে যদি কোন ভুল থেকে থাকে, বেশ আমাকে তা দেখিয়ে দাও। আমি যদি তা সত্য বলে বুঝি, স্বীকার করে নিব। তোমাদের কাছ থেকে কি আমার পাওয়ার কিছু নাই?

সত্যলাভের পিপাসা যাদের ভিতর জেগেছে, তারা যে কোন প্রকারেই হোক্, সত্যের পিপাসা মিটিয়ে নেবেই নেবে। কিন্তু সত্যলাভ করতে হলেও—একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে, সাধনা ধরে চল্‌তে হয়। সত্যলাভ করতে হলে কোথায়ও ফাঁকি-ফক্কর থাক্‌বে না! আমি ঐকান্তিক ভাবেই চাই যে তোমাদের ভিতর সত্যের পিপাসা তীব্র হয়ে জেগে উঠুক—কিন্তু সত্যের তীব্র আবেগে এবং অনুভূতিতে যেন তোমরা অন্ধ হয়ে যেও না। সিদ্ধিলাভেরও একটা পথ রয়েছে—স্বেচ্ছাচারী হয়ে কোন দিন সত্যলাভ হয় না। শুধু আমার কথা বিশ্বাস করো না—তোমরাও ভেবে-চিন্তে দেখো।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে লোপ করে—এমন অধিকার কারও নাই। কাজেই অপরকে দায়ী করে, নিজে সাফা হয়ে যাওয়াতে কি লাভ! তোমরা স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ—এবং স্বেচ্ছায় চলেও যেতে পার! কিন্তু শুধু একটা উত্তেজনা নিয়ে যখন যা খুসী তাই করে চল্‌লে জীবনে কোন দিন উন্নতির আশা করো না। আমিও তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েই বল্‌ছি—সত্যের পথে উত্তেজনা কিংবা অভিমান বড়ই ক্ষতি করে!

দ্বন্দ্ব নিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে, যে যার অনুকূল ক্ষেত্র বেছে নাও! যারা মনে-প্রাণে কোন বল পাচ্ছ না, অবিরাম সংশয়ের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছ, তাদের এই অসময়ে জেনে শুনে আত্মহত্যা করার কি প্রয়োজন? জগতে কোথায়ও কি খুঁজলে অনুকূল ক্ষেত্র পাবে না তোমরা। আমি নিজে তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি, বল দিচ্ছি, ভরসা দিচ্ছি—তোমরা বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বেড়িয়ে পড়, দেখবে, ভগবানই তোমাদের সাহায্য কর্‌বার দরুণ ব্যাকুল হয়ে ছুটে আস্‌বেন! কিন্তু একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, "আমার মাঝে কোন ভণ্ডামী নাই!" আর বাস্তবিকই মিথ্যা প্রবঞ্চনা নিয়ে কোন কিছু লাভ হয় না।

আমি প্রত্যেকবার তোমাদের এক কথাই বলে যাই, কিন্তু তোমরা আমার কাছে আত্ম-গোপন কর! তাই শেষটায় নিজের মনের সঙ্গে আর

কিছুতেই পেরে না উঠে. আমার কাছে বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় দিয়ে লজ্জিত হয়ে তোমাদের চলে যেতে হয়। কিন্তু তোমরাই এর বিচার করে বল তো দেখি—এতে কি আমার প্রাণে বাজে না? তোমাদের ভালবেসেছি এটা আমার মায়া নয়—এ ভালবাসায় তোমাদের আত্ম জাগরণ হবে! তোমাদের মাঝেই এমন কেউ কেউ আছ—যারা শুদ্ধ মাত্র আমার প্রতি ভালবাসাতেই আধ্যাত্মিক পথে দিন দিন উন্নত হচ্ছ—এ কথা আমায় জানিয়েছ!

সত্যলাভের পিপাসায়, অনিবার্য্য ব্যাকুলতা নিয়ে যে যে-পথেই যাক্ না কেন, তার প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা এবং দৃষ্টি থাক্‌বেই! কেননা তোমরা সত্যলাভ করতে পারলে, আমার কথার তাৎপর্য্য আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। আর এটা ঠিক কথা যে, বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা বুঝি, তাতে আমাদের মনের সন্দেহ ঠিক ঠিক যায় না; কিন্তু নিজের অনুভূতির মাঝে সত্যকে পেলে তখন সব সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। আমার কাছে থেকে যদি সত্যের দরুণ তোমাদের প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, তাহলেই যে আশ্রিত হয়ে থাকার ঠিক ঠিক সার্থকতা হল, আমি তোমাদের দিয়ে সেই আশাই পোষণ করি! কাজেই সত্যলাভের পথে যদি তোমরা উন্নীত হও—তাহলে যে আমার আরও আনন্দের বিষয়!

কিন্তু খুব সাবধান হয়ে, কোথায়ও ভণ্ডামী না রেখে চল্‌তে হবে এ পথে! অনেক সময় অর্জ্জুনের মত, সম্মুখ যুদ্ধ দেখে আমাদের প্রাণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাক্‌বার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, কিন্তু এ তো ঠিক নয়। সাময়িক ধর্ম্ম-বোধে তো মানুষের চরিত্র গঠিত হয়ে ওঠে না! তোমাদের মাঝেই অনেকে অনেকবার উতলা হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমার উপদেশে আবার শেষে শান্ত হয়েছ। দুদিন পর তোমরাই এসে বলেছ—"বাস্তবিকই ওটা সাময়িক একটা ভাব এসেছিল।" কাজেই যা করবে, একটু ভেবে-চিন্তে করাই ভাল। (ক্রমশঃ)

গান

—*—

ওরে, তোর হবেই হবে।
জীবন দিয়ে করলি যে পণ—
সে পণ যে তোর রবেই রবে,
ওরে তোর হবেই হবে॥
সাত ঘাট সে ঘুরিয়ে এনে,
শেষে বুকে লয় সে টেনে,
এই ধারা তার বরাবরের—
বল দেখি কি ভাব্‌না তবে?
ওরে তোর হবেই হবে॥
দুঃখের মাঝেই আছিস ব'লে
সে পথ থেকে যাস্‌নি টলে
শক্ত করে ধর্‌লে তারে
সকল ব্যথাই সবেই সবে,
ওরে তোর হবেই হবে॥

—*—

উপলব্ধির শাস্ত্র

—(*)—

যিনি প্রধানও নন, ক্ষেত্রজ্ঞও নন্— দু'য়েরই সমন্বয় যাহাতে, উপনিষদে তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞপতি বলা হইয়াছে। কিম্বা গীতার পুরুষোত্তম ও বলা যাইতে পারে তাঁহাকে। কেননা পুরুষোত্তম ক্ষরও নন্—অক্ষরও নন; ক্ষর অক্ষরের মাঝে অনুস্যূত মাত্র। আশ্চর্য্য তত্ত্ব বটে—এক উপলব্ধি ছাড়া এই তত্ত্বের মীমাংসা হয় না। উপনিষদ্ সেই উপলব্ধির শাস্ত্র।

ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটী তত্ত্ব আমরা বেশ বুঝি, কিন্তু তার উপরও যে পুরুষোত্তম তত্ত্ব তা বুঝতে হলেই ধ্যানে আত্মস্থ হতে হয়—এই ছাড়া সেই তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না। উপনিষদে বলা হইয়াছে—"একজন বসিয়া বসিয়া শুধু দেখিতেছেন, আর একজন ফল ভোগ করিতেছেন।" ইহাই জীব এবং ব্রহ্মের রূপক বর্ণনা। কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্ম তো নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নন—কিম্বা শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈত নন। দ্বৈতাদ্বৈতের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে উপনিষদে। ঋষি আত্মানুভবে গদগদ হইয়া কখনো বা ব্রহ্মকে বিবিক্ত সত্তারূপে দেখিয়াছেন, কখনও বা জীবে জীবে সেই সত্তাকে অনুস্যূত দেখিয়াছেন—এমন করিয়া অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া ঋষি কেবল তাঁহার বিস্ময়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মকে ঋষি নির্ব্বিশেষও বলেন না, আবার সবিশেষও বলেন না। কিন্তু এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলনই ব্রহ্ম! এই ব্রহ্মকে বুঝিতে তাহাদের একটুকুও মতিভ্রম হয় নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি সংস্কারদোষে দুষ্ট ছিল না। পৃথক পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ দৃষ্টিতে না দেখিলেও, তাঁহাদের সংশ্লেষণে কোন ভুল ছিল না।

বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধির তৃপ্তি হয়—কিন্তু ব্রহ্ম বুদ্ধি হৃদয় উভয়কে তৃপ্ত করিয়া তবে ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে মানুষ যখন বুঝে, তখন তাহার বুদ্ধি হৃদয় উভয়ই আপ্যায়িত হয়! ব্রহ্ম হইলেন বিরাট্—সমগ্র। অংশে তাহার ব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু অংশেই তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ নয়। কাজেই দ্বৈতে-অদ্বৈতে মিলে তবে হলেন ব্রহ্ম। তিনি নিছক দ্বৈতও নন—আবার অদ্বৈতও নন! কথাটা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্ম বিচার শক্তির প্রয়োজন হয় না, সংশ্লেষণ দৃষ্টি থাকা চাই তবেই হইল। ব্রহ্মকে বুঝিতে হইলে ব্রহ্মের মত বিরাট উদার দৃষ্টি থাকা চাই: ব্রহ্ম অংশকেও স্বীকার করিয়াছেন, আবার পূর্ণকেও স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মের কাছে কাহারও প্রত্যাখ্যান নাই!

এক কথায় বলিতে গেলে, দ্বৈতা-দ্বৈতের মোহ কাটাইয়া উঠিতে হইবে, অথচ দ্বৈতাদ্বৈতের বোধ লোপ পাইবে না, তাহা হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞান খাঁটী হইল! "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—এই বাণীতে সাধারণতঃ অনেকের মনেই ভ্রম ধারণা উৎপন্ন হয়। তাহারা জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়েন, কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানীর তো কোথায়ও উপেক্ষা নাই, কাজেই জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকাটা তো ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবন অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের জীবন। তাহার ভিতর তিনি সামঞ্জস্যকে—ব্রহ্মকে পাইয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বৈতাদ্বৈতের লীলানন্দে বিভোর—আত্মহারা। ভাষায় সেই আনন্দের কণাও প্রকাশ করা যায় না। ভাষায় যা প্রকাশিত হয় তাহা

অসম্পূর্ণ—অসমাপ্ত, তাই প্রথম এক কথা বলিয়াই, আবার তাহার উল্টো কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি তাহা মুখে বলিয়া বুঝানো যায় না, কিম্বা মুখে যাহা বলা হয় তাহা ভুল। ব্যষ্টি বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে আমরা অংশতঃ জানি, কিন্তু তাহা সম্যক অনুভব বা উপলব্ধি নয়। কাজেই দ্ধি মরিয়া না গেলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় না। কথাটা শুনিতে বেখাপ্পা লাগে বটে, কিন্তু অনুভবের দিক দিয়া কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া যায় না তাহার মাঝে। আমাদের ক্ষুদ্র অভিমান নিয়া আমরা বলি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, কিন্তু আসলে ব্রহ্ম যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন।

উপনিষদের বাণীগুলি সংশ্লেষণ দৃষ্টির ফল। কাজেই তাহা বুঝিতে হইলে অগ্র্যা বুদ্ধির চেয়ে গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন। অনেক সময় যুক্তি বিচার করিয়া যাহা বুঝা না যায়, ধ্যানে ক্ষণেকের দরুণ স্তব্ধ হইতে পারিলে তাহার চেয়ে বেশ সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। উপনিষদ উপলব্ধির শাস্ত্র; ইহা নিয়া তর্ক বিচার করিলে কোন ফল হইবে না, এক একটি বাণীর যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ধ্যানতন্ময়তায় ডুবিয়া যাইতে হইবে। তর্ক বিচারের শাস্ত্র আলাদা! উপনিষদ—উপনিষদই ইহার মাঝে অনন্ত রহস্য বর্ত্তমান, কাজেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে রহস্য-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হইবে।

বুঝিতে হইলে, তাহার প্রধান উপায়ই হইল ধ্যান—কিন্তু ধ্যান না করিয়া তর্ক করিয়াই আমরা রাত দিন কাটাইয়া দিই! কাজেই গভীর ভাবে অর্থানুসন্ধান করিবার সময় এবং সুযোগই পাইনা আমরা। উপলব্ধির শাস্ত্র নিয়া তর্কা-তর্কি চলেনা, অনুভবের জিনিস হৃদয় দিয়া অনুভবই করিতে হয়।

—*—

আরণ্যক

—*—

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।

—ঋগ্বেদ সংহিত ৩।৪।২

ভাল হতে চাই, পারি না কেন? এই কান্নাটাই চারিদিক থেকে শুনতে পাই। মানুষ যা চেয়েছে, তা যে কখনো পায়নি, এ কথা আমি আদপেই বিশ্বাস করি না। চাওয়ারও ফিকির জানতে হয়। শুধু চাই বললেই কি চাওয়া হয়? সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যা চেয়েছ, তা পাওনি, এ হতেই পারে না।

* * *

ইচ্ছা হতে এ জগতের বিকাশ, স্থিতি। আমি মানুষ, ক্ষুদ্র হই, তুচ্ছ হই তবুও আমার ইচ্ছার একটা মূল্য আছে; সমস্ত প্রাণকে উদ্যত করে যখন বিশ্বরাজের দরবারে আমার চাওয়ার পরোয়ানা দাখিল করি, তখনই তাকে করি ঋণী; সে ঋণ শোধ না করে তো আর উপায় নাই। এক উপায়ে না এক উপায়ে সত্ত সত্ত ঋণ শোধ তাঁকে করতেই হয়। আমার ইচ্ছার যে তরঙ্গটুকু আজ

জগতের এই প্রান্তে উঠল, বিশ্বের সীমা পর্য্যন্ত তা আন্দোলিত করবে এবং তারই প্রতিঘাত ফিরে আসবে আমার বুকে। এই শেষের কথাটাই বুঝতে পারি না বলে চেয়েও পাইনি বলে মিথ্যা কলরব করে মরি। ঋণ শোধ হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কি দিয়ে যে, তা বুঝতে পারি না সব সময়। বিধাতার হিসাবে ভুল ধরতে চাই, কিন্তু গোল যে আমার খাতায়, সেটা খেয়ালেই আসে না।

* * *

বিশ্বাসহীনের ইচ্ছার মাঝে দুর্ব্বলতা রয়েছে। চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হতে থাকে—না, একি কখনো পাব? তার প্রার্থনার মাঝে জোর নাই—কাজেই প্রার্থনীয় বিষয়ও পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না। না পেয়ে সে নিরাশ হয়ে তখন বলতে থাকে—"না, চেয়েও তো দেখেছি, যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না। আত্ম-বিশ্বাসী কিন্তু ঠিক এর উল্টো কথাটাই জোর গলায় বলেন—যা চাইব, তা পাবই। কাজেই অভীষ্ট-সিদ্ধি সবল ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে।

* * *

ভাল হতে চেয়েছ দিনের মাঝে ক'বার? নিজের সুযোগ-সুবিধা মত কি? অপকর্ম্মের বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে যখন, তখন শুধু?—চাওয়ার মাঝে শিথিলতা যদি না থাকে, তো পাওয়ার ন্যূনতা ঘটতেই পারে না।

* * *

আমাদের মন একান্তই মূঢ়! জ্বরে অবসন্ন রোগীর মত হঠাৎ "জল জল" বলে চেঁচিয়ে উঠেই তারপর নির্জ্জীব হয়ে পড়ি. তৃষ্ণা যে পেয়েছিল, এখনও যে পেয়েই আছে, সে কথাটা আর ধরে রাখতে পারি না, তাই জলের পাত্র ঠোঁটের কাছে এসে আবার চলে যায়. কিন্তু আমাদের তৃষ্ণা আর মিটে না।

* * *

পাতঞ্জল দর্শন তাই বলছে—তীব্র সংবেগ থাকা চাই এবং তা বেশ স্থায়ী হওয়া চাই। যাদের শিথিলতাতে সর্ব্বঅঙ্গ জর্জ্জরিত, তারা জীবনে কোন কিছুই লাভ করতে সক্ষম হয় না। ইচ্ছার বেগকে তারা বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না, একটুক্ষণ পরেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনের গতি তখন তাদের অন্যদিকে ফিরে যায়।

* * *

আত্যন্তিক ব্যাকুলতা আসা চাই—কিছুতেই যেন তার নির্ব্বাণ না হয়। আর যদি নিভেই যায়, তাহলে যেন প্রাণে শান্তি এনে তারপর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়! তার আগে বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরাও ভাল। একটা জীবন না হয় অভাবের জ্বালায়, অতৃপ্তির বেদনাতেই কেটে গেল, আরও তো কত জীবন পড়ে রয়েছে। সত্যিভাবে যা করব, যা ভাবব তার ফল তো নষ্ট হবে না। অসমাপ্ত সাধনার বেগই আবার নূতন বল এনে দিবে প্রাণে। আবার ব্যাকুলতা নিয়ে ইষ্ট-সিদ্ধির পথে ছুটব।

* * *

ঔৎসুক্য হয়ে মাঝ পথেই বসে থাকতে নাই। মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পতন। সাধক যারা, তারা যেন এ বাণী কিছুতেই না ভুলেন। ভুলিয়ে পথভ্রষ্ট করে দিতে অনেকেই আসবে—কিন্তু সাধকের ভ্রূক্ষেপহীন দৃষ্টি নিয়েই চলতে হবে। লক্ষ্য ছাড়া তার ধ্যানে আর কিছুই যেন প্রতিভাত না হয়। তন্ময় না হলে ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না।

* * *

মানুষ ইচ্ছা করেই মরণের পথে পা বাড়ায়। পারিপার্শ্বিকের শোচনীয় পরিণাম দেখেও মনকে মানুষ সামাল দিতে চেষ্টা করে না। দুরন্ত মনকে সামাল দিতে খুবই বেগ পেতে হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাকে সংযত করা মানুষের

সাধ্যাতীত নয়। মন বেগবান্—কিন্তু বলবান্ নয়; বজ্রদৃঢ় ইচ্ছা তার ওপর অনায়াসে কর্ত্তৃত্ব করতে পারে।

* * *

শাস্ত্র আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞাপক নহে, কেবল আত্মার উপর আরোপিত যে ভ্রান্ত সংস্কার তাকেই ক্রমশঃ বিনাশ করে। শাস্ত্র পড়ে আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানা যায় না। শাস্ত্রাভ্যাসে কতকগুলি উচ্চ চিন্তা ধারণ করবার ক্ষমতা জন্মে মস্তিষ্কে। শাস্ত্র চিত্ত-শুদ্ধিরই একটা উপায় মাত্র। নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত সবলও হয়। কাজেই শাস্ত্র পুরাণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; কিন্তু ইহা ছাড়াও আত্মাকে জানবার দরুণ, ভগবানকে পাবার দরুণ আলাদা ব্যাকুলতা থাকা চাই।

* * *

আধার সমগুণ বিশিষ্ট না হলে, ভাবের ঠিক ঠিক বিনিময় হয় না। এইজন্যই ভাব করতে হলে বা ভালবাসতে হলে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখার প্রয়োজন। ভালবাসায় মানুষকে উন্নতও করে, আবার ভালবেসে মানুষের পতনও হয়। যেখানে পতন হয়, সেখানেই পরস্পরের মাঝে কাহারও ভিতর স্বার্থসিদ্ধির নিদারুণ লিপ্সা রয়েছে। কাজেই ভাবে অভাবে ঠিক ঠিক মিলন হয় না। মিলন হয় সমানে সমানে।

* * *

সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের দৃষ্টি অন্তরের মানুষকে জাগাইয়া তুলে। আত্ম-বোধে দুর্ব্বল মানুষও তখন তেজস্বী হইয়া ওঠে! সত্য-দৃষ্টির অমোঘ শক্তি।

* * *

প্রত্যেকের মাঝে সত্য দর্শন করিব এইরূপ একটা শুভ ইচ্ছার উন্মেষ হওয়া চাই। এই অভ্যাসের ফলে, মানুষের মন্দের দিকটা আপনি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, আর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে তাহারই উজ্জ্বলরূপ—অর্থাৎ যেখানে সে সাচ্চা মানুষ।

* * *

মানুষের ভিতর মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলেই—প্রকৃত সাহায্য করা হইল। আমরা মানুষকে অনেক ভাবেই সাহায্য করি—কিন্তু সেই সাহায্যে কোন ফল হয় না। মানুষের ভিতর মানুষ জাগিয়া না উঠিলে, তাহার অভাব কিছুতেই মিটিবে না। আত্ম-বিশ্বাসে অচল অটল থাকিয়া অপরের মাঝেও সেই বিশ্বাসের জন্ম দিতে হবে।

* * *

—*—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভক্তসম্মিলনীর বিবরণী মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। মাঘ-সংখ্যা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হইবে।



২৩শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

মাঘ---১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৫০ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রার্থনার মন্ত্র

—*—

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্। আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধামি। ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তা-মবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হৌক, এবং আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হৌক! অর্থাৎ মনে বচনে যেন আমি সত্য হই। বাক্-সংযম দ্বারা মনকে স্থির করিয়া তাহার পর যেন যাহা কিছু বলিবার বলি। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম! তুমি আমার সমক্ষে আবির্ভূত হও। তোমরা (বাক্য ও মন) আমার নিকট

বেদকে অর্থাৎ বেদার্থকে প্রকাশ কর। গুরুমুখ হইতে শ্রুত বিদ্যা যেন আমায় পরিত্যাগ না করে। আমি যেন দিবা-রাত্র অধ্যয়ন করিয়াই কাটাইয়া দিতে পারি। আমি ঋতবাক্য বলিব। আমি সত্যবাক্য বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, বেদোপদেষ্টা গুরুকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন!

দিবসের প্রথমেই, কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই—এই শুভ প্রার্থনায় মনকে পবিত্র—উদ্বুদ্ধ করিয়া লইতে হয়! প্রার্থনার মন্ত্র দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ করিয়া লইলে, দিবসের বিচিত্র-কাজের মাঝেও আপন লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি ঘটে না। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দিনই চিত্তকে প্রার্থনার মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া লইতে হয়।

বাক্যে-মনে আমরা এক হই না। অনেক ভণ্ডামী থাকে তাহার মাঝে। মনে যাহা ভাবি, মুখে তাহা প্রকাশ করি না, কিম্বা মুখে যাহা প্রকাশ করি, মনে মনে তাহা আদৌ ভাবি না। মিথ্যা-প্রবঞ্চনা দ্বারা আমরা আবেষ্টিত হইয়া থাকি। কিন্তু দিবসের প্রথমেই মন হইতে সমস্ত মিথ্যা, কালিমা ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিতে হয়। মনে মনে যাহা ভাবি, তাহা যেন বাহিরের বাক্যেও প্রকাশ করিতে দ্বিধা না করি, তাহার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাক্য আর মনে কোন কৃত্রিমতা যেন না থাকে। যাহা ভাবিব—তাহাই বাক্যে প্রকাশ করিব। এই সরলতায় বাক্য-মন উভয়ই ক্রমশঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অভ্যাসের ফলে কখনো মিথ্যা কথা মুখ হইতে বাহির হইবে না। তখন যাহা বলিব, তাহাই সত্য হইবে—সত্য ভাবনার আশ্চর্য্য শক্তি। সত্য সম্মুখে আবির্ভূত না হইলে মনের সন্দেহ ঠিক ঠিক মিটে না—তাহাই দরুণ দ্বিতীয় মন্ত্রেই বলা হইতেছে—**"আবিরাবীর্ম এধি।"** হে সত্যস্বরূপ, তুমি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হও! বাক্য এবং মন দ্বারা তো তোমাকে পাইয়াছিই—এখন তুমি প্রত্যক্ষরূপে আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হও। অনুভবের মাঝে পাইয়াছি, এখন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই! সত্যের প্রত্যক্ষরূপ দর্শনে মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়!

তার পর মন্ত্রেই রহিয়াছে—**"বেদস্য ম আনীস্থঃ।"** বাক্য এবং মন উভয়কেই বলা হইতেছে যে, বেদের গভীর সত্য আমাদের নিকট প্রকাশ কর। কেননা বেদকে অর্থাৎ বেদার্থকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে পারে—একমাত্র বাক্য আর

মনই। কেবল স্বাধ্যায় করিয়া গেলেই হয় না, মনে মনে চিন্তা করাও প্রয়োজন, তাহা না হইলে বেদের গভীর অর্থ প্রকাশিত হইবে কেমন করিয়া। কাজেই বাক্য এবং মন উভয়ের নিকটই প্রার্থনা করা হইতেছে।

"শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ"—গুরু মুখ হইতে শ্রুত বিদ্যা যেন আমায় পরিত্যাগ না করে অর্থাৎ আমি যেন সেই বিদ্যাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি। গুরুমুখ হইতে কেবল শুনিলেই বিদ্যা আয়ত্ত হয় না, তাহাকে বারবার আলোচনা করিতে হয়। এই জন্যই স্বাধ্যায়ের প্রবর্ত্তন। গুরুমুখ হইতে শুনিয়া আসিয়া আবার নিজের মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে হয়। এর পরের শ্লোকেই বলা হইতেছে, আমি গুরু মুখ শ্রুত বিদ্যা আয়ত্ত রাখিবার দরুণ প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

"অনেনাঽধীতেনাঽহোরাত্রান্ সন্দধামি"—এই অধ্যয়নের দ্বারা দিবা ও রাত্রিকে আমি সুসংযুক্ত করিব, অর্থাৎ দিবা-রাত্র অবিচ্ছেদে আমি অধ্যয়ন করিব। ছাত্র মাত্রেই এই দৃঢ়পণ থাকা চাই! যাহা শুনিব, তাহা আয়ত্ত করিবার দরুণ এমন করিয়াই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে হইবে। আর ছাত্রজীবন মাত্রেই তপস্যার জীবন। কঠোর তপস্যাতে উত্তীর্ণ না হইলে, ছাত্র-জীবন সার্থক হয় না! মনের শিথীলতা নিয়া, কোন কাজ হয় না; এই জন্যই ছাত্রদের একটা প্রতিজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। নিত্য নিয়মিত ভাবে তাহা প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। নিত্য অভ্যাসের ফলে সময়ে আপনি বেদার্থ প্রকাশিত হইবে। স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেও প্রকাশিত হইবার যথাযোগ্য ক্ষেত্র দেওয়া চাই—ইহার জন্যই নিত্য নিয়মিত ভাবে সাধনার প্রয়োজন। বাক্য-মন সকলের ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতে পারেন, কাজেই নিত্য অভ্যাস এবং সাধনা দ্বারা বাক্য-মনের সংস্কৃতি করিয়া লইতে হয়। বেদের নিগূঢ় অর্থ একদিনে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব, সেই জন্যই রোজ রোজ স্বাধ্যায় করিতে হয়। এই বাক্য দ্বারা ছাত্রদের সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে। কেননা অনভ্যাসের ফলে অনেকেই গুরু মুখ হইতে শ্রুত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়। নিত্য সাধনার প্রতি এই জন্যই এত জোর দেওয়া। হঠাৎ একদিন কিছু করিলেই কোন কাজ হয় না—নিয়মিত সাধনা করা চাই! তারপর ছাত্রদের আরও কত পণ থাকা চাই।

"ঋতং বদিষ্যামি"—আমি ঋত বাক্য বলিব। চিন্তার মাঝেও সত্যতা থাকা চাই। সত্য-চিন্তা না করিলে, হৃদয় পবিত্র হয় না, কাজেই সত্যেরও স্ফুরণ হয় না। অজস্র বাজে চিন্তার খাতেই আমাদের চিত্ত নদী প্রবাহিত হয়, কিন্তু সংযম এবং সাধনার দ্বারা তাহার মোর ফিরাইতে হইবে। চিন্তারও সংযম প্রয়োজন, আবোল-তাবোল কিছু না ভাবিয়া, নির্দ্দিষ্ট কয়টী ভাবনায় দিনটীকে অতিবাহিত করিতে হইবে। আর সেই ভাবনার মাঝে কোন অসত্যের স্থান থাকিবে না! সত্য চিন্তায় এমন করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইতে পারিলেই, বাহিরেও সত্য-বাক্য ছাড়া মুখ দিয়া আর কিছুই বাহির হইবে না। কাজেই মন আর বাক্য তখন এক হইবে।

সত্য-চিন্তা নিয়া দিন অতিবাহিত করিব—প্রাণ গেলেও মিথ্যা-চিন্তা করিব না; এইরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্প থাকা চাই। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিলে যাহা বলা যাইবে, তাহাই সত্যরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে! সত্য ভাবনার আশ্চর্য্য ফল! তখন যাহা ভাবা যায়, তাহাই স্থূলেও সত্যরূপে ফুটিয়া উঠে। আমাদের বাক্যে এবং চিন্তায় সত্যতা থাকে না বলিয়াই, যাহা ভাবি, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার উল্টো একটা কিছু ঘটিয়া বসে। তখন নিজের চিন্তা-ভাবনার প্রতি একটা অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই অবিশ্বাসের মূল কোথায়, কোথা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, তাহা ভাবিতে গেলেই, মনের মাঝে আমাদের যে ভণ্ডামী রহিয়াছে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। তাহা না হইলে সত্য-ভাবনার ফলে, সত্য কার্য্যেও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। মনে-মুখে যদি ঐক্যই না থাকিল, তাহা হইলে বাক্যের দৃঢ়তা হইবে কেমন করিয়া!

দিবসের প্রারম্ভেই কতকগুলি প্রতিজ্ঞা নিয়া তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হয়। আর সেই প্রতিজ্ঞাগুলি চিন্তা দ্বারা অবিরাম জাগ্রত করিয়া রাখিতে হইবে। যাহা ভাবিব, তাহা সত্যই ভাবিব—এই পণ থাকিলে চিন্তায় স্বাভাবিকই একটা সংযম আসিয়া পড়িবে। সাত-পাঁচ না ভাবিয়া, চিত্ত ক্রমশঃই সত্য-ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ভাবেই জীবন সত্যের পথে উন্নীত হইবে।

শুধু মনে মনে সত্য-চিন্তা করিলেই চলিবে না—বাক্য প্রকাশ করিবার সময়ও যথার্থ অর্থাৎ সত্য-বাক্য বলিতে হইবে।

"সত্যং বদিষ্যামি"—অর্থাৎ মুখে যাহা বলিব, তাহাও সত্য হইবে। ইহা অবশ্য কোন কঠিন কাজ নয়, কেননা সত্য-ভাবনা করিতে শিখিলে, মুখ

হইতে কখনো অসত্য কথা বাহির হইবে না। আসলে সত্য-ভাবনার উপরই, সত্য-বাক্যের নির্ভরতা! চিন্তা পরিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাক্যকেও বিশুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে! অনেক সময় মুখে কিছু বলিতে গেলেই, আনুসঙ্গিক অনেক মিথ্যা আসিয়া তাহার সঙ্গে জড়িত হয়, কাজেই বাক্য প্রকাশের বেলাতেও খুব সাবধান থাকিতে হইবে!

শেষ প্রার্থনার মন্ত্রটী বড়ই সুন্দর, আচার্য্য-শিষ্যে হইল পিতা-পুত্রের ন্যায় সম্বন্ধ। কাজেই শিষ্য অন্যান্য প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছে—"তন্-মামবতু, তদ্‌বক্তারমবতু॥ অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥" সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। সেই ব্রহ্ম বেদোপদেষ্টা গুরুকেও রক্ষা করুন! শিষ্যের কি সুন্দর অমায়িক সরল প্রার্থনা! গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস না থাকিলে, বেদার্থ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্যই বলে, গুরু-বেবান্ত-বাক্যে বিশ্বাস থাকা চাই! গুরুর প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে, গুরু যাহা বলিবেন, তাহারও তো কোন ফল হইবে না। কাজেই গুরু-বাক্য বুঝিতে হইলে, শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ এবং সংযতেন্দ্রিয় হওয়া খুবই প্রয়োজন! প্রথম কথাই হইল শ্রদ্ধা থাকা চাই। গীতাতেও আছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" জ্ঞান-লাভের প্রথম অধিকারীই হইল—শ্রদ্ধাবান্। এই দুর্ল্লভ শ্রদ্ধা জিনিষটিই নচিকেতার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই জন্যই নচিকেতা যথার্থ সত্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন! শিষ্য যদি আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন না হয়, গুরুর প্রতি যদি অগাধ বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে কোন কিছুই লাভের আশা নাই!

শ্রদ্ধা আশ্চর্য্য জিনিসই বটে, একমাত্র শ্রদ্ধা দ্বারা সব লাভ হইতে পারে! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শেষ পর্য্যন্ত এই শ্রদ্ধার উপদেশই দিলেন! অর্জ্জুন যখন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন, অর্থাৎ গুরুবাক্যে আস্থা স্থাপন হইল তাঁহার, তখনই তাঁহার ভিতর সত্য-ধর্ম্মের বিকাশ হইল! পূর্ব্বের কাপুরুষের মত দুর্ব্বলতা কোথায় তখন অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরস্পরের শ্রদ্ধার ভিতর দিয়াই আশ্চর্য্যরূপে শক্তি-সঞ্চার হয়। গুরু-শিষ্যের মহিমা এই শ্রদ্ধার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আর এই শ্রদ্ধার ফলে, অজ্ঞাতে আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চারিত হইয়া যায়। শুধু গুরুর মহিমা কেন, শিষ্যেরও যথার্থ গুরু-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তখন! এই শক্তি-সঞ্চার প্রণালী আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। গুরু-বাদের ভিত্তি এই শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়াই। শ্রদ্ধা গেলে সবই গেল। অথচ এই শ্রদ্ধাই

যখন আবির্ভূত হয়, তখন আশ্চর্য্যরূপে শক্তির ক্রিয়া হইতে থাকে! শ্রদ্ধা কেন উৎপন্ন হয়, তাহার কোন উত্তর নাই—শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কঠোপনিষদেও দেখা যায়, নচিকেতার হৃদয়ে এইভাবে—"**শ্রদ্ধাবিবেশ।**" শ্রদ্ধা বয়সের অপেক্ষা করে না, নচিকেতা অল্প-বয়স্কই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সেই দুর্লভ শ্রদ্ধারই আবির্ভাব হইয়াছিল! এই শ্রদ্ধাতে, আস্তিক্যবুদ্ধিতে আশ্চর্য্য শক্তির ক্রিয়া না হইয়া পারে না। তখন গুরু-শিষ্য উভয়ই উভয়ের মহিমায়—শক্তিতে স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া যায়।

বিশ্বাসের কোন বিধি নাই—নিয়ম নাই, বিশ্বাস একবার হৃদয়ে জন্মিতে পারিলেই হইল, তারপর জীবনে তাহার আশ্চর্য্য শক্তি বিকাশিত হইতে থাকে! গুরু-শিষ্য উভয়ের শ্রদ্ধা সম্মিলিত হইয়াই এই আশ্চর্য্য শক্তির সঞ্চার হয়! শুধু শিষ্য কেন, গুরুও তাহার মহিমায় মুগ্ধ-বিস্মিত না হইয়া পারেন না! হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ হইলে কি এক মহান্ শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য এবং গুরুকে দেখিলেই বোঝা যায়। শ্রদ্ধার ভিতর দিয়াই গুরু-শিষ্যের আদান-প্রদান, উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু আসলে যদি শ্রদ্ধাই না থাকে, তাহা হইলে গুরুর নিকট শ্রুত-বিদ্যার কোন নিগূঢ় রহস্যই বোঝা সম্ভবপর হইবে না। বেদ গুরু ছাড়া অন্যেও পড়াইতে পারে, কিন্তু সেই পড়াতে শিষ্যের হৃদয়ে সেই দুর্লভ শক্তির সঞ্চার হয় না। অর্থাৎ চিত্ত যদি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে বেদের নিগূঢ় অর্থ কখনো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে না! শ্রদ্ধায় আশ্চর্য্য জিনিষের বিকাশ হয়। পরস্পরের শ্রদ্ধায় যে জিনিষ উৎপন্ন হয়, তাহার নিকট বাহিরের উপলক্ষ অতীব তুচ্ছ হইয়া যায় তখন। আর দুর্লভ শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে না পারিলে—উপলক্ষ্যটাই বড় হইয়া উঠে!

শান্তি-পাঠের এই শেষ কয়টী লাইনে, গুরু-শিষ্যের কিরূপ অমায়িক ভাব থাকা উচিত তাহাই দেখানো হইয়াছে। শিষ্য যদি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া এই কৃতজ্ঞতাটুকু গুরুর নিকট স্বীকার না করে কিম্বা না দেখায়, তাহা হইলে গুরু-শিষ্যের এই মহান্ সম্পর্কের পবিত্র মাধুর্য্যই যে থাকিল না। ব্রহ্ম-বিদ্যা অর্জ্জনের বেলায় গুরু শিষ্য উভয়ই উভয়ের দরুণ প্রার্থনা করা উচিত! এই প্রার্থনার মন্ত্রে পরস্পর উভয়ের মাঝেই শক্তি-সঞ্চার হয়। আচার্য্য-শিষ্যের ইহাই সহজ-সরল সম্বন্ধ।

—*—

আত্ম-মুক্তির পথ

—(*)—

দল বাঁধিয়া, আড়ম্বর করিয়া জীবনটাকে কাটাইয়া দেওয়াটাই অনেকের কাছে গৌরবের বিষয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিগত ভাবে কাহার জীবনের কতটুকু উন্নতি হইল তাহার দিকে বড় কেহ তলাইয়া দেখিতেই চায়না। এইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, হয়ত সম্প্রদায় বা লোকের সংখ্যা আশাতীত ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তালাস করিয়া মানুষের মত মানুষ একটীও পাওয়া যায় না। মানুষের মোহের অন্ত নাই। মানুষ মানুষকে উন্নত হইতে সাহায্য করিতে ভয় পায়, বাধা প্রদান করে; কেননা তাহা হইলে যে নূতন একটা উপদ্রব সৃষ্টি হইবে। যাহাদের ভিতর সত্যের আলোক স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা কাহারও কথায়, কাহারও ভীতি-সূচক উপদেশে না ভুলিয়া আকুল হইয়াই সত্যের পানে ছুটিয়া চলে। আশে-পাশের মানুষ তখন বলিতে থাকে, "আঃ, কি ভাল ছেলেটী ছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীবনটাকে পণ্ড করিতে চলিয়াছে।" তাহাদের এই কথাগুলির মাঝে কিন্তু সত্য-দৃষ্টির বা সত্যিকার দরদের একটুও চিহ্ন নাই—তাহাদের আক্ষেপ এই জন্য, কি জানি সে আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক ঝিঁমুণীর ব্যাঘাত ঘটায়! আশ্চর্য্য মানুষের মোহ।

আড়ষ্টভাবে জীবনটাকে কাটাইয়া দেওয়াতে যে কি সুখ তাহা তাহারাই জানে। কাহারও কাহারও জীবনে সত্য তমের আকার ধারণ করিয়াই আসে, তাহারা তাহাতেই বেশ সন্তুষ্ট—কিন্তু সকলের জীবন তো আর এক রকম নয়। অনেকের জীবনে এই সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কি করিবে, কোন পথে গেলে জীবনে শাশ্বত শান্তি আসিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেই তাহারা অমন ব্যাকুল হইয়া ওঠে! জীবনের অফুরন্ত ব্যাকুলতা তখন অজস্র পথে সত্যকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। বাহির হইতে বিচার করিলে তাহাদের এই চঞ্চলতাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট-ভাব বলিয়া অবজ্ঞা করা যায়, কিন্তু অনেকের জীবনের এই চঞ্চলতার মূল-রহস্য অতীব নিগূঢ়। তাহাদের এই চঞ্চলতার মূলে আত্মানুসন্ধানের তীব্র ব্যাকুলতা থাকে। পথ পায় না বলিয়াই তাহারা ইতস্ততঃ এদিক-ওদিক সব দিক হাতড়াইয়া বেড়ায়। আসলে তাহাদের প্রাণে ঐকান্তিক ভাবেই একটা কিছু চায়।

কিন্তু মানুষ মানুষের এই বাহিরের দিকটা নিয়াই বেশী বিচার করে, এবং তদনুযায়ী রায় প্রকাশ করে। আসলে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার মত অন্তর্দৃষ্টি মানুষের নাই। দরদী হইয়া সবার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারিলে এত সমালোচনা না হইয়া মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনার ভাগটাই বেশী হইত। আসলে কাহার প্রাণে কি চায়, কি জন্য তাহাদের ভিতর এইরূপ অনিবার্য্য ব্যাকুলতা আসে—সেই সম্বন্ধে সুগভীর ভাবে চিন্তা না করিয়া, কেন সে আর দশজনের মত জীবনটাকে থাপে থাপে মিলাইয়া চলিতে পারিল না ইহাই হয় সমালোচনার বিষয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মানুষ মানুষের নিরর্থক ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেনা। অন্তরের ব্যাকুলতায় অন্তর্দেবতাই তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাহার বুদ্ধি তখন অনুকূল পথেই তাহাকে সাহায্য করিয়া সত্য-লাভ করাইয়া দেয়। কাজেই উদ্‌ভ্রান্তের মত, অস্বস্তি লইয়া, বেদনা লইয়াও যাহারা সত্যের পানে ছুটিয়া

চলে, তাহাদের জীবন একদিন না একদিন সাফল্য-মণ্ডিত না হইয়া থাকিতেই পারে না ; বরঞ্চ আত্ম-চেষ্টায় আত্ম-সাক্ষ্যাকারের মহিমা আরও বেশী। মানুষ যেখানে দুর্ব্বল সেইখানেই তাহাকে অপরের সাহায্য লইতে হয়।

আত্ম-সমর্পণ সম্বন্ধে মস্তবড় একটা ভুল ধারণা নিয়াও অনেকে বেশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, "সমর্পিত-জীবনে আবার সাধনা কি, আমরা প্রভুর নির্দ্দেশেই চলি—আমরা যন্ত্র মাত্র।" কিন্তু সাধনার প্রতি অমন যুক্তিহীন ঔদাসীন্য যে তমগুণ প্রসূতই নয়, তাহাই বা কে জানে। কামনা বাসনার হাত হইতে নিস্তার না পাইয়াও, আত্ম-সমর্পণের বড়াই করিয়া কত মানুষ যে দিন দিন এমন করিয়া আত্ম-ঘাতী হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আর স্বাধীনভাবে মন-বুদ্ধি ইহাদের খাটাইতে গেলেই নানাদিক হইতে সংশয় সমস্যা উপস্থিত না হইয়াই পারে না। মানুষ হইবার পথে মানুষকে এমন অনেক সমস্যায়ই পাড়তে হয়। কাজেই জীবন একভাবে কিছুতেই কাটিতে পারে না।

নিজের ভিতর হইতে আশ্বাস না পাওয়া পর্য্যন্ত পরের কথায় ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকাতে কোন লাভ নাই। অনেক ক্ষেত্রে নিজেরই কোন না কোন দিক্‌কার দুর্ব্বলতার দরুণ অপরের সঙ্গে রফা করিয়া চলিতে হয়, কিন্তু একবার কোনমতে যদি সত্যলাভের পিপাসা জাগিয়া উঠে, তখন আর মানুষ নিজের আত্মার বাণী ছাড়া, অপরের কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না। আর সাধারণতঃ নিজেদের জীবনেও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, নিজের ভিতর হইতে সমস্যার সমাধান না হইলে, হাজার উপদেশেও কিছু আসে যায় না। নিজের আত্মা ঘুমাইয়া থাকে বলিয়াই, অপরের নিকট হইতে যাহা শুনি, তাহাকেই চরম মনে করি, কিম্বা ইষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া ধরিয়া নিই। কিন্তু আত্মা-জাগ্রত হইয়া উঠিলে সব আবার বিপর্য্যয়ও হইয়া যায়। অর্থাৎ আমার কিসে হিত হইবে তাহা আমি ছাড়া অর্থাৎ আমার আত্মা ছাড়া আর কে ভাল জানে বা ভাল বুঝে। এই জন্যই ঋষিদের সার্ব্বভৌম উপদেশই হইল—"আত্মানং বিদ্ধি।" নিজকে জানিতে না পারিলে মানুষের কোন দিন তৃপ্তি আসিবে না। নিজকে জানার সঙ্কেত নিজের মাঝেই রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ এই সত্য কথাটা এত সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়াই অপরের কাছে ছুটিয়া যায়—তাহাদের অভিজ্ঞতার কথা, তাহাদের অনুভবের কথা জানিতে। অপরের কথা শুনিয়া যখন নিজের ভিতরে বিশ্বাস জন্মিতে থাকে, এবং মনটা ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইয়া আসে, তখন নিজের মাঝেই নিজে তলাইয়া গিয়া সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হয়। সত্য-দর্শনের আর কোন উপায় নাই।

নিজকে আমরা খুব কম বিশ্বাস করি বলিয়াই অপরের শাস্ত্রনা, অপরের কৃপার প্রতি আমাদের কাতর-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু এই কৃপার দরুণ আমরা যত ব্যাকুল হইয়া উঠি, সেই ব্যাকুলতা যদি আত্ম-বিশ্বাস অর্জ্জনের দরুণ হইত তাহা হইলে বোধ হয় আত্মোন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হইতে পারিতাম। সব জায়গাতে কেবল সহজ-পন্থা আবিষ্কারের দরুণ আমাদের নিদারুণ চেষ্টা।

ভগবন্নির্ভরতা, বা গুরুর উপর নির্ভরতা আসিলে সাধকের জীবন আমূল রূপান্তরিত হইয়া যায়! খাঁটী নির্ভরতায় মানুষের মন-প্রাণ উৎসাহ-উদ্যমের দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া ওঠে! নিজের প্রাণে অফুরন্ত শক্তি জাগে তখন- কৃপার যথার্থ তাৎপর্য্য তখনই বুঝা যায়। সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইতে না পারিলে, নির্ভর আসিতেই পারে না। বরঞ্চ অবিশুদ্ধ চিত্তের দরুণ, নির্ভরের ভুল অর্থ নিশ্চিতরূপে ধারণা হইয়া যায়! নির্ভর করিয়া অনেক সাধকের পতন হয় এই জন্যই—কেননা নির্ভরের পর তাহাদের নিজের উদ্যম চেষ্টা একেবারে লোপ পাইয়া যায়!

আত্ম-চেষ্টার উপর—গুরুর কৃপা বর্ষিত হইলে, তখন কৃপারও সার্থকতা হয়। দুর্ব্বলকে কৃপা করিয়াও কোন ফল হয় না—কেননা কৃপার মর্য্যাদা রক্ষণ দুর্ব্বলের দ্বারা হয় না। নিজকে জানিবার দরুণ নিজের ভিতর যাহাদের ব্যাকুলতা আসে নাই, তাহারা পরের উপদেশ পাইয়াই বা কি করিবে! প্রবঞ্চনা পূর্ণ নির্ভরতা হইতে, আত্ম-চেষ্টার দ্বারা সাময়িক হয়ত যে লক্ষ্য বিচ্যুতি ঘটে, তাহাও শ্রেয়ঃ। কেননা যাহাদের ভিতর একবার ব্যাকুলতা আসিয়াছে, তাহারা সাময়িক পথ ভ্রষ্ট হইলেও পুনরায় ইষ্ট-সিদ্ধির পথে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে।

আধ্যাত্মিকতার ভাণে জীবন পঙ্গু হয়, অথচ না বুঝিয়া, যাচাই না করিয়া অধিকাংশই এই ভাণ করিয়া যাওয়াটাকেই গৌরব বলে মনে করে। কিন্তু এই অবস্থায় পড়িলেও, সত্যলাভের পিপাসা যাহাদের ভিতর জাগিয়াছে, তাহাদের ভিতরে ভিতরে আত্ম বিদ্রোহ না জাগিয়া পারে না। তাহারা গতানুগতিক পথ হইতে নিজকে ছিনাইয়া লইতে বাধ্য হয়। সকলে তখন অভিশাপ দেয় তাদের—কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই অভিশাপে যেন সত্যিকার সাধকের জীবনকে উন্নতির পথে আরও দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়।

উপদেশকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইলেও, আত্ম-চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হয়! মানুষ তখন অপরের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে ঔদাস্যে দিন কর্ত্তন করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবন বলিতে, নিশ্চেষ্ট বা নিৰ্জ্জীব ভাবে বসিয়া থাকাকে বুঝায় না। এই আধ্যাত্মিকতার জীবন ক্রমশঃ অধোদিকেই দ্রুত অগ্রসর হয়।

দল বাঁধিয়া, গতানুগতিক আচার পালন করিয়া যাওয়াতে বেশ একটা সুখ আছে, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু সাধকের প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না! অসহ্য যাতনা বা দুঃখ পাইলেও নিজের পথ, তাহারা নিজেরাই আবিষ্কার করিয়া লয়। সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে যাহারা জীবনে উপলব্ধি করিতে চায়—আত্ম চেষ্টা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়।

গীতার কথার ন্যায়, আমরা অনেকেই অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি বলিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া, অত্রাণকে ত্রাণ বলিয়া ধরিয়া বেশ নিশ্চিতভাবে দিন কাটাইয়া দিই। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় যাঁহাদের দৈবী-চক্ষু ফুটিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সেই ভণ্ডামীতে কিছুতেই আবিষ্ট হইয়া যান না! অপরের ধারণার সঙ্গে না মিলিলেই, আমি যাহা যথার্থতঃ অনুভব করি তাহা যদি মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা হইলে স্বানুভবের কোন মূল্যই যে থাকে না। অথচ স্বানুভব না হইলে, শুধু অপরের কথায় আত্মতৃপ্তিও আসে না!

আত্মচেষ্টার কোন ত্রুটী না রাখিয়া, গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, গুরুকৃপার মহিমাও সত্বর উপলব্ধি করা যায়! ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকামের উপদেশ প্রার্থনার রীতিটী সকল সাধকেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আচার্য্যের নিকট তিনি উপদেশ প্রার্থী হইয়াই গিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্য্য তাহার চোখ-মুখ দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"হে সৌম্য, তুমি যেন ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ। জিজ্ঞাসা করি, কে তোমাকে উপদেশ দিলেন?" এইখানে সত্যকামের আত্ম চেষ্টা এবং তৎসত্ত্বেও এই যে বিনম্র ভাব তাহা উল্লেখ যোগ্য!

ব্যক্তিগত চেষ্টার একান্ত অভাব হইয়া পড়িলেই, কৃপাটাও একটু বেশী বেশী প্রয়োজন হয়! শক্তিশালী সাধকের কৃপাবাদ আর দুর্ব্বলের কৃপাবাদে রাত-দিন পার্থক্য; দুর্ব্বল কৃপালাভ করিয়াও কৃপাকে হজম করিতে পারে না—কেননা তাহার আত্ম-শক্তি মোটেই নাই। সঞ্চারিত শক্তিকে আত্মগত করিয়া নিতে হইলেও, শুদ্ধ আধার এবং সাত্ত্বিক ভাবের প্রয়োজন। কাজেই আধার শুদ্ধির দরুণ নিজকেই অবিরাম চেষ্টা এবং যত্ন করিতে হইবে।

উপদেশ শুনিলেই কিছু হয় না—সেই উপদেশ যদি জীবনে কার্য্যকরী না হয়! অনেক কিছুই শুনি, কিন্তু তাহাতে জীবন-গঠনের দিকে একটুকুও অগ্রসর হই না আমরা। ইহার প্রধান কারণই হইল, আত্ম-চেষ্টা দ্বারা সমন্বয়ের অভাব।

সংযম ও তপস্যা

—*—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী—সংযমীর পক্ষে রাত্রিকালও জাগরণের সময়। সাধারণ মানুষ সে সময় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু সংযমী সংযমাগ্নির তাপে চির জাগ্রত, তাঁর চেতনা কখনো বিলুপ্ত হয় না। এখন প্রশ্ন এই যে, সংযমী চেতনাকে সব সময়ের দরুণ এরূপ উজ্জ্বল রাখেন কি করে? সব মানুষের ক্লান্তি আসে - কিন্তু সংযমীর ক্লান্তি আসে না কেন? চক্ষু মুদ্রিত করে, অঘোর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে না পড়লে যেমন সাধারণের বিশ্রামানুভব হয় না, সংযমী নিদ্রাহীন অবস্থায় থেকেও, কি করে স্বাভাবিক অবসাদ এবং ক্লান্তি থেকে নিজকে নির্ম্মুক্ত রেখে বিশ্রাম অনুভব করেন?

এক কথায় উত্তর দিলে, এই বল্‌তে হয় যে, সংযমীর প্রাণে অনির্ব্বাণ তপস্যার হোমানল প্রজ্জ্বলিত। তিনি দিবারাত্র সজাগ সচেষ্ট থাকেন---এই তাপের দরুণ—তপস্যার দরুণ! অবসাদ-জড়তা সব সেই তপস্যার অগ্নিতে পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যায়। কাজেই সাধারণ মানবের ন্যায়, তাদের আলস্য জড়ত্ব থাকে না; ঘুমাবার সময় এলেও যে তাঁরা ঘুমাতে পারেন না; কেননা বুকের মাঝে অবিরাম তপস্যার অগ্নি জ্বল্‌তে থাকে। অন্তর বিশুদ্ধির ফলে জড়তা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায় তাঁদের। কাজেই তারা স্বাভাবিক আকর্ষণের বহু উর্দ্ধে! সাধারণ মানুষ আর সংযমীতে এই জন্যই রাত-দিন প্রভেদ!

সাধারণ মানুষের চেতনাকে অনেক কিছুই এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তারা তখন অন্ধকারে তলিয়ে যায়---কিন্তু সংযমীর চেতনাকে কিছুতেই গ্রাস করতে পারে না! বরঞ্চ যারা গ্রাস করতে আসে, তারাই সেই তাপের প্রভাবে অভিভূত—আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চেতনার বৈদ্যুতিক প্রবাহে, জড়ও তখন চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! জড় ঐশ্বর্য্য দেখাতে এসে, নিজেই অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে! কাজেই আসল কথা হল—তাপ—তপস্যা! নিজের মাঝে যিনি এই তপস্যার অগ্নিকে চির প্রোজ্জ্বল রাখ্‌তে পারেন—তাঁর কাছে রাত্রি-দিনের কোন মোহ নাই। রাত্রি দিন সবই সমান।

জগতে যিনিই যত বড় হয়েছেন, তার ভিতর ততই তাপ সঞ্চিত! এই তাপেই তিনি চির-জাগ্রত, অপরের সুখ দুঃখের বেদনা এসে এই জন্যই তাঁর বুকে বেশী বাজে! তাঁর অন্তর মুহূর্ত্তের দরুণও কোন প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না, ময়লা-আবর্জ্জনা সব দগ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর চিত্ত স্বচ্ছ দর্পণবৎ। তাতে বিশ্বের সুখ দুঃখের ছায়া এসে প্রতিফলিত হয়! তখন তিনি সকলের দরুণ আরও বেশী করে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন! মহাপুরুষদের বুকে অনন্ত তাপ, সেই তাপের মহিমায় তাঁরা চিরোজ্জ্বল! তপস্যার অগ্নিতে সকল মালিন্য ভস্মীভূত হয় বলেই, তাঁদের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সমগ্র বিশ্বের সুখ-দুঃখের বেদনা মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠে!

চেতনা যার লোপ হয় না, তার কাছে রাত্রি বা অন্ধকার কিসের? সে যে চির জাগ্রত, চির-প্রবুদ্ধ! কিন্তু এই চির-জাগ্রত, চির-প্রবুদ্ধ ভাব অর্জ্জন করতে হলে, নিজের সকল মালিন্য ভস্ম হয়ে যাওয়া চাই! অস্থিচর্ম্ম সার হলেও তখন এই হাড়ের মাঝেও বিদ্যুত চমকে যাবে! সকল দেহে তখন সাত্ত্বিক প্রকাশের লক্ষণ ফুটে উঠ্‌বে! কিন্তু দেহের জড়ত্ব নিঃশেষে ভস্মীভূত না হলে, সাত্ত্বিকতার বিদ্যুৎ প্রকাশ হতে বাধা পায়। এই জন্যই যারা তপস্বী নয়, তারা ধর্ম্মকে ধারণ করে রাখ্‌তে পারে না, ধর্ম্ম তাদের জীবনে বিদ্যুৎ প্রবাহরূপে শিরায়-

উপশিরায় সঞ্চারিত হয় না। ধার্ম্মিক মানুষের বাহির-ভিতরে কোন প্রভেদ নাই। সাত্ত্বিক-ভাবের প্রেরণায়, তাঁদের দেহ-মন-প্রাণ সবই বিশুদ্ধ করে নিয়োজিত!

ঘুম মানুষের স্বাভাবিক—কিন্তু সংযমী তপস্যা দ্বারা তাকে জয় করে ফেলেছেন। অভ্যাসের ফলে, সংযমীর কাছে চির জাগ্রত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই সংযমী এবং অসংযমীর স্বভাবে রাত-দিন পার্থক্য। সংযমীর স্বভাবকে পেতে হলে, সংযমীর মত অবিরাম তপস্যা করা চাই! তপস্যা ছাড়া জড়ত্ব কাটানো যায় না। যার ভিতর যত জড়ত্ব বেশী, তাঁকে তত বেশী সাধনা করতে হয়। সাধনার কাল এই জন্যই অধিকারী ভেদে দীর্ঘ এবং লঘু হয়।

অজ্ঞানী এবং জ্ঞানীর স্বভাবে বহু পার্থক্য! জ্ঞানীর স্বভাবে তামসিকতার একটুকুও লেশ নাই, কিন্তু অজ্ঞানীর স্বভাব তমপ্রভাবাচ্ছন্ন। স্বাভাবিক আকর্ষণের ঊর্দ্ধে উঠে যেতে পারেন বলেই, জ্ঞানীর ভালবাসা প্রেম রূপে পরিণত হয়ে যায়; (অর্থাৎ দেহাসক্তি থাকে না—শুধু বিশুদ্ধ ভাবে ভাবে মিলন হয়) আর অজ্ঞানীর ভালবাসা কামে পর্য্যবসিত হয়। চিত্তের শুদ্ধি এবং অবিশুদ্ধি নিয়াই পরিণতিরও বিপর্য্যয় ঘটে!

তাপ সর্ব্বত্রই রয়েছে—তবে কোথায়ও প্রকট আর কোথায়ও প্রচ্ছন্ন। চেতন মানুষ সেই তপঃশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে আত্ম চেষ্টায়, কিন্তু জড় তা পারে না। এই জন্যই জড়ের মুক্তি—বিধির বিধানের অন্তর্গত। কিন্তু মানুষ আত্ম-চেষ্টা দ্বারা আত্ম-মুক্তির পথ আবিষ্কার করে নিতে পারে! মানুষ ইচ্ছা করলেই চলতে পারে, কিন্তু জড় তা পারে না। কাজেই অভ্যাস এবং যত্ন দ্বারা মানুষ ইচ্ছাকে ক্রমশঃ বলবত্তর এবং বলবত্তম করে আত্ম-মুক্তির পথে শীঘ্রই অগ্রসর হয়ে যায়।

তাপই শক্তিতে পরিণত হয়। কাজেই যাদের ভিতর তপঃশক্তি নাই, ক্রমশই তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে! তপস্যার অভাবে সকলেরই পতন হয়, আবার তপস্যার দরুণই সকলের উন্নতি হয়! তপস্বী হতে না পারলে, জীবন তামসিকতা এবং জড়ত্বে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে—সূর্য্যের কিরণ ঠিক ঠিক প্রকাশিত হতে পারে না।

তপস্বীর, সংযমীর কাজই হল, আত্ম-মুক্তির পথে যত বাধা আছে, তাদের সবকে অপসারিত করা! পথে কোন বাধা না থাকলে, আত্মার মহিমা স্বাভাবতঃই ফুটে ওঠে। কিন্তু বাধাকে দূর করতেই সাধনার বা তপস্যার প্রয়োজন হয়। উদার—নির্ম্মুক্ত—নীলকাশের মত চিত্ত যখন স্বচ্ছ হয়—বিশারদ হয়, তখন ভগবানের কৃপা আপনি বর্ষিত হতে থাকে।

মানুষের ভিতর যে তপঃশক্তি স্বাভাবিকই রয়েছে, তাকেই সাধনা-ব্যাকুলতা দ্বারা জাগিয়ে তুলতে হবে। ভিতরে তাপ জন্মিলে, মানুষ কখনো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারেনা। নিজের দরুণ হউক, আর পরের দরুণই হউক, তাকে অবিরাম স্পন্দিত-সজাগ সচেষ্ট হতেই—হবে। তখনই প্রকৃত জীবন আরম্ভ হল—কেননা বুকে অভাবের বেদনা অর্থাৎ বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। বড় হওয়ার দরুণ আকুলতা এবং অভাববোধ সবার ভিতরই রয়েছে। কিন্তু মানুষ চেতন বলেই সেই অভাব পূরণের দরুণ বেশি সচেষ্ট হয়।

আমি যে ছোট হয়ে আছি, আবদ্ধ হয়ে আছি, আমার স্বরূপ যে এ নয়—এ চিন্তা নিয়ে, এ তাপ নিয়ে, এ বেদনা নিয়ে, সর্ব্বদা জেগে থাকতে হয়। আমি যা চাই, সেই চাওয়ার মাঝে যদি কোন ব্যাঘাত বা বিরাম না ঘটে,

তা হলে ইষ্টসিদ্ধি হতে বেশী সময় লাগে না এই জন্যই আত্ম-সাক্ষ্যাৎকারের পূর্ব্ব পর্যন্ত নিজকে সর্ব্বদা সজাগ রাখবার চেষ্টা কর্তে হয়। আত্মানুভব হয়ে গেলে, তখন আর কোন কিছু এসেই টলাতে বা আচ্ছন্ন করে ফেল্‌তে পারে না। আত্ম-মহিমার কাছে সকল শক্তিই স্তিমিত।

যজ্ঞ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত—হোমানলকে একভাবে প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে। ইন্ধনের অভাবে অর্থাৎ ব্যাকুলতার অভাবে, আত্ম-সাক্ষ্যাৎকারের প্রবল ইচ্ছা যেন স্তিমিত হয়ে না যায়। এই জন্যই অজপা জপ করে যেতে হবে। এক মুহূর্ত্তের দরুণও যেন প্রার্থনার বিরাম না হয়, চেষ্টার বিরাম না হয়! নিজের মনের প্রতি সজাগ-পাহাড়া রাখতে হবে, যেন সে ফাঁকি দিয়ে অন্য চিন্তায় নিমজ্জিত না হয়। এক ভাব—এক চিন্তায় অহোরাত্র কাটিয়ে দিতে হবে। তবেই সংযমী হওয়া যায়—সিদ্ধিলাভ ঘটে!

স্বভাবের ব্যতিক্রম বলেই প্রথমতঃ প্রত্যেক সাধককেই একটু বেগ পেতে হয়। কিন্তু এই বেগের দরুণ উৎসাহ উদ্যমকে কমিয়ে দিলে চল্‌বে না। প্রথমতঃ রাত্রিতে বেশী জাগলে চোখ পুড়ায়, কিন্তু অভ্যাসের ফলে ৮'দিন পর চোখে আর সে যন্ত্রণা থাকে না। সত্যলাভের পথ এত সহজ নয়—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি স্বভাবতঃ যে পথে চল্‌ছে সে পথ থেকে তার মোর অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে হয়। সে পথে গতির কোন ব্যাঘাত হয় না, বরঞ্চ সে গতির পথ—অনন্ত গতির পথ, কিন্তু প্রবৃত্তির পথের ক্ষয় আছে—বিনাশ আছে।

ভিতরে যোগাগ্নি সর্ব্বদা জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হয়, তা না হলে সম্যকভাবে আত্ম-শোধন হয় না। আত্ম শোধনের উপায়ই হল তপস্যা, ভিতরে তাপ সঞ্চয় করা! মানুষ নিজে না জাগ্‌লে আত্ম-শোধনের চেষ্টা জাগ্রত হবে কেমন করে?

প্রত্যেকের ভিতরই বড় হওয়ার অভাব বোধ রয়েছে। কাজেই সেই অভাব-বোধকে আত্যন্তিক করে, ব্রহ্মকে লাভ করা উচিত। বড় হতে হলে তপস্যা চাই—কেননা সংস্কারে, মোহে আমাদের আত্মা সঙ্কোচিত হয়ে রয়েছেন; তাঁকে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ মুক্ত কর্‌তে হবে!

সর্বদিকেই এখন সংযমী, তপস্বীর প্রয়োজন। নিজের অভাবকে ভাল করে বুঝে নিয়ে তারপর তার পূরণের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। শক্তিশালী জাতির সৃষ্টি তপস্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমাদের ভিতর যে প্রচ্ছন্ন শক্তি রয়েছে তাকে জীবনে মূর্ত্ত করে তুলতে হলেই সাধনা চাই—তপস্যা চাই; শুধু অতীত নিয়ে গৌরব অনুভব কর্‌লে হবে না। আমরা ঋষির বংশধর এই বল্‌লেই ঋষিদের মত সম্মান পাব না। ঋষিদের মাঝে যে শক্তি ছিল, যে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির বাণী তাঁরা প্রচার করে গিয়েছেন, সেই শক্তি, সেই প্রেরণা আমাদের লাভ কর্‌তে হবে। কাজেই সেই শক্তিকে পুনঃ উজ্জীবিত করে তুল্‌তে হলেই তপস্যার প্রয়োজন।

ভিতরে অভাববোধ না জাগলে, তাপ সঞ্চিত না হলে, জীবনে উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হবে কেমন করে? ভারত এখনো তৌষ্টিকের ন্যায় সামান্য তৃপ্তিতেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, আসলে তার ভিতর তপস্যার শক্তি স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। আবার হোমানল জ্বালাতে হবে—শুধু বাহিরে নয়—অন্তরে।

একটা নব শক্তিশালী জাতিগঠনের পক্ষে, সমষ্টির তপঃশক্তি পুঞ্জীভূত হওয়া খুবই প্রয়োজন। আমাদের ভিতরে তপঃশক্তি না থাক্‌লে, নব-জাতির মেরুদণ্ড বীর্যশালী হবে কেমন করে? দুর্ব্বল পিতার দ্বারা দুর্ব্বল সন্তানেরই সৃষ্টি হয়।

বহুদিন ধরে অন্তরের হোমানল নির্ব্বাপিত হয়ে আছে বলেই, চিত্ত আমাদের নিষ্কলুষ নয়। অনেক আবর্জ্জনা জড় হয়েছে, তাদের আবার পুড়ে ছাই করতে হবে! কাজেই প্রথমেই বাগাড়ম্বরে নিযুক্ত না হয়ে, সাধনার প্রতি মনকে নিবিষ্ট করতে হবে! সেই সাধন-শক্তি বা তপঃশক্তি লোপ পেয়ে গেলে, তখন শুধু বাইরের ঠাট বজায় রেখে কোন ফল হয় না! তাতে মানুষের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় না—কেননা তাতে প্রাণ-শক্তি অবাধে লীলায়িত হতে পারে না।

সম্প্রদায় কিম্বা আশ্রম যাঁরা গড়ে গিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন তপস্বী—সংযমী। সম্প্রদায় কিম্বা আশ্রম গঠনের প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি ছিল না, তাঁরা ছিলেন আত্মানুব্যায়ী, সেই আত্মার অমোঘ বীর্য্য স্বভাবতঃই বাহিরেও তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে গিয়েছে। কাজেই সকলেরই স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব নির্ভর করে—আত্ম-শক্তির উপর। আত্ম শক্তি উদ্বুদ্ধ না হলে, শত চেষ্টাতেও বাহিরের ঠাটকে বজায় রাখা যায় না। শক্তিশালী হতে না পারলে, সেই নিষ্ঠাই বা জাগবে কেমন করে! নিষ্ঠাবান্ যারা তাদের প্রাণ মরা নয়, শক্তি আছে বলেই তাদের ধরে-রাখার ক্ষমতাটা বেশী। প্রাণহীনের নিষ্ঠা দেখে, কারও প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয় না। কাজেই নিষ্ঠার মূলেও বড় জিনিষ রয়েছে, আসলে তাঁরই যদি অভাব হয়, তাহলে সেই নিষ্ঠার কোন মূল্য নাই!

তপঃশক্তি নাই বলেই আমরা দিন দিন ছোট হয়ে পড়ছি। বড় হতে হলে, জাতির অগ্রগণ্য হতে হলে, সেই তপঃশক্তিই জাগাতে হবে। কাজেই আড়ম্বরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, সাধন-নিরত হওয়াই অগ্রে প্রয়োজন। আমি ব্রাহ্মণ আছি, অতএব আমার কাছে সবাই মাথা নত করে চলুক, শুধু এই দাবী করলেই চলবে না; ভিতরে শক্তির উদ্বোধন হলে, বলে-কয়ে শ্রদ্ধা কিম্বা সম্মান আদায় করতে হয় না, গুণ দেখে তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়! সম্মান আদায় করবার দরুণ ব্যস্ত না হয়ে, যে শক্তির প্রভাবে মানুষ মানুষকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখায়, সেই শক্তিই আয়ত্ত করে নিতে হবে! কাজেই ব্রাহ্মণ্য শক্তিই হোক্, আর যে কোন শক্তিই হোক্, তপস্যা না করলে কিছুই উদ্বুদ্ধ হবে না!

কিন্তু আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে হলেই, সে আদর্শ জীবনে কার্য্যকরী হওয়া চাই। কেবল মাত্র একটা মহান্ আদর্শ নিয়ে বড়াই করে বেড়ালেই কিছু ফল হয় না, এর চেয়ে ছোট একটা আদর্শ ধরেও তা যদি তপস্যা দ্বারা, সাধনা দ্বারা জীবনে প্রতিফলিত করা যায়, তাহলে তার মূল্য বেশী!

যে শক্তিকে কেন্দ্র করে, যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি কিংবা বিকাশ, অজ্ঞানাভিভূত মানুষ সেই শক্তিকেই ভুলে যায়! কাজেই সৃষ্টি-রক্ষার দরুণ তাদের এত যত্ন, এত ব্যাকুলতা এবং এত উদ্বেগ। কিন্তু জগৎ-স্রষ্টার মনে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের দরুণ একটুকুও ক্ষোভ কিম্বা দুঃখ উপস্থিত হয় না, কেননা তিনি জানেন সৃষ্টি-প্রলয় একমাত্র তাঁর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। সৃষ্টি রক্ষা এবং বিকাশের মূলে এই বজ্রদৃঢ় ইচ্ছাই হল আসল! এই দৈবী ইচ্ছা একমাত্র তপস্যা-সম্ভূত! তপস্যার মূল লক্ষ্য থাকবে নিজকে জানা! নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে না জানা পর্য্যন্ত, ভিতরে ভিতরে তপস্যার তাপে বিদগ্ধ হতে হবেই! নিজকে জানতে পারলে—আর কিছুই জানার বা বোঝবার থাকে না; কেননা এক "আমি"ই জীবে জীবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। চিত্তকে সংযম করে একবার সেই "বিরাট্ আমি"র অনুসন্ধান পেলে, তখন আর সমন্বয় করতে বেগ পেতে হয় না! কাজেই সংযমের প্রয়োজন—তপস্যার প্রয়োজনই অগ্রে! সংযমীর চোখে নিদ্রা নাই, পলকের দরুণও তাদের চেতনা লুপ্ত হয় না। অন্তরের তাপে তাঁরা চির-বিদগ্ধ, চিরোজ্জ্বল! নিদ্রা আসে কার চোখে? কে অভিভূত হয়?—যার ভিত

জেগে থাক্‌বার সংবেগ নাই, আত্মাকে সংস্কারে, মোহে আচ্ছন্ন করেও যার প্রাণে একটুকুও বাজে না! সংযমীর স্বভাব এই কারণেই সাধারণের ব্যতিক্রম। কেননা সংযমীর লক্ষ্য স্পষ্ট, কাজেই লক্ষ্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, অবিরাম চেষ্টার দ্বারা তার প্রতি অগ্রসর হওয়াই সংযমীর আসল কাজ!

আর কিছু না, শুধু তপঃশক্তিকেই বাড়াতে হবে। চাই অভাব-বোধ, এবং অভাব-পূরণের আকুল চেষ্টা। সেই তপঃশক্তি যখন সমষ্টির মাঝে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে, তখন এক শক্তিশালী জাতির অভ্যুদয় না হয়েই পারে না। বীর্য্যশালী জাতির উদ্ভব হবে—এই তপঃশক্তিকেই কেন্দ্র করে! কাজেই প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত সাধনায় মন দাও—তপস্যা কর—নিজকে জান—সংযমী হও!

আত্মরতি

—*—

কর্ম্মকে ভয় করে সবাই—কেননা কর্ম্ম মানুষকে দুঃখ দেয়, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু কর্ম্ম না করলেও, নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাক্‌লেও, বাজে চিন্তায় চিত্তকে কলুষিত করে ফেলে! কাজেই কর্ম্ম না করে বসে থাকাটাও কম শক্তির কাজ নয়। অনেক সময় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি বলে, বাজে চিন্তা এসে অনিষ্ট সাধন কর্‌তে পারে না, কিন্তু অলস হয়ে, কুড়েমি করে বসে থাক্‌লে, অশুভ চিন্তা-ভাবনা এসে মাথায় কিল্‌বিল্ কর্‌তে থাকে। তখন কর্ম্ম করিনা বটে, কিন্তু অকর্ম্মের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে! কাজেই চিত্ত-শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জোর করে কর্ম্ম ছাড়্‌তে নাই। বরঞ্চ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করে যাওয়াতে সব দিকেই ইষ্ট হয়। কর্ম্ম কার নাই, কর্ম্ম না কর্‌লেও চলে কার? গীতাকার তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে তার পরিচয় দিয়েছেন—

> যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
> আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

—যিনি আত্মাতেই প্রীতি অনুভব করেন, আত্মাতেই যিনি তৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই।”

কথাগুলি বলে ফেলা খুবই সহজ, কিন্তু চিত্ত কতখানি অন্তর্ম্মুখী হলে তারপর এই অবস্থালাভ হয়, তা সাধন ছাড়া বোঝবার উপায় নাই। নিছক আত্ম-রতি নিয়ে থাক্‌তে হলে, মনের জোর অসীম থাকা চাই। বিনাভ্যাসে, বিনা সাধনায় চিত্তের এই সাম্যভাব আসে না। কাজেই গীতাকার উপরোক্ত শ্লোকে যা বলেছেন, তা লাভ কর্‌তে হলে কঠোর সংযম এবং সাধনারার প্রয়োজন। বহির্ম্মুখী চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী করা, একদিনের কাজ নয়; দৈনন্দিন সাধনার প্রতি বিশেষ যত্ন করলে তারপর সেই দৈবী-শক্তি লাভ হয়। তখন নিঃসঙ্গ হয়ে থাক্‌তেই ভাল লাগে, কেননা ভিতরে ভিতরে আত্মাই যে তার সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। নিবৃত্তি মানুষের সহজে আসে না। মন বিচিত্র পথে ঘুরে ফিরে তারপর সামঞ্জস্যের রাজ্যে ফিরে আসে। তখন সে তার নিজের শক্তির পরিচয় পায়। ইচ্ছা করলে সে ইষ্টধ্যানে রাতদিন কাটিয়ে দিতে পারে তখন। কাজেই বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখ্‌লেও তার কোন ক্ষতি হয় না।

কর্ম্ম নাই বল্‌তে, কোন কর্ম্মই যে নাই, তা নয়;

তবে কিনা কর্ম্মের ধারা তখন বদ্‌লে যায়। আত্ম-তৃপ্ত যিনি, তিনি অলসভাবে দিন কাটান্ না। ভিতরে ভিতরে একনিষ্ঠ ভাবের সাধনায় তিনি নিমগ্ন হয়ে থাকেন, কাজেই বাহিরের কর্ম্ম কমে গিয়ে আভ্যন্তরীন কর্ম্মই বেশী করে চল্‌তে থাকে। ইন্দ্রিয় মন সব গুটিয়ে আত্ম-চিন্তায় অহরহঃ ডুবে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। বাইরের কর্ম্মে দেহ-মন ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাপৃত থাক্‌লে, তখন বরঞ্চ বেশ ভালই থাকা যায়; কিন্তু স্থির হয়ে বস্‌লে মন আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাজেই তখন তাদের আয়ত্তে রাখা শক্তির প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য থাক্‌লে, আত্ম-তৃপ্তি কখনো আস্‌তে পারে না। কাজেই চিত্ত স্থির এবং সমাহিত না হলে আত্মতৃপ্তি আসেনা। আত্মার মাঝে রস খুঁজে পাওয়া, চঞ্চল মনের কাজ নয়; আর চঞ্চল মন সেই রসে তৃপ্তিও অনুভব করে না। আত্ম-রতি অনুভব করতে হলে, ইন্দ্রিয়ের সংযম চাই। সংযত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রসানুভব হয়, সেই রসের অনুভবে মন চঞ্চল হয়ে উঠে না। বরঞ্চ চিত্ত তাতে স্থির হয়। চঞ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ভোগ হয় তাতে একটা বিষম জ্বালা উপস্থিত হয়—কিন্তু সংযত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রসানুভব হয়, তাতে সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ তর্পিত হয়ে যায়। সেই সাত্ত্বিক রসের অভিসেকে সকল জ্বালার অবসান হয়, চিত্তে একটা প্রশান্তির ভাব আসে।

সাধারণ মানুষ যে ভোগের দরুণ লালায়িত হয়ে বাহিরে বাহিরে অনুসন্ধান করে বেড়ায়, সংযমী, আত্মাকে অবলম্বন করে নিজের মাঝেই তা আস্বাদন করেন। সংযমীর ভোগ ভিতরে, অসংযমীর ভোগ বাহিরে; তাই একজন চঞ্চল, একজন পরকে পীড়ন করে চায় সুখ অনুভব করতে, আর একজন নিজকে পীড়ন করেই সুখ অনুভব করে। নিছক আত্মাতেই যাঁর পরিতৃপ্তি তাঁর তো বাহিরের কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। তিনি আত্ম-মহিমায় গৌরবান্বিত, তিনিই সংযমী—স্বাধীন!

আত্ম-তৃপ্তি লাভ করতে হলেই, বাহির হতে মনকে গুটিয়ে এনে—আত্মকেন্দ্রে লয় করতে হবে। কিন্তু আত্ম-কেন্দ্রে মনকে লয় করতে হলেই সাধনা চাই, তপস্যা চাই। মনের গতি স্বভাব-তঃই বহির্ম্মুখী, তাকে অন্তর্ম্মুখী করতে হলেই, নিয়মিত সাধনার প্রয়োজন হয়। আত্মভাবে মন তন্ময় হয়ে গেলে, তখন আর বহির্জ্জগতের প্রতি দৃষ্টিই থাকে না। আত্মার মাঝেই তখন সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, কাজেই আত্ম-ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেই তখন বেশী ভাল লাগে।

নিজের মাঝেই সব রয়েছে—কিন্তু এই সহজ সত্য কথাটা মানুষের বিশ্বাস হয় না। চায় মানুষ শান্তি; কিন্তু অশান্ত হয়ে, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মানুষ শান্তির পথ না ধরে; অশান্তির পথেই অগ্রসর হয়। বিচিত্র কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, চিত্ত যতই বিশুদ্ধ হতে থাকে, ততই আত্মার উজ্জ্বল মহিমা অনুভব করা যায়। আত্ম-তৃপ্তির মূল কারণ, তখন মানুষ নিজের মাঝেই খুঁজে পায়। বাহিরে আর তৃপ্তির দরুণ ছুটতে হয় না—শান্তি তখন নিজের মাঝেই মিলে!

উপদেশে মন প্রবোধ মানে না, তাই বিচিত্র কর্ম্মের ভিতর দিয়েই তাকে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। বাহিরের কর্ম্ম করে করে ক্রমশঃই চিত্ত অন্তর্ম্মুখী হবে, তখন আস্তে আস্তে কর্ম্মের ভিতর

দিয়াই আত্মতৃপ্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। কর্ম্ম ছাড়া যাবে কখন?—যখন সম্পূর্ণ আত্ম-তৃপ্তি নিয়াই থাকা সম্ভব পর হবে! কিন্তু একটানা ভাব-প্রবাহে চিত্তকে সরস রাখা খুবই শক্তির প্রয়োজন। এই জন্য আত্ম-শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত বাহিরের কাজ-কর্ম্মকেও উপ-লক্ষ স্বরূপ রাখ্‌তে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা এক আত্মার মাঝেই যে সব বিরাজিত তা দেখিয়ে দিলেন। তখন অর্জ্জুনের আত্ম-বিশ্বাস এল। কাজেই নিজের মাঝে প্রত্যক্ষ ভাবে সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত ভাব মূর্ত্ত হইয়া না উঠিলে, এবং তা সাক্ষাৎ কর্‌তে না পার্‌লে—নিছক আত্ম রতি নিয়া থাকা কি সম্ভবপর? মানুষের অনেক বিষয়ে অভাব—আত্মসমাহিত হয়ে যদি আত্মার মাঝেই সব অভাবের পূর্ণতা খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে কেবল আত্মাতে সন্তুষ্টি আসবে কেমন করে?

বাহিরে যা দেখ্‌ছি বা পাচ্ছি, অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে ভিতরেও আত্মার মাঝে যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে তো তৃপ্তি আস্‌বে না! বাহির-ভিতর এক হয়ে যাওয়া চাই। ভাবকে আত্মগত করে নিজের মাঝেও প্রত্যক্ষ করা চাই, আবার বাহিরে মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপেও প্রত্যক্ষ করা চাই, তবে না দর্শনের পূর্ণতা? তখন বহির্জ্জগতের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে থাক্‌লেও ক্ষতি নাই। ভাব পেলে আত্ম-সমাহিত হয়েই থাক্‌তে ইচ্ছা হয় বেশী।

সমন্বয় হওয়া চাই—আত্মাতে সর্ব্বভূত, এবং সর্ব্বভূতে একই আত্মা! আত্মরতি যখন হবে তখন আত্মার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে সবারই সম্মিলন হবে, আর আত্ম-ব্যাপ্তির সময় সকলের মাঝেই এক আত্মা ব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌বেন। নিজের মাঝে সবকে না পাওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক আত্মরতি আস্‌তেই পারে না!

মনটা কখনো মরে যায় না, কাজেই আত্ম তৃপ্তির মাঝেই মন যদি বৈচিত্র না দেখ্‌তে পেত, তাহলে আত্ম-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে তুল্‌ত। কিন্তু মন আত্মার মাঝেই সবকে দেখতে পায়। কাজেই তাকে আর অনর্থক বাহিরে ছুটা-ছুটী কর্‌তে হয় না।

এই যে নিজের মাঝে সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া—এ কম কঠিন কথা নয়। বাহিরের চিন্তা ভাবনা হতে মনকে গুটিয়ে আত্ম-কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্‌তে না পার্‌লে কোন রহস্যেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ম্মের প্রবৃত্তি থেকে গেলে, জোর করে মনকে সমাহিত করা যায় না, কাজেই আস্তে আস্তে কর্ম্মের ভিতর দিয়াই নিষ্কাম হয়ে তার পর আত্ম তৃপ্তি, আত্ম-রতি লাভ করা যায়। কাজেই আত্ম তৃপ্তি, বা আত্ম-রতি লাভ না করা পর্য্যন্ত—কাজ ছাড়্‌তে নাই। অবশ্য চেষ্টা দ্বারা যত দূর পারা যায়, শুভ কর্ম্ম আপ্রাণ করে যাওয়াই উচিত। তাহলেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং মন ক্রমশঃ আত্মার প্রভাব দ্বারা, আত্ম-মুখী হয়।

—•—

সত্য-দৃষ্টি

—(*)—

আত্মস্থ হয়ে মানুষ যখন তত্ত্বানুসন্ধান করে, এবং সেই তত্ত্বের কথা যখন বাইরে এসে ভাষায় প্রকাশ করে, তখন সব লোক অবাক্ হয়ে, আশ্চর্য্য হয়ে বক্তার বানীতে মুগ্ধ হয়ে যায়। যে যত গভীর চিন্তাশীল, দরদী—তার কথায় লোক আকৃষ্ট হয় তত বেশী। মানুষ আসলে ভিতরের কথাটাই জান্‌তে চায়—কিন্তু সাধারণ মানুষ উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত নিয়া আত্মনিবিষ্ট ভাবে বিভোর হতে পারে না, তাই সাধারণের কথায় লোকের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সহজে আসে না।

প্রত্যেকের ভিতরেই এক প্রাণের স্পন্দন—কাজেই চিত্তকে শান্ত-সমাহিত কর্‌তে পার্‌লে প্রত্যেকের হৃদয়ের কথাই এসে সাড়া না দিয়ে পারে না। চিন্তাশীল, ভাবুক, দরদীর প্রাণে, সকলের প্রাণের কথা এসেই সাড়া দেয়, তাই তারা এক জায়গা থেকেই বিভিন্ন চরিত্রের লোকের প্রাণের অব্যক্ত বেদনা বেশ সহজ-সরল ভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

ঠিক ঠিক প্রাণের কথা যে বল্‌তে পারে, তার প্রতি স্বাভাবিক একটা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। মানুষ আশ্চর্য্য হয়ে চিন্তাশীল সাহিত্যিককে ধন্যবাদ দেয়। কেননা সাহিত্যিক অপরের প্রাণের কথাও বেশ সহজ সরল ভাবে প্রকাশ কর্‌তে পারে! একজনের কথা অন্যজন কেমন করে হুবহু বলে দিতে পারে, এই ব্যাপার নিয়ে সাধারণ লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা জানে না যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতরই এমন একটা জায়গা রয়েছে, যেখানে মনকে নিবিষ্ট কর্‌তে পার্‌লে, সব তত্ত্ব আপনি ধরা পড়ে যায়। আসল কথা হল, সব মানুষ আত্মস্থ হতে পারে না বলেই, অপরের কাছ থেকেই তাদের প্রাণের কথা শুনে, বিস্ময়ে পুলকে তারা আত্মহারা হয়ে যায়! গভীর ভাবে চিন্তা করে, ভিতর থেকে যে যাই বলুক না কেন, তাতে প্রত্যেকের ভিতরই সাড়া না দিয়ে পারে না। তাহলেই এমন একটী কেন্দ্রও আছে—যেখানে সকল বৈচিত্র্য এবং ভেদেরও অবাধ সম্মিলন। সেই কেন্দ্র থেকে, আত্মস্থ হয়ে যিনি যা বলেন, তাতে প্রত্যেকের প্রাণেই স্পন্দিত হয়ে উঠে। কাজেই মূল কথা হল—আত্মস্থ হয়ে ভাব্‌বার ক্ষমতা থাকা চাই!

আমাদের চোখের সম্মুখে কত কিছুই আসে যায়, কিন্তু আমরা তন্ময় হয়ে তাদের সম্বন্ধে ভাবতে পারি না--কিন্তু কবি, সাহিত্যিকরা এই দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনা থেকেও এমন কিছু আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিতে পারেন যাতে প্রত্যেকেই বিস্ময়ান্বিত না হয়ে থাকতে পারে না। কবি কিম্বা সাহিত্যিকদের বিশেষত্বই হল এই অন্তরদৃষ্টি লাভ। তারা কোন কিছুরই বাহিরটা নিয়া কেবল বিচার করেন না—আসল তত্ত্ব জান্‌বার দরুণ মনটাকে সেই সেই বিষয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন!

শিক্ষিত হউক, অশিক্ষিত হউক প্রাণ জিনিষটা সবার ভিতরই আছে! প্রাণের কথা সকলই বুঝে। মনটাকে তন্ময় করে দিয়ে মূল সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে, তখন দেখা যায়, সেটা এত সহজ-সত্য যে সকলের প্রাণকেই স্পর্শ করে।

বাহির থেকে মনটাকে গুটিয়ে এনে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে! সকল রহস্যই মানুষের হৃদয়ে! মানুষ এ কথাটা জান্‌লেও কিম্বা বুঝলেও, সংযম-শক্তির অভাবে চিত্তটাকে স্থির করতে পারে না, তাই তাদের জীবন অস্পষ্ট কুহেলিকায় আবৃত! কিন্তু নিজে আত্মস্থ হতে না পারলেও,

আত্মস্থ হয়ে যিনি যা বলেন তাতে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির চিত্তও সাময়িক উদ্দীপিত হয়ে উঠে। সত্যের মহিমা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় না !

আমরা যা বলি, সাধারণতঃ দেখে-শুনে কিম্বা অভিজ্ঞতা থেকে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা লাভ করি বহির্দৃষ্টি নিয়েই ! কাজেই অনুভবের গভীরতা থাকে না তার মাঝে। যে যত গভীর চিন্তাশীল, অর্থাৎ সব কিছুই ভিতরে তলিয়ে দেখে, তার কথা তত প্রাণস্পর্শী হয় ! যে মূল কেন্দ্র হতে ভেদের সৃষ্টি হয়েছে, সেই কেন্দ্রের সন্ধান পেলে তখন আর ভেদটা চোখের সাম্‌নে অত বড় হয়ে ফুটে উঠে না ! তখন ঐক্যের দিকটাই বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে।

সত্য যা, চিরন্তন উপলব্ধি যা, তা মানুষ বুঝবেই ; কাজেই হৃদয়ের সত্যিকার অনুভূতির মূল্য আর সব চেয়ে বেশী। কোন কৃত্রিমতা না রেখে, হৃদয়ের অনুভূতি সহজ সরল ভাষায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই—সেটাই বড় "আর্ট" হয়ে দাঁড়ায়। আমরা প্রত্যেকের মাঝেই নিজকে তলিয়ে দিতে জানি না—কাজেই ওপরভাষা অর্থ নিয়েই আমাদের তৃপ্ত থাক্‌তে হয় ! মনকে তলিয়ে না দিয়ে যা বুঝি, তার মাঝে ভুলের ভাগই বেশী থেকে যায়। একজনকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে হলে তার হৃদয়ের স্পন্দন নিজের মাঝে অনুভব করতে হলে, নিজকেই ধ্যানে স্তব্ধ হতে হবে। বুঝার পক্ষে বাইরের অভিজ্ঞতাই একমাত্র অবলম্বনীয় নয়। আসলে মানুষকে বুঝতে হলে, আত্মধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতে হবে !

নিজের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে যা বলা যায়, তার মূল্য হয় অনেক বেশী ; তাতে লোকের মনের মাঝেও একটা সত্যিকার সাড়া পড়ে যায়। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সংযোগ রয়েছে। কাজেই ধ্যান-তন্ময়তায় ডুবে যখন, সেই কেন্দ্র-ভূমিতে পৌঁছা যায়, এবং চিত্তের সেই তন্ময়তা নিয়ে বাইরে এসেও হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করা হয় তখন প্রত্যেকের হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গেই সেই অনুভূতি মিলে যায় !

সাধনা করে সবাই, কিন্তু সিদ্ধিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে উঠে না। কবি যাঁরা, শিল্পী যাঁরা, তারা সিদ্ধ ; তাঁদের প্রাণে সকলের সুখ-দুঃখের করুণ বেদনা এসে স্পন্দিত হতে থাকে, সকলের হয়ে, আবেগময়ী ভাষাতে তারা তারই রূপ দেয় মাত্র !

চিত্তকে সবাই তন্ময় করতে পারে না, আত্ম চেষ্টা ছাড়াও ঐশ্বরিক গুণ থাকা চাই ! সকলের সুখ-দুঃখের ব্যথা বুঝা, এবং তার প্রতিকারের দরুণ নিজের অনুভব এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলেরই সাধ্য নয়। কেননা নিজকে ব্যাপ্ত করে সকলের মাঝে অনুভব করা, সাধন-সাপেক্ষ ! সাহিত্য সৃষ্টিরও সাধনা রয়েছে ! সে সাধনায় তিল তিল করেই সিদ্ধিলাভ হয়।

—*—

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন

—*—

পথ দুইটি। একটী প্রবৃত্তির—অর্থাৎ আবৃত্তির পথ, আর একটি নিবৃত্তির—অর্থাৎ অনাবৃত্তির পথ। এক পথে গেলে আর ফিরিতে হয় না, সেইটিকেই উপনিষদ বলেন; উত্তরায়ণের পথ, জ্যোতির পথ, অমৃতের পথ, দেবযান ইত্যাদি; আর এক পথে গেলে পুনরাবৃত্তি হয়, সেইটিকেই বলা হয় দক্ষিণায়নের পথ; মৃত্যুর সরনি, ধূমাবৃত কৃষ্ণপথ, সংসারাবর্ত্তনের পথ, পিতৃযান। সহজ সাধকও পুনঃ পুনঃ বারণ করিতেছেন, সাবধান, দক্ষিণে যাইও না, ও পথ মরণের। দক্ষিণদিকের অধিপতি যম, কাজেই সেই পথে মৃত্যু ছাড়া অব্যাহতি নাই। দক্ষিণায়নের পথ মৃত্যুর পথ, এই পথে মানুষকে অবিরাম দুঃখ পাইতে হয়! নিবৃত্তির পথই পরমধাম, সেই পথে মানুষের শাশ্বত আনন্দ লাভ করিবার সৌভাগ্য হয়। সেই পরমধামে গেলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। গীতাতেও

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

—যে অবস্থা লাভ হইলে পুনর্জন্ম একেবারে ঘুচে যায়, তাহাই হইল আমার পরমধাম। কাজেই পরমধামে পৌঁছিতে হইলে নিবৃত্তির পথেই অর্থাৎ উত্তরায়ণের পথেই যাইতে হইবে! সেই পথের গতি ক্রমশঃই উৰ্দ্ধমুখী হইয়া গিয়াছে—কাজেই সেই পথে আর পতনের আশঙ্কা নাই! সেই পথ ক্রমোন্নতির পথ। কোন্ পথে গেলে ফিরিয়া আসিতে হয়, আর কোন পথে গেলে পুনরাবর্ত্তন হয় না গীতাকার তাহাই বলিতেছেন।

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥

—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! কোন সময় মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ হয়, আর কোন সময় মৃত্যু হইলে পুনরায় সংসারে জন্ম নিতে হয়, আমি তোমাকে সেই সেই কালের কথা বলিব!"

সাধু মহাপুরুষরা সেই কাল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ। কোন্ সময়ে দেহত্যাগ হইলে সংসারে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতে পারেন! কথিত আছে, ভীষ্মদেব নাকি শত্রুদের বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও উত্তরায়ণের দরুণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কেননা উত্তরায়ণের পথই হইল শ্রেষ্ঠ পথ। কষ্ট ভোগ করিয়াও সেই পথে যাইতে পারিলে আর পুনরাবৃত্তির ভয় থাকে না। সেই জন্যই বোধ হয় ভীষ্মদেব এত কষ্ট সহ্য করিয়াও—সেই উত্তরায়ণের দরুণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন! উত্তরায়ণের পথে উন্নীত হইতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন—প্রবৃত্তিকে সংযত করা মুখের কথা নয়। মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা সহজে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না। দুঃখ পাইলেও, মানুষ এই ভোগের পথেই বারবার আসা-যাওয়া করিতে চায়।

যোগীরা বলিয়া থাকেন, নিশ্বাসের গতি দেখিয়া নাকি কর্ম্মাকর্ম্মের গতি ও ফলাফল নিরূপণ করা যায়। ইড়া আর পিঙ্গলাকে গঙ্গা যমুনা বলা হয়। পিঙ্গলাই যমুনা, দক্ষিণদিকে বহিতেছে, এই পথে গেলে ভীষণ অন্ধকারে নিপতিত হইতে হয়, উদ্ধারের কোন আশাই থাকে না। কাজেই যোগীরা আত্ম-সংযম দ্বারা সেই পথকে নিরোধ করিয়া—উত্তরায়ণের পথে গমন করেন! যোগীরা দেহত্যাগ করিবার কালে, সময় এবং কালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন এই জন্যই! আত্ম-চেষ্টা ছাড়াও মানুষকে উন্নত করিবার দরুণ অনুকূল প্রকৃতি রহিয়াছে, সেই প্রকৃতি এবং কালের দরুণ অপেক্ষা করিলে, উন্নতি সহজ-সাধ্য হয়!

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

ছয়মাস উত্তরায়ণ, আর ছয়মাস দক্ষিণায়ন! অগ্নি ও জ্যোতিঃ অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অহঃ অর্থাৎ দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এই অতিবাহিকী দেবতাদের পথ ধরে যাঁরা চলেন, সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ দেহান্তে ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে অবশেষে ব্রহ্মপদ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। এই দেবযানই ব্রহ্মমার্গ বা ক্রমোন্নতির পথ। সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যাঁহারা যায়, তাঁহারাই ক্রমোন্নতির পথের যাত্রী। কথিত আছে, লোকনাথ ব্রহ্মচারীও নাকি দেহত্যাগ কালে এই আদিত্য রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবযান বা ব্রহ্মমার্গেই তাঁহার গতি হইয়াছিল! যাঁহারা উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করেন (উৎরান্ সংক্রান্তিতে মরেন) এবং দেহান্তে দেবযান মার্গে গমন করেন, তাহারাই অবশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন!

আর একটি পথ হইল—দক্ষিণায়ন। ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইত্যাদি অতিবাহিকী দেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিতে করিতে কর্ম্মযোগী চন্দ্রমার জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবর্ত্তিত হন! দক্ষিণায়নের পথে গেলে ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগান্তে আবার জন্ম নিতে হয়! ইহাকেই সংসার চক্রের পথ বলা হইয়া থাকে! এই পথে আর আসা-যাওয়ার নিবৃত্তি নাই, অস্থায়ীভাবে কিছুদিন মাত্র স্বর্গভোগ হয়।

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দ্বিবিধ গতি অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে প্রথমটীর দ্বারা অনাবৃত্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর অপরটীর দ্বারা সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মাধিকারী জীবের শুক্লা ও কৃষ্ণা এই দ্বিবিধ গতিই নিরূপিত। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পথ চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে! ভোগ দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি আসে না, নিবৃত্তির পথে, সংযমের পথে চলিলে তবে নিবৃত্তি আসে। ভোগে চিত্ত আবিল হইয়া ওঠে, তাহাতে সব অন্ধকার হইয়া যায়, তাহার জন্যই ভোগের পথকে কৃষ্ণ-পথ বা ধূমমার্গ বলা হইয়াছে!

জ্ঞানের পথ—আলোর পথ; তাহাতে সবই স্পষ্ট উজ্জ্বল, কোথায়ও অজ্ঞানাচ্ছন্নতা নাই! দিব্য-দৃষ্টি খুলিলে, তবে এই পথের সন্ধান পাওয়া যায়, অজ্ঞানান্ধ জীব এই পথের সন্ধান জানে না। কাজেই বারবার তাহাদের সংসারেই আবর্ত্তিত হইতে হয়!

উপনিষদ বলিয়াছেন—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥

আত্মহন্ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বিমুখ ব্যক্তি, মৃত্যুর পর অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য লোকে গমন করে। 'আত্মহন' অর্থ—আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান সত্ত্বেও, যাহারা অবিদ্যাবশতঃ তাঁহার অজর অমরাদি ভাবগুলি অনুভব করিতে অক্ষম। এই জন্যই আত্মজ্ঞানহীন জনগণকে 'আত্মহন' বলা হইয়াছে। তাহারা দেহত্যাগের পর এই আত্মহনন অপরাধেই পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে!

চিত্তের মালিন্য হেতুই আত্ম-জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশিত হইতে পারে না। এই জন্যই চিত্ত-শুদ্ধির দরুণ সাধনার প্রয়োজন! স্বর্গলাভ করিবার লোভে পড়িয়া বাহিরের কতকগুলি শুভ-অনুষ্ঠান করিলেই বিশেষ কোন ফল হয় না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ হইলে আবার সেই পুনরাবর্ত্তন হয়।

প্রশ্নোপনিষদে নবম এবং দশম শ্লোকে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে।

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে; তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥৯

—প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ; তাহার দুইটী অয়ন বা পথরূপ অংশ আছে—একটি দক্ষিণ, অপরটী উত্তর। অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ অনিত্য ইষ্টকর্ম্ম—বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম এবং পূর্ত্ত—স্মৃত্যুক্ত কূপ ও উদ্যান নির্ম্মান প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থানপ্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয়। প্রজাকাম বা সন্তানার্থী এই সকল ঋষি দক্ষিণায়ন—ধূমাদিমার্গ প্রাপ্ত হয়। ইহাই রয়ি—সর্ব্বভোগ্য, যাহা পিতৃযান বলিয়া কথিত হয়!

এই ভোগের পথে সকলেরই প্রবৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ পুত্র, বিত্ত, ও স্বর্গাদি লোক লাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন! সন্ন্যাসই নিবৃত্তির পথ, এই পথে সমস্ত কামনার নির্ব্বাণ হয়। উত্তরায়ণের পথে, আদিত্যলোকে সকল তমের বিনাশ হয়! ভোগের লালসা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ না হইলে, উত্তরায়ণের পথে উন্নীত হওয়া যায় না। এই জন্যই ভিতরে তপস্যার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, মনের সমস্ত মালিন্য এবং আবর্জ্জনাকে আহুতি দিয়া, অর্চ্চিরাদি মার্গে উন্নীত হইতে হয়।

পৌষ সংক্রান্তিকেই উৎরান্ সংক্রান্তি বলা হয়। এই মাস হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। এই সংক্রান্তি দিনে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই খড় কিম্বা অন্য কিছু দিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার পর তাহা পুড়িয়া ছাই করিয়া ফেলা হয়। অনুষ্ঠানটী বোধ হয় মূল ভাবেরই রূপক মাত্র। অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির পর হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, এই উত্তরায়ণ হইল অর্চ্চিরাদি মার্গ, কাজেই তাহাতে কোনরূপ মালিন্য থাকে না। যত কিছু মালিন্য এবং আবর্জ্জনা সংক্রান্তি দিনেই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়—তাহার পর অমৃতের পথে যাত্রা সুরু হয়! দাহ না হইলে, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি আসে না। এই জন্যই চিত্তশুদ্ধির দরুণ, তপস্যারূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়। এই অগ্নিশুদ্ধির পরই দেবযান পথে উন্নীত হইবার অধিকার জন্মে। চন্দ্রের—রয়ির—অন্নের ক্ষয়বৃদ্ধির ভয় আছে, কিন্তু আদিত্যরূপী প্রাণের কিছুতেই ক্ষয় হয় না। প্রাণোপাসকের কোন দিন পতন হয় না, প্রাণোপাসক নির্ভীক। প্রাণোপাসকের অক্ষয় বীর্য্য লাভ হয়, সেই বীর্য্য সামান্য কারণে বিচলিত হয় না, আর বিচলিত হইলেও মহৎ কার্য্য সঙ্কল্প না করিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় না!

অন্ন হইতেই স্নিগ্ধ-শুক্রের জন্ম, সেই শুক্র হইতেই ওজঃধাতু বা বীর্য্যের উৎপত্তি, সেই বীর্য্য হইতেই প্রাণশক্তির উদ্ভব হয়। কাজেই সাধনা এবং সংযমের দ্বারা প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, তখন আর কোন কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না! কাজেই প্রাণশক্তি লাভ করিতে হইলে, নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিতে হইবে! প্রাণের ক্ষয় নাই—আত্মার ক্ষয় নাই, আদিত্যের ক্ষয় নাই, কিন্তু চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি আছে। কাজেই রয়ির পথ—আবৃত্তির পথ। আদিত্যরূপী সূর্য্যের পথ, অনাবৃত্তির পথ! এখন সেই অনাবৃত্তি সাধন-পথের কথাই বলা হইবে।

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্; এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥

—পূর্ব্বে দক্ষিণ মার্গের কথা বলা হইয়াছে, এখন উত্তর মার্গের কথা বলা হইতেছে। আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন, অর্থাৎ আদিত্যলোকে গমন করেন। ইহাই প্রাণ সমূহের আয়তন (আশ্রয়) ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), ইহাই অভয়, এবং ইহাই পরমার্থ (উৎকৃষ্ট স্থান)—এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। কারণ ইহাই তাহাদের নিরোধ বা অনাবৃত্তি সাধন। অথবা নিরোধ অর্থে অবিদ্বানগণের অগম্য স্থানকেও বুঝায়।

উত্তরায়ণ হইল নিবৃত্তি সাধনের পথ। কাজেই তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা এই তিনটি দৈবী সম্পদ অগ্রে অর্জ্জন করিতে হইবে! তপস্যা বলিতে— তিতিক্ষা শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম। সর্ব্বশেষে আস্তিক্য-বুদ্ধি অর্জ্জন। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা (অর্থাৎ উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্তকেই অন্বেষণ করিয়া "আমিই তদাত্মক" এইরূপে আদিত্যকে জয় করিতে হইবে। এই আদিত্য বা প্রাণরূপী সূর্য্যই সকলের আশ্রয়স্থল। ইহাই বিদ্যাসহকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের উৎকৃষ্ট গম্য স্থান।

দুইটি প্রণিধান যোগ্য কথাই ইহার মাঝে রহিয়াছে। প্রথম কথা হইল—আত্মাকে বা প্রাণ-রূপী সূর্য্যকে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা এবং বিদ্যাদ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে, সেই অন্বেষণের ফলে চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হইবে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেলে তখন আবার অনুভব হইবে যে "আমিই তদাত্মক" অর্থাৎ আত্মা বা প্রাণরূপী সূর্য্য। কাজেই আত্মজ্ঞান আর কিছুই নয়—নিজেরই ব্রহ্মানুভূতির, অর্থাৎ আমি যে বিরাট এই উপলব্ধির পথে যত বাধা-বিঘ্ন আছে তাহাকেই তিরোহিত করিয়া দেওয়া। অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া গেলেই—আত্মস্বরূপের মহিমা স্বভাবতঃই উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। চিত্তের মালিন্য দূরীভূত না হইলে, "আমিই তদাত্মক" এই অনুভূতি আসে না! আর সাধারণ লোক এই জন্যই ব্রহ্ম হয়ে যাওয়াটাকে এত ভয় করে! এই বিরাট ভাব ধারণ করিতে হইলে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। কাজেই উত্তরায়ণের পথ সাধনার পথ—ইহা ভোগের পথ নয়।

সহজ কথায় বলিতে গেলে, নিজকে জানার পথই হইল উত্তরায়নের পথ, আর নিজকে ভুলিয়া থাকার পথই হইল দক্ষিণায়নের পথ। বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, বরঞ্চ তাহাতে আত্মানুভূতির বিলম্ব ঘটায়। তবে কিনা বিদ্যাসহকৃত জ্ঞানীর কর্ম্ম, কখনো বন্ধনস্বরূপ হয় না। কেবল কর্ম্মী, কেবল জ্ঞানী হইলেই মুস্কিল!

উত্তরায়ণ পথের যাত্রী যাহারা, তাহাদের সংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা সংযমী না হইলে কষ্ট-সহিষ্ণু হইতে পারা যায় না। অসংযমী মাত্রেই দুর্ব্বল। দক্ষিণায়ন কালে সংযমী না হইলে, উত্ত-রায়ণে নিদারুণ কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, উত্তরায়ণ পথের যাত্রীদের—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা থাকা একান্ত প্রয়োজন! উত্তরায়ণের যথাযোগ্য যাত্রী এই জন্যই খুব কম মিলে। উত্তরায়ণের পথ—তপস্যার পথ কিনা।

আত্ম-প্রত্যয়

—*—

ইচ্ছার অমোঘ শক্তি। মানুষ ইচ্ছা করলে নিজের ভাব অপরের মাঝেও অনায়াসে সঞ্চারিত করতে পারে, যারা পারে তারাই গুরু—নায়ক পরিচালক—leader। পরিচালনার শক্তি সকলের মাঝে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে না—সকলেই নিজের ইচ্ছানুযায়ী অপরকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। সেই শক্তি লাভ করতে হলে, আত্ম বিশ্বাস এবং তপস্যার প্রয়োজন! তপস্যায় সিদ্ধ হতে পারলে, নিজের শক্তি, ভাব অপরের মাঝেও সঞ্চার করবার ক্ষমতা জন্মে। কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্ এই বজ্রদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের কথাই বলেছিলেন—

And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

সত্য গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রত্যেকের মাঝেই রয়েছে, কাজেই সত্যবাণীতে সকলই উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারে না! সত্য সকলের প্রাণেই সাড়া দেয়, বিদ্বান কিম্বা মূর্খ বলে কোন কিছু আসে যায় না! কাজেই আসল কথা হল সত্য উপলব্ধির গভীরতা নিয়ে, নিজের মাঝে গভীরভাবে তলিয়ে গিয়ে যে সত্যের ইঙ্গিত এবং আভাস পাওয়া যায়, সেই সত্যের বাণীতে সকলের প্রাণকেই স্পর্শ এবং মুগ্ধ করে! আমরা উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা নিয়ে, কেবল ভেদেরই সৃষ্টি করি! ঐক্যের সন্ধান পেতে হলে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যে নিবিড়তম সম্বন্ধ রয়েছে তা অনুভব করতে হলে, নিজের মাঝেই নিজকে তলিয়ে দিতে হবে। আত্ম-চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেলে, যে সামঞ্জস্যের দীপ্তি অন্তরে বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে যায়, তাতে অনেক নিগূঢ় রহস্যেরই সন্ধান মিলে! মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস রাখে না বলেই, অপরকেও বিশ্বাসের অগ্নি-মন্ত্রে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে না। তা না হলে আমার সত্যিকার অনুভব—অপরের হৃদয়ের সত্যকেও উদ্বুদ্ধ না করে থাকতে পারে না। মহাপুরুষদের বাণীতে আমাদের অন্তর প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে কেন? না সেই বাণী—যথার্থ অনুভবের বাণী। সেই বাণী যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা করে না, প্রাণ থেকে উদ্ভূত হয়ে, প্রাণকে স্পর্শ করে, আবার প্রাণেই মিলিয়ে যায়!

সত্য সঙ্কল্প কোন দিন ব্যর্থ হয় না, এক স্থলে তার রূপ ফুটে উঠেই! আমাদের আশা জল্পনা-কল্পনা সব ব্যর্থ হয়ে যায়, তার মূল কারণই হল, সত্যের অভাব। সত্য-চিন্তার বিনাশ নাই, কারও না কারও প্রাণে সত্যরূপে তা বিকশিত হয়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। শুদ্ধ আধারেই সত্য মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

আমরা সবাই পরিচালিত হচ্ছি সত্য দ্বারা, কাজেই সত্যের সঙ্গে আমাদেরই সকলেরই সংযোগ রয়েছে। সত্য-চিন্তা বা ভাবনা দ্বারা অপরকেও আকৃষ্ট করা যায়, কেননা সবাই যে সত্যের পূজারী। সত্যের চেয়ে ভালবাসার সামগ্রী আর নাই। কাজেই সত্যলাভ করে, মহাপুরুষরা যখন সেই সত্য বিলাবার দরুণ ব্যাকুল হয়ে উঠেন, তখন সত্যলাভেচ্ছু মাত্রেই আকুল হয়ে ছুটে আসে। এই যে অনিবার্য্য আকর্ষণ, সত্যের দরুণ অফুরন্ত ব্যাকুলতা—ইহা হিপ্‌নোটিজম্ নয়; জেনে-শুনে সজ্ঞানেই তারা ছুটে আসে, তাদের চিত্তে কোনরূপ আচ্ছন্নতা থাকে না!

নিজের মাঝে গভীরভাবে তলিয়ে যেতে পারলে, অনুভবেরও ব্যাপ্তি ঘটে! সেই অনুভব আর ব্যষ্টির অনুভব বলে, সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না, সেই অনুভব সকলের অনুভব রূপেই অন্তরের মাঝে ফুটে উঠে। তখন জোর করেই বলা যায় যে, আমার ভাবে আর তোমার ভাবে কোন পার্থক্য নেই। আমি যা ভাব্‌ব—তুমিও তা ভাবতে বাধ্য!

সত্য ভাবনা বিশুদ্ধ আধারেই রূপ পরিগ্রহ করে। এই জন্যই বিশুদ্ধ আধারেই সত্যের বিকাশ হয়। কাজেই আমার সত্যিকার অনুভবও আবার যোগ্য অধিকারীর প্রাণেই সহজে ক্রিয়া করবে! প্রত্যেক জায়গাতেই স্তর রয়েছে! এক স্তরের লোকের মাঝে সহজেই ভাবের ক্রিয়া সঞ্চারিত হয়ে যায়। আধার অবিশুদ্ধির ফলে বা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত নয় বলে অনেক সময় সত্যও ব্যাহত হয়! এই জন্যই আমি যা ভাবব, এবং আমার ভাব দ্বারা যারা ভাবিত হবে—উভয়ের মাঝেই ঐক্য থাকা চাই!

সত্য বিলাবার এবং সত্য-গ্রহণের আকুলতা উভয়পক্ষে সমান থাকলেই সত্যশক্তি স্থায়ীভাবে সঞ্চারিত হয়। তা না হলে সাময়িক ভাবে অপরের চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে বিশেষ কোন ফল হয় না। বিবেকানন্দের lecture শুনে আমেরিকার অনেক মহিলারই নাকি সাময়িক খুব উচ্চভাব আসত, কিন্তু আধার অবিশুদ্ধির ফলে পরক্ষণেই আবার মন নিম্ন-ভূমিতে নেমে পড়ত, কাজেই বিশুদ্ধ ভাবকে ধারণ করতে হলে নিজের ব্যক্তিগত সাধনারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভাব-সঞ্চার করা যেমন গুরুর কাজ—তেমনি ভাবকে হজম করবার বা ধারণা করবার ক্ষমতাও আবার শিষ্যকেই অর্জ্জন করতে হবে। বজ্রদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের বলে অপরের চিন্তা-ভাবনার মাঝেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু দুর্ব্বল আধারে অনেক সময় শক্তির ব্যর্থতাও হয়। অনেক সময় ভাবকে আত্মগত করে নিতে পারে না বলেই, দুর্ব্বল সাধকের মনে এক মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়!

সত্য-লাভের প্রেরণা সবার মাঝেই রয়েছে—কিন্তু সেই প্রেরণা চিত্তের মালিন্য হেতু অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কাজেই চিত্তকে বিশুদ্ধ পরিমার্জ্জিত করে তুলতে না পারলে, সত্যবাণীতে তেমন উদ্বুদ্ধ করে না প্রাণকে। সঙ্কল্পের ক্রিয়া অব্যর্থ বটে, কিন্তু আধারের যোগ্যতা অনুসারে তার প্রকাশের তারতম্য ঘটে।

বিশুদ্ধ আধারকে অবলম্বন করেই ভাবের স্ফুরণ হয়! ভাব সকলের জীবনে মূর্ত্ত-প্রেরণারূপে আবির্ভূত হয় না। যারা সাধক, তপস্বী, তাদের জীবনেই শুভ-ইচ্ছার ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রকাশ করে! এই জন্যই জীবনকে শুভ-ইচ্ছার বাহন করতে হলে, সাধনা চাই, তপস্যা চাই। মন-প্রাণকে এক সুরে বাঁধতে না পারলে, উচ্চাঙ্গের অনুভূতি আসে না, কিম্বা আসলেও তাকে ধারণ করে রাখার ক্ষমতা হয় না!

একজনের চিন্তায়, আর সবাই পরিচালিত হতে পারে! তবে কিনা সেই চিন্তা মূলে সবারই চিন্তা হওয়া প্রয়োজন। হয়ত সবারই প্রাণে ভাল হবার আকুল ইচ্ছা রয়েছে, তবে কিনা আত্মশক্তির অভাবে সেই ইচ্ছাকে সবাই সক্রিয় করতে পারে না, তাই অপরের আত্মশক্তির প্রভাবে যখন আত্মা জেগে উঠে, তখন শুভ-ইচ্ছার নির্দ্দেশে চলা প্রতিবন্ধক বলে মনে হয় না! মানুষ প্রাণে প্রাণে যা চায়, অনেক সময় সংস্কারের মোহে, তাকে চেপে রাখে, কিন্তু আত্মশক্তি সম্পন্ন সাধক সে জায়গাতেই এসে দুর্ব্বলকে তুলে ধরেন। তিনি এসে বলেন, এই যে তোমার প্রাণও খাঁটী জিনিষকেই চাইছে—তুমি এত ভয় করছ কেন? এই কথা শুনে দুর্ব্বলের প্রাণেও আত্ম-মহিমার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে! এর পর হতে হয়ত তার জীবন অন্য ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

নিজের প্রত্যয়ে কোন ভগ্নাংশ যদি না থাকে, তাহলে সেই প্রত্যয় দ্বারা অপরকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারা যায়। হয়ত প্রতিকূল চিন্তা দ্বারা সেই প্রত্যয় সাময়িক ভাবে ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু দু'দিন পরে সবাই তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য! কেননা সত্য ছাড়া যে মানুষ বাঁচতে পারে না, সত্যই যে বল, বলহীন হয়ে মানুষ কয়দিন টিকতে পারে?

অপরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেন যারা, তাঁরা অখণ্ড আত্ম-প্রত্যয়ী—জীবন গেলেও, সেই প্রত্যয় হতে তারা বিচ্যুত হন না। কেননা প্রত্যয়ই যে তাঁদের প্রাণ, প্রাণকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে? প্রত্যেকের মাঝেই এই অখণ্ড আত্ম-প্রত্যয়ের বীজ উপ্ত আছে, কাজেই আত্ম-প্রত্যয়ীকে দেখে প্রাণে সাড়া না দিয়ে পারে না। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে জীবন আরও বেশী উদ্বুদ্ধ হয়—এই জন্যই আত্ম-প্রত্যয়ীর বাস্তব জীবনের ধারা অপরকে আরও বেশী সজাগ উদ্বুদ্ধ করে তুলে।

যে কোন অবস্থায়, দারুণ অধঃপতনের যে কোন নিম্নতম সোপানেই মানুষ থাকুক না কেন আত্ম-প্রত্যয়ী আত্ম-বিশ্বাসের বলে সকল আবরণকে ভেদ করে, প্রত্যেকের অন্তরতম নির্ম্মল সত্ত্ব মূর্ত্তিকেও প্রত্যক্ষ করেন। এই জন্যই তাদের কাছে ঘৃণিত বলে কিছু নাই! এই আত্ম-প্রত্যয় এবং দিব্য-দৃষ্টি এলেই—মানুষ মানুষকে ঘুম হতে, মোহ হতে, জাগিয়ে তুল্‌তে পারে। কেননা প্রত্যেকের মাঝে যে জলন্ত ভগবান্ রয়েছে—এই অনুভবে যে তারা সিদ্ধ!

আসল কথা হল, নিজকে জানা—নিজকে পাওয়া। নিজকে পেলে, তখন বুকে অফুরন্ত বল আসে, সেই বল দ্বারা অপরকেও আত্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়। সেই দীক্ষাই সহজে ক্রিয়া করে, কেননা দীক্ষার মন্ত্র যে আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত। তা না হলে আত্ম-প্রত্যয়-বিহীন বাণীতে কোন ক্রিয়াই করে না। মন্ত্র-শক্তি অব্যর্থ ভাবেই ক্রিয়া করে, যদি সেই মন্ত্রে আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করা যায়। সব নির্ভর করে সাধকের আত্ম-প্রত্যয়ের উপর। এই প্রত্যয় দ্বারাই জগৎ নিয়ন্ত্রিত!

কাজেই আমার সত্য-ভাবনার দ্বারা, তুমিও উদ্বুদ্ধ হবে এ আর অসম্ভব কি? চিন্তা ভাবনা মৌলিক হলে, সকলের প্রাণকেই স্পর্শ করে, কেননা মূলে সবার ভিতরই এক ভাব রয়েছে। কিন্তু সেই ভাবের সন্ধান সবাই পায়না, আর প্রত্যক্ষ ভাবে সেই ভাবের সন্ধান না পেলে বুকে জোরও আসে না। তখন প্রতি কথায়, প্রতি কর্ম্মে একটা অবিশ্বাস এবং আশঙ্কার ভাব থেকেই যায়। এই জন্যই তন্ময় হযে যারা মূল-ভাবের উৎস আবিষ্কার করতে পেরেছে, তারা যে প্রত্যয়ের বাণী বলেন, তাতে একটা অব্যর্থ শক্তি সঞ্চারের বীজ থেকে যায়। আত্ম-প্রত্যয়ীর কথায় লোকের প্রাণ বিশেষ ভাবে সাড়া দেয়!

আমরা আত্ম-প্রত্যয়ীর কথায় উদ্বুদ্ধ হই, আর ভাবি, না জানি তার ভিতর কি এক দুর্লভ শক্তির সঞ্চার হয়েছে! কিন্তু আসল কথা যে আর কিছুই নয়—মাত্র সে নিজকে বিশ্বাস করে। এই সহজ কথাটাই আমরা বুঝ্‌তে পারি না—কেননা আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা মানুষকে এত সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়, আত্ম-প্রত্যয় না হলে তো তা বুঝ্‌বার উপায় নাই।

—*—

সংস্কার

—*—

সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। সংস্কার হইতে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ কি? দ্বিতীয় বার জন্ম হয়েছে যার, সেই দ্বিজ। সে তো পাখীরও অর্থাৎ যারা অণ্ডজ, ডিম হতে জন্মায়, তারাও একবার মাতৃ-কুক্ষি থেকে ডিম রূপে, আবার ডিম থেকে শাবক রূপে, মোট এই দুই বার জন্মগ্রহণ করে থাকে। তাহলে পাখীর চেয়ে এই দ্বিজের পার্থক্য কি? পার্থক্য ওই সংস্কারে। মাতৃদেহ হতে যে দেহ হয়, তা সকলেরই একরূপ অর্থাৎ কতক-গুলি পাঞ্চভৌতিক গুণ-সমষ্টি স্বরূপ। এই দেহকে সাধারণ কথায় আমরা মাটীর দেহ বলে থাকি। বাস্তবিক পক্ষে এই দেহের মাঝে ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতের উপাদান থাক-লেও বিশেষ বেশীর ভাগ থাকে ক্ষিতির বা মাটীর, তাই এ দেহকে আমরা মাটীর দেহ বলি। এই সাধারণ স্থূল দেহ সকলেরই জাতি, আয়ু ও ভোগের অনুসারে মাতৃ-পিতৃ সংযোগে উৎপন্ন হয়ে পরপর প্রারব্ধক্ষয় করে। কিন্তু স্থূল দেহ দ্বারা স্থূল কর্ম্ম করে, তাহা দ্বারা সেই সমস্ত কর্ম্মের পরিণামের বা পাপপুণ্যের হাত থেকে কি করে বাঁচা যায়, তা এই স্থূল দেহ বলে দিতে পারে না। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বা ধারণা বশে আমরা কর্ম্ম করে যাই, কিন্তু সেই ধারণারও যে আবার সংস্কারপূর্ব্বক এই জীবনেই সেই সমস্ত কর্ম্মই পাপ-বন্ধনের কারণ না হয়ে, পুণ্যরূপ মুক্তির আলোক দিতে পারে, এমন সামর্থ্য জন্মে। তাই এই সংস্কারকে দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। পূর্ব্বের জন্ম শুধু দেহের জন্ম, এই লোকে বেঁচে থাকবার আধার পাওয়া; আর এই পরের জন্ম হচ্ছে আধ্যা-ত্মিক রাজ্যে বেঁচে থাকবার, সত্যিকার অমর হওয়ার প্রথম কৌশল জানা।

এই সংস্কার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিরই লাভ হত। যারা এই সংস্কারকে গ্রহণ করে তদনুযায়ী চল্‌তে না পারত, সেই শূদ্রের পক্ষে সহজ উপায় ছিল সেবা। সেবা দ্বারা দ্বিজের অন্তরের সংস্কার তাদের মাঝে সংক্রমিত হত। শূদ্র ঘৃণার পাত্র নয়, কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত জ্যেষ্ঠের সেবা দ্বারা আপন শক্তির ন্যূনতাটুকু জ্যেষ্ঠের সহায়ে পূরণ কর্‌বার সুযোগ তার ছিল। আবার যেখানে আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম তথ্য শূদ্রের মাঝেও আয়ত্ত হত, সেখানে সে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে কোন অংশে হীন হত না, বরং বহু ব্রাহ্মণও এসে সেই শূদ্রের কাছ থেকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করতেন। এমন যথার্থ গুণের আদর ছিল বলেই নিকৃষ্ট ব্যাধের মুখ হতে নির্গত বাণীও ব্যাধগীতা রূপে হিন্দুর শাস্ত্রে আজ পর্য্যন্ত বরেণ্য হয়ে আছে। কিন্তু আচারে-বিচারে শূদ্র থেকেও আসলে চিত্তকে ব্রহ্মতত্ত্বে সংলগ্ন রাখা কচিৎ দুই এক জনের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে! সেখানেও হয়ত অনুসন্ধানে জানা যেতে পারে যে, এই জীবনের প্রথমাবস্থায় বা পূর্ব্ব জন্মে সেই চরম তত্ত্ব আয়ত্ত করতে সে ও কিছু কম চেষ্টা করেনি। তারপর হয়ত তার ফল বিশেষ কোনও কারণে ছাই চাপা আগুনের মত তার অন্তরে লুকানো থাকলেও বাইরে তাকে নীচ কুলের আচার নিয়েই থাকতে হচ্ছে। বেদে আচানক সিদ্ধ বা হঠাৎ সিদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়, এ যুগেও জন্মের পর থেকেই কতকগুলি অলৌকিক গুণের বিকাশ হয়েছে, এমন অনেক মহাত্মার কথা শুনা যায়। কিন্তু জগতে বিনামূল্যে কিছুই মিলেনা, একথা যদি মান্‌তে হয়, তবে তাঁরাও আমাদের কাছে হঠাৎ সিদ্ধ হলেও আসলে তাঁদের সে সিদ্ধি হঠাৎ

হয়নি মোটেই, তার পিছনেও হয়ত জন্মান্তরের সাধনার ইতিহাস আছে!

যে দিক দিয়েই সাধনা করুক তার মাঝে সেই বিষয়ের সংস্কার বা ধারণা পূর্ব্ব-হতে বীজাকারে বেশী পরিমাণে না থাকলে সেই বিষয়ে তার আগ্রহ হয় না। জগতে অনন্ত বিষয়, অনন্ত অধিকারী, অনন্ত উপায় ও অনন্ত ফল রয়েছে! তার মাঝে যেটী আজ আমার মাঝে প্রবল হয়ে উঠ্‌বে সেটীর দিকেই স্বাভাবিক আমার ঝোঁক আসবে। এখানে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায়ই দেখা যায়, যে যেমন সংস্কারের লোক সে সেইরূপ সংস্কারের পিতামাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করে থাকে, এবং তার ফলে সেই বিষয়ে আরও উন্নত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। Heredityর (বংশধারার) নিয়মে পিতা পুত্রের মাঝে সেই বিষয়ের বীজ রেখে গেলেন—এইরূপ বলা হয় বটে কিন্তু কেন যে তেমনি পুত্র তারই গৃহে জন্মিল, এ প্রশ্নের মীমাংসা শুধু স্থূল কার্য্য-কারণের ব্যপার দিয়েই মীমাংসা হয় না। কেননা এমনও দেখা যায় যে, পিতা এক ভাবের, পুত্র আর এক ভাবের সংস্কারের অধিকারী। কিন্তু সেই পুত্রই এমন আবেষ্টনের মাঝে গিয়ে পড়েছে যে সেখানে তার অন্তরের সংস্কার দিন দিন দৃঢ়মূল এবং বর্দ্ধিত হবার সুযোগ পেয়েছে। যেমন করেই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সমানে সমানে যোগ রক্ষিত হয়েছেই। সংস্কারের উন্নতি হওয়া চাই, এই হল লক্ষ্য সে এখন জন্মগত অধিকারে থেকেই হোক, বা অন্যত্র গিয়েই হোক। কিন্তু কোনও না কোনও দিক থেকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সংস্কারের সাম্য না থাকলে সে গৃহে তার জন্ম হয় না। এই পিতা যে গুণের অধিকারী, পুত্রের মাঝেও সেই গুণের সম্ভবনা বেশী হওয়াই সকলে অনুমান করে। তাই ব্রাহ্মণের ছেলের মাঝেই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণত্বের দাবী আমরা বেশী করি। শূদ্রের মাঝে সে সংস্কার প্রথমেই কেহ আশা করে না। গুণগুলি এমনি বংশগত হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু সাধারণের exceptional case (ব্যতিরেক) ও যে না হয়, তা নয়। কিন্তু পরিণামে যদি সব রকমে দেখা যায় যে, জন্মগত অধিকার ছাড়াও কেহ স্বীয় প্রতিভা বলে আজন্মাধিকারীর চেয়ে কোনও অংশে কম অধিকারী নয়, তখনই তাকে আজন্মাধিকারীর প্রাপ্য অধিকার দেওয়া যেতে পারে। নতুবা শুধু অধিকার দিলেই অধিকারী হওয়া যায় না, বরং সে অধিকারের গৌরব দিন দিন খর্ব্ব হয়ে মূল্য হীন হয়ে পড়ে। অধিকারকে খর্ব্ব ক'রে অধিকারী হওয়ার চেয়ে, অধিকারীর আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে অধিকার আয়ত্ব হলে, তাতে অধিকার ও অধিকারী দুয়েরই মাহাত্ম্য বাড়ে বেশী। বশিষ্ঠ মুনি যদি সাধারণ স্বধর্ম্মাবমাননাকারী একটা যেমন-তেমন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব লোকের অবস্থা ভেবে, বিশ্বামিত্রকে তার চেয়ে বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত দেখে, প্রথমেই তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতেন—আসল ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনের জন্য, সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করতে, বিশ্বামিত্রকে বারম্বার ব্রাহ্মণ বলে যদি অস্বীকার না করতেন, তবে তাতে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণত্বের মহিমা এত বেশী হত না। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পরীক্ষায় আরও মহান্ বলেই পরিগণিত হয়েছিলেন, চরমতত্ত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হয়ে ব্রহ্মর্ষি নামে পূজিত হয়েছিলেন। আর যদি এখনকার মত শুধু একটা পৈতা গলায় দেওয়াই ব্রাহ্মণত্ব ধরে নিতেন, তবে এখনকার রামা-শ্যামা বাগদীর মতই থেকে যেতেন, আজ আমরা তাঁদের নামও করতাম না, ব্রহ্মণত্ব যে আসলে কতদুর উর্দ্ধজগতের কথা, তাও কল্পনা করতে পারা যেতনা।

আসলে চাই দিন দিন সংস্কৃত বা ভাল হওয়া। আমার অন্তরে যে সংস্কার রয়েছে. তাকে যদি দিন দিন উন্নত করে যেতে পারি, তবে বাইরের সমাজ যাই থাক, সে সমাজে আজ আমি যা বলেই পরিগণিত হই না কেন, একদিন আমাকে মানতে হবেই। সে মানা তর্কে বা শুধু বিরোধে হেরে গিয়ে মানা নয়, বাস্তবিক অন্তর নত হয়ে এলে, তখন বাইরকে নত করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হয় না। কিন্তু প্রথম উঠবার সময়ে আমাকে অপরে মানবে, কি না মানবে, সে দিকে মন না দিয়ে সত্যি উঠতে পারছি কি না, সে দিকেই সজাগ-দৃষ্টি চাই বেশী। যেমন আছি, অন্তরে ঠিক তেমনি থেকেই অথবা দিন দিন সে দিক দিয়ে অধঃপাতে গিয়েও বাইরের মান সম্মান বাড়াবার বা বজায় রাখবার উপায়গুলি আঁকড়ে ধরলেও সাধারণের অন্তরের অন্তর্যামী সে পূজোপকরণে ভোলেন না। বাইরে যদিও প্রমাণ প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে তবুও অন্তরে সে ব্যর্থ চেষ্টা ধরা পড়ে। আবার পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র বন্ধন হতে মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তরের আপ্রাণ চেষ্টা বাইরের বিনা বিজ্ঞাপনেও অপরের প্রাণে গিয়ে আঘাত দেয়। মানুষ কোন্ ছার, দেবতাও সে সাধনায় চমৎকৃত হয়ে তাকে তার যোগ্য আসন না দিয়ে পারেন না। মানুষের দুর্ব্বল সমাজকে ব্যাহত করে জোর করে আপনাকে বড় বলে জাহির করার চেয়ে এই যথার্থ বড় হওয়া চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকে। মানুষ যদি সেই মহত্ত্বের যোগ্য পুরস্কার নাও দিতে পারে তবু তা ব্যর্থ হয় না। প্রচেষ্টা বা অন্তরের লক্ষ্য যার মহান্ বাইরের আচারও তার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন সুন্দর হয়ে উঠবে। যে আচারের পিছনে মন পূর্ব্বে সজাগ ছিল না, তখন সে মন সজাগ হয়ে আপন আচার ব্যবহারের প্রত্যেকটী খুটী-নাটী পর্য্যন্ত বিচারের আগুণে দিন দিন শুদ্ধ ও সুন্দর করতে থাকে। জন্ম হতে অভ্যস্ত অভ্যাসগুলিও অলক্ষ্যে কুরুচিগুলিকে ছেটে ফেলে যাতে সুরুচি সম্পন্ন হয়, সেদিকে চেষ্টা জাগে। গ্রামের মানুষ আজন্ম গ্রাম্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেও, সহরে বাস করতে গিয়ে যেমন সেখানকার মতই নিজেকে তৈরী করতে সাধারণ চেষ্টা জাগে, আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ মুমুক্ষুর প্রাণও তেমনি উর্দ্ধজগতে প্রবেশের যোগ্য যাবতীয় আচারাদিকে শত কষ্টসাধ্য হলেও গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়। জন্মগত স্থান কাল পাত্রের কত রকম অদ্ভুত সংস্কার আমাদের মনের মাঝে গোপন থাকে—বাইরের আচার ব্যবহারে তার প্রকাশ হয়! কিন্তু অন্য কোনও সুন্দর নূতন সংস্কারকে গ্রহণ করতে মন তখন ইচ্ছুক নয়; তাই সেগুলি নিতান্ত কুরুচি সম্পন্ন বা আধ্যাত্মিক পথের পরিপন্থী হলেও সেগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, কাহারও সঙ্গে সেই সমস্ত সংস্কার নিয়ে বিরোধ হলেও সেগুলি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা জাগে না। বরং সেই সংস্কারও সেই বুদ্ধি দিয়ে দেখি বলে, সেই চোখে নিজের ব্যবহারের গলদগুলি ধরা তো পড়েই না, উপরন্তু অপরের আচারগুলি বাস্তবিক সুন্দর হলেও তখন তাকে সুন্দর বলে মনে হয় না। নিজে না বুঝ্‌লে সৌন্দর্য্য কি কাকেও যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়?

কাজেই নিজের সংস্কার, নিজের মনকেই উন্নত করে, তবে বাইরে যথার্থ সৌন্দর্য্যের বিচার করতে হবে। সংস্কার দ্বারা সবাই বিধৃত। কাজেই সংস্কারের সংস্কার বা মেরামত করেই তার মাঝে বাস করতে হয়! প্রকৃতির নিয়মে মানুষ যাতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠতে পারে, উচ্চ সংস্কার বা ধারণার অধিকারী হয়, সে জন্য চলতে ফিরতে জীবনের নিত্য ঘর কন্নায় আমাদের মনের মাঝে বিরোধ লেগেই থাকে; সাধারণ মানুষ এই বিরোধ নিয়ে যখন নিজের মনের বিচার করতে বসে, তখন কেবল অপরের দোষ সাব্যস্ত করেই সুখী হয়। যার মাঝে যতটুকু বিবেক বা সৎ ও অসতের

পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ হয়, সে ততটুকু নিজের দোষ বুঝতে পারে! নতুবা মহামায়ার এমনই প্রভাব যে নিজের উপর অত্যধিক মমতায় কাহারও নিজের দোষ নিজের চোখে ধরা পড়তে চায় না—নিজের মুখ নিজে না দেখা বিধাতার এক অপরূপ রসিকতা। সংস্কার বশে যাই করে যাই তার পিছনে বিচারের তীক্ষ্ণ খড়্গ না থাকলে আত্ম-মমতার হাত থেকে কেহই রেহাই পেতে পারে না। কিন্তু তীব্র ভাবে নিজকে সংস্কার করবার ইচ্ছা না থাকলে জন্মগত সংস্কারের ছদ্মবেশই ধরা যায় না—সংস্করণ আর হবে কি করে? অথচ জগতের প্রায় ষোলআনা বিরোধই নাকি পরস্পরের মনের গরমিলের জন্য। কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক বা ব্যক্তিগত, সমস্ত জীবনই মূলে একটী সংযোগ সূত্রে বাঁধা আছে। কিন্তু স্বার্থের সংস্কারের দেয়াল দিয়েই না আমরা পার্থক্য সৃষ্টি করে ফেলেছি।

প্রত্যেকের আপনাপন সংস্কার বিশুদ্ধ করতে করতে যে বিরাট ক্ষেত্রে পৌঁছা যায়, সেখানে সবার জায়গা হয় বলেই তা বৃহৎ বা ব্রহ্ম। পূর্ব্বে নিত্য-ঘরকন্নার মাঝেও ভারতের ঋষি এই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারতেন, তাই তখনও আর্য্য-অনার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মাঝে অনৈক্যের নিত্য ধূমায়িত বহ্নি ছিল না। আপনার মাঝে বিরাট্ বা প্রবল সংস্কার ছিল বলেই অপরকে তাঁরা সম্পূর্ণ জয় করে আত্মগত করে নিতে পেরেছিলেন। প্রবল শক্তি দ্বারা ঐক্যের বন্ধনে সমস্ত অনৈক্যকে কুক্ষিগত করতে পারতেন বলেই—তাঁরা ছিলেন আর্য্য বা শ্রেষ্ঠ। আর যাঁদের সে শক্তি ছিল না, তারাই ছিল, অনার্য্য বা নিকৃষ্ট শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটী আর্য্য বা শ্রেষ্ঠ সংস্কার লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম ঐক্যের সাধনায় নিরত হত। সে সাধনা শুধু পঙ্গু জীবনের দুর্ব্বল কামনা বা আশার মন্ত্র জপ করা নয়—জীবনে সর্ব্বপ্রকার সবলতার পরখ হওয়ার সুযোগ দিয়ে প্রতিক্ষণে আপনাকে যথার্থ বড় করার অজপাজপ চলত। নিজকে বড় করতে হলে শুধুই চোখ বুজে ভাবে বড় হলে চলে না, কর্ম্মের মাঝেও বৃহতের সাধনা চাই। জাতি, সমাজ ও দেশভেদে সে আচারের প্রবর্ত্তন ও সীমারেখা টেনে দিয়ে আচার্য্য তাঁর শক্তিতে পূর্ব্বের মত দূষিত সংস্কারকে নির্জ্জিত করে, পরম মহান্ সংস্কার দ্বারা জীবনের যথার্থ লক্ষ্য মর্ম্মগত করাবেন—তাই তখন সেই উপনীত ব্রহ্মচারী—সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।

কাজেই কেবল মুখের কথা নয়—আপন অন্তরের সংস্কারের সংস্কার করা চাই—সে শুধু বাইরে গলায় সূত্র ধারণ নয়, অন্তরের শুদ্ধি হতে না থাকলে "আজন্মাৎ জায়তে শূদ্রঃ"—সবাই জন্ম হতে শূদ্রই থেকে যায়। 'সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে', সে সংস্কার কি শুধু গুরুই করে দেন? তোমারও কি তাতে দায়িত্ব নাই! একদিন সংস্কার থেকে মুক্ত হবে, সেদিন সন্ন্যাসের দিন, মহামুক্তির দিন। কিন্তু তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমার যখন ভাল-মন্দ জ্ঞান রয়েছে, তখন আপন অন্তর সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে চলবে কেন? সেখানেও তোমাকে মন্দটা ছেড়ে ভালর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সে সংস্কার বাইরে থেকে কেউ করে দিতে পারে না। বাইরে শুধু direction বা নির্দ্দেশ পেতে পার, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চলতে হবে তোমার নিজেকেই। তোমার সংস্কারক তুমিই। তুমি শুধু দ্বিজ কেন, যতদিন পর্য্যন্ত তোমার ঈপ্সিত সংস্কার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে অন্তরে শিকড় না গাড়বে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে তুমি সংস্কৃত করতে থাকবে। প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ভাঙবে আর নূতন সংস্কার পেয়ে নূতন জন্ম পাবে—এমনি আপনাকে 'নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব' স্বরূপ ধারণার আগে কত সংস্কার, কত জন্ম দিনের মাঝে কত পরিবর্ত্তন, জীবনের মাঝে কত ওলট্-পালট হয়ে নূতন জন্ম গ্রহণ করতে হচ্ছে ও হবে, তার ইয়ত্তা নাই। কাজেই কেবল নূতন, কেবল নূতন—এই নিত্যনূতনের মাঝ দিয়ে যেতে যেতেই একদিন চির-নবীনের সাক্ষাৎ মিলবে। সমস্ত সংস্কারের বিলয় বা পূর্ণ প্রকাশ আপনার মাঝে প্রত্যক্ষ হবে।

অব্যক্তের-মহিমা

—(*)—

আমি জানি, এই বলে মানুষ গর্ব্ব করে, কিন্তু এ জানার গর্ব্ব দু'দিনেই চূর্ণ হয়ে যায়। কেননা জেনেও সে জানার অন্ত পাওয়া যায় না। ব্যষ্টিবুদ্ধি দিয়ে জানার ইতি করলেও দেখা যায়, জানার বিষয় আরও অনন্ত পড়ে রয়েছে। কিন্তু তবু মানুষ এই ক্ষুদ্র জানার অভিমান নিয়েই বড়াই করে। গীতায় একটী শ্লোকে আছে—

অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

আদি অব্যক্ত—মধ্য ব্যক্ত, আবার পরিণামও অব্যক্ত। কাজেই এই মাঝের বুদ্‌বুদের দরুণ এত যত্ন, এত আসক্তির কি প্রয়োজন? ন্যায় মতে যার আদি নাই, অন্ত নাই, তার মধ্যাবস্থাও নাই। কাজেই বুদ্ধিমানের এই অস্থায়ী অবস্থার প্রতি আসক্তি বা পরিবেদনার কোন প্রয়োজন হয় না।

আমরা কলরব করি এই বাস্তব জীবনের ক্ষণিক বিকাশ নিয়ে। কিন্তু অব্যক্ত জীবনের প্রতি কয়-জন নজর দিই? জীবন বল্‌তে যদি বিকাশকেই বুঝি, Potential শক্তিকে না ধরি, তাহলে সেই জীবনের পরিপূর্ণ জ্ঞান তো হল না। অবচেতনার জীবন কি জীবন নয়? সেই জীব-নেরও গভীর তাৎপর্য্য আছে। সেই অব্যক্ত জীবনের সন্ধান পেলে, এই ব্যক্ত-জীবনের প্রতি এত মোহ, এত আকর্ষণ থাক্‌ত না। এই স্থূল জগতের বিকা-শের মূলে যে অব্যক্ত সাধনা চল্‌ছে, তাকে জান্‌তে হলে কলরবের অন্তরালে ডুবে যেতে হবে। কান পেতে শুন্‌তে হবে ভিতরে ভিতরে কি আয়োজন কি উদ্যোগ চল্‌ছে। একটা জীবনের বিকাশের মূলেই কতজন কতভাবে যে অব্যক্ত-সাধনায় নিরত, তা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। জীবন শুধু বর্ত্তমানকে নিয়ে নয়—অতীত এবং ভবিষ্যতও তার সঙ্গে জোরা। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, এই তিন-স্তরে যদি অবাধে দৃষ্টি-সঞ্চার কর্‌তে পারা যায়, তাহলেই মানুষের মাঝে সাম্যাবস্থা সহজেই এসে পড়ে। Wakeful state যাদের, তারা স্থির ধীর, গম্ভীর, কোন কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি নাই তাদের।

সবই ত অব্যক্তের গর্ভেই নিহিত—ব্যক্ত আর কতটুকু? প্রকৃতির গর্ভে অনন্ত সম্ভাব্যতার বীজ সুপ্ত রয়েছে। আমরা যে ভাবনায়, যে-ধারণায় সিদ্ধ হয়ে পড়েছি, প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবে সব আবার ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে যেতেও বেশী সময় লাগে না। তখন আমাদের আশ্চর্য্য হয়ে বিস্ময়-নেত্রে অবলোকন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

বাস্তবিকই প্রকৃতি রহস্যময়ীই বটে; তাঁহার শক্তির বা মহিমার অন্ত নাই। আমাদের ভাব-নার অতীত কার্য্য ঘটিয়ে তোলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। কোথা হতে শক্তির বিকাশ হয়, শক্তি মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠে, তার রহস্য কে জানে?

অব্যক্তের মহিমা সর্ব্বত্রই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যারা একটু ধ্যানপরায়ণ তারাই তা বুঝ্‌তে পারে। ব্যক্ত-জীবনের প্রতি পদে পদে অব্যক্তের রহস্য লুকায়িত। যাঁরা সেই রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা ব্যক্ত-জীবনের উপর নির্ভর করেই চলেন না। অব্যক্তের মহতী শক্তির পরিচয়ে তাঁরা—বিস্মিত, মুগ্ধ।

সাধারণ মানুষ সাময়িক হর্ষ-বিষাদেই উৎফুল্লিত বা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কেননা প্রকৃতির অব্যক্ত

অংশের প্রতি তাদের লক্ষ নাই। বর্ত্তমানকে নিয়েই তাদের আনন্দ বা শোক। অব্যক্তকে বিশ্বাস করলেও, অব্যক্ত সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু বিচক্ষণ যাঁরা—ধীর যাঁরা, তাঁরা ব্যক্ত অবস্থা দেখেই বিচলিত হয়ে ওঠেন না—তাঁরা আরও গভীর ভাবে রহস্যানুসন্ধান করেন।

কার্য্যটা কারণ থেকেই উৎপন্ন; কাজেই উৎপত্তি স্থল কারণটাকে জানতে পারলে, কার্য্য-কারণ উভয়েরই একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আমরা মূলটাকে না ধরে, স্থূলকে নিয়েই মেতে পড়ি বেশী। আমরা ধ্যানপরায়ণের কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যাই—কি করে তারা অপরের জীবনের কথা বলে দিতে পারে। কিন্তু একটু সমাহিত হতে পারলেই নিজের অব্যক্ত জীবনের স্পন্দন বেশ স্পষ্ট হয়েই হৃদয়ের মাঝে ধরা দেয়। কিন্তু ধ্যান করতে বসে অনভ্যাসের দরুণ চিত্ত আমাদের সহজেই ঢলে পড়ে, অর্থাৎ অব্যক্ত থেকে অব্যক্তের সন্ধান নিয়ে ফিরে না এসে, সেখানেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকি!

যতই লাফালাফি করি না কেন, আসল জিনিষ আমাদের হৃদয়ে অর্থাৎ অব্যক্তভাবে আমাদের মাঝেই বিরাজমান। বহির্ম্মুখী চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী করতে পারলে অব্যক্তের মহিমা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু মানুষ চিত্তকে সহজে সমাহিত করতে পারে না। অব্যক্ত জীবন সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নাই বললেই চলে!

সব অব্যক্ত—কিন্তু তা অন্ধকার নয়। অব্যক্ত বলতে অনেকেই অন্ধকার বলে ভ্রম করেন, কিন্তু অব্যক্তের রাজ্য অনন্ত উজ্বল রহস্যে পরিপূর্ণ। পূর্ণ-চেতনা নিয়ে সেই রাজ্য হতে অনেক দুর্ল্লভ বস্তু নিয়ে ফিরে আসা যায়। আসল জিনিষ আমরা অব্যক্ত থেকেই পাই!

—*—

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন শুক্রবার—সকালে উঠে দেখি পাণ্ডা মহারাজ সশরীরে হাজির, তিনি বলিলেন, "তীর্থ হতে খালি পেটে, কিছু না খেয়ে বেরহতে নাই; তাতে সুফল নষ্ট হয়।" তিনি এই উদ্দেশ্যেই কিছু মায়ের প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে এসে ছিলেন। তাঁর আদেশানুযায়ী প্রসাদ গ্রহণান্তর বেলা ৮ টার সময় রওনা হলাম। ক্রমশঃ সামান্য সামান্য চড়াই-উৎরাই করে চলবার সময় ভাগীরথী গঙ্গার এ পাড় হতে অপর পাড়স্থিত গতকালের সন্ধ্যেবেলার সেই সুমনোরম দর্শিত স্থান "গৌরী-কুণ্ড" দেখতে পেয়ে, এপাড় হতেই উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রণাম করে আবার চলতে লাগলাম। আজ গঙ্গোত্তরী হতে বের হবার সময় প্রাণে একটি দারুণ অভাব অনুভব করতে লাগলাম। এত-দিন পর আমারা আমাদের চিরবাঞ্ছিত পূণ্য ভূমিতে এসেও আজ তাকে ত্যাগ করে যেয়ে, প্রাণে যে কি এক নিদারুণ করুণ-ব্যথা বেজে উঠলো, কেমন করে সে অব্যক্ত যাতনা জানাব? সে আনন্দময় প্রকৃতির রম্য-নিকেতন ত্যাগ করে এসে আজ আগ্রায় বসে, যখন আমি গঙ্গোত্তরীর

কথা লিখতে বসি, তখন গঙ্গোত্তরীর, গোমুখীর প্রত্যেকটি স্থানের মধুময় দৃশ্য প্রাণে ফুটে উঠে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করে, যেন কি এক মহান্ শোকবারিতে আপ্লুত হয়ে ধৈর্য্য-হারা হয়ে পড়ছি। যে আগ্রার "তাজ" দেখার জন্য সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ হতে অজস্র লোক এসে এর সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে আপনাকে সৌভাগ্য-বান্ মনে করে, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য সেই আগ্রার তাজ আজ দেখেও প্রাণে সে বিমল আনন্দ উপভোগ করতে পারছিনা—হৃদয়ে একটুও শান্তি পাচ্ছি না। আবার সে আনন্দময় প্রদেশে যাবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ কেঁদে উঠছে। কেন যে এমন কঠোর পার্ব্বত্য-ভূমির জন্যও প্রাণ অমন করে উতালা হয়ে ওঠে কে জানে? হায়! তেমন দিন কি আর হবে, যে-দিন পুনরায় ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থানে উপ-নীত হয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকায়ে হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রনা মুছে ফেলে জীবনখানা আনন্দময় করে তুলতে পারবো?

গঙ্গোত্তরী আসার সময় আমরা যে-সব পথ চড়াই করে এসেছি, এখন সেই সব পথ উৎরাই এবং উৎরাই পথ গুলি চড়াই করে যেতে হবে। আমরা এই ভাবে চড়াই—উৎরাই করতে করতে বিষাদযুক্ত হৃদয়ে চল্‌তে চল্‌তে বেলা ১১ টার সময় **ভৈরব ঘাঁটী** চটীতে পৌছে, শীঘ্র শীঘ্র দ্বিপ্রহরের আহার সমাপ্ত করে আবার তখনই বের হয়ে পড়লাম, কারণ আজকাল বিকেলের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পূর্ব্বে যতদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই সুবিধাজনক। ধরা-লীর পূর্ব্বে কোন ভাল চটী নাই, ইচ্ছা যাতে আজই যেয়ে ধরালিতে রাত্রিবাস করতে পারি। এই চটীর সংবাদ পাঠকদের যাবার সময়ই জানি-য়েছি। এখানে জিনিষাদি সবই গঙ্গোত্তরীর মত চড়া দামে কিনতে হয়, তা ছাড়া জলেরও বেশ অসু-বিধা। আমার বের হবার জন্য তাড়াতাড়ি করলেও ভৈরবঘাঁটী হতে বেলা ৩টার পূর্ব্বে বের হতে পারলাম না। চটী হতে বের হয়ে সেই কঠিন উৎরাই পথটি অতিক্রম করে **জাহ্নবী গঙ্গার** উপরিস্থিত ঝোলান পুলটি পার হয়ে কয়েকটী ছোট ছোট চড়াই উৎরাই করার পরই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে প্রবল জোরে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। আমরা আশ্রয় পাবার আশায় ছুটে ছুটে ডাকবাংলায় এসে পৌছলাম। বৃষ্টি কিছুতেই থামতে চায় না—অনবরত চলেছে। কমা, সেমিকোলেন বাদ দিয়ে যেন প্রবল জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো, অগত্যা বাধ্য হয়ে আজ এখানেই রাত্রিযাপন স্থির করলাম। আমরা ডাকবাংলার প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড বারান্দায় আড্ডা নিয়েছিলাম। সেখানেও জলের ঝাপটা আসার এবং ডাকবাংলাটীর ঘর খোলা থাকায় তার ভিতরেই রাত্রি যাপন করার উদ্দেশ্যে আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার অল্পক্ষণ পরেই নিকটস্থ চটিওয়ালা এসে, সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের ঘর হতে বের করে দিল। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়, অনেক অনুনয়-বিনয় করেও কোন ফল না হওয়ায় অগত্যা বারান্দাতেই আড্ডা নেওয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থামলে যখন তার সেই ক্ষুদ্র দোকান হতে আলু, চাল ও দুধ কিনে আলু-ভাতে ও দুধ দিয়ে রাত্রির আহার সমাপ্ত করলাম, তখন কিন্তু ভায়া অতি যত্ন করে ঘর খুলে থাকার জায়গা করে দিল। আমরা মাত্র তিনজন রাতে থেলেও কিন্তু, আমাদের সঙ্গীর সকলকেই থাকার জায়গা করে দিল। ডাক-বাংলাটি বেশ বড়, তার ভিতর ৫০।৬০ জন যাত্রী বেশ থাকতে পারে; এ ডাকবাংলাটি ব্রহ্মদেশের মত সম্পূর্ণ কাঠের তৈরী। এমন কি মেজেও কাঠের। হিমালয়ের চটীওয়ালাগুলি কেমন স্বার্থপর পাঠকগণ একবার বিবেচনা করে দেখ্‌বেন। সমস্ত

রাত ভরে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। আজকাল প্রত্যহই বিকেল বেলা বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সময় এক বেলাই পথ চলা নিরাপদজনক, আজমাত্র ৯ মাইল পথ অতিক্রম করেছি।

২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার—চারিদিকস্থ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর বরফ থাকার জন্য গঙ্গোত্তরার মত অত শীত না হলেও, এখানেও শীতের প্রকোপ কম নয়। তার উপর আবার সমস্ত রাত বৃষ্টি পড়ার দরুণ অন্যদিনের চেয়ে আজ শীতের প্রকোপ অনেক বেশী। সকালে ঘর হতে বের হয়ে দেখি, এত বেশী শীত লাগছে, বের হয় কার সাধ্যি! মনে হল যেন, গোমুখীর শীত এখানে এসে জমা হয়েছে: কাজেই আজ আর খুব সকালে বের হতে পারলাম না। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব উদিত হয়ে, আপন কিরণজালে সমস্ত জগতকে সঞ্জীবিত করে তুললেন—আমরাও তাঁর করুণা হতে বঞ্চিত হলাম না। সূর্য্যের নবীন কিরণে শরীরে নব ভাবের উদয় হয়ে যেন নূতন বলে বলীয়ান করে তুললো। আমরাও তখন সকলে সবিতাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ প্রণাম করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। জঙ্গল-চটী হতে বের হয়েই, আমার ঘটিটী যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা গ্রহণ করেছিলেন, সেই স্থানের পুলটী পার হয়ে, নির্জ্জন কাননের ভিতর দিয়ে চার মাইল পথ অতিক্রম করে ধরালী চটীতে এসে পৌছি। এখান হতে বাবাকালীকম্বলীবালার সদাব্রত একটি ও জয়পুরের মহারাণীর সদাব্রত একটি নিয়ে, তখনই আবার বের হয়ে পড়লাম। এর অপর পারেই পাণ্ডাদের বসতি গ্রাম মুখু বা মঠ। চিদানন্দদা ও ছোট মা পূর্ব্বেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই তাদের সদাব্রতগুলিও আমাদেরই বইতে হল।

তারা যেয়ে হরশিলেতে ধরমসিংহের বাড়ীরূপী ধর্ম্মশালায় আড্ডা নিয়েছিলেন। তার বাড়ীটি ভাল না হলেও তার পাশের জলের খেলা অতীব আনন্দদায়ক। আমরাও এখানেই আড্ডা নিলাম। যাবার দিন এই হরশিলেই শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের ধর্ম্মশালায় বাস করে গেছি। স্থানটী অতি সুন্দর; বড় বড় ৫।৬টা ঝরণা ভাগীরথীমাতাতে আত্ম-সমর্পণের জন্য যেন আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটে চলেছে। স্থানটীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে আজ আর এখান হতে নড়বো না স্থির করলাম। তার উপর আবার রাত্রে অত্যধিক বৃষ্টি হয়ে, আমাদের ইচ্ছার ব্যাঘাত করলো। জলের বিশেষ সুবিধা থাকায় আজ সকলেই এখানে জামা-কাপড়াদি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার জন্য স্থানটী ভালরূপ ঘুরে দেখবার সুবিধা হয়ে উঠলো না। এই হরশিলে প্রবেশের মুখে ভাগীরথী গঙ্গার উপর একটি কাঠের পুল পার হতে হয়েছে।

২৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—হরশিলের চারদিকের পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি বরফের মুকুট পরে আগন্তুকের প্রাণে এক নব ভাবের প্রেরণা জাগায়ে দিলেও কিন্তু, রাতে শীতের প্রকোপে বেশ কাঁপতে হয়েছে। তাই আজও সবিতার সন্দর্শন না করে বের হই নাই। সবিতার নূতন তেজে পুষ্ট হয়ে ভাগীরথী গঙ্গার ধারে ধারে পূর্ব্বোক্ত প্রায় সমতল পথে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে সিঙ্গোট নদীটি পার হয়েই ক্রমোচ্চ চড়াই করার পর অর্থাৎ হরশিল হতে ৩৸ মাইল এসে ঝালাগ্রাম পেলাম। ঝালাগ্রামে থাকার বিশেষ কোন সুবিধা নাই, কোন চটী নাই, মন্দিররূপী একটি ধর্ম্মশালা নাই ও ডাকবাংলা আছে। যাত্রীদের এখানে না থাকাই সুবিধাজনক। আমরা সেখান

হতে আরও দেড় মাইল ক্রমোচ্চ চড়াই করে, পর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত হয়ে চারিদিকে সমুদ্রের উর্ম্মিমালাসদৃশ পর্ব্বতশৃঙ্গ গুলি দেখে মোহিত হয়ে গেলাম। এদিকের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব্বত শৃঙ্গই বরফাবৃত থাকায় মনে হয় যেন, প্রকৃতি দেবী আপন রম্য নিকেতনের পর্ব্বত শৃঙ্গরূপী প্রহরীদের প্রত্যেকের শিরে উজ্জল রূপার মুকুট পরায়ে, আপন অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্র মানবদের দেখায়ে, তাদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বতা খর্ব্ব করে দিচ্ছেন। আমরা সেখানে অল্পসময় দাঁড়ায়ে প্রকৃতির লীলা মুগ্ধ হয়ে দেখে নিলাম। এদিকে ক্রমেই বেলা হতে লাগলো, তাই বাধ্য হয়ে শীঘ্র উৎরাই করতে লাগলাম। এক মাইল উৎরাই করেই **সুখী চটী।** ভৈরবঘাঁটী ও উত্তরকাশীর মধ্যে এই সুখীচটীর চড়াই বড় চড়াই। আজ দ্বিপ্রহরে এই চটীতেই থাকবো ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দিন বিকেলে ঝড়-বৃষ্টি হয় বলে, এ বেলাই আরও অল্পদূর এগিয়ে লুহারী-নাগে যেয়ে থাক্‌বো সকলকে বলার পর সকলেই রওনা হবার দরুণ প্রস্তুত হলেন।

সদাব্রত নেবার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখান হতে উৎরাই পথে দুটী পথ একটি ক্রম-নিম্ন উৎরাই, অন্যটি পাকদণ্ডীতে খাড়া উৎরাই। আমি সদাব্রত নিয়ে ক্রম-নিম্ন পথে উৎরাই না করে, পাকদণ্ডী পথে খাড়া উৎরাই করে ৩॥ মাইল আসার পর **লুহারী নাগ** চটীতে পৌছি-লাম। আমি আসার অনেক পূর্ব্বেই সারদা ভায়া ও মায়েরা অনেকেই এসে এখানে আড্ডা নিয়েছেন। আজ এখানেই থাকার কথা ছিল; এখান হতে গঙ্গানালী চটী ৪॥ মাইল। পথে আর কোনও চটী নাই। চিদানন্দদা ও ছোট মা আমার আসার পূর্ব্বেই, এই হরশিলে থাকার কথা থাকলেও, এখানে না থেকে গঙ্গানাম্নী চটীর ধর্ম্মশালায় যেয়ে আড্ডা নিয়েছিলেন। বিকেলে অত্যধিক ঝড় বৃষ্টি হবার জন্য, আমাদের বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা আর এগিয়ে তাদের সঙ্গে মিলতে পারি নাই। তাদের কোন খোঁজ না পেয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে-ছিলাম। তবে এদিকে কোন হিংস্র জন্তু দ্বারা কোন লোক তথা যাত্রী হত হয়েছে শুন্‌তে পাই নাই, তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত।

এ ধর্ম্মশালাটির পাদদেশ ধৌত করে ভাগীরথী গঙ্গা মৃদু মন্দ গতিতে ধীরভাবে গন্তব্য পথে চলেছে। আজ ভাগীরথী গঙ্গাতে নেমে স্নান করা গেল। কিন্তু ধর্ম্মশালার ঘরটি অতীব খারাপ। মাত্র তিনখানা ঘর, তার মেজে আবার উঁচু-নীচু—অসমতলের জন্য তাতে নিদ্রা যাওয়া বিশেষ কষ্টদায়ক। গঙ্গা-নানীর চটীর ধর্ম্মশালা এর তুলনায় রাজমহল। আজ সকালেই ৯॥ মাইল পথ অতিক্রম করেছি।

৩০ জ্যৈষ্ঠ শনিবার—চিদানন্দজীর সঙ্গে কাল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। অন্যান্য সকলেই আমার কাছে ছিল। তিনি ও ছোট মা আমাদের দলভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন; এ লুহারী নাগের চারিদিকের পর্ব্বতশৃঙ্গ বরফাবৃত থাকার জন্য এ স্থানেও শীতের প্রকোপ কম না হলেও ওদের চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম বলে, অতি ভোরে উঠে, শীতের প্রকোপ গ্রাহ্য না করেই তখনই রওনা হয়ে পড়্‌লাম। আজ আমরা আকাশ-ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত তীব্র বেগে ছুটে চলেছি। তাই বেলা ৭ টার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য ৪॥ মাইল চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করে **গঙ্গানানী** চটীতে যেয়ে পৌছি। সেখানে পৌছে তাদের দেখতে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তারা সকালে সামনের চটীতে চলে গেছে আমাদের সামনের চটীতে যেয়ে মিলবার জন্য দোকানদারকে বলে গেছে; আমরা তখনই আবার সামনের চটীর উদ্দেশ্যে বের হব স্থির

করি, কিন্তু ভটবাড়ী এখান হতে ৯ মাইল; সকালে ৪॥ মাইল এসেছি। কাল একাদশীর জন্য অনেকেই উপবাস করে আছেন, আজ সকালে কিছু না খেয়ে সেই উপবাসের ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে একসঙ্গে ১৩॥ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করা খুবই কষ্টকর বিষয়, এখানেই এ বেলা থেকে শীঘ্র শীঘ্র খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যাওয়াই স্থির হল; সব চেয়ে স্থির হল সব চেয়ে হরিদাস ভায়ার একসঙ্গে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা কষ্টকর। তাই ভায়ার জন্যই এখানে থাকা স্থির করলাম; খুব তাড়াতাড়ি খাওয়ার কাজ শেষ করে, বিশ্রাম না করে, যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের আহারের পরই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হল, ঘণ্টাখানেক দেরী করবার পরও যখন সে বৃষ্টি বন্ধ হল না, তখন আমরা সেই বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হয়ে পড়লাম; গঙ্গানানী হতে বের হয়েই, ভাগীরথী গঙ্গার উপরিস্থিত পুলটি পার হয়ে ভাগীরথীমাকে ডাইনে রেখে, নানাপ্রকার বড় বড় গাছের তলা দিয়ে, ছোট ছোট কয়েকটী চড়াই উৎরাই শেষ করে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী **ভূকিকাপুল** নামক চটীতে যেয়ে পৌঁছি। এ চটিতেও তারা তুজন নাই, কাজেই সেই বৃষ্টির মধ্যেই আবার বের হয়ে ভাগীরথী গঙ্গার উপরিস্থিত পুল পার হয়ে, ভাগীরথী গঙ্গা বাঁ হাতে রেখে ক্রমশঃ চড়াই-উৎরাই করতে করতে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে **ভটবাড়ী** জংশন চটিতে যেয়ে পৌঁছি; চিদানন্দ মহারাজ কালী-কম্বলীয়ালার ধর্ম্মশালার দ্বিতলে জায়গা নিয়েছিলেন; আমরা তারই পাশে জায়গা নিলাম; আজ ১৩॥ মাইল পথ অতিক্রম করে বিশেষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; যাবার আসার তুইবারের সদাব্রত (বাবা কালী-কম্বলীয়ালার) অনেক কষ্টে আদায় করা গেল; এখানকার সদাব্রত দানকারী অতীব খারাপ লোক; পার্ব্বত্যপথ অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার উদ্রেক কেমন হয়, তা বোধ হয় ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন; অত পথ চলে আসার পর, কেহ রান্তে পাক করতে রাজি না হওয়ায়, অগত্যা চটিয়ালার দ্বারাই পুরী বানায়ে আলুভাজা দ্বারা গলাধঃকরণ করা গেল; এখানে বাঁশমতি চাউল টাকার ৴১॥ সের, আলু ৴৮ সের, ঘী ৴১৵০ ছটাক, চিনি ৴৸৶ ছটাক, গুড় ৴১।০ সের, ডাল ৴২ সের ভাঙ্গা মুসুরীর ডাল ৴৩ সের। যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথে আর কোথাও মুসুরীর ডাল দেখি নাই।

আমাদের কেদারবদরী যেতে এই ভটবাড়ী-জংশন হতেই বুড়া-কেদার হয়ে ত্রিযুগী নারায়ণ যেয়ে কেদারের পথে মিলতে হবে। এই ভটবাড়ী হতে বুড়া-কেদার হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ পর্য্যন্ত ভীষণ চড়াই-উৎরাইসংযুক্ত উৎকট বিশেষ বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করতে হবে। উপায় নাই, নতুবা সেই টিহরী ঘুরে শ্রীনগর দিয়ে কেদারবদরীর পথে আসা আরও ১৫।২০ দিনের ঘোর-ফের বেশী। সুতরাং আমরা আগামী কালই "জয়গুরু" বলে তাঁর নাম নিয়ে এই তুরতিক্রম্য বিপদ সঙ্কুল পথে বের হয়ে পড়বো স্থির হল।

গঙ্গোত্তরীর যাবার দিন এখানে বুড়া কেদারের একজন পাণ্ডার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার নিকট হতে পথের সমুদয় বিবরণ জেনে টুকে নিয়েছিলাম, কত মাইল পর পর চটী তাহাও লিখে নিয়েছিলাম: হিমালয়ের এ দিকটায় আজকাল যতগুলি পথ আবিষ্কার হয়ে পথিকের গন্তব্য স্থানে যাবার সহায়তা করছে, তন্মধ্যে এই ভটবাড়ী হতে ত্রিযুগীনারায়ণের পাকদণ্ডী পথটিই বিশেষ বিপদসঙ্কুল—যে পথে কাল আমরা রওনা হব। তবে আনন্দের বিষয় পথে মাঝে মাঝে চটী আছে—থাকার জায়গা আছে, খাবার জিনিষাদিও মোটামোটি পাওয়া যায়। তবে উৎকট চড়াই উৎরাই করতে যা কষ্ট হয়ে থাকে।

ভটবাড়ী জংশন তথা বড় চটী হওয়ার দরুণ অত্যধিক যাত্রীর ভিড়ের জন্য খুব অশান্তিতে কাটান গেল। জায়গাটি বেশ সমৃদ্ধিশালী বটে! ইচ্ছা হয়েছিল, যাবার দিনের মত ডাক-বাংলার সম্মুখের উন্মুক্ত প্রান্তরে তৃণশয্যায় আশ্রয় নিয়ে, আকাশের তারা গুণতে গুণতে নিদ্রার কোলে এলিয়ে পড়ি।

৩১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—ভটবাড়ী হতে বের হয়ে আজ অনেকটা বেলা হয়ে গেল। ভটবাড়ী হতে উত্তরকাশীর দিকে যে পথটি গিয়েছে, অর্থাৎ যে পথে আমরা গঙ্গোত্তরীর দিকে এসেছিলাম, সেই পথে উত্তর কাশীর দিকে দুই মাইল এসে দক্ষিণ-দিকের উত্তরকাশীর পথটি ছেড়ে আমরা বাম-দিকের পথে কেদারবদরী দর্শনে রওনা হলাম। বিহারী দাদা আমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে এখান হতে উত্তরকাশীর দিকে রওনা হলেন। আমরা প্রায় সকলেই তাহাকে পাথেয় বাবদ সামান্য সামান্য সাহয্য করলাম। তিনি বিদায় নিয়ে যাবার সময় কতবার আমাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন। আমরাও তাকে দুঃখিত অন্তরে বিদায় দিয়ে বাম দিকের পথ ধরে ভাগী-রথী গঙ্গার উপরিস্থিত ঝোলাপুল পার হলাম। এখান হতেই আমরা ভাগীরথীগঙ্গার সঙ্গ ছাড়া হলাম। এরপর যত দিন হিমালয়ে ছিলাম ভাগীরথী আর দেখতে পাইনি। এখানে ভাগী-রথীগঙ্গার পার্শ্বেই একটী সামান্য চটী আছে নাম **ডাঙ্গা** চটী। কাল এ চটী পর্য্যন্ত এসে থাকলে মন্দ হত না, তবে চটিটী ভাল না। ভাল না হলেও দু'মাইল পথ তো এগিয়ে থাকা যেত। ভাগীরথীগঙ্গার উপরিস্থিত পুলটিও খারাপ। দুখানা কাঠ ফেলে রেখে দিয়েছে, তার উপর দিয়ে অতি সাবধানের সহিত পুলটি পার হতে হয় এর সামনেই আবার আর একটী নদীর উপর পুল রয়েছে। সে নদীটিও নেহাৎ মন্দ নয়—ভাগীরথী গঙ্গারই ভাই বটে! তার উপর একখান মোটা কাঠ ফেলে রেখেছে। সে নদীটীর উপরিস্থিত এক খণ্ড কাঠের উপর দিয়ে অতি সাবধানের সহিত সে পুলটিও পার হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আজকাল পার্ব্বত্য দেশে ভ্রমণ করতে করতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই আর এ সব দেখে ভয় হয় না। যে নদীটি পেরিয়ে এলাম তার নাম **শতরুদ্রা গঙ্গা**। শতরুদ্রা গঙ্গা-পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ হতে উৎপন্ন হয়ে এখানে এসে ভাগীরথীতে আত্মসমর্পণ করেছে। শতরুদ্রা সঙ্গমে শ্রাদ্ধাদি করার জন্য এখানেও একজন পাণ্ডা এসে ধরেছিল। তাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে ভাগীরথী গঙ্গার পূর্ব্ব পার দিয়ে চলতে লাগলাম। উত্তর-কাশীর পথটি যেমন ভাগীরথীগঙ্গার পশ্চিম পার দিয়ে, এ পথটিও তেমন ভাগীরথীগঙ্গার পূর্ব্ব পার দিয়ে। তবে উত্তরকাশীর পথটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আর এ পথটি উঁচু-নীচু বন জঙ্গলাবৃত। আমরা ভাগীরথীগঙ্গা ডান হাতে রেখে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চড়াই-উৎরাই করতে করতে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করার পর, একটী গ্রাম পেলাম, নাম **মৌরিগ্রাম**। এ পথগুলি সবই পাক-দণ্ডী পথ, এ গ্রামে বেশ দুধ পওয়া যায়। আমরা সকলেই গরমাগরম দুধ খেয়ে নিলাম। চিদানন্দজী ও ছোট মা দুধের সঙ্গে বাসী রুটী দ্বারা প্রাতর্ভোজন সম্পন্ন করে নিলেন। এ গ্রামে যদিও চটী নাই কিন্তু থাকার বিশেষ সুবিধা আছে। পাহারীগণ সকলেই নিজেদেরে বাড়ীতে যাত্রী রাখে। কারণ জিনিষাদি বিক্রি করে দু-পয়সা উপার্জ্জনও তো হবে; এদের বাড়ীগুলি প্রায় সেই ভাবে তৈরী।

আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রায় সমতলভূমিতে প্রায় আধা-

মাইল বেশ ভাল পথে চলে একটী বড় ঝরণার নিকট এসে উপস্থিত হলাম। ঝরণাটি যেমন বড় তার স্রোতও তেমনি প্রবল, তবে জল বেশী নয়। অসংখ্য ছোট বড় মাঝারী নানাপ্রকার উপল-খণ্ড এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে তার উপর দিয়ে ঝরণাটি পার হয়েই খাড়া চড়াই আরম্ভ হল। এত বড় খাড়া চড়াই আজ পর্য্যন্ত আর একটিও পায় নাই, আমরা ক্রমে বরফময় দেশ ত্যাগ করে গরম দেশে এসে পড়েছি। ঝরণাটি ৪০০০ হাজার ফুট উচ্চ হবে। কাজেই এখানে রৌদ্রের তাপ খুব কঠোর বলে মনে হতে লাগলো। এদিকে আজ বের হতেও বেলা হয়ে গেছিল, তার উপর আবার বিহারীদাকে বিদায় দিতে—তার মায়ার বাঁধন ছিন্ন করতেও অনেক সময় কেটে গেছিল। অত্যধিক বেলা হওয়ার প্রথমরৌদ্রের তাপে খুব ক্লিষ্ট করে তুললো। এটি অত্যধিক উৎকট চড়াই। এক মাইল ঐ ভাবে চড়াই করার পর একটি গ্রাম পেয়ে খুব আনন্দ হল। মনে করলাম আজ এখা-নেই থাকি। তখন বেলা ১১ টা বেজে গেছে। অনেক অনুনয় বিনয় করাতেও গ্রামবাসী জায়গা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অগত্যা সে স্থান হতে আবার বের হয়ে পড়লাম। আধ মাইল চড়াই করার পর সকলেই হাঁপিয়ে গেলাম। এ পাহাড়ে গাছের অভাব না থাকলেও ছায়ার বিশেষ অভাব ছিল। চিদানন্দজী মহারাজ ও ছোট মা এরা দুজনে এর পূর্ব্বেই চটীতে চলে গেছিলেন। আমরা সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, আবার চড়াই করতে লাগলাম। আরও আধ মাইল বিষম উৎকট চড়াই করে **ফেলুচটিতে** যেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আজ যে দুই মাইল উৎকট চড়াই করে এসেছি, এমন উৎকট খাড়া চড়াই আর কখনও করি নাই। এ পথটুকু আস্‌তে এত কষ্ট হয়ে-ছল উত্তরকাশী হতে একদিন ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করে ভটবাড়ী আস্‌তেও তত কষ্ট অনুভব করি নাই। খুব সকালে হলে হয়তো আমরা এমন উৎকট চড়াইকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না। একে তো আমরা বরফাল দেশ হতে এসেছি, তার উপর প্রখর রৌদ্রের তাপ, তার উপর আবার সময় বুঝে হাওয়াও বন্ধ। নানা কারণেই কষ্ট হয়েছিল।

স্থানটি বহু উচ্চে, পর্ব্বতের প্রায় শিখরদেশে অবস্থিত। আজ আর এখান হতে নড়বো না স্থির। এখানে মাত্র দুটী চটী, তাও ভাল নয়। তার উপর আবার জলের বিশেষ কষ্ট! অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি ঝরণা দিয়ে চির চির করে জল পড়ছে—তাতে এক ঘড়া জল ভরতে ১৫ মিনিট কেটে যায়। কাজেই জলের অভাবে স্নান করতে পারলাম না। এ দুটী চটীতে পূর্ব্বেই অনেক যাত্রী এসে আড্ডা নেওয়ায় পাকের জল জোগাড় করতেই আমাদের কষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু যেরূপ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাতে আর কিছুই ভাল লাগছিল না। এখানে দুধ টাকার ⁄৪ সের, ঘী ⁄॥ সের, আটা ⁄৩ সের, মোটা চাউল ⁄২॥ সের, সখোসা ডাল ⁄১॥ সের। ভাল জিনিষ মোটেই নাই।

গঙ্গোত্তরী হতে ভটবাড়ী ৩৮ মাইল, ভটবাড়ী হতে বুড়াকেদার ২৯ মাইল, ত্রিযুগীনারায়ণ ৭২॥ মাইল! আজ সামান্য দু মাইল চড়াই করতেই আমাদের যেরূপ কষ্ট হয়েছে, তাতে ত্রিযুগীনারায়ণ যেতে ৭২॥ মাইল পথ যে কি করে অতিক্রম করবো খুব চিন্তা হলো বটে! অনেক কাণ্ডীবালা (নিকটস্থ গ্রামের বাসিন্দা, যে গ্রামে আমরা থাকতে চেয়ে-ছিলাম) এসে প্রত্যেককে এক একটি করে কাণ্ডী করে নিবার জন্য অনেক অনুরোধ করলো। তারা বললো আজ আর কতটুকু পথ এসেছেন! সামনে এর চেয়ে খুব কঠিন ও বিপদসঙ্কুল পথ আছে। তাদের কথা সবই সত্য হলেও ডাণ্ডী কাণ্ডী করার টাকা কোথায়; ত্রিযুগীনারায়ণ পর্য্যন্ত পৌছায়ে দিতে প্রত্যেক কাণ্ডীবালা ১৫৲ টাকা চাইলেও বোধ হয় ১০৲ টাকাতেই যেত। তারা অনেক আশা করে এলেও, আমরা তাদের নিরাশ করে দেওয়ায় আমাদের সপিণ্ডিকরণ করতে করতে পথ ধরলো। বিকেলে আজ বৃষ্টি না হলেও এবং অত্যন্ত জল কষ্ট হলেও, এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আজ আর এ জায়গা ত্যাগ করতে ইচ্ছা হল না। আজ মাত্র ৭ মাইল পথ এসেছি। (ক্রমশঃ)

শাস্ত্র-বিভ্রম

—*—

শাস্ত্র পড়ে যেখানে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেখানে নিজের সিদ্ধান্ত কোনও কিছু না থাকলেও পরের সিদ্ধান্তে দোষ দর্শন হওয়া বিচিত্র নয়, বরং অনেক সময়ে তাই স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। জীবনে বড় একটা কিছু পাবার আশায় বিভ্রান্ত হয়ে সবদিকে ভ্রমণ করার চেয়ে যে কোনও একটা দিকে ভগবন্নির্ভরতার সঙ্গে লেগে পড়লে যে সুফল ফলে বেশী, বিভ্রান্ত চিত্ত এ কথা মানে না। সব ঘাট ঘুরে দেখে, বাছাই করে এক ঘাটে বসা ভাল, কিন্তু সেই বাছাই করার মত শক্তিই যার আয়ত্ত হয়নি, সে ঘুরে ঘুরেই যে খাঁটী জায়গা পাবে, এমন ভরসাই বৃথা।

ভগবন্নির্ভরতা জিনিষটী এমনি যে, এই ধরণের বিভ্রান্ত চিত্তেও একবার তার আভাস জাগলে স্বয়ং তিনিই এসে পথ ধরিয়ে দেন। তাঁকে যে প্রাণ-পণে চায়, হাতের সামনে যা পায় তাই নিয়েই সে প্রাণের দেবতাকে পূজা করতে বসে। দেবতা সেখানে পূজার বিধি-নিয়ম সম্বন্ধে ভক্তের অজ্ঞানকৃত দোষটাই ধরে বসেন না। দেবতার লক্ষ্য শুধু পুষ্পোপকরণে নয়—আসল লক্ষ্য ভক্ত হৃদয়ের দিকেই। তাঁর কাছে ভুল দোষগুলিই বিচারের উপকরণ নয়। বর্ত্তমান সফলতা বিফলতাও তার পক্ষে চিরদিনের জন্য অনড়রূপে নির্দ্ধারিত হয় না।

শাস্ত্র দ্বারা বিচার করে বুদ্ধিকে হার মানিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সেই বিজেতার চেয়েও তীব্রতর প্রতিভাশালী এসে হয়ত আবার তাকেও হারিয়ে দিতে পারে। কাজেই সাময়িক জয়-পরাজয় দিয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ঠিক হয় না। তাই কথায় বলে শাস্ত্রে গরু হারালে গরু পাওয়া যায়—অর্থাৎ কূট তর্কে বা যে কোনও উপায়ে শাস্ত্র হতে মনোমত ব্যাখ্যা বার করা বিশেষ কঠিন নয়। বিশেষতঃ হিন্দুর শাস্ত্র-সমুদ্রে জলদেবতা ও প্রাণ সংহারক নানারূপ কুৎসিৎ দেহধারী জল জন্তুর অভাব নাই। ঋষির বাণীকে মনোমত ব্যাখ্যা করেই যার যেমন অভিরুচি, সে তেমন ব্যবস্থা শাস্ত্র থেকে নিতে পারছে। কিন্তু দুঃখের উপর আরও বেশী পরিতাপের বিষয় এই যে, ওই ধরণের শাস্ত্রব্যাখ্যাতাও শ্রোতা এই দুয়ের প্রত্যেকেই জানে যে অমন ব্যবস্থাকে প্রাণপণে বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়! তা শুধু উপস্থিত কার্য্যোদ্ধারের উপায় মাত্র।

শাস্ত্রাধ্যায়ী যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রের মাঝ থেকে আপনার জীবন মরণের একান্ত স্থির আশ্রয় ভূমি পেয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস করতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তার সে শাস্ত্রপাঠ সফল হয়নি বুঝতে হবে। আপ্ত-বাক্য যদি সব সময়ে সান্ত্বনা দিতেই না পারে, পথই ধরিয়ে দিতে না পারে, তবে দেহপাত করে যে বচন শ্রবণ মিথ্যাই হয়ে পড়ে। আর শাস্ত্র যদি আমার মত অধিকারীর যোগ্য পথ বলে দিয়ে সেই পথে আমাকে চরমে পৌঁছে দিতে না পারে, তবে সে শাস্ত্র অপরের সতই যোগ্য হউক, যতই প্রশংসনীয় হউক, আমার পক্ষে সেখানে "দেখাদেখি শেখা নাচ" ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু বহুশাস্ত্র ঘাটার ফলে সর্ব্বত্র দোষ দর্শনই যদি শেষ পর্য্যন্ত লভ্য হয়, তবে তেমন হতভাগ্য পথে গিয়ে লাভ কি?

শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয়ই প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ব্যবহারের নিয়ম না জানলে উভয়ই আত্ম-হন্তারক হয়। এই আত্ম-হত্যার অস্ত্র আজীবন বহন করেও মানুষ ভারবাহী পশুর মত তার মর্ম্ম হয়ত বুঝতে না পারে, কিন্তু তবু ঐ বহনের বড়াইয়েই নিজকে অপর সকলের চেয়ে মহাভাগ্যবান মনে করে। খুঁজলে হয়ত দেখা যায় যে, বহু শ্রোতা যিনি, তিনি হয়ত শতদিকে হাতড়িয়েও পথ না পেয়ে অন্তর্জ্বালায় জ্বলে মরছেন; আবার অন্যদিকে নেহাৎ গণ্ডমূর্খও আপন বিশ্বাসের বলে ঢেঁকি ভজেই মনের আনন্দে স্বর্গে চলে যাচ্ছে। বরং এই শ্রেণীর মানুষই বেশী। নতুবা কজন লোক আর শাস্ত্রের ধার ধারে! শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যা তাদের শোনায়, স্বয়ং শিব বলেছেন শুনে, তাই তারা বিশ্বাস করে যায়। এই অকপট বিশ্বাসই তাদের হৃদয়কে একাগ্র করে—তারা সফল কাম হয়। শাস্ত্রব্যাখ্যাতার মুখে শিব-দুর্গার দোহাই শুনেই তাদের এমনি বিশ্বাস হয়।

চল্‌তি কথাতেও বলা হয়, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" বিশ্বাস এমনই জিনিষ যে শত তর্ক-যুক্তিতেও সহজে টলে না। এই ধরণের বিশ্বাস কখন যে কি দেশে হয়ে পড়ে, তা সব সময়ে ধরা যায় না। বাইরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণের মাঝেও হয়ত মনের এমন প্রগাঢ় বিশ্বাসের আকর্ষণ এসে পড়ে যে বাইরে তা প্রকাশ করে বলা দায় হয়ে ওঠে। বাইরে একটা কিছু কারণ দেখাবার জন্যই সেখানে একটা কিছু বল্‌তে হয়, নতুবা মূল কথা প্রকাশের শক্তি থাকে না, হয়ত বা সে নিজেও জানে না যে কেন হঠাৎ এমন বিশ্বাসের নিগড় বন্ধনে সে বাঁধা পড়ল। এই ধরণের বিশ্বাসকেই আস্তিক্য বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধা কেবল বড়র উপরই হয় না—বাইরে কোনওদিক দিয়ে ছোটকেও এই বিশ্বাস শ্রদ্ধার পাত্র করে তার কাছ থেকে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত জীবনের বহু উপজীব্য মিল্‌তে পারে।

বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাসের পাত্রের উপর অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা সাধারণ ভাষায় যাকে অনুরাগ বলি, তা প্রায়ই এমনি একটা কিছু হেতুকে উপলক্ষ্য করেই প্রথমে আসে! কাজেই আপ্ত বা গুরুবাক্য বলে বিশ্বাস করব, তার মাঝেও এমন একটা কিছু আকর্ষণের বস্তু থেকে যদি তা আমাকে প্রথমে আকৃষ্ট করে, তবে সেই আকর্ষণের ফলেই তখন যা শুন্‌ব, তাতেই আমার বিশ্বাস আস্‌বে। হৃদয় সম্পর্কহীন নিরেট যুক্তিবাদী হলেও যখনি তাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে বিজেতা তার মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে পারে, তখনই তাঁর বাক্য সেই যুক্তিবাদী শ্রোতার কাছে আপ্তবানী বলে গৃহীত হয়; নতুবা শুধু তর্কে পরাজয়ের ফলে পরস্পরের কেবল আক্রোশেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উভয়ে উভয়ের দিকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হলে সেখানে তর্কের সুফল ফলে না। একের জিগীষাবৃত্তিই অপরের মনকে নত না করে আরও বেশী করে উত্তেজিত করে তুলে। এজন্য চৈতন্যদেবের জীবনীতে শোনা যায় ও অনেক মহাপুরুষের প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, তাঁরা আগে হেসে, পরে কথাটী বল্‌তেন। সে হাসিতে কিন্তু অপরকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে আপন বাহাদুরী জাহির করে না। বরং শ্রোতার মন অনুকূল ভাবে বক্তার দিকে আকৃষ্ট করে। যিনি যত বেশী শাস্ত্রজ্ঞ হন, শ্রোতার বুদ্ধিকে একনিষ্ঠ শান্ত করবার শক্তি তাঁর তত বেশী হয়। তাই চঞ্চল ও অসহিষ্ণু পথভ্রষ্টকে তাঁরা স্বীয় মতের মাঝ দিয়েই নিয়ে এসে মহান্ কল্যাণকর সিদ্ধান্তে উপনীত করেন।

কাজেই শাস্ত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি কর্‌তে হলেও উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর কাছে গিয়ে প্রথমে তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে নেওয়া চাই। সেই জন্যই পূর্ব্বের ব্যবস্থা ছিল সমিধ্‌পানি হয়ে অর্থাৎ আমি তোমার বশ্য, অর্থাৎ আসল তত্ত্ব কি, তাই জেনে প্রকৃষ্ট পথে চলবার ও সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই তোমার কাছে এসেছি—এমনি বিনীতভাব গ্রহণ করে গুরুর কাছে উপনীত হতে হত। তার পর বহু বর্ষ সেবাদি সহকারে সেই জ্ঞান আয়ত্ত হলে প্রয়োজন মত পণ্ডিত সমাজে তার পরখ হত। কিন্তু সেখানেও উপযুক্ত ব্যক্তি কখনও বিনয়কে ত্যাগ ক'রে, উচ্ছৃঙ্খল পন্থা অবলম্বন কর্‌তেন না। তাই দিগ্বিজয়ী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বিচার সভায় উপনীত হয়ে প্রথমে বলতেন—"বয়ং ন বিবদামহে।"—আমরা বিবাদ অর্থাৎ ঝগরা করি না। পরস্পর দুরূহ মতবাদ নিয়ে তুমুল তর্ক হলেও ভদ্র ব্যবহারের ও সম্মানের অভাব হত না। শাস্ত্র দ্বারা বুদ্ধি বিভ্রান্ত না হয়ে যাঁরা তা থেকে যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হয়, তাঁদের মাঝে এমনি অবিচলিত ভাব ও সমুদ্রবৎ গাম্ভীর্য্যের বিকাশ হয়। আর সাধারণ অল্পবিদ্যাভয়ঙ্করীর দলই "শফরি ফরফরায়তে।" যে সত্যিকার জিনিষ পেয়েছে, সে চায় অপরকেও সেই জিনিষ দান করতে। কাজেই অজ্ঞানের ফাঁফরে হাবুডুবু খেয়ে কেউ যদি তাঁদের সকাশে উপনীত হয়, তবে তাঁরা সস্নেহে শান্তভাবে তাকে যথার্থ পথই প্রদর্শন করেন। তাঁরা নিজের ঢাক নিজে বাজিয়ে প্রচার করতে বের হন না। "পূর্ণ কুম্ভ ইবার্ণবে" তাঁরা গম্ভীরই থাকেন।

শাস্ত্রপথ গহন। সে পথে চল্‌তে হলে পদে পদে সাবধানতা প্রয়োজন। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা এই যে শাস্ত্র পড়ে শেষপর্য্যন্ত অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে নাস্তিক হয়ে পড়ে। সাধারণ বিশ্বাস বিচারের শলাকায় বিদ্ধ হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। এই সব কারণে পূর্ব্বহতে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন গুরু পিছনে না থাকলে অভিমান, অবিশ্বাস, পথভ্রান্তি প্রভৃতি এসে পড়া স্বাভাবিক। আমি যা জেনেছি,

তাই ঠিক—অপরকে বিধ্বস্ত করে স্বীয়মতে আনা চাই—এমনি ধরণের বিজীগীষা এসে অপরের মাঝে যে সত্যিকার অভাব কোথায়, সৌন্দর্য্যই বা কোথায় —তা জানবার অবসর দেয় না। প্রাণের বিনিময়জনিত আনন্দ আর তার ভাগ্যে ঘটে না— শুধু কচ্কচিতেই সে তৃপ্তি পেতে চায়।

প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ পেতে হলে চাই শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে উদার প্রাণ। বিশ্বাসের দুর্গকে যে ভাঙতে হবে, সেখানেও অ'ত সন্তর্পণে এক বিশ্বাসের স্থলে আর এক বিশ্বাসের স্থাপন করতে হবে, কারও ভুল ধারণা ভাঙতে হলেই যে প্রচণ্ড হতে হবে, এমন কথা নয়। তাতে ভাঙ্গা যাবে বটে, কিন্তু সে ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকৃষ্ট কিছুর গটন আর সেখানে হয়ে ওঠে না। বিজিতের প্রাণ যেখানে বিজয়ীর পদে আপনি এসে লুটে পড়ে, সেখানকার জয়ই প্রকৃত জয়। তা হয়, মহান্ হৃদয় দিয়ে—হৃদয়-জয়। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয় মহান্ ও প্রশান্ত না হয়, শাস্ত্রকার ঋষিদের মত মহান্ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত না হয়, তবে তার কাছে অপরের ভয় ছাড়া প্রীতির আশা কেউ করতে পারে না। তাই শাস্ত্রের প্রথম কথা হচ্ছে:—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততো সুখম্॥

বিদ্যাতে যদি বিনয়ীই না করে, তবে সৎপাত্র রূপে সে বিশ্বস্ত হয় না। সৎপাত্র হলে ধন, ধর্ম্ম, সুখ সবই আসে, কিন্তু শাস্ত্র পড়ে উদ্দেশ্য ভুলে, অভিমানে বিভ্রান্ত হলে, সমস্তই পণ্ড হয়ে যায়। শাস্ত্র বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে, সুতরাং শাস্ত্র না হলেও চলবে না—কিন্তু তা সংগ্রহের পথে সাবধক হোসিয়ার।

শ্রীশ্রীগুরুধামের জন্মোৎসবে সাহায্য-প্রাপ্তি স্বীকার

তিন টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—তারানাথ দাস শ্রীমতি বসন্তকুমারী দাসী। দুই টাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—হেমন্তকুমার ঘোষ, জয়ন্তকুমার ঘোষ, নৃপেন্দ্রনাথ রায়, ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, প্রমথকুমার দাস, চন্দ্রনাথ ভৌমিক, মহিমচন্দ্র দেব, দীনবন্ধু দে, নীহাররঞ্জন নন্দী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, ক্ষিরোদচন্দ্র চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ফণিভূষণ মিত্র।

একটাকা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—গগনচন্দ্র দেব, বিভূতিভূষণ কর্ম্মকার, রসিকচন্দ্র কর্ম্মকার, ভবরঞ্জন গুহ, নবিনচন্দ্র ঘোষ, তরণীকান্ত দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় জানা, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ভূপতিচরণ চৌধুরী, অনুকুলচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নকুমার সাহা, কামেশরঞ্জন পাল, সারদাচরণ দাস, রাইমোহন পাল, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যতীন্দ্রনাথ দাস, রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিপিনবিহারী কর, আনন্দমোহন দাস, প্রিয়নাথ কর্ম্মকার, রমেন্দ্র কর, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমোহন দাস, যামিনীকুমার রায়, সারদাচরণ মজুমদার, রমেশচন্দ্র ধর মহেন্দ্রচন্দ্র পাল, রাইবিনোদ পাল, নবদ্বীপ চন্দ্র, নৃপেন্দ্রনারায়ণ বসুনিয়া, সারদা চক্রবর্ত্তী, কামিনীকুমার মহাতক, মহিমচন্দ্র চৌধুরী, যোগেন্দ্রচন্দ্র ধর, সহদেব কুমার নাথ, হরপ্রসাদ রায়, ননীকুমার চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, রামরতন গাঙ্গুলী, শ্রীনাথ সাহা, ক্রমেশ্বর আর বিনোদ দাসী, নৃসিংহ ঘোষ, বৈকুণ্ঠকুমার দাস, চন্দ্রকুমার নাথ, শ্রীমতি ইন্দুপ্রভা, শ্রীমতি সাবিত্রীবালা দাস, শ্রীমতি সরোজিনী কর, শ্রীমতি হিরণ্ময়ী ঘোষ আর আসয়বালা ঘোষ, শ্রীবিজনবাসিনী গুহ, শ্রীবসন্তকুমারী দেবী, আর ক্ষিরোদবালা দেবী, শ্রীমতি সুশীলাবালা, শ্রীমতি সীত দেবী, শ্রীমতি কুমোদিনী সাহা, শ্রীবিরাজমোহিনী দত্ত, শ্রীমতি নিরুপমা দত্ত, শ্রীমতি শতকুমারী, সুখদাসুন্দরী রায়, শ্রীমতি সুহাসিনী দেবী, শ্রীমতি হরি দাসী, শ্রীমতি কালীতারা দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, শ্রীমতি সুবাসিনী দেবী, শ্রীমতি চন্দ্রকুমারী দে, শ্রীমতি সিদ্ধেশ্বরী দেবী, শ্রীমৎ সারদানন্দ। আটআনা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—গোবিন্দচন্দ্র সাহা, নিকুঞ্জবিহারী দেবনাথ, রমণীমোহন দেবনাথ, জনৈক ভক্ত, বরদাচরণ দাস, শ্রীহিরণময়ী দেবী, শ্রীমতি অনন্ত বালা।

চারআনা করিয়া—শ্রীযুক্তাঃ—বিপিনবিহারী সাহা, প্যারীমোহন দেবনাথ, রতনমণী দেবনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ হালদার, যতীন্দ্রমোহন শীল, শরৎচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন দেব, শ্যামাচরণ মল্লিক, নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীক্ষিরোদাসী রুদ্র, শ্রীকিরণ বালা, শ্রীনিরুপমা, শ্রীমতি বসন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীমতি সৌদামিনী দত্ত। শ্রীমতি গগনতারা ॥/০ শ্রীঅম্বিকাচরণ সূত্রধর, শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ ঢালী, শ্রীমতী সত্যবামা ৶০, শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা /০, শ্রীমতী শ্রীমতী কালীতারা /০। (শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যো—

ভক্তসম্মিলনী

ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৩৭

স্থান—পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, ময়নামতী (কুমিল্লা)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

—*—

গত ১১ই পৌষ শনিবার হইতে ১৩ই পৌষ সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে (কুমিল্লা ময়নামতী) ভক্ত-সম্মিলনীর ষোড়শ-বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার সকলস্থান হইতে জমিদার, পণ্ডিত, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেরাণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সুদূর বিহার ও আসাম হইতেও কয়েকটী ভক্ত আসিয়াছিলেন। প্রায় চারিশত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার মহিলা ভক্তদিগের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

প্রথম দিবস—ভগবান্ শ্রীশ্রীজগদ্গুরুকে সভাপতিরূপে আহ্বান করিয়া সমবেত ভক্তগণ কর্ত্তৃক বন্দনাগীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ৮ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্বয়ং সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া সভাপতির প্রতিনিধি স্বরূপে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ মহারাজ ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ মঠ ও আশ্রমাদি স্থাপনের এবং ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করেন। আলোচ্য বৎসরে যে সকল গুরুভ্রাতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মঙ্গল-কামনা করা হয়। অতঃপর গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ এবং মঠ ও আশ্রমগুলির আয়-ব্যয় প্রদর্শন করিয়া সেবক ও সদস্যগণের মধ্যে কাহার দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে ও অর্থ সামর্থ্যে কে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করার পর ১২—৩০ মিনিটে সভাভঙ্গ হয়।

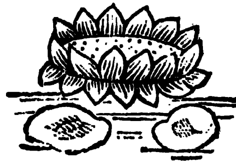
দ্বিতীয় দিবস—যথানিয়মে প্রার্থনা-সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ৮ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। যে সকল সদস্য ও বিশিষ্ট ভক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিতে না পারিয়া পত্র দ্বারা তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ জানাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বস্তার ষ্টেটের রাজা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সিংহ ভঞ্জদেবের পত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সকল অধ্যক্ষের অবিবেচনার ফলে মঠ ও আশ্রমের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাঁহাদের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব ও মন্তব্য গৃহীত হয়। অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ উপস্থিত ট্রাষ্টি ও সদস্যগণের পরিচয় করিয়া দিয়া গুরুকৃপা, নির্ভরতা ও আধ্যাত্মিক-বিষয় সম্বন্ধে

উপদেশাদি প্রদান করেন। ভক্তগণের মধ্য হইতেও কয়েকজন "গুরুকৃপা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন! পরে ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও অভিবাদন ও আলিঙ্গনান্তে বেলা ১২ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

এই দিন সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আসাম বঙ্গীয়-সারস্বত মঠান্তর্গত মহিলা-সংঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হয়।

তৃতীয় দিবস—সন্ধ্যা ৬টায় আশ্রম প্রাঙ্গণে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে হাওড়ার প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বি, এ, বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা সমাধানকল্পে সারস্বত মঠ কি করিয়াছেন, সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত ফনীভূষণ মিত্র বি, এল, শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দাস বি, এল, মঠের কার্য্য প্রণালীকে অভিনন্দিত করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস উকিল মহাশয় সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী যে, সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রের সারস্বরূপ ইহা ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে উক্ত পুস্তকাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তৎপর শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ মহারাজ জীবনের লক্ষ্য, জীবনের কর্ত্তব্য ও গুরুভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তাদের বক্তৃতা সমর্থন করিয়া নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। অনন্তর সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে ৮॥ টার সময় সভ ভঙ্গহয়।

এবার সম্মিলনীতে একটী অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চারে সকলকেই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। উদ্‌যোক্তাদের উদ্যোগ-আয়োজন বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। এই কয়দিন উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সম্মিলনীর ব্যয়ভার সমাগত ভক্তমণ্ডলীই বহন করিয়াছেন। এবার সম্মিলনীর বিশেষত্ব আসাম বঙ্গীয়-সারস্বত মঠান্তর্গত মহিলা-সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন। আগামী বর্ষে দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।



অভিভাষণ

—*—

[ভক্তসম্মিলনীর ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ মহারাজ দ্বারা পঠিত]

—(*)—

নরাকার পরমব্রহ্মরূপায়া হজ্ঞান হারিণে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান করতঃ অজ্ঞান হরণ করিতেছেন, সেই পরমব্রহ্মরূপী গুরুদেব স্বয়ং নরাকার বপু ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। হে ভ্রাতৃগণ! আসুন, আমরা আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার শ্রীশ্রীচরণে প্রণত: হইয়া তাঁহারই পরিকল্পিত এই শুভ কার্য্যের উদ্বোধন করি।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়া অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছে—রাখিয়া যাইতেছে কেবল স্মৃতি। আজিকার এই দিনে আমাদের কত অতীতের কথাই মনে হইতেছে—বিশেষরূপে মনে হইতেছে কি করিয়া তিলে তিলে বাড়িয়া আমাদের ভক্তসম্মিলনী আজ এই বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। আজ আর আমাদের ভক্তসম্মিলনী শিশু নহে, ইহা যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভক্তসম্মিলনীর আজ ষোড়ষবার্ষিক অধিবেশন. সুতরাং পূর্ণ, পুষ্ট ও সজীব। ইহা হইতেই এই সম্মিলনীর গুরুত্ব উপলব্ধি হইতেছে, এই বারের সম্মিলনী আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি সাধের স্থান এই ময়নামতীতেই হইতেছে। আপনারা অনেকেই অবগত আছেন আশ্রমসকলের মধ্যে একমাত্র এই স্থানই শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোনীত এবং নিজ অর্থব্যয়ে ক্রীত। এই পর্য্যন্ত এই আশ্রম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে যাহা কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে মনে হয়, এই স্থানের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কেবল মাত্র এ জীবনের সম্বন্ধ নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনেরও নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই স্থান পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক হিসাবেও বিশেষ গৌরবান্বিত। এই স্থান যাঁহার নামের সহিত বিজড়িত সেই পুণ্যশীলা রাণী ময়নামতী এই আশ্রমের অনতিদূরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তিনি কেবল মাত্র বিপুল রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন এমন নহে, অধিকন্তু, তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না, অশেষ গুণবতী মহিলা ছিলেন। তিনি নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক—মীননাথ শিষ্য গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। এতাদৃশ সদ্‌গুরু লাভ করিয়াই রাণী ময়নামতী অশেষ গুণ সম্পন্না হইতে পারিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার স্বামী বিয়োগ ঘটে, তৎপরে একমাত্র নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা স্বরূপে বহুদিন অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করতঃ তিনি অশেষ কীর্ত্তি ও যশোসম্পনা হইতে সমর্থা হইয়াছিলেন। বহুদিন হইল তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে তাঁহার অপরিসীম কীর্ত্তিগাথা গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে।

কিম্বদন্তী আছে যে বৌদ্ধযুগে একসময়ে এই স্থানে দুইসহস্রাধিক বৌদ্ধসন্ন্যাসী শ্রমণ বাস করিতেন, এই

সকল শ্রমণ দিগ্‌দিগন্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের অশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আজিও ময়নামতী ও তাঁহার সুযোগ্যা ভগিনী লালমতী (লালমাই) পাহাড়ের স্থানে স্থানে প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি, প্রস্তর স্তম্ভ প্রাচীন ইষ্টকালয়াদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের এই আশ্রমভূমিতেও এই প্রকারের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং একটী প্রস্তর স্তম্ভ এখনও রক্ষিত আছে। ইহা হইতেই এই স্থানের প্রাচীনত্ব এবং বৌদ্ধযুগের সহিত এই যুগের নিবিড় সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ সাধনপূত স্থানে এই আশ্রম স্থাপন অতি উপযুক্তই হইয়াছে। গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অসমান এই টীলাযুক্ত স্থানকে সমতল ও বাসোপযোগী করিয়া বর্ত্তমান আশ্রমে পরিণত করিতে সেবকগণের অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আশ্রমভূমি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টায় ১৮৫০৲ টাকা ব্যয়ে ৪০ কাণি জমি খরিদ করিয়া আশ্রম পরিচালন উপযোগী স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এখনও সমস্ত জমি চাষাবাদের বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় নাই, তবে আশা আছে অচিরে উহাতে বিশেষ আয় হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে আশ্রমে অধ্যক্ষ মহারাজ ব্যতীত ৬টী সেবক ও ৩টী অনাথ বালক রহিয়াছে। আশ্রমের কার্য্যাবলীর পরিসর ও কৃষি কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য আরও কতিপয় কর্ম্মী সেবকের প্রয়োজন। এই বৎসর ১০০০৲ ব্যয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের সংলগ্ন একটী ঘর ও বারাণ্ডা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই টাকা এই বিভাগীয় ভক্তগণই প্রদান করিয়াছেন। আমিলাইস মহিলা-সঙ্ঘ ২৭৫৲ টাকা ব্যয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ পাকের জন্য একটী পাক-শালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীমতি শত-কুমারী চৌধুরাণী একাই ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, বাকী টাকা উক্ত সঙ্ঘস্থ মহিলা ভক্তগণের প্রদত্ত অর্থ এবং সঞ্চিত মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে।

গতবর্ষে একটী প্রস্তাব হইয়াছিল যে ঋষি-বিদ্যালয় প্রত্যেক আশ্রমে স্থাপন না করিয়া কোন একটী আশ্রমে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্রীভূত করিলে সর্ব্ব বিষয়ে সুবিধা হইবে। আসাম মঠের অবস্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া উহাকেও বাঙ্গলার কোন আশ্রমে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় উক্ত উভয়বিধ কার্য্যের জন্যই এই আশ্রমের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ভৌগলিক অবস্থিতি একান্ত অনুকূল, এই আশ্রমে স্থানাভাব হইবার কোন কারণ নাই, কারণ নিকটবর্ত্তী সুন্দর ও মনোরম টীলাগুলি বন্দোবস্ত লইয়া সহজেই আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। নিকটে জিলার সহর থাকায় প্রেসের কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা আমাদের পুস্তকাদি প্রচার ও ছাপা বাদে কিছু আয়ও করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে কুমিল্লা সহরে কোন মেসিনপ্রেস এযাবৎ স্থাপিত হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঙ্গলাকেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং বাঙ্গালায় মঠ স্থাপন এবং প্রেস পরিচালনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই স্থানে আমাদের সমবেত কর্ম্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া মঠ ও ঋষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে কিনা আপনারা তাহা বিবেচনা করিবেন।

আজিকার দিনে আমাদের মঠাধ্যক্ষের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। তাঁহার অভাবে আমাদের কার্য্যশক্তিও বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার স্থানে কার্য্য করিবার যোগ্য ব্যক্তির অভাব অনুভব করিয়া আমরা বিচলিত হইয়াছি। এইরূপ

অবস্থায় আমাদের সঙ্ঘ কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে অচিরে তাহার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আজ পৃথিবীভরা বিপ্লবের দিন, ধর্ম্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্রনীতিতে সকল বিষয়েই বিপ্লব। এমন দিনে যে আমাদের প্রিয় গুরুভ্রাতৃগণের মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতেছে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ঋষি-বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা এক কথায় সৎশিক্ষা দ্বারা বর্ত্তমান যুগে কোন ফল লাভ হইতেছে না যাহারা মনে করেন, তাহারা হয় অর্ব্বাচীন নতুবা বাতুল; সৎশিক্ষা দ্বারা, সদুপদেশ দ্বারা, সৎদৃষ্টান্ত দ্বারা কত শত বর্ব্বর, নিষ্ঠুর পাষণ্ডও উন্নত, সৎ ও সাধু হইয়াছে এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের শিক্ষা ও চরিত্র এবং উপদেশ জগতে কি কার্য্য করে নাই? এই বিরাট প্রতিষ্ঠান, শ্রীশ্রীঠাকুরের ২০ বৎসরব্যাপী কঠোর কর্ম্ম-সাধনা, তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, উপদেশ ও শিক্ষা কি ব্যর্থ হইবে? আমার মনে হয় ইহা অসম্ভব; তবে বর্ত্তমান দেশ কাল-পাত্র হয়ত তাঁহার এই ভাব গ্রহণের উপযুক্ত নহে, সুতরাং প্রতি কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের পশ্চাতে ব্যর্থতা আসিয়া আমাদের কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। ইহাতে আমাদের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গুরু-অন্বেষণ করিয়া সাধনমার্গের সকল পন্থাতেই বিচরণ করিয়াছেন এবং সেই সকল পন্থায় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতাও আছে, সেই সকল পন্থায় তিনি সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কয়জন অধিকারী আছেন যাঁহারা সেই সকল পন্থা বা যে কোন একটী পন্থা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। সকলেই তো নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকেও ত সাধনপরায়ণ দেখিতে পাই না। শ্রীশ্রীঠাকুর কত কষ্ট ও অশেষ যত্ন করিয়া এই লুপ্তপ্রায় রত্নগুলি উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু কই আমাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহার এইগুলি যাচাই করিয়া দেখিতে সাহসী হন।

নির্ভরতা এত সোজা জিনিষ নয়, শুধু মুখের কথায় নির্ভরতা আসে না। অহংবুদ্ধির চরম সীমায় যখন হালে পানি পায় না, তখনই নির্ভরতা আসে। তাহার পূর্ব্বে যাহারা নির্ভরতা আসে বলে, তাহারা আত্মপ্রবঞ্চক। নির্ভরতা বা বিশ্বাস যেন ফুলের কুঁড়ি। কুঁড়ি যেমন একবার বাহির হইলে আর ভিতরে যায় না তেমনি নির্ভরতা বা বিশ্বাস একবার জন্মিলে হাজার ঝঞ্ঝাবাতেও তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারে না। আগে সাধন-ভজন যোগ-যাগ তপস্যাদি করিয়া দেখুন, যখন দেখিবেন, সত্যবস্তু লাভে ঐ সকল পর্য্যাপ্ত নহে তখনই বুঝিবেন তাঁহার কৃপা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্য-যোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি বুঝাইয়া অবশেষে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উপদেশ করেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অহং-মমত্ব বিশিষ্টজীবের পক্ষে শরণাগতি যে একপ্রকার অসম্ভব এই উপদেশ দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। আমি বলিতে চাহি না যে আমাদের মধ্যে সেইরূপ ভাগ্যবান্ জন কেহই নাই, তবে তাঁহাদের সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প সেই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অন্যের তাই বলিয়া শরণাগতির অভিনয় করা চলে না। তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনির্গত যে উপদেশাদি, সাধন-ক্রিয়া পাইয়াছেন বিহিত ভাবে তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি তাঁহার শরণ লইয়াছি বলিয়া সাধন-ভজন ত্যাগ করিলে তাঁহার

প্রতি অবিশ্বাসই আসিবে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মত গুরু পাইয়াও কিছু হইল না বলিয়া পরিণামে আফশোষ করিতে হইবে।

যুগধর্ম্মের আহ্বানে যুবকগণ ও জননীগণ সাড়া দিয়াছেন, এমন একদিন আসিবে যেইদিন এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারার্থ শত শত আত্মত্যাগী জননী ও সন্তানের প্রয়োজন হইবে! সেইদিনের জন্য প্রস্তুত হউন! রাণী ময়নামতীর মত যিনি একমাত্র সন্তান রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন--শত শত জননী যেন আমাদের সঙ্ঘকে অলঙ্কৃত করিয়া সেই ভাবে কৃতকৃতার্থ করিতে পারেন। তখন আমাদের এই আশ্রম পুনরায় শত শত সন্ন্যাসীর বিহারভূমি হইয়া উঠিবে, এই পূতপুণ্যভূমি আবার মঠ মন্দিরাদিতে ভরিয়া উঠিবে, বুদ্ধদেবের অতীত স্মৃতি পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিবে! আপনারা হয়ত আমাকে কল্পনাপ্রিয় ভাবিতেছেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন ধর্ম্মে-কর্ম্মে, নীতিতে-আচারে হীন এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য এই দেশে শত শত সন্ন্যাসীর প্রয়োজন আছে কিনা? বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে পৃথিবী ছাইয়া পড়িয়াছিল—যে বুদ্ধের - "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণতঃ চরণে যাঁর"—সেই সকল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রভাবে নহে কি? জগৎগুরু শঙ্করের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বা প্রবল শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সৃষ্টি না হইলে কি বৌদ্ধ কাপালিক দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে পারিত, পাশ্চাত্যসভ্যতাবনাম জড়বাদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আবার শত শত সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। দেশের সেই সুদিন অবশ্যই আসিবে। আজ ইহা কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিশ্বাস করুন এই পবিত্র ও মনোরম ময়নামতীর আশ্রমক্ষেত্রই একদিন শত শত সন্ন্যাসীর আশ্রয় স্থান হইবে। আপনারা অনেকেই দূর দূরান্ত হইতে আসিয়াছেন—এই স্থান দেখিবার সুযোগ কাহারও তেমন হয় নাই। আমি আপনাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে আপনারা এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যাঁহাদের অবসর আছে তাঁহারা অন্ততঃ এই ময়নামতী ও লালমাই পাহাড় দেখিয়া যাইবেন, দেখিবেন ইহার প্রত্যেকটী টীলা প্রাচীন ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ পূর্ণ কত বৌদ্ধমূর্ত্তি, হিন্দু-দেবদেবীমূর্ত্তি স্তম্ভ ও শিলালিপি এই সকল স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, অন্বেষণ করিলে বহু প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তি ও স্মৃতি চিহ্ন ইহার স্থানে স্থানে রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এই আশ্রমেরই অনতিদূরে ময়নামতী প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। তথায় কয়েকটী মন্দির বিশেষ একটী সাধনস্থান, ভূগর্ভগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কথিত আছে ঐ স্থানে ময়নামতীর গুরুদেব সিদ্ধ গোরক্ষনাথ মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। উহার অনতিদূরে কয়েকটী কালী-সাধন স্থানও আছে তথায় অল্প দিন হইল জনৈকা নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোক ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন এবং তাঁহার জটা হইতে রুধিরধারা পতিত হইত, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি তন্ত্র-সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বাসস্থান এখনও বিদ্যমান আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, একসময়ে আমাদের আশ্রমস্থ পাহাড়ই সিদ্ধ যোগী ব্রহ্মানন্দ গিরির আজন্মভূমি ছিল। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পূর্ণানন্দ গুটীকা সাধন বলে এই স্থান দিয়া শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থান অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া নিম্নে অবতরণ করতঃ গুরুদেবকে উদ্ধার করেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় আমাদের এই আশ্রম যথোপযুক্ত স্থানেই নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

সংঘশক্তির প্রভাব কত প্রবল। বিচ্ছিন্ন-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিলে তবেই মহাশক্তির উদয় হয়। মহৎকার্য্য সাধনব্যপদেশে দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্য সমাজ যখনই সংঘবদ্ধ হইয়াছেন—তখনই দুর্দ্দমনীয় আসুরিক-শক্তি, বিরুদ্ধশক্তি আপনি অবনত

হইতে বাধা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ভক্ত-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে ঐরূপ সংঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতেই ইঙ্গিত করিতেছেন। আজ ত্যাগী ও গৃহীভক্তগণ একই প্রাঙ্গনে একই উদ্দেশ্যে মিলিত। বিরুদ্ধ শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, এই সঙ্ঘশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ ধর্ম্মে-কর্ম্মে নীতিতে ও আচারে ভ্রষ্ট এই পতিতজাতিকে হঠাৎ তুলিয়া ধরা অসম্ভব। কিন্তু আপনারা জানিবেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ইচ্ছা কালে ফলবতী হইবেই এবং অচিরে শুভফল প্রসব করিবেই, তিনি যে শক্তিবীজ নিহিত করিয়াছেন তাহা অনুকূল আব-হাওয়া পাইলে একদিন মহামহীরুহে পরিণত হইবে। সেদিনের জন্য অবশ্যই আপনাদিগকে শান্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতে হইবে।

আজ আপনাদিগকে বৎসরান্তে নিকটে পাইয়াছি তাই প্রাণ উন্মুক্ত করিয়া আপনাদের নিকট দুটী প্রাণের কথা বলিলাম, আশা করি ক্রুটী গ্রহণ করিবেন না। আপনাদের নিকটে পাইয়া আর আদর-আপ্যায়নের কথা মনে থাকে না। আমাদের বহু ক্রুটী আছে, কিন্তু বিশ্বাস আছে, আমরা সকলে ভাই ভাই, কর্ম্ম-বিভাগে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন আছি মাত্র, একই পিতার আহ্বানে পিতৃগৃহে সকলে সমবেত হইয়াছি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রুটী স্বাভাবিক সরলতায় মার্জনা করিবেন। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের পিতা, শাস্তা, আচার্য্য ও গুরুদেবের নিকট আমাদের দোষ-ক্রুটী নিবেদন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতঃ হই ও তাঁহার আশী-র্ব্বাদ ভিক্ষা করি—

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥



অভিভাষণ

—•—

ষোড়শ বার্ষিক ভক্তসম্মিলনীর মহিলা সভার প্রথম অধিবেশনে
আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠান্তর্গত আমিলাইস—
মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী
শ্রীসীতাদেবী দ্বারা মহিলা-সভায় পঠিত

প্রেমাস্পদ মাতা ও ভগিনীগণ!

শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম করুণাবলে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী অগণিত ভ্রাতা ভগিনীগণ একসূত্রে গ্রথিত হইয়া আজ এই ষোড়শবার্ষিক ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষে ময়নামতী আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শ্রীচরণপ্রান্তে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সমাজ-বন্ধন, পরস্পরের মিলন পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ছিল; কিন্তু এই সম্মিলনীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা আজ উড়িয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুরে একদিন যেমন যমুনা প্রাকৃতিক নিয়ম ভুলিয়া উজান বহিয়াছিল, গোপবালারা যেমন আপন আপন স্বামী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন ঘরবাড়ী ভুলিয়া অপ্রাকৃত রসাস্বাদের জন্য রাসের মহাযজ্ঞে সমবেত হইয়াছিল, আজ আমরা মাতা-ভগিনীগণ সমস্ত বাধা সমস্ত বন্ধন ভুলিয়া গিয়া এই ময়নামতীক্ষেত্রে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের শ্রীচরণতলে সমবেত হইয়াছি, আজ এই শুভ-মিলন-বাসরে আমরা দূরদূরান্তবাসী ভগিনীগণ ও মাতৃস্থানীয়া জননীগণ পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া নিজকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছি এবং যাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইয়া আজ এই ধর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-রূপে আমাদের মধ্যে বিরাজিত দেখিতে পাইয়া তাঁহারই অপার করুণা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছি।

ভগিনীগণ!

গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনালীলাবতীর যুগ বহুকাল অনন্তের কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদেরই বংশধর আমরা অতীতের স্মৃতিটুকু বুকে করিয়া এযাবৎ জীবন্মৃত অবস্থায় কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছি মাত্র, আমরা এখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, অসহায়, অশিক্ষিত, ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, তাই জগৎপিতার আসন টলিয়াছে, আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কলির জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এ যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণে জীব-সেবার শুভ ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে; তাই তিনি সুদূর পল্লীগ্রামের অলিগাল ঘুরিয়া আমাদের মত পাষণ্ডী জীবকে কৃপা করিয়াছেন! কিন্তু ভগিনীগণ! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আমরা কি তাঁহার এই অহেতুকী কৃপালাভের উপযুক্ত হইতে পারিয়াছি? আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ঠাকুর কেন আমাদের জন্য এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইয়াও কেন তিনি অনাহারে অনিদ্রায় দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অযাচিতভাবে এই অসাধনের ধন বিনা মূল্যে বিলাইয়া দিতেছেন। তাঁহার সাধন-জীবনের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাই

না। এখনও তাঁহার জীবনী বাহির হয় নাই, হইবার সময় হয় নাই, যোগীগুরুর ভূমিকায় এবং "মায়ের কৃপা" পুস্তকে এবং পুরাতন আর্য্যদর্পণের কোন কোন স্থানে শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের সাধন-জীবন সম্বন্ধে অতি সামান্য আভাস দিয়াছেন মাত্র। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুরাণ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়—সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মুনি-ঋষিগণ গভীর অরণ্যে ঊর্দ্ধপদে, হেঁটমুণ্ডে, প্রচণ্ড শীতাতপে, অনশনে, অর্দ্ধাশনে কুত্রাপি কন্দ-ফল মূল মাত্র ভোজনে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাক-কাণ কীটভ্রংষ্ট হইয়াছে, কাহারও গায়ে উইএর ঢিবি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা তথাপিও সাধনার পথ হইতে স্খলিত হয় নাই বা সাধন প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন নাই! শ্রীশ্রীঠাকুরও কি কম কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কত কাল ধরিয়া বনে-জঙ্গলে মুনি-ঋষিদের তপোবনে গুহা-গহ্বরে কাটাইতে হইয়াছে। কতবার তাঁহার নিজের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। তিনি শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানীর মধ্য দিয়া বিচরণ কালে হিংস্রজন্তুর কবল হইতে অলৌকিকভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। মহাপুরুষের সাধন জীবন বাস্তবিকই অদ্ভুত ও বিচিত্রতাময়; সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুর আমাদের জগতের জীবকে অমৃতহ্রদের সন্ধান জানাইবার জন্য পাহাড়-পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ছুটিয়া আসেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; কিন্তু বহির্মুখী বাঙ্গালী, বাঙ্গালার নরনারী তাঁহার অমৃতবাণী, অযাচিত দান, উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাই তিনি স্বীয় অপরিসীম তপঃশক্তি প্রভাবে বাঙ্গালীর বহির্মুখী-ভাবকে অন্তর্মুখী করিবার অভিপ্রায়ে এবং বাঙ্গালার তরুণপ্রাণে শক্তি সঞ্চার করতঃ তাহাকে অধ্যাত্ম-সম্পদ ধারণার উপযোগী করিবার জন্য এদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আসাম প্রদেশে চলিয়া যান, এবং স্বকীয় তপঃপ্রভাব এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে পুঞ্জিভূত করিয়া, প্রবাহ আকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি "আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ" স্থাপন করেন, এবং সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পান। বাল্যজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভাবে আমাদের সমাজ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল-পরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার মহাপ্রাণ করুণায় উছলিয়া উঠে, তাই তিনি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে উক্ত মঠে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ২০ বৎসর পূর্ব্বে সুদূর আসামের তপঃক্ষেত্রে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা আজ ফলে-পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। এখন তাহার শাখা প্রশাখা কেবল মাত্র আসামেই সীমাবদ্ধ নহে, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ আজ আমরা শ্রীমৎ চিদানন্দ, শ্রীমৎ প্রেমানন্দ, শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ, শ্রীমৎ আত্মানন্দ, শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ও শ্রীমৎ নির্ব্বানানন্দ স্বামী মহারাজদিগকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিভাগে থাকিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্য প্রচার করিতেছেন। বিভিন্ন বিভাগে যাহাতে গুরুগৃহের আদর্শে প্রত্যেক গুরুভ্রাতা ভগিনীগণ নিজ নিজ গার্হস্থ্য জীবন গঠন করিতে পারেন অর্থাৎ আদর্শ গৃহী হইতে পারেন তজ্জন্য প্রত্যেক বিভাগেই ঠাকুর একটা করিয়া আদর্শ সংসার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ভগিনীগণ! এই আদর্শ সংসারই আমাদের বিভাগীয় আশ্রম।

এই আদর্শ সংসার বহির্দৃষ্টিতে আমাদের সামাজিক সংসারেরই মতন বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে, বহিঃকর্ম্ম এখানেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ আমাদেরই মতন অন্নসংস্থান, গৃহবন্ধন, হলচালন, গো-পালন, রন্ধন, জীবসেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া নিজের আত্মোন্নতি করিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র ভাবের তফাতেই

আশ্রমবাসীরা গুরুগৃহে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা প্রারব্ধক্ষয় করিয়া যাইতেছেন, আর আমরা হতভাগা, তাই সমস্ত কর্ম্মে অহংএর ছাপ লাগাইয়া কর্ম্মের বহর বাড়াইয়া চলিয়াছি। একইপ্রকার কর্ম্মদ্বারা তাহাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হইতেছে; আর আমরা বন্ধন দৃঢ়তর করিতেছি। আমরা যাহাতে আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুকরণে নিজের সংসার গঠন করিতে পারি এই জন্য ঠাকুর দয়া করিয়া এই গৃহস্থালী পাতাইয়াছেন। ঠাকুর নিজে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে প্রয়োজন কি? তিনি থাকিবার জন্য আশ্রম করেননি, আমাদের শারীরিক মানসিক উভয়বিধ মঙ্গলার্থে আদর্শরূপে আশ্রম গঠন করেছেন। আশ্রম রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের আদর্শই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই আদর্শ চোখের উপর দেখিয়াও গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা গ্রামে গ্রামে, প্রতি গুরুভ্রাতা-ভগিনীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; যাহাতে প্রত্যেকেই তাঁহাদের আদর্শে এবং উপদেশে নিজকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন! ঠাকুর কেবল আশ্রম গড়িয়া তুলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; প্রতিবৎসর যাহাতে বাংলার সর্ব্বস্থান হইতে গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণ একস্থানে সমবেত হইয়া গতসম্বৎসরের কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে পারেন এবং সাম্বৎসরিক জীবনের উত্থান-পতন চিন্তা করিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ও পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা নিজের সংস্কারগত দুর্ব্বলতা ধুইয়া-মুছিয়া দেহ মন বিধৌত করিয়া নূতন শক্তিতে শক্তিমান হইতে পারেন, এই মহান্ উদ্দেশ্যেই ভক্তসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভগিনীগণ! এখন একবার স্থিরভাবে চিন্তা করুন, এই আশ্রমের সার্থকতা আছে কিনা, একবার ভাবিয়া দেখুন আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগের কোন প্রয়োজন আছে কিনা? এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝুন, এই আশ্রমকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট রাখিবার দায়িত্ব আপনাদের কিনা, ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন এই গুরুগৃহই আমাদের দেব মন্দির। এখানেই মূর্ত্তিমান ঠাকুর বিগ্রহ স্বশরীরে বিরাজমান! আমাদের মধ্যে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু মহিলা আছেন, আপনারা এই ঠাকুরমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে, সংস্কার-কর্ম্মে এবং পরিপোষণ হেতু আপনাদের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করুন। যাহার যাহা আছে আজ তাহা লইয়া অগ্রসর হউন। যাহার অর্থ আছে তিনি অর্থ সাহায্য করুন, যাহার অর্থ নাই তিনি অন্ততঃ মুষ্টি ভিক্ষা দান করুন, আশ্রমের চিন্তা আপনাদের দৈনন্দিন কার্য্যের অঙ্গ হউক। আপনারা আশ্রমের ভাবে ভাবান্বিত হইতে চেষ্টা করুন। আশ্রমের আদর্শ প্রত্যেকে গ্রহণ করুণ, এবং সেই আদর্শে আপন আপন পারিবারিক জীবনগঠন করুন। আপনারা দেখিবেন অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যেক পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। আপনাদের বাড়ীর অঙ্গন-প্রাঙ্গন সকাল-সন্ধ্যায় আশ্রম গীতিতে মুখরিত হইয়া উঠুক! আপনাদের দৈনন্দিন কার্য্যে আশ্রম-ভাব ফুটিয়া উঠুক! আপনাদের আসনগৃহ শ্রীগুরুর বিমলজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক! দেহধারী ঠাকুর চিদ্‌ঘনভাববিগ্রহরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হউন্, এমন সময় আসিবে, সেদিন আমরা শিশুর সরল সহজভাবে আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে প্রতি গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইব।

ভগিনীগণ! তাহারই আয়োজন চলিতেছে, আজ তাহারই বোধন মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুন

যেন আশ্রম চিন্তা আপনাদের দৈনন্দিন কার্য্যের অঙ্গ হয়। আপনারা ঠাকুরকে না ভুলেন। ঠাকুর-গৃহকে যেন ভুলিয়া না যান. ঠাকুরের সেবক-দিগকে যেন আপনজন বলিয়া চিনেন, এবং আপন-বোধে ভালবাসেন ও স্নেহ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কত রাজা-মহারাজা শিষ্য আছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কেহ একা সকল আশ্রম গড়িয়া দিতে পারেন. কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা তাহা নহে। ইহাতে কয়েকটী ইমারত প্রস্তুত হইতে পারে বটে, আশ্রম গড়িয়া উঠে না। ঠাকুরের নিজের ভাষায় বলি, 'আশ্রমগুলিকে গড়িয়া তুলি-বার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা কেহ বুঝে না? তোমারা জেনে রাখ, বড় লোকের অর্থ দ্বারা আশ্রম প্রভৃতির উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। আশ্রমের উদ্দেশ্য লোক তৈয়ারী করা। একজন ধনী যদি একটী আশ্রম তৈয়ারী করিয়া দেয় ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বিপুল অর্থ দান করে. তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু উপকার হয় না। কারণ, হয়ত তাহার এককোটী টাকার সম্পত্তি আছে. দশ বিশ হাজার টাকা দিয়া একটি আশ্রম গড়িয়া দিলে তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু ত্যাগ স্বীকার করা হয় না। তাহাতে অন্যের ও বড় কিছু উন্নতি হয় না। শুধু হাতে দশ জনে মিলে যদি একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে ও তিলে তিলে তাহাকে গড়িয়া তোলা যায়, তবে সেই দশজন হয়ত দশহাজার লোকের নিকট ভিক্ষার্থে যায়, সেই দশ হাজার লোককে আশ্রমের উদ্দেশ্য বুঝায়। তাহারাও আশ্রমের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে শিক্ষা করে। এইরূপে দশহাজার লোক উন্নত হয়। তোমরা আশ্রমের জন্য ভিক্ষা কর. যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা আশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিতেছ কেন? আশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিয়া লাভ কি? তোমরা বলিও সেবা সহায়ে চিত্তশুদ্ধি আশ্রমের উদ্দেশ্য। তোমরা যাহারা গৃহী, তাহারা এইভাবে এইসব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, কর্ম্মী-দিগকে সাহায্য কর। গৃহে থাকিয়া নিঃস্বার্থতা শিক্ষা কর, আমি বল্‌ছি "গৃহীদের এই পথ, নান্য পন্থা।"

আবার ঠাকুরের ভাষায় বলি "আমি চাই তোমাদের ধীরে ধীরে, তিলে তিলে গড়ে নিতে, ছোট থেকে বড় করতে। জগতে যাহা কিছু বড়, সবই ছোট হইতে বড় হয় ও তাহাই টিকিয়া যায়। তোমাদের বেশী প্রচারের প্রয়োজন নাই, তোমরা নিজেরা শুদ্ধাত্মা হও। যে গ্রামে তিন-জন গুরুভাই আছে, তাহাদের বাড়ীতে মুষ্টিভিক্ষা কর। একস্থানে মাঝে মাঝে একত্র হও। এতে কাজ হইবে। এমন একদিন আসিবে যখন বড় বড় লোক তোমাদের আশ্রম মঠ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হইবে "সত্যের আদর চিরদিনই সমান।"

আপনাদের মধ্যে অনেকেই বয়সে আমা হইতে প্রাচীনা, এবং জ্ঞানে গরীয়সী। আপনাদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা এই সম্মিলনীতে আসিয়া যে বিমলানন্দ অনুভব করিলেন, অনু-পস্থিত গুরুভগিনীদের মধ্যে তাহা যেন বিলাইতে চেষ্টা করেন।

তাহার পূত স্মৃতি যেন সম্মিলনীর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া না যায়। আপনারা এই স্মৃতি বহন করিয়া নিয়া যান এবং গ্রামবাসী গুরু-ভগিনীদের সহিত এই উৎসবের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। অন্ততঃ সম্বৎসর পর্য্যন্ত যাহাতে গৃহস্থের আদর্শ হইতে চ্যুত না হন, তজ্জন্য আজ প্রতিজ্ঞা করুন। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের সহিত আশ্রমের আদর্শে সকাল-সন্ধ্যায় স্তোত্র গীতাদি পাঠ করিবেন। সপ্তাহে একবার অন্ততঃ একগ্রামের গুরুভগিনীগণ এক-স্থানে একত্র হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য এবং নিজ

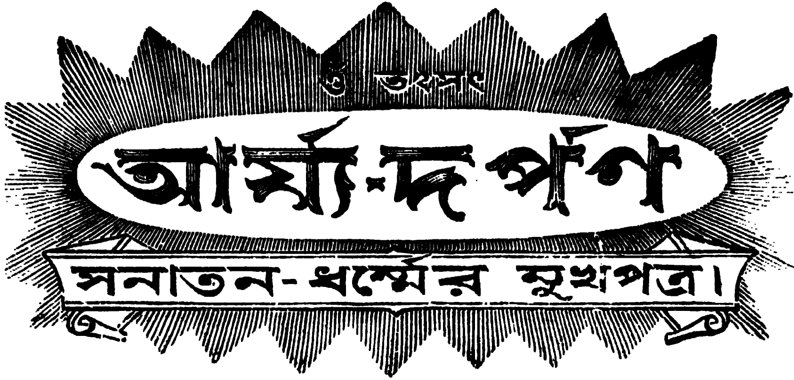
নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পুস্তকাদি হইতে বা আর্য্যদর্পণ অথবা যে কোন ধর্ম্ম পুস্তক হইতে পাঠ ও আলোচনা করিবেন, প্রত্যেকে আশ্রমের জন্য মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন। অক্ষম পক্ষে অন্ততঃ দুবেলা দুমুষ্টি চাউল আশ্রমের জন্য সঞ্চয় করিবেন। তবেই আশ্রমের এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য প্রচার ও সিদ্ধ হইবে! তবেই সংযম-শক্তি প্রতিষ্ঠা হইবে, আমরা সকলে এক পিতার সন্তান, সকলেই ভ্রাতা ভগিনী, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত জন্ম জন্মান্তর হইতে অতি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের কোন কার্য্য বা আচরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণে যেন আঘাত না লাগে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় আবার বলি "আমাদিগকে যেন কেহ জারজ বলিয়া সন্দেহ না করে।"

[আঃ দঃ পৃঃ ৪৯২]

সর্ব্বশেষে আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন আমাদের এই শুভ-মিলন যেন ব্যর্থ না হয়, প্রতিবৎসর যেন আমরা গুরুভগিনীগণ একত্রে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারি। অদ্যকার দিনটি বাঙ্গালার মহিলা-সঙ্ঘের জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকুক। চলুন এই শুভ মিলনবাসরে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করি, আমাদের প্রাণে যেন কর্ম্ম শক্তির প্রেরণা অটুট থাকে।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব





২৩শ বর্ষ | ২য় খণ্ড

ফাল্গুন—১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৫১ | পঞ্চম সংখ্যা

পুরুষোঽমানব

—*—

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ—চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড—৫)

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে॥

—যাঁহারা দেবযান-পথের যাত্রী, মৃত্যুর পর তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হউক বা না হউক, তাঁহারা অর্চ্চিতে গমন করেন। অর্চ্চি হইতে দিবসে, দিবস হইতে

শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয়মাসে, সেই ছয়মাস হইতে সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। সেই বিদ্যুৎলোকে এক অমানুষ পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান্। ইহাই দেবপথ—ব্রহ্মপথ! এই পথে গেলে আর সংসারাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না!

আত্ম-চেষ্টার অবসান হইলে, এই বিদ্যুন্ময় পুরুষই মানুষকে ব্রহ্মের পথে লইয়া যান্। ইনিই গুরু—ইনিই মানুষকে উদ্ধার করিবার দরুণ পথে আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন।

মানুষের আত্ম-চেষ্টারও একটা সীমা রহিয়াছে, তাহার পর যিনি আসিয়া আত্ম-চেষ্টার ক্লান্তিকে বিদ্যুন্ময়-প্রেরণা দ্বারা অপসারিত করিয়া দেন—তিনিই সকলের অন্তর্য্যামী—গুরু! এই গুরু কৃপা করিয়াই তখন জীবকে ব্রহ্মলোকে উন্নীত করেন। কাজেই আত্ম-চেষ্টার উপরও "গুরুকৃপা" চাই—আত্ম-চেষ্টার গতি বিদ্যুন্ময়লোক, কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধেও ব্রহ্মলোক রহিয়াছে! এই ব্রহ্মকে যিনি পাওয়াইয়া দেন—তিনি ব্রহ্মলোক হইতে কৃপা করিয়াই মানুষকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করেন! এই জন্যই গুরুকৃপা না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না! ব্রহ্মকে গুরুই আসিয়া চিনাইয়া দেন। গুরু মাঝপথে বসিয়া আছেন এই জন্যই—এই দূতীয়ালীই গুরুর কাজ!

আত্ম-চেষ্টাশীল, ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত তো হওয়া চাইই—কিন্তু ইহাই শেষ নয়; তাহার পরও গুরুর—সেই বিদ্যুন্ময় পুরুষের প্রয়োজন হয়। তিনি আসিয়া কৃপা করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া না দিলে—প্রকৃত মুক্তির পথ জানা দুঃসাধ্য। চেষ্টা থাকা চাই, উদ্যম থাকা চাই, আবেগ থাকা চাই; কিন্তু সবার সেরা হইল—তাঁহার কৃপা। তিনি যদি কৃপা করিয়া হাত-বাড়াইয়া আমাদের বুকে টানিয়া না লন্, সত্যের পথ দেখাইয়া না দেন্, তাহা হইলে কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই দুর্ল্লভ পথের সন্ধান পায়! তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কৃপা করেন তিনি আত্ম-চেষ্টাশীল সাধককেই—আলস্য-জড়তায় আচ্ছন্ন ভণ্ড নির্ভর-বাদীকে নয়!

● সসীম মানবের চেষ্টাও সসীম। তাহার চেষ্টারও একটা সীমা রহিয়াছে, সীমার ঊর্দ্ধে যাইবার সামর্থ্য তাহার নাই, সেইখানেই সেই অ-মানব পুরুষের, দিব্য-দেহধারী গুরুর প্রয়োজন হয়! তিনি আসিয়া মানবের আত্মচেষ্টার নিদারুণ ক্লান্তিকে অপনোদন করিয়া দেন—মানুষের দুর্ব্বল প্রাণকে শক্তি-সঞ্চার দ্বারা

উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। তখনই মানুষের আসল জ্ঞান লাভ হয়, ব্যক্তিগত সাধনারও চরম সার্থকতা কোন্‌খানে তাহা মানুষ বুঝিতে সক্ষম হয়।

উজান পথ চলিতে হইলেই স্বাভাবিকই ক্লান্তি আসিবার কথা, তাহার উপর মানুষের আত্মবলই বা কতখানি! কাজেই পথের মাঝে সাহায্যকারী না পাইলে, ক্লান্তিতে, অবসাদে হয়ত পথের মাঝেই বসিয়া থাকিতে হয়! সত্যলাভের সব পথিকই সত্যলাভে সক্ষম হয় না—এমন কি সত্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও সত্যলাভে বঞ্চিত হয়। সত্যের দ্বার হিরণ্ময় আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত, কেহ কেহ বাহিরের এই উজ্জ্বল রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহারা মনে করে এই বুঝি সত্য—ইহার পর বুঝি আর কিছুই নাই! কাজেই তুষ্টি আসিয়া সেইখানেই তাহাদের তৃপ্তি আনিয়া দেয়, আর তাহাদের আবেগ থাকে না! সত্য-রাজ্যের অন্দর মহলে প্রবেশ করা আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাহারা বাহিরকেই ভিতর মনে করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া পড়ে!

প্রবঞ্চিত হইবার এমন অনেক প্রলোভন, অনেক কারণই রহিয়াছে—সব আকর্ষণকে, সব প্রলোভনকে বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের পূর্ণ আবেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে পারিলেই—সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হয়। নিজের ভিতর পূর্ণ-আবেগ পূর্ণ-উদ্যম তো থাকা চাইই, তাহার পরও সেই অ-মানব পুরুষের কৃপার প্রয়োজন হয়। কেননা শুধু আবেগ থাকিলেই সত্যের যথার্থ পথ আবিষ্কার হয় না—সত্য-পথের একজন দিশারী চাই। তিনিই গুরু, সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়া, তিনিই আবেগকে, আত্মচেষ্টাকে সার্থক করেন!

অনেকেই ক্লান্তিতে, অবসাদে, চেতনার অস্পষ্টতায় এইখানে আসিয়াই দিশে-হারা হইয়া যায়, কোন্ পথে গেলে ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে, তাহা আর ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সেই গুরুরূপী অ-মানব পুরুষ সঙ্কটস্থলে বসিয়া রহিয়াছেন। আত্ম-চেষ্টা দ্বারা বিদ্যুন্মণ্ডলোকে যাহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহাদের তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ করাইয়া দেন। সীমা হইতে অসীমের রাজ্যে লইয়া যাইবার ভার এই গুরুর ওপর। আত্ম-চেষ্টা দ্বারা সামান্য দর্শন হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে হইলেই গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন হয়। গুরু ধারণার অতীত—তাঁহার জন্ম কর্ম্ম সবই দিব্য। কৃপা করিয়া তিনি ধারণার শক্তি না দিলে, সসীম মানবের শক্তি কি যে, তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হয়! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্য-চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন—তবুও বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন ভয়ে জড়সর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সীমার শেষে যে অসীম পুরুষ আপন মহিমায় বিরাজিত—তিনিই বিশ্বগুরু। তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহাকে পাওয়া দুষ্কর—কেননা তিনি যে সীমার রাজ্য ছাড়াইয়া!

আবেগ থাকা চাই, কিন্তু দম্ভ যেন না থাকে। দম্ভ মানুষকে অনেক নীচে নামাইয়া আনে—সত্য-লাভেচ্ছুর দম্ভই হল প্রধান শত্রু। অনেকের পতনের মূল কারণ এই দম্ভ। সত্যলাভের পথে ছিটা-ফোঁটা আনন্দ পাইয়াই তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে! তাহাদের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, দৃষ্টি সঙ্কোচিত হইয়া আসে; কিন্তু তাহারা তবু সেই গর্ব্ব করিয়াই ক্রমশঃ অধোদিকে নামিয়া আসে। পতনকেই মনে করে উত্থান—উত্থানকেই মনে করে পতন, তাহাদের দৃষ্টি—ধারণা সব বিতথ হইয়া পড়ে, বিভ্রান্ত হইয়া যায়। বৈতথ্য দৃষ্টিকেই মনে করে সত্যদৃষ্টি! কাজেই আত্মশক্তিতে অন্ধ হইয়া পড়িলে সত্যলাভ হয় না। সত্য-দৃষ্টি খুলিয়া গেলে, মানুষ অসীম রাজ্যের আভাসও কিছু কিছু পায়; তখন আপনা হইতেই মানুষের গর্ব্ব কমিয়া আসে! অসীম রাজ্যের রাজাধিরাজ সেই অ-মানব পুরুষের কৃপা দেখিয়া তখন মানুষ মুগ্ধ হইয়া যায়। সেই অ-মানব পুরুষের বিদ্যুন্ময় দীপ্তিতে, ব্যষ্টি অহঙ্কার—অভিমানের তাপ আপনি শান্ত-স্নিগ্ধ হইয়া আসে।

আমাদের দৃষ্টির, চেতনারও সীমা আছে। আমরা সবই দেখিতে পাই না—কিম্বা সব সময় জাগ্রত থাকিতে পারি না; কিন্তু এমন একজন মহান্ পুরুষ আছেন, যিনি সদা-জাগ্রত, যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। কাজেই আমাদের অচৈতন্য অবস্থায়, চেতনা সঞ্চার করা, তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ। তিনি যদি ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন, তাহা হইলেই আবার আমরা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারি, তাহা না হইলে ঘুমের মাঝেই আমাদের অবশ হইয়া থাকিতে হয়। তহবিল শূন্য হইয়া গেলে, অযাচিতভাবে যিনি নিজ হইতেই তাহা পূর্ণ করিয়া দেন, তাঁহার অযাচিত কৃপার কি মূল্য দেওয়া যাইতে পারে? তিনি দয়ালু—দান করাই তাঁহার স্বভাব, নিজকে বিলাইয়া দিয়া, অপরের মাঝে ব্যাপ্ত করিয়াই তাঁহার পরম আনন্দ।

সত্যলাভের অসীম ব্যাকুলতা লইয়া চলিতে চলিতে যাহাদের ব্যষ্টি-সম্বল নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহাদের পথের সম্বল আবার জুটাইয়া দেন সেই অমানব, পরমদয়ালু মহাপুরুষই! নিজের চেষ্টাকে যথাযথ ভাবে খাটাইলে, সেই চেষ্টারই প্রতিদান স্বরূপ অহেতুক কৃপা বর্ষিত হইতে থাকে। আত্ম-চেষ্টায় যাহারা বিদ্যুন্ময়লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাহাদিগকে অসীম রাজ্যে লইয়া যাইবার

দরুণ সেই দিব্য মহাপুরুষই উন্মুখ, ব্যাকুল এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা একান্ত চেষ্টাশীল, নিরভিমানী, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার দরুণ ভগবানই ব্যাকুল হইয়া উঠেন!

যথার্থভাবে নিজকে সমর্পণ করিয়া যখন শূন্য হইয়া পড়ি, তখন আবার আমাদের দিব্য-সম্পদে পূর্ণ করিয়া তুলিবার দরুণ তিনিই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। নিজের চেষ্টাকে চূড়ান্ত করিয়া যখন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য হই, তখন আবার ভগবানই অফুরন্ত শক্তি প্রদান করেন! ফাঁকি না থাকিলে, ভণ্ডামী না থাকিলে, যথার্থ সাধনায়, আকুলতার শেষ সার্থকতা পাওয়া যাইবেই যাইবে!

সসীম মানুষের প্রাণেও অসীমের বেদনা রহিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়লোক হইতে সেই অমানব পুরুষের অমায়িক আকর্ষণ প্রত্যেক মায়িক-জীবের প্রাণেই অনুভূত হয়। মানুষ তখন উন্মাদ হয়, আকুল হইয়া ইষ্ট-সিদ্ধির পথে ছুটিয়া চলে—ভাবে, আত্ম-চেষ্টা দ্বারাই বুঝি কূলের নাগাল পাওয়া যাইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর মানুষ পারিয়া উঠে না। ব্যক্তিগত চেষ্টার সীমাবসানে মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে—কিন্তু সেই দিব্যমহাপুরুষ তখনই আসিয়া প্রাণে নূতন শক্তির বীজ রোপণ করিয়া দেন। মানুষ পূর্ণ চেতনা লইয়া, সেই উর্দ্ধ-জগতের পানে তাকাইয়া বিস্ময়ে অবাক-মুগ্ধ হইয়া যায়।

সীমার বন্ধন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত না হইলে ব্রহ্মের দর্শন হয় না। এই জন্যই সসীম ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিদ্বারা যাহা দেখি, যাহা অনুভব করি, তাহা পরিপূর্ণ দর্শন নয়—অনুভব নয়! আত্মহারা হইয়া যাইতে না পারিলে সংস্কার ভস্মীভূত হইয়া না গেলে—ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয় না। ব্রহ্মের অনুভব দেহ-মন-প্রাণ সবকে আপ্যায়িত করিয়াও নিঃশেষ হয় না। ব্রহ্মানুভূতির বিশিষ্ট করণ নাই। ব্রহ্মানন্দে সকল অঙ্গ তর্পিত হয়! আত্ম-সমর্পণ ছাড়া, বিরাটের অনুভব আসিতে পারে না। আত্ম-চেষ্টার সকল চাতুরী মুহূর্ত্তের মাঝে বৃথা হইয়া পড়ে—সেই বিরাট পুরুষের ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই! ইচ্ছা করিলে, তিনি সবই করিতে পারেন! তবে কি নির্ভরবাদের অর্থ এই যে, হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা? না, তাহা অসম্ভব! কিন্তু আত্ম-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটীও অজপা-জপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমার চেষ্টার একটা এলাকা রহিয়াছে, তাহার সীমা ছাড়াইয়া আমি এতটুকুও অগ্রসর হইতে পারিব না, কাজেই তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহাকে জানা কঠিন।

আত্ম-শক্তির অদম্য আবেগ, এবং নির্ভরবাদের প্রশান্ত, উজ্জ্বল অনুভূতি লইয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, যদি তাঁহার কৃপা অনুভব না হয়, তাহা হইলে আত্ম-চেষ্টার অভিমানে যে দু'দণ্ড পরেই অধঃপতন সুরু হইয়া যাইবে! কাজেই একদিকে অদম্য তেজ থাকা চাই; আবার অন্যদিকে চিত্তের সেই প্রশান্ত ভাবকেও সংরক্ষণ করিয়া চলিতে হইবে। আপ্রাণ সাধনা করিয়াও মনে করিতে হইবে, সেই অসীম আধ্যাত্মিক রাজ্যের অধিশ্বরকে তুষ্ট করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মশক্তির তীব্র মহিমায় আমার নিজের মনেরই অশুদ্ধি ক্ষয় হইতে পারে—কিন্তু সেই অমানব পুরুষের সন্তুষ্টি বিধান তাঁহারই কৃপা সাপেক্ষ। তিনি যদি তাঁহার মঙ্গল হস্ত দ্বারা আমাদের আশীর্ব্বাদ না করেন, তাহা হইলে আত্মম্ভরিতার দরুণ অভিশপ্ত জীবন নিয়াই আমাদের কাল কাটাইতে হইবে।

অনাবৃত্তির পথের সন্ধান একমাত্র অ-মানব গুরুই বলিয়া দিতে পারেন। আত্ম-চেষ্টা দ্বারা সাময়িক কাল পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ হইতে পারে, কিন্তু আবার সেই সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হইতে হইবে। কাজেই মোক্ষের পথ কেবল আত্ম-চেষ্টা দ্বারাই জানা যায় না, যদি না গুরুর কৃপা না থাকে।

সত্যধর্ম্ম সত্যেরই স্বর্ণময় আচ্ছাদনে সঙ্গোপিত। কাজেই ঋষির ন্যায় প্রার্থনা করিতে হইবে—"হে পূষন্‌, জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা (অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা) সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্ম্মপরায়ণ আমি উহা দর্শন করি।" বিদ্যুৎ এবং জ্যোতির অন্তরালে সত্যের কল্যাণময় রূপ রহিয়াছে! বিদ্যুতের, জ্যোতির অন্তরালে যে অ-মানব মহাপুরুষ রহিয়াছেন—তিনিই হলেন, সকল জীবের জ্ঞানদাতা। কাজেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যে যাহারা ভুলিয়া যায়, তাহারা সত্যের কল্যাণময় রূপ দর্শনে বঞ্চিত হয়!

অ-মানব পুরুষের আকর্ষণ রহিয়াছে বলিয়াই ক্রমোন্নতির পথে যাহারা চলিয়াছে, তাহারা ক্রমোন্নতি লাভ করে! আর যাহারা নিজের চেষ্টাকেই চরম মনে করে, তাহাদের তো আর ঊর্দ্ধলোকের আকর্ষণ নাই, তাহারা যে গর্ব্বের দরুণ শক্তিহীন, গতিহীন হইয়া পড়ে! গর্ব্বে মানুষের চিত্ত দীপ্তিহীন হইয়া পড়ে—নিরস হইয়া পড়ে! কাজেই প্রফুল্লতার অভাবে, তাহারা একজায়গাতেই স্থিতিলাভকে চরম মনে করে। গর্ব্ব হইল অধঃপতনের প্রথম সোপান!

ব্রহ্মকে যিনি পাওয়াইয়া দেন—তিনি ব্রহ্ম হইতেও বড়, তিনিই সেই অ-মানব পুরুষ গুরু! এই গুরু না হইলে কাহারও উদ্ধার নাই। স্থূলে—সূক্ষ্মে উভয়ত্রই গুরুর প্রয়োজন হয়! ব্যষ্টি চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন বৃহৎ চেতনার প্রয়োজন না হইয়াই পারে না। গুরু সদাজাগ্রত, তিনি এই সন্ধিস্থলে বসিয়া বসিয়া জীবের সকল চেষ্টা এবং পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার লীলা।

সংস্কারসিদ্ধ মানুষ অসীম রাজ্যের কাছে অগ্রসর হওয়া মাত্রই—দিশেহারা হইয়া যায়। আর তাহার ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। তখনই সেই পরমগুরু আসিয়া নবচেতনা সঞ্চার পূর্ব্বক সত্যের পথ দেখাইয়া দেন। অসীমের রাজ্যে আসিয়া সকলকেই এমন করিয়া একবার ঘোল খাইতে হয়। তখন এক-মাত্র অহেতুক কৃপাসিন্ধুই সম্বল! তিনি আবার সবকে নূতন সংস্কারে, নূতন যোগ্যতা প্রদান করেন!

আত্মচেষ্টার চরমে না উঠিলে, কৃপাবাদ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনে হয়, হয়ত কোথায়ও নিজেরই চেষ্টার ত্রুটী রহিয়াছে। আত্ম-চেষ্টা দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যখন ক্লান্তি আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ সংস্কার রহিত অবস্থা আয়ত্ত হয়, তখনই সেই গুরুকৃপার মহিমা হৃদয়ে অনুভূত হয়। কাজেই সাধন-ভজনবিহীন হইয়া কৃপাবাদের মাহাত্ম্য লইয়া যাহারা কীর্ত্তন করে, তাহারা ভণ্ড। সত্যলাভের অদম্য আবেগই সাধককে সত্যদ্রষ্টা গুরুর সান্নিধ্য লাভ করাইয়া দেয়।

কৃপা জিনিষটীর কাজ আর কিছুই নয়—সার্থকতা সম্পাদন করা। কাজেই সাধনার আয়োজন এবং সাধনা সাধককেই করিতে হইবে, গুরু আসিয়া কৃপা-বর্ষণ দ্বারা সবকে সার্থক করিয়া তুলিবেন মাত্র। কাজেই সাধন-ভজনবিহীন নির্ভরবাদী এবং সাধন-ভজনের অভিমানে উগ্র অভিমানী—কেহই সেই বিস্ময়-স্ময় লোকস্থিত অ-মানব পুরুষের কৃপালাভে সমর্থ হয় না। যাহারা সাধন-ভজনশীল অথচ নিরভিমানী তাহারাই গুরুর কৃপার পাত্র। গুরু "এনান্ ব্রহ্ম গময়তি।"—তাহাদিগকেই ব্রহ্মে লইয়া যান্।

পথের সঙ্কেত

—*—

যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপ জ্বলে, প্রাণ হইতে প্রাণের সঞ্চার হয়, তেমনি করিয়া মানুষ হইতে মানুষ হয়, ভগবান্ হইতে ভগবান্ লাভ হয়। এই মানুষ বা ভগবান তর্ক-যুক্তির মানুষ বা ভগবান নয়—তাঁহাদের সৃষ্টি আমাদের অন্তর্ম্মুখী সাধনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিজে অন্তর্ম্মুখী সাধনায় তলাইয়া যাইতে না পারিলে—আসল মানুষকে চিনা যায় না। ভগবানকে চিনিতে হইলেও ভাগবত দৃষ্টি লাভ করা চাই!

সন্তানের ভাল-মন্দ পিতা-মাতার কল্যাণকামনার উপরই নির্ভর করে। আসল জীবন গঠনের উপাদান আমরা মায়ের কাছ হইতেই পাই। ভালবাসা দ্বারা মা প্রাণ সঞ্চারিত করেন, প্রাণকে পুষ্ট করিতে পারেন। কাজেই আসল ঋণী আমরা মায়ের কাছেই—মা দর্শন-শাস্ত্রে বিদুষী কিনা, শাস্ত্রে পুরাণে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কিনা, ইহা আমাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় না। কেননা মায়ের কাছ হইতে আমরা যে স্নেহ পাই, যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাই—আর তাহাতে আমাদের জীবনের ভিত্তি যেরূপ সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তাহার সঙ্গে দর্শনের বড় বড় আদর্শের তুলনাই হইতে পারে না। মায়ের স্নেহে—মায়ের ভালবাসায়, প্রাণ আছে; তাহা দর্শনের মতবাদের ন্যায় প্রাণহীন নয়। কাজেই কেবল পুঁথি পুস্তক পড়িয়া কতকগুলি উচ্চ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হইলেই, জীবনের উন্নতি হয় না। আদর্শ বাস্তব হওয়া চাই—আর আদর্শ মানুষের সাধনায়ই বাস্তব হইয়া উঠে। কাজেই মৃত আদর্শকে আশ্রয় করিলে কোন ফল হইবে না, চাই জীবন্ত মানুষের সঙ্গ। মানুষের আশ্রয়েই মানুষ হওয়া যায়! তবে কিনা সেই মানুষ—মানুষের মত মানুষ হওয়া চাই! মহৎ-জীবনের সংস্পর্শ লাভ করা কম কথা নয়, কেননা তাহাতে জীবন্ত প্রেরণা অহরহঃই লাভ করিবার সুযোগ সুবিধা ঘটে! অস্পষ্টভাবের কাছে আত্ম সমর্পণ করার চেয়ে, সুস্পষ্ট আপ্ত-ব্যক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে জীবনের অনেক অবাস্তব-বেদনা, ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বালাই হইতে নিস্তার পাওয়া যায়! অব্যক্তাসক্তচিত্ত যাহাদের তাহাদের কপালে দুঃখের মাত্রাই বেশী, এমন কি অনেকের জীবন অস্পষ্ট লক্ষ্যের উন্মাদনায় ব্যর্থও হয়। সুস্পষ্ট বাস্তব আশ্রয়ের চেয়ে, তখন অস্পষ্ট লক্ষ্যের প্রতিই তাহাদের ঝোক চড়িয়া যায়। শেষে তাহারা ভ্রান্ত-আদর্শের দরুণই প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। কাজেই জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারাও কম কঠিন এবং কম ভাগ্যের কথা নয়।

মানুষের গর্ভে জন্মিলেই মানুষ হওয়া যায় না—মনুষ্যত্বের সাধনা চাই, তবেই মানুষ—মানুষ হইতে পারে! এই মনুষ্যত্বের সাধনা, জীবন্ত মানুষের কাছ থেকেই শিক্ষা করিয়া নিতে হয়। পুঁথি-পুস্তকে সাধনার অস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে, কিন্তু সাধনার বাস্তব প্রণালী মানুষই জানে, কাজেই মানুষের কাছ থেকেই মনুষ্যত্বের সাধনা জানিয়া নিতে হয়! আশ্রয় নিলে জীবনের অবনতি হয় না—ব্যক্তিত্বেরও লোপ হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না! বরঞ্চ অনেক উপদ্রব হইতে সহজেই রেহাই পাওয়া যায়! কাহাকেও প্রাণপণে ভালবাসিলে এবং তাহার আশ্রয় নিয়া থাকিলে, জীবনের বিকাশ আরও পরিপূর্ণ এবং সুষমামণ্ডিত হয়। ভালবাসার স্নিগ্ধ-মাধুরীতে অনেক উত্তেজনা কামনা প্রশান্তিতে বিলয় হয়! যৌবনে মহৎব্যক্তির আশ্রয় নিতে পারিলে, একটা পরম সার্থকতা লাভ হয়! আবেগ লইয়া, উন্মাদনা লইয়া—মানুষ অনেক সময়

ভ্রান্ত পথেও প্রধাবিত হয় ; অবাস্তব আদর্শের মোহ তখন তাহাদের অকল্যাণের পথেই টানিয়া লইয়া যায় ! কাজেই বাস্তব জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে বাস্তব আদর্শেরও প্রয়োজন—এবং বাস্তব মহাপুরুষের আশ্রয় নেওয়াও প্রয়োজন। এই উভয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, তবে মানুষের জীবন ঠিক মনুষ্যত্বের দুর্লভ রত্নে গড়িয়া উঠে।

অন্তর হইতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস কমিয়া গেলে সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করিবার আসুরিক গুণ সহজেই উৎপন্ন হয়। তাহাতে আর কাহারও ক্ষতি হয় না ; নিজের জীবনই দৈন্যে, হাহাকারে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এই জ্বালা সহ্য করাকেই যাহারা গৌরব মনে করে, তাহাদের মত দুর্ভাগা আর কেহই নাই ! তাহাদের যথেষ্ট শক্তি আছে মানিতে হইবে, আত্ম-প্রত্যয়ও তাহাদের যথেষ্ট ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু অজ্ঞান দ্বারা, মোহ দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কাজেই আত্ম-প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা সম্পাদন করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। শক্তি থাকিলেই কেবল হয় না, শক্তিকে আবার সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি নিয়োজিত করিতে হয়, তাহা না হইলে আসুরিক শক্তি নিয়া অধঃপতনের দিকে যাওয়াটাই কি শক্তির সার্থকতা ? কতজনের জীবন যে শুধু অলীক আদর্শের উন্মাদনায় পণ্ড হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই ! গীতার কথাই ঠিক—"সহস্রের মাঝে হয়ত কাহারও প্রাণে ভগবান্‌লাভের আকুলতা আসে, আবার তাহাদের মাঝেও তত্ত্বতঃ হয়ত অতি অল্প লোকেই ভগবান্‌কে জানিতে সক্ষম হয়।"

নিজের মাঝে মহত্ত্ব না থাকিলে, শুধু যুক্তি-বিচার লইয়া মহাপুরুষ নির্ব্বাচন করা যায় না। প্রাণে প্রাণেই আধ্যাত্মিক তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া চলে, বাহির হইতে তাহার কোন কারণ খুঁজিলে, কারণ পাওয়া যায় না। খাঁটী আত্ম-প্রত্যয়ী যাহারা, তাহারা অপরের মহত্ত্বকে আগেই পরিমাপ করিবার দরুণ ব্যস্ত হয় না। নিজের মাঝে মহত্ত্ব আছে বলিয়াই অপরকে অবিশ্বাস করিতে তাহারা ব্যথা পায়, দুঃখ অনুভব করে ; অপরের মাঝে মহত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলে, নিজের মাঝেই কোথায়ও দৈন্য আছে বলিয়া দুঃখিত হয়। বাস্তবিকই মহান্ বলিলে ইহাদিগকেই বলা উচিত।

আত্ম-প্রত্যয়ীর প্রাণে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি ক্ষমতা রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে—প্রাণের অভীষ্ট দেবতাকে প্রাণ দিয়া বাস্তব করিয়া তোলা—আত্ম-প্রত্যয়ীর পক্ষে অসম্ভব নয় ! কাজেই দোষ ধরিবার, দোষ দিবার বাতিকটা তাহাদের নাই বলিলেই চলে।

কথিত আছে, অদ্বৈতমহাপ্রভুর আকুল-আহ্বানেই নাকি মহাপ্রভু অবতরণ করিয়াছিলেন। কাজেই দেখিতে পাই, যথার্থ আকুলতার অসাধারণ শক্তি রহিয়াছে ! যাহাকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিব, তাহার ভিতর যদি বিশ্বাসের দৈবী-সম্পদই উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্বাসের মাঝে কোথায়ও না কোথায়ও গলদ রহিয়াছে। বাস্তবিকই প্রাণ দিয়া যাহাকে চাওয়া যায়, সেই প্রাণকে অধিষ্ঠান করিয়াই তিনি মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠেন।

এক লক্ষ্যে, এক আশ্রয়ে মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারা দুর্ব্বলের কাজ নয়। আত্ম-প্রত্যয় বিহীন যাহারা, তাহারা মনে করে, স্থান পরিবর্ত্তন, আদর্শ পরিবর্ত্তন করিলেই বুঝি আসল জিনিষ মিলিয়া যাইবে ; কিন্তু তাহারা একটুও ভাবিয়া দেখে না যে, দুর্ব্বলতাই তাহাদের চঞ্চল করিয়া, অস্থির করিয়া তুলিবার কারণ।

ভণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে, অসাধুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে কে বলে ? বিচার-শক্তি সর্ব্বত্রই প্রয়োজন ; কিন্তু জগতের কোথায়ও কি সাধুব্যক্তি নাই, কিম্বা তোমার খাঁটী আত্ম-প্রত্যয়ের কি কোন মূল্য নাই ? তোমার প্রাণ যাঁহাকে

চায়, সেই প্রাণই যে তাঁহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে! তোমার শুভ কামনা কোথায়ও না কোথায়ও বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেই। তাহার সঙ্গে কি কোন দিন তোমার সাক্ষাৎ হইবে না? যদি না হয়, তাহা হইলে কল্পনা আর বাস্তবে পার্থক্য কি রহিল? তোমার কাছে তো সেই বাস্তবও কল্পনার মতই অবাস্তব। কাজেই তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নিজের প্রত্যয়ে কোথায়ও গলদ রহিয়াছে কিনা!

প্রাণের ঠাকুর না পাইলে, কাহারও কাছে মাথা নত করিব না, এই পণ যাহার ভিতর রহিয়াছে—সে তো ভাগ্যবান্। সে যে আপন প্রত্যয়ে অচল অটল, প্রাণপণে বিশ্বাস করিয়াছে বলিয়াই সে জানে—প্রাণের ঠাকুর তাহাকে ধরা না দিয়া থাকিতেই পারিবেন না। দৃঢ়প্রত্যয়ের কাছে দেশ-কালের দূরত্বে কিছুই আসে যায় না। বরঞ্চ আত্ম-প্রত্যয়ী দীর্ঘকাল ধরিয়া নীরব সাধনা করিয়াই তাহার ইষ্ট-দেবকে লাভ করিতে বাঞ্ছা করে, কেননা সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যে চিত্ত ক্রমশঃই বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে! ভগবৎ-মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই যে মার্জ্জিত মন-বুদ্ধি দেহের প্রয়োজন হয়।

মোটকথা, যাহারা যথার্থই আত্ম-প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে, তাহারা ইষ্টকে এত সহজে, যেখানে-সেখানে বিশ্বাস না করিলেও সাধনা করিয়াই ইষ্ট সাক্ষাৎলাভ করে! তাহাদের সাধনার জোর, মনের-প্রাণের আবেগ আরও প্রচণ্ড! নিঃশব্দে জীবন পাত করিয়া যাইতে, বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না তাহারা! গুরুর মহত্ত্ব নাই থাকুক, কিম্বা যথার্থ গুরু নাই পাওয়া যাক্, এই সব আত্ম-প্রত্যয়ীর মহত্ত্বেও তো শক্তিসম্পন্ন গুরুর আবির্ভাব হইতে পারে—ইহা তো বেশ স্পষ্টরূপেই আশা করা যাইতে পারে! কাজেই আসল কথা হইল অন্তরের খাঁটী ব্যাকুলতা এবং সাধন-পিপাসা নিয়া। এই দুইটীর ওপরই সব নির্ভর করে!

প্রাণের খোরাক যাঁহার কাছ থেকে পাই, তিনি পণ্ডিত না হইলেও পূজনীয়—শ্রদ্ধার্হ! অনেক বড় বড় লোকের জীবনে তাঁহাদের অন্তঃপুরচারিণী মায়ের প্রভাব বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে দেখিতে পাই। প্রাণকে ঠাণ্ডা করিবার যে গুণ, তাহা সকল গুণের চেয়ে সেরা! একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা মা আমাদের চির-ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। কাজেই ভালবাসায়, পাণ্ডিত্যে যে কোন প্রকারেই হউক —প্রাণ-সঞ্চরণ-প্রণালীই হইল শ্রেষ্ঠ প্রণালী! এই ভালবাসা দ্বারা, প্রাণ-সঞ্চার দ্বারাই মানুষ মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে!

কাজেই মহতের আশ্রয় লইয়া জীবন গঠন করাই হইল জীবন-গঠনের শ্রেষ্ঠ এবং সুদৃঢ় উপায়। মানুষের সংস্পর্শে, মানুষের আদর্শে আমরা বেশী উদ্বুদ্ধ হই—পুথির কথায় বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, কিন্তু হৃদয়ের হাহাকার তাহাতেই মিটে না। হৃদয়কে প্রশান্ত করিতে হইলে চাই প্রাণের পরশ—আর সেই পরশ মানুষ—মানুষের কাছ থেকেই পায়।

সমর্পণের কথা বলিলেই আত্ম-সম্মানে যেন একটু আঘাত লাগে। কিন্তু আসলে তো সমর্পণে মানুষের আত্ম-সম্মানের একটুকুও ক্ষতি করে না। বরঞ্চ প্রাণ-সঞ্চার দ্বারা, চেতনার দীপ্তি আরও বেশী করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে! মহতের সংস্পর্শে অন্তর্নিহিত সুপ্ত মহত্ত্বেরই উদ্বোধন হয়। এই ভাবে বিবেকানন্দ—রামকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়া নিজের জীবনের মহত্ত্বই আর বেশী স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই আশ্রিত হইয়া থাকিলে —জীবন তো পঙ্গু হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই!

ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিবার কথা কেহই বলে না, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলেও মহৎ জীবনের প্রভাব কম কার্য্যকরী হয় না। মানুষের মত মানুষের কাছে গেলেই, আমাদেরও অন্তর্নিহিত

মানুষ পূর্ণ-চেতনা লইয়া জাগ্রত হইয়া উঠেন! গুরু সেবাতে আত্মোদ্বোধনই হয়—যথার্থ সেবাতে মানুষ কোনরূপ ভেস্কীতে পড়ে না। পরিপূর্ণ বিকাশের আবার তেমনি আশ্রয়স্থলেরও প্রয়োজন হয়। মানুষ হওয়া সহজ কথা নয়, তিল তিল সাধনা করিয়াই মানুষ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হয়।

নিজের অন্ধ আবেগ নিয়া অনেক সময় পথের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই আবেগকেও যথোচিত পথে পরিচালিত করিবার দরুণ মহতের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। শক্তি থাকিলেও, আমরা অনেক সময় বিপথেই ধাবিত হই, কাজেই শক্তির যথাযথ ব্যবহারের দরুণ শিক্ষা, সাধনা এবং সংযমের খুবই প্রয়োজন। নিদারুণ অহঙ্কার আছে বলিয়াই সঁপিয়া দেওয়ার মাঝে স্বভাবতঃই একটা অমর্য্যাদা অনুভব করি। কিন্তু সমর্পণই যে মানুষ হইবার—মনুষ্যত্ব লাভ করিবার একমাত্র পথ।

সমর্পণেরও সাধনা রহিয়াছে—সেই সাধনা আর কিছুই নয়, নিজের অহঙ্কারকে চূর্ণ করা, নিজের জানার মোহকে অগ্রাহ্য করা। এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, তবেই আসিয়া ভগবান বুক জুড়িয়া বসেন। নিজকে রিক্ত করা মুখের কথা নয়। কত সংগ্রাম, কত দ্বন্দ্ব পার হইয়া যাইতে পারিলে, তবেই সমর্পণ সিদ্ধ হওয়া যায়। অহঙ্কারী জীবের শুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থান, দুষ্কর সাধন-সাপেক্ষ!

ছোট চারা-গাছই একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। বৃদ্ধিরও একটা ক্রমপরিণতি রহিয়াছে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"ছোট চারা গাছকে প্রথম প্রথম বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, তারপর বড় হইয়া গেলে, শক্ত হইয়া গেলে, আর বেড়া না থাকিলেও কিছু আসে যায় না।" মানুষের বেলাতেও এই কথাটা খাটে। জীবনের প্রথমে, অর্থাৎ যৌবন কালে, মহৎ জীবনের আশ্রিত হইয়া থাকা খুবই প্রয়োজন! শক্তির উন্মাদনায় মানুষ পথভ্রষ্টও হইয়া যায়! কাজেই শক্তির তরঙ্গকে প্রশান্ত রাখিতে হইলে, মহৎ-প্রভাবের খুবই প্রয়োজন! তারপর যোগ্যতা আসিয়া গেলে, কেহই কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—কোন পক্ষেরই বিক্ষোভ কিম্বা সন্তাপ থাকে না তাহাতে!

অবলম্বনবিহীন, আশ্রয়বিহীন হইয়া থাকিতে হইলেও বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, আর সেই শক্তি ক্রমশঃই আয়ত্ত হয়! প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল—গুরুগৃহ। শিক্ষার মন্দিরে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন। গুরু গৃহে—আচার্য্যকেই কিম্বা গুরুকেই ব্রহ্মভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ রূপে পাওয়া যাইত, আর গায়ত্রিস্বরূপিণী গুরুপত্নীই হইতেন মা! কাজেই আধ্যাত্মিক পিতা মাতার আশ্রয়ে আবার দিব্যজন্ম লাভ হইত। সেই আদর্শ গুরুগৃহের—আদর্শ আচার্য্য এবং আচার্য্য-পত্নীর প্রভাবেই শিষ্যও সহজেই ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারিত! কাজেই আশ্রয়ে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশেরই সহায়তা করে—তাহাতে জীবন পণ্ড হয় না!

নিছক আত্ম-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইলেও, প্রথমে মহৎ- জীবনের স্নিগ্ধ পবিত্র অমায়িক স্নেহ লাভ করিতে হয়। আশ্রয় না পাইলে শূন্যকে অবলম্বন করিয়া কোন কিছুরই বিকাশ হয় না। জীবন-গঠনের পক্ষে গুরুগৃহের আদর্শই হইল সব চেয়ে হিতকর এবং কল্যাণময়। তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত এই কথাই আসিয়া দাঁড়ায় যে, মানুষ হইতে হইলে প্রকৃত মানুষের সংস্পর্শ, মানুষের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন

উপায় নাই। স্বাধীনতালাভের মূল উদ্দেশ্য যে আত্মানুভব, তাহা গুরুর আশ্রয় নিয়া সংযম তপস্যার পর স্বাভাবিকই লাভ হয়।

চেতন মানুষের বাণীতে, আচরণে, আদেশে, উপদেশে আমাদের চিত্ত যতখানি উদ্বুদ্ধ হয়, অন্য কিছুতেই আর তেমন হয় না। কাজেই মানুষের আশ্রয়ে, মানুষের সংস্পর্শেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায়। যৌবনের একটী পরম দান হইতেছে আত্ম-প্রত্যয়। যুবক ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারে—জাগতিক প্রগতি যুবকেরই হাতে। কিন্তু এই সুদৃঢ় আত্ম প্রত্যয়ের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায় ভাবুকতার উন্মাদনায়। যৌবনে এই উন্মাদনা আসা স্বাভাবিক, কিন্তু গুরুর মৌন সাধনা শিষ্যের মনের আবিলতাময় কামনা উত্তেজনাকে প্রশান্ত অনুভবে রূপান্তরিত করে। আশ্রয় নিয়া থাকার পরম সার্থকতা এই সময়েই বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই ভাবে কামনা বাসনা যখন সংযত হয়, রূপান্তরিত হয়, তখনই মানুষ আসল পথের সন্ধান পায়—যাহার দরুণ তাহার প্রাণও হাহাকার করিতেছে। কিন্তু চালকের অভাবে, উপদেষ্টার অভাবে, অনেকের জীবনই প্রলোভনে প্রমত্ত হইয়া উঠে—তাহারা উন্মাদনা লইয়াই ছুটে বটে, কিন্তু জীবনের আসল তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। দ্বন্দ্বের সময়, সংগ্রামের সময়ই—উপদেষ্টার, আশ্রয়দাতার প্রয়োজন হয়। অর্জ্জুনের মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব সকল সাধকেরই আসে—সংশয়ে দ্বন্দ্বে তখন চলিবার পথও অস্পষ্ট হইয়া উঠে, সেই দুর্দ্দিনের দরুণই, সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার দরুণই আশ্রয় নেওয়া। দ্বন্দ্বাতীত যাহারা, তাহারাই দ্রষ্টা—গুরু, কাজেই দ্বন্দ্বের ভিতর হইতে কি করিয়া মুক্ত হওয়া যায়, তাহার সঙ্কেত একমাত্র তাঁহারাই বলিয়া দিতে পারেন। আশ্রয় নেওয়া মানে—মুক্ত হইবার সঙ্কেত জানিয়া লওয়া। ইহাতে কি কাহারও আপত্তি আছে? না আত্ম-সম্মান ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে?

—(*)—

ঋষির আদর্শ

—*—

"পূর্ণ উদ্যম, অটুট স্বাস্থ্য, আপ্রাণ খাটবার ক্ষমতা নিয়ে যেন একশ বছর বেঁচে থাকি।" বেঁচে থাকবার প্রার্থনাই যদি করতে হয়, তাহলে যেন একশ বছরের কম কিছুতেই না হয়। আর সে একশ বছর কুঁড়েমি করে কাটিয়ে দেওয়া নয়—পূর্ণ উদ্যম, পূর্ণ কর্ম্ম-শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকা। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রার্থনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটী দিয়েই ঋষিদের মানসিক বল এবং স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষির বাণী বীর-বাণীই বটে। প্রার্থনার ঐকান্তিকতা নির্ভীকতা দেখে প্রাণ উল্লসিত হয়ে ওঠে! সেই তেজস্বী ঋষিদেরই বংশধর আমরা, কিন্তু একশ বছর বেঁচে থাকবার কথা যেন আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা মাত্র। চল্লিশ পার হতে না হতেই তো জীবনের সমস্ত সাধ মিটে যায়। তখন মরণের দরুণ তৈরী হতে হয়। বাস্তবিকই কি দুর্ব্বলতা কি অভিশাপেই না আমাদের অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত, সর্ব্বত্রই কেবল ভয় আর ত্রাস!

কর্ম্মক্ষম হয়ে একশ বছর বেঁচে থাকা কি গৌরবের বিষয়। বুকভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি মানুষ এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবার সাধ করে! আজকাল সংসারের বিচিত্র জঞ্জালের দরুণ গৃহস্থ প্রার্থনা করে, "ভগবান আর বেঁচে থাকবার সাধ নাই—খুব সংসার ভোগ করেছি, এখন মরলেই বাঁচি!" এই কথাগুলি শুনলে যেন দুর্ব্বলতা সংক্রমিত হয়। আর যখন স্বাস্থ্যবান্ কর্ম্মীর মুখ থেকে শুনি, "না, এত সহজেই যমকে আসতে দেব না, অন্ততঃ আশী তো পার হোক।" কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রাণ নেচে ওঠে।

সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার সাধ হয় কার?—যার নাকি সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছু মাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই। কিন্তু চল্লিশ পার হতে না হতেই যে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হতে হয়—এতে কি বাস্তবিকই মনের সাধ মিটে?

কি সুন্দর প্রার্থনা, একশ বছর বেঁচে থাকা, তাও আবার পূর্ণ কর্ম্মক্ষমতা নিয়ে। সেই কর্ম্মের মাঝে আবার অভিমান থাকবে না—কেননা সবই যে তাঁর দান—সবই যে তাঁর দ্বারা 'বাস্য'—আচ্ছাদিত।

উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যার কথা পাই। কিন্তু সেই যাজ্ঞবল্ক্য কখন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছিলেন?—সংসারের সব অভাব অভিযোগ মিটিয়ে তারপর! দুটী পত্নী নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে ঘর করতে হয়েছিল;—অসময়ে, উপেক্ষা করে, কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখিয়ে তিনি সংসার ছেড়ে পালান নি। মোট কথা, ঋষিদের মাঝে দুর্ব্বলতা জিনিষটা ছিল না, তাঁরা যা করেছেন, কোন দিকে বিক্ষোভ উৎপন্ন হতে না দিয়ে।

শক্তির অভাব হয়ে পড়লেই খুব তাড়াতাড়ি ভব-পাড়ি দিতে লেগে যেতে হয়, তা না হলে শেষে যে শক্তি সামর্থ্য কিছুই থাকবে না। এই অসময়ে মুক্তি অন্বেষণের দরুণ বাহির হওয়াটা ঠিক ঠিক বলিষ্ঠ আত্মার প্রেরণা নয়, এ হল দুর্ব্বল মনের লক্ষণ! মুক্তি-লাভে প্রয়াসী যারা, তাদের সবল হওয়া চাই প্রথমে, তারপর কর্ত্তব্য অবহেলা করাও তাদের স্বভাব নয়! হঠাৎ নানা কারণ ঘটিয়ে মনটাকে বিতৃষ্ণ বৈরাগী করে তুলতে হয় না তাঁদের। তাঁরা স্থির ধীর ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তারপর মুক্তির আস্বাদন করেন।

উপনিষদে ঋষিদের মাঝে যে আদর্শ দেখতে পাই, তার মত পরিপূর্ণ আদর্শ আর নাই। কোথায়ও তাঁদের ব্যস্ততা নাই, কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলা নাই। স্বাভাবিক পরিণতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে কি সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনই না তাঁরা কাটিয়ে গিয়েছেন। আমাদেরও কি সেই আদর্শ হওয়া প্রয়োজন নয়? আমরা সব দিকে দুর্ব্বল, অক্ষম তাই নূতন করে আমাদের দরুণ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু তা বলে অতীতের মহান্ আদর্শের কথা মনে করে, নিজেদের দুর্ব্বলতা মোচনের দরুণ যত্নবান্ হওয়া কি প্রয়োজন নয়? ঋষিরাই যদি আমাদের আদর্শ হন, তাহলে তাদের জীবন যাপন প্রণালীর ইতিহাস, সাধনার ইতিহাস প্রার্থনার সব আমাদেরই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে। তবে না আবার আমরা ঋষিদের মত সুস্থ সবল দীর্ঘ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারব!

দীর্ঘ জীবন নিয়ে ভগবানের লীলা আস্বাদন করে যেতে পারলে আর চাই কি! অসময়ে সংসার থেকে বিদায় নেওয়াও একটা অভিশাপ—বুঝতে হবে, কোথায়ও না কোথায়ও দুর্ব্বলতা রয়েছে। অধিকাংশেই এই দুর্ব্বলতাকে ঢাকবার দরুণ বৈরাগ্যের নামে সংসার থেকে পালিয়ে যাবার ফিকির অনুসন্ধান করে। কিন্তু তা হলে কি হবে, দুর্ব্বলের কোথায়ও স্থান নাই। এই উপনিষদেই

আছে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন আত্মাকে লাভ করতে পারে না।

মরবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়া কত ভাগ্যের কথা। ঋষি এই ভাগ্যলাভের দরুণই প্রার্থনা করছেন। যেন কাজ করে করে একশ বছর বেঁচে থাকতে পারি। কি সুন্দর স্বাবলম্বনের আদর্শ! প্রত্যেকেই যদি এমনিভাবে নিজের উপর নির্ভর করে চলতে পারে, তাহলে আর দুঃখ-দৈন্যের লেশও যে থাকবে না। আর বাস্তবিকই ঋষিযুগে এই জন্যই অনাবিল আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলত। তাঁদের প্রাণখোলা ভাবে সকলকেই আকর্ষণ করে! ঋষিযুগের আদর্শ এখনো আমাদের কত দিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। তাঁদের আন্তরিকতা আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীর উন্মাদনা এখনো আমাদের প্রাণে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করে।

শুধু কাজে মনকে অনেক সময় নীরস করে তুলে, তাতে দেহ অল্প সময়ের মাঝেই অবসন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঋষির আদর্শ ঐ জায়গাতেও কি সুন্দর! কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের লীলা অনুভব করা চাই, সবই যে ঈশ্বর দ্বারাই পরিব্যাপ্ত এই গভীর অনুভূতির দরুণ প্রাণকে ব্যাকুল, উন্মুখী করে রাখতে হবে।" এই অনুভবে সিদ্ধ হয়ে যেতে পারলে, তখন কর্ম্মের ভিতর দিয়েই যে পরমানন্দ লাভ করা যায়। বরঞ্চ কর্ম্ম থাকায় বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি তাতেই ব্যাপৃত থাকে, আর মনটীকে নিয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় বেশ সুন্দর করে তন্ময় করে রাখা যায়।

মনে জোর থাকলে, ভিতরটা বেশ স্বচ্ছ পবিত্র থাকলে কর্ম্মে মানুষকে কখনো আবদ্ধ করে না। নির্লিপ্ত হয়েই কর্ম্ম করতে হয়, এই নির্লিপ্ত হওয়া মানে, কর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকা নয়, অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে এরূপভাবে অনাসক্ত করতে হবে যে, কর্ম্ম করেও কর্ম্মের গ্লানিতে একটুও স্পর্শ করবে না। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের তাৎপর্য্যও এই।

আসল কথা হল, দেহে মনে-প্রাণে বল থাকা চাই। বল থাকলে মানুষের মুখ থেকে কখনো অবসাদগ্রস্ত বাণী বের হয় না। আশা, উদ্যম সব লোপ পেয়ে যায়—এই দুর্ব্বলতার দরুণ! ঋষিদের প্রার্থনার মাঝে—প্রাণশক্তির প্রচুর উপাদান রয়েছে। তাঁরা বৈরাগী ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন লীলাবাদী। সাধন প্রভাবে প্রাকৃত জগৎকেই অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখতেন তাঁরা, তাই নৈসর্গিক সুখ-দুঃখে ভ্রূক্ষেপ না করেই দিব্য পারমার্থিক আনন্দেই তাঁরা দিন অতিবাহিত করে গেছেন। ঋষি-জীবনের আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ—পূর্ণ আদর্শ!

সাহিত্যই হল জাতীয় মনোভাবের পরিচয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়েই জাতীয় সবলতা—দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, কেননা হাজার হলেও মনোভাবকে গোপন করে রাখা যায় না। বৈদিকযুগের সাহিত্যই হল—ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদে—ঋষিদের যে সব প্রার্থনা রয়েছে, তা পড়লে ঋষিদের কিরূপ সবল সতেজতা ছিল তা বুঝা যায়। প্রার্থনা যেন সমস্ত প্রাণ-শক্তি ঢেলে দিয়ে করা হয়েছে—কোথায়ও মিথ্যা-প্রবঞ্চনা নেই তার মাঝে!

ধর্ম্ম জিনিষটা যখন সকলের মাঝেই বেশ স্বচ্ছন্দে বিরাজ করে, তখন আর বিবিক্ত সাধনার দরুণ আলাদা হয়ে গিরি-গুহায় আশ্রয় নিতে হয় না। কিন্তু ধর্ম্মের ভাব যখন ক্রমশঃই কমে আসে, তখনই গোপনে বিবিক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের দরুণ সচেষ্ট হতে হয়। এতে ব্যক্তিগতভাবে কারও চরম উন্নতি হয় বটে, কিন্তু সমষ্টির ভিতর সমভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখা দেয় না। ধর্ম্ম সকলের মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে না পড়লে, সকলের

প্রাণেই আধ্যাত্মিক বল অনুভব হয় না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি না পেলে, মানুষ কখনো দেহে মনে-প্রাণে সবল হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

দুর্ব্বলতা বেড়ে পড়্‌লে তখন ফাঁকি দেওয়াটাই হয়ে যায় স্বভাব; আর ফাঁকি দেওয়াটা যখন স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, তখন এতে যে মানুষের কতখানি অবনতি হয়, এটা আর মনেই জাগে না। কর্ম্ম ত্যাগ করে সাময়িক কোন সমস্যার সমাধানে ব্যাঘাত হলে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু কর্ম্মত্যাগ না করলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি পাওয়া যায় না, জ্ঞান-কর্ম্মে অহি নকুল সম্পর্ক—এই যদি বদ্ধমূল-ধারণা হয়ে যায়, তাহলে বুঝ্‌তে হবে, আদর্শের মাঝে দুর্ব্বলতা এসে প্রবেশ করেছে। স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত যাঁর কোন কর্ত্তব্য নাই, তিনিও কর্ম্ম করে যাচ্ছেন। আর আমরা চোখ মেলে দেখি সম্মুখে কত কর্ত্তব্য রয়েছে—তবু জ্ঞানের বুলি আওড়িয়ে প্রচণ্ড কর্ম্ম-বাসনাকে অবরুদ্ধ করে রাখি। কিন্তু তাহলে কি হবে, দু'দিন পর সব মোহ ছুটে যায়—আসল স্বরূপ আপনি প্রকাশিত হয়ে পড়ে!

কর্ম্ম করতে করতে, অর্থাৎ করে ভিতর দিয়েই যখন কর্ম্ম-বাসনা নিঃশেষ হয়ে আসে, তখন স্বাভাবিকই মন মুক্তির আস্বাদন লাভ করে। চিরকালই যে চোখ-ঢাকা বলদের মত কর্ম্মের ঘানিতে লেগেই থাকতে হবে, তারও কোন মানে নাই। কিন্তু ঘানি ঠেল্‌বার শক্তি যতদিন থাকবে, ততদিন ঘানি ঠেলতেই হবে। তবে কিনা কর্ম্ম করারও দুটো ধারা রয়েছে। এক হল দায়ে পড়ে করা—মন-মরা হয়ে করা; আর এক হল আনন্দোৎফুল্লিত হয়ে, কর্ম্ম না করে থাকতে পারা যায় না বলে, কর্ম্ম করেই প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায় বলে—কর্ম্ম করা। এই দুটো পন্থায় রাত-দিন পার্থক্য।

আসল কথা হল, প্রাণ মরে এলে সব দিকেই সমস্যা উপস্থিত হয়। তখন কেবল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জাগে। কর্ম্ম করলে মুক্তি পাওয়া যাবে, না কর্ম্ম ছাড়লে মুক্তি মিলবে—এই নিয়েই তর্কাতর্কি আরম্ভ হয়। অথচ প্রাণবন্ত জাতির কর্ম্মোদ্যম কিন্তু স্বাভাবিক, তারা অনায়াসে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে যায়। এ যেন তাদের মোটেই গায়ে লাগে না। কিন্তু যাদের প্রাণশক্তি স্তিমিত, তারা আগেই কর্ম্মের বোঝাটাকে বিশেষ করে স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌তে চেষ্টা করে, কিংবা আপনি তাদের বিভীষিকা জাগে! কর্ম্মের ভয়েই—কর্ম্মোদ্যম তাদের লোপ পায়। প্রাণবান কখনো আলস্য জড়তায় আড়ষ্ট হয়ে থাকতে পারে না, প্রাণবানের লক্ষণ প্রাণের পরিচয়ে। কর্ম্ম ছাড়বে কি, অপরের কর্ম্মের বোঝাও প্রাণবানই বয়ে মরে। এই বহনে তাদের প্রাণে আনন্দ আসে, তারা অপরকে মুক্ত করেই মুক্তি অনুভব করে। মুক্তির আসল তাৎপর্য্যই এই। নিজে মুক্ত হতে গিয়ে—অপরের বন্ধনে নিজকে বদ্ধ করেও তাদের অসীম আনন্দ। আনন্দোপভোগের আসল কারণই হল মন। এই মনকে আয়ত্ত রাখতে পারলে সর্ব্বাবস্থায়ই আনন্দ লাভ করা যায়।

"একশ বছর বাঁচব এবং কাজ করেই বেঁচে থাকব"—এটা কামনা নয়। প্রাণবানের আনন্দাতিশয্যের বাণী মাত্র। মৃত্যুর কল্পনা তাদের আসে না—তারা জগৎময় প্রাণেরই অভিব্যক্তি—প্রাণেরই সঞ্চরণ দেখতে পায়।

কাজ না করে অলস হয়ে মানুষ যে থাকতেই পারে না। আনন্দ পেলে মানুষের কর্ম্মশক্তি আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। উপনিষদের ঋষি জগৎময় এক আনন্দেরই লীলা দেখছেন। সাধে ঋষিমুখ দিয়ে এই বাণী নির্গত হয়েছে "একশ বছর বাঁচব"—কেননা এইটুকু আয়ু না পেলে লীলাময়ের লীলা উপভোগ

করব। বেঁচে থাকবার সাধ হয় এই জন্যই। ভাগবত জীবন অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের কাছেও ঘেঁসতে পারে না।

ভাগবত জীবন ঋষি জীবনই সকলের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন। দেহ মন-প্রাণ বিশুদ্ধ হয়ে গেলেই ভাগবত জ্ঞান লাভ হয়। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে এই জগৎকেই নূতন ভাবে আস্বাদন করা যায়। তখন আর এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হয় না। কেননা এই জগতই যে অসীম আনন্দের সহায়ক হয়ে ওঠে তখন।

প্রাণকে বিকৃত না করলে, আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন না করলে একশ বছর পূর্ণ কর্ম্মোদ্যম নিয়ে বেঁচে থাকা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আমরণ সর্ব্বতো-ভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করবার চেয়ে আর গৌরবের বিষয় কি আছে?

শরণাগতি

দেশের আকাশে-বাতাসে আজ স্বাধীনতার বাত্যা বহিতে সুরু করিয়াছে, পরাধীনতার নিগড় বড় অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে,—স্বাধীনতা-লিপ্সুর প্রাণে প্রাণে একটা বিদ্যুন্ময় প্রেরণা ছুটিয়া চলিয়াছে। আর এ বন্ধন ভাল লাগে না, অন্ধের মত পরের অনুবর্ত্তনে মন আর উঠে না; চাই এখন উন্মুক্ত-উদার প্রাণের পরশ, চাই বন্ধনহারা মুক্তির আনন্দময় আস্বাদ! অধ্যাত্মক্ষেত্রেও আজ সেই অভিঘাতের প্রবল স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। বহু আবর্জ্জনা জমিয়াছে সত্য, তাহা দূর করিতে হইবে, ইহাও সত্য; কিন্তু উত্তেজনার মাথায় আবর্জ্জনার সঙ্গে সঙ্গে যে গৃহলক্ষ্মীকেও ঠেলিয়া ফেলা হইতেছে, তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। তাই আজ স্বাধীনতাকামী মুক্তি-কামী সাধক, স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের চির-প্রচলিত সহজ-সরল পন্থা শ্রীগুরুর সেবা ও তাঁহার অনুবর্ত্তনকে slave-mentality বলিয়া ঘোষণা করিতেও দ্বিধা অনুভব করিতেছে না। রোগ হইয়াছে জানি, রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছ জানি,—কিন্তু এই জ্বালা নিবারণের জন্য চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া আপন খেয়াল-খুসীতে বিভ্রান্তের মত ছুটিয়া বেড়াইলে কি ফল দর্শিবে? যাদের চিত্তে স্থৈর্য্যের লেশমাত্র নাই, প্রাণে ধৈর্য্য ধারণের এক কণা শক্তিও নাই, কেমন করিয়া যে তাহারা আত্মশক্তির বড়াই করে তাহাই শুধু ভাবি!

'সত্য'ই জীবনের লক্ষ্য। সেই সত্য লাভের দুইটী চিরন্তন পন্থা—এক কঠোর সন্ন্যাস যোগ, অপর ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা। প্রথমটীতে চাই বজ্র-দৃঢ় দেহ, অটুট সঙ্কল্প, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু প্রাণ, সূক্ষ্ম বিচারসমর্থ অগ্র্যাবুদ্ধি, আর চাই—"গুরু-বেদান্ত-বাক্যেষু বিশ্বাসঃ"—শাস্ত্রে যাহাকে বলে শ্রদ্ধা; দ্বিতীয়টীতে চাই শুধু—বুকভরা বিশ্বাস, আর প্রাণভরা ভক্তি!

যাহারা আত্মশক্তিতে সত্যলাভের প্রয়াসী, শ্রীগুরুর অনুবর্ত্তিতা দাসত্বের নিদর্শন বোধে স্বাধীন চেষ্টায় মুক্তি-অর্জ্জনে ব্যাকুল, তাদের বলি—একবার নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, নিজেদের যোগ্যতা কতটুকু আছে তাহা যাচাই করিয়া লইতে। শুধু দম্ভ করিয়া উড়ুপের সাহায্যে

সমুদ্র উত্তরণের নিষ্ফল প্রয়াসে কি ফল? ভাবিও না যে তোমাকে আমি সত্য পথ হইতে বিচলিত করিতেছি, তোমার স্বাধীনতালিপ্সু প্রাণকে চির-পরাধীনতার নিগড়ে বাঁধবার চেষ্টা করিতেছি। শুধু বুঝিয়া দেখিতে বলি, তোমার শক্তিসামর্থ্যানুযায়ী পন্থা নির্ব্বাচিত হইল কি না? পাছে অগ্রসর হইতে হইতে পথের দুর্গমতা দেখিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়—তাই ভাবি, একবার এ পথ আবার অন্য পথ, এই ভাবে চলিতে তো জীবনে কোন দিনই লক্ষ্যের সান্নিধ্য মিলিবে না। তাই আবার বলি—সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখ—তোমার আত্মানুমোদিত পথ কি যথার্থই সত্য?

কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতে. দ্বন্দ্বে সকলেরই চিত্তবিভ্রম ঘটে, কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনেরও চিত্তবিভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। যে মহান্ কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিয়ন্তার যন্ত্রস্বরূপে তাঁর দেহ ধারণ, যে সুমহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জ্জনে তাঁর আশৈশব প্রাণপাতী প্রয়াস, সেই কর্ম্মক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া তাঁহার চিত্ত মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তামসিকতা সাত্ত্বিকতার আবরণে আবৃত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে নানা দোষ প্রদর্শন করিতে লাগিল, ক্ষত্রধর্ম্ম যতিধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। অর্জ্জুনের এই সাময়িক মোহ দূর করিয়া—তাঁহাকে সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাধ্যায়ব্যাপী গীতামৃত বর্ষণ। কে জানে তোমারও এই পথ নির্ব্বাচন সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত কি না! আর যদি প্রকৃতই তোমার কঠোর সাধনোপযোগী দৈবী সম্পদ্‌রাজি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে হে সত্যকাম! ঝাঁপাইয়া পড় সাধন সমরে—বুকে অনির্ব্বাণ জ্বালা লইয়া, অদম্য উৎসাহ লইয়া, বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে বল—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।' জগৎ তোমার প্রচেষ্টায় স্তম্ভিত হইবে, তোমার সিদ্ধিতে তোমাকে মাথায় তুলিয়া নাচিবে। কিন্তু সাবধান! যেন বিশ্বাস হারাইও না, শ্রদ্ধা হারাইও না। শ্রীগুরুর দক্ষিণ মুখের পানে তাকাইয়া তাঁর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া তবে আত্মশক্তির অনুবর্ত্তন কর। তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে পথের বাধা, বিলীন হইয়া যাইবে; অচিরেই লক্ষ্য-বস্তু পরিলক্ষিত হইবে। জানিয়া রাখিও—সিদ্ধির মূল তোমার প্রচেষ্টা নয়, তাঁর কৃপা; তোমার সাধনা উপলক্ষ্য মাত্র।

কে বলে কঠোর সন্ন্যাসযোগে কৃপার প্রয়োজন নাই? উপনিষদে আছে "যমেবৈষ বৃণুতে।" তবে অহমিকায় অন্ধ হইয়া মূলে ভুল করিতেছ কেন? যে পথই অবলম্বন কর, সর্ব্বত্রই চাই শ্রীগুরুর শুভ আশীর্ব্বাদ, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি!

শুধু ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদাহরণ প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে পরিস্ফুট। উদ্দালক গুরুর আলি বাঁধিয়া, উপমন্যু গুরুপদে অচলা ভক্তি রাখিয়া, বেদ গুরু শুশ্রূষা করিয়া, সত্যকাম শুধু গুরুর গরু চরাইয়া, কেমন করিয়া শ্রীগুরুর প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্ব্বক অভীষ্ট বস্তুলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শুধু গুরুসেবা অবলম্বনে বিদ্যাবুদ্ধিহীন গিরির উপর আচার্য্য শঙ্করের স্নেহ কিভাবে বর্ষিত হইল, কেমন করিয়া গিরি তোটকাচার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইলেন, কেমন করিয়া আচার্য্য তাহাকে সব ঢালিয়া দিলেন, সে কাহিনীও আজ সুধীসমাজে অপরিজ্ঞাত নহে। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিবে শুধু গুরুকৃপায় সিদ্ধি ধরায় কেমন করিয়া নামিয়া আসিয়াছে। তবুও কি কৃপাবাদের কোন ভিত্তি নাই?

সাধক জীবনের পথপ্রদর্শক সনাতন শাস্ত্র জলধিমথিত সুধা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই দুইটী পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। উপদেশচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! যিনি আমারই

উদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি মৎপরায়ণ, আমার ভক্ত, আসক্তি শূন্য এবং সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে সংশয় উদয় হইল—কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ? কঠোর সন্ন্যাসযোগ অথবা সহজ আত্ম-সমর্পণ যোগ? তাই তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন- "হে গুরো! এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, আর যাহারা তাহা না করিয়া নিরাকার অক্ষর ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ?" তদুত্তরে শ্রীভগবান বলিলেন- "যাহারা আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন, আমি বলি—তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী, তাহারাই আমার প্রিয়তম। তবে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বভূতহিতসাধনে রত যে সকল সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, কূটস্থ, অচল, নিত্য অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারাও অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মেআসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের অভীষ্টলাভে অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। আর যাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে আমার ধ্যান করেন, উপাসনা করেন, মদর্পিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরেই আমি মৃত্যুময় সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি। অতএব আমাতেই আত্ম-সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে না পারে, তবে অভ্যাসযোগে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। আর যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও 'মৎ কর্ম্মপরামো ভব'—আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম কর। শুধু আমার প্রীতি সাধনার্থ কর্ম্ম করিয়া গেলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।"

এই যে গুরু শিষ্যের সংবাদ, ইহা শুধু একই স্থানে, একই কালে একই পাত্রে নিবদ্ধ নয়। (শিষ্য অর্জ্জুন প্রপন্নহৃদয়ে যেমন গুরু শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া আত্মসন্দেহ ভঞ্জনার্থ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন), শ্রীকৃষ্ণও গুরুরূপে অর্জ্জুনকে যে ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, যে ভাবে শিষ্যের সন্দেহ নিরাস করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া তাহাকে সত্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, আজিও গুরু সেইভাবেই তেমনি করিয়াই সকলকে সত্যপথে আহ্বান করিতেছেন,— সত্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার আকুল-আহ্বান শুনে কয় জন? কিন্তু আমরা তাঁহার ডাক শুনিয়াও শুনিতেছি না, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াও করিতেছি না। বিশ্বাস কর,—শুধু "মৎকর্ম্মপরমো ভব" তাহা-হইলেই তোমরা "নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।"

সত্যই কি তুমি সত্য পথের পথিক? বাস্তবিকই তুমি সত্য লাভ করিতে চাও? তবে স্থির বিশ্বাস, অটুট ধৈর্য্য, অপরিমিত শ্রদ্ধা পথের পাথেয়রূপে হৃদয়ে স্থাপন কর। শ্রদ্ধা বিশ্বাস না থাকিলে যে কোন দিনই অভীষ্ট বস্তু লাভে সমর্থ হইবে না তুমি! একবার বুকে হাত দিয়া দেখ, তোমার সহজ ধর্ম্ম কি? ক্ষণিক উত্তেজনার বশে সহজকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না যেন! অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

মোহবশতঃ তুমি যাহা করিবে না বলিয়া ভাবিতেছ, তাহা স্বভাবজাত কর্ম্মের বশে অবশের মত আপনিই করিবে। আজ শ্রীগুরুর কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া এই সহজ কর্ম্মকে সত্য লাভের পরিপন্থী বলিয়া মনে

করিতেছ! কিন্তু ইহা তোমার ক্ষণিক বিভ্রম মাত্র; অচিরেই এই ভ্রম কাটিয়া যাইবে, তোমার যাহা স্বভাব, সেই স্বভাবেরই স্ফূর্ত্তি হইবে।

মানুষ এত লম্ফ-ঝম্প করে কিসের শক্তিতে? মনে করে বুঝি তার শক্তির ইয়ত্তা নাই, সে যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে; কিন্তু জানে না যে সে আর কাহারও হাতের যন্ত্র পুত্তলিকা!

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি ভাবিও না তোমার কর্ত্তা তুমি স্বয়ং, তুমি যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বর প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ তাহাদের পরিচালিত করিতেছেন, জীবের স্বাতন্ত্র্য কোথায়?— অতএব যদি আত্মহিত চাও, যদি মঙ্গল চাও—তাহা হইলে

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাহারই অনুগ্রহে তুমি পরাশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া শ্রীগুরু প্রপন্ন শিষ্যকে শান্তির মুক্তির উপায়স্বরূপ শ্রীভগবানে শরণাগতির পথই নির্দ্দেশ করিলেন।—বলিলেন—এই তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর উপদেশ দিলাম, অতঃপর সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা বলিতেছি, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে যে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ইত্যাদির উপদেশ দিয়া আসিলাম, তাহা তোমার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনার্থ। কিন্তু উহা তোমার সহজ পথ নহে। তাই বলি সম্প্রতি সে সবের কথা ভুলিয়া গিয়া সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া—আমি গুরু—একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমার নির্দ্দেশে চল, অবিচারে আমার অনুসরণ কর আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব

ঈশ্বরে শরণাগতি গুহ্যতর, আর শ্রীগুরুতে আত্ম-সমর্পণ গুহ্যতম তত্ত্ব, ইহা পুরাণ পুরুষেরই অভিমত, তাঁহারই উক্তি। আজ গুরুও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ।"

যে পথ ধরিয়াই চল, সর্ব্বত্রই শরণাগতির প্রয়োজন। শরণাগত না হইয়া সত্য লাভের আশা বৃথা। যদি সত্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে, যদি পথ নির্ব্বাচন লইয়া মনের মাঝে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর শরণাপন্ন হও; কর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনের সুরে সুর মিশাইয়া ভক্তিকারুণ্য কণ্ঠে বল—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

হে গুরো! আমি পথ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না, মোহে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, অজ্ঞানে দৃষ্টি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তুমি আমায় সত্য পথের সন্ধান বলিয়া দাও। জীবনের লক্ষ্য শান্তি কি মুক্তি, তাহার পন্থা জ্ঞান কি ভক্তি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্ পথে গেলে আমি লক্ষ্যে উপনীত হইব—কোন্ পন্থা অবলম্বনে আমার শ্রেয়ঃলাভ হইবে, তাহা জানি না। হে গুরো! আমাকে সে সত্য পথের নির্দ্দেশ করিয়া

দাও, আমার স্বধর্ম্ম, সহজ ধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইয়া দাও। আমি তোমার শিষ্য, শাসনার্হ তুমি আমাকে শাসন কর ”

শ্রীগুরু নিশ্চয়ই একটা পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, কি ভাবে তোমার শ্রেয়ঃলাভ হইবে তাহার উপায় বলিয়া দিবেন, প্রণতশিরে তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁর নির্দ্দিষ্ট পন্থায়ই জীবন পরিচালিত কর। আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া, শাস্ত্রের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া জীবন পণ্ড করিও না। ইহারই নাম দিতেছ তোমরা স্বাধীনচেষ্টা। ইহা স্বাধীন চেষ্টা না উচ্ছৃঙ্খলতা?—কঠোর সন্ন্যাসযোগই অবলম্বন কর, আর সহজ নিষ্কাম কর্ম্মযোগই অবলম্বন কর, উভয়ত্রই শরণাগতির প্রয়োজন। শরণাগতিই পথের ও মতের সমন্বয়।

নির্ভরতা

ভিখারী দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে; গৃহস্থ তখন কাজে ব্যস্ত, তাই ভিক্ষা দিতে বিলম্ব হচ্ছে; তখন যদি ভিখারী রেগে গিয়ে বল্‌তে থাকে যে—"ভারী তো একমুঠো চা'ল দিবে, তার জন্য ছমাস দ্বারে দাঁড়িয়ে নবাবকে ডাক্‌তে হবে ! ইত্যাদি," তাহলে গৃহস্থ কি করে! যদি খুব সৎ গৃহস্থ হন, তবে হয়ত বল্‌বেন—"বেটা কি বক্‌বক্ করছে, —দে তো ওকে দুমুঠো চা'ল দিয়ে বিদায় করে!" আর গৃহস্থ যদি তেমন না হন. তবে হয়ত অমন আপ্যায়নের প্রতিদানে বেশ উত্তম-মধ্যম দুঘায়ের ব্যবস্থা করতে লাঠি নিয়ে ছুটে আসেন!

নির্ভরকারী 'আমি নির্ভর করেছি' বলে যদি গুরুকে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্ভরের ফলের জন্য দায়ী করে, তবে তিনি এখন বলবেন,—"আমি যখন তোমার ভার নিয়েছি বলছি, তোমার যদি আমার উপর নির্ভরই হয়ে থাকে, তবে আমার জন্য তোমাকে সারা-জীবন অপেক্ষা করতে হবে—আমি আমার সময়মত যা দেওয়ার দেব; এতে কোনও দাবীদাওয়া থাক্‌তে পারে না।"

নির্ভরের ফল তিলে তিলে এসে বর্ত্তাবে। আমি যা চাইছি, তা যদি ইনি দিতে পারেন বলে বিশ্বাস হয়, তবে তখন তা পাওয়ার জন্য আরও ব্যগ্রতা আস্‌বে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্বাসও আস্‌বে যে, যদি ইঁহার দয়া হয়, তবে তো নিশ্চয়ই পাব! আর নির্ভর করার সঙ্গে সঙ্গে যদি নির্ভরের স্থল যিনি, তিনি সে নির্ভর গ্রহণ করে ঈপ্সিত বস্তু দানের জন্য প্রতিশ্রুত হন, তবে নিশ্চিত একটা নিশ্চিন্ত ভাব আসাই স্বাভাবিক। অবশ্য পাওয়ার পথেই তখন গতি চল্‌ছে, কিন্তু তবু সে গতির সীমা যে বেশী দূর নয়, এই

ভরসায় হৃদয়কে স্নিগ্ধ করবে। গতি তখন যতই দ্রুত হোক, তাতে উদ্বেগের কারণ থাক্‌বে না।

অপরিচিত অথচ একান্ত বাঞ্ছিত স্থানে চলেছি, কিন্তু পথ চিনিনি, তাই একবার এদিকে, আবার সেদিকে ঘুরে ঘুরে চলেছি, মনে বিশেষ আশঙ্কা রয়েছে,—কি জানি, পাই কি না পাই, বা কখন পাই—ইত্যাদি। আর একজন চলেছে একজন পথপ্রদর্শক বা নির্ভরযোগ্য সাথী নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে। পাওয়ার ভরসা পেয়ে সে প্রাপ্যবস্তুর কল্পনা-জল্পনায় মেতে যেতে পারে, কিন্তু পথ না পাওয়ার দুর্ভাবনা তার নাই। সে টিকিট করেছে, গাড়ীতে চেপেছে, এখন গাড়ী নিরাপদে গিয়ে পৌঁছালেই সে যে পৌঁছে যাবে, মোটামুটী এই ভরসাই তখন থাকে। তার শুধু গাড়ীর আরোহীর নিয়ম-পালন ছাড়া কর্ত্তব্য থাকে না।

পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব আমাদের থাকে, কারণ অমনি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। কিন্তু নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে সে পাওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ যদি সে নির্ভর গৃহীত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেখানে পুনরায় সন্দেহ করলে নির্ভরের স্থল যিনি, তাঁহাকেই সন্দেহ করা হয়। সুতরাং পূর্ব্বে বিচারান্তে যদি একবার নির্ভর করাই হয়, তবে পুনরায় সে সংশয় পূর্ব্ব বিচারের ভ্রমই প্রমাণিত করে। সে জন্য দায়ী নির্ভরস্থলাভিষিক্ত নন, নির্ভর-কারীই সে জন্য দায়ী।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব অর্থে বুঝা বা না বুঝা। আত্মতত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত, ভগবান্ সর্ব্বত্র বিরাজিত, এসমস্ত কথা শুধু শাস্ত্রনিবদ্ধ বা ফাঁকা বুলিই নয়—উপযুক্ত সাধকের অনুভব দ্বারা তা যখন প্রমাণিত হয়, তখন আমাদের মত অনধিকারীর কাছে ফাঁকা বুলি হলেও আসল বস্তু ফাঁকা নয় কখনই। আমাদের কাছে অমন-ভাবে প্রতিভাত হওয়ার কারণ আমাদেরই অনুভবের অক্ষমতা। নতুবা সকলের পক্ষেই অনুভবের যোগ্য হত! কিন্তু তা তো হয় না! আমি যেখানে পাইনি বলে হা-হুতাশ করে অপরের মাঝে পর্য্যন্ত বিক্ষোভ তুলছি, সেখানে "পেয়েছি" বলবার মত লোকেরও যে অভাব নাই! আমি অন্ধ বলেই কি চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্ব নাই বলতে হবে?

কিন্তু এইটেই আমরা মান্‌তে চাই-না যে, আমি যেটুকু বুঝেছি, আমার পাশে থেকে আর কেউ তার চেয়েও বেশী বুঝ্‌তে পারে। আপন বুদ্ধির উপর সকলেরই এতখানি বিশ্বাস যে অন্যান্য নানা বিষয়ে মানুষ যতই আপনার দৈন্য প্রকাশ করুক না কেন, আমার বুদ্ধি নাই, আমি বোকা, বা অপরের চেয়ে কম বুঝি, একথা কেহই কিছুতেই স্বীকার করবে না! বরং অন্যান্য সমস্ত রকম দৈন্যের মাঝে থেকেও কি করে বুদ্ধির জোরে সে নিজকে পরিচালিত করেছে, সেইটে দেখাবার জন্যই ব্যস্ত বেশী। ভগবানেরও উপহাস এমনি নিদারুণ যে, এই ধরণের স্বয়ং আত্মবিজ্ঞাপনদানের সময়েই হয়ত বুদ্ধি বিভ্রান্ত করে দেন! সে বিভ্রম

অপরে বুঝ্‌লেও তার নিজের কাছে কিন্তু কিছুতেই ধরা পড়ে না। ভ্রমের স্বভাবই ওই। দুঃখের বিষয় এই যে, সবল চিত্তের এই ধরণের যখন ভ্রান্তি ঘটে, সেই অবস্থায় অনেক দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষও তাঁর আওতায় পড়ে ভুলটা নিয়েই দল পাকায় ও বড়াই করে।

এই প্রকার অনধিকারীর কাছে ধর্ম্মের সমস্তই ভণ্ডামাত্র মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশিত, ভগবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত। আপনাপন মনের ময়লা-মাটী ঘুচিয়ে দিলে তবে সেই স্বপ্রকাশ হৃদয়ে প্রকাশিত হন। যত রকম সাধন-ভজন, সব শুধু এই মলিনতা দূর করার জন্য। আবরণ ক্ষয় করা ভিন্ন মানুষের সাধন-ভজনের আর কোনও প্রয়োজনও নাই, থাকলেও তা তার পক্ষে সাধ্যাতীত। কেননা, তার ক্ষুদ্র শক্তি যতই সাধন-ভজন করুক না কেন, তা দ্বারাই ভগবান লাভ হবে, এমন কথা বলা যায় না —ভগবান্ সাধন-ভজনের দ্বারা আস্‌তে বাধ্য নন। সাধন-ভজন দ্বারা চিত্তমল বিদূরিত হলে যখন জ্ঞান-ভক্তির উদয় হয়, শ্রীভগবান তখন সেই ভক্তকে কৃপা করে এসে দেখা দেন। চিত্তে এই জ্ঞান-ভক্তি উদয় করা বা মলিনতা দূর করার উপায় অধিকারীভেদে নানাপ্রকার। সেই উপায়গুলি-কেই আমরা সাধন-ভজন বলি। সাধন-ভজন অর্থে আমাদের মনোনীত উপায় অবলম্বন মাত্র। ভগবান পাওয়ার যন্ত্র নয়।

অধিকারীভেদে নির্ভরতাও এমনি ধরণের একটা উপায়। এক অর্থে নির্ভর করার পরে আর কোনও সাধন থাকে না বটে, কিন্তু আর এক অর্থে তখন থেকেই অর্থাৎ নির্ভরের পর থেকেই আরও বেশী করে আত্মদৃষ্টিপরায়ণতা বেড়ে গিয়ে আত্ম-শোধনের, পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তনের সুযোগ ও সংস্কারের সাধনা বেশী করে আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকল্‌মা দেওয়ার পরেই গিরীশ ঘোষের আত্মজা বিনাশেও কাঁদবার অধিকার নাই, এই কথা মনে হয়েছিল, তাই তিনি 'সব গুরুর ইচ্ছা' বলে স্থির থাকতে পেরেছিলেন।

নির্ভরের পরে উদ্ভট সাধন কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের মাঝ দিয়ে তিলে তিলে যে সমস্ত সমস্যায় নির্ভরস্থল অর্থাৎ গুরু বা ইষ্ট সহায়ে অতিক্রম করে যেতে হয়, তাতেই ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হয়ে আসে, চিত্তের মলিনতা দূর হয়। কুপ্রবৃত্তি আস্‌ছে—তখন, যেহেতু আমি নির্ভর করেছি, সুতরাং বিচার কর্‌ব না—যা আস্‌ছে সেই অনুযায়ী চল্‌ব—এ নয়। বরং কুপ্রবৃত্তি যে শরীরে আস্‌ছে, সেই দেহমনও যে তাঁকে দিয়ে দিয়েছি, সুতরাং এদিয়ে আর তো আমার ইচ্ছামত যা খুসী তাই করা যাবে না—তাঁর শরণাপন্ন যখন আমি, তখন তাঁর শক্তিতে এসব জয় করা যে আমার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ! এমনি ভাব আসাই স্বাভাবিক।

নির্ভরের পূর্ব্বে চিরাচরিত অভ্যাসগুলি হয়ত এমন দৃঢ় হয়ে গিয়েছে যে, খারাপ

জেনেও তা আর তখন ত্যাগ কর' সম্ভব হয় না। তখন বাইরে সে অভ্যাসগুলি বজায় থাক্‌লেও খাঁটী নির্ভরকারীর মন তখন সে সব ছেড়ে বহু উর্দ্ধে চলে যায়। তাই দেখা যায় যে গিরীশ ঘোষ মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবনত অভ্যাস নিয়ে থাক্‌লেও তার অন্তর শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিত হয়ে অতি উর্দ্ধে উঠে গিয়েছিল। নতুবা শ্রীশঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির মত মহাপুরুষের জীবন সম্বলিত নাটক লিখে ও অভিনয় করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পর্য্যন্ত গিরীশ ঘোষ মহাভাবস্থ কর্‌তে পার্‌তেন না। শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নাটকে এমন সমস্ত কথা নাটকীয় ভাষায় বর্ণিত আছে, যা শুধু বই পড়ে হয় না—উপলব্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন হয়। আত্মজ্ঞান বা গুরুকৃপা ব্যতীত এই উপলব্ধি সম্ভব হয় না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সারাজীবন যথেচ্ছাচারে থেকেও যদি এমন উচ্চভূমি লাভ করা সম্ভব হয়, তবে আজীবন ধরে সদাচারনিষ্ঠার কি প্রয়োজন ? সত্যই এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, তিন বেলা যথানিয়মে সন্ধ্যাহ্নিকাদি অনুষ্ঠানের ক্রুটী নাই, অথচ মরণের পূর্ব্বে সুপ্তসংস্কারসমূহের হঠাৎ প্রকাশ হয়ে বাহিরে বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করে। যেমন হয়ত কেহ জোর করে মনের নানাপ্রকার কুবাসনা দমন করে রাখা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে প্রলোভন জয় করতে পারে নি ; তাই যৌবনকালে নীতির দোহাই দিয়ে বা পরকালবিশ্বাসে অত্যন্ত শাস্ত্রযুক্ত বলে অনেক সময় অনেক প্রলোভনের সুযোগ পেয়েও সে সমস্ত হতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য বশতঃ কার্য্যক্ষম না হলেও মনে মনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়রুচিকরকল্পনা এসে পড়ে। তখন যৌবনের দীপ্ত তেজে যে উদার নৈতিক বল বুকে ধারণ ক'রে প্রলোভনকে পদাঘাতে দূর করেছে, আর বৃদ্ধ বয়সে হয়ত সেই উপায়ের জন্য অনুতাপ আস্‌ছে! ইন্দ্রিয়ের দোষ দিয়ে যারা ইন্দ্রিয় দমন অর্থে কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বার-স্বরূপ শারীরিক অঙ্গগুলিকে নষ্ট করতে চায়, তাদের এ দেখে শিক্ষা হওয়া উচিত যে, ইন্দ্রিয়বিকারের মূল কারণ ইন্দ্রিয়ই নয়—মনই মূল কারণ। এই মনকে উচ্চ চিন্তায় নিরত করার দরুণ অহরহ চেষ্টা ব্যতিরেকে যাঁরা শুধু বাইরে লোকদেখানো আচার নিয়েই মত্ত, সমস্ত লোকে তাঁহাদের প্রশংসা করলেও আসলে তাদের স্থান বেশী উচ্চে নয়। অভ্যস্ত আচারের দরুণ খানিকটা ফললাভ ভিন্ন মন তাদের বেশী কিছু লাভ করে না ; তাই অবশ দেহে ইন্দ্রিয়ের জোর না থাকলেও মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হবার সুযোগ বৃদ্ধবয়সেই বেশী হয়।

আবার যৌবনে যথেচ্ছাচারী থেকে বৃদ্ধ-বয়সে অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে মনও বহু উর্দ্ধে উঠে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এইটাই স্বাভাবিক। পূর্ব্বের উদাহরণে অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হওয়ার কারণ এই যে, সমস্ত আচারাদি বাইরে

পালন করা যায়, তা যদি সত্যিকার উদ্দেশ্য বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্য না হয়ে লোক-দেখানো, অথবা জোর করে করানো অথচ শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্ব না জানানো হয়, তবেই দেহের উপর জোর খাটানোর শক্তি যেই কমে আসে, অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। সেই দুর্ব্বল দেহ-মনের গতি স্বাভাবিকই যে নিম্নদিকে হবে, তাতে আর বাধা কি? কাজেই প্রথম অবস্থায় জোর করে কতকগুলি সদাচার অভ্যস্ত করা গেলেও সঙ্গে সঙ্গে বা পরে যদি তার উদ্দেশ্য জেনে আপন ইচ্ছাতেই মন তাতে প্রবর্ত্তিত না হয়, তবে তার ফল এমনি অস্বাভাবিকই হয়ে উঠবে।

পক্ষান্তরে, যে কোনও উপায়ে মনকে উপরে তুল্‌তে পারলে কোনও আচার-বিচারের মাপকাঠি দিয়ে তাঁর আসন নিম্নে নেওয়া যায় না। এই কারণে একটা কথা অনেকের মুখে শুনা যায় যে, "মন শুদ্ধ থাক্‌লেই হল।" অবশ্য এই কথা যারা উচ্চারণ করে, তাদেরই যে মন শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তেমন নয়; বরং আচারে মন শুদ্ধ হতে পারে—অবশ্য সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আচারে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। আচারের যদি কোনও উচ্চ ফলই না থাক্‌বে, তবে স্মৃতি-শাস্ত্র নিরর্থক হত। কিন্তু অধিকারীর অভাবে অন্ধের মত সারাজীবন স্মৃতির অনুসরণের চেষ্টা করেও তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে অধোগতি হওয়া বিচিত্র নয়।

আপন চেষ্টায় আচার বা স্মৃতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অথবা বিচার অর্থাৎ জ্ঞানাদি সাংখ্যবেদান্ত প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের কঠোর পন্থা দ্বারা নিজে নিজে কোনও দিক দিয়েই সম্পূর্ণ নির্ভরশূন্য হয়ে পরিপূর্ণ ইষ্টপ্রাপ্তি হয়েছে বলে কারও কথা শুনা যায় না। যে সাধক যতই তেজীয়ান্ হোন গুরু অর্থাৎ ঊর্দ্ধ শক্তির শরণাপন্ন হয়ে সেই শক্তিলাভ করা ভিন্ন মোক্ষসাধনের কোনও পন্থাই সাধককে চরমে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। শাস্ত্রে শুধু সাধনপন্থারই উল্লেখ রয়েছে। সেই পন্থায় চলে যে শেষ সীমা পর্য্যন্ত যেতে চায়, তাকে এক সময়ে না এক সময়ে আপন শক্তির চূড়ান্ত জেনে ঊর্দ্ধ-শক্তি বা গুরুশক্তির আরাধনা করতেই হবে। যোগের ভাষায় বল্‌তে হয়, যতই উন্নত সাধক হোক্, দ্বিদল পর্য্যন্ত স্বচেষ্টা; তারপর গুরু না হলেই চলবে না। সে এখন স্থূলে হোক্ বা সূক্ষ্মে হোক। নির্ভরতাই এই গুরুলাভের পক্ষে একমাত্র সাধন।

নির্ভরতাসমুদ্র থেকে নদীর বুকে জল যাওয়ার মত সাধকের প্রাণে ঊর্দ্ধশক্তির প্রেরণা এনে দেয়। আমার যা সব তোমায় দিলাম—একথা বলে সাধক বাইরে সব সমর্পণ করবামাত্র তার ভিতর সেই ঊর্দ্ধশক্তির প্রভাবে ভরপুর হতে থাক্‌বে। নির্ভরতা বা সমর্পণ পাওয়ারই কৌশলমাত্র। যার পাওয়া হয় না, সে নির্ভরও করে নাই বা তার নির্ভরতা যথার্থ হয়নি। সত্যি, যে স্ত্রীকে স্বামী যথার্থ ভালবাসে সে কি অপরের কাছে

তা বলে বেড়ায় যে, স্বামী কিভাবে তাঁকে সোহাগ করেন! তেমনি যে নির্ভর করে, সে যে অহরহঃ প্রাণভরে তাঁর সোহাগ পাচ্ছে, সে কেমন করে বলবে যে, সে কি পাচ্ছে? আবার সাধ্বী স্ত্রী যেমন মুখে বলে বেড়ায় না যে, স্বামীকে তিনি কিরকম ভালবাসেন, তেমনি যথার্থ গুরুভক্ত বা ভগবদ্ভক্তও দশের কাছে আমি নির্ভর করেছি বলে দম্ভ করে বেড়ান না।

কাজেই নির্ভরকারীর বাইরে সাধন না দেখা গেলেও অন্তর তাঁর নিষ্ক্রিয় নয়। নির্ভরের পর ঠিক বিপরীত ভাব প্রাণে জাগলেও পরিণামে তা থাকবে না—সমস্তই মহামঙ্গলে পরিণত হবে—এই স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাসে একমাত্র ইষ্টের শরণ ও তাঁর স্মরণ-মননই সমস্ত প্রকার কুচিন্তা ও দুর্ব্বলতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। আমি তাঁর—তিনি যে বস্তু, আমিও তদাকারকারিত, সুতরাং ভালমন্দ যা কিছু আমার মাঝে আসছে, সব তাঁকে দিয়েছি ও দিচ্ছি, তাঁর সেই স্পর্শমণির স্পর্শে আমার সমস্ত হৃদয়কালিমা সোণা হয়ে যাবেই যাবে—এই প্রচণ্ড বিশ্বাসই নির্ভরতা—তাই জীবনে-মরণে সমস্ত সময়ে সমস্ত সাধনার মূল কথা।

উপলব্ধি

—*—

আনন্দাবেগের সঙ্গে সঙ্গে সজ্ঞান থাকতে হয়, সচেতন থাকতে হয়। আনন্দ সকলের মনেই আসে, বসন্তকালে সর্ব্বত্র আনন্দের ঝলক দেখা যায়, কিন্তু কৈ সকলেই তো সে আনন্দ বুঝে না, গ্রহণ করে না। কাজেই সৌন্দর্য্য-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যানুভবের ক্ষমতাও থাকা চাই, তা নইলে সৌন্দর্য্য থাকা না থাকাতে কি এল গেল? মানুষ শ্রেষ্ঠ কিসে?—না সে সৃষ্টির মাঝে যে অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে, অনন্ত সৌন্দর্য্য রয়েছে, তাই সে সজ্ঞান হয়ে অনুভব করে। অন্যে তা পারে না, তাদের ততখানি বেদনা নাই, তারা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাদের জন্য সৃষ্টির অন্তরালে যে দীপ্ত চেতনা রয়েছে তা জাগ্রত নয়, স্পষ্ট নয়! এক কথায় বলতে গেলে, মানুষ তার চেতনা নিয়েই সকলের চেয়ে ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছে। যার চেতনা যত প্রোজ্জ্বল, সে তত উপরে।

অশোকের বন রক্তিমরাগে রঞ্জিত, নাগেশ্বরের বন অসংখ্য তাম্রবর্ণ কচিপাতার ভরে গিয়েছে, সর্ব্বত্রই কেবলই নব প্রাণের অদম্য আবেগে বিকাশের বেদনায় সকল হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে; কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্য, এই যে সুষমা, একে উপভোগ করে, দেখে কে? এই মানুষই দরদী—শুধু সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ মানুষ নয়, এই এই সৌন্দর্য্যের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়, সমাহিত হয়ে যায়; তবুও সেই সৌন্দর্য্যের মূল তত্ত্বের কূলকিনারা করে উঠতে পারে না, এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসা রয়েছে বলেই মানুষ মানুষ।

বসন্তের সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত, বসন্তে গাছে গাছে সুন্দর কচি পাতা আসে, সুরভি পুষ্প দ্বারা শোভিত হয়। মাঝে মাঝে কোকিলের ডাকে মন-প্রাণ আকুল হয়ে উঠে; সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের

বিকাশ। কিন্তু বসন্তের কোকিল, পত্রপুষ্পাকীর্ণ বৃক্ষ কি সেই সেই সৌন্দর্যকে সজ্ঞান হয়ে অনুভব করতে পারে? তাদের জীবন বেয়ে সৌন্দর্য্যের যে স্নিগ্ধ মাধুরী উপ্‌চে পড়ে, তা কি তারা অনুভব করে?

মানুষের প্রতি বিশ্ববিধাতার অসীম করুণা—কেননা মানুষ চেতনার উর্দ্ধ স্তরে উঠে যেতে পারে। এই চেতনা দ্বারা মানুষ সব পায়, সব বুঝে, সব আত্মগত করে। চেতনা যখন আড়ষ্ট হয়ে থাকে, তাতে যখন প্রাণের বিদ্যুৎসঞ্চরণ থাকে না, তখনই মানুষের অধঃপতন। তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রধান এবং মূল উপকরণই হল জাতির উর্দ্ধ চেতনা। এই চেতনা নিয়ে, প্রজ্ঞা নিয়ে মানুষ যখন স্তব্ধ হয়ে যায়; তখন অসীম বিশ্বের রহস্য বিদ্যুতের মত দীপ্তি নিয়ে মানুষের অন্তরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। জান্‌তে হলে মানুষকে স্তব্ধ হতে হবে, শান্ত হতে হবে। পাতঞ্জলে বেশ সুন্দর একটি কথা আছে। চিত্ত যখন মালিন্য-রহিত হয়, তখন জ্ঞানের পরিধি অনন্তবিস্তৃত হয়ে যায়, আর জ্ঞেয় হয়ে যায় অল্প! জ্ঞানের আলোক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে যেতে কোন বাধা পায় না বলেই জ্ঞান লাভ করতে বেশী সময় লাগে না। জ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে আমরা ঝোঁক দিই পুথির উপর, বাহিরের অনুশীলনের উপর; কিন্তু জ্ঞান লাভের দৈবী সম্পদ্ মানুষের ভিতরেই রয়েছে।

সর্ব্বত্র আমরা বাধা দিচ্ছি এবং নিজে বাধা-স্বরূপ হয়ে আছি। বেদান্ত বল্‌ছেন—"তুমি নিজেই যে ব্রহ্ম"; কিন্তু এই ব্রহ্ম তোমারই দেহের জড়ত্বের দরুণ ঠিক ঠিক বিকাশলাভ করতে পারছে না। কাজেই সর্ব্বদা অনুভব কর চিন্তা কর, যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ; আর এই অনুভবের পথে যত কিছু বাধা আছে, সবকে নির্মূল করে দাও। সাধনা দেহের মনের—আত্মার নয়।

সাধনা আর কিছুই নয়, কেবল বাধা-বিঘ্ন দূর করা। পূজা-পার্ব্বণ করবার আগেই বিঘ্ননাশের দরুণ গণপতির পূজা কর্‌তে হয়। এই বিঘ্ন নাশ হয়ে গেলে দেবতা স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠেন। আমরা সাধারণতঃ বিঘ্নটাকে মনে করি বাইরে, কিন্তু আমাদের নিজেদের মনেই কত ভূত, প্রেত, পিশাচ, অন্ধ-সংস্কার ইত্যাদি রয়েছে। দূর করতে হবে এই-গুলোকেই—এই বিঘ্ননাশ হয়ে গেলেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সকল কর্ম্মে আমাদের সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন।

মানুষ চেতন বলেই আবার স্বেচ্ছায় চৈতন্যের অপব্যয় করে থাকে। এই ভাবেই মানুষ নিজেই নিজের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। জড় যারা, অর্থাৎ চেতনা যাদের গভীরভাবে সুপ্ত, তারা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাদের স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ নাই। তারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টি করতে পারে না। সাময়িক কালের দরুণ তারা সৃষ্টির বাহন হয় মাত্র। মানুষ চেতন বলেই, প্রকৃতিকে অনেক সময় বাধা দেয়—স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে অবজ্ঞাও করে বসে! কাজেই চেতন হলে আবার ভয়ের আশঙ্কাও রয়েছে, যদি সেই চেতনাকে ঠিক ঠিক ভাবে না বুঝা যায়।

পূজার মন্ত্রের চেয়ে বিঘ্ননাশের মন্ত্রই বেশী। অর্থাৎ ঠিক ঠিক পূজার যোগ্য হতে গিয়েই, আমরা দেখি, আমাদের কত দিকে অযোগ্যতা, তাই বিঘ্ন দূর করতে করতেই সময় যায় বেশী। প্রকৃত পূজা হল হৃদয়ের একাগ্র আহ্বান। সেই আহ্বান মুহূর্ত্তের দরুণ হলেও—তাই খাঁটি, তাতেই কাজ হয় বেশী। কিন্তু সেই আকুল আহ্বান—আকুল ক্রন্দন সব সময়ই তো আসে না। আর না আসার কারণই হল জড়ত্বে আমাদের চিত্ত নিস্পন্দ—অসাড়!

যিনি প্রকাশস্বরূপ, তাঁর মাঝে তো এতটুকু সঙ্কোচও নেই। কাজেই ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে দেহ মন প্রাণ অপার্থিব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দেহের সংস্কৃতি, মনের সংস্কৃতি, সবারই সংস্কৃতি চাই; এই আধারের যোগ্যতাতেই ভগবানের অনন্ত অব্যক্ত মহিমাও সপ্রমাণ হয়ে ওঠে। কাজেই সাধনা

কর্‌তে হবে শুধু বিঘ্ননাশের দরুণ। বাহিরের বিঘ্নের চেয়ে ভিতরের বিঘ্নই সব চেয়ে বড়, এই জন্যই ঋষি নজর দিয়াছেন ভিতরের প্রতি। ভিতর নিয়ন্ত্রিত হলে, বাহির আপনিই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে।

শুধু একঝোঁকা কঠোরতা নয়, যাতে যথার্থ সংস্কৃতি হয়, সেই পথই অবলম্বন কর্‌তে হবে। দেহের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির তারতম্য ঘটে। নব নব অনুভূতি আসে কেমন করে?—এই দেহেরই স্বচ্ছতা ও যোগ্যতা দেখে। সাধনার সিদ্ধি মার্জ্জিত দেহ মন বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে।

সহজকে ভাবদারা সহজেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মন প্রাণের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে পেতে গিয়েই দেখি—অসংখ্য বাধা—বিপত্তি। কাজেই যাকে পেয়েছি, তাকে বাস্তবে নামিয়ে আনতে গেলেই, সাধনার যে কত প্রয়োজন, তা উপলব্ধি হয়।

মানুষ সৃষ্ট জীব বটে, কিন্তু মানুষ নিজের মাঝেই স্রষ্টাকে আত্মারূপে সন্দর্শন কর্‌তে পারে বলেই—সৃষ্ট হয়েও সৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের মাঝে আছে। মানুষের প্রতি এই ভগবানের বিশেষ করুণা। সৌন্দর্য্যের বাহন হওয়ার চেয়ে সুন্দরকে যে উপলব্ধি করতে পারে, সেই বড়! মানুষ সেই উপলব্ধিতেই সৌভাগ্যবান্!

ব্যাপ্তি

—*—

ওরে তুই ওঠ্ রে আজি
　ভেদ করে সাত প্রাচীর ঘেরা
অন্ধকারের লৌহকারার
　ওই যত সব মনের বেড়া!

সঙ্কুচিত মনকে তোর ওই
　আলোক মাঝে ফেল্ না দেখি—
আলোয় আলোয় কেমন করে
　দেখ্‌ব বাধে ঠেকাঠেকি!

আঁধার মাঝে এক অপরে
　পৃথক্ বলে ঠেল্‌লি দূরে,
আলোয় এসে মুখটী চিনে
　গা দেখি গান একই সুরে!

হাজার হাজার প্রাণের পরশ
　তোরই প্রাণে লাগবে আসি—
বিশ্ব হবে আপন গৃহ
　সবার মুখে হাস্‌বি হাসি!

আপন প্রাণের আনন্দেতে
　টান্ রে সবায় আপন বুকে,
দেখ্‌বি শুধুই আনন্দ-ঢেউ
　সবাই সেথা ভাসছে সুখে!

সমস্যা

—*—

তোদের সঙ্গে ভাই, আর কোন বিষয় নিয়েই বিরোধ কিম্বা অমিল নাই আমার, কিন্তু ওই একটা জায়গায় আমার মতে এবং তোদের মতে একটা প্রভেদ রয়েছে। তোরা আড়ম্বরটাকেই বেশী ভাল বাসিস্— অথচ এই আড়ম্বরের মূলে যে প্রাণশক্তির সুনিবিড় আনন্দাবেগ রয়েছে, সেটা তলিয়ে দেখিস না। অনেক সময় প্রাণ জিনিষটা যদি লোপ পেয়ে যায়, তাহলে আদর্শেরও পরিবর্ত্তন করতে হয়। অর্থাৎ প্রাণ নিয়েই হল আমার আসল কথা। কি করে প্রাণকে প্রফুল্ল সঞ্জীবিত রাখা যায়, তার পথই আবিষ্কার করতে হবে। প্রাণ না থাকলে দেখছি কিছুতেই কিছু হয় না। কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির দিকে জোর তাগিদ দিলে কি হবে? আমি বরাবর তোদের সঙ্গে এ নিয়েই লড়াই করে এসেছি এবং যে পর্য্যন্ত সংস্কার না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি প্রাণ দিয়ে প্রাণের কথা প্রকাশ করে যাবই!—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোদের প্রাণকেও আমি একদিন গলাতে পারব, কেননা আমি যা বলছি তা তোদেরও প্রাণের অন্তর্নিহিত কথা, কাজেই নিছক্ আদর্শের মোহ যেদিন তোদের লোপ পেয়ে যাবে, সেদিন বুঝবি, আমার কথার মূল্য আছে কি না!

রমেশ।— তাহলে দেখ্ছি তুই মুনি-ঋষি আপ্ত-বাক্য সবই উল্টে দিতে চাস্? মোট কথা, তোর যা খুসী তাই করে যাবি এবং সেই অধিকার দেবার দরুণই তোর এই লড়াই এবং আমাদের সঙ্গে মতানৈক্য! এতদিন ধরে সন্ধ্যা পূজা জপ তপ করে আস্ছি—এসবই তাহলে তোর মতে বৃথা। আর কিছু না হোক, এই অনুষ্ঠানগুলি বজায় রেখে যদি মরেও যেতে পারি, তাহলেও কত সার্থক জীবন। প্রাণের নাম করে তোদের মত ব্যভিচার করতে চাই না। ধর্ম্মলাভ এত সহজ নয়—কত যুগযুগান্তর কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধি লাভ হয়। দুদিন এটা আর দুদিন ওটা এরূপভাবে চঞ্চল হয়ে ঘুরলে ফিরলে কি ইষ্টসিদ্ধি হয়? অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও যে কি প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, তোরা তার কি বুঝবি? অনুষ্ঠান না করেই আগে থেকেই তোদের সমালোচনা! এই তো ধর্ম্মের প্রতি তোদের শ্রদ্ধা!

বিমল।—আরে ভাই এত চটিস্ কেন? আমিও তো আনন্দের কথা, প্রাণের কথাই বলছি। অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও যে কি আনন্দ পাওয়া যায়, তা আমার মত পাষণ্ড না হয় নাই বুঝল—কিন্তু এর মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারে এমন ২।৪ জন লোকও কি মিলে না? আমার কথা আলাদা, আমি আজন্ম নাস্তিক, আমার তোদের মত ভাব ভক্তি শ্রদ্ধা কিছুই নাই—এ তো আমি নিজেই স্বীকার করছি। কিন্তু আর কোন চিন্তা না করলেও আমায় এই এক চিন্তাতেই আকুল করে তুলছে; আমি কেবল ভাবি —তোদের মত একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনুষ্ঠানকারী থাক্‌তেও লোকের ভিতর কেন অবিকম্প যোগশক্তি ফুটে উঠছে না—মানুষগুলো কেন মন-মরা হয়ে আছে? কেন তাদের আনুষ্ঠানিক আনন্দ স্থায়ী হচ্ছে না—কেন সেই আনন্দ দৈনন্দিন কর্ম্মোৎসাহের ভিতর দিয়েও প্রকাশ পাচ্ছে না। আমার মনে হয়, কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড মারাত্মক ভুল রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কাউকেই দোষ দিতে চাই না। কিন্তু এর মূল অনুসন্ধানের দরুণ সকলেরই একটু যত্নবান্ হওয়া প্রয়োজন বোধ করি।

আমি চাই বিমল আনন্দ, আর প্রাণশক্তির বিদ্যুৎসঞ্চরণ। অর্থাৎ মানুষ—আনন্দে, প্রাণের আবেগে, কর্মঠ শক্তিশালী সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন লাভ করুক! কেউ যেন মনমরা হয়ে না থাকে, কাউকে দেখে যেন মনমরা ভাব প্রাণে না জাগে। প্রত্যেকের মাঝে অবাধ প্রাণসঞ্চরণ হোক। বিষাদগ্রস্ত হয়ে, কেবল অনুষ্ঠানের বোঝা বইতে বইতে যেন জীবনটা শেষ হয়ে না যায়। অনেকেরই দেখি, অনুষ্ঠানই হোক্ আর জপ-তপই হোক্, যেন দায়স্বরূপ হয়ে ওঠে—কি করা, না করে উপায় নেই, তাহলে যে …………। আমি এদের জন্যই আরও বেশী দুঃখ অনুভব করি—কেন ওদের উপর এই চাপ কেন, যা বহন করে ওদের প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে আস্ছে, তা দিয়েই ওদের চেপে রাখা কেন? নিয়মকানুনের প্রবর্ত্তয়িতা যে মানুষ নিজেই, একথাটা ওদের বুঝিয়ে দিলে কি বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যাবে? আর বুঝিয়ে দিতে যদি ভয় হয়, তাহলে তো স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষকে অজ্ঞান করে রাখ্‌বার দরুণই তোদের বিধিমত প্রচেষ্টা! আমি এই বলি যে, নিয়মকানুন আপনি গড়ে উঠুক, প্রচুর আনন্দ থাক্‌লে আপনি নিজেদের মাঝ থেকেই নিয়ন্ত্রণশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। শক্তিশালী জাতিদের দিয়েই একথা প্রমাণ হয়। কাজেই আসল কথা হল প্রাণ। শক্তির প্রাচুর্য্য থাক্‌লে তবে না প্রাণকে এক জায়গায় বেঁধে রাখতেও আনন্দ! কর্ম্মে প্রাণ থাক্‌লে, অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে, নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়েও ফল লাভ করতে বেশী সময় লাগে না। আর ফল লাভ হয়ে গেলেই তো সার্থকতা সম্পাদন হল। উদ্যমবিহীন প্রাণহীনদের দিয়ে কি করা যায়?—কিছুই না। কিন্তু আমার যেন কেন ওদের দোষ দিবার আগে, কেন ওরা উদ্যমবিহীন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, তারই কারণ অনুসন্ধান করে দেখ্‌বার দরুণ নিদারুণ আকুলতা জন্মে। আমি গভীর দুঃখ নিয়ে, বেদনা নিয়ে এই সমস্যার মূল আবিষ্কার করতে চাই!

সে দিন জগদ্বন্ধু তর্কলঙ্কারের এক ছেলে মহেশ (যে নাকি আই, এ, পড়্‌ছে) আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এসেই, সে আজ সন্ধ্যা করেনি বলে কি এক তুমুল কাণ্ড বেধেছিল তাকে নিয়ে, তারই কাহিনী বল্‌লে। শুনে আমার হাসিও পেল, দুঃখও হল। আমি বল্‌তে চাই, তর্কলঙ্কার মহাশয়ের শেয়ানা ছেলেকে জোর করে কেন সন্ধ্যা করাতে হবে, কিম্বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তা করবার দরুণ তাকে সময় অসময় এত নীতির বচনই বা কেন শুনাতে হবে? আমি বলি, প্রাণ দিয়ে মানুষ যা করে, তা অনুকরণ কর্‌বার দরুণ মানুষের ভিতর স্বাভাবিকই একটা প্রচেষ্টা আসে, তা আর বলে-কয়ে করাতে হবে না। অবশ্য কচিৎ যে কোথায়ও ব্যতিক্রম না হয়, তা বলছি না—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এত ব্যতিক্রম দেখা যায় কেন? স্থূলে এত ব্যতিক্রম দেখি বলেই, তার সূক্ষ্ম কারণ আবিষ্কার করবার দরুণ আমার ভিতর এত আকুল চেষ্টা। আমি কারও মন-রক্ষার্থ আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতাকেও পোষণ করতে পারি না, আমার কাছে সবই স্পষ্ট। তবে কিনা গভীর ভাবে চিন্তা না করে আমি কোন বিক্ষোভ কিম্বা আন্দোলন উপস্থিত করি না। প্রাণ দিয়ে যা গড়া যায়, তাই স্থায়ী হয়; তার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ ক্ষয় দেখেও যদি বলি—না, এর অটুট স্বাস্থ্য রয়েছে, তাহলে সেটা কি পাগলামী নয়? আমি এই গুপ্ত রহস্যটা আবিষ্কার করে দিচ্ছি বলেই ভণ্ড নাস্তিক। আচ্ছা ভাই, আমার এই কলঙ্কই ভাল। আমি মনে করি, আমার প্রতি এ তোদের অসীম কৃপা!

কথাগুলো তোদের পক্ষে খুবই অরুচিকর, কিন্তু আমি আজ দুচারটা অরুচিকর কথাই বলে যাব।

দেখ্ ভাই রমেশ! আমিও প্রাণের ঐশ্বর্য্যশক্তিকে খুবই শ্রদ্ধা করি। এই মঠ মন্দির অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যে ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয় দিচ্ছে—এতে

কি গৌরব অনুভব না করে পারি? কিন্তু বাইরের এই ঐশ্বর্য্য গৌরবের বিষয় হলেও অন্তরের মাধুর্য্যকে আমি বেশী মূল্যবান্ মনে করি। বৌদ্ধ যুগে কত মঠ মন্দিরস্তূপই না নির্ম্মিত হয়েছে! কিন্তু এই মন্দিরস্তূপগুলি নির্ম্মিত হয়েছিল যাঁকে উপলক্ষ্য করে, যাঁর প্রতি নিশ্চল ভালবাসার আকর্ষণে, আমি তাঁকেই, এবং যারা তাঁর অমায়িক আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, আমি তাদেরই প্রাণশক্তিকে ধন্যবাদ দিই। আসল কথা হল ভালবাসা—অনুরাগ! যথার্থ অনুরাগেই সবার প্রাণশক্তি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, আর প্রাণশক্তি উজ্জীবিত হয়ে উঠলেই, তার আবার অজস্র পথে বিকাশ এবং পরিণতিও স্বাভাবিকই ঘটে! আমি এই ভালবাসা, অনুরাগ, প্রাণশক্তির অব্যর্থ সঞ্চরণকেই বেশী মূল্যবান্ মনে করি। মানুষের ভিতর এই দুর্লভ গুণগুলি যাতে সহজে সঞ্চারিত হতে পারে, তারই পথ আবিষ্কার করে নিতে হবে। প্রাণশক্তির উজ্জীবন হলে, রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনে মারাত্মক কিছু ঘটে বসে না, বরঞ্চ পরিবর্ত্তনে অনুকূল পথই আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে!

আমার প্রথম কথাই হল, মানুষকে মুক্তি দিতে হবে আগে। অবশ্য এই অব্যর্থ মুক্তির দরুণ প্রথমতঃ কিছু কিছু ব্যভিচার ঘটতে পারে, কিন্তু এই ব্যভিচার স্থায়ী নয়! মানুষ শক্তি পেলেই, শক্তিমন্ত হয়ে উঠলেই শক্তিকেও ব্যবহার করার প্রণালী আবিষ্কার করে নিতে পারবে। প্রাথমিক ভুল, ক্রুটীবিচ্যুতি উপেক্ষার বিষয়। মুক্তির হাওয়া লাগলে, বন্ধনজর্জ্জারিত মানুষও নূতন ভাব নূতন আকার ধারণ করে!

—*—

বাসনা-প্রসঙ্গ

—*—

বাসনা দ্বিবিধ—শুদ্ধা এবং মলিনা। মলিনা বাসনা হইতে জীবের জন্ম-মরণ দুঃখ, আর শুদ্ধা বাসনা হইতেই জীবের মুক্তি-পথে গতি হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণের তৃতীয় সর্গে এই বাসনা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে—

> বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
> মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশনী॥ ১১

—এই মলিনা বাসনা হইতেই বার বার সংসারচক্রে পতিত হইতে হয়, কিন্তু এই বাসনার শুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধা বাসনা দ্বারা জন্ম-বিনাশ হয়।

বাসনাই সৃষ্টির মূল রহস্য। বাসনার নিবৃত্তি হইয়া গেলে আর জন্ম-মরণদুঃখ অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু সহজে কি মানুষের বাসনা ক্ষয় হয়? ধীরে ধীরে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তারপর মলিনা বাসনার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আর এই মলিনা বাসনা অপসারিত হইলেই, চিত্তে শুদ্ধা-বাসনার উন্মেষ হয়। তখন আবার বাসনাকে অবলম্বন করিয়াই ঊর্দ্ধলোকে গতি হইয়া থাকে। কাজেই বাসনারও রূপভেদ আছে। বাসনাই জীবের বন্ধনের কারণ, আবার বাসনার দ্বারাই জীব মোক্ষের পথে অগ্রসর হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামনাশূন্য হইতে বলিয়াও, নিজেই মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন "মা আমি আর কিছুই চাই না—কেবল শুদ্ধা ভক্তি দে মা।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন না কোন কামনা মনের মাঝে উদিত হইবেই। কিন্তু সংযম এবং সাধনার ফলে চিত্ত যখন একাগ্র ভূমিতে আরোহণ করে, তখন কামনার বিশুদ্ধরূপে চিত্তকে ইচ্ছানুযায়ী সন্নিবিষ্ট রাখা যায়। এইরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্তের মাঝে এক সাত্ত্বিক আনন্দের স্থিতিপ্রবাহ চলে। তখন মন কেবল শুদ্ধা বাসনারই আধারস্বরূপ হয়। অর্থাৎ মনে হয়, কোন বাসনা জাগিতেই পারে না—একমাত্র শুদ্ধা বাসনা ছাড়া।

কোন বাসনাই যদি না থাকে, তাহা হইলে দেহ আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে? অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকার মূলে কতগুলি বাসনা রহিয়াছে; সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া গেলে আর দেহ থাকে না। কিন্তু সাধনা দ্বারা চিত্তের সংস্কার না হইলে, সহজে রক্তবীজ অসুরের মত বাসনার পরাজয় হয় না; এক বাসনার ক্ষয়ে আবার সেই স্থানে অন্য বাসনা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। কাজেই বাসনার মূল নির্ম্মূল করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। জন্ম নিরোধ করা সহজ কথা নয়।

অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী।
পুনর্জ্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ॥
যোগবাশিষ্ঠ—১২ শ্লোক

—পণ্ডিতেরা বলেন, মলিন-বাসনা প্রবল অহঙ্কারের গুণে, অজ্ঞানক্ষেত্রে নিবিড় ঘনীভূত ভাবে উদ্ভূতা হইয়া পুনর্জ্জন্মরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে।

এই মলিন-বাসনা হইতেই মানুষের অহঙ্কার আত্মাভিমান ঘনীভূত হয়। গীতাতেও আছে—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এইগুলিই আসুরী-সম্পদ। আর এই সম্পদগুলি মলিন-বাসনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই মলিনা-বাসনার প্রভাবেই—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা নিজকে কর্ত্তা এবং সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া মনে করে। যাহারা মলিন-বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন, বিবেক-শূন্য, গীতায় তাহাদের লক্ষণ বলিয়াছেন, যথা—

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্ত্ততেঽশুচিব্রতাঃ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তমুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥

এই মলিন-বাসনা হইতেই দুষ্পূরণীয় অজস্র কামনার সৃষ্টি হয়। আর এই জন্যই বার বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। জীবের অশেষ দুঃখের মূল কারণই হইল এই বাসনা। বাসনার শেষ নাই, মানুষ বাসনায় শেষে অন্ধ হইয়া পড়ে। বাসনা হইতে কত দুঃখ, কত অশান্তি পায় মানুষ, তবু স্বেচ্ছায় এই বাসনার কবলেই পড়িতে চায়। এই দুর্নিবার বাসনা রোধ করিবার শক্তি-সাধনা ব্যতিরেকে আয়ত্ত হয় না।

মন বস্তুটীর যে মরণ নাই, সুতরাং তাহার একটা না একটা আশ্রয় চাইই। কিন্তু আশ্রয় দিবার বেলাতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি

উভয় দিকেই ধাবিত হইতে পারে। কেবলমাত্র কুচিন্তা করিতেই মন অভ্যস্ত নয়; সুচিন্তাতে লাগাইয়া দিলেও দেখিবে মন কত দ্রুত অগ্রসর হয়। কাজেই মনকে যে চিন্তায় অভ্যস্ত করানো যাইবে, সে তাহাতেই লাগিয়া যাইবে।

মলিন-বাসনা সব দিয়া দিয়াই প্রতিবন্ধক স্বরূপ, কিন্তু শুদ্ধ বাসনা আবার অনুকূলস্থানীয়া।

পুনর্জ্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সংভৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে॥
যোগবাশিষ্ঠ, ১৩ শ্লোক

—কথিত আছে, শুদ্ধ বাসনা তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিনী। তাহাতে পুনর্জ্জন্মের অঙ্কুর নাই। তাহা ভৃষ্ট-বীজের ন্যায় অর্থাৎ তাহার ভিতরের বাসনা বা অঙ্কুর নাই, বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভৃষ্ট অর্থ হইল—ভাজা। বীজকে, কামনার অঙ্কুরকে তপস্যা রূপ অগ্নি দ্বারা ভাজিয়া নিলে, তাহাতে আর নূতন বাসনার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দগ্ধ রজ্জুর ন্যায় তাহার কেবল বাহিরের আকারই থাকে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোনরূপ বন্ধনের আশঙ্কা নাই।

জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর প্রভেদই হইল এই শুদ্ধা এবং মলিনা বাসনা লইয়া। অর্থাৎ জ্ঞানী শুদ্ধা বাসনাকে অবলম্বন করিয়াই দেহ-ধারণ করিয়া থাকেন, আর অজ্ঞানী মলিনা বাসনাকে আশ্রয় করিয়াই দেহ-ধারণ করে। এক জনার গতি ঊর্দ্ধে, আর এক জনার গতি নিম্নলোকে।

অনেকেই মনে করিয়া থাকে যে, কোন বাসনাই যদি না থাকিল, তাহা হইলে চিত্ত যে জড় হইয়া যাইবে; একটা কিছু আশ্রয় না থাকিলে মনের ক্রিয়া হইবে কেমন করিয়া? কিন্তু এইখানেই একটী বিশেষ অনুধ্যানের বিষয় রহিয়াছে। এই আশ্রয় অবলম্বনের বেলাতেই খুব সাবধান হইতে হয়! যোগীরাও বাসনাকে অবলম্বন করিয়াই মুক্তির আস্বাদন লাভ করেন, কিন্তু সেই বাসনা হইলে সাত্ত্বিক বাসনা বা শুদ্ধ বাসনা। তাহাতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা ঊর্দ্ধ জগতের। মহাপুরুষেরা কেবল মাত্র শুদ্ধা বাসনাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

অপুনর্জ্জন্মকরণী জীবন্মুক্তেষু দেহিষু।
বাসনা বিদ্যতে শুদ্ধা দেহে চক্র ইব ভ্রমঃ॥
যোগবাশিষ্ঠ—১৪ শ্লোক

শুদ্ধ-বাসনা—জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহে চক্রভ্রমণের ন্যায় থাকে, তাহা পুনর্জ্জন্ম সাধনে সমর্থ হয় না। চক্রকে একবার ঘুরাইয়া দিলে, তাহা সেই একবারের শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই ঘুরিতে থাকে, আর কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে, ঘুরিতে ঘুরিতে কতক্ষণ পরে আপনি তাহার বেগ থামিয়া আসে এবং স্থিরভাব অবলম্বন করে। তেমনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের শরীরও শুদ্ধবাসনার অধীন। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, মহাপুরুষদেরও ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই দ্ধবাসনার অধীন শরীরও প্রারব্ধ ভোগ করে। কিন্তু এই প্রারব্ধ শেষ হইলেই, আর কোন মলিন বাসনা তাহাতে সংযুক্ত না হওয়ায় শরীরান্তর হয় না। অর্থাৎ প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পরমমুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রারব্ধ প্রত্যেককেই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু সাধনা দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া শুদ্ধবাসনার অধীন করিয়া দিতে পারিলে, আর কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। কেননা শুদ্ধবাসনা মানুষকে কখনো নীচে নামাইয়া আনে না, শুদ্ধবাসনার গতি ঊর্দ্ধমুখী, তাহা কেবল মানুষকে নব নব আনন্দই প্রদান করে। কিন্তু এই শুদ্ধবাসনাকে আশ্রয় করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা মলিন চিত্তবিশিষ্ট লোকে বুঝিতে সক্ষম হয় না। এই জন্যই যোগীরা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন, তাহা যে ভোগীদের ভোগের আনন্দের

চেয়ে কত মহৎ এবং কত উচ্চস্তরের, তাহা ভোগী বুঝিতে সক্ষম হয় না।

যতক্ষণ দেহ থাকিবে, ততক্ষণ মনের মাঝে বাসনার উদয় হইবেই। কিন্তু সাধনা দ্বারা মানুষ চিত্তকে সংযত করিতে বা একাগ্র করিতে সক্ষম হয়। তাহাতে এই ফল হয় যে, মন চঞ্চল হইয়া যাহা-তাহা লাভ করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠে না, মনের মাঝেও একটা স্থৈর্য্য তখন আসিয়া পড়ে। সেই স্থির চিত্তে কেবল শুদ্ধবাসনারই উন্মেষ হয়। অনেকেই ভাবে যে, বাসনার বৈচিত্র্য না থাকিলে কেবল একরকমের আনন্দে যে বিস্বাদ আসিয়া পড়িবে। কিন্তু আসলে ব্যাপার তাহা নয়, শুদ্ধবাসনার মাঝেও আনন্দানুভূতির বৈচিত্র্য থাকে। মনকে একবার সেই শুদ্ধবাসনার অধীন করিয়া দিতে পারিলে, তখন বুঝা যায়, শুদ্ধবাসনার মাঝেও কত বিচিত্র আনন্দের উৎস রহিয়াছে।

মহাপুরুষ আর সাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য এই জন্যই হইয়া থাকে। উভয়েই জীবন ধারণ করিয়া আছে বটে, কিন্তু একজন শুদ্ধবাসনাকে আশ্রয় করিয়া থাকার দরুণ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন, আর একজন মলিন বাসনাকে আশ্রয় করার দরুণ আরও ভাল করিয়া বন্ধনের পথকে প্রশস্ত করিতেছে।

শুদ্ধবাসনা হইতে যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা দিয়া লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এই জন্যই শুদ্ধ-বাসনা হইতে সৃষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ জন্মমাত্রই নিবৃত্তিমার্গের সাধনা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন; তাহাদের দ্বারা আর সৃষ্টির কার্য্য রক্ষা হইল না। কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলেই কিছু না কিছু মলিন বাসনার ভেজাল থাকা চাই-ই। সৃষ্টি রক্ষা চলে না দেখিয়াই ভগবান এই মলিন বাসনার সৃষ্টি করিলেন। এই মলিন বাসনা দ্বারাই জীব অভিভূত হইয়া পড়িল।

প্রারব্ধ যদি না থাকে, তাহা হইলে কেবল মাত্র শুদ্ধবাসনাকে অবলম্বন করিয়া আর এই স্থূল দেহ টিকিয়া থাকিতে পারে না। মহাপুরুষদের শরীর প্রারব্ধ পর্য্যন্ত থাকে, প্রারব্ধ শেষ হইয়া গেলেই আর থাকিবার প্রয়োজন হয় না। কেননা তাহাদের মনে তো আর অন্য কোন বাসনা জাগে না।

নিছক্ শুদ্ধসত্ত্বের মাঝে সৃষ্টির উপাদান নাই—তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং মৌলিক। কাজেই সংযোগ না হইলে সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। আর সৃষ্টি যখন হইল, তখন সত্ত্বের সঙ্গে অল্প তমের মিশ্রণ হইল, অর্থাৎ জ্ঞানে-অজ্ঞানে মিলাইয়া তবে জীব সৃষ্টি। এই জন্য জীবের মাঝে অহরহঃ দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বিবেকজ্ঞানও এই জন্যই জীবের মাঝে রহিয়াছে, কেননা জীব যে একেবারে তলাইয়া যাইতে পারে না, তাহা হইলে যে তাহার বিবেকে বাধে। এই দ্বন্দ্ব যতক্ষণ চলে, ততক্ষণই জীব জগতে। আর এই দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেলে, অর্থাৎ জীবনের নিগূঢ় সন্ধান আবিষ্কার করিতে পারিলে, স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন আর কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন সংশয় নাই—কেবল আনন্দ—বিশুদ্ধানন্দ! সেই অবস্থা লাভ হয় এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই। অর্থাৎ মানুষের মাঝে ভাল-মন্দ উভয় বীজ রহিয়াছে বলিয়াই, মন্দ করিয়াই মানুষের মাঝে অনুশোচনা জাগে। এই-রূপে চিত্ত যখন ক্রমশঃ নিছক ভালর দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই মানুষ মুক্তির সন্ধান পায়।

মলিন বাসনা দ্বারা প্রাকৃত সংযোগ, আর শুদ্ধ বাসনা দ্বারা অপ্রাকৃত সংযোগ হয়। শুদ্ধবাসনার মিলন ভাবজগতে; বৈষ্ণবদের অপ্রাকৃত আস্বাদন এই শুদ্ধবাসনাকে অবলম্বন করিয়াই হয়, সেই অপ্রাকৃত জগতে সবই আছে—কিন্তু সবই বিশুদ্ধ কাহারও মাঝে মালিন্য নাই, দ্বেষ নাই, বৃন্দাবনের সবই অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত জগতের প্রবেশের

দ্বারই হইল—শুদ্ধবাসনা। এই শুদ্ধ বাসনা না জন্মিলে সেই ভাব-জগতে, অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করা যায় না।

প্রাকৃত জগতের ভোগের চেয়ে, অপ্রাকৃত জগতের ভোগ শতগুণে মধুর! প্রাকৃত জগতের সবই বিচ্ছিন্ন—কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের মাঝে সব একরস। অপ্রাকৃত জগতে সবই আছে, কিন্তু সবই বিশুদ্ধ বলিয়াই—সবের মাঝেই অবাধ মিলন! বৈশিষ্ট্য আছে অথচ মিলনে কোন বাধা নাই! বিশুদ্ধ ভাব জগতে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারা কেবল মাত্র শুদ্ধবাসনাকে অবলম্বন করিয়াই আছেন। কাজেই সেইখানের সবই অপ্রাকৃত!

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা সেই অপ্রাকৃত জগতের সন্ধানই দিয়া যান। শুদ্ধবাসনাকে অবলম্বন করেন বলিয়াই—অপ্রাকৃত জগতের রহস্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কাজেই তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই জীবন্মুক্তির আস্বাদন করেন। প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া গেলে সেই শুদ্ধবাসনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সেই চিরস্থায়ী ভাব-জগতে বা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করেন! সেই ভাবজগতে বিনাশ নাই, ভাব-জগতের আনন্দ অপূর্ব্বানন্দ! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ভাব-জগতে প্রবেশ করিতে হইলে—শুদ্ধ-বাসনাকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

আর এই শুদ্ধবাসনা, বিনা সাধনায়, বিনা সংযমে লাভ হয় না। অনেক সাধ্য সাধনা ও তপস্যার পর সেই দুর্লভ রত্ন আয়ত্ত করিতে মানুষ সক্ষম হয়।

—(*)—

শুভলগ্ন

—*—

উদাসী গো আপন-ভোলা বাঁধলে বাসা কোন্ গগনে?
রূপের আলো ছড়িয়ে দিলে মত্ত আগুন ফাগুন মনে।
উঠল ফুটে কৃষ্ণকেলি,
বনে বনে যুঁই চামেলি,
কৃষ্ণচূড়ার রক্তমুকুট জাগল পুলকশিহরণে!

নূতন সুরে গাইল পাখী, অনেক দিনের গানটী ভোলা—
সবুজ পাতায় সাজিয়ে দিলে কাননবালার সাধের দোলা;
আবাহনের গানটী গেয়ে,
আসার আশায় পথটী চেয়ে
মুখর ভুবন রইল নীরব—আস্‌বে তুমি কোন্ লগনে?

ধর্ম্মকথা

—*—

"ধর্ম্মকথা শুন্‌লে কি হবে? তার চেয়ে বরং কাজের কথা শুনলে কাজ হবে। কি করে দুটো পয়সা ঘরে আসে, সেইসব আলোচনা বরং কাজে লাগবে। যে যতই বল, আর যাই কর না কেন বাপু—রূপচাঁদ হলে ঘর আলো, মুখ আলো, বুক আলো, দেশ আলো, সব আলোময় হয়ে ওঠে! আর তা না হলে সব অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার—জগৎটা শূন্য-চোখে ধাঁধাঁ দেখতে থাকি। কি হবে তোমার কথা শুনে? ও তো আমিও কত জানি এবং বল্‌তে পারি! ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কত বড় বড় বচন ঝেড়ে গেছেন, তাতে কি ফল হয়েছে? জগতে কি কারও দায় কমেছে? জগতের দুঃখ দিন দিন বেড়েছে বই কমেছে কি? আমাদের অমনি তো দুমুঠো খাবার ঘরে নাই, তার উপরে এই সমস্ত ভেকধারীদের পাল্লায় পড়ে দেশটা তো উচ্ছন্নে যেতে বসেছেই—আমাদেরও নিশ্চিন্ত মনে দু'গ্রাস মুখে তুলবার যো নাই। ধর্ম্মের নামে দিন দিন কতই তো হচ্ছে, তাতে দেশের কি কাজটা হচ্ছে? বরং কতকগুলি বেকার শুধু বসে বসে খাচ্ছে, আর তাদের খাবার যোগাতে হচ্ছে তাদের যারা সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো পয়সা জোটাতে পারছে না। হবে না মশায়, ওসব দিয়ে কিছু হবে না! হবে বলে বোঝাতে পারেন কি?"

এই বলিয়া সরকারী উকীল মহাপ্রতিপত্তি ও প্রভূত সম্পদ্‌শালী ভৈরব বাবু স্বীয় বয়স্তের দিকে এবং দ্বারস্থ সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সন্ন্যাসী মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন—

"বেশ তো, এমনি করে যদি স্পষ্টভাষায় সংশয় ব্যক্ত করে বলতে পারেন, তবে কেন বোঝাতে পারব না? আমরা তো বোঝাতেই এসেছি। আপনি আমাদের পরিচিত, মঠ-আশ্রমগুলিরও যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন, তথাপি আপনার মনে যখন এই সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে, তখন এগুলি শুধু আপনার মনের সংশয় নয়—আপনার মত সমাজের বহু লোকেরই মনোভাব এইরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম দৃষ্টে এই ধরণের যুক্তিগুলিও খুবই সুযুক্তি বলে মনে হয়। বিশেষতঃ আপনাদের মত অভিজ্ঞ বহুদর্শী প্রৌঢ় হিন্দুর মুখে এই ধরণের কথা শুন্‌লে বিরুদ্ধবাদী, অজ্ঞ ও বিধর্ম্মীদেরও অনেক নূতন নূতন ধারণা মাথায় গজাবে। সরল বিশ্বাসে যারা আমাদের সদনুষ্ঠানে কিছুমাত্র সহায়তা করতেন, তাঁরাও বুঝে বা না-বুঝে হোক্ তবু অমুক বাবু যখন এই কথা বলেছেন, তখন একেবারে বেদবাক্য—এর নড়চড় কিছুতেই করব না—করতে দেব না বলে বদ্ধপরিকর হবেন। অবশ্য আমাদের কাছে ব্যাপারটা বুঝলে সে ধারণা ভাঙ্গতে বেশী দেরী হবে না; কিন্তু আমরা জানার পূর্ব্বে তাদের মাঝে অনেক কিছু হয়ে যাবে। তবেই বুঝুন, আমি গৃহত্যাগী সমাজের বাহভুক্ত, আপনি সমাজস্থ, সুতরাং আপনার দায়িত্ব কত বেশী; কিন্তু তা ভুলে গিয়ে সমাজকে বিপথে পরিচালিত করতে কত সাহায্য করছেন। আমরা সন্ন্যাসী—আত্মমুক্তির দরুণ ও জগদ্ধিতায় আমাদের জীবন, তাই আমরা আসি যেচে আপনাদের দুয়ারে—দুটো সত্যি কথা বুঝিয়ে দিতে। তাতে লাভ কি?

লাভ? আমাদের পক্ষে আপনাদের শ্রীমুখের

গালি। কোথাও বা তেমন গৃহস্থ হলে কিছু বলতে না বলতেই হয়ত রক্তচক্ষু ইত্যাদি। আর আপনারা যদি আমাদের কথাগুলি ভালভাবে শুনে একটু বিবেচনা করেন, তবেই বুঝতে পারেন যে, ঘরে ভাত না পেয়েই এই সমস্ত শিক্ষিত ভদ্র যুবক আপনাদের দ্বারে আসেনি। দেশের সমাজের যে অবস্থা, তাতে এর প্রতিবিধানকল্পে আপনারা য বৈশ্য ও ক্ষাত্র ভাবে সেবার ব্যবস্থা করতে দেশময় বিক্ষোভ তুলেছেন, আমরা সেই বিক্ষোভ নিবারণ করে ব্রাহ্মণভাবে সেবার পক্ষপাতী। দেশে ধন অমুক, দেশবাসী আত্মরক্ষণে সমর্থ হোক—আপনাদের মত আমাদেরও এটা অকাম্য নয়, কাম্যই বটে। কিন্তু আপনাদের চেয়ে আমাদের উদ্দেশ্য আর এক ধাপ এগিয়ে। আমাদের এই ব্রাহ্মণভাবে সেবার উপজীব্য হচ্ছে জ্ঞানদান। সে জ্ঞান এমন কিছু নয় যে, দেশময় বিক্ষোভ উঠবে। শীতের পরে বসন্ত আগমনের সময়ে যেমন বিক্ষোভ আসে না, ভগবানের অপূর্ব কৌশলে অতি ধীরে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়—আমাদের এই প্রণালীও তদ্রূপ ধীর কিন্তু অবশ্য ফলপ্রসূ। এখন আপনার প্রশ্নে আসা যাক।

"ধর্ম্মকথা শুনলে কি হবে" এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। পূর্ব্বেই বলেছি, জ্ঞান দানই আমাদের সেবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান বলতে শুধুই পারমার্থিক জ্ঞান নয়। ঐহিক নানা বিষয়ক জ্ঞানও বটে। লৌকিক জ্ঞানের ফল শুধু খ্যাতি লাভই নয়, অপরকে যথার্থ দিকে পরিচালিত করবার শক্তিও এই জ্ঞান থেকেই আসে। যে নিজকে যা বলে ভাবে, সে ঠিক সেই বস্তুই নয়; যথার্থ জ্ঞান তাই প্রত্যেকের নাই। এই যথার্থ জ্ঞান দিতে হলেই যে যে বস্তু, তাকে সেই তত্ত্ব জানিয়ে দিতে হবে। ধর্ম্ম কথাটার অর্থই হচ্ছে প্রাণ—যে জিনিষ দ্বারা আমরা বিধৃত, তাই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম বলতে কিম্ভূতকিমাকার একটা কিছু এমন ধারণা থাকলে চলবে না। আপনাদের ধর্ম্ম বলতে অমনি ধারণা রয়েছে বলেই ধর্ম্মকথায় ভয় পান। সেদিন রবিবারে "ধর্ম্মনীতি" সভার অধিবেশনের দিন সেখানে যেতে দেখি, সভায় মাত্র ৩।৪ জন মানুষ। প্রতি সপ্তাহের অধিবেশনেই নাকি এমনি লোকসংখ্যা 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠছে। এর কারণও এই ধর্ম্মের নামে জুজুর ভয়। আসলে বিষয়টা তলিয়ে বুঝলে কি এমন প্রাণহীনতা আসে?

ধর্ম্ম জিনিষটা শুধু যৌবন যথেচ্ছচারিতায় কাটাবার ফলে বৃদ্ধ বয়সের অনুতাপ মাত্র নয়—ধর্ম্ম শুধু চোখ উলটিয়ে ওপারের কথাই ভাবা নয়। মরণের পূর্ব্বে এপারের প্রত্যেক কর্ম্মেরও বিশিষ্ট ধর্ম্ম রয়েছে। বিশেষ করে ধর্ম্মের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক অবস্থার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম রয়েছে। কিন্তু এই সমস্তই হল লৌকিক ধর্ম্ম। পারমার্থিক ধর্ম্ম সব চেয়ে উচ্চ বলে ধর্ম্ম বলতে পারমার্থিক কথা বোঝাই এখন সার হয়েছে। তাই ধর্ম্মজীবন বলে জীবনের একটা ভাগকে বিশেষ করে জীবনীতে দেখানো হয়। কিন্তু "ধর্ম্মজীবন" কথাটাই এদেশের আমদানী নয়। বিলাতী Religious life এর অনুবাদ হচ্ছে ধর্ম্মজীবন। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মজীবন বলে জীবনের এমন কোনও বয়স নাই যে, সেই থেকে দশ-বিশ বা এত বৎসরকে ধর্ম্মজীবন অর্থাৎ শুধু ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য ব্যয় করতে হবে।

ধর্ম্ম মানুষের সারাজীবন ধরেই চলতে থাকে। শৈশব হতে মরণ পর্য্যন্ত যে বয়সের যেরূপ ধর্ম্ম, মানুষ তদনুযায়ী চলতে থাকে। কিন্তু মানুষ যেমন পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মও তেমনি পরিবর্ত্তনশীল।

আপনার যে শরীর শৈশবে ছিল, তা এখন নাই, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য ভেদে শরীর পরিবর্ত্তিত হয়ে বর্ত্তমান আকার ধারণ করেছে; তেমনি আপনার মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, অবস্থার ধর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, ধর্ম্ম যদি পরিবর্ত্তিতই হয়, তবে তা স্বভাববশেই হবে, না তার উপর কারিকুরি করা চলে? এখানে দুইরূপই দেখা যায়। সাধারণ জীবকুল প্রকৃতির প্রেরণায় স্বাভাবিক ধর্ম্মেই চলে। লোকে বলে—যার যা ধর্ম্ম। তাই ইতর প্রাণী বা মানুষের মাঝেও সাধারণ ইতর শ্রেণীর লোক স্বভাবের বশেই চলে। তাই এই সমস্তকে পশুপর্য্যায়ভুক্ত করা চলে।

কিন্তু আত্মচিন্তাপরায়ণ মানুষের পক্ষে এই ধর্ম্ম স্বভাব বশেই চলবে, এমন কথা নাই। তাঁরা ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন দ্বারা আপন খুসী মত সংস্কার গঠন ও ধর্ম্ম পালন করতে পারেন। এই জন্যই ধর্ম্ম কথার প্রয়োজন। ধর্ম্মকথা শুনলে মানুষ আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হবার সুযোগ পায়।

কাজের কথা শুনলে কাজ হয়, একথা ঠিক। তবে তার পূর্ব্বে এই বিচার প্রয়োজন যে, কোনটা কাজ আর কোনটাই বা অকাজ? এই বিচার করে যদি কথা শোনা যায় ব বলা হয়, তাহলে অনেক বাজে কথা শোনা বা বাজে কথা বলার বিরাম হয়ে ওই ধর্ম্মকথা শোনা, ধর্ম্মকথা বলা, আপন ধর্ম্ম কি তা জানা প্রভৃতিই বেড়ে চলবে। সুতরাং তাতে ভালই হবে, আমরাও তাই চাই। আমরা জানি, ধর্ম্মদ্বারা বিধৃত এই জগৎ; ধর্ম্ম ভিন্ন এক পাও চলার যো নাই। ইংরেজ তার ধর্ম্মানুযায়ী জগতে বড় হতে পেরেছে, আবার তার অধর্ম্মানুযায়ী অবনতি ঘটতে পারে। এক কথায় বলতে গেলে—

"ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্ বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥"

—ধর্ম্মের দ্বারা জগৎ সুরক্ষিত, ধর্ম্ম ধরাধারণকারী, ভুবনে ধর্ম্ম ভিন্ন কিছু নাই। এমন যে ধর্ম্ম, তাঁকে নমস্কার করি।

কাজ বলতে কি করে দুটো পয়সা ঘরে আসে, তাই অবলম্বন করাই যদি কাজ হয়, তবে অনেক কুকর্ম্ম করেও সাময়িক ভাবে বড়লোক অর্থাৎ ধনী হওয়া যায়। কিন্তু মজা এই যে, এত রকম চেষ্টা করেও অধর্ম্মোপায় অবলম্বনে যে অর্থ ঘরে আসে, তা সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিনাশের বীজ সঙ্গে নিয়ে আসে। আপাতদৃষ্টে সেগুলি লক্ষ্য না হলেও ধার্ম্মিকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে। তাই সে ভয় পায়—অন্যায় করতে গিয়ে ন্যায় ধর্ম্মের তীব্র শাসন মনে পড়ে। সে ধর্ম্মভীরু বলে লোক-সমাজে আখ্যা পায়। কিন্তু মানুষকে সে ভয় করে না—সে ভয় করে অধর্ম্মকে, ভালবাসে ধর্ম্মকে। তাই তার ধর্ম্মপথে অর্জ্জিত অর্থেরও অসদ্ভাব হয় না। ধর্ম্মের কথা শুনেও কি করে দুপয়সা ঘরে আসে, তা জানা যায়; বরঞ্চ তাতে হয়ত রাতারাতি বড়লোক হয়ে আবার একদিনে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় না। পাপের অর্থে পাপেই ভোগ হয়। অর্থকে পরমার্থে নিয়োগ করে চিরস্থায়ী করার দরুণ তাই ধর্ম্মকথা শোনার প্রয়োজন।

রূপচাঁদ অর্থাৎ টাকা না হলে জগৎটা অন্ধকার বা চাঁদমুখ কালো হয় যায় সত্য, কিন্তু ধার্ম্মিকের পক্ষে ওরূপ ভাব সাময়িক মাত্র। তাঁর অন্তরে যে দীপ্ত তেজ রয়েছে, বাইরে টাকার অভাবে তা ম্রিয়মাণ হয় না, সাময়িক অভাবে সে তেজকে আবৃত করে মাত্র। ধার্ম্মিকের মুখে ধর্ম্মের কথা যতটা হৃদয়স্পর্শী হয়, অপরের সে কথা জানা থাকলেও তাদের মুখে শুনলে তা হৃদয় স্পর্শ করে না। বড় বড়

বচন অনেকেরই জানা থাকতে পারে, কিন্তু জীবনে সে সব খাটাতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যা ও সমাধান তিনি পান, যে নিজের জীবনে তা অনুভব না করেছে, তার পক্ষে সে অভিজ্ঞতার আশা বৃথা। কাজেই বড় বড় কথা শুধু জানলেই হয় না। হৃদয়ের সঙ্গে লেগে গিয়ে যাতে সে সমস্ত কর্ম্মের মাঝে ফলিয়ে তুলতে প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে সাধুমুখে শাস্ত্র ও সাধুবাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ আবশ্যক।

পরের প্রশ্ন হচ্ছে, "ঈশা-মুসা শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি কত মহাপুরুষ এসে জীবোদ্ধারের জন্য কত চেষ্টা করেছেন, তাতে কি ফল হয়েছে—জগতের দায় দিন দিন বেড়েছে বই কমেছে কিনা? জগতে কি তাতে কারও দুঃখ কমেছে?" এর উত্তরে বলব, হাঁ, ব্যক্তিগত ভাবে নিশ্চয় অনেকের কমেছে। শুধু কমেছে কেন, তাঁদের কৃপায় তত্তৎপ্রদর্শিত পন্থায় চলে বহু সাধক ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি পেয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত আদি যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত কত শত ভক্ত, সাধক জ্ঞানী মহাপুরুষেরা দিয়ে গিয়েছেন ও দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে হয়ত আরও দিবেন। কিন্তু কয়জন ভাগ্যবান্ অধিকারী তাঁদের চিনে সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারে? তাই তাঁদের প্রদর্শিত পন্থাকে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য ও ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থাকে যাতে আমাদেরও অবলম্বনীয় বলে গ্রহণ করতে পারি, সেইজন্য আমাদেরও পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা তো করে গিয়েছেনই, কিন্তু আমরা যে এখনও গ্রহণ করতে পারিনি, তাই সে সব হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকথার আলোচনা সবারই প্রয়োজন। যোগ্য ব্যক্তির মুখ হতে সে আলোচনা শুনতে পারলে আরও ভাল হয়, লাভ হয়।

ঘরে আমাদের খাবার নাই কেন? আমরা মানুষ হতে পারি না বলে। মানুষের ধর্ম্ম যা, তাই যাতে আয়ত্ত হয়, আগে সেই পথ ধরতে পারলে, মানুষ হতে পারলে, ঘরে ভক্তের অভাব হবে না।

ভেকধারীদের পাল্লায় পড়ে দেশ উচ্ছন্নে গিয়ে থাকলে তেত্রিশ কোটী জনসংখ্যার মাঝে মাত্র ১৪ লক্ষ ভেকধারী নিশ্চয়ই অধিক শক্তিশালী। দেশ উচ্ছন্নে গেলে তাদেরই ক্ষতি—তারাই বা থাকবে কোথায়? সুতরাং তারা দেশকে উচ্ছন্নে তো দিচ্ছেই না, বরং তাদের পুণ্য ও তপস্যার জোরেই গান্ধীর মত তপস্বী নেতার আবির্ভাব হয়েছে। সকলের পিছনে আধ্যাত্মিক শক্তি যোগাচ্ছেন তাঁরাই। গান্ধীর গুরুও নাকি এক সন্ন্যাসী। শিবাজীর গুরু সন্ন্যাসী সমর্থ রামদাসকে কে না জানে?

গৃহস্থের মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের জীবন যেমনি, ছেলের জন্য পিতার জীবন উৎসর্গ তেমনি। আশা করি, এসম্বন্ধে আমাদের আর বেশী বলতে হবে না। এ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু আজ আর নয়।

সুবিবেক

—*—

ঘুম থেকে দেরীতে উঠ্‌লে যেমন কোন্‌ কাজটা আগে কর্‌ব, কোনটা পরে কর্‌ব, অতিব্যস্ততায় ঠাহর করেই উঠ্‌তে পারি না, সর্বদিকেই একটা বিশৃঙ্খলা লেগে যায়, তেমনি বহুকালের জড়ত্ব হঠাৎ ভেঙ্গে গেলেও একটা দিশেহারা ভাব এসে উপস্থিত হয়। বৃথা সময় নষ্ট করার দিকে তাকিয়ে তখন একটা নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত হয়, চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে হয়, কি সর্ব্বনাশই না করেছি এতকাল! এই সঙ্কটময় অবস্থায়, অতীতের অনুশোচনায় অনেকেরই চিত্তবিভ্রম ঘটে, তাহারা হয়ত অতীতের ক্ষতি সুদে-আসলে তুলতে গিয়ে, এমন এক অদ্ভুত কিম্বা অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে যে, পরিণামে সব পণ্ড হয়ে যায়। কাজেই অতীতের ব্যর্থতার দিকে হঠাৎ নজর পড়্‌লে, কিম্বা হঠাৎ মোহ ভেঙ্গে গেলে, একমাত্র আত্মস্থ ব্যক্তি ছাড়া সামাল দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। অজ্ঞানাবস্থার চেয়ে সজ্ঞান হয়ে অনেকে সর্ব্বনাশ করে আরও বেশী!

এ শুধু কল্পনার কথা নয়, বাস্তব-ক্ষেত্রেও এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যারা বিচার না করে, সাময়িক উত্তেজনায় এক আদর্শ ধরে বসে, এবং শেষে আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে না পারায় ফল-লাভে বঞ্চিত হয়, তাদের দুর্গতির আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। অশান্তির অনলে তাদের অহরহঃ জ্বলেপুড়ে মরতে হয়।

সর্ব্বত্রই ব্যবস্থিতচিত্ত থাকা চাই—আদর্শ গ্রহণ কর্‌বার বেলায় যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা প্রয়োজন (অর্থাৎ যে পথ ধরে চল্‌ব, সে পথে আমার কল্যাণ হবে কিনা, পথের কঠোরতা আমার শরীরের ধাতে সহ্য হবে কিনা ইত্যাদি), তেমনি আদর্শ পরিবর্ত্তনের বেলাতেও স্থির-ধীর বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন! ধাঁ করে কোন কিছু গ্রহণ করাও বিবেচকের কাজ নয়, তেমনি ধাঁ করে পরিত্যাগ করাও বিবেচকের কাজ নয়।

হঠাৎ জেগে উঠেই কোন কাজে লেগে যাওয়া অনুচিত। একটু শান্ত হবে, ধৈর্য্য ধরে ভেবে দেখ্‌তে হয়। বিশেষতঃ যে আদর্শের উপর জীবনের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, সে আদর্শকে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে নিজের সঙ্গে, নিজের সংস্কারের সঙ্গে, যতদূর দৃষ্টি যায়, বেশ ভাল ভাবেই বিচার করে নেওয়া প্রয়োজন। কাজেই ক্ষতি বুঝবার মত চেতনা থাক্‌লেই হল না, ক্ষতি-পূরণ কর্‌বার দরুণ আত্মস্থ হওয়ার শক্তি থাকা চাই! না বুঝে, সাময়িক মোহে হয়ত ভুল পথই কেহ কেহ ধরে বসে, কিন্তু সেই ভুল যখন ভেঙ্গে যায়, তখন আর তারা পথ পায় না, কি করবে, কি কর্‌লে অতীতের গ্লান অপসারিত হবে, তা আর ভেবে স্থির কর্‌তে পারে না। কাজেই অজ্ঞানীর মাঝে চেতনা সঞ্চার হলে, তারা এক অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে! কি অপব্যয় যে হয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি পড়েই তারা উন্মত্ত হয়ে উঠে, কিন্তু এই উন্মত্ততার দরুণ সব ব্যর্থ হয়।

অসময়ে যারা নিজেদের ভুল ধর্‌তে পারে, তাদের আর বাকী সময়টা শান্ত সমাহিত হয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করা চলে না, জেগেই অতীতের অপচয়টাকেই বড় করে দেখে আর এই নিদারুণ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দিয়েই তারা অস্থির হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে পড়ে। মোহ ভেঙ্গে গেলে, প্রথম সময়টা কেবল বিচিত্র দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত হয়—সাম্যাবস্থা সহজে আসে না। এই জন্যই আদর্শ পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে খুবই গভীরভাবে চিন্তার

প্রয়োজন, এই সময়ের চোট্ট তরলমস্তিষ্ক যাদের তারা সহ্য করতে পারে না। তরলমস্তিষ্ক ভাবুকেরা বরাবরই অপরের দেখাদেখিতেই মত্ত হয়।

বহুদিনের সঞ্চিত জড়ত্ব এবং মোহ ভেঙ্গে গেলে, চেতনার আতিশয্যে তখন উদ্ভট এক উন্মত্ততা আসে। বরঞ্চ নিদ্রিত হয়ে তারা থাকে ভাল—কারও অনিষ্ট করে না; কিন্তু জাগ্রত হয়ে মধুকৈটভের ন্যায় প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। কাজেই চেতনার অতিশয্যে অনেকেই আবার বিমূঢ়ও হয়ে যায়। তারা ঠিক করে উঠতে পারে না যে, কি করবে আর কি না করবে।

গলদ কোথায়, আবিষ্কার করাটাও কম কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু কেবল গলদ আবিষ্কার করলেই জীবনের উন্নতি হয় না। অনেকে নিজের দোষ ধরতে পারে, নিজের আদর্শের অপূর্ণতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু শক্তির অভাবে, বুঝে-শুনেও তাই নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। কাজেই ভুল বুঝবার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে, ভুল সংশোধনের পন্থাও আবিষ্কার করে নিতে হয়। নিয়তির নিয়ন্তা হবার শক্তিসামর্থ্য না থাকলে শুধু নিয়তিকে দোষ দিলে আর কি হবে? সমালোচনা করে, তার সংশোধনও করা চাই; তাই যদি না হয়, অনর্থক একটা সমালোচনারূপ উপদ্রব সৃষ্টি করে জড়গ্রস্ত মনকে উত্যক্ত করে তোলা কেন?

সর্ব্বত্রই নিজকে দায়ী মনে করলে, হঠাৎ যখন কারও প্রবর্ত্তিত আদর্শের প্রতি আস্থা ছুটে যায়, তখন সেই আদর্শ-প্রবর্ত্তনকারীর উপর বিতৃষ্ণা আসতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ব্যক্তিই দায়ী—কেননা মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে পরিচালিত করতে পারে না। যদি ভুল আদর্শই গ্রহণ করে থাক, তাহলে বুঝতে হবে, এই ভুলের প্রতিই তোমার আকর্ষণ ছিল, তুমি বুঝে-শুনেই সেই ভ্রান্ত আদর্শকে বরণ করেছিলে কাজেই দোষ অন্যের নয়—নিজেরই সুষ্ঠু বিচারের অভাব।

ক্ষতির দরুণ আক্ষেপ হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে যদি চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তো আর পুনরুন্নতির কোন আশাই থাকে না। কত ভুল ভ্রান্তি হবে, কিন্তু তাতে চিত্ত বিচলিত হলে তো চলবে না। স্থির চিত্ত নিয়ে পুনঃ পুনঃ ইষ্ট সিদ্ধির পথে ধাবিত হতে হবে। এতদিন যে কিছু হয়নি, তার সম্পূর্ণ দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপালে কি হবে? সর্ব্বত্রই তো তুমিই দায়ী! তোমার বিবেক বলে তো একটা কিছু আছে? আর যদি মূঢ়ের ন্যায় অন্যের আদর্শে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়ে থাক, তাহলেও তুমি তোমার অজ্ঞানাচ্ছন্নতার দরুণ দায়ী!

জাঁক-জমকের ভিতর দিয়ে অনেক অসত্য প্রবঞ্চনা বেশ দিব্য চলে যায়; বিশেষ নিবিষ্ট-চিত্ত নিয়ে বিচার করে না দেখলে, সহজে তা কারও চোখে ধরাই পড়ে না! আড়ম্বরের ভিতর অনেক সময় অসত্যেরও প্রশ্রয় থাকে—কিন্তু যথার্থ সত্যপিপাসুর কাছে সবই ধরা পড়ে যায়। কাজেই অপ্রিয় হলেও তাঁরা মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করে সবার মোহ দূর করে দেন! কিন্তু অসত্য, প্রবঞ্চনা, ভ্রান্তি ধরতে হলে নিজের মাঝে ওসব কুগুণ থাকলে চলে না। বরঞ্চ ভুল বুঝে, অপরকেও ভুল পথে সবার দরুণ প্ররোচিত করলে, নিজেরই সর্ব্বনাশ হয়। কাজেই নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টি ছাড়া, সমালোচনা করতে গেলে, তাতে কুফলই ফলে!

সর্ব্বত্রই সত্য-নিষ্ঠার ভাব থাকা চাই, ভুলভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলা যেরূপ অন্যায়, তেমনি নিজের ভুল ধারণার প্ররোচনায় সত্যকেও অসত্য বলে অবধারণ করা আরও মারাত্মক। সমালোচকের সত্যদৃষ্টি থাকা চাই সর্ব্বাগ্রে, তারপর সমালোচনার ক্ষেত্রে নেমে যথার্থ সত্য-অসত্য আবিষ্কার করে নিতে হয়।

গভীর চিন্তাশীল এবং আত্মস্থ ব্যক্তি ছাড়া যে কোন বিষয়েরই হোক না কেন, ভাল-মন্দ আবিষ্কার

করা অপরের দুঃসাধ্য। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা স্থির চিত্তের লক্ষণ নয়। অনেক সময় আদর্শ পরিবর্তন না করলে নিজের জীবনের অবনতিই হয়, কিন্তু আদর্শ পরিবর্তনের অগ্রে নিজের ভিতর গভীর-ভাবে আত্মস্থ হয়ে দেখতে হয় যে, ঠিক আমার প্রাণে কি চায়? যে আদর্শ ধরে চল্‌ছি, তাতে আমার প্রাণের আপ্যায়ন কিম্বা পরিপুষ্টি হবে কি না। যথার্থই সেই পরিপুষ্টির কোন উপায় সেই আদর্শের মাঝে খুঁজে না পেলে, সেই মৃত আদর্শকে ধরে নিজের মাঝেও মৃত্যুকে ডেকে আনাতে কি লাভ? কিন্তু একথা মনে রাখ্‌তে হবে, গ্রহণ বর্জ্জনের পূর্ব্বে খুব গভীরভাবে নিজের মাঝে সব তলিয়ে দেখতে হবে।

নির্ভীক, সাহসী, সত্যনিষ্ঠ ছাড়া কুসংস্কারকে কেহই নির্ম্মূল করতে পারে না। আর সবার প্রাণেই ভয় আছে—কেননা তারা তো নিজে বিচার করে চলে না, অপরের বিচারের দ্বারা পরিচালিত হয়। কাজেই নিজে কোন মাহাত্ম্য অনুভব কর্‌তে না পারলেও—অপরে যখন বল্‌ছে, তখন নিশ্চয়ই সে কিছু পেয়েছে তার মাঝে, এই বলে মনকে কল্পনার সাহায্যে পরিতৃপ্ত রাখে। কিন্তু এ মোহ, একদিন না একদিন ভাঙ্গেই! কেননা মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব বলে একটা জিনিষ রয়েছে।

প্রচলিত সংস্কারকে যারা প্রথমে এসে আঘাত করে, তাদের দুর্গতির সীমাপারসীমা নাই। এ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সত্যকথা বলেও এক মহা বিপদ, এমন কি জীবন নিয়ে পর্য্যন্ত টান পড়ে। কিন্তু যথার্থ সত্য-পিপাসু যে নির্ভীক, কাজেই তারা নীরবে আপন আদর্শানুযায়ীই চল্‌তে থাকে। একদিন সবাই আবার তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। তা বলে সত্য-পিপাসু কখনও গর্ব্বে উদ্ধত হয়ে উঠে না, তিনি জানেন, সত্যের আকর্ষণের চেয়ে বড় আকর্ষণ আর নাই। যে যেখানেই যে মায়াতেই ভুলে থাক না কেন, একদিন প্রত্যেকের চৈতন্য সঞ্চার হবে। তখন জন্মার্জ্জিত সংস্কারও মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হবে না।

আত্মচেতনার উন্মেষ হতে দেওয়াই, তার সাহায্য করাই যথার্থ সাহায্য। কিন্তু আত্মা জেগে উঠ্‌লে কি জানি কি করে বসে, এই ভয়ে যারা জড়-সড়, তারা কখনো হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তাদের দিয়ে এই সাহায্য হয় যে, বহুদিন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে, আরামে ঘুমে বেভুলা হয়ে থাকা যায়। ঘুম ভাঙ্গতে যাওয়াটা তারা অনধিকার প্রচেষ্টা বলে প্রকাশ করে। কেননা ঘুম তো একদিন ভাঙ্গবেই, কাজেই জেনে শুনেও ঘুমিয়েই দিনটা কাটিয়ে দাও আর কি?

সকলের দ্বারাই যথার্থ সত্য আবিষ্কার হয় না, সবাই সত্যদ্রষ্টার আসন লাভ কর্‌বার সৌভাগ্য পায় না, কিন্তু সততা পূর্ব্বক সত্যানুসন্ধান ইচ্ছা করলে সবাই কর্‌তে পারে। এখানেই একটুখানি চৈতন্য সঞ্চার হওয়া প্রয়োজন। নিজের বিবেককে জাগ্রত রেখে, প্রাণের অনিবার্য্য আকুলতা নিয়ে সত্যানুসন্ধান করাটা প্রচণ্ড আত্মাভিমানের পরিচয় নয়। অভিমানে মানুষের পতন হয়। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসুর যে আকুলতা, তা তো অভিমান-প্রসূত নয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত!

হঠাৎ এক উত্তেজনায় আদর্শ পরিবর্ত্তন করার চেয়ে, প্রাণ দিয়ে একটা কিছুকে ধরে রাখার মূল্য অনেক বেশী। যে এ উত্তেজনায় মনের মাঝে নৈরাশ্য উৎপন্ন করে, সেই উত্তেজনা প্রশান্ত হয়ে গিয়ে যদি একাগ্রতাতে পরিণত হয়, তাহলে বোধ হয় আয়োজনের কিম্বা আদর্শের অসম্পূর্ণতার দরুণ তেমন কিছু আসে যায় না, কেননা যে অসম্পূর্ণতাটুকু থাকে, তা আত্ম-শক্তি এবং একাগ্রতার ফলেই মিটে যায়। কাজেই মনের মাঝে দৃঢ়-বিশ্বাস উৎপন্ন করাই হল আসল সাধনা।

বিচার সর্ব্বত্রই প্রয়োজন, কেননা মানুষ অচেতন নয়, ভাল মন্দ বোধ মানুষের আছে। কিন্তু বিচার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, বীর্য্য এই সব

দৈবী-সম্পদ্গুলিও থাকা প্রয়োজন। এই শ্রদ্ধা এই বীর্য্য না থাকলে কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হতে পারে না। আবার জীবন দিয়া যাহা আঁক্‌ড়িয়ে ধরা যায়, তাহাতে সুফল না ফলে পারেই না।

কাজেই স্থির ধীর গম্ভীর বিচারশীল হওয়া চাই। প্রায়ই আমরা এক সংস্কার, এক মোহের হাত থেকে নিস্তার পেতে গিয়ে, অন্য মোহ কিম্বা অন্য সংস্কারে আরোও বেশী জড়িত হয়ে পড়ি। বরঞ্চ তখন আরও বিপদ বেশী—স্বেচ্ছায় আবিষ্কৃত পথের মোহ কিম্বা অসম্পূর্ণতা চোখে কিছুতেই লাগে না।

প্রতীক্ষা

—*—

কাতর প্রাণে তোমার পানে চাই,
দরশ আশে কাটাই যে গো কাল—
কোন্ লগনে আস্‌বে তোমার তরী
লাগ্‌বে ঘাটে নামিয়ে মোহন পাল।

আসবে কি গো
আস্‌বে কি সে দিন—
ধন্য হবে ব্যথার পরশ—
বাজ্‌বে হৃদয়বীণ?

সেদিন কত দূর—
ওগো সেদিন কবে হবে?
সকল চাওয়া স্তব্ধ করে
তোমায় চাব যবে!

নানান্ কাজে নানান আনাগোনা
বুকখানা যে ভগ্ন করে দেয়;
যে পথেতেই যাই না কেন তবু
সে পথ কি গো তোমার পানে নেয়?

বুকের মাঝে ব্যথার তুফান ওঠে,
নয়ন-কোণে শোকের অশ্রু জল,
পূর্ণ করে, হিয়ার কমণ্ডলু
রাখব তোমার ধুতে চরণতল!

সত্য কি গো
সত্য এসব বাণী?—
তোমায় চাওয়া ব্যর্থ নহে!
তাইত অবাক্ মানি!

উপায়-প্রত্যয়

—•—

একতত্ত্বাভ্যাস করতে হবে—জীবনটাকে একটা Principle-এ ঢেলে দিতে হবে। তা করতে হলেই চিত্তের কতগুলি সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে নিতে হয়। একতত্ত্বাভ্যাস করতে হলেই শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি সমাধি ইত্যাদি শক্তির বিচিত্র রূপ জাগাতে হবে, এগুলো এক তত্ত্বে পর্য্যবসিত হবে।

প্রথম কথাই হল শ্রদ্ধা (steady light of faith) জাগানো চাই। শ্রদ্ধা উদ্বোধিত না হলে উৎসাহ জাগতে পারে না। যোগ হল উপায়-প্রত্যয়, কাজেই প্রথমে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এসব উপায় দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করতে হবে। এই উপায়গুলি দ্বারাই প্রত্যক্ চেতনার অধিগম হইয়া থাকে। আর যোগের পক্ষে অন্তরায় যা কিছু আছে, সব দূরীভূত হয়।

মানুষের ভিতর সব শক্তিই রয়েছে, কিন্তু সবই জাগ্রত নয়। সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন চাই। শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি, সমাধি এ সব গুণগুলি সুপ্ত রয়েছে, আত্ম চেষ্টা দ্বারা তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে, তারা জাগলেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়, তা না হলে সব বিফল। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে, শ্রদ্ধা, বীর্য্য স্মৃতি এসব যেন একতত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়।

মন একাগ্র হলে—ইষ্টসিদ্ধি লাভ না হয়েই পারে না। কিন্তু মনকে একাগ্র করতে হলেই শ্রদ্ধা (Faith) বীর্য্য (Vigour) স্মৃতি (Unremitting exertion), সমাধি (Calmness and concentration), প্রজ্ঞা (Illumined heart) থাকা চাই। একসঙ্গে এতগুলি উপায় সহায় হলে তবে ইষ্টসিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে।

ভোজরাজের পাতঞ্জলটীকাতে শ্রদ্ধার অর্থ করেছেন—যোগ বিষয়ে চিত্তের প্রসাদ। যোগের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নামই হল শ্রদ্ধা। কাজেই প্রথমেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়া চাই। স্বাভাবিকই মন আত্মাকে জানবার দরুণ যোগযুক্ত হবে। যোগের প্রতি আপনিই একটা আন্তরিক টান অনুভব হবে! এই শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, জোর করে শ্রদ্ধা জাগানো যায় না, আর অন্যান্যগুলি চেষ্টাযত্ন দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রথমে চিত্তে শ্রদ্ধা থাকা চাই।

তারপর শ্রদ্ধা জন্মে গেলে তা হতে আপনি বীর্য্য উৎসাহ জন্মে। সেই বীর্য্য হতেই অনুভূত পদার্থের অবিস্মরণ হয়। অর্থাৎ বীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বীর্য্যহীনের স্মৃতি নিষ্প্রভ—অর্থাৎ তার লক্ষ্য স্পষ্ট নয়। বীর্য্যের মাঝেই ধারণক্ষমতা রয়েছে, অনুভূত পদার্থের স্মৃতি বীর্য্য না থাকলে স্পষ্টভাবে মনের মাঝে উদিত হয় না।

অনুভূত পদার্থের অবিস্মরণ হলেই, ইষ্টে তন্ময়তা বা সমাধি এসে পড়ে। কেননা ইষ্ট চিন্তার বিচ্ছেদ না ঘটলে বা তার মাঝে কোন বিরাম না পড়লে সহজেই সমাধি এসে পড়ে। এই সমাধি এলেই জ্ঞাতব্য-প্রবিবেক হয়। অর্থাৎ চিত্ত তখন ইষ্টের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ওঠে। চিত্ত যখন জ্ঞানালোকে প্লাবিত হয়ে যায়, তখন অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। উক্ত উপায়-প্রত্যয়ের এই হল শেষ পরিণাম! চিত্ত চঞ্চল, কাজেই একতত্ত্বাভ্যাসে সহজে তাকে নিয়োজিত করতে পারা যায় না। আবার একতত্ত্বে বিলীন না করতে পারলে—ইষ্টসিদ্ধিও হয় না। তন্ময়তা সহজে আসতে চায় না, আর তন্ময়তা না আসা পর্য্যন্ত চিত্তের চাঞ্চল্যও দূরীভূত হয় না।

যা চাওয়া যায়, তা মন-প্রাণ ঢেলেই চাইতে হয়. এরই নাম একাগ্রতা। একজেদী ছেলে মায়ের কাছে যা চায়, তা আদায় করেই করে। তার মাঝেও সেই জিনিষ লাভ করবার দরুণ, পর পর উপায়-প্রত্যয়গুলি জেগে উঠে। একজেদী ছেলে যা চাইবে, তা না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্য কিছু-তেই ভুলে থাকে না। মা তাকে কত বুঝান, কত লোভ দেখান, কিন্তু পলকের তরেও তার ইষ্ট বিষয়ে অবিস্মরণ হয় না। সে যা চায় তা তার হাতে এসে না পড়লে, সে কিছুতেই জেদ ছাড়ে না—এই তো তার বীর্য্য। একজেদ ছেলের মাঝে যোগের এই উপায়-প্রত্যয় বেশ সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু ছেলে তখন তা বুঝতে পারে না, অর্থাৎ তার মাঝে যে এই উপায়-প্রত্যয়গুলি ইষ্টসিদ্ধির দরুণ ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হয়ে উঠছে, একথা ছেলে বুঝতে পারে না। তবে একজেদী ছেলেকে দেখে যোগের এই উপায় প্রত্যয়-গুলি পর পর জাগ্রত হয়, তা বয়স্ক এবং সজ্ঞানী মানব বুঝতে সক্ষম হয়।

একজেদী ছেলের মতই পণ থাকা চাই, তা হলেই ইষ্ট-সিদ্ধি হয়। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের ভিতর সংশয়, বিশ্বাস এই সব দুর্লভ দৈবী সম্পদগুলি কমে আসে, এই জন্যই চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে পাওয়া যায়, একথা আর বয়স্ক ছেলে বিশ্বাস করে না অথচ প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে না বলেই কিন্তু সে যা চায়, তা পায় না। কিন্তু সরল শিশু তার বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রদ্ধা দ্বারাই অপ্রাপ্য জিনিষও আয়ত্ত করে নেয়!

চাইলে যে নিরাশ হতে হবে, একথা এক-জেদী সরল শিশু কিছুতেই বিশ্বাস করে না। সে শুধু এই জানে, যা যাইব, তা পাবই! এই শ্রদ্ধা বা দুর্লভ বিশ্বাস দ্বারাই জগতের সব আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান পড়ে মানুষের এই সব দৈব গুণগুলি ক্রমশঃই লোপ পেয়ে যায় কেন, তা বুঝি না। চিন্তা-ভাবনা দ্বারা, বড় কিছু অগ্রসর হওয়া যায় না, যদি না হৃদয়ে বিশ্বাসের আলোক প্রজ্জ্বলিত হয়ে না উঠে।

একাগ্র হতে পারলে, সর্ব্ব বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায়। শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থের ভিতর এই একাগ্রতা শক্তিই বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠে-ছিল, তিনি যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তন্ময় হয়ে দিবারাত্র অতিবাহিত করে দিতে পারতেন, তেমনি অন্যান্য যে কোন বিষয় নিয়েও দিবা-রাত্র তাঁর কোথা দিয়ে আসত যেত, তা তিনি খেয়ালই রাখতেন না। এক দিন নাকি একটা অঙ্ক মিলেনি বলে, সারা রাত জেগে বসে ছিলেন। অঙ্কের ফল মিলল, তবে তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন। সব কর্ম্মই ছিল তাঁর পক্ষে সাধনা—সব কাজেই তিনি মনের সমান একাগ্রতা ঢেলে দিতেন। এই জন্যই সব কাজ তাঁর এমন সুষ্ঠু এবং সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হত।

কার্য্যসিদ্ধির মূল উপকরণই হল—একাগ্রতা। এই একাগ্রতা জন্মে গেলে, আর কিছুই লাগে না—তখন সর্ব্ব কার্য্যেই সিদ্ধি। কিন্তু মনের এই একাগ্র শক্তি সহজে আয়ত্ত হয় না। মালিন্য সম্পূর্ণ রূপে বিধৌত হয়ে না গেলে—মনের মাঝে জোর আসে না, সঙ্কল্পকে স্থায়ী রাখা সম্ভবপর হয় না।

অনেক সময় আমরা না বুঝে, বিষয় আয়ত্ত করতে গিয়ে বাইরের কায়দা কানুনের উপরই বেমালুম জোর দিই, কিন্তু তাতে বড় কিছু এগোনো যায় না। আসল কথা হল মনের একাগ্রতা—এই একাগ্রতা না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। আর যার মন একাগ্র—সে সব কাজেই সহজে মনটাকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারে। এই জন্যই যে কোনও তত্ত্বই হোক না কেন, একাগ্র সাধকের পক্ষে অধিগত করতে বেশী সময় লাগে না।

আমরা মনটাকে এক বিষয়ে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারি না। অর্থাৎ আমাদের মাঝে বীর্য্যের অভাব, সেই জন্যই ইচ্ছাশক্তিও দুর্ব্বল। এক বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করে রাখ্‌তে পারলে সেই বিষয়ের তত্ত্ব আপনি এসে ধরা দেয়। কিন্তু মন হল পল্লবগ্রাহী, তার স্থিরতা নাই। আমরা চাই একটা কিছু পেতে, একটা কিছু চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে দেখ্‌তে, কিন্তু মন কতখানি সত্তায় হলে, কতখানি নিবিষ্ট হলে যে রস-ঘন মূর্ত্তিকে সন্দর্শন করা যায়, তার দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখি না। প্রাণের আকুলতার সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্য না থাক্‌লে, অভীষ্ট দেবতা রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। আর প্রত্যক্ষ একটা কিছু না দেখ্‌লে প্রাণ পরিতৃপ্তও হয় না। অনেক সময় ধ্যানে বাস, ক্ষণেকের তরে মনটা বেশ আনন্দ রঙ্গে আপ্লুতও হয়ে ওঠে, কিন্তু অক্ষত বীর্য্যের অভাবে সহজেই মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে আসে। আর কোমর বাঁকা হয়ে গেলে তো সবই গেল। তখন কেবল তন্দ্রাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ভাবের নেশা। তাতে আত্ম-ভোলা হয়ে থাকা যায়, কিন্তু আত্মতৃপ্তি মিলে না। এই জন্যই ভাবপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্যেরও সংযোগ হওয়া চাই, তাহলেই জীবন সত্তালাভে সার্থক হয়। শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থের মাঝে যেমন তীব্র সংবেগ (emotional element) ছিল, তেমনি আবার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি (Rational element) ইত্যাদিও ছিল ; এই জন্যই তিনি ভাবকে যেমন সংবরণ করতে পারতেন, তেমনি বিশ্লেষণও করতে পারতেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা বল্‌তে, ভাব এবং বীর্য্য উভয়েরই সমান সংযম। অনেকের জীবনই বীর্য্য অভাবে নিছক ভাবুকতায় পর্য্যবাসিত হয়। তাদের জীবনে কোন মৌলিকত্ব থাকে না। আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রদ্ধা, (আস্তিক্য বুদ্ধি) বীর্য্য এবং সমাধি—এই তিনটী দুর্ল্লভ রত্নেরই সমান প্রয়োজন। একটী বাদ দেওয়া মানে, এক দিকে অঙ্গহানি করে রাখা। এই তিনের সমন্বয় যিনি করতে পেরেছেন, তিনিই জীবনের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

অনেক সময় আমরা ভাবে আশাতীত রূপে মহান্ বস্তু পেয়ে ফেলি, কিন্তু বীর্য্য অভাবে তাকে সংরক্ষণ করতে পারি না। কাজেই সেই ভাবের মাধুর্য্যে সাময়িক আমাদের চিত্ত প্রবুদ্ধ হয়, কিন্তু আবার যেই সেই পূর্ব্ববৎ।

আত্ম সাক্ষাৎকারের যতগুলি উপায় বলা হয়েছে, তা একদিনেই লাভ করা যায় না। পর পর লাভ হয়। এই জন্যই হতাশ হতে নাই, বীর্য্য দ্বারা, উৎসাহ উদ্যম দ্বারা সর্ব্বদা চেষ্টাশীল হয়ে থাকতে হয়। ক্রমশঃ উন্মার্গগামী মনও প্রশান্তির পথে এগিয়ে আসে। তখন ইষ্টসিদ্ধি লাভ সহজেই হয়ে যায়!

যোগ—উপায়-প্রত্যয়। সকলেই এর অধিকারী। অলৌকিক প্রক্রিয়াগুলি বাদ দিয়েও, পাতঞ্জলে যে সব সার্ব্বভৌম উপদেশ সূত্র রয়েছে, তা প্রতিপালন করে গেলে, জীবন আধ্যাত্মিক রাজ্যে ক্রমশঃই উন্নত হতে থাকে। মৌলিক তত্ত্ব অবশ্য সবার দ্বারাই আবিষ্কৃত হয় না, কিন্তু যোগের যে সব হিতকর উপদেশ রয়েছে, তা প্রতিপালন করে গেলেও জীবন সার্থক হয়। একাগ্রতা নিয়ে যে কোন একটা সূত্রকে অবলম্বন করে সাধন করতে লেগে গেলে, সবাই তাতে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। আসল কথা হল মনের একাগ্রতা—বাইরের কসরৎ আয়ত্ত করতে বেশী সময় লাগে না। আর এই একাগ্রতা লাভ হয় বীর্য্য থেকেই। কাজেই সংযত ভাবে জীবন যাপন করলে, প্রত্যেকেই যোগের অনুপম অনুভূতি লাভ করতে সক্ষম হতে পারে।

উপদেশ

—•—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"আমার এ ইচ্ছা নয়, তোমরা সারাজীবন কেবল খাটুনী খেটেই মরবে। কর্ম চিত্তশুদ্ধির উপায়। কর্ম্ম না করলে জন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কারের পুঁজি কিছুতেই ক্ষয় হয় না। তারপর আমরা বাঙ্গালী জাতি, আমাদের ভাবের চেয়ে ভাবুকতাটাই বেশী। এই জন্যই আমি তোমাদের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মন-প্রাণকেও ভাবের উপযোগী সুদৃঢ় বলিষ্ঠ করে তুলতে বরাবর উপদেশ দিই। খাঁটী ভাবে মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত করে, আর ভাবুকতায় মানুষকে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয় শুধু। বৈদিকযুগে এত কঠোর নিয়ম-সংযমের বিধি ছিল কেন?—না, ব্রহ্মকে, বিরাটকে, ভূমাকে উপলব্ধি করতে হলে, সঙ্কীর্ণ মন-প্রাণ-বুদ্ধিকে উদার করতে হবে বলে। আর ব্রহ্মোপলব্ধির দরুণ অল্পে অল্পে দেহ-মন-প্রাণ উপযোগী হয়ে ওঠে। এত বড় বিরাট ভাব ধারণ করতে হলেও—দেহে-মনে-প্রাণে বজ্রদৃঢ় এবং হৃদয়ে সুকোমল হওয়া চাই। একসঙ্গে এই দুটো ভাবকে আয়ত্ত করা সুকঠিন।

আমার কাছেই অনেকে অনেকের অনুভূতির কথা বলে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়; শুনে আমিও আনন্দ পাই, কিন্তু দুঃখও হয় এই ভেবে যে, এইটুকু পেয়েই ওরা এত উল্লসিত হয়ে উঠছে, ওদের আধার এতেই অল্পে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! সাধনা দ্বারা দেহ-মনকে বলিষ্ঠ করে তুলতে পারলে বড় বড় ভাবকে হজম করা যায়—তা না হলে, ভাবকে ধারণ করতে না পেরে অনেকেই দিশেহারা হয়ে যায়। আমি এমন অনেককেই জানি, যারা নিজেদের অপবিশুদ্ধ আধারের দরুণ কৃপাকে হজম করতে না পেরে, শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই কর্ম্মের প্রতি তোমাদের এই জন্যই আমি এত জোর দিতে বলি।

অবশ্য সব ভাবের উপরই নির্ভর করে। কর্ম্মকে সাধনা বলে মনে করে নিতে না পারলে, সেই কর্ম্মে জীবনের উন্নতি হওয়ার আশা করা বৃথা!

তোমরা ভাবপ্রবণ, এই জন্যই বলি, কর্ম্ম করে তোমাদের স্নায়ুগুলিকে একটু শক্ত কর—দৃঢ় কর! ভাবকে আত্মগত করে নিতে পারলে তাই সুনিয়ন্ত্রিত শক্তিরূপে পরিণত হয়, আর ভাবকে আত্মগত করতে না পারলেই তা শুধু নিছক ভাবুকতারূপে মানুষকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ভাব পেলে মানুষ আত্মস্থ হয়, আর ভাবুকতায় মানুষ আত্মকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়।

শুধু উপদেশ হিসাবে আমি তোমাদের একথাগুলো বলছি না—এ আমার উপলব্ধির কথা—অভিজ্ঞতার কথা। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ কথাগুলোতে সকলের প্রাণকেই স্পর্শ করবে।

কর্ম্ম না করে, সাধনা না করে, যে যতই ভাব পেয়ে লাফিয়ে উঠ না কেন—সে ভাবের স্থায়িত্ব মোটেই নাই। তোমাদের জীবনের কতটুকুই বা তোমরা জান? তোমরা তো কেবল বর্ত্তমানের পুঁজি নিয়েই বড়াই কর। কিন্তু অব্যক্তভাবে তোমাদের মাঝে কোন্ কর্ম্মের বীজ রয়েছে, এবং তার ক্রিয়া যখন আরম্ভ হবে, তখন কোথায় যাবে তোমাদের কর্ম্মের গৌরবের অহঙ্কার—এ কথা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখলে, তবেই সব ভাবুকতা ছুটে যায়। ভাবুকতা নেশা মাত্র—এর নেশায় আত্মভোলা হয়ে মানুষ অজ্ঞানের পথেই ধাবিত হয়; কিন্তু ভাব নেশা নয়, তা জ্ঞানসমুজ্জ্বল, চেতনাদীপ্ত, তাতে আচ্ছন্নতা নাই, মোহ নাই। ভাব পেলে মানুষ—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" সমাহিত হয়ে আসে! কিন্তু তোমাদের মাঝে কয়জনের সে প্রশান্তির ভাব এসেছে? কয়জন অবিক্ষোভে সত্যের পথে চলতে পারছ?

মানুষের ভিতর স্বরাট্ আত্মা রয়েছে, কাজেই মানুষ চিরকাল দাস হয়ে থাকবে, এ কথা তো কিছুতেই সম্ভবপর নয়! কিন্তু সত্যিকার অনুভবের লাভ না হতেই মানুষ যখন ব্যর্থ স্বাধীনতার অভিনয় করতে যায়, তখনই মরণ আর কি? অহঙ্কারী বিমূঢ়াত্মা নিজেকে কর্ত্তা বলে মনে করা—পতনেরই কারণ। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এ অনুভব এত সহজে আসে না, এত জন্যই সন্ন্যাসের সাধনা। সন্ন্যাস নিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

জীবন সুস্থ-সবল-বলিষ্ঠ হোক্। তোমরা নির্ভীক প্রেরণাতে সত্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হও—এ আমারও আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার একান্ত প্রয়াস কি তোমাদের মাঝে জাগ্রত হয়েছে? তোমরা স্বাধীন হতে পারলে, তবেই না আমারও সন্ন্যাসের সার্থকতা, আমার উপলব্ধি যদি তোমাদের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে পরিপূর্ণরূপে ফুটে না উঠ্‌ল, তাহলে আমারও যে কত বড় দুঃখ, কত বড় জ্বালা! কারও জীবনকে কোনদিক দিয়ে চেপে রাখ্‌বার মত এত বড় পাপ আর দুনিয়ায় নেই—কিন্তু জীবনের বিকাশেরও একটা ছন্দ আছে, সুর আছে; কাজেই জীবনের উন্নতির একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথও রয়েছে! আমি চাই তোমরা পথ ধরেই—পথ উত্তীর্ণ হও।

"আমি জীবন্মুক্ত" এই বিশ্বাস যদি তোমাদের দৃঢ়মূল হয়ে থাকে, তাহলে আমি কর্ম্মের প্রলোভন দেখিয়ে তোমাদের বন্ধন দশায় ফেলব, এ অলীক কল্পনা তো আস্‌তেই পারে না। আমি চাই, তোমরাও জীবন্মুক্তি আস্বাদন কর। আমার শুদ্ধ বাসনা তোমাদের শুদ্ধ দেহকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করুক, আমরা সচেতন ইচ্ছা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুণ ও শক্তিরূপে তোমাদের মাঝে ফুটে উঠুক! আমি জানি, দিব্যভাবে কর্ম্ম কর্‌তে হলে আধ্যাত্মিক স্বরূপে ফিরে যেতে হয়, সেখানে মান-অভিমানের উগ্রতা থাকে না। সকল কর্ম্মের প্রেরণা সেই পরা-প্রকৃতি হতেই উন্মুক্ত হতে দাও! কর্ম্মের সাধনা রয়েছে। "অহং" কে বিসর্জ্জন দিয়ে, পরা-প্রকৃতিতে আশ্রয় কর্‌তে না পার্‌লে, কোন কর্ম্মই সুষ্ঠুভাবে হয় না।

আত্মসমর্পণের দিকে আমি এই জন্যই তোমাদের জোর দিতে বলি। সমর্পণের ভিতর দিয়েই জীবনে রূপান্তর আসে। শক্তির বিকাশ, সমর্পিত শুদ্ধ আধারেই হয়। জীবনটা সমর্পণের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে গেলে, ভাগবত ইচ্ছায় যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তা দ্বারা নিজের এবং জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। "অহংকে বিসর্জ্জন দিতে না পার্‌লে অন্তরে ভগবদিচ্ছার বিশুদ্ধ প্রবাহ বইতে পারে না। জীবনে এই সিদ্ধ অনুভূতি না পেলে, কিছুতেই জীবনের ঘোর ফিরে না। সমর্পণই দিব্য-জীবন লাভের একমাত্র পথ—নান্যঃ পন্থা!

নিষ্ক্রিয় জীবন—ব্যর্থ জীবন। কিন্তু আমি চাই কর্ম্ম করেও তোমরা নির্লিপ্ত থাক, নিরভিমান হও। আর এই একমাত্র উপায় হল সমর্পণের সাধনা। তোমরা নিজেদের দরুণ কিছুই কর্‌ছ না—সব শ্রীগুরুর প্রীত্যর্থে। কাজেই কর্ম্ম করে যে আনন্দ লাভ কর্‌ছ তোমরা, তা হল ইষ্টেরই আত্মিক তৃপ্তির বিশুদ্ধ অনুভব। কাজেই তাতে তোমরা নির্লিপ্ত হয়ে, আধ্যাত্মিক পথেই কেবল অগ্রসর হচ্ছ। যারা মনে প্রাণে সমর্পণের পথে চলেছ, তারা এই চলার মাঝেই সেই দিব্য অনুভবের আভাস পাবে। এই আনন্দে তোমরা আরও বিশ্বস্ত হবে, সমর্পণের মহিমায় চিরপ্রবুদ্ধ হবে।

তোমরা তো অবুঝ নও, সত্যলাভের দরুণ প্রাণ দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। বেশ তো আমার একথার মাঝে সত্যতা রয়েছে কি না, তা তোমরা পরীক্ষা করে দেখ না। সবাই না পার, অন্ততঃ পাঁচটী - সমর্পণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ কর। মন প্রাণ উজাড় করে দিয়ে এই সাধনায় লেগে যাও তো দেখি, দেখব তোমাদের জীবন দিয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি না! সাধনার বিচিত্র পথ রয়েছে, সবাই এক পথের যোগ্য না। কাজেই তোমাদের সকলকে দিয়ে আমি এক পথে সিদ্ধিলাভ করাতে চাই না। তার দরুণ এখানে যে কেউই থাকুক না কেন, আমি তাদের মন বুঝে তার পর সাধনার রীতি বলে দিই। সবাইকে আমি এখানে থাকৃতে বলি না, কেউ কেউ আমার উপদেশ নিয়ে অন্যত্র গিয়েও সুফল লাভ করেছে। কিন্তু এখানে যারা থাকৃতে চায়, তাদের প্রথমেই আমি বলি, বিশ্বাস এবং নিছক সমর্পণের সাধনা অবলম্বন করেই এখানে পড়ে থাকৃতে হবে। যারা থাকে এই বিশ্বাস নিয়েই থাকে। আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। আমি কাউকে জোর করে প্রবৃত্ত করাতে যাইনি, আর এ আমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ। এখানে যারা রয়েছে স্বেচ্ছায়, সমর্পণের পথে জীবন উৎসর্গ করবে বলেই; কাজেই কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না করে, নীরবে আত্মতৃপ্তি নিয়েই এখানে থাকৃতে হবে।

তোমাদের নিষ্কাম হতে হবে, হয়ত এ জীবনে সিদ্ধিলাভ নাও হতে পারে। একটা জীবন না হয় মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ বিসর্জ্জনই হল। সমর্পণের সাধনায় যারা সিদ্ধিলাভ করতে চাও—

তাদের নির্ভীক হতে হবে সকলের আগে! আদর্শকে আজীবন অক্ষুণ্ণ রাখবার দরুণ বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সাধনায় তন্ময় হয়ে যেতে হবে।

ব্যষ্টি ইচ্ছার বিলয় না হলে, সমষ্টি ভাগবত ইচ্ছার বিকাশ হতে পারে না। এই জন্যই তোমাদের বলি, তোমরা দেহে মনে প্রাণে নিরহঙ্কারী হও। "অহং"এর বিন্দুমাত্র গন্ধও যেন না থাকে। আর এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথও একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মসাধনা। এখানে যারা কর্ম্ম করছ, তারা বল তো দেখি, কর্ম্মের কোন আসক্তি তোমাদের মনে বীজস্বরূপ থেকে যাচ্ছে কি না? যদি বীজ থাকে, তাহলে জেনো, তোমাদের কর্ম্মের কোথাও না কোথায়ও "অহং"এর অভিমান ছাপমারা রয়েছেই।

সাহস না থাকলে সমর্পণ হয় না। জীবনকে স্বেচ্ছায় রূপান্তরিত হতে দেওয়া সকলের সাহসে কুলায় না। কেহ কেহ ভয় করে—এতে বুঝি আত্মবিলোপ ঘটবে। কিন্তু মুক্তাত্মার আশ্রয়ে যে বদ্ধ আত্মাও মুক্তির পথই শীঘ্র খুঁজে পায়। একথা কেহই মনে করে না। সমর্পণের লক্ষ্যই হল, আত্মার দৈবী প্রকাশের পথকে নির্ব্বিঘ্ন সুপ্রশস্ত করে দেওয়া। নিজের অহঙ্কার, অভিমান অর্থাৎ তামস প্রকৃতি হতে যা সম্ভূত, তাদের বিনাশ করা। যাদের মালিন্য বেশী, তাদের যোগ্য হতেও বেশী সময় নেয়।

আত্মানুভব আর আত্মাভিমান এই দুটো কথা এক নয়। এক পথ প্রশান্তির পথ, যোগের পথ, আর অন্য পথ উগ্র স্বেচ্ছাচারিতার পথ। সত্যলাভের পিপাসা যথার্থই যার ভিতর জেগেছে, তার প্রধান লক্ষণই হল সে বিনীত, তার ভিতর অনির্ব্বাণ আকুলতা।

তোমরা সত্যলাভ করবে বলেই আমরা এখানে রয়েছি। সত্যলাভের পিপাসা যাদের মাঝে জাগবে, তারা কি আমার প্রতি বিরূপ হবে? কেন আমি কি কারও যথার্থ আকুলতা বুঝি না? মুক্তির পিপাসা জাগলেও আমি তোমাদের কথার ছলায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করব? বরঞ্চ আমি তোমাদের সেই সুযোগ দেবার দরুণই অপেক্ষা করে বসে আছি। তোমরা চিত্তকে বিশুদ্ধ কর, যথার্থ সত্যের দীপ্তিতে তোমার অন্তর পুলকিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

অব্যক্ত ভাবে শক্তির ক্রিয়া অবিরামই চলছে! কিন্তু যারা শুদ্ধ দেহ মন-প্রাণ দিয়ে সেই শক্তির দিব্য বিকাশ ঘটাতে পারছ, তাদের মত ভাগ্যবান্ কয়জন আছে? সমর্পিত জীবনের গৌরবের সঙ্গে আর কোন গৌরবের তুলনাই যে হয় না। আমি তোমাদের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলে মনে করি। তোমরা সাহসী, নির্ভীক—একটা মহৎ ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করে তুলবার দরুণ তোমরা জীবন দান করেছ। চেতন হয়েও, তোমরা যে নিজ সঙ্কীর্ণ ইচ্ছাকে বলি দিয়ে, জীবনকে এক মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ গঠন করতে চেয়েছ, এতে শুধু তোমাদের সত্যনিষ্ঠাই বিঘোষিত হচ্ছে না, আমরাও এক এক সময় তোমাদের এই আত্মত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে যাই!

বিশ্বাস সহজে আসে না, তোমাদের মাঝে যারা এখনো আত্মসমর্পণের সাধনায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারনি, তাদের আমি বার বার সাবধান করে দিচ্ছি—এখানে থেকে তাদের কোন কল্যাণ হবে না। শক্তি বিকাশের ও শুভ ইচ্ছা স্ফুরণের সুযোগ দিতে হয়, সেই সুযোগ তোমাদেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে। বিশ্বাসহারা হয়ে সমর্পণের সাধনায় কোন দিন সিদ্ধি লাভ ঘটতে পারে না। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

(আশ্রম-সংবাদ

পশ্চিমবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে বিগত ১৮ই মাঘ রবিবার দিবস বর্দ্ধমান বিভাগীয় ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। অধিবেশনে আশ্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ হয় এবং অভাব অনাটন ও উপস্থিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

এই সম্মিলনীতে সারস্বতসংঘের তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং শ্রীমৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী ট্রাষ্টীদ্বয় ও মেদিনীপুর জেলা সদস্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি এবং হাওড়া জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।

২৩শ বর্ষ ২য় খণ্ড

চৈত্র—১৩৩৭

সমষ্টি সং ২৫১ ষষ্ঠ সংখ্যা

ভৃগুবল্লী

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—

উপনিষদ্ ব্রহ্ম-বিদ্যারই বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। এই ব্রহ্মকে বুঝাইতে গিয়া, এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া নানা কথা, নানা দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যে যেরূপ অধিকারী, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু তাহাকে সেই ভাবেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংশয় তাহাতেই মিটিয়া গিয়াছে। উপনিষদ্ এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই প্রশ্নোত্তরে পরিপূর্ণ।

বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করুন।" তাহাকে তিনি প্রত্যুত্তরে এই বলিলেন—"অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য এই সমুদায়ই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। তাহাকে বরুণ আরও বলিলেন—"যাঁহা হইতে এই প্রাণিসমূহ জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া যাঁহা দ্বারা জীবন ধারণ করে, এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় বা প্রবেশ করে, তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা কর—তিনিই ব্রহ্ম।"

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, এই তিনের মূলই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিষ্ঠান—নির্বিকার! ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই সৃষ্টি-স্থিতি—প্রলয় অবলীলাক্রমে ঘটিয়া যাইতেছে। কাজেই এই চঞ্চলতার, অস্থিরতার মূলে যিনি—বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ, বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই ব্রহ্মকেই জানিতে চেষ্টা কর। সকল রহস্যের সকল পরিবর্ত্তনের মূল এই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জান না বলিয়াই মৃত্যুর ছায়ায় আতঙ্কিত হইয়া উঠ, পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত দেখিয়াই ভাবী আশঙ্কায় কাতর হইয়া যাও। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে—বিশ্বসত্তার নিবিড়তম অনুভূতি লাভ করিতে পারিলে, আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কোন ভয় থাকে না। ব্রহ্মের—বিশ্ব-সত্তার কোন সময় অন্তর্ধান নাই। ব্রহ্ম চিরকাল আছেন—এই চিরজাগ্রত, চিরপ্রবুদ্ধ বিরাট সত্তার সঙ্গেই নিজকে বিলয় করিয়া দিতে হইবে। চক্ষু, মন, প্রাণ, বাক্য সব ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ হইয়া উঠিবে।

সঙ্কীর্ণ আমিরই মরণ আছে—কিন্তু বৃহৎ আমির মরণ নাই। সেই আমিই—ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জানা মানে, নিজেরই অক্ষয়, অমর আত্মার অনুসন্ধান পাওয়া। সেই বীর্য্যবন্ত অনুভব একবার লাভ করিতে পারিলে দধীচি ঋষির ন্যায় নিজের অস্থি দানেও কুণ্ঠা আসে না। সেই বীর্য্যবন্ত অনুভূতিই আত্মগত করিয়া নিতে হইবে। ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি নির্ভীক, তাঁহার প্রাণে ভয় নাই, আশঙ্কা নাই, জড়তা নাই, তিনি চির-জাগ্রত। ব্রহ্মবিদ্ বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া জীবন-ধারণ করেনা। তিনিই সকলকে সজীব-প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করেন—অতএব সেই ব্রহ্মকেই বিশেষভাবে অনুধ্যান কর।

ভৃগু তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া প্রথমেই তিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি; অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—

প্রথমেই সূক্ষ্ম অনুভূতি আসে না। ক্রমশঃ স্থূল হইতেই সূক্ষ্মে গতি হইয়া থাকে। তাই প্রথমেই ভৃগু দেখিলেন অন্ন না হইলে তো মানুষ বাঁচে না, অন্ন হইতেই মানুষের জন্ম, সেই অন্নদ্বারাই মানুষ জীবনধারণ করে, পরিশেষে অন্নেই প্রতিগমন করে। কাজেই অন্নই ব্রহ্ম। কিন্তু অন্ন-ব্রহ্মকে জানিয়াও ভৃগুর মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। ইহা হইতেই ব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ আছে—এই সন্দেহে পুনরায় তিনি পিতৃসমীপে গমন করিলেন। পূর্ব্ববৎ পিতৃদেব বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন্।"—তিনি তাহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন।

ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, নিজকেই তপস্যা করিতে হইবে। গুরুর উপদেশেই কেবল কাজ হয় না, সেই উপদেশকে তপস্যার ভিতর দিয়া, ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য করিতে হয়। তপস্যাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। তপঃপূত দেহেই ব্রহ্মানুভূতির দিব্যবিকাশ হয়। তপস্যা দ্বারা দেহ-মন সংস্কৃত হইলে, ব্রহ্মের বিমল বিদ্যুচ্ছটা আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। কাজেই আসল কথাই হইল তপস্যা—তপস্যা!

তপস্যা—আত্মশোধনের উপায়। আর আত্মশোধন হইয়া গেলেই ব্রহ্মের অজস্র কৃপারাশি বর্ষিত হইতে থাকে। তপস্যার ভিতর দিয়া, আত্মশোধনের পথ দিয়াই, ব্রহ্মের বিমল দীপ্তির বিকাশ। কাজেই তপস্যাই হইল ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান দ্বার। সেই ব্রহ্মকে—তপস্যা দ্বারাই জানিতে চেষ্টা কর।

ভৃগু তপস্যা করিলেন. তপস্যা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম। অন্ন হইতেও প্রাণ সূক্ষ্ম শক্তিশালী।

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি; প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপস্তপ্ত্বা—

প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ হইতেই প্রাণীর জন্ম, প্রাণদ্বারাই জীবন ধারণ হয়; এবং পরিশেষে প্রাণেই প্রতিগমন করিতে হয়।

চিত্ত যখন ধ্যানে তন্ময় হইতে থাকে, অনুভবও তত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। গুরু জানেন, যথার্থ শিষ্যের ক্রমোন্নতি হইবেই হইবে। কাজেই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের সমাধান শিষ্য নিজেই করিতে পারিবে। এই জন্যই ভৃগু বরুণদেব কেবল তন্ময় হইতে, ধ্যানপরায়ণ হইতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কেননা আত্মস্থ হইতে পারিলে, সকল সমস্যার সমাধান নিজের মাঝেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

ভৃগু প্রাণকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তিনি আরও গভীর ভাবে ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলেন, তাহার পর তিনি মনই যে ব্রহ্ম, এই অনুভূতি লাভ করিলেন।

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, মনসা জাতানি জীবন্তি; মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—

তপস্যার ভিতর দিয়া যতই আত্ম-শোধন হইতে থাকে, অনুভূতিও তত সূক্ষ্ম এবং গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন হয়। এই জন্যই ভৃগুদেব যতই তন্ময় হইতে লাগিলেন, ততই ব্রহ্মের সূক্ষ্মানুভূতি পাইতে লাগিলেন। আর মন যতই তন্ময় হইতে থাকে, ততই সে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। একবার অন্তর্মুখী হইতে পারিলে, স্থূল বিষয়ের দরুণ এই মনের বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকে না।

মনই ব্রহ্ম—এই অনুভবেও ভৃগুদেবের সম্যক্ তৃপ্তি আসিল না। তিনি আরও সূক্ষ্ম অনুভূতি পাইলেন—বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপস্তপ্ত্বা—

এক একটা কোষ অতিক্রম করিলে প্রাণের আকুলতা যেন আরও বাড়িয়া যায়, তাই ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সংবেগশালী সাধকের প্রাণ সত্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তৌষ্টিকের মত অর্দ্ধপথেই চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, যাহারা সত্যের পথ ধরিয়া চলিয়াছে—তাহাদের গতি ঊর্দ্ধমুখী। একটার পর আর একটা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভৃগুদেব অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষকে অতিক্রম করিয়াও নিশ্চেষ্ট হইতে পারিলেন না; তিনি আরও গভীর ধ্যানে তন্ময় হইলেন। এইবারের তপস্যার পর তিনি আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমনি প্রতিষ্ঠিতা। য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবানন্নদো ভবতি, মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন, মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥

—আনন্দ হইতেই প্রাণীগণের জন্ম, জন্মিয়া আনন্দ দ্বারাই প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে, এবং পরিশেষে আনন্দেই প্রতিগমন করে

এইবারের অনুভূতি—সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই। আনন্দ হইতেই সৃষ্টি, আবার আনন্দেই প্রলয়—ইহাই মহানন্দের লীলা।

আনন্দই যখন ব্রহ্ম, তখন আনন্দে স্থিতি হইলেই ব্রহ্মে স্থিতি। কাজেই সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতে হইবে—ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

এই ভার্গবী বারুণী অর্থাৎ ভৃগু কর্ত্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্ত্তৃক উক্ত বিদ্যা উচ্চতম হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত। উচ্চ হৃদয়যুক্ত না হইলে এই বিদ্যালাভ করা যায় না। ইহা উচ্চতম অধিকারীর জন্য উক্ত। যিনি এইরূপ ভাবে ব্রহ্মকে জানেন—তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্, অন্নভোক্তা হন। পুত্র, পশু,

ব্রহ্মতেজ ও কীর্ত্তি বিষয়ে মহান্ হন। অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মবিদ্ সব দিকেই মহত্ত্ব লাভ করেন, তাঁহার কোনদিকেই অপূর্ণতা থাকে না।

ব্রহ্ম—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। কাজেই এই পঞ্চকোষেই ব্রহ্ম অনুস্যূত। ব্রহ্মের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র। কোথায়ও তাহার অব্যাপ্তি নাই। তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানা যায় না। এইজন্যই ভৃগুদেব এক এক কোষ অতিক্রম করিয়া, তাহার পর সম্যক্ অনুভূতি লাভ করিলেন। ব্রহ্ম কেবল অন্নময় নন্, প্রাণময় নন, মনোময় নন, বিজ্ঞানময় নন্, আনন্দময় নন্—তিনি সব কোষের সমষ্টি। কাজেই যুগপৎ সমষ্টির অনুভূতি লাভ করিতে না পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান পরিপূর্ণ হয় না।

এই ভার্গবী বারুণী বিদ্যার মাঝে একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় রহিয়াছে। ভৃগু যত বার বরুণদেবের নিকট এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের দরুণ উপস্থিত হইয়াছেন, ততবারই বরুণদেব কেবল তপস্যার কথাই বলিয়াছেন। এই তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তপস্যা দ্বারা তপ্ত হইয়াই ভৃগুদেব ব্রহ্মানুভূতির এক এক স্তর পার হইয়া গিয়াছেন।

তাপ চাই, তপস্যা চাই—তাহা না হইলে চিত্তের মালিন্য এবং ক্লেদ অপসারিত হয় না। চিত্তের মালিন্য অপসারিত না হইলে অনুভূতির মাঝেও স্পষ্টতা আসে না। এইজন্যই চিত্তে ক্রমশঃ উন্নতির দরুণ বরুণদেব কেবল তপস্যার কথাই বলিয়াছেন। তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সব আয়ত্ত করিতে পারা যায়। এই তাপই সাধনা, এই তাপই সংবেগ, এই তাপ দ্বারাই নিজকে তপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

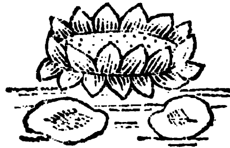
চিত্ত যতই সূক্ষ্ম এবং আবেগসম্পন্ন হইবে, জীবন ধারণের অবলম্বনও ততই সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী হইয়া আসিবে। তা দেখি, ভৃগুদেব প্রথমতঃ মনে করিলেন, অন্নই ব্রহ্ম—অন্ন না হইলে বুঝি প্রাণ বাঁচে না। তারপর দেখিলেন, অন্নের চেয়েও প্রাণ বড়, প্রাণ হইতে মন বড়, মন হইতে বিজ্ঞান বড়, বিজ্ঞান হইতে আনন্দ বড়। শেষে বুঝিলেন, আনন্দই চরম, আনন্দ না হইলে মানুষ বাঁচিতেই পারে না। না খেয়েও বাঁচা যায়, কিন্তু আনন্দ না হইলে বাঁচা দায়! কাজেই আনন্দই ব্রহ্মের চরম অবস্থা!

ব্রহ্ম নিছক্ আনন্দকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছেন। আনন্দে অবস্থান করিয়াই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করিতেছেন। আনন্দই ব্রহ্মের

প্রাণ। এই প্রাণই জীবে সঞ্চরিত। ব্রহ্ম যখন আনন্দিত হন—তখনই প্রাণের বিদ্যুৎ সঞ্চরণ। সৃষ্টির মূল কথাই হল আনন্দ—প্রাণ!

স্থূল অন্নকেই ব্রহ্মে—আনন্দে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। তখন অন্নের সূক্ষ্ম অংশেই পরিতৃপ্ত! অন্নের সূক্ষ্ম রূপান্তরই আনন্দ। নিছক্ আনন্দ নিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়। কেননা আনন্দই যে প্রাণ। আনন্দে থাকিতে পারিলে স্থূল বাহ্যিক উপকরণ অনেক কমিয়া যায়। নিরানন্দ হইয়া মানুষ বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। স্থূল অন্নে মানুষের আয়ু বাড়ে না। আনন্দেই মানুষের আয়ু বাড়ে। সেই আনন্দ অন্নেরই সূক্ষ্ম অংশ হইতে উৎপন্ন। সংযত এবং তপঃপরায়ণই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে।

আনন্দেই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ। কাজেই তপস্যা দ্বারা স্থূল ভোগ-তৃষ্ণাকে সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ তৃষ্ণাতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন সাধক নিছক্ আনন্দ নিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। অন্নে প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে ব্রহ্ম আছেন বটে, কিন্তু আনন্দেই ব্রহ্ম পূর্ণ; কাজেই নিম্নের ঐ চারিটী কোষ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেই তবেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।



প্রাণবন্ত ধর্ম্ম

—:*:—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ জাতির আজ এ দুর্দ্দশা কেন! ইহাতে স্বতঃই মনের মাঝে একটা খট্‌কা লাগিয়া যায়। তাহা হইলে কি বলিব, গীতার বাণীর কোন সত্যতা নাই, মহাপুরুষদের মুখ হইতে নিঃসৃত বাণীর কোন তাৎপর্য্য নাই? অথচ হাজার হইলেও অনুভবের বাণীকে—সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম্ম যে মানুষকে মহদ্‌ভয় হইতে পরিত্রাণ করে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি আজ আমাদের এত দুর্দ্দশার কারণ এই যে, আমরা আসল ধর্ম্ম কি তাহার সম্বন্ধে অচেতন সংজ্ঞাহীন। আমরা ধর্ম্মের নাম করিয়া বাঁচিয়া আছি বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্ম আমাদের প্রাণদান করে না। ধর্ম্ম করিয়াও আমরা ক্ষয়ের পথে চলিয়াছি। ধর্ম্মের কুসংস্কারে আমাদের ভয়ের সীমা-পরিসীমা নাই! ধার্ম্মিক কোথায় নির্ভীক হইবে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি লাভ করিয়া মেরুদণ্ডে দুর্ব্বলতা-রই সঞ্চার হইতেছে। কাজেই আবার আমাদের সেই ধর্ম্মকেই লাভ করিতে হইবে, যে ধর্ম্মের স্বল্প অনুভূতিতেও মহদ্‌ভয় বিদূরিত হয়। কি জন্য ধর্ম্ম করিয়াও দিন দিন আমাদের অবনতি হইতেছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। আবার সেই মহান্ সত্যধর্ম্মের আশ্রয় নিয়া প্রাণবন্ত বীর্য্যবন্ত হইয়া উঠিতে হইবে। আমরা সেই প্রাণের ধর্ম্ম, প্রাণের অনুভূতি হইতেই বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, তাই প্রাণবন্ত ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়া যে প্রাণহীন ঐশ্বর্য্যের অভিনয় দেখাইতেছি, তাহাতে আমাদের মৃতপ্রাণ আরও ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! এই অবসন্নতায় আমাদের জীবনীশক্তির আরও অপচয় হইতেছে। কাজেই প্রাণবন্ত জাতির সঙ্গে অবসাদ নিয়া আমরা কি করিয়া পারিয়া উঠিব! আমাদের একমাত্র উদ্ধারের উপায়ই হইল সেই ধর্ম্মের, প্রাণের শরণাপন্ন হওয়া। সেই প্রাণের উদ্দীপনে, ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়াও অজস্রভাবে আত্মপ্রকাশই হয়; ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে প্রাণশক্তি বিন্দুমাত্র মলিন হয় না। কাজেই আমাদের আবার প্রাণবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে।

ধর্ম্মের অনুভূতি আমাদের অস্থিমজ্জায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে, কাজেই সত্যধর্ম্মকে পুনঃ আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। তবে কিনা সঞ্চিত কুসংস্কারকে ধ্বংস করিতে হইলে একটু নির্দ্দয় হইতে হইবে, নির্ম্মম হইতে হইবে। ভণ্ড আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে আত্মচৈতন্যের প্রখর দীপ্তিতে বিলোপ করিয়া দিতে হইবে। যাহাতে প্রাণ উল্লসিত হয়, শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা হুবহু মিলিয়া যায়, তাহার প্রতিই সবিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। কাজেই প্রাণশক্তির উদ্দীপক উপকরণ ছাড়া, আর সবকেই অস্বীকার করিতে হইবে, প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

ধর্ম্মের নামে আজ অজস্র কুসংস্কার রাহুর মত আমাদের কবলিত করিয়া ফেলিতেছে। ধর্ম্ম নাই বলিয়াই, প্রাণ নাই বলিয়াই, নির্ব্বিবাদে আমরা আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছি। শক্তিহীনের কোথা-য়ও পথ নাই, সবদিকেই সে নিরুপায়। কাজেই ধর্ম্ম করিয়া দুর্ব্বল দিন দিন অধঃপতনের চরম সীমায়ই নামিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজ আবার চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। প্রাণে একটা নিদারুণ অস্বস্তি আসিয়া পড়িয়াছে! অনেক দিন ধরিয়া সংক্রামক দুর্ব্বল ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে

আজ ভণ্ড-আধ্যাত্মিকতার উপরও স্বাভাবিকই একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। এখন প্রাণ যথার্থ সত্যের আশ্রয় লইবার দরুণই একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই চারিদিকে বিপ্লবের ঢেউ উঠিয়াছে। প্রাণে একটা নিদারুণ জ্বালা আসিয়াছে, কিন্তু বহু দিনের অনভ্যাসের ফলে প্রাণবন্ত ধর্ম্মকে কোন পথে সহজে লাভ করা যায়, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু পথ না জানিলেও, প্রাণের উদ্বেগ তো থামিবার নয়, কাজেই সবদিকেই প্রথমে একটা কোলাহল, উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই উত্তেজনার অন্তরালে একটা শুভ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আবার সেই সত্যধর্ম্মের আশ্রয় পাইবার দরুণই মানুষ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মলাভ করিবে বলিয়াই আজ মানুষ উন্মত্ত—পাগল, কাজেই এই প্রলয়ের মধ্য দিয়াও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছারই বিকাশ হইবে। কেহই আজ প্রাণহীন সাধনার প্রণালীতে ভুলিতে পারিতেছে না। এই সেই দিনও বিবেকানন্দ এই সংশয় লইয়াই পরমহংসদেবকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ঠাকুর, তুমি যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর, ইহা তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি নয় তো? তুমি কি আমাকে ধর্ম্মলাভ করিয়ে দিতে পার?" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাস্তবিকই বিবেকানন্দকে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের উদ্দীপনায় বিবেকানন্দের ভিতর বিবেকানন্দ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিবেকানন্দই পাশ্চাত্য জগৎকেও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই ধর্ম্ম মানুষকে নির্জ্জীব করে না, ধর্ম আধ্যাত্মিক মহাশক্তি—এই শক্তিকে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়। তাহাতে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই প্রাণ-সঞ্চরণ প্রণালীতেই যথার্থতঃ ধর্ম্মের উদ্দীপন হয়, তখন আর এত উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কাজেই ধর্মই—প্রাণই মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। যাহার কাছে গেলে সেই সজীব প্রাণের পরশই পাওয়া যায়, তিনিই গুরু। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের চরণতলে এই জন্যই লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বাহ্যিক কোন অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াই দায়মুক্ত হন নাই—তিনি তাঁহার ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আসল বিবেকানন্দের উদ্বোধন হইল, তখন সেই বিবেকানন্দই হইলেন ধর্ম্মাচার্য্য। কাজেই আসল ধর্ম আর কিছুই নয়—প্রাণশক্তির সঞ্চার। এই প্রাণকে, ধর্ম্মকে সঞ্চারিত করিতে পারেন যিনি—তিনিই আচার্য্য, তিনিই গুরু।

বাস্তবিকই স্বল্প ধর্ম্ম দ্বারাই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মের অমোঘ শক্তি, প্রাণবন্ত জাতি প্রাণবন্ত ধর্ম্মকেই লাভ করে। এই জন্যই প্রাণবন্ত জাতির ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। এককালে আমাদেরও ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু প্রাণহীন হইয়া পড়ায়, ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ায় আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। আমাদের ভণ্ডামী আমরা নিজেরাই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি। ইহাতেই সংস্কার হইবে—আবার আমরা সেই সত্যধর্ম্মের আশ্রয় নিয়া প্রাণবন্ত জাতি হইয়া উঠিতে পারিব। আমাদের অস্থি-মজ্জায় সেই সত্যধর্ম্মের অনুভূতি এখনো একেবারে লোপ পায় নাই, সেই প্রাণবন্ত অনুভূতির কথা কিছুতেই ভুলিবার নয়; এই জন্যই আবার প্রাণে আকুলতা আসিয়াছে, স্বভাবে ফিরিয়া যাইবার দরুণ সকল দিকেই আয়োজন উদ্যোগ চলিয়াছে।

ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করিতেছে না, ধর্ম্ম আমাদের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে না, বরঞ্চ আমরাই দুর্ব্বল-ধর্ম্মকে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখিবার দরুণ তিলে তিলে মরিতেছি। এই মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহাদের মত অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন

জীব কি আর জগতে আছে? এখনো মানুষ সেই কুসংস্কারকে জড়াইয়া ধরিয়াই মরিতে চায়—ইহাতেই যেন তাহাদের তৃপ্তি। কিন্তু মুখে বলিলে কি হইবে, প্রাণের জ্বালা সময় সময় আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিষ্ঠাবানের অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত মুখখানা দেখিয়াই তাহার নিষ্ঠার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। জানিয়া-শুনিয়া যে তিল তিল করিয়া মরা, এর মত নিদারুণ অভিশাপ আর নাই। আমরা যাহাকে নিষ্ঠাবান্ বলি—তাহার আজ এই দশা। তাহার প্রাণে শান্তি নাই, তবুও সে লোকে কি ভাবিবে, লোকে কি বলিবে, এই ভয়ে ভয়ে ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করিয়া চলিয়াছে।

টীকা-টিপ্পনী লিখিতে পারিলেই ধর্ম্মের স্বরূপ আবিষ্কার হয় না। ধর্ম্মের মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পাণ্ডিত্যবুদ্ধি লইয়া কেবল কতকগুলি অযথা শ্লোক কিম্বা ভাষ্য রচনা করিলেই চলে না। ধর্ম্ম আত্মানুশীলনসাপেক্ষ। এই জন্যই বুদ্ধদেব এত সব শাস্ত্র পুরাণ থাকিতেও, নিজেই আত্মধ্যানে বসিয়া গেলেন। নিজের মাঝে গভীরভাবে তলাইয়া গিয়া তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইলেন, সেই সত্যদ্বারাই বিশ্বমানবের প্রাণ ধর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। কাজেই আসল ধর্ম্মের মূল কোথায়, তাহা জানিতে হইলে নিজকেই আত্মধ্যানে নিরত হইতে হইবে।

সত্য সূত্রে কিম্বা ভাষ্যে নাই, সত্য রহিয়াছে আপন হৃদয়ের অন্তঃস্তলে। সেই জন্যই সত্যলাভ করিলে শাস্ত্রের ভিতরও একটা নূতন অর্থ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। যুগে যুগে মহাপুরুষরা, সিদ্ধ মহাজনেরা আপন অন্তরের সত্যালোকেই শাস্ত্রের, পুরাণের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে হইলে যে আত্ম নিরত-স্তব্ধ ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাহাই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আর গভীরভাবে তলাইয়া যাইতে না পারিলে চরম সত্যের সন্ধানও সহজে আবিষ্কার করা যায় না।

ধর্ম্ম হইতে, প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নমুণ্ড ছাগপশুর ন্যায় যতই উল্লম্ফন করি না কেন, তাহার স্থায়িত্ব ক্ষণকাল। কিছুক্ষণ পরেই প্রাণশক্তির অভাবে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইতে হইবে। কাজেই যথার্থ ধর্ম্মের স্বরূপ না জানিয়া, কেবল অনুষ্ঠানাদি করিয়া প্রাণের যে ক্ষণস্থায়ী সামর্থ্যের অভিনয় দেখাই, তাহার মূল্য কতখানি তাহা একটু নিবিষ্ট চিত্ত হইলেই ধরা পড়িয়া যায়।

আমাদের অধঃপতনের মূল কারণই হইল—আমরা সেই ধর্ম্মের, প্রাণের অবিচ্ছিন্ন ধারা হইতে নিজেদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। জীবন যাহাকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হয়, বর্দ্ধিত হয়, সেই ধর্ম্মকেই আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি। বাঁচিতে হইলে আবার সেই ধর্ম্মের স্বরূপই আমাদের আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

কুসংস্কারের ছাপ প্রায় সকলের চিত্তকেই কলুষিত করিয়া দেখিয়াছে, কাজেই যথার্থ ধর্ম্মের স্বরূপ আবিষ্কারের পথ বলিয়া দিবার লোকও আজকাল বিরল। তাহা হইলেও নিরাশ হইবার কিছু নাই—যে প্রাণে আকুলতা আসিয়াছে, সেই প্রাণেই আকুলতা নির্ব্বাণের উপায় রহিয়াছে। আমাদিগকে কেবল আত্ম-নিরত হইতে হইবে, তাহা হইলে নিজেরাই ধর্ম্মের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া লইতে পারিব।

ধর্ম্মের পরশ—আমাদের প্রাণশক্তিরই উদ্দীপন। প্রাণ মরিয়া গেলে বুঝিতে হইবে, ধর্ম্মের মাঝেও ঘুণ ধরিয়াছে। কাজেই সেই ধর্ম্মমোহকে অতিক্রম করিয়া সত্যধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে। প্রাণকে মারিয়া, প্রাণকে নির্জ্জিত করিয়া যে ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করিতে হয়, সেই ধর্ম্ম মানুষের প্রাণশক্তিকে ক্ষয় করিতেই জানে, মানুষের প্রাণ তাহা

তেও পুষ্ট হয় না, সজীব হয় না। যে পথে গেলে মৃত্যু অবধারিত সেই পথ হইতে বিমুখ হইয়া জীবন লাভের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।

ধর্ম্ম অবিদ্যা নয়—ধর্ম্ম বিদ্যা। কাজেই ধর্ম্মের দ্বারা অমৃতই লাভ হয়। মরণের দিন ঘনাইয়া আসিলেই বুঝিতে হইবে, অবিদ্যার প্রশ্রয় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যার অনুশীলনে ধর্ম্মের অনুশীলনে মানুষের আয়ু, বল, উৎসাহ, উদ্যম ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আয়ু, বল, উৎসাহ উদ্যম যদি কমিয়া যায়, অথচ ধর্ম্ম কেবল নামে ধর্ম্ম হিসাবে থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম-দ্বারা জাতির কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

ধর্ম্ম—জীবন্ত অনুভূতি। তাহাতে অনেক সময় পুঁথির বচনের সঙ্গে অমিলও হইয়া যায়। তাই বলিয়াই কি যথার্থ অনুভবকে অস্বীকার কিম্বা অবজ্ঞা করিতে হইবে? যথার্থ অনুভবের মাঝে স্বাভাবিকই একটা প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্যই ধার্ম্মিক ব্যক্তির স্বাভাবিকই একটা প্রভাব জন্মে। তাহাদের সেই সজীব অনুভূতির প্রেরণায় আশেপাশের সকলেই উদ্বুদ্ধ সচেতন হয়ে উঠে।

প্রাণের ধর্ম্মই হইল বিকাশ। কাজেই তাজা প্রাণের অফুরন্ত শক্তি নানা কর্ম্মে, নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু এই মুখ্য প্রাণই যখন থাকে না, তখন আর সবই ব্যর্থ। আয়োজন আড়ম্বরের মাঝেও কেমন যেন একটা নিরুৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা ধার্ম্মিক জাতি—এই বলিয়া গৌরব করিবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু অতীতের গৌরব নিয়াই তো বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করা যায় না। সেই গৌরব বজায় রাখিতে হইলে আবার সেই প্রাণের পরিচয়ই দেখাইতে হইবে। প্রাণশক্তি উদ্দীপন না হইলে, শুধু মুখের কথায় কোন কাজ হয় না।

মূঢ় সংস্কারে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতের দিব্য সাধনার সন্ধান পাইবার দরুণ সকল দিকেই প্রস্তুতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই যে সচেতন ভাব, সকলের প্রাণেই যথার্থ ধর্ম্মের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা, ইহাতেই আবার আশার সঞ্চার হইতেছে। যে পর্য্যন্ত সেই সত্য ধর্ম্মের আবিষ্কার না হয়, সেই পর্য্যন্ত আমাদের আত্ম-ত্যাগ, আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াই যাইতে হইবে। তারপর নিশ্চয়ই একদিন আমরা ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারিব। তখনই বুঝিব—"স্বল্পমপি অস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই কথার তাৎপর্য্য কি।



আশ্বাসের কথা

"মহাশয়, আজ আপনার আগমনে আমাদের এই "ধর্মনীতি" সভা উপকৃত হইল। কিন্তু আমরা হইলাম সংসারী লোক, এই মাত্র যে সমস্ত সদুপদেশ ও উচ্চাঙ্গের আলোচনা হইয়া গেল, কিছু ক্ষণের মধ্যেই সাংসারিক চিন্তাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সে সমস্তই ভুলিয়া যাইব; সুতরাং, এই শুষ্ক মরুভূমিতে বারিবিন্দুসেচন মোটেই ফলোপধায়ক হইয়া উঠে না। আর সারা জীবনই এমনি করিয়া কাটিল, এখন বার্দ্ধক্যের ভাঙ্গা শরীর লইয়া পড়িয়া আছি। ইহাদ্বারা আর কিই বা করিতে পারিব! এ জীবন এমনি গেল, কিছুই করা হইয়া উঠিল না।"

"কেন, আপনাদের মনে যদি সত্যই এমন ভাব আসিয়া থাকে যে 'এ জীবন অমনি গেল। সঞ্চয়ের মত কিছুই করা হল না', তবে ইহাই যে মস্ত লাভ। এই অগণিত লোকের মাঝে কয়জনের প্রাণে এই কথা জাগে যে, 'হায়, এই দেহ এমনি পাত হইতে চলিল, কিছুই তো করা হইল না—ইত্যাদি? যাঁহাদের এইপ্রকার আকুলতা জাগিয়াছে, তাঁহারা যদি অতি নিবিড়ভাবে এই "জ্বলনা"র দুখ অনুভব করিতে পারেন, তবে তাই যে ভবিষ্যতে কিছু হবার সুযোগের উপাদান হইয়া রহিবে। মানুষ সারাজীবন খাটে, কিন্তু মরণের পূর্ব্বেও যদি একবার যথার্থরূপে ভাবিতে পারে যে, তাহার এই সারাজীবনের কর্ম্ম মিছামিছি কেবল সুখলালসার ও অতৃপ্তিরই বৃদ্ধি করিয়াছে, আসল যে কাজ দ্বারা পুনরায় আর এত কষ্ট করিতে জন্ম না হয়, তাহার কিছুই হয় নাই—তাহা হইলেও বৌদ্ধদিগের মহাশ্রমণের উক্তিতে বলিলে তাঁহার স্রোতাপত্তি জন্মিল।—অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমের স্রোতে এই মাত্র সে পতিত হইল। তখন হইতে তাহার আধ্যাত্মিক জীবন সুরু হইল। এই স্রোতের টানে এখন সে দ্রুত চলিতে থাকিবে। তাঁহার অর্হত্ত্বলাভ অবশ্যম্ভাবী।

এই স্রোতাপত্তির পর কেহ কেহ হয়ত 'সকৃদাগামী' হইতে পারেন। অর্থাৎ এইবার মরণের পর আর মাত্র একবার তাঁহাকে এই জগতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভূমির পরের অবস্থার নাম অনাগামিত্ব। যাঁহারা অনাগামিত্ব লাভ করেন, তাঁহাদের মরণের পর আর এই জগতে আসিয়া মুক্তির জন্য সাধনার্থে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। মরণের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি, সেই ভূমি ইহাদের মৃত্যুর পরে লাভ হয়। এই নির্ব্বাণমুক্তির পূর্ব্বে জীবন্মুক্তির অবস্থা ভোগ করিতে হয়। অর্থাৎ এই দুই জীবনেই আপন সাধন ভজনের সাহায্যে মুক্তির স্বাদ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু তবু তখনও পূর্ণমুক্তি তাঁহার হয় নাই। প্রারব্ধজনিত কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার স্থূলদেহ তখন পর্য্যন্ত বন্ধনের চিহ্ন বহন করিতে থাকে। জ্ঞানলাভ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। জ্ঞানলাভের পর এই দেহও যখন ক্লান্ত হইবে, তখনই নির্ব্বাণমুক্তি মিলিবে। পূর্ব্বে জ্ঞানলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকিলে তবেই দেহপাতান্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়, নতুবা "যা মুক্তি পিণ্ডপাতেন সা মুক্তি শুনিশূকরে।"—দেহপাতেই যদি মুক্তি হইত, তবে শূকর-কুকুরেও তো মুক্তিলাভ করে।

এই জীবনে কিছু হইল না বলিয়া যদি পূর্ণ বৈরাগ্য আসে, তবে ফলে বৌদ্ধের চতুর্থভূমি অর্হত্ত্ব বা মুক্তিলাভও অসম্ভব নয়; তবে বার্দ্ধক্যের পরে জীবনের সামর্থ্য ও সময় সুযোগ থাকে না বলিয়া সেই জীবনে মুক্তিলাভ হওয়া কঠিন। কিন্তু মরণের

পূর্ব্বে যদি সারাজীবনের সমস্ত কর্ম্মসংস্কার ও স্মৃতি-সমূহের প্রভাব হইতে 'আমার কিছু হয় নাই" বলিয়া পরজন্মে যাতে হয় সেই কামনাটাই প্রবল হয়, তবে শ্রীভগবদ্ভক্তিতে বলি যে. পরজন্মে 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে—শুচি ও শ্রীযুক্ত অর্থাৎ লক্ষ্মীমন্তের গৃহে সেই যোগভ্রষ্ট জন্ম গ্রহণ করিবে। সেখানে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বা সংস্কার মনে আপনি আপনি আসিতে থাকিবে, বরং তাহার পরের ধাপে উঠিবার সুযোগ ও ইচ্ছা জন্মিবে। যাহার একবার আধ্যাত্মিক পথে প্রবেশ হইয়াছে বা প্রবেশের দৃঢ় অভিলাষ হইয়াছে, সেই স্রোতা-পত্তিমার্গের যোগী হইয়াছে। যে কোনও কারণে যদি তখন তাহার সেই যোগভূমি হইতে অগ্রসর হওয়া না হয়, তবেই তাহাকে যোগভ্রষ্ট বলা যায়। ভগবৎকৃপাই বলি বা প্রকৃতির নিয়মই বলি, এই যে যোগভ্রষ্টের পুনরায় যোগভূমি লাভের সুযোগ ও ইচ্ছা হওয়া, মুক্তিলাভের পক্ষে ইহা যোগীদিগের কত বড় আশার কথা! ইহা না থাকিলে ছিন্ন মেঘের মত যদি ছন্নছাড়া জীবন বহন করিতে জন্মজন্মান্তর ঘুরিতে হইত, তাহা হইলে কয়জন এ পথে আসিতে পারিত?

সুতরাং কিছুই হয় নাই, এইভাব মনে উদিত হওয়াও কম কথা নয়। কিছু হয় নাই বলিয়া তীব্র অনুশোচনা আসিলেই বুঝিতে হইবে যে এই-বার কিছু হইতে চলিল। কারণ, হয় নাই বলিয়া অভাববোধ আসিলে, তখন তাহা পূরণের বুদ্ধিও ক্রমশঃ আসিবেই। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বুদ্ধি আসি-লেও সময়ে কুলাইল না বলিয়া হতাশ্বাসের কারণ নাই, কেননা উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তিতে যথেষ্ট আশ্বাস পাওয়া যাইতেছে। এখন কথা হইতেছে ঐ অভাব-বোধ লইয়া। মুখে বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়, তাই বলি বলিয়া 'হয় নাই' কথা আওড়ালেই হয় না। বস্তুতঃ 'হয় নাই' বলিয়া তীব্র দুঃখানুভব করা চাই। ভোগের বস্তু হাতছাড়া হইলে যেমন প্রবল আক্ষেপের সীমা থাকে না, তেমনি ভোগের জগৎ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু লাভ হইল না বলিয়া বুকভরা হাহাকার উদ্বেলিত হওয়া চাই। এমনি তীব্র হাহাকার না জন্মিলে মরণ সময়ে ভোগের সংস্কার প্রবল হইয়া সামান্য মুক্তি-কামনাতে অভিভূত করিবে এবং তার ফলে মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্মগ্রহণকালে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগসম্পন্ন গৃহে না জন্মিয়া যেখানে তাহার পূর্ব্ব-কাম্য ভোগ মিলিবে, তেমন পরিবেষ্টনেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বাঞ্ছাকল্পতরুর লীলায় মানুষ যেমন মুক্তির সুযোগ পায়, তেমনি ভোগে-রও সুযোগ পায়। ভোগ বন্ধনের কারণ বলিয়া কাহারও চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভোগ না মিলিত, মুক্তিকামী সকলেই হইত, তাহা হইলে জগতে বৈচি-ত্র্যের লীলা থাকিত না। মোট কথা, মৃত্যুকালে যেমন ইচ্ছা প্রবল হইবে, তদনুকূলেই জন্ম হইবে।

আর একটা কথা ছিল যে, সাংসারিক চিন্তায় সৎচিন্তা সদালোচনার স্মৃতি ডুবাইয়া দেয়। এই কথাটি বহুলোকের মুখেই শোনা যায়। অনেকেই মনে করেন, যেহেতু তাঁহারা সংসারী অর্থাৎ একঘর লোকের ভরণপোষণের চিন্তা তাঁহাদের করিতে হয়, সে জন্য সৎচিন্তা, সদালাপ বা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিবার তাঁহাদের সুযোগ হয় না। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের অভাবে অন্যান্য চিন্তাই প্রবল হয়, সুতরাং কোন ধর্ম্মকথা সেই প্রবল চিন্তার মাঝে কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু এ কথাটা এক দিক দিয়া সত্য হইলেও অন্যদিক দিক দিয়া আবার সম্পূর্ণ উল্টাইয়া মিথ্যা করিয়াও দেওয়া যায়। ধরুন, আপনি সাপকে খুব ভয় করেন। যখনই দেখেন তখনই মন প্রাণ শিহরিয়া কাঁপিয়া ওঠে। কিন্তু

তাই বলিয়া কি সব সময়েই কেবল সাপের চিন্তা করেন ? সাপের চিন্তাই কি আপনার অন্যান্য চিন্তাকে ডুবাইয়া দিয়া সব সময়ে মনে জাগে ? তাহা হয় না। অন্যান্য চিন্তার মাঝে যদি কখনও সর্পভয়ের কথা মনে ওঠে বা হঠাৎ সর্পদর্শন হয়, তবেই হঠাৎ চমক লাগে। সাপের ভয় তখনই বিশেষ করিয়া মনে উদিত হয়। অন্য সময়ে যদিও সর্পভয় মনের মাঝে থাকে, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মভাবে অপ্রকাশ অবস্থাতেই থাকে। ভয়ের প্রকাশ হয় শুধু সর্প দর্শন দিতেই। ইহার কারণ সর্প সম্বন্ধে মনে যে গভীর সংস্কার রহিয়াছে, তাহা সব সময়ে প্রকাশ না হইলেও তাহার শক্তি এত বেশী যে, যখন প্রকাশ হয়, তখন অন্যান্য সমস্ত সংস্কারকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। ধর্ম বলিতে এখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ বা আধ্যাত্মিক পথের কথা। তাহা মানুষ সব সময়ে হয়ত করিতে পারে না। কিন্তু প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মলাভ বা ভগবানের উপর যাহার টান থাকে, সে যখনই সেই প্রসঙ্গ শুনে, তখনই মনের মাঝে এক বিশেষ ভাবের উদয় হয়, তাহার প্রভাব এত বেশী যে, তখনকার জন্য অন্যান্য সমস্ত সংস্কার ক্ষণতরে হইলেও অভিভূত থাকে। কাজেই সব সময়ে প্রসঙ্গ না হইলেও মনে মনে যদি তাহার প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ অনুভব করা যায়, তবে তাহা সর্ব্বোত্তম নিশ্চয়ই। সমস্ত কাজের মাঝে মাঝে তাহার স্মরণ না হইলেও কোনও উপলক্ষ্য ধরিয়া যদি কিছু সময়ের জন্য মনন চলে, তাহার মধ্যেও অধিকারী ভেদে এমন হইতে পারে যে, সেই সামান্য সময়ের মননেও মনের মাঝে দাগ পড়ে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে হয়ত সব সময়ে দেখিতে পায় না, কিন্তু ক্ষণেকে পলকে দেখাটুকুরই এত শক্তি যে অহরহ বহুদিন পর্য্যন্ত হয়ত তাহার প্রেমাস্পদকে মনে পড়িতে থাকে, আর তাহাকে পাগল করিয়া তুলে। ভগবৎপ্রেমের এমনি ক্ষণিক স্মরণে সমস্ত বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। বাহিরের উপকরণ শুধু উদ্দীপনার জন্য ; তাই সব সময়ে তাহার প্রসঙ্গ না হইলেও ক্ষণিক স্মরণেই সুপ্ত ভাব গভীরভাবে মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে।

যাহারা তেমন অধিকারী নয়, সেই মন্দাধিকারীর পক্ষেও সাময়িক প্রসঙ্গ কম উপকারক নহে। ভাল জিনিষের যতটুকু পাওয়া যায়, তাই লাভ। তাহা ছাড়া কে জানে কোন শুভমুহূর্ত্তে কোন্ প্রসঙ্গ কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া পাগল করিয়া তুলিবে? ক্ষণিকের উত্তেজনায় যে পাপ কর্ম্ম করা যায়, তাহার প্রভাব সমস্ত জীবন ধরিয়া চলিতে থাকে, এমন কি কোন কোনও সময় জন্মান্তর পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। তবে সাময়িক পুণ্য কাজেরই প্রভাব কি ক্ষণেকেই বিনষ্ট হইবে? হঠাৎ সাময়িকভাবে যে সৎকার্য্যটি করা যায়, তাহাও অনন্ত কালসাগরে বহুদিন পর্য্যন্ত সংস্কাররূপে স্থায়ী থাকে। অথবা সেই সৎকার্য্যটী অনুষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মনের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে যে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ সেই পরিবর্ত্তনই পরিণামে চরম ও পরমতত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। তাই পুরাণাদিতে অনেক সময় এমন উদাহরণ দেখানো হইয়াছে যে, সারাজীবন অপকর্ম্ম করিয়াও একবার শ্রীভগবন্নাম স্মরণের ফলেই অনন্ত স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অনেকের মনে হইতে পারে যে, সারা জীবন যথেচ্ছাচারিতা বা পাপের চূড়ান্ত করিয়া শেষ—শেষে একবার নাম নিলে বা গঙ্গাস্নান করিলেই তো হইবে। তেমন বিশ্বাস থাকিলে তাহা হয় বটে, কিন্তু তেমন বিশ্বাস থাকিলে আবার ঐমন প্রবৃত্তিও হয় না। তাহা ছাড়া একবার নাম নেওয়া বা গঙ্গাস্নানের সঙ্গে সঙ্গে যদি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ অন্তরস্থ মহাভাবের সুপ্তি কেটে গিয়ে চিত্তকে উন্নত না করে, তবে আর

একবার নাম মুখে নিলেই বা কি করে সমস্ত জীবনের পাপ খণ্ডিবে? সেই জন্যই পাপ খণ্ডনের নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু শাস্তি নয়—চিত্তকে উন্নীত করার জন্য স্বয়ংগৃহীত শাস্ত্রোপায়। পাপে মলিন চিত্ত তাহাতে শুদ্ধিলাভ করে। দু'একবার নাম নিলে যাহাতে ভাবের স্ফুরণ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বা অহরহ নামের দ্বারা মলিনতা দূর করার বিধি। সে বিধি যতটুকু বা যত সময়ের জন্য পালন হয়, ততই মঙ্গল।

এই সমস্ত ছাড়া ধর্ম্মোপদেশ বা যে কোনও কথা বিশিষ্ট উপদেষ্টার মুখে ক্ষণেকের জন্য শ্রবণেও এমন শক্তি তাঁহার ভিতর হইতে সংক্রমিত হইতে পারে যে সেই ক্ষণেই তার সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে। কোন্ মুহূর্ত্তে কাহাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের অমোঘ শক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, কে বলিতে পারে? জীবনময় যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার সমস্ত পরাজয়ের অন্ধকার উদ্ভাসিত করিয়া এক মুহূর্ত্তেই শেষ জয় ঘটিতে পারে। বক্তা যদি তেমন শক্তিসম্পন্ন হন, তবে শ্রোতার প্রাণে যদিও বা নানা প্রতিকূলতা বশতঃ সদ্য সদ্য কোনও ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয় না, তবুও জীবনের এক সময়ে না এক সময়ে তাহার সেই বাণী জাগ্রত হয়ে প্রাণের তারে নূতন ঝঙ্কার বেজে উঠবেই। সারাজীবন যদিই বা না হয়, তবে মরণের পূর্ব্বেও সেই মহাপুরুষকে মনে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণী মহাশক্তির আধার প্রতীয়মান হইতে পারে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন—"ওরে জাত-সাপের কামড়ে মরতে হবেই, যদি তখনই মৃত্যু না হয় ত দুদণ্ড পরে হবে।" বন্দুকের গুলি গায়ে বিঁধলে পাখী যদিও বা বাসায় যায়—সেখানেই মরিয়া থাকে, ভগবন্নাম ওই জাত সাপ বা বন্দুকের গুলির মত ক্ষণিক বলিয়া তুচ্ছের নহে।"

অন্তরতর

অন্তরের অন্তর ওগো ওগো আমার সাধনা।
যতই কেন গোপন থাক-রইবে না ত অজানা॥
খেলছ কত লুকোচুরি
সীমায় অসীম জীবন ধরি,
শেষ শয়নে ঘুমিয়ে থাক—সেও ত শুধু ছলনা॥
গোপন কত করবে সখা স্বপ্রকাশ কি গোপন থাকে,
হাসিটি যে পড়ছে ঝরে অন্ধকারের গোপন ফাঁকে;
হিয়ায় তোমার মূর্ত্তি আঁকা,
বিফল যে গো লুকিয়ে থাকা,
সরস আমি স্পর্শে তোমার—বিভীষিকায় দমব না॥

চাপরাশ

পরমহংস দেবের একটি মূল্যবান্ উপদেশ মনে পড়ছে—"মনে মনে আদেশ হলে হয় না। ভগবান্ সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন, তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত! পর্ব্বত টোলে যায়।" আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোক শিক্ষা দেওয়া যায় না, যে তার আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়।"

বাস্তবিকই যাঁরা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভে জন্ম সার্থক করেছেন, তাঁদের মুখনিঃসৃত উপদেশের বাণীর একটা আলাদা জোর রয়েছে। তাঁরা যা বলেন, তার মাঝে দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, কোনরূপ নিজের দুর্ব্বলতা মিশ্রিত নাই। এই জন্যই অপরের প্রাণ সত্যভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁদের উপদেশে। সে কথায় জোর কত! বাস্তবিকই তাতে পর্ব্বত টলে যায়।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে সত্যলাভ না করেও উপদেশের অজস্র বাণী অনেকের মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়ে, তাতে ফলও হয় তেমনি। কারও প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে না, কেউ নিজের মাঝে একটু বল পায় না, এক কাণে শুনছে তো অপর কাণ দিয়ে সব বের হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য উপদেশ দিতে গিয়েও নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে ভেবে চিন্তে নিতে হয়।

অনুভূতিবিহীন অনর্গল বচন দ্বারা কোন কাজ হয় না। অথচ মানুষ আর কোন বিষয়ে না হোক, ধর্ম্ম বিষয়ে (যার প্রত্যক্ষ অনুভূতি না পেলে কোন মূল্যই থাকে না কথার মাঝে) বিশিষ্ট অনুভব ব্যতিরেকেও বেশ এক চোট উপদেশের বুলি গেয়ে যেতে পারে। এই জন্যই উপদেষ্টার অভাব প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু সেই উপদেশে যথার্থ মানুষ গড়ে ওঠে খুব কম।

বরাবরই পরমহংসদেবের সেই অমূল্য উপদেশটার কথাই স্মরণ হচ্ছে। "সে কথার জোর কত! পর্ব্বত টোলে যায়।" পর্ব্বত পর্য্যন্ত টলে যায়, অথচ মানুষের সজ্ঞান প্রাণই যেখানে উদ্বুদ্ধ হয় না উপদেশে, সেই উপদেশের মাঝে যে ভেজাল রয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই।

মানুষ নিজের মাঝে কিছু না পেয়েও, শুধু বাহ্যিক একটা গৌরব লাভ করবার দরুণ, জেনেশুনেও প্রবঞ্চনা করে। এই প্রবঞ্চনা করই শেষে দর্শে দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ অভ্যাসের ফলে এমনি স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় যে, নিজের দৈন্য থাকা সত্ত্বেও লোকমান্য হবার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষায় নিজের গলদ শেষে চোখেই ধরা পড়ে না। কিন্তু ফাঁকি দিলে কি হবে? গলদ যেখানে থেকে যায়, সেখানটা কলুষিত হয়ে, মলিন হয়ে আপনি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে।

কথাতে সহজে জোর আসে না, সে কথা যদি প্রাণের অন্তরতম নিভৃত প্রদেশ হতে বের না হয়। অনেক গ্রাম্য ফকীর, বাউল রয়েছেন যাঁরা কিছুমাত্র লেখার ধার ধারেন না, অথচ তাঁদের সত্যিকার অনুভূতির জন্য গানগুলি কিম্বা উপদেশগুলি প্রাণকে এমন পবিত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে যে আর বল্‌বার নয়। এই জন্যই অনুভূতির বাণীর সঙ্গে শুধু পাণ্ডিত্য কিম্বা বুদ্ধির কারসাজিতে রচিত কথার তুলনাই হতে পারে না।

অভিজ্ঞতার কথা, আর হৃদয়ের অনুভূতির কথাকে এক আসনে বসানো যেতে পারে না

আমরা যা বলি, তা প্রায়ই অভিজ্ঞতার কথা। নিবিড়তমভাবে সে সব কথায় হৃদয়ের যোগ নেই। এই জন্যই ভাল উপন্যাস পড়্‌লে, হঠাৎ যেন কেমন একটা চমক লেগে যায়, দু চার দিন সেই লেখার বেশ প্রশংসাও করি, কিন্তু তাতে চিত্ত স্থায়ীভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রাণের যথার্থ অনুভূতির একটি বাণীও চিরতরে হৃদয়ের মাঝে বিঁধে যায়। তখন বুঝি—অনুভূতির বাণীর জোর কত! স্থায়ী ভাবে দাগ রেখে যাবার উপযোগী একমাত্র অনুভূতির বাণীই।

প্রাণ থেকে যে যাই বলুক না কেন, তাতে জড় চেতন সবাই উদ্‌বুদ্ধ না হয়ে পারে না। পরমহংসদেবের উপদেশগুলি পাণ্ডিত্যে বা বড় বড় দার্শনিক তথ্যে ভরপুর নয়। কিন্তু এই সহজ সরল উপদেশগুলিই কিরূপ অব্যর্থ ভাবে মানুষের প্রাণকে বিশুদ্ধ প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছে, তা ভাবলে অবাক্‌ হয়ে যাই। এই জন্যই শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য এক দিকে—আর হৃদয়ের যথার্থ অনুভব আর এক দিকে। মনে প্রাণে অনুভব করে মানুষ যা বলে, তা শাস্ত্রের সঙ্গে সব সময় না মিল্‌লেও যে অসত্য, তা নয়। তার সত্যতা ক্রমশঃ ধরা পড়ে।

রাম-প্রসাদী সঙ্গীত বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ্‌। অথচ এই সম্পদ ভাষায় পাণ্ডিত্যে তেমন উঁচুদরের নয়, তাতে আছে হৃদয়ের সহজ অনুভূতির কথা, মায়ে ছেলেতে সহজ সম্বন্ধের কথা। দেখছি, প্রসাদী সঙ্গীতের এক একটি কথার মূল্য কত—জোর কত! গাওয়া মাত্রই প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎ সঞ্চরণ হয়ে যায়। মনে হয় ব্রহ্মময়ীর ছেলে রামপ্রসাদের মত, আমরাও যেন মায়ের কৃপা হতে বঞ্চিত হব না—মা আমাদেরও এসে কোলে তুলে নেবেন।

এই যে অনুভবের বিদ্যুৎসঞ্চরণ, একটি পদ বা শব্দ স্মৃতিপথে উদিত হওয়া মাত্র প্রাণ এক অনুভূতিতে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, এর মূলে কি রয়েছে?—না সাধকের মন-প্রাণ ঢালা আবেগ—অনুভূতি। সেই আবেগপূর্ণ অনুভূতিতে সকলের প্রাণই উজ্জ্বল প্রেরণায় সন্দীপিত হয়ে ওঠে। এঁদের কথাতেই কাজ হয়—এঁদের উপদেশেরই যথার্থ মূল্য রয়েছে। আর বিশেষত্ব এই জায়গায় যে, ভগবানকে যাঁরা প্রত্যক্ষ লাভ করেছেন, তাঁদের উপদেশ দেওয়ার অভিমান নাই, আয়োজন নাই বা উদ্যোগ নাই। আনন্দাতিশয্যে সময়ে অসময়ে তাঁরা প্রাণের সেই বিদ্যুন্ময় প্রেরণায় দীপ্তিই ভাবে ভাষায় ফুটিয়ে তুলেন মাত্র।

সত্যদর্শী সাধকের বাণীতে বাস্তবিকই পর্ব্বত টলে যায়, মানুষ যে টল্‌বে তাতে আর বিচিত্র কি? আত্ম-প্রত্যয়ের উজ্জ্বল মহিমার কাছে সব অভিমান বিলুণ্ঠিত হয়। আর এই যে সমর্পণ, এতে কোন ক্ষোভ নাই; প্রাণ অপূর্ব্ব সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বলেই আপনি বিনম্র ভাব এসে পড়ে।

যথার্থ অনুভবের বাণীতে একটা আলাদা শক্তি রয়েছে। শুনা মাত্রই যেন সুপ্ত প্রাণও নিমিষে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনুভূতির বাণীতে যেমন সন্দিগ্ধ সংস্কার নাই, তেমনি যে শুনে তার বাণী, তারও মনে কোন সংস্কার জাগে না। শুনবামাত্রই তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। হাজার হলেও ভগবান যার প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়নি, তার কথার মাঝে কিছু না কিছু সংস্কার, দুর্ব্বলতা থেকে যায়ই যায়, তা থেকে কিছুতেই সে নিবৃত্তি পায় না। সে যা বলে, ভেবে চিন্তে; জোর দিয়ে, নিঃসংশয়ে কোন কথাই সে বলতে পারে না। মুখে একরূপ বলে কিন্তু প্রাণ আবার অন্যদিকে সংশয়ে, দুর্ব্বলতায় দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে। দুর্ব্বলের কথা স্বাভাবিকই দুর্ব্বল, তার কথার শক্তিসংক্রমণক্ষমতা মোটেই নাই।

বিবেকানন্দ যখন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর! তুমি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছ? প্রত্যুত্তরে পরমহংসদেব যখন বললেন, হাঁ,

আমি তাকে দেখেছি, এমন কি তোকেও দেখাতে পারি? এই স্পর্দ্ধার বাণীতেই তো বিবেকানন্দ একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কি নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের উক্তি! মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ না পেলে কি এরূপ অকুণ্ঠভাবে, বীর্য্যের সহিত উত্তর প্রদান করতে পারে?

উপদেশ তুমি-আমিও দিই। কিন্তু কেউ যদি ফিরে জিজ্ঞেস করে বসে, "আপনি যা বললেন, তা কি আপনার প্রত্যক্ষ অনুভূত?" তা হলে হয় ভণ্ডামী করে আত্মগোপন করতে হবে, নয়তো সত্যকথা বলে ফেলে উক্ত সম্মানের দাবীকে পর্য্যুদস্ত করে দিতে হবে। আর বললে কি হবে, ভণ্ডামী করলে এক সময় না এক সময় ধরা পড়ে যাবেই যাবে। আর যে বাস্তবিকই ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করেনি, তার মাঝে যে অবিকম্পিত ভাবই আসতে পারে না। সে যা বলবে, ইতস্ততঃ করে—অর্থাৎ তার মাঝে অখণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের জোর নেই।

আরও একটি কথা পরমহংস দেব বলতেন—"চাপরাস না পেলে কাজ হয় না।" বাস্তবিকই ভগবানের দেওয়া চাপরাস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের যোগক্ষেম ভগবানই বহন করেন। কাজেই তাদের কোন অভাব নাই, দুঃখ নাই, দৈন্য নাই। বিশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়ে তখন ভগবানের অফুরন্ত মহিমা প্রকাশ পায়। তাঁরা যা বলেন, উপদেশ দেন, তাই ভগবানের ইঙ্গিতে, ভগবানের আদেশে। কিন্তু এই আদেশ মনে মনে হলে চলে না, চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি!

উপদেশ দিতে দিতে কথা মার্জ্জিত হতে পারে বটে, কিন্তু সেই উপদেশ যদি আত্মার গভীরতম প্রদেশ হতে বের না হয়, তাহলে সেই কথা যতই কেন পরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধ হোক না কেন, তাতে স্থায়ীভাবে কোন কাজই হবে না। এক একটা সত্যিকার অনুভূতির বাণীতে মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়, আর সে কথার জোর কত, যেন বিদ্যুতের মত আঁধার হৃদয় আলোকিত উদ্ভাসিত করে তুলে!

দুর্ব্বলতায় দুঃখে দৈন্যে মানুষের সহায় মানুষই, কিন্তু দুর্ব্বল দুর্ব্বলকে, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাবে কেমন করে? এই জন্যই বজ্রদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় চাই। সেই আত্ম-প্রত্যয়ের বাণীতে দুর্ব্বলের মুমূর্ষু প্রাণও জীবন্তোদ্দীপিত হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে সঙ্গেই জীবনে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যায়।

উপদেশ সবাই দেয়, কিন্তু সবাই "চাপরাস" পায় না বলেই সেই উপদেশে তেমন কোন কাজ হয় না। কাজেই উপদেশ দেওয়ার আগে নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে নিতে হয়। অনেকের উপদেশ দেওয়ার এক বাতিক চড়ে যায়; কোন প্রয়োজন নাই, কেউ হয়ত বলছেও না, অথচ অনর্গল তার মুখ থেকে অনুভূতিবিহীন বাণী বের হচ্ছে; জগতে পরোপদেষ্টার সংখ্যাই অধিক।

অন্য যে কোন বিষয়ে হলেও আলাদা কথা, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে (যার সম্বন্ধে সত্যিকার অনুভূতি না পেলে এক কথাও বলা চলে না) মানুষ কেমন করে যে সাক্ষাৎ অনুভূতি না পেয়েও এত উপদেশ দিতে পারে, তাই ভেবে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়।

অন্তরের ডাক

বিশ্বমাঝে বাঁচার মতন বাঁচতে হবে, এই যে পণ,
দুঃখ দৈন্য বিপদ মাঝেও রাখ্‌বি অটুট অনুক্ষণ!
সুখের প্রাতে দুঃখের রাতে এই কথাটী কর্‌ স্মরণ—
সাধ্‌বি তাহা, যা ধরেছিস্‌,—হয় যদি তায় হোক্‌ মরণ!
প্রতিকূলের ঝড়ের হাওয়া উড়াতে চায় সব ঝাঁটি—
তার মাঝে তুই যেটুক পারিস্‌ কাম্‌ড়ে থাকিস্‌ নিজ মাটি।
বাঁশীর তানে মাত্‌বে তারাই যাদের বুকে বাজবে সুর!
তার মাঝে তুই বাছিস্‌ না রে কে তোর আপন নিকট দূর!
আপন যে তোর আস্‌বে কাছে এই কথাটা জানিস্‌ ঠিক্‌—
বারে বারে দিচ্ছে সাড়া সন্দেহ তাও ধিক্‌রে ধিক্‌!
সোণার বাঁধন ফেল্‌বি ছিঁড়ে পর্‌বি তবে কোন্‌ নিগড়?
ছাড়্‌লি যারে বুঝ্‌লি না তুই দিচ্ছে ধরা সেই অধর!
রূপে রূপে মোহন বেশে থাকিস্‌ ভুলে তুই বেকার—
তোর তরে সে ক্ষণে ক্ষণে খাটুছে এসে তোর বেগার!
চিন্‌লি না তুই আপন বঁধু, আপন মুখও তোর অচিন্‌,
হাটের মাঝে খুঁজিস্‌ যারে তোর ঘরে সে রয় অধীন।
ভরসা কাজেই আছে রে তোর মিছেই করিস্‌ হা-হুতাশ,—
আপন ধনের রাখিস্‌ না খোঁজ পরের ধনেই হস্‌ হতাশ!
আপন ঘরে আয় ফিরে তুই, নিজের মাঝেই কর প্রবেশ—
ছড়িয়ে পড়িস তখন রে তুই চিন্‌লে আপন মোহন দেশ।
বাঁচার মত বাঁচবি ভবে—শুনিস্‌ না কি তাঁর হানা!
পরের কথায় নাচিস্‌ কেন? শুন্‌লে শুনিস্‌ তাঁর মানা!
তাঁরেই নিয়ে গৃহস্থালী, তাঁর সেবাতে চাস্‌ জীবন—
আপ্‌না থেকে আস্‌বে সবাই শুন্‌তে তখন তোর কূজন।

মুক্তির হাওয়া

"মানুষকে মুক্তি দিতে হবে সব চেয়ে আগে, তারপর জীবন আপনি সংযত সুমাজ্জিত কল্যাণযুক্ত হয়ে উঠবে। আমার মতের সঙ্গে তোর মতের এই জায়গায় মস্ত বড় একটা পার্থক্য রয়েছে ; আর আমি তোর মতে সব সময় সায় দিয়ে চলিনি বলে অনেক সময় তুই আমার উপর অভিমান করে বসে থাকিস্। কিন্তু বলি ভাই, নিজের নিজের স্বানুভবকে তুচ্ছ করে, কেবল কল্পিত আদর্শকে নির্বিচারে সুখ্যাতি করে চল্‌লেই কি আমার পক্ষে উপযুক্ত কাজ হ'ত ? আমি যা বুঝেছি, তা যুক্তির কথা নয়, প্রাণ দিয়ে অনুভব করা ; আর প্রত্যক্ষ এরূপ অনেক ব্যপার দেখছি। এই তোকে জগদীশ মুখুজ্যের ছেলে নরেশের দৃষ্টান্তই দেখাচি। জগদীশবাবুর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, মানুষকে তিনি গভীর ভাবে শ্রদ্ধা কর্‌তেন, ভালবাস্‌তেন, তাই মুখুজ্যেমশায়ের বড় ভাই গঙ্গাচরণবাবুর নিষেধ সত্বেও, একজেদী ছেলে নরেশের অভিমতানুযায়ীই নরেশকে তিনি চালাতেন।

জগদীশ বাবুর তিনটি ছেলে, বড় দুটী ছেলেই বেশ শান্ত-শিষ্ট, ধর্মের দিকে বেশ মতি-গতি আছে, শাস্ত্রবাক্যকে কোন দিন তারা অশ্রদ্ধা করেনি, কিন্তু কনিষ্ঠ ছেলে নরেশের সবই উল্টা, সব কথাতেই তার তর্ক-যুক্তি, এমন কি বড় দুটী ভাই এবং নিজের পিতার সঙ্গেও ধর্ম্ম বিষয় নিয়ে তার প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে যায়। বড় দু'ভাই তো এক এক সময় রেগে অধৈর্য্য হয়ে যেত, কিন্তু জগদীশ বাবু তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত কর্‌তেন।

নরেশের মুখে এই কথাটী প্রায়ই শুনা যায় যে, "আপনারা কেবল পরের মুখেই ঝাল খান। নিজের অনুভূতির উপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই আপনাদের। এমন কি অনেক সময় নিজে বুঝ্‌ছেন একটা, অনুভব কর্‌ছেন একটা, কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশের সঙ্গে হুবহু মিল্‌ছে না বলে, তাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে চলেন। এ সব কি দুর্ব্বলতা নয় ? আর এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েই আপনারা চান ধর্ম্ম অর্জ্জন কর্‌তে ? এমন ধর্ম্ম যদি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমন্ত হয়ে আমার কাছে সাম্‌নে এসে ভেল্কি করে-জোড় হাতে এসেও দাঁড়ায়, আমি তাকে বেশ সজ্ঞানে অবিক্ষুব্ধ চিত্তে বিদায় দেব।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত উপদেশ এত বচন শুন্‌তে শুন্‌তে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল! ধর্ম্ম যদি প্রাণের বস্তু হয়, তাহলে তা অপরকে বলে-কয়ে গ্রহণ করাতে হবে কেন ? প্রাণের জিনিষ প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হবেই। আচার নিয়ম পালন করে গেলে, আর আপ্তবাক্যে লোক-দেখানো বিশ্বাস দেখালেই যথার্থ ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। কতজনেই কত ব্রত নিয়ম জপ-তপ কর্‌ছে, কিন্তু প্রকৃত

ধার্ম্মিক কয়জন হতে পেরেছে ? আমি বলি—ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশের মাত্রাটা খুবই কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। নীরবে, বিনাড়ম্বরে প্রাণ থেকে যথার্থ ধর্ম্মের ভাব উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। তাতে মানুষের ভিতর যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হবে। মানুষের ফাঁকি দেবার বিশিষ্ট বৃত্তিটা প্ররোচনার অভাবে বিলোপ হবে।"

তোদের মতে বল্‌তে গেলে নরেশের একটা ভয়ানক দোষ এই যে, সে নির্ব্বিচারে কিছুই মান্‌তে চায় না। জগদীশ বাবুর আর দুইটা ছেলেকে তোরা খুবই প্রশংসা করিস্‌, যেহেতু, তারা শান্ত-শিষ্ট দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে চলে। আর নরেশকে তোরা বরাবর রাগী, অভিমানী, বেশী বুঝদার বলে মনে অবজ্ঞা ক'রস্‌!

কিন্তু জগদীশবাবু বাইরে একরকম দেখালেও ভিতরে ভিতরে নরেশকে যত ভাল বাসেন, আর কাউকে তেমন ভালবাসেন না। সেদিন আমার সঙ্গে হঠাৎ জগদীশবাবুর দেখা। কথাপ্রসঙ্গে নরেশের কথাও উঠ্‌ল। তিনি শতমুখে নরেশের প্রশংসা করলেন। বল্‌লেন—"বাস্তবিকই নরেশের এক একটা বিষয় তলিয়ে দেখ্‌বার দরুণ এত আকুলতা এবং এত উৎকণ্ঠা যে আর বল্‌বার নয়"—অন্যান্যের মত ready-made opinionকে গিলে ফেল্‌বার মত এত দুর্ব্বলতা নাই ওর। সব কথাই তলিয়ে না বুঝে মন্তব্য প্রকাশ করা তার মতে অসমীচীন। এই জন্যই ধর্ম্মের কোন প্রসঙ্গ উঠ্‌লেই ও কেবল স্থির, ধীর, গম্ভীরভাবে সব শুনে যায়। ও প্রায়ই আমাকে বলে, ধর্ম্ম যদি জীবনের সকল রকম সমস্যার সমাধান না কর্‌তে পারে, তাহলে আমি তাকে ধর্ম্মই বলি বলি না। ধার্ম্মিক মানুষ, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে সর্ব্ববিষয়েই যোগ্য, তার কোন দিকে অপূর্ণতা নেই।"

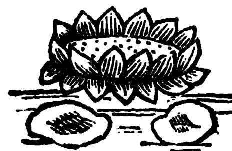
নরেশের লোকদেখানো ভক্তি কিম্বা নিষ্ঠা নাই। কিন্তু তার ভিতর যখন এক একটা প্রশ্ন জাগে, তখন যেন সে চিন্তায় ডুবে যায়—আর তখন দেখা যায় তার নিষ্ঠা, তার যথার্থ আকুলতা! সে বলে—"মানুষকে জোর করে কেন ভগবানের নাম লওয়াতে চেষ্টা কর্‌তে হবে ? ভিতর থেকে যদি ভগবানের প্রতি তার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা না জাগে, তাহলে তাকে ঠেলিয়ে ধর্ম্ম-করানোতে কি ফল?"

নরেশ প্রায়ই বলে—"মানুষের ভিতর মানুষ জেগে উঠ্‌লেই—সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকের মনুষ্যত্ব যাতে উদ্বুদ্ধ হয়, তারই চেষ্টা কর্‌তে হবে। মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পথ সকলেরই এক রকম নয়; কেউ জ্ঞানের ভিতর দিয়ে, কেউ কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, কেউ ভক্তির ভিতর দিয়ে নিজকে জান্‌তে পারে। কাজেই প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সবাইকে এক পথে ঠেলে দেওয়াতে কোন লাভ নাই, তাতে দমাবদ্ধ হয়ে, ছট্‌ফটানিই সার হয়।"

সে-দিন আমাদেরই গ্রামের ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্যের উদ্মার কথা এবং বিচার-বিবেচনাহীনতার কথাই এসে নরেশ বল্‌লে। উক্ত ভট্টাচার্য্যের একটী ছেলে। ভট্টাচার্য্য মশায় একমাত্র ছেলে সুবোধকে চান, আচারে নিষ্ঠায় গোড়ামিতে ওঁরই মত করে গড়ে তুল্‌তে, কিন্তু সুবোধের মত অন্য রকমের। এই নিয়ে সে দিন সুবোধকে ধরে নাকি—কি মারই মার্‌লে! নরেশ দুঃখ করে বল্‌লে, "আচ্ছা! এই যে প্রহার, এতে কি সুবোধের মনুষ্যত্ব জাগ্‌বার পক্ষে সহায়তা করা হল? তার মনটাকে মেরে রুচিটাকে গলা-টিপে হত্যা করে তার জীবনের কি উন্নতির আশা করা যায়? এই ভাবে কোন দিন জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ হতে পারে? ওঁরা বল্‌বেন—ছেলেটা মানুষ হ'ল না, কিন্তু আমি বলি—মানুষ হওয়ার পক্ষে প্রধান বিঘ্নই যে এই ধরণের অভিভাবক!"

জগদীশ বাবু আমাকে এরূপ অনেক কথাই নরেশের সম্বন্ধে বল্‌লেন। তাতেই বুঝ্‌লাম, নরেশের প্রতি ওঁর কিরূপ আন্তরিক টান। জগদীশ বাবু আমাকে আরও বল্‌লেন, "দেখ নরেন, আমি যদি নরেশের ভিতর খাঁটী অভিমান বা সব কিছুই তলিয়ে বুঝ্‌বার মত অগ্র্যা বুদ্ধি না দেখ্‌তাম, তা হলে কিছুতেই ওকে ছেড়ে দিতাম না। আমি জানি, ওকে ছেড়ে দেওয়াই ওর আত্ম বিকাশের পথে সাহায্য করা। তা বলে সবার পক্ষেই যে এক নিয়ম, তা বল্‌ছি না। কিন্তু নরেশের মত আত্ম-বিশ্বাসী ছেলেকে এরূপ স্বাধীনতা দেওয়াতে কোনও ক্ষতি নাই।"

নিজের পথ নিজে বেছে নিতে পার্‌লে আর চাই কি? দুর্ব্বলতা রয়েছে, ভীরুতা রয়েছে মানুষের, তাই সকলেই স্বাধীন ভাবে চল্‌তে পারে না। কাজেই ওদের চোখ বুজে পরের কথাতেই সায় দিয়ে চল্‌তে হয়! কিন্তু এই ধরণের দুর্ব্বল পারিপার্শ্বিকের মাঝে থেকেও যদি কেউ আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে উঠে, তাহলে কি তাকে অবজ্ঞা কর্‌ব? বরঞ্চ সেই শ্রদ্ধার পাত্র—ধন্যবাদার্হ। নরেশকে আমি সব চেয়ে ভালবাসি—আমি জানি, ও কাউকেই ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌বে না নিজের দরুণ। আমি নরেশের দরুণ ভাবি না—যত ভাবি, অসহায় দুর্ব্বল-ভাবুক আমার অপর দুটো ছেলে অবিনাশ এবং অক্ষয়ের দরুণ!



মঙ্গলহস্ত

প্রকৃতির বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার অন্তরালে যেমন গুরুগম্ভীর সাম্য অবস্থান করে, সেইরূপ নানা বৈষম্যের অন্তরালেও সাম্যের অবস্থান চিরকাল। বিপ্লব কেবল শুধু প্রকৃতিতে নহে, অধ্যাত্ম জগতেও দেখা দেয়। তখন সাধককে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। সাধক তখন কূল হারাইয়া অকূলে ভাসিতে থাকে। কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত হইয়া কূলহারাকে কূলে উঠাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়া থাকে; যে আজ বিদ্রোহী, সে তখন শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করে। সয়তান, মার ইত্যাদি চিরদিন সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে, সাধক লক্ষ্য ঠিক করিয়া চলিও—দেখিবে, এক দিন তাহারা আপনিই পথ ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে তোমার আর উপায় নাই। তোমাকে অকূলে ফেলিয়া নিমজ্জিত করিবে। পথে বিঘ্ন আছে সত্য, কিন্তু বিঘ্নকে অতিক্রম করাই পৌরুষ। বিঘ্ন দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। যাহারা বিঘ্ন দেখিয়া লক্ষ্যপথ ভুলিয়া যায়, তাহারা নিতান্ত কৃপার পাত্র। "ক্ষুরস্য ধারা ইব নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" সাধকের পথ অত্যন্ত দুর্গম নিশ্চয়ই, কিন্তু এই পথ আমাকে অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে, ইহা জানিয়া যদি অগ্রসর হই, তবে বুকে বল ও সাহস আসিবেই এবং ভগবানের মঙ্গল-হস্ত আমাকে রক্ষা করিবেই। দুঃখকে বরণ করায় দুঃখ আর দুঃখ থাকে না; দুঃখও সুখে পরিণত হয়। তেমনি হে সাধক, তুমি আজ সাহসের সহিত বীরের ন্যায় অগ্রসর হও, দেখিবে লক্ষ্য তোমার অদূরে। কোন বাধাই তোমাকে বাধাপ্রদানে সমর্থ নহে।

কিছুদিন সংযমের পথে চলিতে চলিতে সাধকের চিত্তে অবসাদ আসা স্বাভাবিক। সাবধান, সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিও না, তাহা হইলে অসংযম উন্নতমস্তকে তোমার সম্মুখীন হইবে, তখন আর তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। কথায় বলে "ব্রাহ্মণ যদি মুসলমান হয়, ত মুরগী খাবার যম হয়।" সুতরাং অসংযমকে লক্ষ্যপথের বিঘ্ন জানিও। লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কতকগুলি বিভূতি আসিয়া সাধককে বিচলিত করে, সে বিষয়েও সাধকের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মান যশ আত্মপ্রতিষ্ঠাও সাধকের পথের কণ্টকস্বরূপ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবম্; প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, এতাংস্ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ।" আরও "অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাঃ, অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্।" সাধক, এই সকল বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যপথে স্থির থাকিবে। ছিদ্র কোন দিকেই রাখিও না, কোন দিক দিয়া শত্রু আক্রমণ করিবে কে জানিতে পারে, সুতরাং বুকে

অমিত সাহস ও বল লইয়া ও ভগবানকে ভরসা করিয়া স্থির, ধীর পদে অগ্রসর হও। তাঁহার মঙ্গল-হস্ত তোমাকে রক্ষা করিবেই।

ভুল-ভ্রান্তি হওয়াও সাধকের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। গুরু ত মানুষরূপী; তাঁহার কার্য্যে ও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস আসিলেও আসিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য ত অবিশ্বাস্য নহে। আমার অন্তরের অন্তর দিয়া যে লক্ষ্য নির্ণয় করিয়াছি, তাঁহার প্রতি যেন অবিশ্বাসী না হই। গুরু আমার সেই লক্ষ্যপথের সহায়ক মাত্র। মানুষ হিসাবে গুরুতে যত দোষই থাকুক না কেন, তিনি আমার লক্ষ্যপথের সহায়ক জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণের আমার কোন প্রয়োজন নাই। বলে—"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' আর, এক গুরুর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া যতই আমি অন্য গুরু ধরি না কেন, সেই দোষ বা ততোধিক দোষ ত তাঁহাদের মধ্যেও থাকিতে পারে। ফলে এই দাঁড়াইবে যে, আমিই গুরুর প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া স্বৈরাচারী হইব, লক্ষ্যপথে আর সহায় পাইব না; সুতরাং গুরুর প্রতি অবিশ্বাস আসাও সাধকের একটি মহা ভ্রম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা আমরা যেন এইরূপ মহা ভ্রমে পতিত না হই। ভগবানের প্রতি নির্ভর থাকিলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে এই ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন।

তুমি

বন্ধু তোমার পরশ পেয়ে
ফুট্‌ছে কমল সরোবরে,
ছুট্‌লো অনিল মন্দ ধীরে
উঠ্‌লো ভুবন গন্ধে ভরে!
গাছের মাথায় আম্র-মুকুলে
দেয় পাঠিয়ে কি সুবাসে—
তোমার গায়ের গন্ধ কি এ
পৌঁছে গিয়ে স্বর্গবাসে?
বৃন্দাবনে যে অলৌকিক
করলে লীলা নবীন মদন,
স্মৃতি কি তার বসন্তে এই
জাগাও হৃদয় করতে দহন?
ওগো অরূপ তোমার যে রূপ
বিশ্বময় আজ প্রসারিত;
আকাশ বাতাস যেই হরষে
দেখ্‌ছি হে আজ আমোদিত;
তারও আরো কোন্ সুদূরে
কল্পনারও পরপারে—
ব্যক্ত কি গো সেথাও তুমি
যেম্‌নি আছ ঠিক এই পারে?

দুঃখবাদী ও সুখবাদী

ছেলে অন্যায় করেছে, অভিভাবক তিরস্কার করেছেন; এখানে তিরস্কারের ধারা নানারকম হতে পারে, কিন্তু সব জায়গাতেই উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলের ভাল করা। যে ছেলেকে মা বকে দেন, সে ছেলে যদি মাকে ভালবাসে তবুও হয়ত মায়ের ভয়ে ছুটে পালায়, কিন্তু তারপরে অন্ততঃ খিদের সময়ে আবার মার কাছেই ফিরে আসে। মাও যদি বা ছেলে না আসে, তবে আপন প্রাণের দরদেই পরে আবার নিজেই ছেলেকে খুঁজতে বের হন। আমাদের দুষ্ট মনকে সুপথে আনতে গিয়ে গুরু বা ভগবানের তিরস্কারও দুঃখপ্রহার রূপে আমাদিগকে আহত করে। ভক্তপ্রাণ সে আঘাতের পরে প্রাণের জ্বালায় আবার তাঁর কাছেই ফিরে আসে। যারা না আসে, তাদেরও তিনি আপন ইচ্ছায় এক সময়ে এসে কোলে তুলে নেন বটে, কিন্তু সে যে কতক্ষণে কত যুগ পরে হবে, তার ইয়ত্তা নাই। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বল্‌লে— "সবাই খেতে পায় বটে, কিন্তু কেউ দশটায় কেউ বা দুটোয়। যার গরজ বেশী, সে অপেক্ষা করতে পারে না।"

আঘাতরূপে তাঁর ডাক যার প্রাণে যত বেশী বাজে, সে তত আকুল হয়ে পড়ে। আঘাত পেয়ে অনেক ছেলে কেবল পালাতেই থাকে, আবার এক এক ছেলে মাকেই আরও বেশী করে মা মা বলে চীৎকার করে জড়িয়ে ধরে। তাতে মার স্নেহধারা তার উপর আরও বেশী ক্ষরিত হয়। আগে মার স্নেহকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ ক'রে তারপর যা করা যায়, তাতেই মার প্রাণ বাঁধা যায়। সাধন-ভজন বা তার কাছে নিরন্তর একান্ত প্রাণের আত্মসমর্পণ দ্বারা চিত্ত যখন একটা দৃঢ়ভূমি লাভ করে, সাধারণ মানুষের অগম্য স্থান হতে জগৎকে বিচার করবার ক্ষমতা লাভ হয়, তখন সেই স্থির প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির মানাভিমানাদি ক্ষুদ্র ভাবও ভগবৎপ্রেমের অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তার পূর্বে কিছু করবও না, পাপের পথে চিত্তকে চঞ্চল করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করব না, অথচ ভগবান্ আমার দ্বারে বাঁধা থাকবেন—এমন আকাঙ্খী ভগবান সহ্য করেন না।

অনেকে আছেন দুঃখ-শোকের ধার ধারেন না, অর্থাৎ প্রাণে যেই কোনও আঘাত এল, অমনি নূতন রকম ভোগের উপকরণ দিয়ে সে আঘাতের দুঃখ বিস্মৃত হতে চান। লোকের কাছে এরা হয়ত খুব স্ফূর্তিবাজ লোক বা এমনি ধরণের কোনও সুখ্যাতিব্যঞ্জক আখ্যা পেয়ে থাকেন, কিন্তু বিচারশীল মনস্বীর কাছে দুঃখাভিভূত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় এমন ধরণের লোক যে 'স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ।' কারণ তার সুখদুঃখানুভবের অনুভূতি তখনও মোটেই সূক্ষ্ম ও তীব্র হতে পারেনি। সাধারণতঃ দেখা যায়, বহুলোকেই এক বিবাহের পরে যদি স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে, তবে নানা অজুহাত দেখিয়ে পুনরায় বিবাহে মোটেই অনিচ্ছুক নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বিবাহের যথার্থ মর্ম বুঝে স্ত্রীকে যথার্থ ভালবেসেছেন, তিনি পুনরায় বিবাহে সহজে সম্মত হন না। কারণ তিনি বিবাহ বা স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ যত নিগূঢ়ভাবে বুঝেছেন, সাধারণ লোকে তত নিবিড় রূপে হয়ত তা অনুভব করে না। সুতরাং একটা ভোগের যদি অবসান হয়, তবে অপর ভোগ দ্বারা মনকে সতেজ রাখা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়—কাম্যও

নয়। যিনি নিবিড় হয়ে সুখকে অনুভব করতে পারেন, তিনিই দুঃখকেও নিবিড় রূপে অনুভব করা সত্ত্বেও অবিচলিত থাকতে সক্ষম হন। আর যে দুঃখটাকে হজম করবার ভয়ে বা অসমর্থতায় নিত্য নূতন সুখের উপকরণ খুঁজে বেড়ায়, সে কিন্তু সুখটাও যথার্থ রূপে আস্বাদন করতে পারে না। বরং যে যত দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত হয়, তার অনুভূতির শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। তাই সুখের সময়ে সে সহজে এলিয়ে পড়ে না।

সুখের মাঝে এলিয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কারণ চঞ্চল মনের পক্ষে প্রকৃতির অধঃস্রোত নিরোধ করা দুরূহ। দুঃখে মন যেমন আবিল হয়, তেমনি আবার স্থির হবারও সুযোগ পায়। ধর যেমন কান্না; মানুষ দুঃখে কাঁদে, কিন্তু সেই কাঁদাও দিন-রাত অবিশ্রান্ত ভাবে বেশী দিন চলতে পারে না; আবার চোখের জল শুকিয়ে শুকিয়ে মনটা একটা জড়বৎ স্থির হবেই। কিন্তু সুখের নেশায় বিভোর প্রাণ আঘাত পেয়েও আবার সুখ খোঁজে, আবার তা পেয়ে এলিয়ে পড়ে থাকতে চায়।

হয়ত মনে হচ্ছে, পড় কুগে এলিয়ে, তাই ভাল। চাই না অমন Pessimist হয়ে মুখ ভার করে থাকতে! আনন্দই আমরা চাই—আনন্দাদ্ধ্যেবেমানি ভূতানি জায়ন্তে সংপ্রিয়ন্তে বিলীয়ন্তে চ—ইত্যাদি। কাজেই আনন্দই জগতের পুষ্টি বিধায়ক। দেহে-মনে প্রাণে নূতন রসের সঞ্চার করে এই আনন্দ। তা যার মাঝে পাব সেখানে গিয়ে যতটুকু সেই আনন্দের প্রকাশ হবে, সেখানে গিয়ে সেই বস্তুই আঁকড়ে ধরব—চাই না দর্শনের বুলি শেখানো দুঃখের পসরা।

কথাটা ঠিক। বস্তুতঃ জগতে আমরা সুখের জন্যই লালায়িত, ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ সমস্তই আনন্দ-দায়ক বলেই মানুষ সে সব চায়। এই চারটী সংজ্ঞাকে বাদ দিয়ে মানুষ আনন্দ বা দুঃখমুক্তি চায় বলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে তা অনুভব নিয়ে। সুখ বা আনন্দের উপকরণ অনেকেই প্রাণান্ত করেও সংগ্রহ করে, কিন্তু সে সমস্ত উপকরণ দিয়ে যথার্থ সুখ অনুভব করতে পারে কয়জন? উপকরণেই যদি সুখ নিহিত থাকত, তবে সব লোকেই শুধু উপকরণ নিয়ে মজে থাকত। এই জগতেই সমস্ত সুখের ভোগ হত। পরমসুখ বা পরমানন্দের জন্য মানুষ এই জগৎকে উপেক্ষা করত না। এই জগতের ঊর্দ্ধে যে আনন্দ, তাই দিয়েই এ জগৎ বিধৃত। সে আনন্দকে উপলব্ধি করতে হলেই একবার এই সমস্ত তুচ্ছ আনন্দের প্রতি উদাসীন হতে হয়।

বিষয়ের আনন্দও আনন্দ বটে, যেমন সব মিষ্টিই মিষ্টি, কিন্তু গুড় বা রসগোল্লার একদর নয়। রসগোল্লার সন্ধানকারীকে মুদি দোকানে ব'সে থাকলে চলে না—ময়রার দোকানে যাওয়ার জন্য মুদির দোকান ছাড়তে হয়। তবে মুদীর দোকানে বসে থেকেও যে ময়রার দোকানের জিনিষ পেতে পারে, সে ওস্তাদ্ বটে। কিন্তু তেমন লোক খুব কম। সোজা পন্থা ছেড়ে দিয়ে ওস্তাদী দেখাতে গিয়ে সাধারণ লোক মারাই পড়ে। তাই প্রথমেই যদি সংসারসুখ বা তুচ্ছ আনন্দে মজে থেকে পরমানন্দ পাওয়ার বড়াই করা হয়, তা বালক রূপে অজ্ঞ বলে বিবেচ্য।

সংসারটাকে কেবল দুঃখময় বলে বোঝে যারা, তাদের pessimist বা দুঃখবাদী বলা যায়। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য আনন্দলাভ, তাদিগকে দুঃখবাদী বলা যায় কি করে? তাহলে সবাই যখন সুখ বা আনন্দপ্রত্যাশী, তখন সবাই দুঃখবাদী হয়ে পড়ে। optimistরা আপাতসুখ নিয়ে মজে থাকতে চায়, আর pessimistরা তাকে তুচ্ছ করে উচ্চস্তর

প্রত্যাশী। এই দুই ধরণের লোকেরই আসল লক্ষ্য সেই আনন্দই। তবে আনন্দের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে দুঃখবাদী হয়ত বর্ত্তমান আনন্দের আশ্রয় ক্ষুদ্র বস্তুকে উপেক্ষা করছেন, আর আনন্দবাদী হয়ত যা পাচ্ছেন, তাতেই মশগুল হয়ে পড়ছেন। কিন্তু এদের কেহই দুঃখ নিয়ে থাকতে চান না।

বস্তুতঃ এ জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুও আনন্দের প্রতীকরূপে অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের বিষয়রতি আর সে আনন্দে বহু পার্থক্য। এই প্রভেদ ধরা যায় তাদের ব্যক্তিগত আনন্দ প্রকাশের ধার ও পরিণাম দেখে। মূল আনন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি যার হয়েছে, তার কাছে ক্ষুদ্র মাটীর ঢেলাও হয়ত পরমানন্দের উদ্দীপক হয়, আর পক্ষান্তরে বিষয়াসক্তের কাছে সে মাটীর ঢেলা মাটীর ঢেলা বলেই অর্থাৎ তুচ্ছ রূপেই প্রতিভাত হয়; তার মাঝে আনন্দের উপাদান পরিলক্ষিত হয় না। ইন্দ্রিয়োত্তেজক বস্তু ভিন্ন তার আনন্দের আশ্রয় অন্যত্র হতে পারে না। মোটের উপর তার আনন্দ প্রকাশ বিষয়সাপেক্ষ, আর পরমতত্ত্বজ্ঞের আনন্দ বিষয়নিরপেক্ষ। বিষয়নিরপেক্ষ বলে বিষয়ের ধর্ম্ম তিনি যে স্বীকার করেন না, এমন নয়। তাঁর আনন্দ যেমন বিষয় ভিন্নও অর্থাৎ স্থূল উপাদান ব্যতিরেকেও জন্মিতে পারে, তেমনি স্থূল উপকরণকে আশ্রয় করেও জন্মিতে পারে। বরং সাধারণ মানুষের স্থূল আনন্দোপকরণে হয় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, আর পরমতত্ত্বজ্ঞের হয় উদ্দীপনা। অর্থাৎ তিনি যে ভাবের ভাবুক, সেই ভাবের উদ্বোধক হয় বাহিরের উপকরণ। তাই দেখা যায়, সুন্দরী স্ত্রীলোক দর্শনে কামুকের হয় রিপুর উত্তেজনা, আর রামকৃষ্ণ দেবের হত মাতৃভাবের উদ্দীপনা। দুইই আনন্দের বটে অর্থাৎ আনন্দ থেকে জন্ম বটে, কিন্তু উভয়ের পরিণাম ও প্রকাশের ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত।

জগতের সবই মঙ্গলের জন্য, সমস্তই আনন্দময়, সুখের হেতু—প্রভৃতি খুব উঁচু দরের কথা। অতি মূল্যবান্ পোষাক পরিধান করে যদি কয়লার খনির কুলি সাজা হয় বা ধূলায় গড়ানো যায়, তাহলে সে পোষাকের যেমন মর্য্যাদা থাকে না, তেমনি বড় বড় বচন আওড়িয়ে যদি তুচ্ছ কাজে ইন্দ্রিয়তর্পণের পোষকতা করা হয়, তবে সে বাণীর গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হয়। জগতের সবই মঙ্গলের জন্য—আনন্দময় রূপে যার উপলব্ধি হয়, তাঁর প্রতি বাহ্যবস্তুতেই আনন্দ-স্ফুরণ ঘেলে যায়। অসৎ পথে তার পা পড়বার কারণই থাকে না, কেননা তার যে চিত্ত এত উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করার কথা—নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-কাচতে তার মন মজবার কথা নয়। একমাত্র ব্রহ্মানন্দে ডুবে থাকলে সব আনন্দময় বলে অনুভূত হতে পারে। তা ভিন্ন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যার মনের কারবার, সেও যদি সব বিষয়ে আনন্দের বড়াই করে, তাহলে তাকে পাগল বলতে হয়।

তুচ্ছ বিষয়ের আনন্দ পেয়েই যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে মহান্ আনন্দের সন্ধান পাবে আর কেমন করে? কিন্তু ভগবানের এমনি করুণা যে কোনও ব্যক্তিই অল্প নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না। প্রত্যেকের ভিতরেই অহরহঃ "দাও দাও—আরও দাও" রবে কামনানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। যতই বাইরে তৃপ্তের ভাণ করুক, অন্তরে কামনা-কীটের তীব্র দংশনে এক এক সময়ে যে সে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে, তার কথা কজন জানে? এই যে ভগবানের করুণা, কেননা সে এমনি কামনা করবে ও দুর্ব্বল কামনার পরিণাম আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ভোগ করে করে একদিন এসে লুটিয়ে পড়বেই। দুষ্ট মনকে পথে আনতে পরম স্নেহময়ের যে অমনি শাসন! অবিদ্যাচ্ছন্ন মন যে অনিত্য, অশুচি, দুঃখ, ও অনাত্মবস্তুতেই নিত্য, শুচি, সুখময় ও একান্ত আত্মময় বলে জ্ঞান করে। এই অবিদ্যানিবৃত্তি যতদিন না

হবে, যতদিন সেজন্য চেষ্টা না জাগবে, ততদিন এমনি মহাভ্রম তো থাকবেই। সামান্য প্রাপ্তির এই মহা তৌষ্টিকতা ভাঙ্গার জন্যই আঘাতরূপে তাঁর আহ্বান প্রয়োজন। তাঁর সে ডাক শুনলে তবে না ঘুম ভাঙ্গে!

বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সত্য সত্যই আনন্দের দ্যোতক। জ্ঞানীর কাছে জগৎ আনন্দময়ই বটে, কিন্তু তুমি আমি সর্ব্বদা সে আনন্দ অনুভব করতে পারি কি? তবে যা আমার জীবনে এখনো পাইনি, সে বিষয়ে পরের মুখে ঝাল খেতে যাব কেন? জগৎটা আমাদের কাছে নিত্য নূতন আনন্দোপকরণ-সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও যখন সর্ব্বদা আনন্দদায়ক হয় না, তখন কেন 'ভগবান করুণাময়, তিনি আমাদের সুখের জন্য এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন,'—প্রভৃতি বাঁধা বুলি আওড়াব? নিজের জীবনে যতটুকু প্রমাণিত হয়েছে, ততটুকুই প্রচার করতে পারি। যা পাইনি, তা আছে বলে বড় জোর বিশ্বাস করতে পারি, পাবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বড় গলায় অপরের সঙ্গে তা নিয়ে ঝগড়া করা যায় কি করে? সুতরাং দুঃখবাদী বা সুখবাদীর মাঝে জগতের তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ হতে পারে না। কেননা, পরিণামে কেহই দুঃখবাদী নয়, আবার বর্ত্তমানেও সাধারণ মানুষ আমরা জগৎটা সুখময় বলেই সুখবাদী সাজতে পারি না। এমন লোক খুব কম দেখা যায়—যে বলে যে, 'হাঁ আমি সুখী'। যদি বা কেউ বলে, তবে বুঝতে হবে সে হয় মস্ত জ্ঞানী, নতুবা পরম অল্পজ্ঞ—সুতরাং পরম কৃপার পাত্র।

আসল কথা হচ্ছে, সাধনা নিয়ে। আমি যা-ই হই না কেন, উন্নতি চাই; যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থার উন্নতি চাই—সুতরাং সাধনা চাই। ন্যূনতা-বোধ থাকা চাই, নতুবা তা পূরণের জন্য, অভাব মিটবার জন্য আকুলতা আসবে কেমন করে? আর এই ন্যূনতাবোধই দুঃখ, তাই আবার সুখের হেতু। সুখ দুঃখ মিলিয়ে আমাদের জীবন। কেহই সম্পূর্ণ দুঃখবাদী নহেন, কেননা সকলেই সুখের প্রত্যাশী। আবার কেহই সুখবাদী নন, কেননা জগতে সাধক মাত্রেই দুঃখগ্রস্ত। বরং দুঃখ বা অভাববোধের তীব্রতাই অহরহঃ ভগবচ্ছমীপে প্রার্থনীয়। কুন্তী দেবী সেই প্রার্থনাই তাঁর কাছে করেছিলেন। আমরাও যেন তাঁর সেই মঙ্গলময় হস্তের দুঃখ-আঘাতে "আমি কি দুঃখেরে ডরাই" বলে ভক্তের মত, তাঁকেই জড়িয়ে ধরতে পারি। দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সেই আঘাতকারী হাতখানির সঙ্গে যদি স্বয়ং তাঁকে দেখতে পাই, তবেই সব দুঃখ সইবার মত বুকে বল আসবে—তাঁকে নিয়ে আনন্দের সাগরে বিলীন হতে পারব।



ব্রহ্মপুত্র তীরে

"রমেশদা! চল না আজ ব্রহ্মপুত্র-তীরে বেড়িয়ে আসি, আজ আমার একটু অবসরও আছে আর বিশেষতঃ যোগ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করা আমার একান্ত অভিপ্রায়। আর সকালে বিকালে নদীর পার দিয়ে বেড়ানোতে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। আমার প্রায়ই ইচ্ছা হয়, তোমাকে নিয়ে বিচিত্র প্রসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে বেশ অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে মুক্ত-বায়ু সেবন করে আসি।"

রমেশ ॥—"তা, বেড়ানো সম্বন্ধে আমাকে আর এত প্রলোভন এবং উপদেশ দিতে হবে না। তুই বোধ কর খবরও রাখিস্ না পরেশ, আমি কোন্ সময় বেড়াতে যাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠেই আমি সরাসরি ব্রহ্মপুত্রের তীরে চলে যাই। সে সময় হাঁটি খুব দ্রুত, বুকের স্পন্দন সজোরে চল্‌তে থাকে, আর মুক্ত বায়ু সেবন করে যেন প্রাণশক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে! কি যে আনন্দ পাই, তা তোকে কি করে বল্‌ব? তারপর হেঁটে গিয়ে দু-পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করে ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে স্নান করে দেহ-মনকে তর্পিত করে নিই। স্নান করেই পদ্মাসন করে তীরেই একজায়গায় বসি, তার-পর শীতলী-কুম্ভক করি। শীতলী-কুম্ভক কাকে বলে তা বোধ করি তুই জানিস্ না? এ বড় সহজ ক্রিয়া, আর এতে উপকারও হয় যথেষ্ট। বাহির হতে কুঞ্চিত-জিহ্বা সহায়ে নির্ম্মল বায়ু টেনে এনে কিছুক্ষণ কুম্ভক করি, তারপর আবার নাসাপথে সেই বায়ুকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে ফেল্‌তে হয়। এতে সমস্ত আভ্যন্তরীণ যন্ত্রই বিশোধিত হয়ে যায়। এ ক্রিয়া করে আমি এত আনন্দ পাই যে আর বল্‌বার নয়। বায়ু টেনে, আমি মনের জোরে সেই বায়ুকে শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট করিয়ে দিই। তাতে মনে হয়, আমার শরীরের ময়লা-আবর্জনা যেন আর কিছুই থাকে না। এই বিশুদ্ধ বায়ুতে ভিতরের সমস্ত ক্লেদ-আবর্জ্জনা বিধৌত হয়ে যায়।...যাক্—বল্‌তে বল্‌তে অনেক বলে ফেল্‌লাম। বেশ, এখন আর দেরী করার প্রয়োজন নাই। চল্—দু'জনেই এক সঙ্গে আজ বেড়িয়ে আসি। তবে কিনা, আমি নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই বেড়াতে ভালবাসি, এর কারণ আর কিছুই নয়, তেমন উপযুক্ত সঙ্গী পাই না। তোর সম্বন্ধে তোদের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ক্ষিতিশবাবুর কাছে আমি অনেক কথা জানতে পেরেছি। তুই পড়াশুনা রীতিমত চালিয়েও যে যোগ-সম্বন্ধে বেশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিস্, তা জেনে আমি খুব আনন্দিত। আজকাল তেমন যোগীও নাই, আর থাকলেও practical traing দেবার art সকলে জানেন না। আমি মোটামোটি ভাবে যোগশাস্ত্র থেকে

কয়েকটী সূত্র বেছে নিয়েছি। আর তাই practically অভ্যাস করছি। এতে আমি আশাতীত ফল পেয়েছি।”

পরেশ ॥—“রমেশদা, বেশ এখানে আর দেরি করে কোন লাভ নেই, চল হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সব বলা যাবে। এই বলে উভয়েই হাঁটা সুরু করে দিলে। দেখ, রমেশদা, আমি যখন ক্লাশ সিক্স্‌এ পড়ি, তখন থেকেই আমার মন যোগ-সম্বন্ধে অনেক কিছু জান্‌বার দরুণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। নিজের চেষ্টায় একটু-আধটু আসন প্রাণায়ামও করেছি কিন্তু তাতে ঠিক ঠিক ফল পাইনি। আমার মনে তখনই এ সব খেল্‌ত যে আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করতে না পারলে, জীবন কখনো শান্তিপূর্ণ হবে না। আর মানুষের স্বাস্থ্য বলে যে অমূল্য সম্পদ্ রয়েছে, তাকে বর্দ্ধিত করতে পারে, একমাত্র এই ধর্ম্ম। তবে নিছক জ্ঞানালোচনায় দেহের মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য আস্‌তে পারে না। তখনই আমার মনে জাগ্‌ত যে Spiritual impulseকে ধারণা করতে হলে যোগ্য দেহ চাই। আর সেই দেহ ঠিক যোগের প্রক্রিয়া দ্বারাই লাভ হবে। আমারই অনেক Class-friend রয়েছে, পড়াশুনায় বেশ ভাল, চিন্তা-ভাবনাও প্রচুর করে, কিন্তু প্রায়ই আমায় বলে—‘ভাই রিপুর উত্তেজনা তো কমে না।’ এদের মুখ থেকে ঐরূপ শুনে আর আমার নিজেরও অভিজ্ঞতায়ও বুঝ্‌তে পেরেছি যে শুধু মনের অনুশীলন দ্বারাই কল্যাণ হয় না, দেহেরও অনুশীলন চাই অর্থাৎ দেহকে ইন্দ্রিয়কে যত উত্তেজনাবিহীন করা যাবে, ততই কল্যাণ হবে। আমি জানি, আর আমার কাছে এরূপ অনেকে এসে তাদের আত্মকাহিনী প্রাণ খুলে বলেছেও, শুনে আমার দুঃখ এবং তৎপ্রতিকারার্থ একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা আরও বেশী জেগে গিয়েছে মনে। অনেকেরই ভাল হবার ইচ্ছা রয়েছে—কিন্তু পথের দিশারী নেই কেউ। কেউ একটা কল্যাণকর কথা বেশ বুকের জোর দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলতে পারে না। তবে আমাদের হেডমাষ্টার ক্ষিতীশবাবুর মুখ থেকেই আপনার প্রশংসা শুন্‌তে পেয়েছি। আপনি আমার বয়সেও বড়, কাজেই বড় ভাই বলে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনি নাকি যোগ-শাস্ত্রের অলৌকিক সূত্রগুলি বাদ দিয়ে তা থেকে বেছে বেছে কয়টি সূত্র ধরে প্রক্রিয়া করে বেশ ফল পেয়েছেন। আমার একান্ত অনুরোধ—আজ আমাকে যোগ সম্বন্ধে খুব essential এবং preliminary কয়টী উপদেশ দেন। আমার খুব বিশ্বাস হয়, আপনার উপদেশে আমার এবং আমার বন্ধুদের অশেষ হিত সাধন হবে।”

রমেশ ॥—“তুই যা বল্‌লি পরেশ, তা অতি সত্য কথা! আমারও ইচ্ছে হচ্ছে যে আমি practically যে কয়টা প্রক্রিয়া করেছি, সে সম্বন্ধে কয়েকজনকে উপদেশ দেই এবং শিখাই। কিন্তু এদিকে কারও মতি-গতি দেখিনি বলেই এতদিন আমি চুপ করে আছি।

আমি যা করেছি, তার মাঝে বিন্দুবিসর্গও অলৌকিকত্ব নাই, এবং তা অতি সহজ সরল সূত্র। শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করে তা থেকে আমি প্রভূত উপকার পেয়েছি। দেখ্ ভাই পরেশ! আমি জানি, অনেকের ভিতরেই আত্মসংশোধনার্থ একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, কিন্তু কেউ স্থির চিত্ত নিয়ে কোন একটা প্রক্রিয়া কর্‌তে রাজী নয়। যোগের প্রধান কথাই হল, বিক্ষেপশূন্য হওয়া; কাজেই চঞ্চলতা নিয়ে যে কোন exercise করিস্ না কেন, তাতে হিত না হয়ে বরঞ্চ অহিত হয় বেশী। অনেকের কথাই জানি, সকালে বিকালে ছোলা-ভিজান খাওয়ার বন্দোবস্ত, "বুক-ডন" করার ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক আড়ম্বরই করে নিয়েছে; কিন্তু তাদের তাতে মনের উত্তেজনা একটুও কমেনি। কাজেই প্রধান কথাই হল আগে মনটাকে অপ্রমত্ত, অচঞ্চল করে নিবার চেষ্টা কর্‌তে হবে। যাক্ এখন দুএকটি কাজের কথা বলি, আর হাঁটুতে হাঁটুতে যখন ব্রহ্মপুত্রে এসে পৌঁছেছি, তখন এই বালুর চরটায় গিয়ে একটু প্রসঙ্গ করা যাক্।"

পরেশও বল্‌লে—"হুঁ। রমেশদা, চল ঐ বালুর চড়াটাতেই গিয়ে বসি। সেখানে দৃশ্যও খুব সুন্দর।"

পরেশের ঔৎসুক্য এত বেশী যে সেখানে বসেই রমেশদাকে বল্‌লে, "রমেশদা! প্রসঙ্গটা যেন জুড়িয়ে না যায়, বেশ আবার আরম্ভ করে দাও।"

রমেশ॥—"আমি কিন্তু কোন নূতন কথা বল্‌ব না পরেশ। শ্রদ্ধার সহিত যদি তা অনুষ্ঠান করিস, তাহলেই তার ফল পাবি। তবে এইটুকু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং জোর দিয়েই তোকে বলতে পারি যে, এই প্রক্রিয়া করলে অবশ্যই তুই তার ফল অনুভব করতে পারবি।

"যোগশাস্ত্রে দু'টী কথা রয়েছে—একটী হল যম আর একটি নিয়ম। এ দুটি নিয়মকেই পালন করে চল্‌তে হবে। এই দশবিধ যম নিয়মকে সর্ব্বাবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে পালন করে যেতে পারলে তা মহাব্রতে পরিণত হয়, এই মহাব্রত দ্বারাই মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয়। যম হল পঞ্চবিধ। এক একটী বল্‌ছি। প্রথমেই—

অহিংসা—(You should cultivate the spirit of non-violence.)

এ সম্বন্ধে তার বেশী কি বল্‌ব, স্বয়ং গান্ধীই এবার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়েছেন। মানুষ অহিংসা-ব্রতে প্রতিষ্ঠ হতে পার্‌লে জগতের সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। মৈত্রীভাবনা দ্বারা জগতের বিরুদ্ধ শক্তিরও রূপান্তর ঘটিয়ে দেওয়া যায়। কাজেই প্রথমেই অহিংসা ব্রত অবলম্বন কর্‌তে হবে। কেবল প্রাণী-বধ পরিত্যাগ কর্‌লেই যে অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হবে তা নয়, প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতেও পার্‌বে না। কায়িক-বাচিক-মানসিক ক্রিয়া দ্বারা পরকে ব্যথিত করাও উচিত নয়। তা হলেই অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হবে। এই অহিংসানুষ্ঠান আত্যন্তিক বা পরাকাষ্ঠা

অবস্থা প্রাপ্ত হলেই চিত্তে শুক্লধর্ম্মের আবির্ভাব হবে। দ্বিতীয় হল—

সত্য—(Be truthful)

সত্যবাদী হওয়া চাই। প্রাণ গেলেও মিথ্যা বল্‌ব না। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হলেই সত্যপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়। সত্যের দরুণ প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ কর্‌লে চল্‌বে না। সত্য-প্রতিষ্ঠ সাধক মাত্রেই নির্ভীক্ বলে জান্‌বে। তাদের বুকে অসীম বল। তৃতীয় হল—

অস্তেয়—(Do not thirst after possessions).

অল্পে তুষ্ট, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা চাই। চিত্তকে অর্থগৃধ্নু করে তুল্‌তে নাই, বা যশোলিপ্সাতে মজিয়ে রাখ্‌তে নাই। অল্প means অথচ প্রচুর আনন্দ পাওয়া চাই। ঋষিদেরও এই আদর্শ। তাঁরা কোন দিন আড়ম্বরকে পছন্দ করেন নি। অনাড়ম্বর ভাবে জীবন-যাপনই শান্তিপ্রদ। চতুর্থ হল—

ব্রহ্মচর্য্য—(Remain spotlessly pure as regards sex-impulses).

ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাতে যেন নিরপেক্ষ থাক্‌তে পারা যায়, তারই চেষ্টা কর্‌তে হবে। উত্তেজনায় মনকে যেন ঘুলিয়ে না দেয়। চিত্তে যেন দাগ কিম্বা সংস্কার রেখে যেতে না পারে। কাজেই উদাসীনের মত থাক্‌তে হবে। এতেই চিত্তে কোন দাগ লেগে থাক্‌বে না। ইন্দ্রিয়ের বেগকে ধৈর্য্যের সহিত সয়ে যেতে হবে, তাহলেই তাতে কোন বিকার ঘট্‌বে না। এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ চিত্ত spotless (বিশুদ্ধ) অপাপবিদ্ধ অবস্থা লাভ কর্‌বে। পঞ্চম হল—

অপরিগ্রহ—(Be of temperate & Frugal habits).

মধ্যপন্থা ধরে চল্‌তে হবে। গীতাতেও আছে যুক্তাহারবিহার, নাতিশীতোষ্ণ—কাজেই বাড়াবাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আড়ম্বর কর্‌তে নাই, আবার শুকিয়েও মর্‌তে নাই। মোট কথা balance ঠিক রাখা চাই। মিতব্যয়িতা চাই। একদিন প্রয়োজনের অতিরিক্তই গ্রহণ করা গেল, আর একদিন একেবারে কিছুই না, এ সব অসংযমের লক্ষণ, এতে কোনদিন কল্যাণ হয় না। এই জন্যই মধ্য পন্থা ধরে চল্‌তে হবে, যা আজীবন পালন করে চলা সাধ্যায়ত্ত হবে।

এই গেল যম। তারপর নিয়মের কথা আস্‌বে। আজ আর সময় নাই, এখন বাড়ী ফের্‌বার সময় হয়েছে। বেশ এখন রোজই তোর সঙ্গে বেড়াতে আসা যাবে আর এ প্রসঙ্গে তোকে অনেক বলা যাবে। তবে চল, এখন আবার বাড়ীর দিকে ফিরি। আর একটা বিশেষ কথা এই যে, আজ যা তোকে বল্‌লাম, তা তুই মনে মনে ভেবে দেখিস্ সত্যি কিনা। এই পথ ধরে যদি চল্‌তে পারিস, তাহলে ক্রমশঃ তোকে আরও বলা যাবে।"

পরেশ॥—"রমেশ দা! তুমি যখন বল্‌ছ, চল্‌তে পার্‌লে তোমার উপদেশ মত নিশ্চয়ই

চলন। আজ তোমার উপদেশগুলি শুনে নূতন প্রাণ সঞ্চার হল। বাস্তবিকই তো আমাদের শাস্ত্রে এমন সুন্দর কথা রয়েছে, অথচ এর মাঝে অসাধ্য বা অলৌকিক তো কিছুই নাই। যাক্, তুমি যে রোজই আমাকে নিয়ে বেড়াতে আস্‌বে বলে ভরসা দিয়েছ, তাতেই আমি ধন্য।

(ক্রমশঃ)

উপদেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—*—

মুখে বল্‌লেই সমর্পণ হয় না, সমর্পণের পরখ হয় জীবন দিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কল্পকে অক্ষুণ্ণ রাখাও বীর্য্যশালী সাধকের প্রয়োজন। এখানে অনেকেই আসে—কেউ কেউ হয়ত দুই বছর চার বছর থাক্‌ল, কিন্তু যাবার সময় চিত্তের দৈন্য প্রকাশ করে যায়; তাতেই বুঝি তারা ঠিক ঠিক সমর্পণের পথ ধরে চলেনি, সমর্পণের পথ অপ্রমাদের পথ, এ পথে সাধকের কোন দিন জ্বালা কিংবা দুঃখ আস্‌তে পারে না। নিজের জীবনকে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ দান করে কি প্রাণে জ্বালা আস্‌তে পারে?

আমি আশা করেছিলাম (আর এখনো আমি নিরাশ হইনি)—তোমাদের ভিতর দিয়ে একটা নূতন শক্তিশালী আধ্যাত্মিকতার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটবে। কেননা তোমরা নিজেদের ভাল মন্দ সব আমাকে সমর্পণ করে দিয়েছ। এখন তোমাদের শুদ্ধ আধারকে অবলম্বন করে আমার শুভ ইচ্ছাই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে। ভাগবত চেতনার বিকাশস্থল একমাত্র সমর্পিত দেহ-মন-বুদ্ধিই। তোমরা সহজে সেই "অহং"এর কবল হতে নিস্তার পাবার পথ ধরেছ। সমর্পণের পথে অহংকে যত সহজে বিসর্জ্জন করা যায়, আর অন্য কোন পথেই "অহং"কে সেই ভাবে বিসর্জ্জন করা যায় না।

আমি জানি—মানুষ অত্যন্ত অভিমানী। নিজকে বিলিয়ে দেওয়া সকলের সাধ্য নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক—নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানও এসে ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করেন না। সমর্পণের সাধনায় অনেকেরই আতঙ্ক হয়, অনেকে মনে করে, তাহলে তো আসল জিনিষ যে ব্যক্তিত্ব তাই লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের গুরু শিষ্যের সাধনার সম্বন্ধ আবহমান কাল ধরে চলে আস্‌ছে। উপযুক্ত গুরুর আধ্যাত্মিক প্রভাবে উপযুক্ত শিষ্যের আসল ব্যক্তিত্বেরই স্ফুরণ হয়। সেই ব্যক্তিত্বই হল—গুরুত্ব। উপযুক্ত শিষ্য গুরুর কাছ থেকে গুরুত্বই লাভ করে। গুরু শিষ্যের ব্যক্তিত্বকে কোন দিন চেপে রাখতে চান না।

আমি এ কথা বলছি না যে, সমর্পণের পথ ছাড়া আর কোন পথই নাই। কিন্তু সাধনার বৈচিত্র্য

থাক্‌লেও—এক এক জন এক এক সাধনার মর্ম্মোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত। তোমাদের মাঝে সবকে দিয়েই আমি সমর্পণের সাধনার আশা পোষণ করি না—কিন্তু যারা আশ্রিত, যারা স্বেচ্ছায় এ পথ ধরে রয়েছে, তাদের উপর আমার খুবই আশা। বেশ তো, তোমরা এ জীবন দিয়ে পরখ করে যাও—সমর্পণের সাধনায় কোন সত্য নিহিত আছে কিনা—শুদ্ধ ভালবাসার, শুদ্ধ সমর্পণের ভিতর দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় কিনা।

তোমরা যুবক, ইচ্ছা করলে তোমরা যাতে লাগবে, তাতেই সিদ্ধ হতে পারবে। তোমাদের মাঝে সবাই না হয়, অন্ততঃ পাঁচটী নির্ভীক, সাহসী যুবক সমর্পণের পথে সত্যোদ্ঘাটনে মন-প্রাণ-দেহ বিসর্জ্জন দাও। কত দিকেই তো তোমাদের experiment চল্‌ছে, বেশ তো অটুট বিশ্বাস নিয়ে একবার এই সমর্পণের সাধনাতেই দেখ না—শেষ পর্য্যন্ত কি ফল দাঁড়ায়!

তোমরা গুরু-গোবিন্দ সিংহের "বঙ্গল বা শিখ সংস্কারের" কাহিনী বোধ হয় জান। গুরু-গোবিন্দই ছিলেন এই সংস্কারের নেতা। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলব।

গুরুগোবিন্দ সিং আনন্দপুরে বৈশাখী মেলা জমিয়েছিলেন। এই মেলায় শিখ-সংস্কার হবে বলে তিনি সকলকে আহ্বান করেন। মেলার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটী মণ্ডপ। মণ্ডপের প্রায় মধ্যস্থলে গুরুর সিংহাসন। যথাসময় গুরু এসে সভার সিংহাসনে বসে দু-চার কথা বলে, তারপর বল্‌লেন "বিশেষ ভক্ত কয়েকজন শিখের মস্তক আবশ্যক হয়েছে। স্বেচ্ছাক্রমে গুরুকার্য্যের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত কে আছ আইস!" এই কথা শুনে সকলেই হতভম্ব হয়ে পড়্‌ল। গুরুগোবিন্দ সিংহ এরূপ ভাবে একবার, দুইবার, তিনবার সকলকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর্‌লেন। তৃতীয় আহ্বানে দয়াসিং নামক জনৈক ক্ষাত্রিয় শিখ গুরুর কার্য্যে মস্তক দিতে প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হল। তখন নিষ্কোষিত অসি হস্তে গুরুগোবিন্দ তাকে প্রশংসা কর্‌তে কর্‌তে হস্ত ধারণপূর্ব্বক একধারে নির্জন এক তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেলেন। সেখানে তাকে স্থির ভাবে বসিয়ে একটি ছাগ বলিদানপূর্ব্বক রক্তসিক্ত তরবারি হস্তে পুনরায় সিংহাসনে উঠে দ্বিতীয়বার আর একজনকে আহ্বান করলেন। তখন ধর্ম্ম সিং নামক জাঠ শিখ গুরুর কার্য্যে মস্তক দেবার দরুণ প্রস্তুত হল। তাকে নিয়েও গুরুগোবিন্দ পূর্ব্বের মতই কাজ কর্‌লেন। এরূপ ভাবে তৃতীয় বার মহকম সিং, চতুর্থ বার সাহেব সিং (নাপিত), পঞ্চম বার হিম্মং সিং নামক জনৈক কাহাড় গুরুর কার্য্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল। গুরুর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে এই পাঁচ জনকে নিয়ে পুনরায় তিনি সভাস্থলে ফিরে এলেন। উক্ত পাঁচ জনের নির্ভীকতার প্রশংসা করে, তিনি বল্‌লেন যে, এই পাঁচ জনই প্রকৃত শিখ নামের যোগ্য। গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, গুরুবাক্যের উপর কোন প্রকার সংশয় না করে, মরণ-বাঁচন ভয়কে অবহেলা করে যারা চল্‌তে পারে, তারাই শিখ। আমি আজ এই পাঁচ জনকেই দৃঢ় বিশ্বাসী শিষ্যরূপে পেয়েই আমার বিশ্বাস হয়েছে এই শিখ-সম্প্রদায় "খালসা" নামে অভিহিত হবার যোগ্য। এক্ষণে এঁদের পাঁচ জনকে মন্ত্রপূত করে নেওয়া যাক্।" এই বলে গুরুগোবিন্দ সিং একটা লৌহ-পাত্রে জল আনিয়ে তাতে ভগবতী দত্ত কায়া (তরবারি) ডুবিয়ে "জপজী" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে সেই জলকে অমৃতময় পূত করে নিলেন। সেই অমৃত জল প্রথমে পাঁচ জনকে পাঁচ গণ্ডুষ খেতে দিলেন। তারপর বক্ষে ও মস্তকে তা সিঞ্চিত

করে দিলেন। গুরুগোবিন্দ তাদের আহ্বান করে বললেন—"আজ থেকে তোমরা খালসা হলে, এখন তোমাদের সঙ্গে গুরুর বিভিন্নতা রইল না। তোমাদের পূর্ব্ব নাম ও নিবাস ভুলে যাও। এই সংস্কারে তোমাদের নব জন্ম লাভ হল। এখন তোমাদের জন্মস্থান কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, পাটনা, বাসস্থান আনন্দপুর, জাতিতে ক্ষত্রিয়।"

এই হল বহল বা শিখ সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই পাঁচ জনের শিষ্যেরাই খালসা নামে অভিহিত হয়ে আসছে। প্রথমে পাঁচ জন নির্ভীক বীর শিখই প্রাণদান করতে প্রস্তুত হয়েছিল। গুরুর আহ্বানকে বিনা-বিচারে এই পাঁচ জনই মেনে নিয়েছিল। বলতে গেলে উক্ত পাঁচ জনই শিখ-সম্প্রদায়ের আদি বীজস্বরূপ। এরূপ ত্যাগী নির্ভীক শিষ্য না পেলে গুরুগোবিন্দ কিছুতেই তাঁর মনোভিলাষ পূর্ণ করে যেতে পারতেন না।

বিনা বিচারে আদেশ পালনকে কেউ কেউ দুর্ব্বলতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতা বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু দেখ, জগতে মহান্ কাজের মূলে এরূপ নির্ব্বিচার আত্মত্যাগের মূল্যই বেশী। প্রথমে নির্ব্বিচারে এরূপ ভাবে আত্মত্যাগ করতে না পারলে কোন মহান্ কাজই সুসম্পন্ন হয় না।

বিচার শক্তি সর্ব্বত্রই প্রয়োজন। কিন্তু বিচার যেখানে শুচিবাইএর মত আচ্ছন্ন করে রাখে, সেখানে বিচারের কোন মূল্য নাই। যে বিচার মানুষকে দুর্ব্বল করে—মানুষকে মনুষ্যত্বের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

গুরুগোবিন্দের আহ্বানে যে পাঁচ জন অগ্নিময় বিশ্বাস দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে, মরণের পথে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে এসেছিল, তারাই ঠিক শিষ্যের উপযুক্ত। বিশ্বাসে মানুষ অন্ধ হয় না। বিশ্বাস দ্বারা সিদ্ধি লাভের সঙ্কেত আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশী।

এই জন্যই তোমাদের আমি বারবার বলি, আর কিছু লাগবে না তোমাদের। তোমরা শুধু গুরুর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। বেশী না, পাঁচটী অগ্নি-বিশ্বাসী যুবককে আমার কর্ম্মের সহায়রূপে পেলে, আমার সঙ্কল্প অবহেলে সিদ্ধ করে তুলতে পারি কি না দেখো! অটল-বিশ্বাসী পাঁচটী সত্যান্বেষী যুবক দিয়ে আমি সমগ্র জগতে এক নূতন আধ্যাত্মিক প্রবাহ ছুটিয়ে দিতে পারি। চাই শুধু প্রাণ—চাই অচল-অটল বিশ্বাস।

কাজে নামবার আগেই তোমরা বিশ্বাসহীন হয়ে পড়, দুর্ব্বল হয়ে পড় অনেক ক্ষেত্রে! বিশ্বাসে মানুষের বুক পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, সে বুক দিয়ে অলঙ্ঘ্য বাধা বিঘ্নকেও ঠেলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিশ্বাসীর বুকের আশা সহজে চূর্ণ হয় না। মরণ পণ—তবু তাদের বিশ্বাসের এক তিলও ব্যত্যয় হয় না!

কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করতে পারলেই জীবন উন্নত হয় না। শাস্ত্রে অনেক উপদেশ, অনেক তত্ত্বকথা পড়ে রয়েছে, কিন্তু আমি খুব ভেবে দেখেছি, শাস্ত্রের শোনা কথায় কোন ফল হয় না। এই জন্যই তোমরা যাতে পণ্ডিত না হয়ে মানুষ হয়ে উঠ, তার প্রতি আমার এত লক্ষ্য! মানুষ হতে হলে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি এই তিনটী দৈবীগুণ অত্যাবশ্যক।

যজ্ঞে যারা আত্মাহুতি দেয়—তাদের আমি সব চেয়ে বড় দৃষ্টিতে দেখি! জীবনটাকে অকাতরে অকুণ্ঠিত চিত্তে এক মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ যারা বিসর্জ্জন দিতে পারে, তারা মৃত্যুঞ্জয়ী—প্রাণায়াম সাধনায় সিদ্ধ! তাঁরাই ঠিক মহাপ্রাণে যুক্ত হতে পেরেছে!

গুরু শিষ্য উভয়ের মাঝে সমান জোরের বিশ্বাস

থাকা প্রয়োজন। তাহলে সেখানে এক আশ্চর্য্য শক্তির উন্মেষ হয়। তোমরা এরূপ আমার দু'এক জন শিষ্যের কথা হয়ত জান! আর বাস্তবিকই আজ সগৌরবে বলছি, আমি যদি বিশ্বাসী, শ্রদ্ধা-পরায়ণ কয়টী যুবক না পেতাম, তাহলে আজ এতদূর অগ্রসর হতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিল ঠিক তারাই। আমাকে পর্য্যন্ত এক এক সময় স্তম্ভিত করে ফেলেছে তারা। তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, কিন্তু এজন্যই তারা বড় হতে পারেনি। তারা বড় হতে পেরেছিল, মানুষের মনুষ্যত্বধর্ম্মের উৎকর্ষ করে! আমার কাছে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে রিক্ত হয়ে একদিন দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যাবার সময় তারা আত্মার আনন্দ বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে এই বলে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল! আজ তারা ইহ জগতে নাই। কিন্তু তাদের কাছে আমি ঋণী—একথা বলতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই, কিম্বা এতে আমার গুরুত্ব লঘু হবে না! শাস্ত্রে পুরাণে মুক্তির যে সব পথ দেখানো হয়েছে, তা অসত্য একথা বলছি না। কিন্তু এর চেয়ে অতি সহজে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে। আমি নিজেও সাধন ভজন করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, দেখেছি তার চেয়ে অনেক ছোট কথায়, সহজ সরল পথে মানুষ উন্নত হতে পারে। আর ঠিক কাজ হয় তাতেই! এই জন্যই সহজ সরল ভাবে, সাধুত্ব বজায় রেখে দৈনন্দিন কর্ম্ম করা ছাড়া আর কোন কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যার কথায় আমি জোর দিই না। আমরা না বুঝে শরীরিক মানসিক শক্তির অপব্যয় করি।

বিশ্বাস করে যারা তলে তলে বিশ্বাসঘাতকতা করছ, তারা আমার তো ক্ষতি করছই, নিজেদের জীবনকেও ভবিষ্যতের দরুণ বিপন্ন করে তুলছ। আগা-গোড়া একটা বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে আশ্রিত হয়ে থাকার কোন সার্থকতা নাই। তারা অনায়াসে নিজের সঙ্কল্প সিদ্ধির পথ দেখলেই কল্যাণ হয়। আমি কাউকে মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ করে রাখছি না। ধর্ম্ম যাদুমন্ত্র নয়, ধর্ম্ম ভেল্কিবাজীর জিনিষ নয়। তোমাদের মাঝে এমন অনেক আছে বা এক দিন ছিল, যারা আমি অলৌকিক বিভূতি কিছু দেখাই না বলে রাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, কিম্বা গিয়ে আবার ফিরে এসেছ। আমি তোমাদের দোষ দিই না—দোষ ধর্ম্মব্যাখ্যাতার।

আমি উপলব্ধিতে যা পেয়েছি, তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে, মানুষকে অতি সহজে, অতি ছোট-খাটো কথায় বেশী এগিয়ে দেওয়া যায়। আমি কয়েকটী কথাকেই জীবনের উন্নতির বীজমন্ত্র স্বরূপ ধরে নিয়েছি। তোমরা বিশ্বাস করে চলে দেখ, তাতে কি আশ্চর্য্য ফল! (ক্রমশঃ)

“স্বারাজ্যমাধিপত্যম্”

—*—

কৌষিতকি উপনিষদে স্বারাজ্য লাভের উপায় সম্বন্ধে বেশ সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। আত্মজ্ঞানই স্বারাজ্য আধিপত্যের একমাত্র উপায়।

তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রজ্ঞ আত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্টঃ আ লোমেভ্য আ নখেভ্যঃ। তমেতমাত্মানম্ এত আত্মানোঽন্ববস্যন্তি। যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ। তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। এবং বৈ তমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি। স যাবদ্ধ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদেনমসুরা অভিবভূবুঃ। স যদা বিজজ্ঞে অথ হত্বা অসুরান্ বিজিত্য সর্বেষাং দেবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পরীয়ায়। তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্ব্বান্ পাপ্মানোঽপহত্য সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ য এবং বেদ॥

—“যেমন ক্ষুর ক্ষুরাধারে অথবা অথবা অগ্নি অগ্নিরক্ষণ স্থানে (Fire-place) থাকে, তেমনি এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই শরীরকে আত্মময় করিয়া ইহার প্রত্যেক নখ এবং লোম পর্য্যন্ত ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই সকল আত্মারা (অর্থাৎ বালাকির উল্লিখিত পুরুষেরা) তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন, যেমন আত্মীয়েরা শ্রেষ্ঠীর অর্থাৎ কুলপতির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠী যেমন আত্মীয়দিগের সহিত ভোজন করেন, অথবা যেমন আত্মীয়গণ শ্রেষ্ঠীর উপর ভরণ-পোষণের জন্য নির্ভর করে, তেমনি এই আত্মা অন্য সকল আত্মার সহিত বিষয় ভোগ করেন, এই সকল আত্মা এই শ্রেষ্ঠ আত্মার উপরই তাহাদের ভোগের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে। যত দিন ইন্দ্র এই আত্মাকে জানিতে পারেন নাই, ততদিন তাঁহাকে অসুরেরা পরাজিত করিয়াছিল। তিনি যখন ইহাকে (অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে) জানিলেন, তখন তিনি অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং আধিপত্য লাভ করিলেন। তেমনি যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সমুদয় পাপকে অপহত করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও আধিপত্য লাভ করেন।”

দেবাসুরের সংগ্রাম আবহমান কাল ধরিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এখনো এই মর্ত্ত্য জগতেও এই সংগ্রাম চলিয়াছে। আত্মজ্ঞ দেবতারাই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। দেবতারা যতদিন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠ হইতে না পারে, ততদিনই অসুরের জ্বালাতন। অসুরেরা সুযোগ পাইয়া দেবতাদিগকে তখনই বেশী করিয়া আক্রমণ করে। কাজেই অসুরকে বিতাড়িত করিবার একমাত্র উপায় এবং মহৌষধই হইল—আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত দেব মানবই অসুরের অখণ্ড প্রতাপের ভয়ে জড়সড়, কিন্তু একবার কোন মতে সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অনুভূতি লাভ করিতে পারিলে, সেই বজ্রদৃঢ় অনুভব দ্বারা বাহির ভিতর সকল দিকের শত্রুকেই পরাজিত করিয়া রাখা যায়।

দেবতারা তরবারির সাহায্যে দিগ্বিজয় লাভ করেন নাই, তাঁহারা অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন—আত্মানুভবের দিব্য মন্ত্র দিয়া। সেই মহান্ অনুভবই হইল দিব্য অস্ত্র। এই অস্ত্রের সঙ্গে অসুরদের পারিয়া উঠা দুষ্কর। তাই দেখি, দেবতারা যখন আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান পাইলেন, তখনই অসুরেরা দেবতাদের ভয়ে কম্পিত,—এর আগে দেবতাদের উপর অসুরদের অখণ্ড আধিপত্য ছিল।

ভারতের দিব্য অনুভূতিসম্পন্ন ঋষিদেরই বংশধর আমরা, কাজেই ভারতের রাষ্ট্র সংগ্রামেও আজ এই দিব্যাস্ত্রের সন্ধানই পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী নিজেও একজন সত্যাগ্রহী এবং এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনেই সকলকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তিনি সকলকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিতে বলিলেন—স্বরাজ লাভ করিতে হইলে বিনা তরবারিতেও যে তাহা লাভ করিতে পারা যায়, এই অটুট বিশ্বাস দ্বারা তিনি সমগ্র জাতির প্রাণে এক বিদ্যুন্ময় প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। তাই দেখি, ভারত আজ শান্তির ভিতর দিয়া স্বারাজ্য আধিপত্য লাভ করিবার দরুণ উন্মুখী হইয়াছে।

অটল বিশ্বাস দ্বারা গান্ধী নব শক্তি অর্জ্জনে সক্ষম হইয়া ছিলেন। তাই অহিংস সংগ্রামের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ। তিনি এই সত্যানুভবের মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার বুকে এত বল সঞ্চয় হইয়াছে। কত ভয় কত আশঙ্কা, তাহারা কাছ ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই কেহ।

তিনি যে পথ ধরিয়াছেন—তাহা ঋষির পথ। তাঁহার একমাত্র অবলম্বন সত্য—সেই সত্যের অনুভবেই তিনি সকল দিকেই পাষাণবৎ হইতে পারিয়াছেন—অন্তরে বাহিরে কোন শত্রুই তাঁহাকে বা তাহার উজ্জ্বল অনুভূতির দীপ্তিকে ম্লান করিতে পারিতেছে না। তিনি যদি বিপ্লবী হইতেন, তাহা হইলে শান্তির ভিতর দিয়া কখনো ইষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। কিন্তু যে দিব্য অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার অখণ্ড প্রতাপের কাছে, আর সকল পথ, সকল মতকেই অবনত হইয়া থাকিতে হইতেছে।

সংগ্রাম জয়ের দৈবী পন্থাই হইল আত্মানুভব—সত্যের প্রতি অচল নিষ্ঠা। ঋষিরা এই পথে চলিয়াই সকল দিকে বিজয়ী হইয়াছিলেন। কাজেই জীবনের উন্নতি লাভ করিতে হইলে, আবার আমাদের ঋষিদের পন্থা অবলম্বন করিয়াই জীবনের পূর্ণ পরিণতি করিতে হইবে।

বুদ্ধি দ্বারা তৈরী অস্ত্রের চেয়ে, হৃদয়ানুভূতির সত্য প্রতিষ্ঠারূপ তীক্ষ্ণ শলাকার বেগ এবং শক্তি ঢের বেশী। মানুষের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিলে, বাহিরের অস্ত্র আপনি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িবে—কেননা সেও যে মানুষ। মানুষের ভিতর মনুষ্যত্ব উদ্বোধন করিবার যজ্ঞই অগ্রে করিতে হইবে। এই যজ্ঞে আত্ম-বিশ্বাসই হইল প্রধান উপকরণ। কাজেই যাহারা পাষণ্ড, দুর্দ্দান্ত যাহাদের ভিতর মনুষ্যত্ববোধ এখনো সুপ্ত, আত্ম-বিশ্বাসের অমোঘ প্রভাব দ্বারা তাহাদের সুপ্ত বৃত্তিকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

মানুষে মানুষে কোনদিন সংগ্রাম হয় না, সংগ্রাম হয় মানুষে অমানুষে। সেই জন্যই মানুষকে, সকলের মাঝেই মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করিতে হইবে। আত্মানুভব না হইলে মানুষ সহজে এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। এইজন্যই নিজে আত্মানুভব করিয়া তাহার পর অপরকেও

সেই অনুভবের সঙ্কেত শিখাইয়া দিতে হইবে।

কি সুন্দর কথা—"জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই শরীরকে আত্মবোধ করিয়া ইহার প্রত্যেক নখ এবং লোম পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।" এই অনুভব যাহার লাভ হইয়াছে—গীতার ভাষায়—তাহাকে কোন শস্ত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। স্পর্শ করিবার সুযোগই যে নাই তাহার শরীরে। সর্ব্ব শরীরই আত্মানুভবের উজ্জ্বল মহিমায় প্রদীপ্ত! কোথাও তাহার কলুষিত ভাব নাই—কোথাও তাহার দৈন্য নাই, ক্লান্তি নাই।

কিন্তু এই যে দৈবী অনুভব, ইহা সহজেই আসে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর, দৈবী প্রকৃতি বা পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে তবে শরীরের বিশুদ্ধতার দরুণ সেই অনুভব স্থূল শরীরেও নামিয়া আসে। এই জন্যই এই দুর্ল্লভ অনুভূতি লাভ করিতে হইলে শরীরের জড়ত্ব, মনের জড়ত্ব, সব জড়ত্বকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে। আর জড়তা কাটাইতে হইলেই সংযমের পথে চলিতে হইবে।

আত্মানুভবের পথ—সংযমের পথ। সকল দিকে সংযমী হইলে পর সেই দুর্ল্লভ অনুভূতি লাভ করা যায়। তখন রিক্তহস্তে বিনা অস্ত্রে সমস্ত জগৎকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতে পারা যায়। গান্ধী সেই আত্মানুভূতিই লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহার শারীরিক স্থূলতা না থাকিলেও, আত্মার বিদ্যুন্ময় তীক্ষ্ণ দীপ্তিতে সকলেই তাঁহার কাছে অভিভূত।

শত্রু পরাজয়ের অপূর্ব্ব এবং সহজ সঙ্কেতই হইল এই। ইহাতে পরের উপর অস্ত্র প্রয়োগের দরুণ চঞ্চল হইতে হয় না, নিজের ওপর কঠোর সংযমরূপ দিব্য মন্ত্র বলে নিজকেই শোধিত করিয়া লইতে হয়। কাজেই মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলিতে গেলে—সকলকেই সত্যাগ্রহী হইতে হইবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে, আর সত্যকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিলে বিজয় লাভ অবশ্যম্ভাবী!

আত্মা শরীরের প্রতি লোমকূপে অনুপ্রবিষ্ট, কিন্তু এই অনুভব চিত্তের মালিন্য হেতু সকলের কাছেই স্পষ্টোজ্জ্বল নয়। আত্মা শরীর হইতে বিবিক্ত নয়—আত্মা এই শরীরময়। ভাগবত তনু-লাভেরও এই একমাত্র সঙ্কেত। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিচিত্র জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর এই ভাবেই তাহাদের দিন কাটিতেছে। কিন্তু যাহাদের প্রাণে জ্বালা আসিয়াছে, আর সেই তাপে বিশুদ্ধ হইয়া অন্তরের মালিন্য ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যাইতেছে, তাহারাই সেই অনুভূতির যোগ্যতা লাভ করিতেছে!

চিন্ময় দেহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহে আসক্ত নন, অথচ দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত! দেহকে তাঁহারা আত্মা হইতে বিবিক্ত বলিয়া ভাবিতে পারেন না, এইজন্যই তাহাদের দেহ দিব্য দেহ। নিছক দিব্য দেহেরও একটা প্রভাব রহিয়াছে।

স্থূল শরীরকে একমাত্র আত্ম-বোধ দ্বারাই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করা যায়! তখন এই দেহই হয় আত্মার বাহন, রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বলিতে গেলে, তখন আর বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু শরীরের প্রতি অণুপরমাণুকে আত্মার বিশুদ্ধ রসে জারিত করিয়া ফেলিতে না পারিলে, সেই দিব্য অনুভূতির অধিকারী হওয়া যায় না। এই জন্যই বহু-কষ্ট, বহু সাধ্য-সাধনার পর মানুষের দিব্য দেহ দিব্য-জন্ম লাভ হয়।

এই দিব্য-অনুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রসংগ্রামকেও আধ্যাত্মি-

কতার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি তাই বলিয়াছেন—Politics is placed on religion—আধ্যাত্মিকতা ছাড়া কোন সংগ্রামেই বিজয় লাভ করা যায় না। নিজের জীবনে সত্যের গভীর অনুভূতি না পাইলে, ধর্ম্মকেই সকল প্রচেষ্টা সকল সংগ্রামের সিদ্ধি-লাভের হেতু বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না।

ভারতের সাধনায়, সংগ্রামে সর্ব্বত্রই একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের দরুণই ভারতকে আজও পৃথিবীর প্রায় সমগ্র জাতিই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেছে। ভারতের বল এই আত্মিক বল। এই আত্মিক বলের সন্ধান পাইয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—রাজনীতিক্ষেত্রে নামিয়াও যিনি ভিতরে ভিতরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সাধনা করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার বাহিরের জীবন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে নিগূঢ় ভাবের সাধনা তাঁহার মাঝে চলিয়াছিল, তাহাই তাঁহার আসল দিক্।

যে কোন বিরাট উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে নামিয়াই ভারতের সন্তান প্রথমেই ধর্ম্মই যে সর্ব্বসিদ্ধির মূল তাহা সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। কাজেই বিরাট কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকের মাঝেই আবার একটা অন্তরনিগূঢ় ভাবের সাধনাও চলিতে থাকে। আমাদের ধর্ম্মবোধ অস্থিমজ্জায় অনুগত, কাজেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্ষেত্রেই আমরা বিজয়ী হইবার আশা পোষণ করিতে পারি না।

আত্মানুভবই হইল মূল—ইহাকে ভিত্তি করিয়া সকল দিকেই সফলকাম হওয়া যায়। কাজেই আধ্যাত্মিক পথে আগে আত্মোপলব্ধি করিতে না পারিলে, কোন দিকেই তেমন সাহস এবং নির্ভরের সহিত কাজে নামা যায় না। বিনা সাধনায় আত্মানুভব আসে না। এই জন্যই সাধনা দ্বারা নিজের আত্মার অজরত্ব, অমরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে অন্য যে দিকেই লাগা যায়, সেই দিকেই মনস্কাম সিদ্ধ হয়। স্বর্গের রাজাধিরাজ স্বয়ং ইন্দ্রও অসুরদের ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িতেন। ইহার কারণ আর কিছু না, তখন তাঁদের আত্মানুভব সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। তিনি যে আত্মানুভবের অক্ষয় কবচে সুরক্ষিত, নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে রহিয়াছেন, এ বিশ্বাস তাঁহারই জন্মে নাই—এই জন্যই অসুররা তাঁহার দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে বার বার পর্য্যুদস্ত করিয়া দিত। কিন্তু ইন্দ্র যখন আত্মাকে জানিতে পারিলেন, আলোম আনখ পর্য্যন্ত আত্মা অনুপ্রবিষ্ট ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এই অনুভূতি লাভ করিলেন—তখনই তিনি প্রকৃত স্বারাজ্যাধিপত্য লাভ করিলেন।

বাহির ভিতর তখন কোন দিক হইতেই শত্রু আক্রমণ করিতে পারে না। আত্মবিদ্‌কে দেখিয়া সকলের প্রাণে বরঞ্চ আতঙ্কই উপস্থিত হয়। আর ভিতরের শত্রু তো আত্মানুভবের প্রখর দীপ্তিতেই বিনষ্ট হইয়া যায়—কেননা সর্ব্ব অঙ্গ তখন আত্মানুভবের মহিমায় প্রদীপ্ত। শত্রু আক্রমণ করিবার কোন ছিদ্র বা পথই থাকে না শরীরে। তখন সর্ব্ব শরীর আত্মময়।

শত্রুকে পরাজিত করিতে হইলে আত্মাকেই জানিতে হইবে। কাজেই বাহিরে অস্ত্র সংগ্রহ না করিয়া, নিজের আত্মোপলব্ধিতে সুদৃঢ় বলিষ্ঠ হইতে পারিলে, আর কোন অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। শত্রুকে শান্তমনে পরাজিত করিবার একমাত্র সঙ্কেত এই আত্মানুভব।

কাজেই শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বারাজ্যলাভ করিতে হইলে জাতিকে আত্মস্থ হইতে হইবে। আত্মানুভবের ভিতর দিয়াই স্বারাজ্য সিদ্ধি—কাজেই ভারতের স্বারাজ্য সিদ্ধির সংগ্রামও অধ্যাত্ম সংগ্রাম। ভারতের কুরুক্ষেত্রও—ধর্ম্মক্ষেত্র।

অন্নপূর্ণা-পূজা

—*—

মা অন্নপূর্ণার পূজার চারিটী ব্রত। সেই ব্রতানুষ্ঠানেই মা পরিতুষ্টা। সেই ব্রতের কথা ভুলে যাই বলেই আমাদের এত দুঃখ, এত দৈন্য, আর এই জন্যই স্নেহময়ী জননী অন্নপূর্ণার স্নেহ-দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়ে হাহা-হার করে দিন কাটাই। মায়ের ছেলে মায়ের আদেশ ভুলে যখন বিপথে চলতে আরম্ভ করে, তখনই তার আপদ-অশান্তি এসে জুটে। আঘাতে দুঃখ-দৈন্যের নিষ্পেষণে চিত্তের মালিন্য যখন অপসারিত হয়ে যায়, তখনই মায়ের আদেশের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মাকে ভুলে থাকা যায় না কিছুতেই—এই জন্যই তো মা—মা। চারিটী ব্রতের প্রথমটীই হল—

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চেসন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥

"অন্নের নিন্দা করতে নাই, তা ব্রত। প্রাণ অন্ন, শরীর অন্নভোক্তা। প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত। শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন। পুত্রাদি পশু, ব্রহ্মতেজ এবং মহান্ কীর্ত্তি লাভ করেন।"

অন্ন দ্বারাই প্রাণ পুষ্ট, আবার পুষ্টিতেই অন্নের সার্থকতা। কাজেই অন্নই ব্রহ্ম! ব্রহ্মে ব্রহ্মে অপূর্ব্ব মিলন, আর তা থেকে উদ্ভূত হয় এক আশ্চর্য্য শক্তি। এই শক্তি লাভ করেই মানুষ উজান পথে এগিয়ে চলবার সাহস করে। শক্তিময়ী মাকে পাবে কেমন করে? অন্নের সাত্বিক নিবেদনেই প্রাণময়ী অন্নপূর্ণার তৃপ্তি। অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, অন্নেই মা পরিপূর্ণভাবে রয়েছেন—এই জন্যই তো মাকে বলি অন্নপূর্ণা।

আমাদের প্রাণ মরে আসে কেন?—অন্ন নাই বলে। অন্ন কর—প্রাণে প্রচুর বল পাবে। মা অন্নপূর্ণার সন্তানের অন্নের অভাব কি? অন্ন করলেই প্রচুর অন্ন হয়। অন্ন উৎপাদনকারী জাতিই মায়ের প্রকৃত সন্তান, তারাই ঠিক শক্তিশালী; মায়ের পরিপূর্ণ সবল বিশুদ্ধ কৃপা তারাই লাভ করেছে। অন্ন উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও তাদের অদম্য শক্তিতে নেচে ওঠে। এই অন্ন করে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি!

গ্রামের কৃষক যাদের বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, তারাই ঠিক মা অন্নপূর্ণার কৃপা লাভ করে ধন্য হয়। ওরাই মাকে পায়, বুকের

রন্দে জল করে এই যে খাটুনি—এতেই মায়ের যথার্থ পূজা করা হয়। এই আনন্দের চেয়ে নবীন সতেজ আর কোন আনন্দেরই তুলনা হতে পারে না। মাকে ওরাই সহজ ভাবে পায়। ওদের পথই আদর্শ। মা অন্নপূর্ণার পূজা সে দিনই হবে, যে দিন বিলাসিতা ছেড়ে, ভণ্ডামী ছেড়ে, সবাই গিয়ে অশিক্ষিত কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেবে। অন্নপূর্ণা মায়ের আবির্ভাব সেই শুভদিনে শুভ লগ্নেই হবে।

অন্নং ন পরিত্যক্ষত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥

অন্নকে পরিত্যাগ করতে নাই। অর্থাৎ ভিখারী সাজ্‌তে নাই। শক্তি থেকে যার জন্ম, তার মাঝে ফকির ভাব আস্‌বে কেন? আগুন হতে যে আগুনের হল্কা বের হয়, তাও আগুনই। তাই যেখানে লাগে, সেখানটা পুড়ে যায়। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে, তপোবলে তার শক্তি অবিক্ষুব্ধ, অচঞ্চল কর্ম্মধারাতে রূপান্তরিত হতে পারে। তা বলে দৈন্য আস্‌বে কেন, সর্বৈশ্বর্য্যময়ী মায়ের সন্তানের ভিখারী সাজ্‌তে হবে কেন? মা ভোলানাথের রিক্ত ভাণ্ডকেও পূর্ণ করে তুলেছেন। মায়ের রাজ্যে অপূর্ণতা নাই, অভাব নাই।—পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতম্; আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা॥

—অন্ন বহু করা চাই। কেবল নিজের উপর তৃপ্তি বা নিজের কাজ চলে গেলেই চলবে না। পূর্ণতার আতিশয্য চাই—ঐটুকুই তো ঐশ্বর্য্য। মায়ের সন্তানদেরও এই ঐশ্বর্য্য লাভ করতে হবে। নিজের হয়েও আরও অনেক সঞ্চিত থাক্‌বে। তবেই না তা মা অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার হবে। এই জন্যই বলা হয়েছে, বহু অন্ন কর্‌বে। নিজে খাবে, পরকে খিলাবে, পূজা পার্ব্বণ কর্‌বে, তবেই না তুমি ঠিক খাঁটী গৃহস্থ। পুত্র চাই, ব্রহ্মতেজ চাই—তবেই তুমি মহাশাল—মহাগৃহস্থ হলে।

নিজকেই সব কর্‌তে হবে—অপরের দ্বারে ভিখারী সাজতে হবে কেন? স্বাবলম্বীর ব্রহ্মানুভূতির মাঝে জোর কত! "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ"—বাস্তবিকই ভিক্ষাদ্বারা কোন দিকে জীবনের উন্নতি নাই। যে ফকির, তার ব্রহ্ম-চিন্তার সে সবল মস্তিষ্ক কোথায়? রাত্রি দিন অন্নচিন্তাই যাদের ছাড়ছে না—তার আবার ব্রহ্মচিন্তা কর্‌বে কিসের? অন্নই তো ব্রহ্ম—কাজেই অন্নেরই চাষ করতে হবে।

এ সব কিন্তু উপনিষদেরই সার কথা। যে সব ঋষিরা এ সব বাণী প্রচার করে গিয়েছেন, তাঁরা "পেটকোরাস্তে" সাধু ছিলেন না--তাঁদের পুত্র ছিল, পশু ছিল, ব্রহ্মতেজ ছিল। কাজেই তাঁরাই ছিলেন জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শের

অভিনেতা। জীবনে কোথায়ও অপূর্ণতা ছিল না তাঁদের! তারা অন্নও করতেন, ব্রহ্ম-চিন্তাও করতেন। অন্নের দরুণ পরের দ্বারে ভিখারী সাজতে হত না তাঁদের। এই জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিদের আদর্শ ধরলেই—মা অন্নপূর্ণাকে আবার আমরা পরিতুষ্ট করিতে পার্‌ব। আমাদের খাবার দুঃখ যদি দূর হয়, তাহলে সব দুঃখ আপনি দূর হয়ে যাবে।

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে।

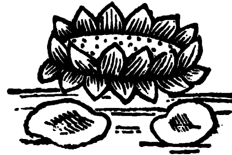
যে কোন প্রকারেই হোক্ বছরের খোরাকটা সংগ্রহ কর্‌তেই হবে—ভিক্ষা করে নয়, কৃষি দ্বারা। কেউ যদি অতিথি হয়ে আসে, তাকে ফিরিয়ে দেন না—ইহাই হল ব্রত। সাধু গৃহস্থগণ অতিথি অভ্যাগত কাউকে বিমুখ করেন না।

কাজেই বহু অন্নের প্রয়োজন। এই অন্ন উৎপন্ন হয় কৃষি থেকে। কাজেই কৃষি কর্‌লেই মা অন্নপূর্ণার সব চেয়ে বড় পরিতৃপ্তি! মা আমাদের সব দিয়ে রেখেছেন, পৃথিবী দিয়েছেন, জল দিয়েছেন, বায়ু দিয়েছেন, আকাশ দিয়েছেন—এক কথায় বল্‌তে গেলে কৃষির ভূমি এবং সব উপকরণই আমাদের দিয়েছেন। এখন চাই শুধু করে খাওয়া!

মায়ের অহেতুক দানকে উপেক্ষা করে চল্‌ছি, তাই আমাদের এত কষ্ট, এত হাহা-কার। যে জমিতে চাষ কর্‌লে সোণা ফলে, তাকে আমরা রেখে দিয়েছি পতিত। কাজেই ঘরে আমাদের খাবার নেই—অন্নপূর্ণা পূজা আমরা করব কি দিয়ে?

মায়ের আদেশ শুনেছিলেন ঋষিরা—তাই তাঁদের দুঃখ-দৈন্যে প্রপীড়িত হতে হয়নি। তাঁরা সেই চারিটি ব্রত একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা প্রতিপালন করেছিলেন। আমাদেরও দুঃখ-দৈন্য থাক্‌বে না, চিন্তায়-ভাবনায়-কর্ম্মে আমারাও স্বাধীন হতে পার্‌ব—যদি মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করি—ঋষিদের জীবনকে আদর্শ স্থানীয় বলে শ্রদ্ধা করি—অনুসরণ করি।

ধার করে, ভিক্ষা করে, মায়ের পূজা হয় না। মায়ের পূজায় উপকরণ সব নিজে-রই উৎপন্ন দ্রব্য হওয়া চাই!



আরণ্যক

—:*:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"

—ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রত্যেকটী মানুষ তার বংশ, জাতি বা দেশের প্রতীক্ স্বরূপ। কাজেই প্রত্যেকটী জীবনেই তমোর বিরুদ্ধে তপস্যা প্রয়োজন। মানুষ মানুষ হতে চাইলে পশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই।

* * *

ক্ষুৎপিপাসাদি সঙ্গে যাবে না—দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিও ত্যাগ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার ঘুমটী তোমাকে ছাড়বে না। মরণের সময় থেকে তার পরেও ঘুমেই অজ্ঞান করে রাখে। এই মহাশত্রুকে জয় করতে পারলে ব্রহ্মানন্দ তোমার করায়ত্ত হবেই।

* * *

জেগে ঘুমান চাই বা ঘুমিয়েও জাগা চাই। ঘুমিয়ে যে দেহ-মনের ক্লান্তি দূর হয়, নূতন শক্তিতে আমরা উজ্জীবিত হই, সেই শক্তি জেগে থেকে আয়ত্ত করতে হবে। দেহ ঘুমাক—মন সর্ব্বদর্শী হয়ে মহাজপে মগ্ন থাক্—তবেই মায়াজয়—ব্রহ্মলাভ।

* * *

লৌকিক জগতে কর্ম্মের মাঝেও নিদ্রা-জড়তা-আলস্য প্রভৃতি তমোর বিকারগুলি আমাদিগকে পিছনে টেনে রেখে। যতটুকু প্রয়োজন হওয়া উচিত, তারও অনেক বেশী দাবী করে এই তমোগুণ। প্রত্যেকটী ব্যক্তি-গত জীবন ধ'রে ধ'রে সমস্ত ভারতবর্ষ মহাতমোতে আচ্ছন্ন। এর মাঝে যারা জাগতে চাইছে, সমষ্টির প্রবল শক্তিতে তাদিগকেও পিছনে টেনে রাখছে। অধ্যাত্ম-বীর তুমি, তোমাকে যে ঠেলে উঠতেই হবে!

* * *

হাজারকরা একজনও বোধ হয় যথার্থ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু নই আমরা—তা যদি হতাম তবে তার অর্থাৎ সেই হাজারকরা একজনের শক্তিতেই বহুকালের জড়তাও অনেক-খানি কমতে বাধ্য হত। তাই আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ কর—পথে যদি দু একটা কাঁটা বিঁধে, তাতেই বা দুঃখ কি?

* * *

আমার যা প্রাপ্য, তা আসবেই—নিশ্চে-ষ্টের মুখে এই যে ধুয়া, এর মূলে রয়েছে নিরাশার সান্ত্বনা বা জড়তার প্রশ্রয়। হাঁ, জন্মান্তরের স্বকৃতিবশে যদিই বা আসে, তবু নিশ্চেষ্ট থাকা কেন? এখনকার চেষ্টায় চলেও তো ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা হবে! কর্ম্মের আশয়ানুরূপ ফল যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অলসের তামস নির্ভরতা কেন! মহামুক্তিকামীর সংগ্রামে মরণও যে শ্লাঘার বিষয়।

—*—

বর্ষশেষে

—)*(—

অনন্ত কালপারাবারে বুদ্বুদের মত একটী বৎসর চলিয়া গেল। হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিলে সমগ্র বর্ষের ভিতর দিয়া যে নিরাশা, যে দুঃখ-দৈন্যের প্রবল অভিঘাত অনিবার্য্য বেগে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে মুহ্যমান হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে অতীতের সঞ্চয়ই তো একমাত্র আশ্রয়-স্থল নয়। মানুষের ভবিষ্যৎ আছে—এই ভবিষ্যৎই মানুষকে নব নব আশায় আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলে। তাই আজ অতীতের সঞ্চয়কে বুকের মাঝে সংহত না করে, ভবিষ্যতের আশাকেও সমুজ্জল-রূপে দেখিতে হইবে। বর্ষ-বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক চিন্তায় অনেক ভাবনায় সকল দিক হইতে উদ্বুদ্ধ সজাগ হইয়া উঠিতে হইবে। অতীতে যে ভুল-ত্রুটী হইয়া গিয়াছে, তাহা যেন পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত না হয়, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে। অতীতের সঞ্চয় আর ভবিষ্যতের আশাকে মিলাইয়া আমাদের নূতন অভিযান সুরু হইবে। আমরা আজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ মৌন-চিত্তে নব জীবনের অনাবিল প্রকাশকে দেখিয়া ধন্য হইব।

*　　*

সারা বৎসর ধরিয়া যে দুর্য্যোগ দেশের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু দেশের শুভলক্ষণের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। উত্তেজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে নাই। প্রত্যেকের চিত্তেই লক্ষ্যের অবিকম্প দীপ্তি উজ্জ্বল রহিয়াছে। আজ বিপ্লবের মূলেও দেখিতেছি একটা শক্তি আনয়নের প্রচেষ্টা। কাজেই সর্ব্বত্রই লক্ষ্য অচল-অটলই রহিয়াছে। দৃঢ়পণে সকলেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অবাঞ্ছনীয় ত্রুটীকে আজ বড় করিয়া দেখিলে ঠিক সুবিচার করা হইবে না। দেশ ধীরে ধীরে সব দিকেই জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। মহাত্মা গান্ধী নিজের আদর্শ প্রাণপূর্ণ বিশ্বাসে সত্য বলিয়া জানেন, কিন্তু সেই আদর্শে দেশ-বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে তাঁহাকে এতদিন নানা বাধা-বিঘ্ন পাইতে হইয়াছে। কিন্তু আজ সকল দিক হইতেই সেই সত্য-আদর্শ গ্রহণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। তাই মনে হয়, দেশ দিন দিন স্বাধিকার লাভের যোগ্য হইয়াই উঠিতেছে। কিন্তু সেই আদর্শকে কল্পনার ভিতর দিয়া অস্পষ্টরূপে পাইলে কোন ফল হইবে না, চাই তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার বীর্য্য। সেই জন্যই সত্যনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ একদল মানুষের প্রয়োজন। এখনো বাজে হৈ-চৈ না করিয়া ঢের কাজ পড়িয়া রহিয়াছে করিবার। সকলকেই আত্ম-নিষ্ঠ হইয়া সেই কর্ম্ম-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হইবে রাত্রিদিন। সেই কর্ম্মের অবকাশের অসময়ে ফল লাভের দরুণ প্রলুব্ধ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ বা কর্ম্মে বিভ্রাট ঘটাইয়া তুলিলে তাহাতে কোন কল্যাণের আশা নাই। সংস্কারের দরুণই যদি বিপ্লব হয়, তাহা হইলে সংস্কারের অনুকূল হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিলেই অমনি বিপ্লব-বিদ্রোহকে প্রশান্ত করিয়া, আত্ম-নিষ্ঠ কর্ম্মে নিজকে সমর্পণ করিয়া দেওয়াই মঙ্গলকর। কোন কিছুরই অপব্যয়ে বা বাড়াবাড়িতে ঠিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

*　　*　　*

পণ রক্ষার অটল বীর্য্য কয়েকটী কৃতী যুবকের মাঝে দেখা গিয়াছে। কিন্তু পণ রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদের যে অমূল্য শক্তির ব্যয় হইয়াছে, তাহা যদি কর্ম্মের মাঝে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে দেশ আরও বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িত। নিজক আদর্শ বা সঙ্কল্প রক্ষার দরুণই একদল যুবক অকাতরে প্রাণে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাদের সেই দৈবী-ক্ষেমের তুলনা নাই বটে, কিন্তু ইহাই শেষ নয়, এর পরেও অনেক কিছু বাকী আছে। সেই আদর্শকে নির্ব্বিরোধে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবারও প্রচেষ্টা চাই। সর্ব্বত্রই অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াটাই গৌরবের বা কল্যাণের পথ নয়। মোট কথা, কোন কিছুরই ঝোঁক ভাল না—চাই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া আর তাহাতে যেন কোন প্রকার প্রমত্ততার অন্ধ আবেগ না রাখা। মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথের মত এমন নির্দ্দোষ অথচ কল্যাণকর, উন্নতিকর পথ আর নাই। দেশের প্রাণ উত্তেজনাবিহীন হইয়া স্তব্ধ হোক, শান্ত হোক—আর সেই শান্ত প্রাণের অনাবিল অক্লান্ত কর্ম্মচেষ্টা দেশবাসীকে আপন ইষ্ট সিদ্ধির পথে সজাগ সচেষ্ট রাখুক!

* * *

শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রভৃতি দৈবী সম্পদ্‌গুলিকে অবজ্ঞা করিয়া যে কোন পথেই চলি না কেন, তাহাতে আমাদের কল্যাণের আশা নাই! ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, মানুষ যদি বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে কোন দিন উন্নতি হইবে না। দোষ, গলদ সর্ব্বত্রই থাকিতে পারে, কিন্তু সেই গলদকে নির্ম্মূল, নিশ্চিহ্ন করিতে হইলে যে মনের মাঝে ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে, বা তাহার দরুণ নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা, বিশ্বাসকেও জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এর কোন মানে নাই। সংস্কার করিতে হইলেও অপ্রমত্ত হইয়া করিতে হইবে। তরল মস্তিষ্কযুক্ত লোক যদি সংস্কারক হয়, তাহা হইলে তাহাতে হিত না হইয়া বরঞ্চ শতগুণে অহিতই হইয়া থাকে। অজ্ঞান হইয়া বিমূঢ় হইয়া কোন কিছুই করা উচিৎ নয়। ধর্ম্মেও আজ সংস্কারকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাদের যদি সংস্কারের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সব দিকে একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া দেওয়াটাই যেন তাহাদের কৃতিত্ব বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বত্রই এইরূপ একদল উন্মার্গ-গামী তরলমস্তিষ্ক লোকে আবির্ভাব দেখা দিয়াছে।

* * *

কর্ম্ম করিলে তাহার একটা প্রতিদান পাওয়া যায়ই। অবশ্য নিজে নিজেই হয়ত অনেক কর্ম্মের সহজ সরল প্রণালী আবিষ্কার করা যায় না, সেই জন্যই একজন ওস্তাদের প্রয়োজন। কিন্তু সত্যিকার আকুলতা লইয়া যতটুকুই করি না কেন, তাহার একটা ফল আছেই। এই জন্যই সত্যিকার সাধকের অপরের উপর দোষারোপ করিবার দুর্ব্বল প্রবৃত্তিটা খুব কম। নিজে যেখানে মূলতঃই কিছু করি না, সেখানেই দায় সারিবার দরুণ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে হয়। আমাদের যত কিছু অকৃতকার্য্যতা সব স্থান কাল আর পাত্র দোষে—আমাদের বিন্দুমাত্রও দোষ নাই তাহাতে! সাধন ভজনের পথটা একটা অবজ্ঞার পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই পথকে অবজ্ঞা করে বা অবিশ্বাস করে, তাহারা যদি বাস্তবিকই কাজে নামিয়া তারপর যথাযথ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিত, তাহা হইলে এত ক্ষতি হইত না। কিন্তু নিজে মোটেই কিছু না করিয়া, অপরের বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ

করিতে যাহারা উদ্যত হয়, তাহাদের মত মূঢ় আর কে আছে?

*　　*　　*

সঙ্ঘের প্রথম অবস্থায় সব দিক বেশ সুন্দরই চলে, কিন্তু যখনই সঙ্ঘে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখনই বুঝিতে হইবে, আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া আত্মসিদ্ধি বা স্বার্থের পথে চলিয়াছি। এক লক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া যেখানে পাঁচটী প্রাণ সম্মিলিত হইয়াছি, সেই একটীর মাঝেও যদি লক্ষ্যহারা ভাব সংক্রমিত হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ। এই জন্যই সঙ্ঘের মাঝে ভাব-বিনিময়ের একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্য স্থির আছে কিনা, তাহা বারংবার অলোচনা করিতে হয়। একটু একটু করিয়াই গলদ সঞ্চিত হয়, পরে তাহা হইতেই লক্ষ্য ভ্রংশের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। এই জন্যই সঙ্ঘ যেখানে রহিয়াছে, সেইখানে প্রাত্যহিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রাণে প্রাণে মিলিত হইতে পারিলেই আমাদের সকলদিকে উন্নতি হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন।

অক্ষয় তৃতীয়া

আগামী ৮ই বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্রত্য সারস্বত মঠের চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্য-দর্পণের গ্রাহক অনুগ্রাহক, ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি

শ্রীগুরুর মঙ্গলময় অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া "আর্য্য-দর্পণ" ত্রয়োবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্য-দর্পণ ২৪শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। শ্রীগুরুর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের আনুকূল্যে আমরা এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ দেশের ও বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আর্য্য-দর্পণ যদি ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক-

দিগের আদরের সামগ্রী হইয়া থাকে, তাহা শ্রীভগবানেরই আশীর্ব্বাদের ফল।

নব বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের শেষ ভাগে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মণিঅর্ডার যোগে মূল্য (২॥০) প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ২৫শে বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের শেষ ভাগে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ২৫শে বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে, তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমাদের নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকা-খানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমা-দিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা করি—আমাদের এই অনু-রোধ উপেক্ষিত হইবে না।

আরও একটী বিষয় গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, পোষ্ট-অফিসের নূতন নিয়ম অনুযায়ী ভিঃ পিঃ প্যাকেট তিন দিনের অধিক কোন পোষ্ট-অফিসে জমা রাখা হইবে না; সুতরাং তিন দিনের মধ্যে ভিঃ পিঃ গ্রহণ না করিলে উহা আমাদের নিকট ফেরত আসিবে এবং তাহাতে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহকগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, যাহাতে শৈথিল্য বশতঃ ভিঃ পিঃ ফেরত না আসে। বিশেষ বলা বাহুল্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"আর্য্যদর্পণ"

